রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

—

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

প্রবন্ধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশ মাঘ ১৩৯৮
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

প্রকাশক
শিক্ষাসচিব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ। কলিকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রাকর
শ্রীসরস্বতী প্রেস (১৯৮৪) লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
১১ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৫৬

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তম জনসাধারণের কাছে পেঁছে দেবার এই আয়োজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পর, ২০০১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনকর্মে যে-সব প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে' না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রবীন্দ্রভবন। শান্তিনিকেতন
জনাব আনিসুজ্জামান

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মুদ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্মিগণ সহযোগিতা ও বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সংস্কৃতশিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকাশ : ১৮৯৬

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা অনুযায়ী 'সংস্কৃতশিক্ষা'র প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ একই সঙ্গে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। দুই খণ্ডই হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। তবে প্রথম ভাগের কোনো কপি পাওয়া যায় নি।

বাল্মীকিরামায়ণ-অনুবাদক

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত

সন্ধিসংকেত*

১

কা+অ
ক+আ
ক+অ
কা+আ } =কা

২

ক+ই
ক+ঈ
কা+ই
কা+ঈ } =কে

৩

ক+এ
ক+ঐ
কা+এ
কা+ঐ } =কৈ

৪

কি+আ
কী+আ } =ক্যা

৫

কৃ+আ=ক্রা

৬

কে+উ=কউ
কে+এ=কএ

৭

কৌ+অ=কাব

৮

কৌ+উ=কাবু
কৌ+এ=কাবে

৯। অকারের পূর্বে বিসর্গযুক্ত অকার বিসর্গ ত্যাগ করিয়া ওকার হয় এবং পরবর্তী অ লোপ হয়। সেই লুপ্ত অকারের নিম্নলিখিত চিহ্নটি থাকে মাত্র; ইহার কোনো উচ্চারণ নাই। ঽ।

কঃ+অ=কোঽ
কঃ+অত্র=কোঽত্র (উচ্চারণ কোত্র)

১০। অ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্বরবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত আকারের বিসর্গ লোপ হয়।

কঃ+আ=কআ   কঃ+ই=কই
কঃ+উ=কউ   কঃ+ঋ=কঋ

১১। আ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্বরবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত আকার তাহার বিসর্গ ত্যাগ করে।

কাঃ+অ=কাঅ   কাঃ+ই=কাই
কাঃ+উ=কাউ ইত্যাদি।

*এই গ্রন্থে যে-সকল সন্ধি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহারই সংকেত লিখিত হইল। এগুলি মুখস্থ করিবার জন্য নহে। পরবর্তী পাঠসমূহে যেখানে কোনো সন্ধি আসিবে অথবা পাঠচর্চায় যেখানে কোনো সন্ধির আবশ্যক হইবে এই-সকল এক দুই তিন চিহ্নিত সংকেতের সহিত ছাত্রগণ মিলাইয়া লইবে।

১২। নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত অকার বিসর্গ ত্যাগ করিয়া ওকার হইয়া যায়।

গ, ঘ
জ, ঝ
ড, ঢ
দ, ধ, ন
ব, ভ, ম
য, র, ল, ব, হ

কঃ+গ=কোগ কঃ+জ=কোজ
কঃ+ন=কোন ইত্যাদি।

১৩। নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে বিসর্গযুক্ত আকার তাহার বিসর্গ ত্যাগ করে।

গ, ঘ
জ, ঝ
ড, ঢ
দ, ধ, ন
ব, ভ, ম
য, র, ল, ব, হ

কাঃ+গ=কাগ
কাঃ+জ=কাজ ইত্যাদি।

১৪। বিসর্গ যখন ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন তাহা পরবর্তী স্বরবর্ণ মাত্রেরই সহিত র্ আকারে যুক্ত হয়।

কিঃ+অ=কির কিঃ+আ=কিরা
কুঃ+ই=কুরি কুঃ+উ=কুরু
কীঃ+এ=কীরে ইত্যাদি।

১৫। বিসর্গ যখন ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন তাহা পরবর্তী নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত রেফ্ আকারে যুক্ত হয়।

গ, ঘ
জ, ঝ
ড, ঢ
দ, ধ, ন
ব, ভ, ম
য, র, ল, ব, হ

কিঃ+গ=কির্গ কীঃ+ঘ=কীর্ঘ
কুঃ+জ=কুর্জ কৃঃ+ঝ=কৃর্ঝ
কেঃ+ড=কের্ড কোঃ+ঢ=কোর্ঢ ইত্যাদি।

১৬। বিসর্গ, পরবর্তী চ ও ছ-য়ের সহিত শ্ রূপে যুক্ত হয়।

কঃ+চ=কশ্চ কঃ+ছ=কশ্ছ

১৭। বিসর্গ, পরবর্তী ট ও ঠ-য়ের সহিত ষ্ রূপে যুক্ত হয়।

কঃ+ট=কষ্ট কঃ+ঠ=কষ্ঠ

১৮। বিসর্গ, পরবর্তী ত ও থ-য়ের সহিত স্ রূপে যুক্ত হয়।

কঃ+ত=কস্ত　　　　কঃ+থ=কস্থ

—

১৯। স্বরবর্ণের পর ছ আসিলে সেই ছ-য়ের সহিত চ্ যুক্ত হয়।

ক+ছ=কচ্ছ　　　　কি+ছ=কিচ্ছ

কু+ছ=কুচ্ছ ইত্যাদি।

২০। ত্-য়ের পর কোনো স্বরবর্ণ থাকিলে তাহা দ্ হইয়া সেই স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত হয়।

কত্+অ=কদ　　　　কত্+ই=কদি

কত্+এ=কদে

২১। ত্-য়ের পর ন আসিলে উভয়ে মিলিয়া ন্ন হয়।

কত্+ন=কন্ন

২২। ত্-য়ের পর চ আসিলে উভয়ে মিলিয়া চ্চ হয়।

কত্+চ=কচ্চ

প্রথম পাঠ

প্রত্যেক পাঠে যে সকল নূতন শব্দ ব্যবহার হইবে তাহাদের বিভক্তিপ্রকরণ পূর্ব-শিক্ষিত কোন্ কোন্ শব্দের অনুরূপ তাহা শিক্ষক বলিয়া দিবেন। এতদর্থে প্রথম ভাগের নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে আদর্শ-স্বরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন।

বটঃ, গিরিঃ, প্রহরী, তরুঃ, ফলং, লতা, নদী, ধেনুঃ, বধূঃ

যে পদে যে সন্ধির ব্যবহার হইয়াছে অথবা আবশ্যক হইবে, সেই সন্ধিসংকেতের সংখ্যা তৎপার্শ্বে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে লিখিত থাকিবে; ছাত্রগণ তাহা মিলাইয়া লইয়া সন্ধি করিবে।

নিদাঘকালঃ	গ্রীষ্মকাল
তড়াগঃ	পুষ্করিণী
আতপঃ	রৌদ্র
পরিক্ষীণ	ক্ষয়প্রাপ্ত
পাংশুঃ	ধূলি
সরস্তীরং	সরোবরের তীর
কুরঙ্গঃ	হরিণ

—

[illegible]

কূপস্তড়াগশ্চ শুষ্যতি (১৮, ১৬)। দিবসঃ প্রখরাতপো ভবতি (১২)। গাত্রং দহতি। পিঞ্জরে শুকো ন জল্পতি (১২)।* নদী পরিক্ষীণা শোভতে। শুষ্কং পত্রং পততি। পাংশুরুদ্গচ্ছতি গগনে (১৪)। বকুলশ্চম্পকশ্চ বিকশতি (১৬)। সরস্তীরে মৃগশ্চরতি (১৬)। শ্রান্তো গৌঃ শব্দায়তে (১২)। শুষ্কা শাখা কম্পতে পবনাহতা। ক্ষুধিতঃ পান্থঃ পচতি তরুতলে। ছায়ান্বেষী† কুরঙ্গো ধাবতি (১২)। পাঠাগারে পঠতিচ্ছাত্রঃ (১৯)।

* যে-সকল শব্দে সপ্তমী বিভক্তি অবিকল বাংলার অনুরূপ, সেই-সকল শব্দেই সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে অতএব ইহা বুঝিতে ছাত্রদের কষ্ট হইবে না।

† ছায়ান্বেষী বিশেষণ শব্দটি প্রহরী শব্দের ন্যায়।

পাঠচর্চা । ২ ।

সংস্কৃত করো—

১। কে যাইতেছে (১২)?
২। আমার গুরু যাইতেছেন (১৫)।
৩। যে পড়িতেছে সে কে?*
৪। যে পড়িতেছে সে আমারই বন্ধু (৩)।
৫। কে শব্দ করিতেছে?
৬। চঞ্চল শুক শব্দ করিতেছে।
৭। কাহার ধেনু চরিতেছে (১৬)?
৮। আমার কপিল ধেনু চরিতেছে (১৬)।
৯। কে তাহার পুত্র (১৮)?
১০। যে পাক করিতেছে সেই তাহার পুত্র।
১১। কাহার স্বচ্ছ শীতল জলাশয় শোভা পাইতেছে (১২)?
১২। তোমারই স্বচ্ছ শীতল জলাশয় শোভা পাইতেছে (৩, ১২)।

কণ্ঠস্থ করো—

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বমানপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবত্ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।
(১২, ১, ২২, ২১)

দূরতঃ	দূর হইতে
পটাবৃতঃ	বস্ত্রাবৃত
তাবত্	সেই পর্যন্ত
যাবত্	যে পর্যন্ত
ন ভাষতে	না কথা কহে

উপরের শ্লোকটির সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

পটাবৃত শব্দটি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত?

তৃতীয় পাঠ

শরঃ	তীর
সমরঃ	যুদ্ধ
সারথিঃ	যে রথ চালায়
রণঃ	যুদ্ধ
অঙ্গনং	উঠান্
রণাঙ্গনং	**রণক্ষেত্র**
রথঃ	
গোমায়ুঃ	শৃগাল
ক্ষুধা	

* মনে রাখিতে হইবে, অ ব্যতীত অন্য সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে সঃ শব্দের বিসর্গ লোপ হয় এবং তাহার অন্য কোনো পরিবর্তন হয় না। অ স্বরবর্ণের পূর্বে, সঃ, বিসর্গ ত্যাগ করিয়া সো হইয়া যায় এবং পরবর্তী অকারের উচ্চারণ লোপ হইয়া তাহা লুপ্ত অকারের চিহ্ন ধারণ করে। যথা, সঃ অত্র—সোঽত্র।

আৰ্ত্ত	কাতর
গৃধ্রঃ	শকুনি
শয্যা	
রথী	রথে চড়িয়া যে যুদ্ধ করে
প্রান্তরং	মাঠ
দেবালয়ঃ	দেবমন্দির
বিপ্রঃ	ব্রাহ্মণ
ত্রস্ত	ভীত
মাল্যং	মালা

১। অশ্বৌ পততঃ শরাহতৌ সমরে (১)।
২। পরাজিতৌ সৈনিকৌ ধাবতঃ।
৩। মৃতৌ সারথী রণাঙ্গনে শোভতে (১)।
৪। ভগ্নৌ রথৌ যোধহীনৌ ভবতঃ।
৫। গোমায়ু শব্দায়েতে ক্ষুধার্ত্তৌ (১)।
৬। গৃধ্রৌ চরতঃ।
৭। গৃহে দহতঃ।
৮। কম্পেতে ভীতে বালে শয্যাতলে।
৯। রথিনৌ জল্পতঃ পচতশ্চ প্রান্তরে।
১০। দেবালয়ে বিপ্রৌ পঠতঃ (১)।
১১। ত্রস্তৌ কাকাবুদ্গচ্ছতঃ (৮)।
১২। ছিন্নে মাল্যে শুষ্যতঃ সূর্য্যাতপে (১)।

পাঠচর্চা। ১ ।

ক। সন্ধি বিচ্ছেদ করো।
খ। বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়া নির্বাচন করো।
গ। স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দ পৃথক করো।
ঘ। তঃ-অন্ত ও এতে-অন্ত ক্রিয়াগুলিকে স্বতন্ত্র করো।
ঙ। সমস্ত পদগুলিকে একবচন করো।
তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দ্রষ্টব্য।

২ (১২)
৪ (১২)
৬ (১৬)
১১ (১০)

চ। শরাহত, যোধহীন, আর্ত, ত্রস্ত, ভগ্ন ও ছিন্ন বিশেষণগুলিকে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ রূপে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন করো।
সমরঃ, সারথিঃ, রণঃ, অঙ্গনং, রথঃ, গোমায়ুঃ, ক্ষুধা, গৃধ্র, বালা, রথী, বিপ্রঃ, শয্যা, কাকঃ, মাল্যং, সূর্য্যাতপঃ, দেবালয়ঃ, প্রান্তরং, শয্যাতলং, একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন করো।

ঞ। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত—
শরাহত, রণাঙ্গন, শয্যাতল, দেবালয়, সূর্যাতপ।
ট। তৃতীয় পাঠের বিশেষ্য বিশেষণগুলিকে সংযুক্ত করো।

পাঠচর্চা। ২।

ক। সংস্কৃত করো—
১। দুই গিরি সিন্ধুতীরে শোভা পাইতেছে।
২। দুই লতা কাননে কাঁপিতেছে।
৩। দুই প্রহরী ছুটিতেছে।
৪। দুই গরু প্রান্তরে চরিতেছে।
৫। দুই পান্থ পথিমধ্যে বকিতেছে।
৬। দুই কমল সরোবরে ফুটিতেছে।
৭। দুই বধূ গৃহপ্রান্তে পাক করিতেছে।
৮। দুই অশ্ব প্রাঙ্গণে শব্দ করিতেছে।

খ। এই পদগুলিকে একবচন করিয়া সংস্কৃত করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেত দ্রষ্টব্য—৭ (১৫)
গ। সিন্ধুতীরং, কাননং, দ্বারদেশঃ, গৃহপ্রান্তঃ, এই শব্দগুলিকে দ্বিবচন ও বহুবচন করো।
ঘ। নিম্নলিখিত শব্দ দুইটি যদি সংযুক্ত না হইত তবে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত?—
সিন্ধুতীর, গৃহপ্রান্ত।

পাঠচর্চা। ৩।

ক। বিশেষ্য বিশেষণ একবার সংযুক্ত ও একবার বিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত করো।
১। দুই উজ্জ্বল দীপ কাঁপিতেছে।
২। দুই উন্নত গিরি শোভা পাইতেছে।
৩। দুই ব্যাকুল ধেনু শব্দ করিতেছে।
৪। দুই কপিল গোরু চরিতেছে।
৫। দুই শঙ্কিত প্রহরী ছুটিতেছে।
৬। দুই শ্রান্ত পান্থ যাইতেছে।
৭। দুই চঞ্চল বধূ বকিতেছে।
৮। দুই ক্ষুধিত সৈনিক পাক করিতেছে।
৯। দুই রক্তকমল ফুটিতেছে।
খ। ক্রিয়া পূর্বে দিয়া উল্লিখিত পদগুলিকে সংস্কৃত করো। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সন্ধি-সংকেতগুলি দ্রষ্টব্য—
১ (৬), ২ (৬), ৭ (১৬)
গ। দ্বিবচন পদগুলিকে একবচন করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দ্রষ্টব্য—
১ (১২), ২ (১২), ৪ (১২, ১৬), ৬ (১২), ৭ (১৫)

চতুর্থ পাঠ

একবচন	দ্বিবচন
কঃ	কৌ (কোন্ দুইজন)
যঃ	যৌ (যে দুইজন)
সঃ	তৌ (সেই দুইজন)

১। কস্য বাহূ কম্পেতে?
২। যঃ পচতি প্রান্তরে তস্য বাহূ কম্পেতে।
৩। যৌ পঠতো মন্দিরে তৌ কৌ (১২)।
৪। যৌ পঠতো মন্দিরে তৌ বটূ মমচ্ছাত্রৌ (১২, ১৯)।
৫। যঃ পঠতি স্বল্পালোকে তস্য কিং ভবতি?
৬। যঃ পঠতি স্বল্পালোকে তস্য নেত্রে ক্ষীণে ভবতঃ।
৭। যৌ শোভেতে তরুতলে তৌ তব পুত্রৌ ন বা?
৮। যৌ শোভেতে তরুতলে তৌ মম পুত্রৌ, যৌ শব্দায়েতে ক্রীড়াগারে তৌ চ পুত্রৌ মমৈব (৩)।

পাঠচর্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ করো।
খ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদটি ব্যতীত অন্য পদগুলিকে একবচন করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দ্রষ্টব্য—

৪ (১৫, ১৯), ৭ (১২), ৮ (১২, ৩)

পাঠচর্চা। ২।

ক। সংস্কৃত করো—

১। কোন্ দুইজন ছুটিতেছে?
২। দুইজন প্রহরী ছুটিতেছে।
৩। কাহার দুইটি ধেনু চরিতেছে?
৪। আমারই দুইটি ধেনু চরিতেছে (৩)।
৫। যে দুইজন বকিতেছে তাহারা কাহারা (১৮)?
৬। যে দুইজন বকিতেছে তাহারা তোমারই ছাত্র (১৮, ৩, ১৯)।
৭। কাহার দুইটি উজ্জ্বল মণি শোভা পাইতেছে?
৮। আমারই দুই উজ্জ্বল মণি শোভা পাইতেছে (৩)।
৯। কোন্ দুইটি গোরু শব্দ করিতেছে?
১০। তোমারই দুইটি গোরু শব্দ করিতেছে (৩)।
১১। কোন্ দুইজনে কাঁপিতেছে?
১২। যে দুইজন ছাত্র পড়িতেছে তাহারাই কাঁপিতেছে (১৮, ৬)।

খ। একবচন করো।

কণ্ঠস্থ করো—

অনাহূতঃ প্রবিশতি, অপৃষ্টো বহু ভাষতে,
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি, মূঢ়চেতা নরাধমঃ।

অনাহূতঃ, অপৃষ্টঃ, অবিশ্বস্তঃ, নরাধমঃ, এই কয়েকটি শব্দকে দ্বিবচন ও বহুবচন করো। প্রথম তিনটি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ করিয়া একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন করো। নিম্নলিখিত দুইটি ক্রিয়াপদকে দ্বিবচন করো—

প্রবিশতি, ভাষতে।

নরাধম শব্দ, সংযুক্ত না হইলে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত?

পঞ্চম পাঠ

তুষারঃ	বরফ
নির্ঝরঃ	
ফেনিল	ফেনবিশিষ্ট
শীকরঃ	জলের কণা
উপলঃ	নুড়ি
প্রহত	আঘাতপ্রাপ্ত
বিশাল	বৃহৎ
শিলা	পাথর
স্খলিত	খসিয়া-পড়া
চকিত	চমকিত
অরণ্যং	
তপোবনং	
ঋষিকুমারঃ	ঋষিবালক
আর্দ্র	ভিজা
বল্কলঃ	গাছের ছালে নির্মিত বসন
বিটপঃ	ডাল
প্রাঙ্গণং	উঠান

১। গিরয়ঃ শোভন্তে দূরতঃ।
২। তুষারা ভান্তি শুভ্রাঃ (১৩)।
৩। পতন্তি নির্ঝরাঃ ফেনিলাঃ।
৪। শীকরা উদ্গচ্ছন্তি (১১)।
৫। উপলাঃ শব্দায়ন্তে প্রহতাঃ।
৬। বিশালাঃ শিলাঃ স্খলিতা ভবন্তি (১৩)।
৭। অরণ্যানি কম্পন্তে।
৮। ভয়চকিতাঃ কুরঙ্গা ধাবন্তি (১৩)।
৯। তপোবনে ঋষিকুমারাঃ পঠন্তি।
১০। মুনিকন্যা জল্পন্তিচ্ছায়াতলে (১৩, ১৯)।
১১। আর্দ্রা বল্কলাঃ শুষ্যন্তি তরুবিটপে (১৩)।
১২। সরস্তীরে চরন্তি ধেনবঃ (১৮ সরঃ+তীরম্)।
১৩। মুনিপত্ন্যঃ পচন্তি প্রাঙ্গণে।

পাঠচর্চা। ১।

ক। সন্ধিবিচ্ছেদ করো।
খ। বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়া নির্বাচন করো।
গ। স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ-শব্দ পৃথক্ করো।
ঘ। ন্তি-অন্ত ও ন্তে-অন্ত ক্রিয়াগুলিকে ভিন্ন করো।
ঙ। উক্ত পদগুলিকে একবচন ও দ্বিবচন করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেতগুলি দ্রষ্টব্য—

একবচনে—		দ্বিবচনে—	
২	(১২)	৩	(১২)
৪	(১০)	৪	(৮)
৮	(১২)	১০	(১৬)
১০	(১৯)	১১	(১৮)
১১	(১২)		

চ। ফেনিল, প্রহৃত, বিশাল, স্খলিত, চকিত, আর্দ্র, বিশেষণগুলিকে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গরূপে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন করো।
ছ। ভয়চকিত, তপোবন, ঋষিকুমার, মুনিকন্যা, ছায়াতল, তরুবিটপ, অশোকপুষ্প, চক্রবাকমিথুন, কমলবন, সরস্তীর, মুনিপত্নী, শব্দগুলি সংযুক্ত না হইলে বাংলায় কিরূপে লিখিত হইত?

পাঠচর্চা। ২।

ক। সংস্কৃত করো—
১। পুষ্প-সকল বিকশিত হইতেছে।
২। গিরি-সকল শোভা পাইতেছে।
৩। ধেনু-সকল শব্দ করিতেছে।
৪। বধূ-সকল কাঁপিতেছে।
৫। সাধু-সকল যাইতেছে (১২)।
৬। বালিকা-সকল পাক করিতেছে।
৭। পক্ষী-সকল চরিতেছে (১৬)।
৮। কমল-সকল প্রকাশ পাইতেছে।
৯। দাসী-সকল বকিতেছে (১২)।
খ। উল্লিখিত পদগুলিকে একবচন ও দ্বিবচন করিয়া সংস্কৃত করো। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত সন্ধিসংকেত দ্রষ্টব্য—৫ (১৪)

পাঠচর্চা। ৩।

ক। বিশেষ্য বিশেষণ একবার সংযুক্ত ও একবার বিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত করো।*
১। পুষ্পিত লতা-সকল কাঁপিতেছে (১৩)।
২। চঞ্চল কপি-সকল শব্দ করিতেছে।
৩। বিশ্রান্ত দ্বারী-সকল শব্দ করিতেছে (১৩)।

* বিসর্গের সহিত চ শব্দের কিরূপ যোগ হয় স্মরণ রাখিতে হইবে।

৭।৮। পৌ-অকঃ, স্তৌ অকঃ, ভৌ উকঃ, নৌ এ, গেলৌ এ।

৯। নরঃ অয়ং, নবঃ অঙ্কুরঃ, তীক্ষ্ণঃ অঙ্কুশঃ, জ্বলিতঃ অঙ্গারঃ, বেদঃ অধীতঃ।

১০। কুতঃ আগতঃ, নরঃ ইব, কঃ ঈহতে, চন্দ্রঃ উদেতি, ইতঃ ঊর্ধ্বং, দেবঃ ঋষিঃ, কঃ এষঃ, কুতঃ ঐক্যং, রক্তঃ ওষ্ঠঃ, রাজ্ঞঃ ঔদার্য্যং।

১১। অশ্বাঃ অমী, গজাঃ ইমে, তারাঃ উদিত্বাঃ, আগতাঃ ঋষয়ঃ, নরাঃ এতে।

১২। শোভনঃ গন্ধঃ, নূতনঃ ঘটঃ, সদ্যঃ জাতঃ, মধুরঃ ঝঙ্কারঃ, নবঃ ডমরুঃ, গজঃ ঢৌকতে, মূর্দ্ধণ্যঃ ণকারঃ, নির্ব্বাণঃ দীপঃ, অশ্বঃ ধাবতি, উন্নতঃ নগঃ, দৃঢ় বন্ধঃ, অকুতঃ ভয়ঃ, অতীতঃ মাসঃ, কৃতঃ যত্নঃ, শান্তঃ রোষঃ, কৃতঃ লোভঃ, শীতঃ বায়ুঃ, বামঃ হস্তঃ।

১৩। হতাঃ গজাঃ, কৃতাঃ ঘটাঃ, পুত্রাঃ জাতাঃ, মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ, নবাঃ ডমরবঃ, গজাঃ ঢৌকন্তে, নির্ব্বাণাঃ দীপাঃ, অশ্বাঃ ধাবন্তি, উন্নতাঃ নগাঃ, দৃঢ়াঃ বন্ধাঃ, নরাঃ ভীতাঃ, অতীতাঃ মাসাঃ, ছাত্রাঃ যতন্তে, এতাঃ রথ্যাঃ, নরাঃ লভন্তে, বাতাঃ বান্তি, বালকাঃ হসন্তি।

১৪। কবিঃ অয়ং, গতিঃ ইয়ং, রবিঃ উদেতি, শ্রীঃ অসৌ, সুধীঃ এষঃ, বন্ধুঃ আগতঃ, গুরুঃ উবাচ, বধূঃ এষা, ভূঃ ইয়ং, মাতৃঃ অৰ্চ্চয়, দুহিতৃঃ আহবয়, রবেঃ উদয়ঃ, তৈঃ উক্তং, বিধোঃ অস্তময়নং, প্রভোঃ আদেশঃ, গোঃ অয়ং।

১৫। ঋষিঃ গচ্ছতি, হবিঃ ঘ্রাণং, গুরুঃ জয়তি, কৃতৈঃ ঝঙ্কারৈঃ, নবৈঃ ডমরুভিঃ, গোঃ ঢৌকতে, রবেঃ দর্শনং, নিঃ ধনঃ, দুঃ নীতিঃ, নিঃ বন্ধঃ, নিঃ ভয়ঃ, মুহুঃ মুহুঃ, বহিঃ যোগঃ, বিধুঃ লীয়তে, বায়ুঃ বাতি, শিশুঃ হসতি।

১৬। পূর্ণঃ চন্দ্রঃ, জ্যোতিঃ চক্রং, নিঃ চিতঃ, বায়ুঃ চলতি, ধাবিতঃ ছাগঃ, রবেঃ ছবিঃ, তরোঃ ছায়া, রজ্জুঃ ছিদ্যতে।

১৭। ভীতঃ টলতি, উড্ডীনঃ টিট্টিভঃ, ধনু টঙ্কারঃ, স্থিরঃ ঠক্কুরঃ, ভগ্নঃ ঠক্কুরঃ।

১৮। উন্নতঃ তরুঃ, নদ্যাঃ তীরং, ভূমেঃ তলং, ক্ষিপ্তঃ থুৎকারঃ, স্নাতঃ শুধ্যতি।

১৯। সিত ছত্রং, পরি ছদঃ, অব ছেদঃ, বৃক্ষ ছায়া, গৃহ ছিদ্রঃ।

২০। জগৎ অন্তঃ, জগৎ আদিঃ, জগৎ ইন্দ্রঃ, জগৎ ঈশঃ, ভবৎ উক্তং, ভবৎ ঊহনং, ভবৎ ঋণং, জগৎ এতৎ, মহৎ ঐশ্বর্য্যং, মহৎ ওজঃ, মহৎ ঔষধং।

২১। মহৎ চক্রং, ভবৎ চরণং, উৎ চারণং, এতৎ চন্দ্রমণ্ডলং।

২২। জগৎ নাথঃ, উৎ নতঃ, সৎ নীতি, বৃহৎ নাটকং।*

ছাত্রগণ এই-সকল উদাহরণ অনুসারে সন্ধিসূত্র নিজে নিজে লিখিবে।

কণ্ঠস্থ করো—

এষ খলু মাধবঃ কার্য্যেণ কেনাপি ত্বাং প্রেক্ষিতুম্ ইচ্ছতি। এই যে, মাধব কোনো একটি কার্যের জন্য তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

গচ্ছ ত্বং আত্মনো গৃহং, অহমপি মাধবং দৃষ্টবা ত্বরিতমাগত এব। তুমি আপনার ঘরে যাও, আমিও মাধবকে দেখিয়া শীঘ্রই এলেম ব'লে।

বয়স্য চিরাদ্দৃষ্টোহসি। বন্ধু বহুকাল পরে দেখা হইল।

বিবাহমহোৎসব-দর্শন-কৌতূহলেন পরিভ্রমন্ এতাবতীং বেলাং স্থিতোহস্মি। বিবাহ-উৎসব দেখিবার কৌতূহলবশতঃ এত বেলা ঘুরিতেছিলাম।

মাধব, অদ্য চিরয়তি মে ভ্রাতা। মাধব, অদ্য আমার ভ্রাতা বিলম্ব করিতেছেন।

তদ্গত্বা জানীহি কিমাগতো ন বেতি। অতএব গিয়া তুমি জানিয়া আইস তিনি আসিলেন কি না।

---

* এই উদাহরণগুলির অধিকাংশই ব্যাকরণকৌমুদী হইতে সংগৃহীত।

ক এষ ত্বরিতং ইত এব আগচ্ছতি? কে তাঁড়াতাড়ি এই দিকেই আসিতেছে?

এষ ন পুনর্মে ভ্রাতা। এ তো আমার ভ্রাতা নয়।

সখে, কিং নিমিত্তং মাং পরিহৃত্য এবং ত্বরিতং গম্যতে? সখে, কিজন্য আমাকে ছাড়াইয়া এমন তাড়াতাড়ি চলিয়াছ?

মাধব, ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং, সময়োহয়ং গমনস্য পাঠাগারে। মাধব, ত্বরা কর, পাঠাগারে যাইবার সময় হইয়াছে।

এবং যথাহ ভবান্। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই বটে।

'ইংরাজি-সোপান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯০৪ ও ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দুই ভাগ— উপক্রমণিকা এবং ইংরাজি-সোপান প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডও ইংরাজি-সোপান দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগে বিভক্ত। তবে পরবর্তী কালে প্রথম খণ্ডের 'উপক্রমণিকা' অংশ পরিবর্ধিত আকারে ১৯০৯ সালে 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে, প্রথম খণ্ডের 'প্রথম ভাগ' এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'দ্বিতীয় ভাগ' পরিবর্ধিত আকারে 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ নামে ১৯২৯ সালে দুটি স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। তদনুযায়ী বর্তমান রচনাবলী সংস্করণে 'ইংরাজি-সোপান'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের 'উপক্রমণিকা', 'প্রথম ভাগ' ও 'দ্বিতীয় ভাগ' 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা', 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' প্রথম ভাগ এবং 'ইংরেজি সহজ শিক্ষা' দ্বিতীয় ভাগ রূপে মুদ্রিত। এবং 'ইংরাজী-সোপান'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের 'তৃতীয় ভাগ' কালানুক্রমে প্রথমে মুদ্রিত হল।

'ইংরাজি-সোপান'-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

ইংরাজি-সোপান বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য রচিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসংকোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। যাঁহারা অধিক বয়সে ইংরাজি শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহার সাহায্যে অল্প দিনেই শিক্ষার্থীগণ ইংরাজি ভাষাশিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন ইহা আমাদের জানা কথা।

এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা নিয়মিত পাঠের অন্তর্গত নহে। ছাত্রগণ যখন অক্ষরপরিচয়ে প্রবৃত্ত তখনি ইংরাজি ভাষার সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন এই অংশের উদ্দেশ্য। ইহা ভাষাশিক্ষার ড্রিল। শিক্ষক ক্লাসের জন্য ছাত্রগণকে দাঁড় করাইয়া ইংরাজি ভাষায় আদেশ করিবেন, তাহারা পালন করিতে থাকিবে। যখন বলিবামাত্র তাহারা যথারূপে আদেশ সম্পন্ন করিবে তখন বুঝা যাইবে আদেশবাক্যের তাৎপর্য তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইংরাজি বই পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই এই সহজ উপায়ে বিস্তর ইংরাজি শব্দ তাহাদের কর্ণে ও তাহার অর্থ তাহাদের মনে অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে শিক্ষাকার্য অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইবে।

ইংরাজি-সোপানের নিয়মিত পাঠ-অংশ যখন ছাত্রগণ চর্চা করিবে তখনো এই ড্রিল-অংশ প্রত্যহ অভ্যাস করিতে থাকিলে তাহাদের উপকার হইবে।

ইংরাজি-সোপানের উপস্বত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দান করা হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থ অপরাপর বিদ্যালয়ে প্রচলিত ও সাধারণের নিকট আদৃত হয় তবে তদ্দ্বারা বোলপুর বিদ্যালয় সাহায্য লাভ করিবে।

তৃতীয় ভাগ

CHAPTER I

CONCORD

LESSON I

The white bear lives in the cold North.
Seals live in the water of the frozen seas.
The prince landed in Ceylon on New Year's morning.
Bombay is a large city on the West Coast of India.
All the boys of Hindusthan know the camel.
The goat has a long beard and long horns.
Small bells are hung round the neck of the goat.
A young goat is called a kid.
Every Indian boy knows the plantain tree with its nice, soft and sweet fruit.
At one time there were many things in India.
There is a hawk high up in the sky.
Most boys have something made of silk.

Exercise

১। অনুবাদ করো।

২। কর্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার বচনে যে পার্থক্য হয় তাহা উল্লিখিত উদাহরণ হইতে ছাত্রদিগকে বাহির করিতে হইবে। কেবল present and present perfect tense-এ এই পার্থক্য বুঝা যায়। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে সাধারণত বুঝা যায় না। tense বদলাইয়া বুঝাইতে হইবে।

৩। Conversation—

Who landed? The prince landed. Did the prince land? Yes, the prince landed. Where did the prince land? The prince landed in Ceylon. Did the prince land in Java? No, the prince did not land in Java; the prince landed in Ceylon. When did the prince land? The prince landed in New Year's morning.

এই প্রকারে অন্যান্যগুলিকেও প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

৪। ইংরাজি করো—

খরগোসেরা মাটির তলার গর্তে বাস করে। তিনি মে মাসের প্রথম দিনে বম্বে পৌঁছিয়াছিলেন। এক সময়ে বাংলা দেশে অনেক পর্টুগিজ বাস করিত। ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ একটা বড় সহর। এস্‌কিমোরা বরফের মধ্যে শীল শিকার করে। আরবেরা উটের উপর মরুভূমিতে চলে।

৫। সংশোধন করো—

You was in school yesterday. The lazy boy do not mean to try. The Child's hands is cold. Your brothers has been in the garden. On the table there was two long pipes. Dogs is very faithful to their masters. There is five pigs in the sky. Don't he run first? A knowledge of languages are often very useful. The number of soldiers were very great.

LESSON II

Ram and his sister were absent from town.
The King and the Queen returned to London.
Ceylon and Japan are two islands.
The boys and the girls were playing in the meadow.
A lion and an ass went out to hunt.
The horse, the sheep and the cow are called domestic animals.
Both the cat and the dog are black.
Both the man and his wife have left the country.

Exercise

১। অনুবাদ করো এবং tense বদলাও।

২। and, both দিয়া দুই কর্তৃপদকে যোগ করিলে ক্রিয়ার বচনের কি পরিবর্তন হয় তাহা ছাত্রদিগকে ঠিক করিতে হইবে। কর্তা বহুবচন হইলে ক্রিয়াও বহুবচন হয় ইহা ছাত্রদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে। দুইটি একবচনের কর্তৃপদকে and বা both দিয়া যোগ করিলে তাহারা উভয়ে মিলিয়া যে বহুবচন হয় এবং সেই জন্য ক্রিয়াও বহুবচন হইবে তাহাই বুঝাইতে হইবে।

৩। Conversation—

Who were absent? Ram and his sister were absent. Where were they absent from? They were absent from town. Were they absent from school? No, they were not absent from school; they were absent from town. Were they not absent from town? Yes, they were absent from town. Were they in the town? No, they were not in the town. They were absent from town. ইত্যাদি।

৪। অনুবাদ করো (and এবং both দিয়া দুই প্রকারে অনুবাদ করিতে হইবে)—

রাম এবং তাহার ভাই উভয়েই স্কুলে উপস্থিত ছিল। কাক এবং অন্যান্য পাখিরা বাসার জন্য কাঠি বহন করিতেছে। কাঠুরিয়া এবং তাহার ভাই উভয়ে মিলিয়া কুড়াল দিয়া কাঠ কাটিতেছে। মা এবং কন্যা তাঁহাদের খাবার রাঁধিতেছেন। রাজা এবং তাঁহার অনুচরবর্গ শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। উভয় ভৃত্যই অপরাধী। রাম এবং গোপাল উভয়েই অমনোযোগী।

৫। সংশোধন করো—

Ram and he goes home together. Two and two makes four. Near the fire was the table and the chair. She and her brother has arrived. There's two or

three of us coming to see you. On the table was two books and a pen. He and she was late. There is fifty sheep and a hundred cows grazing on the hill-side.

LESSON III

My father or my brother is coming to meet me.
Either the master or the servant was present.
Neither difficulty nor danger frightens him.
Neither he nor his sister is coming to the garden.
Either the man or his wife has done this.
Neither the day nor the hour has been fixed.
Either the cat or the dog has eaten his meat.
Neither the king nor his son will go forth to battle.

Exercise

১। অনুবাদ করো। tense-এর পরিবর্তন করো।

২। or, either-or বা neither-nor-এর স্থানে and বা both বসাইলে কি পরিবর্তন হয়? or, either-or বা neither-nor থাকিলে ক্রিয়াপদ যে কেবল একটি কর্তার সহিত মিল হইবে ইহাই লক্ষ করিতে হইবে।

৩। either-or ও neither-nor এক এক বার কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার পূর্বে বসাইয়া অর্থের কি পার্থক্য হয় দেখিতে হইবে।

৪। যদি দুই বা ততোধিক-সংখ্যক কর্তা থাকে এবং তন্মধ্যে কোনোটি plural থাকে, তবে plural কর্তাকে শেষে বসাইতে হইবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন person-এর কর্তা হয় তবে second personটি প্রথমে, তার পর third person এবং শেষে first person-এর কর্তা বসিবে। যদি একটি কর্তা বহুবচন হয় তবে ক্রিয়া বহুবচন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন person-এর কর্তা থাকিলে শেষের কর্তার সহিত মিল হইবে। যথা—

(1) He or his servants were present.
(2) Either he or I am in the wrong.

৫। যদি একটি প্রধান কর্তার সঙ্গে অন্যান্য কর্তৃপদ with, together with, in addition to, as well as দিয়া যুক্ত থাকে তবে ক্রিয়া কেবল মাত্র প্রধান কর্তার অনুযায়ী হইবে। উল্লিখিত উদাহরণে or, either-or, neither-nor স্থলে এইগুলি বসাইয়া বুঝাইতে হইবে।

৬। or, either-or, neither-nor, with, in addition to, as well as দিয়া অনুবাদ করো—

হয় ছেলেটি নয় মেয়েটি উপস্থিত ছিল। সেও আসছে না তার ভাইও আসছে না। ছালা-সুদ্ধ শস্যের ওজন এক মণ। সিংহ এবং ব্যাঘ্র মাংস খায়। জিনিসপত্র-সুদ্ধ বাড়িটা পুড়িয়া গেছে। শিকারি তাহার কুকুর-দল লইয়া শিয়াল শিকার করিতেছে। তিনিও সন্তুষ্ট হন নাই, আমিও হই নাই। আমার মা কিংবা আমার দিদি নিশ্চয় আসবেন। দিন ক্ষণ কিছুই স্থির হয় নাই।

৭। ভুল সংশোধন করো—

Ignorance or negligence have been the cause of his ruin. There were

neither honesty nor decency in his conduct. Haste or folly are his faults. Neither Holland nor France are rich in minerals. Either Ram or his brother were present. The man with all his faults were loved. The cat as well as the dog are white. The house with furniture are worth a thousand rupees.

CHAPTER IV

DEGREES OF COMPARISON

LESSON I

The book is large. The new book is larger than the old one. The dictionary is the largest of all.

The boy's knife is sharp. The doctor's lancet is sharper than the knife. The razor is the sharpest of all.

The river is broader than the broad carriage drive.

The Ganges is the largest river in India.

Ram is tall. No boy is taller than Ram. Ram is the tallest boy in his class.

We have never had any batch lazier than the present. Vishmá was one of the greatest warriors of his age.

Exercise

১। অনুবাদ করো।

২। large, larger, largest প্রভৃতির অর্থের পার্থক্য ও কোথায় কোন্‌টি ব্যবহৃত হইবে তাহা বুঝাইতে হইবে। r, er, দিয়া Comparative এবং st, est, দিয়া Superlative হয়, এবং Comparative-এর পরে than এবং Superlative-এর আগে the হয়, ইহা ছাত্রদিগকে বাহির করিতে হইবে। Comparative, Superlative-এর অর্থ।

৩। অনুবাদ করো—

শিখ সৈন্যেরা গুর্খা সৈন্যদের অপেক্ষা লম্বা। শিখেরা সব সৈন্য অপেক্ষা লম্বা। রাম শ্যামের চেয়ে কুঁড়ে। আমার ছাত্রেরা সব চেয়ে কুঁড়ে। Alps অপেক্ষা হিমালয় উচ্চ। কাঞ্চনজঙ্ঘা হিমালয়ের এক উচ্চ চূড়া। গৌরীশংকর তার চেয়ে উঁচু। গৌরীশংকর পৃথিবীর সব পর্বতের চেয়ে উঁচু। চীনেরা পৃথিবীর সব চেয়ে পুরান জাতি কি না জানি না। কালকের চেয়ে আজ গরম বেশি। সে অন্য ছাত্র অপেক্ষা অনেক বেশি পরিশ্রমী। এই কাঁচির চেয়ে ছুরিটা বেশি ধারাল। আমার ছাতার চেয়ে তোমার ছাতা অনেক বড়ো। পাকা ফল কাঁচা ফলের চেয়ে মিষ্ট।

৪। Conversation—

What is larger? The book is larger. Is the new book smaller than the old one? No, the new book is not smaller than the old one; it is larger than the old one. Which book is larger, the new or the old? The new book is larger. Is not the new book larger than the old one? Yes, the new book is lerger than the old one. Which is the largest book? The Dictionary is the largest of all. ইত্যাদি।

৫। সংশোধন করো—

His Umbrella is large than mine. This cat is black than that cat. My horse runs swift than yours. Kedar talks loud than his brother. Nirode is the young of all boys.

LESSON II

The sun is more brilliant than the moon.
Kalidas was the most famous poet of ancient India.
A virtuous man is more precious than rubies.
He was less skilful than his brother. He was the least skilful of all men.
Ram's manner was less rude than his father's.

Exercise

১। অনুবাদ করো।

২। পূর্ব পাঠের উদাহরণে r, er, st, est দিয়া যাহা হইতেছিল এখানে more, most, less, least দিয়া তাহাই হইতেছে। কথা বড় হইলে r, er, st, est-র বদলে more, most, less, least বিশেষণের পূর্বে বসে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

৩। কতকগুলি বিশেষণ আছে তাহাদের সম্বন্ধে কোনো বিশেষ নিয়ম নাই। তাহাদের Comparative, Superlative পৃথক কথা দিয়া হয়। যথা—

good	better	best
bad	worse	worst
late	later, latter	Latest, last

ইত্যাদি। উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে হইবে।

৪। সংশোধন করো—

Diamond is the preciousest of all metals. This is the beautifulest river-side that I have seen. Shakespeare is the famousest poet of England in the time of Elizabeth. You are a more intelligenter boy than your brother. The native carpenters are less skilfuler than the Japanese carpenters. Ram is diligenter than any of his class mates. There is nothing in this world that I should like best than a long ride.

৫। অনুবাদ করো—

তোমার হাতের লেখা গোপালের চেয়ে ভালো। তিনি আমাদের ভাইদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। এই পুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণ দেখিয়াছ কি? তিনি আমার চেয়ে দূরে গিয়াছিলেন। এই ঘরটা এই বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে ভিতরকার ঘর। এই ঘরটা সব চেয়ে বাহিরের ঘর। সর্বোচ্চতলে একটি কাচের ঘর আছে। ছেলেদের মধ্যে রাম সব চেয়ে কাজের। তুমি সব চেয়ে অসুবিধার সময় এসেছ। এই কাজটা, ও কাজের চেয়ে বেশি দরকারি। গাড়িতে চড়ে বেড়ানর চেয়ে হেঁটে বেড়ান বেশি আমোদের।

CHAPTER V

[সাধারণত বাক্যের (sentence) দুইটি প্রধান ভাগ, কর্তা ও ক্রিয়া। যথা The horse neighs. The ass brays. The cat mews. কিন্তু ক্রিয়া যদি সকর্মক হয় তবে বাক্যের তিনটি ভাগ কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। যথা—

The soldiers fight battles.
The servant swept the room.
The dog bit the beggar.
We have won prizes.

কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আবার বিশেষণযুক্ত হইতে পারে। আমরা প্রথমে কর্তৃপদের বিশেষণের কথা বলিব।]

LESSON I

Good boys work.
The good boys *of the village* work.
The good boys *of the village wishing to please their master* work.

উল্লিখিত বাক্য (sentence)-গুলিতে good, of the village, wishing to please their masters বাক্যাংশগুলি কর্তৃপদের গুণবাচক, অর্থাৎ বিশেষণ।

Vessels made of baked clay are porous.
The stem of plants makes its way up towards light and air.
The hard white loaf sugar is made from coarse brown moist sugar.
Most of our plants in the garden perish entirely in winter.
The poor woman standing at her window and looking into the garden saw the king pass by.

Exercise

১। অনুবাদ করো ও বিশেষণগুলি দেখাও।
২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কর্তৃপদে বিশেষণ যোগ করো—

The King sent his wife to exile. The boy won the prize. The servant took the ring. The beggar stole the bag. The soldier fell in the battle. The prince conquered the country.

৩। অনুবাদ করো—ডেনেদের বিজ্ঞ রাজা Canute ইংলন্ডের রাজা হইয়াছিলেন। মৎস্য বেঙ এবং সরীসৃপগণের রক্ত ঠান্ডা বলিয়া তাদের চামড়া অনাবৃত (naked)। থারমোমিটারের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট তরল পদার্থ হচ্ছে পারা। শরীরের সমস্ত রক্ত সরু সরু শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সমস্ত পদার্থই জলে ডুবাইলে ওজনে বাড়িয়া যায়।

৪। Conversation—যে-কোনো একটি বাক্য (sentence) লইয়া পূর্বের ন্যায় কথাবার্তা কহিতে হইবে।

LESSON II

[পূর্ব পাঠে যে প্রকার কর্তার বিশেষণ দেখানো হইল, তা ছাড়া একটি পুরা বাক্যও কর্তৃপদের বিশেষণ হইতে পারে। যথা—

Akbar who was a good king ruled his kingdom wisely.

The letter which you have written is long. The books which you have given to my brother are good. The essay that you want is short.

এই সকল স্থলে who was a good king, which you have written, which you have given to my brother, that you want—এই বাক্যগুলি কর্তৃপদের বিশেষণ, adjunct। এখানে who, which, that প্রভৃতি কর্তার বচনের অনুরূপ।]

The boy whose name is Ram broke the window. The house that was built by the mason is very nice.

Nero who was the Emperor of the Roman Empire was fiddling when Rome was burning.

The boy who was set to watch a flock of sheep cried out, 'The wolf! the wolf!'

The men who heard him came to his help. The wolf that nearly killed half of his flock fled away.

Columbus who was a native of Genoa discovered America.

The boy who was with the cart patted the horse. The poor blind man whom you saw yesterday is coming this way.

Exercise

১। অর্থ করো এবং বিশেষণ নির্দেশ করো।

২। এইপ্রকার বিশেষণ যোগ করো—

The story is true. He spoke the truth. The dog could not enter the room. The man. The horse is in the stable.

The King spoke to his subjects. The overcoat is torn. Kalidas is the greatest poet. They sent for the police.

৩। এমন কোনো নোঙ্গর ছিল না যদ্দ্বারা জাহাজ বাঁধা যাইতে পারে। রাজপুত্র, যিনি চমৎকার ঘোড়সওয়ার ছিলেন, তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান, যিনি তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন, তিনি ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচুর ধনসম্পদ তাঁহাকে ঈর্ষ্যাভাজন করেছিল। যে পাখি সতর্ক হয় সে জাল এড়াইয়া চলে। অদূরে যে পাহাড় দেখিতেছ তাহা এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে। সাজাহান, যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য ছিল, তিনি শেষ বয়স কারাগারে যাপন করেছিলেন। ছুতার নির্মিত খাবারের আলমারি সুন্দর হইয়াছে। নিগ্রোদের বাসস্থান আফ্রিকা অত্যন্ত গরম দেশ। যে বই-গুলি তুমি কাল কিনিয়া পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়াছি।

LESSON III

[যে প্রকারে কর্তৃপদের বিশেষণ যোগ করা হইল কর্মপদের বিশেষণও সেই প্রকারেই যোগ করা যাইতে পারে। নিয়ম একই, যথা—

Ram took *a big red* book.
I saw the man *wounded in the battle.*
The boy drove the birds *that were eating the corn.*]

Exercise

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কর্মপদে বিশেষণ যোগ করো—

The girl is minding the baby. The wicked boy threw a stone.
The servant swept the room. His daughter milks the cow.
The artist painted the picture. The fire destroyed the houses.
The children drowned the kittens. He teaches Geography.

২। উল্লিখিত বাক্যগুলির কর্তৃ ও কর্মপদে নানা প্রকারের বিশেষণ যোগ করিতে হইবে।

৩। তুমি এমন অপরাধ করিয়াছ যাহা মার্জনা করা চলে না। ভৃত্য সেই বাড়ির মধ্যে প্রত্যেক ঘর ঝাঁট দিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের পাঠ শিখিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের কঠিন বাড়ির পাঠ শিখিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের জ্যামিতি সম্বন্ধে কঠিন বাড়ির পাঠ শিখিয়াছিল। বালকেরা তাহাদের জ্যামিতি সম্বন্ধে কঠিন বাড়ির পাঠ যাহা তাহাদের শিক্ষক দিয়াছিলেন তাহা শিখিয়াছিল।

মালী আলু খুঁড়িয়া তুলিতেছে। মালী যে আলু লাগাইয়াছিল তাহা তুলিতেছে। মালী নিজের হাতে যে আলু লাগাইয়াছিল তাহা তুলিতেছে।

আমরা একটি ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি একটি টাট্টু ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি একটি নূতন টাট্টু ঘোড়া দেখিয়াছি। আমি আমাদের প্রতিবেশী যে নূতন টাট্টু ঘোড়া কিনিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি।

এটা এমন একটা ব্যাপার যাহার প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

LESSON IV

[যে প্রকারে কর্তা ও কর্মকে বিশেষণ-যুক্ত করা হইল, ক্রিয়াকেও তেমনি বিশেষণ-যুক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

The boys work *diligently.*
The boys work *now.*
The boys work *now in the school.*
The boys work *to please their teacher.*
The boys *now* work *diligently in the school to please their teacher.*

এখানে diligently, now, in the school, to please their teacher যে 'work' ক্রিয়ার বিশেষণ—শিক্ষক মহাশয় এখানে এইটুকু বুঝাইবেন যে, ক্রিয়ার বিশেষণ, ক্রিয়া কেমন করিয়া, কখন, কোথায়, এবং কেন সম্পন্ন হইতেছে ইহাই বুঝায়। যথা—কেমন করিয়া কাজ করিতেছে? diligently। কখন? এই সময়ে। কোথায়? স্কুলে। ইত্যাদি।]

Tom's brother will come to-morrow.
The careless girl was looking off her book.
Pretty flowers grow in my garden all through the year.
The poor slave was crying bitterly over the loss of her child.
The great bell was tolling slowly for the death of the queen.
I am going to Calcutta on the 15th of the next month.
The white bear lives in the cold North.

Exercise

১। অর্থ করো এবং ক্রিয়ার বিশেষণ বাহির করো।

২। নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করো—

The horse ran. The naughty child broke the picture. Ram struck the table. The leaves have fallen. The children were playing. The boat sank.

৩। রামের ভাই কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাজ করেন তিনি কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাজ করেন এবং এখান হইতে প্রায় ছয় মাস হইল গিয়াছেন তিনি কাল আসিবেন। রামের ভাই যিনি পশ্চিমে কাজ করেন এবং এখান হইতে প্রায় ছয় মাস হইল গিয়াছেন তিনি কাল সন্ধ্যা আটটার সময় passenger গাড়িতে আসিবেন।

আমি পরের সপ্তাহে দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতেছি। আমার বাগানে বসন্ত কালে অনেক সুন্দর ফুল ফোটে। একজন জ্যোতিষী তারা দেখিতে দেখিতে গভীর কূপে পড়িয়া গিয়াছিলেন। একজন দরবেশ তাতারদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বল্‌কনগরে পৌঁছিয়া সরাই মনে করিয়া ভ্রমক্রমে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অ্যালেক্‌জাণ্ডার যিনি ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন তিনি পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঞ্জাব পর্যন্ত আসিয়াছিলেন।

LESSON V

[একটি সমগ্র বাক্য (sentence) যেমন কর্তা কর্মের বিশেষণ হইতে পারে তেমনি ক্রিয়ার বিশেষণও হইতে পারে, যথা—

One Sunday while his brother was at supper, he entered the room.

এখানে one Sunday while his brother was at supper—একটি পুরা sentence; ইহা entered ক্রিয়ার বিশেষণ। এইরূপে when, where, how, why—সকল প্রকারের ক্রিয়ার বিশেষণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।]

I shall go to town if you wish it.
Make hay while the sun shines.
I had a fever when I was at Bolpore.
The soldiers went wherever he wanted them to go.
If he had known his wish, the King would have granted it.
If you do not work hard, your teacher will be very angry.
As two friends were travelling thruogh a wood a bear rushed upon them.
As the axe was his living, he was sorry to lose it.
When the villagers ran to help him, he laughed at them for their pains.

Exercise

১। অর্থ করো, ক্রিয়ার বিশেষণ বাহির করো, এবং তাহারা কোন্‌ শ্রেণীর বলো।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির ক্রিয়াতে বিবিধ প্রকারের বিশেষণ যোগ করো—

The boy was tending his flock.
The farmer placed his net. The wolf saw a lamb.
A goat fell into a well. A grass-hopper came to an ant.
The mice held a meeting.

৩। অনুবাদ করো—

তোমাকে খুশি হইয়া আমি টাকা ধার দিতাম, যদি আমার নিজের পকেটে কিছু থাকিত।
সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবে, কারণ সে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে।
যাহাতে মানুষ জীবিকা অর্জন করিতে পারে সেই জন্য তাহাকে কর্ম করিতেই হয়।
সে দরিদ্র হইলেও সে সৎ। আমি যতদূর বলিতে পারি ইহা কখনই সত্য নয়। খাবারের অভাব হইয়াছিল বলিয়া নাবিকেরা মরিয়া গেল। বীরেরা যেমন যুদ্ধ করে সৈন্যেরা তেমনি করিয়া লড়িয়াছিল। আমরা যেমন সংবাদ পাইলাম অমনি যাত্রা করিলাম। সে এত চালাক যে তাহাকে ঠকান চলে না। তুমি দুর্বলই থাকিবে যদি ব্যায়ামচর্চা না কর। তুমি যাই বল না কেন আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। অনেক অতিথি একসঙ্গে আসিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদের খানিকটা অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

CHAPTER VII

A. We get holidays twice a year.
The boat sank in the lake.
The child fell from the upper window.
He cut my book with his knife.

B. He that walks uprightly walks surely.
Allahabad is a city which stands at the junction of the Ganges and the Jumna.
A fakeer who seemed proud of his rags passed through our village yesterday.
I once had a dog whose name was Tiger.
Ram got a nice toy which his father brought from town.
After he had rested for some hours in the shepherd's hut, he started for Benares.
As the wind was favourable we set sail at once.

C. The rain descended, the floods came and the winds blew and beat against the house, and it fell.
The boys are idle when they are students and throw their books aside as soon as they pass.

Exercise

১। অনুবাদ করো। এই তিন প্রকার বাক্যের (sentence) মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করো।

২। লক্ষ করিতে হইবে—

(a) প্রথম প্রকার বাক্যের মধ্যে কেবল একটি কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (finite verb) আছে, তাহা simple sentence।

(b) দ্বিতীয় প্রকার sentence-এ একটি প্রধান sentence এবং তাহার অধীনে এক বা ততোধিক sentence থাকিবে। অধীনস্থ sentence—কর্তা, কর্ম বা ক্রিয়া কিংবা প্রধান sentence-এর যে-কোনো একটা কথার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত—ইহা complex sentence।

(c) তৃতীয় প্রকার sentence-এ দুই বা ততোধিক simple বা complex sentence জুড়িয়া একটা sentence হয়—ইহা compound sentence।

৩। অনুবাদ করো—

যুদ্ধের তারিখ আমার মনে নাই। কখন যুদ্ধ হইয়াছিল আমার মনে নাই। যুদ্ধ হইয়াছিল বটে কিন্তু তারিখ আমি ভুলিয়া গিয়াছি। অন্যত্র দরকারি কাজ ছিল বলিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যেহেতু অন্যত্র দরকারি কাজ ছিল তাই তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার নীচতার জন্য আমি তাহাকে ভালোবাসি না। সে নীচ বলিয়া আমি তাহাকে ভালোবাসি না। সে নীচ এবং সেই জন্য আমি তাহাকে ভালোবাসি না। আমার Tiger নামে একটা কুকুর ছিল। আমার একটি কুকুর ছিল যাহার নাম Tiger। আমার একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম ছিল Tiger। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদ নগর। এলাহাবাদ একটা নগর যাহা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে স্থিত। এলাহাবাদ একটি নগর এবং ইহা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে স্থিত। কয়েক ঘণ্টা কুটীরে বিশ্রাম করিয়া তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। কয়েক ঘণ্টা কুটীরে যখন বিশ্রাম করিয়াছেন তখন তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। কয়েক ঘণ্টা তিনি কুটীরে বিশ্রাম করিলেন এবং পরে পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন।

অসুস্থ হইয়াছিল বলিয়া সে বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিল না। সে অসুস্থ হইয়াছিল, তজ্জন্য বিদ্যালয়ে হাঁটিয়া যাইতে পারিল না।

৪। Conversation—

A. What did Ram get? Did he get the toy which Jadu brought yesterday? Where did his father bring it from?

B. What fell? How did it fall? Did the winds blow? Why did the house fall? etc.

৫। Analyse the following sentences (অর্থাৎ কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া এবং তাহাদের বিশেষণ নির্দেশ করো)—

They have begun a dispute that can never end. He died in the village in which he was born. We can prove that the earth is round. Here was a battle where neither side was victorious. Mercury is called quick-silver, and is nearly fourteen times as heavy as water. Do not urge him more lest he becomes angry. Though you do not hear their foot-steps their advance is certain.

৬। নিম্নলিখিত sentenceগুলিকে simple, complex এবং compound sentence করিয়া অনুবাদ করো—

[উদাহরণ—অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কুটীর দেখিতে পাইলাম।

(*a*) Wandering in the forest, I saw a cottage.

(*b*) As I was wandering in the forest, I saw a cottage.

(*c*) I wandered in the forest and saw a cottage.]

মাটির দিকে পড়িতে পড়িতে বালকটি ডাল ধরিল।

পথে চলিতে চলিতে (walk) মুটে টাকার থলি পাইয়াছিল।
শহর হইতে কুচ করিতে করিতে সৈন্য শত্রুকে দেখিল।
ভয়ের (fright) সহিত চীৎকার করিতে করিতে বালক মাতার দিকে ছুটিয়া গেল।
সানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চাতক আকাশে উঠিল। লজ্জার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা তাহার বিছানায় গেল।
রাগের সহিত গর্জিতে গর্জিতে (growl) বাঘ হাতির উপর লাফ মারিল (spring upon)।
কষ্টের সহিত চীৎকার করিতে করিতে (howl) কুকুর মাটির উপর গড়াইতে লাগিল (roll)।
আনন্দের সহিত নাচিতে নাচিতে কুমারী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল (roam)।
৭। অনুবাদ করো—
বাগানের নীচে একটি গাছ আছে যাহার নীচে (under) চাকর দাঁড়ায়।
ঘরে একটি জানালা আছে যাহার কাছে (near) শিশু ঘুমায়।
পর্বতের একটি শৃঙ্গ আছে যাহার উপরে (above) তারা জ্বলে।
মাতার একটি চাকর আছে যাহার সম্মুখে (before) বালিকাটি খায়।
পিতার একটি বাড়ি আছে যাহার পশ্চাতে (behind) একটি মন্দির আছে।
বাগানের চারি দিকে (round *and* around) একটি প্রাচীর আছে যাহার উপর (over) দিয়া লতা উঠে।
গ্রামে একটি ময়দান আছে যাহা পার হইয়া (across) ঘোড়া ছোটে।
জানালার একটি শার্সি (glass-pane) আছে যাহার ভিতর দিয়া (through) সূর্য আভা দেয়।
খুড়ার একটি মন্দির আছে যাহার পাশে (beside) একটি পুকুর আছে।
আমার ভাইপোর একটি খেত আছে যাহা ছাড়াইয়া (beyond) একটি বন আছে।
সন্ধ্যার পূর্বেই (before) বালিকাটি তাহার বিছানায় ঘুমাইল।
যুদ্ধের পরে (after) সৈন্যেরা আনন্দের সহিত পতাকা উড়াইল (raise)। আমি গাছের নীচে দাঁড়াইতেছি। তুমি মন্দিরের সম্মুখে দৌড়িতেছ। তিনি দেওয়ালের পশ্চাতে বসিতেছেন। আমি ময়দান পার হইয়া যাইতেছি। আমরা ১০টায় (10 A.M.) প্রাতরাশ করি (breakfast)। শিশুটি রাত ৮টার (8 P.M.) পূর্বেই ঘুমাইল। তোমরা পাহাড়ের নিকটে বাস করিতেছ। তাঁহারা তাঁহাদের পাশে বসিতেছেন। তুমি এই পাথরের উপর দিয়া লাফাইতেছ। পর্বত ছাড়াইয়া একটি দেশ আছে। আমার মাথার উপরে একটি পাখি আছে। আমি যখন রান্নাঘরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলাম, মা তাহার পূর্বেই ভাত রাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ময়দান পার হইয়া দৌড়িবার পূর্বে মালী গাছটি কাটিয়া ফেলিয়াছিল। আমি নদীর কাছে যাইবার পরে দাঁড়ি নৌকা চালাইয়াছিল।

CHAPTER VIII

INTERCHANGE OF FORMS

LESSON I

[ক্রিয়া সকর্মক হইলে বাক্যকে দুই প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে, যথা— আমি চাঁদ দেখিয়াছি; চাঁদ আমার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। ইংরাজিতেও তেমনি—I saw the moon; the moon was seen by me। ইংরাজিতে প্রথমটিকে active, দ্বিতীয়টিকে passive বলে।]

Ram was sent to school by his father.
The soldier was wounded by the foe.
The bird was caught by the farmer by whom a net was set to catch it.
He was admitted into the college by some gentlemen who were his father's friends.
Lectures were delivered by the great orator in the Town Hall.
A two-penny loaf was bought by the poor hungry boy.
A carpenter was one day asked by a sailor where his father died.
The room was occupied by a number of men who came from a distant country.

Exercise

১। উল্লিখিত বাক্যগুলির অর্থ করো।

২। active form-এ পরিবর্তিত করো। [active করিবার সময় শিক্ষক মহাশয় অল্প সাহায্য করিবেন মাত্র। তিনি ছাত্রদিগের নিকট হইতে বাহির করাইয়া লইবেন যে, active form-এ যাহা কর্ম passive-এ তাহাই কর্তা এবং passive-এ যাহা 'by' দিয়া আছে active করিতে হইলে তাহা কর্তা হইবে। active sentence কে passive করিতে হইলে ক্রিয়ার পূর্বে be, is, was, are, were প্রভৃতি অর্থাৎ 'be' ক্রিয়ার একটা form হইবে এবং ক্রিয়ার past participle হইবে।]

৩। passive form-এ পরিবর্তিত করো—

The cat killed the mouse. His conduct astonishes me. He spoke to the man. I saw him steal the book. I shall buy the horse from his shop. He will send the book for you to read. You should have paid the bill. The King poisoned his brother.

৪। দুই প্রকারে অনুবাদ করো—

বালকটি পুস্তক ছিঁড়িয়াছে। মৌমাছি মধু আহরণ করে। বিড়ালটা ইঁদুর মারিয়াছিল। আমরা একটা পত্র পাইয়াছি। বালিকাটি একটি চড়ুই ধরিয়াছিল। আমার ভাই শীঘ্র একটি নূতন বাড়ি তৈয়ার করিবেন। একটি বুড়া লোক দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। তিনি দেখা মাত্র আমাকে চিনিয়াছিলেন। তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করিবেন? বন্যা নৌকাটিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। যে পথ জানিত এমন একটি পথপ্রদর্শক পাইয়া, গাধার উপর আমরা বোঝা চাপাইলাম। যে কৃষক আমাদিগকে এত দূর পর্যন্ত পথ দেখাইয়া আসিয়াছিল তাহাকে কিছু দিলাম এবং আমরা কোথায় আছি জানাইবার জন্য তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলাম।

LESSON II

[কোনো কোনো স্থানে active form-এর কর্তৃপদ passive form-এ প্রকাশ থাকে না। এরূপ স্থানে active করিতে হইলে অর্থানুসারে they, the men, people ইত্যাদি কর্তা বসাইতে হয়, যথা—Rice is eaten without sugar; we eat rice without sugar.]

The nest is built with sticks. Water is drawn from the well. The flowers are gathered for the queen. The mat is spread on the bed. The wall is built round the garden. The toys are scattered about the room. The chair is dragged along the floor. The boat is rowed against the current.

১। উপরের পাঠটি অনুবাদ করো। (এই পাঠের prepositionগুলির ব্যবহার শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করিতে বলিবেন।)

২। অনুবাদ করো (active ও passive দুই form-এ)—

নুন দিয়া ভাত খাওয়া হইয়াছে। বেড়ার কাছে সাপ মারা হইয়াছে। ছাদের উপর ধ্বজা তোলা (raise) হইয়াছে। মন্দিরের সামনে প্রদীপ জ্বালান (light) হইয়াছে। টেবিলের কাছে চৌকি বসান (set *or* put) হইয়াছে। গাড়ি ময়দান পার হইয়া চালান হইয়াছে। বাড়ির পিছনে একটি গর্ত খোঁড়া হইয়াছে। শহর ছাড়াইয়া চাকরকে পাঠান হইয়াছে। কাঠের ভিতর দিয়া পেরেক চালান (drive) হইয়াছে। না (without) খেলিয়া দিন কাটান হইয়াছে। গাড়ি রাস্তা দিয়া (along) বরাবর চালান হইয়াছে। সংবাদ শহরের চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

LESSON III

ক্রিয়া দ্বিকর্ম হইলে দুইটি কর্মপদকে কর্তা করিয়া দুই প্রকারে passive করা যায়। যথা—

Active : They offered her a chair.
Passive : (1) A chair was offered her.
(2) She was offered a chair.

They showed him the house. I promised the boy a coat. I forgave him his fault. The king allowed him a pension. The teachers granted him leave. The judge asked him a question. He lent me a thousand pound. The thief gave the man a blow. My father taught me Sanskrit.

১। উল্লিখিত বাক্যগুলিকে অর্থ করো এবং এইরূপ দুই প্রকারে পরিবর্তিত করো।

২। active form এবং দুই প্রকার passive form-এ অনুবাদ করো—

তুমি আমাকে এই সামান্য অনুগ্রহ করিতে অস্বীকার (refuse) করিয়াছিলে। দারোগা সেই নিরপরাধ কয়েদীকে অনেক প্রশ্ন (question) করিয়াছিলেন। গত বৎসর আমি তোমার ভাইকে পাঁচ শত টাকা ধার দিয়াছিলাম। বৃদ্ধ অধ্যাপক আমাকে ইতিহাস শিক্ষা দিতেন (taught)। আশা করি সম্রাট আমাদের এই বিদ্রোহ ক্ষমা করিবেন। যদি তুমি সেখানে যাও তাহা হইলে আমার অনেক কষ্ট বাঁচিবে (save me much trouble)। তোমার এই ব্যবহার তোমার বৃদ্ধ পিতার অশ্রুপাতের কারণ হইবে (cause many a tear)।

CHAPTER IX

DIRECT AND INDIRECT SPEECH

LESSON I

INDICATIVE SENTENCE

D. R said to S, 'I am writing a letter.'
Ind. R told S that he was writing a letter.
D. R says, 'I am going to school.'
Ind. R says that he is going to school.

D. The gentleman said, 'I have much pleasure in meeting you all.'
Ind. The gentleman said that he had much pleasure in meeting them all.
D. The man said, 'The king will be here to-night.'
Ind. The man said that the king would be there that night.
D. R said to S, 'It is now three o'clock.'
Ind. R told S that it was then three o'clock.
D. I said to him, 'I have paid Rs. 5 for these pictures.'
Ind. I told him that I had paid Rs. 5 for those pictures.
D. R said, 'There will be a public meeting in this hall to-morrow.'
Ind. R said that there would be a public meeting in that hall the next day.
D. R said to S, 'I am sure I shall never forget it.'
Ind. R told *or* assured S that he was sure he would never forget it.
D. I said to you, 'We are too late for the train.'
Ind. I told you that we were too late for the train.
D. You said to me, 'I saw it with my own eyes.'
Ind. You told me that you had seen it with your own eyes.

Exercise

১। এই দুই প্রকার বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইতে হইবে। বক্তা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার কথায় বলিলে ও তাঁহার কথা অন্য সময়ে 'তিনি বলিয়াছেন যে' বা 'তিনি বলিলেন যে' এই প্রকারে উদ্ধৃত করিলে এই পার্থক্য হয়। প্রথমটিকে direct, দ্বিতীয়টিকে indirect speech বলা হয়।

২। ইহার পর শিক্ষক ছাত্রদিগকে লক্ষ করিতে বলিবেন direct speechকে indirect করাতে কোন্ উদাহরণে কী পরিবর্তন হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লক্ষ করিতে হইবে—

(১) quotation mark উঠাইয়া that দিতে হইবে।

(২) said to থাকিলে অর্থানুযায়ী told, remarked, assured, observed ইত্যাদি দিতে হইবে।

(৩) quotation-এর ভিতরকার sentence-এর tense বাহিরের ক্রিয়ার tense অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। বাহিরে future বা present tense থাকিলে কোনো পরিবর্তন হয় না; past tense থাকিলে ভিতরে past tense বা past perfect tense হয়; shall, will, have, has থাকিলে should, would, had হইবে।

(৪) this, these-এর স্থানে that, those হয়। now, to-night, to-day, to-morrow, here থাকিলে যথাক্রমে then, that night, that day, next day, there হয়।

(৫) যে বলিতেছে ও যাহাকে বলাইতেছে, এই দুয়ের উপর লক্ষ রাখিয়া pronoun-এর person বদলাইতে হয়।

৩। Indirect করো—

R says, 'I know a little girl named Lila.'
R said, 'I will go home with my teacher.'

R said to S, 'I will do anything for you because you are very kind to me.'
R said to me, 'I am sorry to disturb you in any way.'
R said to you, 'You need not trouble your head about that, for it is all the same to me.'
R said to him, 'I will come down when you are gone.'
R said to me, 'You cannot get there to-night, for it is a long way off from here.'
R said to them, 'You shall do as you like to-morrow.'

৪। দুই প্রকারে অনুবাদ করো—

তিনি বলিলেন, 'আমি পড়িতেছি।' তিনি আমাকে বলিলেন যে, কাল তিনি আমার বই ফেরত দিবেন। শিক্ষকমহাশয় বলিলেন, 'আমি ছুটি দিব না।' যদু আমাকে বলিয়াছিল যে, সে বহু পূর্বে চিঠিখানা লিখিয়াছে। রাম শ্যামকে বলিল, 'তুমি কাল আসিবে ভাবিয়াছিলাম।' রাম শ্যামকে হঠাৎ কাল বলিল যে, সে এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। তিনি সত্যর কথা বলিতেছিলেন, যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। তিনি বলিলেন, 'সত্যর ক্ষুধা পেয়েছে।' তিনি বলিলেন, 'আমি এই ছবিগুলির জন্য অনেক পয়সা খরচ করিয়াছি।' গোপাল বলিল, 'আজ চারিটার সময় বড়ো হলে একটা সভা হবে।' রাম বলিল, 'আমি তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।' তিনি বলিলেন, 'আমি যত শীঘ্র পারি যাইব।' শিক্ষক ছাত্রকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে উপরের ক্লাসে তুলিয়া দিতে পারি না, যদি তুমি পরীক্ষা না দাও।'

৫। Conversation—যে-কোনো একটা বাক্য লইয়া, কে বলিল, কাকে বলিল, কী বলিল, কখন বলিল ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া উত্তর করাইতে হইবে।

LESSON II

Interrogative Sentence

D. R says, 'How did you sleep last night?'
Ind. R asks how you slept last night.
D. I said to him, 'What can I do to help you?'
Ind. I asked him what I could do to help him.
D. He said to me, 'Have I not kept my promise?'
Ind. He asked me if he had not kept his promise.
D. He said to the man, 'Would you be so kind as to let me hear you sing?'
Ind. He asked the man if he would be so kind as to let him hear him sing.
D. The teacher said to the boy, 'Have you seen donkeys like these?'
Ind. The teacher asked the boy whether he had seen donkeys like those.

D. He said to me, 'May I go now?'
Ind. He asked me if he might go then.

Exercise

১। উল্লিখিত উদাহরণের বাক্যগুলি প্রশ্নবাচক—interrogative, পূর্বপাঠের বাক্যগুলি indicative। এই দুই প্রকারের বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইতে হইবে। interrogative sentenceকে indirect করিতে কী কী পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা লক্ষ করিতে হইবে।

(১) said to স্থানে asked *or* enquired দিতে হইবে, অর্থানুযায়ী।
(২) quotation-এর ভিতরের interrogative sentenceকে indicative করা হইয়াছে।
(৩) ভিতরের sentence যেখানে how, what, where, when, why দিয়া আরম্ভ হয় নাই সেখানে quotation mark-এর বদলে if *or* whether দিতে হইবে।
(৪) অন্যান্য নিয়ম indicative sentence-এর মতো।

২। দুই প্রকারে অনুবাদ করো—

বালক শিক্ষককে বলিল, 'আমি কি এই বইটা লাইব্রেরি হইতে আনিব?' তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার কলমটা কি একবার আমাকে দিবে?' আমি বলিলাম, 'কেন, তোমার কলমের কী হইয়াছে? তুমি কি তোমার কলমটা ভাঙিয়াছ?' তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার বয়স কত হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'এই ষোল বৎসর। আমি ১৮৮৯ সালে জন্মিয়াছি।' তিনি সৈন্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা কেন এই গরীবদিগকে কারাগারে লইয়া যাইতেছ?' সৈন্যরা উত্তর করিল, 'ইহারা রাজাকে কর দেয় নাই, তাই ইহাদিগকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছে।'

শিক্ষক বলিলেন, 'শ্যাম, কাল তুমি বিদ্যালয়ে আস নাই কেন?'
শ্যাম বলিল, 'মহাশয়, আমার মা পীড়িতা ছিলেন, তাই কাল বিদ্যালয়ে আসিতে পারি নাই।'
রাম—'পরীক্ষার কী ফল হইল দেখিয়াছ কি?'
শ্যাম—'না। কোথায় দেখিতে পাইব?'
রাম—'তোমার সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।'
শ্যাম—'কেন তুমি আমাকে যাইতে বারণ করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।'
রাম—'তুমি পাস হইতে পার নাই।'

সে আমাকে বলিল, 'আম কি পাকিয়াছে?' আমি বলিলাম, 'আমি দেখি নাই।' তাহার সহিত দেখা হইতে সে বলিল, 'কেমন আছ?' আমি বলিলাম, 'আমার শরীর ভালো নাই।'

ছুটিতে সে কলিকাতায় আছে দেখিয়া আমি বলিলাম, 'বাড়ি যাও না কেন?' সে বলিল, 'বাড়ি গিয়া কী হইবে?'

৩। গোড়ায়: R said to S, I said to him, You said to him, I said to you, He said to me, He said to you বসাইয়া indirect করো—

'Will you come along with me?' 'Are you quite well?' 'Will you do me this favour?' 'Are you ill?' 'How do you feel now?' 'Where are you going to-day?' 'Where do you live now?' 'What do you mean by such mean conduct?' 'How can you doubt it?' 'Do you know why I summoned you yesterday to be present here to-day?' 'Have you heard that Gobinda has holiday now and he will arrive here to-morrow?' 'When did his holidays

commence?' 'Will you come with me to a gentleman with whom I am acquainted?'

গোড়ায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল দিয়াও indirect করাইতে হইবে।

LESSON III

Imperative Sentence

D. The teacher said to the boy, 'Stand up on the bench.'
Ind. The teacher told the boy to stand up on the bench.
D. The blind boy said to the man, 'Please give me a pice.'
Ind. The blind boy begged the man to give him a pice.
D. The girl said, 'Do tell me a story, mother.'
Ind. The girl requested her mother to tell her a story.
D. I said to you, 'Go away at once.'
Ind. I ordered you to go away at once.
D. He said to his friend, 'Please lend me your book.'
Ind. He requested (asked) his friend to lend him his book.
D. He said to the students, 'Do not sit here.'
Ind. He forbade the students to sit there.

১। এই নূতন প্রকারের indirect করিবার প্রণালী লক্ষ করিতে হইবে। আজ্ঞা, অনুরোধ, ভিক্ষা প্রভৃতি জ্ঞাপক sentence (imperative sentence)-কে indirect করিতে হইলে said to স্থানে অর্থানুসারে told, asked, ordered, requested, begged, entreated ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয় এবং quotation mark উঠাইয়া প্রধান ক্রিয়ার পূর্বে to বসাইতে হয়। অন্যান্য নিয়ম পূর্ববৎ।

২। পূর্বে I, you বা he said to me, you বা him বসাইয়া indirect করো—

'Leave the room and do not return to-day.' 'Shed no blood and cast Joseph into the pit that is in the wilderness.' 'Let us sell him to the Turks.' 'Make me as one of thy hired servants, father.' 'Never be disheartened, lad.' 'See, here are two of my grown children sent home to me out of work.' 'Be cheerful in your conversation and never get out of temper in company.'

৩। ভিখারি তাঁহাকে বলিল, 'আমাকে একটি পয়সা দিয়া যান মহাশয়।' তিনি সৈন্যদের বলিলেন, 'এই বন্দীকে ছাড়িয়া দাও। এ নিরপরাধকে কেন বাঁধিয়াছ?' শিক্ষক ছাত্রদিগকে বলিলেন, 'পড়াশুনায় কখনও অমনোযোগী হইও না। যদি হও তাহা হইলে শাস্তি পাইবে।' তিনি আমাকে বলিলেন, 'একটি চৌকি বাহির করিয়া লইয়া আইস।' রাজা অনুচরকে বলিলেন, 'আমার সম্মুখ হইতে তুমি চলিয়া যাও।' সে তাহার বন্ধুকে বলিল, 'এসো নদীর ধারে বেড়াইতে যাওয়া যাক।' বিচারক বন্দীকে বলিলেন, 'তোমার কি বলিবার আছে বলো।' তাহার বাড়িতে গেলেই সে বলিল, 'ভাই কিছু খাইয়া যাইতে হইবে।' তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাহারা বলিল, 'আবার আসছে বছরে আমাদের এখানে তুমি আসিয়ো।' সে মাছের প্রকাণ্ড আকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইল; আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'কে এতবড়ো জন্তুটাকে মারিল? মিথ্যা বলিয়ো না—আমি জানিতে অত্যন্ত উৎসুক।' আমি বলিলাম, 'তুমি হয়তো জান না যে, তোমারই কাজ,

এই মাছটাকেই কাল তুমি গুলি করিয়াছিলে। এই দেখো এর মাথায় স্পষ্ট গুলির দাগ রহিয়াছে।' সে বলিল, 'বটেই তো! আমার বন্দুকের দুটো নলই ভরা ছিল। একবার বন্দুকটা আনো তো দেখি।'

৪। Conversation (পূর্বের ন্যায়)।

LESSON IV

Exclamatory Sentence

বিস্ময়জ্ঞাপক বাক্য (exclamatory sentence)-কে indirect করিতে হইলে said to স্থানে exclaimed, *or* অর্থানুযায়ী অন্য কোনো ক্রিয়া বসাইতে হয়। অন্যান্য নিয়ম indicative sentence-এর মতো। যথা—

D. He said to the king, 'Oh! What a cruel man you are!'

He exclaimed in surprise and told the king what a cruel man he was.

এই প্রকার বাক্যের বিশেষ কোনো নিয়ম নাই, অর্থানুযায়ী পরিবর্তন হয় এবং তাহা ব্যবহার করিতে বুঝা যায়।

ইংরাজি-পাঠ

প্রকাশ : ১৯০৯

LESSON 1

It is Sunday. The boy sits on a mat. He reads. His door is open. The pet cat comes in. The boy takes her on his lap. She is lazy. She shuts her eyes and sleeps. The boy strokes her back. A cart goes by. It makes a noise. The cat wakes up. She jumps down. She wants to play. The boy throws a ball. Look, how pussy runs after it! She is so glad! The boy is very kind. He never hurts his pussy cat.

এই পাঠে যে যে বাক্যে 'না' এবং 'কখনো না' যোগ করা চলে সেইগুলিকে ছাত্রদের দ্বারা নেতিবাচক করাইয়া লইবে।

আজ শনিবার। আজ সোমবার ইত্যাদি। বিড়াল মাদুরে বসিয়া আছে। (নানা লোকের নাম করিয়া) হরি মাদুরে বসিয়া আছে ইত্যাদি। বালকটি ভিতরে আসিল। হরি ভিতরে আসিল ইত্যাদি। বালকটি তাহাকে মাদুরের উপর লইল। ('তাহাকে' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের ভেদ নির্দেশ করিয়া দিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।) মধু পড়িতেছে, যদু পড়িতেছে ইত্যাদি। বাক্স খোলা। বই খোলা। অলস বিড়াল ঘুমাইতেছে। অলস বালক তাহার চোখ বুজিতেছে। ('তাহার' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ ভেদ নির্দেশ করিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।) সে দরজা বন্ধ করিতেছে। হরি বাক্স বন্ধ করিতেছে। অলস বালক ঘুমাইতেছে। হরি অলস, মধু অলস ইত্যাদি। বালকটি তাহার মুখে হাত বুলাইতেছে। একটি বিড়াল পাশ দিয়া যাইতেছে। একটি বালক পাশ দিয়া যাইতেছে। অলস বালকটি পাশ দিয়া যাইতেছে। দয়ালু বালকটি পাশ দিয়া যাইতেছে। যদু পাশ দিয়া যাইতেছে, মধু পাশ দিয়া যাইতেছে ইত্যাদি। সে একটি শব্দ করিল। গাড়িটা একটা শব্দ করিল। বিড়ালটা একটা শব্দ করিল। বিড়ালটা লাফাইয়া পড়িল। শ্যাম লাফাইয়া পড়িল, রাম লাফাইয়া পড়িল ইত্যাদি। শ্যাম শব্দ করিল ইত্যাদি। রাম জাগিয়া উঠিল, শ্যাম জাগিয়া উঠিল ইত্যাদি। বিড়াল ঘুমাইতে চায়, বালক খেলিতে চায়, শ্যাম বসিতে চায়, রাম দরজা খুলিতে চায়, মধু বাক্স বন্ধ করিতে চায়, হরি দৌড়াইতে চায়, শ্যাম একটা গোলা ছুঁড়িতে চায় ইত্যাদি। হরি একটা গোলা ছুঁড়িল ইত্যাদি। দেখো, পুসি কেমন করিয়া ঘুমায়! দেখো, হরি কেমন করিয়া একটা গোলা ছোঁড়ে! দেখো, বিড়ালটা কেমন করিয়া চোখ বোজে! দেখো, বালকটি কেমন করিয়া একটা বিড়ালের পিছনে দৌড়ায়! দেখো, হরি কেমন করিয়া একটা শকটের পিছনে দৌড়ায় ইত্যাদি। বিড়ালটি কতই খুশি! বালকটি কতই খুশি! রাম কতই খুশি ইত্যাদি। দয়ালু বালক কখনই তাহার বিড়ালকে আঘাত করে না। রাম কখনই তাহার ভাইকে আঘাত করে না (শ্যাম, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমি কখনো ঘাসের উপর বসি না (never)। (হরি, মধু প্রভৃতি) বিড়াল কখনো ঘাসের উপর ঘুমায় না। বালকটি কখনো বিড়ালকে তাহার কোলে লয় না।

LESSON 2

The sun is up. The day is warm. The air is dry. I am hot. I sit on the grass. The lawn is green. The shade is cool. The water in the tank is deep. I see a fish. It is big. I wash my feet in the water. The water is clear. I make a paper-boat. See, how it floats! I put some flowers on it. I give it a push. Now it is in deep water. I cannot reach it.

এই পাঠে যেখানে সম্ভব 1st personকে 3rd এবং 3rdকে 1st person করাইয়া লইবে এবং 'না' ও 'কখনো না' যোগে নেতিবাচক করাইবে।

আমি উঠিয়াছি, হরি উঠিয়াছে, মধু উঠিয়াছে ইত্যাদি। বাতাস গরম। জল গরম। (warm এবং hot দুই শব্দই ব্যবহার করাইবে)। ঘাস শুকনা। পুকুর শুকনা। মাদুর শুকনা। বালক ঘাসের উপর বসিয়া আছে। বিড়াল ঘাসের উপর ঘুমাইয়া আছে। (হরি, মধু প্রভৃতি নাম লইয়া বাক্য বলাইবে; যে যে বাক্যে এইরূপ নাম যোগ করিয়া বলানো সম্ভব শিক্ষক তাহা মনে রাখিবেন।) আমি ছায়ায় ঘুমাইয়া আছি (হরি, মধু ইত্যাদি)। আমি তৃণোদ্যানে দাঁড়াইয়া আছি (হরি, মধু)। সবুজ তৃণোদ্যানের উপর ছায়াটি শীতল। বালকটি মাছ দেখিতে পাইয়াছে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বিড়ালটি গভীর জলে বড়ো মাছ দেখিতে পাইয়াছে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বালকটি তাহার পা ধুইতেছে (হরি, মধু)। রাম পরিষ্কার জলে তাহার পা ধুইতেছে। বালকটি একটি কাগজের নৌকা বানাইতেছে; হরি একটি বড়ো কাগজের নৌকা বানাইতেছে (মধু, যদু ইত্যাদি)। দেখো আমি কেমন জলের উপর ভাসিতেছি (হরি, মধু ইত্যাদি)। আমি কাগজের নৌকার উপর কতকগুলি ফুল রাখিতেছি (হরি, মধু)। আমি এখন গভীর জলে (হরি, মধু ইত্যাদি)। বালকটি এখন আমাকে নাগাল পায় না (হরি, মধু)। বালকটি আমাকে একটা ঠেলা দিতেছে (হরি, মধু)। আমি বালকটিকে একটা ঠেলা দিতেছি (হরি, মধু)। আমি কখনো কাগজের নৌকা বানাই না। বালকটি কখনো আমাকে ঠেলা দেয় না। তিনি কখনো আমাকে জানেন না, আমি কখনো তোমাকে জানি না। তিনি কখনো চাল বিক্রয় করেন না। তুমি কখনই জলে তোমার পা ধোও না (হরি, মধু ইত্যাদি)।

এই বাংলা বাক্যগুলিকেও যেখানে সম্ভব person-পরিবর্তন ও নেতিবাচক করিয়া তর্জমা করিতে হইবে।

LESSON 3

I know you. You are a grocer. You sell rice, dal, oil and salt. I buy sugar from you. Your shop is near the temple. You go to the town every Monday. You buy your flour there. You come back in a boat with your bags. You send your son to the market. He buys potatoes for you. You rise very early in the morning and go to your shop. There you do your work and read the Ramayana. You are always busy. You close your shop late at night.

person পরিবর্তন করিতে হইবে। নেতিবাচক করিয়া লইতে হইবে। 3rd person ব্যবহারকালে কখনো he এবং কখনো she ব্যবহার করাইতে হইবে।

তিনি তোমাকে জানেন। আমি একজন মুদি। তুমি একজন বালক। তুমি মস্ত। তুমি দয়ালু। তুমি খুশি। আমি খুশি। তিনি চাল বিক্রি করেন। আমি তেল বিক্রি করি। আমি তোমার বাড়িতে তেল বিক্রি করি। তুমি আমার দোকানে চিনি বিক্রি কর। তুমি প্রতিদিন আমার কাছ হতে লবণ কেন। তিনি প্রতি রবিবারে আমার দোকান হতে ময়দা কেনেন। তুমি প্রতি সোমবারে মন্দিরে যাও। তিনি তাঁহার দোকানে ফিরিয়া যান (আমি, তুমি)। বালকটি তাহার স্কুলে ফিরিয়া যায় (আমি, তুমি)। বালকটি প্রতি সোমবারে তাহার স্কুলে ফিরিয়া যায় (আমি, তুমি)। আমি একটা শকটে (cart) করিয়া প্রতি রবিবারে দোকানে ফিরিয়া আসি। তিনি তাঁহার ছেলেকে শহরে পাঠাইয়া দেন (আমি দিই, তুমি দাও)। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বালকটিকে স্কুলে পাঠাইয়া দেন (তুমি, আমি)। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বস্তাগুলি নৌকা করিয়া শহরে পাঠাইয়া দেন (আমি, তুমি)। তুমি তাহার জন্য আলু কেন। আমি তোমার জন্য ময়দা কিনি। তিনি আমার জন্য চিনি কেনেন। তিনি তাঁহার কাজ করেন। আমি তোমার কাজ করি। আমি আমার কাজ করি। তুমি প্রতি সোমবারে তোমার কাজ কর। তুমি সর্বদাই তোমার কাজ কর (আমি)। তিনি সর্বদাই পড়েন। তুমি প্রাতে সকাল সকাল জাগিয়া ওঠ (আমি)। তিনি প্রাতে দেরিতে ওঠেন। আমি প্রাতে দেরিতে আমার দোকান খুলি (তুমি)। তুমি রাত্রে দেরিতে তোমার দরজা বন্ধ কর (আমি)।

যেখানে সম্ভব বাক্যগুলিকে আমি, তুমি, তিনি এবং হরি, মধু প্রভৃতি নামের যোগে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। যেমন, 'তিনি তোমাকে জানেন' এই বাক্যটি 'আমি তোমাকে জানি, তুমি আমাকে জান, যদু তোমাকে জানে' এইরূপে নানা রূপান্তরে অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 4

She is a little baby. I am her brother. She is only a year old. Her name is Uma. She can walk a little. She cannot run. She says ma, baba, dada. She plays with the dog. The dog never hurts her. When she sleeps the dog sits by. The moon is up. Ma takes Uma out. Baby likes to see the moon. She smiles and claps her hands. She is happy. Ma sings a song and baby sings with her. Go and call uncle. Baby loves him. Uncle gives her dolls.

gender ও person বদল করিতে হইবে। নেতিবাচক করিতে হইবে।

তুমি খোকা। হরি খোকা। হরি কেবল এক বছরের। বিড়ালটি এক বছরের। তার নাম যদু, মধু ইত্যাদি। তার নাম রমা, শামা, বামা ইত্যাদি। সে অল্প দৌড়াতে পারে (আমি, তুমি)। সে হাঁটিতে পারে না (আমি, তুমি)। সে অল্প খেলিতে পারে। সে খেলিতে পারে না। সে কুকুরের সঙ্গে খেলিতে পারে না (আমি, তুমি)। সে কুকুরের সঙ্গে দৌড়াইতে পারে না (আমি, তুমি)। সে যখন খেলা করে কুকুর কাছে বসিয়া থাকে (আমি, তুমি)। সে যখন হাঁটে কুকুর কাছে হাঁটে (আমি, তুমি)। সূর্য উঠিয়াছে। বালকটি বিড়ালকে বাহিরে লইয়া যায় (আমি, তুমি)। মা রামকে বাহিরে লইয়া যায়। শ্যামকে, মধুকে ইত্যাদি। বিড়াল খেলিতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। কুকুর দৌড়াতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। বালকটি শব্দ করিতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। খোকা ঘুমাইতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। খোকা গোলা ছুঁড়িতে পারে না (আমি, তুমি)। খোকা ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িতে পারে না (আমি, তুমি)। খোকা গান গাহিতে ভালোবাসে (আমি, তুমি)। খোকা গান গাহিতে পারে (আমি, তুমি)। খোকা তাহার হাতে তালি দিতে পারে (আমি, তুমি)। খোকা তাহার মার সঙ্গে চলিতে পারে, গাহিতে পারে, খেলিতে পারে, দৌড়াতে পারে, চলিতে পারে না ইত্যাদি। খুড়া তাহাকে গোলা দেন, মা তাহাকে গোলা দেন (আমি, তুমি)।

যেখানে সম্ভব person ও gender পরিবর্তন করিয়া এবং রাম শ্যাম প্রভৃতি নানা নামের যোগে প্রত্যেক বাক্যটিকে নানারূপে নিষ্পন্ন করাইয়া লইবে।

LESSON 5

It is early morning. The crows are up. Men go to their fields. We hear songs from the temple. Listen how the birds sing! Our girls rise very early. They sweep their rooms and go to the tank. There they wash their hands and face and fill their jars. Then they come back home and light a fire in the kitchen. Our cows are all out. They go to the meadows to graze. They come back home in the evening. The lazy boys are still in their bed. They always rise late. Wake them up.

gender, person ও number-পরিবর্তন এবং নেতিবাচক করাইতে হইবে।

এখন সন্ধ্যা। এখন রাত্রি। এখন গরম। আমরা উঠিয়াছি। তোমরা উঠিয়াছ। আমি উঠিয়াছি। তুমি উঠিয়াছ (যদু, মধু ইত্যাদি)। বালকেরা তাহাদের বিদ্যালয়ে যাইতেছে। বালিকারা তাহাদের

বিছানায় যাইতেছে (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। শোনো, কেমন বালকেরা গাহিতেছে! শোনো, আমি কেমন গাহিতেছি, তুমি গাহিতেছ, তিনি গাহিতেছেন (যদু, মধু ইত্যাদি)। আমাদের বালকেরা ভোরে ওঠে, দেরিতে ওঠে। হরি দেরিতে ওঠে (আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি)। বালকেরা তাহাদের স্লেটগুলি ধোয় (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমরা আমাদের মাদুরখানি ধুই। তোমরা তোমাদের গোলাগুলি ধোও। তাঁহারা তাঁহাদের হাত এবং পা ধোন (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাহারা তাহাদের বিছানা ঝাঁট দেয় (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম ইত্যাদি)। আমরা তোমাদের দোকান ঝাঁট দিই (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমরা আমাদের রান্নাঘর ঝাঁট দিই (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। আমরা আমাদের ঘড়া পূর্ণ করি (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। তাহার পরে আমরা (ঘরে, পুকুরে, দোকানে, রান্নাঘরে) ফিরিয়া আসি (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাহার পরে তোমরা আগুন জ্বাল (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাহার পরে হরি তাহার দোকানে আগুন জ্বালে (ইস্কুলে, মাঠে, রান্নাঘরে)। তোমরা সবাই বাহিরে গেছ। আমরা সবাই বাহিরে গেছি (পাখিরা সকলে, বালকেরা সবাই, বালিকারা সবাই, বিড়ালগুলি সকলে)। আমি (তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম) বাহিরে গেছি। আমরা বিছানায় ঘুমাইতে যাই (আমি, তুমি, তিনি, রাম, শ্যাম)। অলস বালিকারা এখনও তাহাদের বিছানায় আছে (আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি)। আমরা সর্বদাই সকাল সকাল উঠি (আমি, তুমি, তিনি ইত্যাদি)। হরিকে জাগাইয়া তোলো (রামকে, শ্যামকে ইত্যাদি)।

LESSON 6

The old man is blind. I know him. He lives in a small hut. It is near my house. I see him every day. He has a son. The old man calls him Hari. Hari cooks his food. Hari has a good cow. She gives him milk. He gets fish from the tank. He has some land. There he grows rice. He takes his rice to the town There he sells it. He buys cloth from the weavers. Hari is very strong and good. We all like him.

gender, person এবং has ছাড়া অন্য ক্রিয়ার বচন পরিবর্তন এবং নেতিবাচক করাইতে হইবে।

বুড়া লোকগুলি অন্ধ (আমরা, তোমরা, আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু)। আমরা তাহাকে জানি (তোমরা, তাহারা, আমি, তুমি, তিনি, শ্যাম, রাম)। আমরা তাহাদিগকে জানি (তাহারা, তোমরা, ইত্যাদি)। তাহার একটি ছোটো বিড়াল (গোলা, পাখি, বাড়ি, খোকা, মাদুর, কুকুর, নৌকা, মাছ, দোকান, পুকুর, খেলনা, ফুল) আছে (আমার, তোমার, হরির, মধুর)। কুঁড়ে ঘরগুলি আমার বাড়ির (তোমার, তাঁর বাড়ির) কাছে। মন্দিরগুলি (দোকানগুলি, পুকুরগুলি, বাড়িগুলি, স্কুলগুলি, ক্ষেত্রগুলি, মাঠগুলি, তৃণোদ্যানগুলি) আমার কুঁড়ে ঘরের কাছে (তোমার, তাঁহার ইত্যাদি)। আমরা তাহাকে প্রতিদিন (সর্বদা, প্রতি রাত্রে, প্রতি প্রাতে, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি বছরে, প্রতি রবিবারে, প্রতি সোমবারে ইত্যাদি) দেখি (আমি, তুমি, তিনি, যদু, মধু)। মধুর একটি পুত্র (একটি বালক, বালিকা ইত্যাদি) আছে। বালক তাহাকে মধু বলিয়া ডাকে (যদু, শ্যাম, ইত্যাদি বলিয়া)—কখনো ডাকে না (আমরা, তোমরা, তাহারা, আমি, তুমি, তিনি, ইত্যাদি)। আমরা তাহার খাদ্য রাঁধি (তোমরা, তাহারা ইত্যাদি)। আমরা সর্বদা (প্রতি দিন, প্রতি রাত্রে ইত্যাদি) তাহার খাদ্য রাঁধি। মধুর একটি ভালো বিড়াল (কুকুর, মাদুর ইত্যাদি) আছে। গাভী তাহাকে দুধ দেয় (কখনো দেয় না)। গাভীগুলি তাহাকে ভালো দুধ দেয় (কখনো দেয় না)। তিনি দোকান হইতে মাছ (নুন, তেল, চিনি, চাল, ময়দা, পুতুল, মাদুর) পান (কখনো পান না) (তাহারা, আমরা, তোমরা)। তাঁহার খানিকটা চিনি (নুন, তেল, চাল, ময়দা, দুধ) আছে। সেখানে তিনি

ডাল জন্মান—কখনো জন্মান না (আমরা, তোমরা)। তিনি তাঁহার শকট শহরে লইয়া যান (মন্দিরে, দোকানে, বাড়িতে, স্কুলে ইত্যাদি)—কখনো লইয়া যান না (আমরা, তোমরা ইত্যাদি)। সেখানে আমরা তেল বিক্রি করি (তাহারা, তোমরা ইত্যাদি)। হরি মনুদির নিকট চাল কেনে (আমি, তুমি, তিনি, আমরা ইত্যাদি)। আমরা হরির কাছ হইতে দুধ (ইত্যাদি) কিনি। তোমরা সকলেই হরিকে ভালোবাস (তাহারা ইত্যাদি)।

LESSON 7

I have a mango garden. Come and see it. It has fifty trees. I have two men. They watch my garden. It is cool here. You see, the trees have nets over them. Birds cannot peck at the fruits. Hari, here I have a mango. You may take it. It is not ripe. I see, you have a knife. Give it to me. This mango is sour. Have you some salt? These lichi trees have no fruits now. They have fruits early in Baisakh. We get no flowers in our garden. My mother has two pet goats. They eat up small plants. You have a big tank in your garden. Has it good fish?

person, gender ও number -পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

আমার একটি বইয়ের দোকান আছে (নাই)। এসো, এটা খাও। এসো, এখানে বসো। এসো, এটা লও। এসো, এটা ধোও। এসো, এটা কেনো। এসো, এটা বিক্রি করো। এসো, এটা ঝাঁট দাও। এসো, আগুন জ্বালো। এসো, একটা গান গাও। টেবিলের উপর একটি বিড়াল আছে (The table has a cat on it এবং There is a cat on the table)। টেবিলের উপর কি একটি বিড়াল আছে? বিছানার (বিছানাগুলির) উপরে একটি মাদুর আছে। আমার কাগজের নৌকার (নৌকাগুলির) মধ্যে কতকগুলি ফুল আছে (নাই)। আমার দোকানে কিছু চিনি আছে (I have some sugar in my shop এবং There is some sugar in my shop)। হরির দোকানে কিছু তেল আছে (নাই)। আলু আছে, মাছ আছে (বই, গোলা, লবণ, পুতুল, দুধ, কাপড়, আম, ছাগল, পাখি, ছুরি ফুল, ফল) (নাই)। কাকটি আম ঠোকরাইতেছে। পাখিটি লিচু ঠোকরাইতেছে। কাকগুলি লিচু ঠোকরাইতেছে। পাখিটি আম ঠোকরাইতেছে। পাখিগুলি আম ঠোকরাইতেছে (তোমার পাখি, আমার পাখি, তার পাখি, তোমাদের পাখি, আমাদের পাখি, তাহাদের পাখি)। পাখি পাকা আমে ঠোকর দিতেছে (পাকা লিচুতে) (পাখিগুলি, আমার পাখি, তোমার পাখি ইত্যাদি)। আমার একটি টক আম আছে (নাই) (আমার, তোমার, আমাদের, তোমাদের, যদুর, মধুর ইত্যাদি)। তুমি একটা গোলা লইতে পারো (একটা ফল, ফুল, মাছ, বই, পাখি, ছুরি, কাপড়, কিছু ময়দা, আলু, তেল, লবণ, চিনি) (আমি, সে, আমরা, তোমরা, তাহারা, যদু, মধু)। এই আমগাছে এখন ফল নাই। এই আমগাছে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল হয় (জ্যৈষ্ঠের গোড়াতেই) (এই লিচু গাছে)।

LESSON 8

The village has a good school. Jadu learns English there. Jadu has a little brother. He also goes to the school. The school has an old head master. He is very kind to the boys. He comes to see us in our house. He takes the boys to his home. He has many books in his room. He shows us pictures from

his books. The school has nice grounds. We play *kapati* there. Boys from the village come to watch our games. We have a deep well in our school. It has good water. The school has a hundred boys. Now it is *Puja* time and the boys have a month's holiday.

person, gender, number-পরিবর্তন এবং প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

শহরে একটি ভালো মন্দির আছে। গ্রামে একটি ভালো পুকুর আছে। স্কুলে একটি ভালো কূপ আছে। যদু স্কুলে সংস্কৃত শেখে (বাংলা শেখে) (আমি, তুমি, হরি, মধু)। যদুর ভাই স্কুলে সংস্কৃত শেখে। যদুর ভাইও (মধুর ভাই, হরির ভাই) স্কুলে যায়। যদুর ভাই সংস্কৃতও শেখে, বাংলাও শেখে। যদুর ভাই ছেলেদের প্রতি খুব দয়াবান (যদুর ভাই, মধুর ভাই, হরির ভাই)। তিনি আমাদের দোকানে চাল কিনিতে আসেন (যদুর ভাইও, মধুর ভাইও ইত্যাদি)। তিনি আমাদের শহরে ফুল বেচিতে আসেন (যদুর ভাই, মধুর ভাই)। তুমি আমাদের শহরে ফুল বেচিতে আস (যদুর ভাই, মধুর ভাই ইত্যাদি)। তিনি মধুর ভাইকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া যান (যদুর ভাইকেও ইত্যাদি)। তাঁর স্কুলে অনেক ছেলে আছে (আমার, তোমার, হরির)। আমার বাগানে অনেক গাছ আছে (আমার, তোমার ইত্যাদি)। তোমার বাগানে অনেক টক আম আছে। তার বাগানে অনেক পাকা লিচু আছে (টক আম আছে ইত্যাদি)। যদুর ভাই আমাদিগকে তাঁর বই থেকে ছবি দেখান (মধুর ভাই ইত্যাদি)। মধুর ভাই আমাদিগকে তাঁর বাক্স থেকে টাকা দেন। হরি তাঁর পুকুর থেকে আমাদের মাছ দেন। এই বাড়িতে বেশ জমি আছে। ঐ মন্দিরে বেশ জমি আছে। এই দোকানে বেশ জমি আছে। গ্রাম হতে লোক (men) আমাদের দুধ বেচিতে আসে। শহর হতে যদুর ভাই আমাদের খেলা দেখিতে আসে (মধুর, হরির)। মধুর ভাইয়ের একটি গভীর পুষ্করিণী আছে (হরির যদুর, আমার, তোমার, হরির ভাইয়ের ইত্যাদি)। যদুর ভাইয়ের বাড়িতে একটি গভীর কূপ আছে (Jadu's brother has a deep well in his house)। বাগানে একশ গাছ আছে। শহরে একশ বাড়ি আছে। দোকানে একশ ছাগল আছে। এখন সন্ধ্যা হয়েছে। এখন সকাল হয়েছে। এখন রাত হয়েছে। এখন গরম, ঠান্ডা। যদু এক মাসের ছুটি পাইয়াছে (আমি, তুমি, যদুর ভাই)।

LESSON 9

This lane is shady. It leads to the river. It has mango groves and bamboo clumps on both sides. *Kokils* sing in the trees all day long and doves coo among the thick leaves. The mango trees are in flower now. The bees hum and butterflies flit about the branches. The village girls go to the river to fetch water. They laugh and chatter. They have their brass pitchers with them.

person, gender, number-পরিবর্তন এবং নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

এই বাগান (বন) ছায়াময়। (বহুবচন।) এই গলি (গলিগুলি) দোকানের দিকে লইয়া যায় (বনের দিকে, বাগানের দিকে, তৃণোদ্যানের দিকে, মন্দিরের দিকে, শহরের দিকে, গ্রামের দিকে, বাড়ির দিকে, পুকুরের দিকে, মধুর বাড়ির দিকে, যদুর বাড়ির দিকে, স্টেশনের দিকে, বিদ্যালয়ের দিকে, ক্ষেত্রের দিকে, আমবাগানের দিকে [mango grove], বাঁশঝাড়ের দিকে)। আমার বাগানে কতকগুলি বাঁশঝাড় আছে (বিকল্পে, I have এবং There is যোগ করিয়া) (আমাদের, তোমাদের, তোমার, তার, তাদের, হরির, মধুর ইত্যাদির বাগানে)। গলিতে দুই ধারের বাড়ি আছে, পুকুর

আছে, লিচু গাছ আছে, তৃণোদ্যান আছে, দোকান আছে, মাঠ আছে, খেত আছে। পুকুরের সকল ধারেই বাঁশঝাড় আছে, আমবাগান আছে, মাঠ আছে, খেত আছে ইত্যাদি। সে সমস্ত দিন গান করে। তুমি সমস্ত দিন পড়। তিনি সমস্ত সকাল রাঁধেন। আমি সমস্ত সন্ধ্যা খেলা করি। সে সমস্ত রাত ঘুমায় (বহুবচন)। ঘন পাতার মধ্যে মৌমাছিরা গুন্‌গুন্‌ করে। ফুলগুলির চারি ধারে প্রজাপতি উড়িয়া বেড়ায়। প্রজাপতি তাহার ঘরের চারি ধারে উড়িয়া বেড়ায়। মৌমাছিরা ফুলগুলির মধ্যে গুন্‌গুন্‌ করে। ছেলেরা বাগানের চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়ায়। খোকা তাহার ঘরের চারি দিকে হাঁটিয়া বেড়ায়। খোকা বকে, হাসে এবং হাততালি দেয়। (আমরা, তোমরা, তাহারা, সে, তুমি, আমি, যদু, হরি, ইত্যাদি)। বালকদের সঙ্গে তাহাদের বই আছে। বালিকাদের সঙ্গে তাহাদের ঘড়া আছে। যদুর সঙ্গে তাহাদের ভাই আছে (আমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে)। হরির সঙ্গে তাহার বিড়াল আছে। (কুকুর আছে, গোলা আছে, স্লেট আছে, কাপড় আছে)। পাখিরা ঘন ডালের মধ্যে গান করে। এসো, এইখানে আমরা ঘন গাছের মধ্যে বসি। এসো, এইখানে আমরা ঘন ঘাসের মধ্যে শুই।

LESSON 10

Jadu is very poor. He catches fish and sells them in the market. We have a market every Sunday. Jadu mends his nets in the evening. His boat is old and it leaks. He wants to buy a new boat. But he has no money. His little son is ill. The poor boy has fever. The young doctor is kind. He comes and takes care of the little boy. He never takes any fee from Jadu. Jadu gives him fruits from his trees and nice fish from his tank.

person, gender, number -পরিবর্তন, নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

যদুর ভাই গরিব (আমরা, তোমরা ইত্যাদি)। তাহার পিতা গরিব নন (আমার, তোমার ইত্যাদি)। বালকেরা প্রজাপতি ধরে (হরি, যদু, আমি, তুমি, তাহারা ইত্যাদি)। যদু পাখি ধরে এবং তাহাদিগকে শহরে বিক্রয় করে। প্রতি রবিবারে আমাদের বোলপুরে হাট হয়। প্রতি বৃহস্পতি-বারে তোমাদের গ্রামে হাট হয়। প্রতি সকালে তোমাদের বাড়িতে স্কুল হয়। প্রতি সন্ধ্যায় তোমাদের স্কুলে খেলা (games) হয়। প্রতি রবিবারে তাহাদের শহরে হাট হয়। আমাদের প্রতিদিনই মাছ হয়। আমাদের প্রতি রবিবার ছুটি হয়। তাহাদের প্রতি বুধবার খেলা হয়। ঘড়ায় ছিদ্র আছে। নৌকায় ছিদ্র আছে (বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যে ছিদ্রের মধ্য দিয়া তরল পদার্থ যায় বা বাহির হয় তাহার সম্বন্ধেই leak শব্দ প্রয়োগ হয়)। আমি একটা নূতন ঘড়া কিনিতে চাই (তুমি, সে, তোমরা, তাহারা, যদু ইত্যাদি)। খোকা একটা নূতন গোলা কিনিতে চায় (তুমি, আমি ইত্যাদি)। মা আমার কাপড় সারিয়া দেন (তুমি, তিনি, তোমরা, তাহারা ইত্যাদি)। আমার ভাই আমার পুতুল সারিয়া দেয় (যদুর ভাই, তুমি, তিনি, ইত্যাদি)। মা গরিব, মার টাকা নাই (আমার, তোমার তার, আমাদের, যদুর, মধুর ইত্যাদি)। হরি গরিব নয়, হরির টাকা আছে (মধু, যদু, আমি, তুমি ইত্যাদি)। যদুর পিতা অসুস্থ (আমি, তুমি, আমরা, তোমরা, মধুর ভাই, হরির ভাই ইত্যাদি)। মার জ্বর হইয়াছে (আমার, তোমার, যদুর, মধুর ইত্যাদি)। যদু আমাকে যত্ন করে, মা তোমাকে যত্ন করে (সে, তুমি, আমরা, তোমরা ইত্যাদি)। ডাক্তার হরির কাছ হইতে ফি লন (আমার, তোমার, যদুর, মধুর ইত্যাদি)। মধু তাঁকে তাঁর ফি কখনো দেয় না, সে তাঁকে ফল দেয়। ডাক্তার গরিবের কাছ হইতে কখনো ফি লন না। ডাক্তার তাঁতির কাছ হইতে কখনো ফি লন না।

There are thick, dark clouds in the west. Father says, a storm is near.

LESSON 11

Look, the dust is up. Do you hear the noise? It is the wind among trees. The dry leaves fly in the air. The storm is upon us. Take care, do not let the baby run out. Shut the door. Where is mother? Is she in the stall to look after the cows? I must go and help her. The lamps are not lit. Ask my sister to bring me a light.

person, gender, number -পরিবর্তন এবং প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

ডালগুলির উপরে পাতা ঘন হইয়া আছে। মাদুরের উপরে ধুলা ঘন হইয়া আছে। প্রভাত আসিল বলিয়া। সন্ধ্যা আসিল বলিয়া। পশ্চিমে ধুলা উঠিয়াছে। সূর্য পূবে উঠিয়াছে। পাখিরা উঠিয়াছে, তাহাদের গান শুনিতেছি। ছেলেরা উঠিয়াছে, তাহাদের গোলমাল শুনিতেছি। পাখিরা আকাশে উড়িতেছে। মৌমাছিরা পাতাগুলির মধ্যে উড়িতেছে। কুকুরটাকে বাহিরে যাইতে দাও (আমাকে, তোমাকে, যদুকে, মধুকে)। হরিকে বাহিরে দৌড়িয়া যাইতে দিয়ো না। হরি খোকার তদারক করে। মধু ছাগলগুলির তদারক করে (বাগানের, মন্দিরের, দোকানের, গ্রামের, পুকুরের, গাছগুলির, তৃণোদ্যানের, বাগানের, বাড়ির, খেতের)। আমাকে পড়িতেই হইবে। ভাইকে আমার সাহায্য করিতেই হইবে। তোমাকে বাহিরে যাইতেই হইবে। তাহাকে গান গাহিতেই হইবে। ইত্যাদি। রান্নাঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই (ঘরে, মন্দিরে, বাড়িতে, দোকানে)। মাকে দুধ আনিতে বলো (পুতুল, কাপড়, ফুল, ফল, আম, পাখি, বিড়াল, কুকুর, জাল, নৌকা, ঘড়া, ছুরি, বই, খোকা, গাভী, ছাগল, গোলা)। মা কি গোয়ালে? বোন কি পুকুরে? বাবা কি হাটে? যদু কি শহরে?

LESSON 12

I go to Calcutta every day to my office. I go by the railway train. I take my breakfast at eight in the morning. Then I walk to the station. Many people go to their office in Calcutta by this train. We meet each other every day in the train and we are very friendly. My office closes after five in the afternoon. My little boy runs out to meet me at the door. He knows I always have some little things in my pocket for him. I let him guess what they are. Some times he guesses right. Some times he makes mistakes. He is very happy when he gets pictures. I bring nice books for his sister.

person, gender, number -পরিবর্তন এবং নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

আমি রেলগাড়ি করিয়া স্কুলে যাই (শহরে যাই, কোন্নগরে যাই, হুগলীতে যাই ইত্যাদি) (আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তাহারা, যদু, মধু ইত্যাদি)। প্রত্যেক রবিবারে আমরা রেলগাড়ি করিয়া বর্ধমানে যাই (তোমরা, তারা, সে, তুমি)। তুমি কি সকালে জলখাবার খাও? হরি সকালে জলখাবার খায় (৬টার সময়, ৭টার সময়, ৮টার সময় ইত্যাদি জলখাবার খায়)। হরি এবং শ্যামের পরস্পরে আপিসে দেখা হয় (যদু এবং মধুর, সে এবং তাহার ভাইয়ের, রাখাল এবং তাহার বাপের ইত্যাদি)। তাদের মধ্যে বেশ ভাব আছে। হরি এবং যদুর মধ্যে ভাব আছে। হরি এবং যদু বন্ধু (friends), আমরা বন্ধু, তোমরা বন্ধু ইত্যাদি। স্কুল বিকালে চারটের পর বন্ধ হয়। দোকান সকাল আটটায় খোলে এবং বিকাল পাঁচটায় বন্ধ হয়। আপিস সকাল দশটায় খোলে। আমার বাবার আপিস সন্ধ্যা সাতটার পর বন্ধ হয় (যদুর আপিস, হরির আপিস ইত্যাদি)। আমি স্কুল হইতে বাজারে হাঁটিয়া যাই। আমি দোকান হইতে মিষ্টান্ন কিনি। তিনি যদুর কাছ হইতে মিষ্টান্ন

কেনেন (হরি মধুর কাছ হইতে ইত্যাদি)। তুমি বিকালে বাড়িতে ফের (তোমরা, সে, তারা ইত্যাদি)। রাম রাত্রে বাড়িতে ফেরে। গলিতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি বাহির হইয়া যাই (মন্দিরে, পুকুরে, দোকানে, শহরে, গ্রামে, তৃণোদ্যানে, ক্ষেত্রে)। তিনি জানেন আমার একটি গাভী আছে (বই আছে, গোলা আছে, বাগান আছে ইত্যাদি)। তিনি জানেন গোয়ালে আমার একটি গাভী আছে। তিনি জানেন টেবিলের উপর আমার একটি বই আছে। তিনি জানেন পকেটে আমার একটি গোলা আছে। তিনি জানেন আমার বাক্সে তাঁর জন্য কিছু টাকা আছে। খোকা জানে আমার ঘরে তাহার জন্য একটা পুতুল আছে। হরি জানে আমার ব্যাগে তাহার জন্য কাপড় আছে। মধু জানে হরির নৌকায় তাহার জন্য একটা ছাগল আছে। যদু জানে শ্যামের দোকানে তাহার জন্য কিছু চিনি আছে। ('সর্বদাই' শব্দ যোগ করিয়া উক্ত বাক্যগুলি পুনরায় অনুবাদ করাইয়া লইবে)। তুমি জান না আমার পকেটে কী আছে। আমি তোমাকে আন্দাজ করিতে দিলাম। তুমি ঠিক আন্দাজ করিতেছ। তুমি ভুল করিতেছ (তিনি, আমরা, তোমরা, যদু, হরি ইত্যাদি)। রাম কী ক্রয় করে আমি জানি। আমি ঠিক আন্দাজ করি। আমি ভুল করি না।

LESSON 13

A man is singing at the door. Who is it? It is Rakhal the blind singer. I like his songs very much. Jadu, go and call him in. Your mother is coming with some milk and sweets. She always gives Rakhal something to eat. Look! the dog is barking at Rakhal. Rakhal is afraid. Whose dog is that? Jadu, do not beat him. I think the dog is going to his master's house. Rakhal, come and sit here. What song are you singing? Is it from the Ramayana? Jadu, why are you teasing your sister? Let her listen to the song. Call your aunt here. I think she is working in the store-room.

person, gender, number-পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে। এইখানে ছাত্রদিগকে বুঝানো আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী পাঠগুলিতে 3rd person singularএ ক্রিয়াপদ যে যে খানে s যোগে হইয়াছে তাহার অধিকাংশ স্থলেই ing প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইলে ভালো হয়। শিক্ষক প্রয়োজন বোধ করিলে ছাত্রদিগকে দিয়া পূর্ববর্তী পাঠের ধাতুরূপ যথাস্থানে ing যোগে পরিবর্তন করাইয়া অভ্যাস করাইবেন।

গৌর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে (আমি, তুমি, যদু, মধু ইত্যাদি)। কুকুরটা দরজার কাছে ঘুমাইতেছে। গৌরের গাড়ি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাকা কি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন? মণি দরজার কাছে বসিয়া আছে। মণি, যাও, কাকাকে ভিতরে ডাকিয়া আনো (বাবাকে, দাদাকে, আমাকে, তোমাকে, যদুকে)। দেখো, মণি কাকার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দৌড়িতেছে (যদু, হরি ইত্যাদি)। কাকা একটা বড়ো পুতুল লইয়া আসিতেছেন (বাবা, দাদা, তুমি, সে, হরি, মধু ইত্যাদি)। মণি কুকুর লইয়া আসিতেছে। কুকুরকে কিছু খাইতে দাও। মণিকে কিছু খাইতে দাও। কুকুরটা মণিকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে (হরিকে, যদুকে, রামকে ইত্যাদি)। মণি কুকুরকে ভয় করে (আমি, তুমি, সে, আমরা, তোমরা, যদু, মধু ইত্যাদি)। শশী বিড়ালকে ভয় করে। খোকা অন্ধকারকে ভয় করে। শ্যাম তাহার পিতাকে ভয় করে। আমি আমার জ্যাঠাকে ভয় করি। হরি আমাকে সর্বদাই মারে। দাদা আমাকে মারেন না, তিনি রামকে মারেন। যদু কুকুরকে মারে, ভাইকে মারে, বোনকে মারে (হরি, শ্যাম ইত্যাদি)। এটা কার বিড়াল (কুকুর, পাখি, ফল, ফুল, দোকান, বাড়ি ইত্যাদি)? তুমি আমাকে বিরক্ত করিতেছ (সে, তাহারা, যদু, মধু ইত্যাদি)। যদু কুকুরটাকে বিরক্ত করিতেছে (খোকা, রাম, শ্যাম ইত্যাদি)। আমার বোন এখন গাহিতেছে (আমার ভাই, বাবা, খোকা, পুত্র, যদু, মধু ইত্যাদি)। তাকে গান শুনিতে দাও (যদুকে, মধুকে ইত্যাদি)। মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন।

আমার বোন গোয়ালে গোরুর তদারক করিতেছে। তোমার ভাই বালকগুলিকে যত্ন করিতেছে (taking care) (আমি, তুমি, যদু, মধু ইত্যাদি)।

LESSON 14

It is a very old tank. The steps of its *ghat* have big cracks. There are high trees on all sides of it. The thick branches of the mango trees do not let a ray of sunlight reach its water. You can hear the chirp of crickets and the howls of jackals all day long. The smell of the weeds fills the still air. The water of this tank is bad. The colour of it is green. It gives fever to the people of the huts around it. The women of the village come here to wash their clothes.

ধাতুরূপ, person, gender, number-পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

এই পুকুরের জল ভালো। এই নদীর জল ঠাণ্ডা। এই গাছের ছায়া শীতল। এই গাছের ডালগুলি ঘন। শহরের বাড়িগুলি পুরাতন। এই গাছের ফল টক। এই গাছের আমগুলি পাকা। এই গ্রামের মাঠগুলি সবুজ। এই বাগানের তৃণোদ্যানটি ছায়াময়। এই পুকুরের মাছ বড়ো। এই শহরের নাম বোলপুর। এই বালকের নাম যদু। এই বাড়ির ঘরগুলি ছোটো। এই গ্রামের মানুষেরা দুধ বিক্রয় করে (বিক্রয় করিতেছে)। স্ত্রীলোকটি জলে পা ধোয় (ধুইতেছে)। এই বাড়ির স্ত্রীলোকেরা তাহাদের ঘর ঝাঁট দেয় (দিতেছে)। এই স্কুলের বালিকারা গান করে (গান করিতেছে)। এই স্কুলের বালকেরা হাসে এবং বকে (হাসিতেছে এবং বকিতেছে)। শহরের দোকানগুলি আটটার সময় বন্ধ হয় (বন্ধ হইতেছে)। ফুলের গন্ধে আমার ঘর ভরিয়া দেয় (দিতেছে)। সূর্যের চারি দিকে মেঘের বর্ণ লাল। এই শহরের লোকেরা মন্দিরে যায় (যাইতেছে)।

LESSON 15

It is raining on the other side of the field. The trees look misty. The cows are running home and the crows are flying to their nests. The wind is damp and it is bringing the smell of the earth. The dark rain-clouds are coming up from the east. Do you hear the patter of rain among the leaves? The shower is now upon us. Oh! how nice it is! The bamboo leaves are all trembling. They seem glad. The birds are chirping in the wood. Where are the girls? Are they fetching water from the river? Go and ask them to hurry home. The daylight is fading and it still rains. The lane is narrow and dark. Mother is waiting for the girls.

ধাতুরূপ, person, gender, number-পরিবর্তন ও প্রশ্নবাচক ও নেতিবাচক করাইতে হইবে।

মাঠের অন্য পারে ধুলা উঠিয়াছে। নদীর অন্য পারে কুটীরগুলি ঝাপসা দেখায় (দেখাইতেছে)। পুকুরের এই পারে ঘাস সবুজ দেখায় (দেখাইতেছে)। তোমাকে বেশ ভালো (nice) দেখায় (দেখাইতেছে) (আমাকে, তাহাকে, যদুকে, মধুকে ইত্যাদি)। ছেলেরা ইহারই মধ্যে বাড়ির দিকে দৌড়িতেছে। পাখিরা ইহারই মধ্যে নদীর অন্য পারের দিকে উড়িতেছে। ঘরটা স্যাঁৎসেঁতে (বাড়ি, ঘাস, পাতাগুলা, ঘাটের সিঁড়িগুলা, কাপড়গুলা)। বালিকারা জলের থেকে উপরে উঠিয়া আসে (আসিতেছে) (আমি, তুমি, সে, আমরা, তোমরা, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমি গাছের মধ্যে বাতাসের

শব্দ শুনিতে পাই (পাইতেছি)। তুমি পাতার মধ্যে বৃষ্টির শব্দ শুনিতে পাও (পাইতেছ)। এইবার আমাদের উপর ঝড় আসিয়া পড়িল। পূব দিক হইতে আর্দ্র হাওয়া আসে (আসিতেছে)। আহা কী চমৎকার বৃষ্টি! আমের পাতা কাঁপে (কাঁপিতেছে)। ছেলেরা কাঁপে (কাঁপিতেছে)। ছেলেদের দেখিয়া খুশি মনে হইতেছে (তোমাকে, তাকে, রামকে, শ্যামকে)। মেয়েরা নদী হইতে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসে (আসিতেছে) (আমরা, তোমরা, তারা, আমি, তুমি, সে)। দিনের আলো ম্লান হয় (হইতেছে)। ফুলগুলি ম্লান হয় (হইতেছে)। সবুজ রং ম্লান হয় (হইতেছে)। পথ অন্ধকার (ঘর, গলি, রাত্রি, সন্ধ্যা, বাগান, আমবাগান)। আমরা মার জন্য অপেক্ষা করি (করিতেছি) (তোমরা, তারা, আমি, তুমি, সে, বালকরা, বালিকারা, যদু, মধু ইত্যাদি)। ছেলেরা তাহাদের সকালের আহারের (breakfast) জন্য অপেক্ষা করে (করিতেছে)। বালিকারা তাহাদের মাস্টারের জন্য অপেক্ষা করে (করিতেছে)। ফুলগুলি ইহার মধ্যে ম্লান হইতেছে। বাঁশপাতা সর্বদাই কাঁপে (কাঁপিতেছে)। ঝড় ইহারই মধ্যে আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। চাঁদের চারি দিকে মেঘ সাদা দেখায় (দেখাইতেছে)। এই পুকুরের চারি দিকের কুঁড়েগুলিকে নূতন বলিয়া মনে হয় (হইতেছে)। এই বইটিকে ইহারই মধ্যে পুরাতন দেখাইতেছে (কুঁড়েটিকে, শহরটিকে, গোলাটিকে, বাগানটিকে, পুতুলটিকে, কাপড়টিকে)।

LESSON 16

My son will go to the market. Will you show him the way? My son will cross the river first. The ferry boat is on the other shore. It will come back soon. Let us sit here under the shade of the tree. The old man is waiting here with his bundle of straw. He will also go to the market. My son is going to buy fish and some mustard oil. He will also buy some kitchen pots. I will wait for him at the temple. I hope he will come back soon. We will not stop long in this village. We must reach home to-morrow. There is a room in the grocer's shop. We will sleep there to-night. Will you wake us up to-morrow morning?

ধাতুরূপ, person, gender, number-পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে। শিক্ষক যদি আবশ্যক বোধ করেন তবে মাঝে মাঝে পূর্বপাঠের ক্রিয়াপদগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে ভবিষ্যৎকালবাচক করাইয়া লইতে পারেন।

নদীতে যাইবার পথ কি আমাকে দেখাইয়া দিবে (মন্দিরে, শহরে, গ্রামে, খেতে, স্কুলে, দোকানে, স্টেশনে)? গ্রামটি মাঠের ওপারে। আমি এই মাঠ পার হইব (তুমি, তিনি, তারা, আমরা, যদু, মধু ইত্যাদি)। নদীর ওপারে হাট। আমরা নদী পার হইব (আমি, তুমি ইত্যাদি)। এসো, খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করা যাক। এসো, খেয়া নৌকার জন্য এই গাছের ছায়াতলে অপেক্ষা করা যাক। এসো, ঘাসের উপর শোওয়া যাক। এসো, আমরা এই গাছটির চারি দিকে বসি। তাহার কাপড়ের বান্ডিলটি লইয়া আমার ভাই দৌড়াইতেছে (যদুর ভাই, মধুর ভাই, আমি, তুমি)। তাঁহার কলসী এবং হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া তিনি নদী পার হইতেছেন (চালের বস্তা, তেলের বোতল, আমের ঝুড়ি [basket] লইয়া) (আমি, তুমি, তাহারা ইত্যাদি)। (উক্ত বাক্যগুলিকে ভবিষ্যৎ-কালবাচক করিবে)। যদুর ভাই চার বস্তা চাল কিনিতে যাইতেছে (আমি, তিনি ইত্যাদি)। (ভবিষ্যৎ।) আমি তাঁহার জন্য দোকানে অপেক্ষা করিতেছি (তুমি, তিনি ইত্যাদি)। (ভবিষ্যৎ।) হরিও (also) মধুর জন্য স্কুলে অপেক্ষা করিতেছে (যদু, বিপিন, রাখাল ইত্যাদি)। তিনি এই বাড়িতে আছেন (is এবং stop এবং live শব্দের প্রভেদ বুঝাইয়া দিবে) (আমি, তুমি, তাঁরা,

আমরা, যদু, মধু ইত্যাদি) (ভবিষ্যৎ)। তিনি এই গ্রামে দীর্ঘকাল আছেন (stop) (আমি, তুমি ইত্যাদি) (ভবিষ্যৎ)। আমাদিগকে কাল শহরে পেঁছিতেই হইবে (আমাকে, তোমাকে, তাকে, তোমাদিগকে ইত্যাদি)। যদুকে এই সকালে স্কুলে পেঁছিতেই হইবে (আমাকে, তোমাকে ইত্যাদি)। মধুদি কাল সকালে তোমাকে জাগাইয়া দিবে (আমি, তুমি ইত্যাদি)। তাঁতি যদুকে আজ রাত্রে জাগাইয়া দিবে।

LESSON 17

The sky is cloudy still; but it will clear up soon; for the wind is blowing hard and clouds are flying fast. It will rain this morning. Look there, the sun is coming out. Get ready to start. There is your bundle of clothes. My big box is under the bed. The children are still sleeping. They will not see us when they wake up, and they will be sorry. We will send them some nice things when we get to town. Do not try to move the box. It is heavy. The porters will carry it to the cart. It will take an hour to get to the railway station. I am going to walk. Our servant will go with the cart. The train will start in the afternoon. Will you have a bath in the river?

ধাতুরূপে person, gender, number-পরিবর্তন ও নেতিবাচক ও প্রশ্নবাচক করাইতে হইবে।

বাতাস এখনো ভিজা। এখনো অন্ধকার। এখনো ঠান্ডা। এখনো গরম। (তিনি, আমি, আমরা ইত্যাদি) যদুও (also) এখনো ঘুমাইতেছে। কিন্তু মধু ইহারই মধ্যে উঠিয়াছে। যদু সর্বদাই ঘুমাইতেছে। আকাশ শীঘ্রই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই গাছের তলায় অনেক শুক্‌না পাতা আছে। কিন্তু শীঘ্রই ইহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে (বিকল্পে there is এবং has দিয়া এই বাক্যগুলি ইংরাজি করাইবে)। কারণ, আমার ভগিনী ইহা ঝাঁট দিতে আসিতেছে (সে, তাহারা, যদু, মধু ইত্যাদি)। কারণ, জল দিয়া আমি ইহা ধুইব (তুমি, সে, তাহারা, আমরা, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমি জোরে (hard) চলিতেছি কিন্তু এখনো আমার স্কুলে পেঁছিতে পারিতেছি না (তুমি, সে, আমরা, তারা, যদু, মধু ইত্যাদি)। আমার ঘোড়া সর্বদাই বেগে দৌড়ায় (তোমার, তার, আমাদের, যদুর ইত্যাদি)। তোমার ঘোড়া কখনই বেগে দৌড়ায় না। কাল বৃষ্টি হইবে না। এখন বৃষ্টি হইতেছে না। আজ বৃষ্টি হইতেছে না। আজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি হইবে না। আজ রাত্রে (to-night) বৃষ্টি হইবে না। চাঁদ বাহির হইয়া আসিতেছে (ভবিষ্যৎ)। আমি বাহির হইয়া আসিতেছি (ভবিষ্যৎ)। আমি যাত্রা করিতে প্রস্তুত হই (তুমি, সে, আমরা, তাহারা, যদু ইত্যাদি)। আমি স্কুলে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি (তুমি, সে ইত্যাদি) (ভবিষ্যৎ)। আমি কলিকাতায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছি (কাশীতে, মাদ্রাজে, পাঞ্জাবে, তুমি, তিনি) (ভবিষ্যৎ)। তোমার খড়ের বান্ডিল লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। আমি আমার চালের বস্তা লইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি (তুমি, সে) (ভবিষ্যৎ)। বালকেরা এখনো ঘাসের উপরে গাছের চারি দিকে ঘুমাইতেছে (বালিকারা, গাভীগুলি, কুকুরগুলি)। তাহারা একটা দোকানে থাকিবে (stop) যখন তাহারা কলিকাতায় পেঁছিবে (আমি, তুমি ইত্যাদি)। কারণ, সেখানে তাহাদের কোনো বন্ধু নাই (আমার, তোমার ইত্যাদি)। আমি দুঃখিত (তুমি, তিনি, আমরা, তারা, যদু)। তোমাকে দেখিয়া দুঃখিত বোধ হইতেছে (তাহাকে, তাহাদিগকে, যদুকে)। তাহাকে দুঃখিত দেখাইতেছে (তোমাকে, তাহাদিগকে, রামকে ইত্যাদি)। তিনি দুঃখিত হইবেন (আমি, তুমি, তোমরা ইত্যাদি)। দৌড়িতে চেষ্টা করিয়ো না। আমি দৌড়িতে চেষ্টা করি না (তুমি, তিনি ইত্যাদি)। এই ভারী খড়ের বান্ডিল আমি বাড়িতে বহিয়া লইয়া যাইব (তুমি, তিনি ইত্যাদি)। এই টেবিলটা ভারী, এটা কি তুমি নাড়িতে পার? খোকা ভারী, তাহাকে তুমি বহিতে পার? এই চিনির বস্তা ভারী, মুটে ইহা

স্টেশানে বহিয়া লইয়া যাইবে। নদীতে যাইতে এক ঘণ্টা লাগে (ভবিষ্যৎ)। শহরে যাইতে এক দিন লাগে (ভবিষ্যৎ)। নদী পার হইতে এক দিন লাগে (ভবিষ্যৎ)। এই পুকুরের চারি দিকে দৌড়িতে এক মিনিট লাগে (ভবিষ্যৎ)। স্টেশানে পোঁছিতে কখনই এক ঘণ্টা লাগে না। এই নদী পার হইতে কখনই বেশিক্ষণ লাগে না। আমি আজ বিকালে যাত্রা করিব (তুমি, তাঁরা ইত্যাদি)।

LESSON 18

Now boys, let us play at cats and mice.
Yes, yes! that will be great fun!
I am the pussy cat. Mew, mew, mew.
And what am I?
You are a mouse. You are the brown mouse.
And I?
You are the long mouse.
And I?
You are a short mouse.
And the rest of us?
You are all mice.
No, let us be kittens.
All right, you are my kittens. Let me see, how many kittens are there.
We are four.
And how many mice?
We are six of us. What are we to do?
Here is a bit of paper. This is a piece of bread.
Brown mouse, come and have a bite at it.
Here, long mouse, you also have a bite.
Now, come along, every one of you, and have your share. Now, my kittens, be ready! Are you ready?
Yes, I am ready.
I am ready.
I am also ready.
We are all ready.
When I cry mew, all of you try to catch the mice.
Yes, yes, we shall try to catch them, but they will run away.
Of course, they will run, but you must run after them.
Now, ready! Mew!
I have caught the brown mouse.
Brown mouse, you are dead. You lie down there.
The long mouse is also dead. You lie down there.
The short mouse is also dead, I have caught him.

I have touched the fat mouse. Is he not dead?
No, he is not quite dead yet*. He can still run away.
You cannot catch me.
Catch me if you can.
Let me see who can catch me.
ছেলেদের মুখস্থ করাইয়া খেলা করাইবে। আবশ্যকমত পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে।

* yet শব্দের অর্থ 'এখনো', still শব্দের অর্থও 'এখনো', দুই শব্দের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। যাহা পূর্বে ঘটিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে তাহার সম্বন্ধেই still শব্দ ব্যবহার হয়, যেমন, The sky is cloudy still. যাহা ঘটিবার অভিমুখে চলিয়াছে কিন্তু ঘটে নাই, তৎসম্বন্ধেই yet শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন, He is not yet dead.

ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা

প্রকাশ : ১৯০৯

'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' ইংরাজি-সোপানের প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকা অংশের পরিবর্ধিত সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে যে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন বর্তমান রচনাবলীতে তদনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে।

শিক্ষকদের প্রতি নিবেদন

ইংরেজি-শিক্ষার্থী বালকেরা যখন অক্ষর-পরিচয়ে প্রবৃত্ত আছে সেই সময়ে কেবল কানে শুনাইয়া ও মুখে বলাইয়া তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা-ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া লইবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই শ্রুতিশিক্ষা শেষ করিলে বই পড়িবার অবস্থায় বালকদের অধ্যয়নকার্য অনেক সহজ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য ছাত্রদের প্রয়োজন বুঝিয়া গ্রন্থলিখিত প্রণালী অনুসরণ-পূর্বক শিক্ষকগণ নূতন নূতন বাক্য রচনা করিয়া ব্যবহার করিবেন। এই গ্রন্থের এক একটি অংশ ছাত্রেরা যখন কানে শুনিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবে তখনই সেই অংশ তাহাদিগকে মুখে বলাইবার সময় আসিবে। সেই সময়েই, শিক্ষক যখন ছাত্রকে Come! বলিবেন, তখন ছাত্র I come বলিয়া তাঁহার নিকটে আসিবে। যখন তিনি বলিবেন, Go! সে I go বলিয়া চলিয়া যাইবে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এইরূপ ভাবেই শিখাইতে হইবে, শিক্ষকগণ ইহা মনে রাখিবেন।

এইখানে এ কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক যে, কোন্ পথ দিয়া ছেলেদের কানে এবং জিহ্বায় ইংরেজি ভাষাটা অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে আমরা এই গ্রন্থে তাহার আভাস দিয়াছি মাত্র। ছাত্রদের বুদ্ধি ও শক্তি বিবেচনা করিয়া শিক্ষকদিগকে কাজ করিতে হইবে। কানের অভ্যাস কতক্ষণ করাইলে মুখে অভ্যাসের সময় আসিবে তাহা ছাত্র বুঝিয়া ঠিক করিতে হইবে। শুধু তাই নয়, যদি দেখা যায় কোনো ছাত্রের পক্ষে কোনো অংশ কঠিন হইতেছে তবে শিক্ষক সে অংশ সহজ করিয়া বা পরিত্যাগ করিয়া চলিবেন। মুখে মুখে বলাইবার সময় ছাত্রদিগকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অনেক দূর অগ্রসর করা যাইতে পারে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

শিক্ষক ছাত্রদিগকে সারিবন্দী দাঁড় করাইয়া একে একে তাহাদিগকে নিজের কাছে আহ্বান করিতেছেন—

Hari, come to me!

এই বাক্যটি যখন হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যখন এই আদেশবাক্য শুনিলেই সে তাহা অবিলম্বে পালন করিতেছে, তখন তাহাকে মুখে বলাইতে হইবে, যথা—

Hari, come to me!
Sir, I come to you.
Hari, go back!
Sir, I go back.

হরি ফিরিয়া গেলে শিক্ষক মধুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, Madhu, who came to me?

মধু উত্তর দিবে, Hari came to you.

এইরূপে সমস্ত ক্লাসকে দিয়া বলাইয়া অতীত কালের রূপ অভ্যাস করানো যাইবে।

হরি যখন শিক্ষকের অভিমুখে আসিতেছে তখন শিক্ষক মধুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, Madhu, who is coming to me? মধু উত্তর দিবে, Sir, Hari is

coming to you. তাহার পরে হরি তাঁহার কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, Has Hari come to me? উত্তর, Yes, Hari has come to you. তাহার পরে হরিকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, Hari, have you come to me? উত্তর, Yes, sir, I have come to you.

এই প্রকারে গ্রন্থলিখিত সমস্ত অংশকেই অনুধাবন করিলে ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছাত্রদের অভ্যস্ত হইবে। ভবিষ্যৎকালের রূপ শিখাইবার সময় শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন, Hari, will you come to me? উত্তর, Yes, sir, I will come to you. Then, come! অন্যের প্রতি, Is Hari coming? Yes, he is coming. Has he come? Yes, he has come. Hari, go back! অন্যের প্রতি, Did Hari come to me? Yes, Hari came to you. Has he gone back? Yes, he has gone back.

গ্রন্থের যে অংশে ট্রেনে চড়া, স্নান, আহার প্রভৃতি বর্ণনা-সূচক বাক্য আছে সেখানে ছেলেরা যথোচিত অভিনয় করিয়া সেই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিবে।

দ্রব্যপরিচয় ও তাহার ইংরেজি নাম শিখাইবার জন্য নানাবিধ সামগ্রী ক্লাসে প্রস্তুত রাখা উচিত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

প্রথম ভাগ

১

Come here কুমুদ!

Sit down কুমুদ!

এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে—

Sit there.
Stand up.
Come back.
Stand there.
Lie there.
Sit up.
Run.
Walk.
Walk back.
Crawl here.
Crawl back.
Rise.
Jump here.
Jump back.
Stop here.

Sit here.
Go back.
Go there.
Lie down.
Lie here.
Stand up.
Run back.
Stop.
Crawl.
Crawl there.
Fall down.
Jump.
Jump there.
Stop.
Smile.

নির্দেশ করিয়া উপরের ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রত্যেককে You come here.
You sit here.
You sit down.

প্রত্যেককে You stand up.
You go back.
You come back.

ইত্যাদি।

ছাত্রগণ যখন আদেশ পালন করিতে ভুল করিবে না তখন তাহারা আদেশ পালনের সঙ্গে সঙ্গে যাহা করিল তাহা বলিবে। যেমন, I come, I go, I sit here, I run, I stop ইত্যাদি। আদেশ পালনের পর ছাত্ররা পরস্পর পরস্পরকে আদেশ করিবে। প্রত্যেক lesson-এ যথাসম্ভব এই প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে ও যে-সকল বাক্য দেওয়া হইল শিক্ষক মহাশয় অনুরূপ বাক্য রচনা করাইয়া অভ্যাস করাইবেন।

২

to

Come to me.
Come to this chair.
Come to this table.
Come to this board.
Come to this bench.

Come to this door.
Come to this window.
Come to this wall.
Come to this corner.
Come to this gate.

Come to this desk.
Come to this tree.
Go to that chair.
Go to that table.
Go to that board.
Go to that bench.
Go to that desk.
Go to that gate.
Go to that tree.

Come to Hari.
—ইত্যাদি প্রত্যেককে।
Go to that wall.
Go to that window.
Go to that door.
Go to that verandah.
Go to that corner.
Go to Hari.
—ইত্যাদি প্রত্যেককে।

walk to, run to, crawl to, jump to প্রভৃতি, ক্রিয়াযোগে শিক্ষক আদেশ করিবেন।

৩

into

ছাত্রদিগকে বাহিরে রাখিয়া একে একে—
Come into this room.
Come into the garden.
Come into the class.
নিজে ছাত্রদের সহিত বাহিরে আসিয়া –
Go into that room.
Run into that room, come back.
Crawl into that room, crawl back.

৪

on, upon

Stand on this floor
Stand on that bench.
Stand on this chair.
Stand on this table.
Stand on that carpet.
Stand on this brick.
Stand on this door-step.
Crawl on this floor.
Crawl on that carpet.

Sit on this chair.
Sit on that bench.
Crawl on that table.
Lie on the floor.
Lie on the mat.
Lie on the table.
Lie on the carpet.
Lie on this bench.
Lie on the grass.

৫

before, behind, right, left, under, by

Stand before me.
Stand behind me.

Sit before the table.
Sit behind the table.

Stand on my right side.
Stand on my left side.
Stand before Kumud.
Stand behind him.
Sit under the table.
Sit before your teacher.
Crawl under the table.
Crawl before the class.

Sit on the right side of your teacher.
Sit on the left side of your teacher.

Stand on his right side.
Stand on his left side.
Lie on your back.
Lie on your right side.
Lie on your left side.
Lie on your stomach.
Lie before the class.
Lie behind the teacher.

৬

round, across, over, beyond

Walk round the table.
Walk round the chair.
Walk round the bench.
Walk round me.
Walk round Hari, Ali,
Abdul, Kumud ইত্যাদি।
Walk across the room.
Walk across the mat.
Walk across the carpet.
Run round the chair.
Run round the table.
Run round the class.
Run beyond table.
Walk over the carpet.
Walk over the lawn.
Walk over the grass.
Walk over the line.
Crawl over the carpet.
Crawl over the grass.
Crawl over the mat.
Run over the carpet.
Run over the grass.
Run over the line.
Jump over this brick.
Jump over this bench.
Walk beyond the tree.

Jump over this line.
Jump over this rope.
Jump over the door-step.

শিক্ষক মহাশয় এইখানে stop এবং wait ক্রিয়া দুইটি শিখাইবেন।

৭

at

Look at the ceiling.
Look at the beam.
Look at the clock.
Look at the board.
Look at the sky.
Look at the cloud.
Look at the girl.
Look at the post.
Look at the path.
Look at the picture.
Look at Kumud's face.
Look at Reva's feet.

Look at the sun.
Look at the bird.
Look at the flower.
Look at the boy.
Look to the east.
Look to the south.
Look to the west.
Look to the north.

৮

Take this book.
Take this pencil.
Take this pen.
Take this inkpot.
Take this eraser.
Take this blue pencil.
Take this black ink.
Take this duster.
Take this card.
Take the map.
Take my book.
Take his ruler ইত্যাদি।
Take his nib ইত্যাদি।
Take Kumud's paper ইত্যাদি।
Take this slate.
Take that paper.
Take that fountain pen.
Take that ruler.
Take this red pencil.
Take this red ink.
Take this chalk.
Take this letter.
Take the envelope.
Take this nib.
Take my pencil.
Take her pen.
Take Hari's book.

৯

Bring that slate.
Bring that book.
Bring that pen.
Bring that chalk.
Bring that pencil.
Bring the red pencil.
Bring the blue pencil.
Bring the map.
Bring the knife.
Bring my pen.
Bring his rubber.
Bring his fountain pen.
Bring his letter.
Bring his rubber ইত্যাদি।
Bring Kumud's book.
Bring Hari's slate ইত্যাদি।
Bring my paper.
Bring my letter.
Bring your pen.
Bring your book.
Bring her slate.
Bring her pencil.

১০

Find the chalk.
Find the book.
Find the pencil.
Find my card.
Find my stick.
Find your book.

Find the rubber.
Find the pen.
Find my book.
Find his stick.
Find your ruler.
Find his book.
Find my letter.

১১

Hold this pen.
Hold this chair.
Hold this chalk.
Hold my hand.
Hold my fingers.
Hold his fingers.
Hold this finger.
Hold that finger.
Hold this brick.
Hold that leaf.
Hold this duster.
Hold Kumud's hands.
Hold Kumud's right hand.
Hold Hari's left hand.

১২

Throw the brick.
Throw the ball.
Throw that leaf.
Throw this stone.
Throw that paper.
Throw this card.
Throw that letter.
Throw that tile.
Throw this rag.
Throw the brick up.
Throw the brick down.
Lift up this brick and drop it.
Hold this book. Drop it.
Take that ruler. Drop it.
Take the duster and
throw it up.
Throw the ball up.
Throw the ball down.

১৩

Lift up your head.
Lower your head.
Lift up your eyes.
Lower your eyes.
Lift up your hands.
Lower your hands.
Lift up your right hand.
Lower your right hand.
Lift up this stone.
Put down this stone.
Lift up this picture.
Lift up your right foot.
Put down your right foot.
Lift up your left foot.
Put down your left foot.
Put down this picture.
Lift up that brick.
Put down that brick.
Lift up this letter.
Put down this letter.
Lift up this stick.
Put down the stick.

১৪

Open the room.
Close the room.
Open the window.
Close the window.
Open the book.
Shut the book.
Open the knife.
Shut the knife.
Open your mouth.
Shut your mouth.

Open the umbrella.
Close the umbrella.
Open the doors.
Close the doors.
Open the box.
Shut the box.
Open your eyes.
Shut your eyes.
Open your book.
Close your book.

১৫

Touch me.
Touch him.
Touch Hari.
Touch this tree.
Touch this water.
Touch this glass.
Touch your skin.

Touch my forehead.
Touch his forehead.
Touch Kumud's forehead.
Touch Jadu's forehead.
Touch his hair.
Touch my head.
Touch my skin.

Touch my right hand, left hand, ear, right ear, left ear.

Touch Hari's skin.
Touch Kumud's skin.
Touch your shoes.
Touch the slippers.

Touch Abdul's nose,
Hari's, Jadu's.
Touch my hair.
Touch the picture.

Touch your slippers.

Touch my eyes, right eye, left eye, waist, wrist, knee, elbow, neck.

Touch the right side of the picture.
Touch the left side of the picture.

১৬

Smell this flower.
Smell this oil.
Smell this mango.
Smell the lemon.
Smell that handkerchief.

Smell that leaf.
Smell this rose.
Smell this fruit.
Smell this banana.
Smell the grass.

১৭

ছাত্রদের সহিত ঘরের বাহিরে আসিয়া—

Dig here.
Dig with this spade.
Dig in the sand.
Dig here with this knife.
Dig there.
Dig with that spade.
Dig in the garden.

১৮

Tear this straw.
Tear the rag.
Tear that string.
Tear that cloth.
Tear this paper.
Tear this thread.
Tear that leaf.
Break that twig.
Break the biscuit.
Break this brick.
Break the stick.
Break this reed.

শিক্ষক মহাশয় cut ক্রিয়াটি এইখানে শিখাইবেন।

১৯

Tear a leaf from this tree.
Tear a leaf from that book.
Tear a thread from this cloth.
Break a branch from that tree.
Pluck a flower from this plant.
Pluck a leaf from that plant.
Take a marble from this box.
Take a pencil from my pocket.
Bring my book from the table.
Take your slate from the bench.
Take Hari's slate from him and bring it to me.
Take Kumud's shoes from him and bring them to me.
Find the chalk and take it to Kumud.
Find the duster and take it to the board.
Find Reva and take her to the window.
Find Hari and take him to the door.
Take this brick and throw it out of the room.
Take this paper and throw it out of the room.

২০

Get up from the carpet.
Get up from the bench and walk round the chair.
Get up from the chair and run out of the class.
Run out of the room.
Run out of the class.
Walk out of the room.
Walk out of the class.
Run out of the room and bring the brick.
Walk out of the class and bring the stick.
Walk out of the room and bring that stone.

২১

জল দিয়া—

Fill this cup.
Fill this jug.
Fill my cup.
Fill that bucket.
Fill the glass.
Fill this pot.
Fill this pan.
Fill this kettle.
Fill this jar.

Empty this cup.
Empty this jug.
Empty my cup.
Empty that bucket.
Empty the glass.
Empty this pot.
Empty this pan.
Empty this kettle.
Empty this jar.

২২

Hang this picture.
Hang this shirt.
Hang this string.

Hang this coat.
Hang this rope.
Hang the picture on the wall.

Hang the string on the chair.
Hang this garland on this chair.
Hang the garland round your neck.
Hang this thread round that picture.

২৩

Tell me your name.
Tell Jadu your name.
Tell Reva his name.

Tell him your name.
Tell her your name.
Tell me your father's name.

Tell me your brother's name.
Tell me your sister's name.
Tell him your mother's name.
Tell us your name.
Tell them your name.
Tell them his name.

২৪

Show me your head.
Show me your left ear.
Show me your left eye.
Show Hari your chin.
Show us your tongue.
Show us your nails.
Show us your shoes.
Show us your toes.
Show them your toes.
Show them your back.
Show us your back.
Show me your right ear.
Show me your eyes.
Show me your right eye.
Show the class your teeth.
Show us your fingers.
Show them your nail.
Show Abdul your nose.
Show them your left ear.
Show me your forehead.
Show them your right ear.
Show me the tree.
Show me the trunk, the leaves, the branches, the flowers, the bark.

২৫

Follow me.
Follow Kumud.
Follow us to the wall.
Follow us to the corner.
Follow him.
Follow your teacher.
Follow them to the table.
Follow them to the board.
Follow Ali out of the room.
Follow me out of this class.

২৬

Beat this tree with your stick.
Beat this tree with your left hand.
Beat this tree with your right hand.
Beat this tree with your fist.
Beat this table with your fist.
Beat that book with your pencil.
Beat this desk with your slate.
Beat this bush with your stick.

Beat that bush with my stick.
Beat this bush with this twig.
Beat this paper with your pen.
Beat the ground with your right foot.
Beat the ground with your stick.
Beat the leaves with your stick.
শিক্ষক মহাশয় এইখানে hit ক্রিয়াটি শিখাইবেন।

২৭

Shake your head.
Shake this duster.
Shake the pencil.
Shake that fountain pen.
Close your hand and shake your fist.
Take this duster and shake it.
Go out of the room and shake your chadar.
Take the bottle and shake it.
Bring the duster from the table and shake it.
Take that handkerchief and shake it.
Bring the umbrella and shake it.
Take the umbrella from Abdul and open it.
Take the map from the wall and roll it.

২৮

Push Hari. Push him.
Push this chair.
Push the table with your right hand.
Push the table with your back.
Push the chair to that corner.
Push the desk to your right side.
Push this bench to the wall.
Push that brick with your stick.
Push your book to your left.
Push Hari out of the room.
Push him out of the class.
শিক্ষক মহাশয় এইখানে move, pull, drag ক্রিয়াগুলি শিখাইবেন।

২৯

Touch your shoulders.
Touch Hari's right shoulder.
Touch his left shoulder.
Touch your neck. Touch your throat.
Touch his back. Touch your chest.
Touch your stomach.
Touch Hari's hand with a pencil.
Touch Kumud's right cheek with a pen.
Touch that plant with your right foot.
Touch this table with your thumb.
Touch the chair with your forefinger.
Touch the book-shelf with your middle finger.
Touch the flower with your third finger.
Touch the picture with your little finger.

৩০

Put this slate on your lap, on your right thigh, on your left thigh, on your right palm, on your left palm.
Put this handkerchief on your lap, on your right thigh, on your left thigh.
Put this leaf on your right palm, on your left palm.
Put your right hand on your left knee, your left hand on your right knee.
Put your right foot on the carpet.
Put your left foot on the bench.
Put both your feet on the carpet.

৩১

Put on the coat. Put off the coat.
Put on your chadar, cap, turban.
Put off your chadar, cap, turban.
Put on your slippers. Put off your slippers.
Put on his shoes. Put off his shoes.
Put on the mask. Put off the mask.
Bring his mask and put it on.
Take this coat and put it on.
Put off your coat and hang it on the wall.
Find your shoes and put them on.
Put off the coat and hang it on the chair.

৩২

Light the candle. Put out the candle.
Light the lamp. Put out the lamp.
Light that torch. Put out that torch.
Light this lantern. Put out this lantern.
Light the fire. Put out the fire.
Put the candle on the table and light it.
Light the lamp and lift it up.
Light this match-stick and put it out.
Put out the lamp and walk out of the room.
Light this twig, straw.

৩৩

Fill my cup with tea.
Fill the cup with water.
Fill this hole with sand.
Fill that hole with sand.
Fill this mug with sand.
Fill this inkpot with ink.
Fill this basket with vegetable.
Fill that basket with paper.
Fill the bag with rice.
Fill this pot with sugar.
Fill that vessel with salt.
Fill the bottle with water.
Take that mug and fill it with lentils.
Bring the basket and fill it with grass, straw, husks, wheat, tamarind seeds.
Fill your right hand with rose leaves.
Fill your left hand with mango leaves.

৩৪

Kick the ball.
Kick the rag.
Kick the ball with your right foot.
Kick the ball with your left foot.
Kick this wall with your right foot.

৩৫

Rub your head with this cloth, your face, your forehead, your right cheek, left cheek.

Rub your right hand with that towel, your right foot, your toes, your back, your neck, the back of your ears.

৩৬

Hold this ball. Let it drop. Hold his hand. Let it go. Let me look at your teeth. Shut the door. Open it. Let him pass. Lift this chair up. Let him take it down. Open the box. Let him close it. Hold the door open. Let Jadu shut it. Let him look at your tongue. Close your fist. Let Hari open it. Let Hari put on your chadar. Let me write on your slate. Let Ram touch your right hand. Let Hari touch your left hand. Let me touch your neck, your wrist, knee, your right ear, right palm, left palm.

৩৭

Take this marble. Take the slate from Ali. Put it into your pocket. Take it out of your pocket. Throw this marble down. Throw the marble up. Throw this marble over the bench, across the room, out of the room. Catch this marble. Drop the marble from your hand. Pick it up from the ground.

৩৮

Give me the book. Give him the pen. Give me his pencil. Give me your slate. Give Hari my pen. Give me Hari's pen. Give me my book. Give him his book. Give Hari's book to Hari. Give Hari's book to Kumud ইত্যাদি।

৩৯

Give me one marble, two marbles, দশ পর্যন্ত।

৪০

Give me a stick. Give me the short stick, long stick, thick stick, thin stick, wet stick, dry stick, broken stick.

Take back the short stick, the long stick ইত্যাদি।

Touch Hari with the short stick, the long stick ইত্যাদি।

Beat the wall with the short stick ইত্যাদি।

৪১

ছাত্রদিগকে বর্ণবৈচিত্র্য শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ে নানা বর্ণের ফুল, রেশম, কাগজ প্রভৃতি রাখা আবশ্যক।

Pick up the white thread, the black, the red, the yellow, the green, the blue, the orange, the violet.

Put back the white thread, the black, etc.

Pick up the purple thread, the brown, the indigo, the pink, the mauve, the golden.

Put back the purple thread, the brown etc.

৪২

Show me the blade of this knife, the handle of that knife. Touch the arms of this chair, the legs of this chair, the seat of this chair, the back of this chair. Rub the lid of this box, the bottom of this box. Rub the top of this table. Go to a corner of this room. Count the beams of this room.

৪৩

Put the small marble into your pocket, my pocket, his pocket, Hari's pocket, &c.

Take out the small marble from your pocket, my pocket, &c. Put the big marble into your pocket, my pocket, &c. Take out the big marble, &c. Put a white ball on the table. Take a red ball from the table. Put a blue ball on the table. Take the blue ball from the table. Take a square block from the table. Put back this square block on the table

৪৪

Come to me with Hamid. Come to me with Kumud, &c. Go to the tree with Hari, &c. Come back to me with your books. Come to this table with your slate. Go to Ali with my book, &c.

৪৫

শিক্ষক বোর্ডে ভিন্ন ভিন্ন আকারের রেখা আঁকিয়া দিয়া পরে আদেশ করিবেন—

Draw a straight line on the blackboard, a crooked line, a slanting line, a curved line, a dot, a circle, a square, a triangle.

Rub out the straight line, &c.

৪৬

Hold this brick. Drop it. Pick it up. Throw it away. Bring it back. Give it to Kumud. Take it back from him. Put it on the table. Keep it under the table. Hold it above your head. Keep it between your feet. Press it with your right hand, left hand. Tread on it with your right foot, left foot. Kick it with your left foot, right foot. Beat it with this stick.

৪৭

Hold this ball. Drop it. Roll it on the ground. Catch it. Throw it up into the air. Bring it to me. Press it with both hands. Wash it with water. Wipe it with a duster. Pass it on to Kumud. You pass it on to Hari, &c. Bring it back to me. Keep it on the table.

৪৮

Hold this string. Tie it round this post. Pull it. Untie the string. Make a knot in it. Bring a knife. Cut this string into two pieces. (Up to ten)

৪৯

Lean against this tree. Shake that branch. Pluck a leaf from the branch. Tear the leaf into two pieces. Break off a twig from the branch. Break it into three pieces. Chew this leaf. Spit it out. Climb upon the tree. Come down. Jump down.

৫০

Dip your fingers into this water. Take your fingers out of the water. Wipe your fingers with this napkin. Put your feet into this tub. Take your right foot out of the tub. Rub your right foot with a towel. Take your left foot out of the tub. Rub your left foot with the towel. Dip your slate into this water. Take your slate out of the water. Wipe the slate with a duster or cloth.

—এইরূপে নানা দ্রব্য।

৫১

Come into the class. Bow to your teacher. Lay your mat. Sit on it. Open your book. Shut your book. Come here. Take the chalk from the table. Write

'A' on the blackboard. Write 'B' on the blackboard, &c. Rub out 'A'. Rub out 'B'. Take up your books. Stand in a row. March out of your class.

৫২

(Bath) Take up your mug. Dip it into the tub. Pour water on your head, shoulders, chest, back. Rub your face with soap, rub your arms with it—your chest. Wash your body with water. Wipe your head with a towel, your face, &c. Put on clean clothes. Comb your hair. Brush your hair. Wring the wet cloth. Hang it on the rope to dry.

৫৩

Sit down to eat. Wash your right hand. Pour your *dal* on the rice. Mix them together. Eat slowly. Take some curry with the rice. Squeeze a piece of lemon over it. Put a pinch of salt into it. Eat. Drink your milk. Drink a little water. Get up. Come out. Wash your hands. Rinse your mouth. Wipe your hands and mouth.

৫৪

Open your purse. Take out a rupee. Buy your ticket. Put it into your purse. Take up your bag. Get into the carriage. Take your seat. Show your ticket. Put it back into your purse. Get down at the station. Take out your bag. Give up your ticket. Go out into the street. Get into a cart. Get down from the cart. Take out your purse. Pay your cart hire. Put back your purse into your pocket.

৫৫

Take the kettle. Bring some water. Put the water in the kettle. Put the kettle on the stove. Bring the teapot. Wash the inside with hot water. Take some tea leaves and put them in the teapot. Take down the kettle. Fill the teapot with boiling water. Close the lid. Bring the cup. Take some milk and put it in the cup. Fill the cup with tea. Mix some sugar. Let him drink.

দ্বিতীয় ভাগ

কথাবার্তা

ক্লাসের কোনো বালককে দেখাইয়া—Who is this boy? একটি সম্পূর্ণ বাক্য বলাইয়া উত্তর লইতে হইবে। যথা—This boy is Hari.

এইরূপ ক্লাসের প্রত্যেক ছেলে সম্বন্ধে প্রত্যেককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তর অভ্যাস হইলে জিজ্ঞাসা করিবে—What is the name of this boy? উত্তর—This boy's name is Hari. এইরূপে অনেকগুলি প্রশ্ন করিবে।

প্রথমে একজনের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী বালক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে—Who is the next boy? উত্তর—The next boy is Ram. এইরূপে পরে পরে সকলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। মাঝে মাঝে প্রশ্নের রূপ পরিবর্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—What is the name of the next boy?

What is your name? What is my name?

কাহাকেও দেখাইয়া—What is his name?

Is Hari in this room? —in this class?—on this bench?

যে বালক ঘরে নাই তাহার সম্বন্ধে—Is Ali in this room? (No, sir, Ali is not in this room.) এইরূপে, in this chair, on this bench ইত্যাদি। প্রশ্নের রূপান্তর করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—Where is Hari?

উত্তর—Hari is in this room.

বই দেখাইয়া—What is this? (উত্তর--This is a book) একে একে ঘরের নানা জিনিস দেখাইয়া উত্তর লইবে। টেবিলের উপর বই রাখিয়া—Where is the book? (বেঞ্চের উপর, মেজের উপর, চৌকির উপর রাখিয়া যথোচিত উত্তর লইবে। পরে বেঞ্চের নীচে, মেঝের নীচে, চৌকির নীচে, টেবিলের নীচে, বই রাখিয়া উত্তর লইতে হইবে, যথা—The book is under the bench ইত্যাদি)। Whose book is this? একে একে ভিন্ন ভিন্ন বালকের বই লইয়া প্রশ্ন করিবে। What is the name of this book? (The name of this book is 'ইংরাজি সোপান'—ইত্যাদি)। এইরূপ, ভিন্ন ভিন্ন বালকের শ্লেট, পেন্সিল, কলম প্রভৃতি লইয়া সেগুলি কাহার জিজ্ঞাসা করিবে।

দেওয়াল স্পর্শ করিয়া—What is this? উত্তর—This is the wall. দরজা, জানলা, মেজে, ছাদ (ceiling), কড়ি, বরগা দেখাইয়া উত্তর লইবে। এইরূপে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া উত্তর লইবে। গুঁড়ি, ডাল, পাতা, ফুল, ছাল প্রভৃতি গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখাইয়া উত্তর লইবে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের জিনিস দেখাইয়া উত্তর লইবে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের জিনিস দেখাইয়া—What colour is this?

একজন বালকের প্রতি—Hari, stand on this bench.

সে দাঁড়াইলে অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে—

Who stands on this bench? (এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র সম্বন্ধে) Who stands on this chair? Who stands near the table, the door, the bench? &c. Who stands

before me, behind me, on my right side, on my left side? Who stands before Hari? &c.

Who sits on this bench, chair, floor? &c. Who sits before me? &c. Who lies there on carpet, bench, table? &c.

Who touches me? Who touches Hari? (এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র সম্বন্ধে) Who takes my pen? Who takes Hari's pen? &c. Who wipes my slate? Who wipes Hari's slate? &c. Who smells this flower, this leaf? &c. Who tears this leaf? &c. Who gives the book to Hari? ইত্যাদি।

Hari, put this marble into my pocket. Who puts a marble into my pocket?

Hari, take out of the marble from my pocket. Who takes out the marble from my pocket?

—এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে লইয়া।

Hari, bring a square block from the table. Who brings a square block from the table? Hari, bring a round block from the table. Madhu, put back the square block on the table, &c.

Abdul, draw a straight line on the board. Who draws a straight line on the board? এইরূপে crooked line, slanting line, curved line, dot, circle, square, triangle আঁকাইয়া লইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

Jadu, rub out the straight line from the board. Who rubs out the straight line from the board? &c.

এইরূপে এই বহির ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ পাঠ'কে প্রশ্নোত্তরে পরিণত করিয়া অভ্যাস করাইতে হইবে।

Come here, Kumud. কুমুদ আসিলে—

প্র। Have you come here?

উ। Yes, I have come here. —এইরূপ প্রত্যেককে।

You sit here.

প্র। Have you sat here?

উ। Yes, I have sat here. —প্রত্যেককে।

You stand there.

প্র। Have you stood there?

উ। Yes, I have stood there. —প্রত্যেককে।

You go there.

প্র। Have you gone there?

উ। Yes, I have gone there. —প্রত্যেককে।

Run here.

প্র। Have you run here?
উ। Yes, I have run here. —প্রত্যেককে।

Kneel here.

প্র। Have you knelt here?
উ। Yes, I have knelt here. —প্রত্যেককে।

Lie down.

প্র। Have you lain down?
উ। Yes, I have lain down. —প্রত্যেককে।

Get up.

প্র। Have you got up?
উ। Yes, I have got up. —প্রত্যেককে।

You all come here.

প্র। Have you all come here?
উ। Yes, we have all come here.
প্র। Has Kumud come here?
উ। Yes, Kumud has come here. —এইরূপে প্রত্যেকের সম্বন্ধে।
প্র। Have I come here?
উ। Yes, sir, you have come here.

Sit down. (সকলকে)

প্র। Have you all sat down?
উ। Yes, we have all sat down.
প্র। Has Kumud sat down?
উ। Yes, Kumud has sat down. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে।
প্র। Have I sat down?
উ। Yes, sir, you have sat down.
প্র। Now, are you sitting?
উ। Yes, we are sitting.
প্র। Is Kumud sitting?
উ। Yes, Kumud is sitting. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। Am I sitting?
উ। Yes, sir, you are sitting. —প্রত্যেককে।

You all stand here.

প্র। Have you all stood here?
উ। Yes, we have all stood here.
প্র। Has Kumud stood here?
উ। Yes, Kumud has stood here. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে।
প্র। Have I stood here?
উ। Yes, sir, you have stood here. —প্রত্যেককে।

Kneel down.

প্র। Have you all knelt down?
উ। Yes, we have all knelt down.
প্র। Has Kumud knelt down?
উ। Yes, Kumud has knelt down. —প্রত্যেকের সম্বন্ধে।
প্র। Have I knelt down?
উ। Yes, sir, you have knelt down.
প্র। Are you kneeling now?
উ। Yes, we are kneeling now.
প্র। Is Kumud kneeling now?
উ। Yes, Kumud is kneeling now.
প্র। Am I kneeling now?
উ। Yes, sir, you are kneeling now.

Go there. Come back.

প্র। Did you go there?
উ। Yes, I went there.
প্র। Have you come back?
উ। Yes, I have come back.
প্র। What are you doing now? Are you standing?
উ। Yes, I am standing.
প্র। Are you walking?
উ। No, I am not walking, I am standing.

প্রত্যেককে এবং দল বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে—

Sit down. Get up.

প্র। Did you sit down? উ। Yes, I sat down.
প্র। Have you got up? উ। Yes, I have got up.
প্র। What are you doing now? Are you running?
উ। We are not running, we are standing.

Run. *Stop.*

প্র। Did you run? উ। Yes, I ran.

প্র। Have you stopped? উ। Yes, I have stopped.

প্র। What are you doing now? Are you sitting?

উ। No, I am not sitting, I am standing.

প্রত্যেককে ও দল বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলকে—

Come here. Kneel down.

প্র। Did you come here? উ। Yes, I came here.

প্র। Have you knelt down? উ। Yes, I have knelt down.

প্র। What are you doing now? Are you lying?

উ। No, we are not lying, we are kneeling.

প্রত্যেককে ও দলকে—

Lie down. Sit up.

প্র। Did you lie down? উ। Yes, I lay down.

প্র। Have you sat up? উ। Yes, I have sat up.

প্র। What are you doing now? Are you standing?

—প্রত্যেককে ও দলকে।

উ। No, I am not standing. I am sitting.

Get up.

প্র। Did you sit here? উ। Yes, I sat here.

প্র। Have you got up? উ। Yes, I have got up.

প্র। What are you doing now? Are you sitting?

উ। No, I am not sitting, I am standing.

Walk.

প্র। What are you doing? উ। I am walking.

Stop.

প্র। What have you done? উ। I have stopped.

প্র। What were you doing? উ। I was walking.

প্র। Were you sitting?

উ। No, I was not sitting, I was walking.

—প্রত্যেককে।

Walk. (সকলকে)

প্র। What are you doing? উ। We are walking.

প্র। Is Satya walking? উ। Yes, Satya is walking.

—এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য কোনো ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে।

প্র। Am I walking?
উ। Yes, sir, you are walking.

—প্রত্যেককে।

প্র। Is Kumud standing?
উ। No, he is not standing, he is walking.

Stop.

প্র। What have you done? উ। We have stopped.
প্র। What were you doing? উ। We were walking.
প্র। What was Kumud doing? উ। Kumud was walking.

—এইরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে অন্য ছাত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে।

প্র। What was I doing? উ। You were walking, sir.

—এই প্রশ্ন প্রত্যেক ছাত্রকে।

প্র। What have I done? উ। You have stopped, sir.
প্র। Was Kumud sitting?
উ। No. Kumud was not sitting, he was walking.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

Sit here.

প্র। What are you doing? উ। I am sitting here.

Lie down.

প্র। What have you done? উ। I have lain down.
প্র। What were you doing? উ। I was sitting.

—প্রত্যেককে।

Sit here. (সকলকে)

প্র। What are you doing? উ। We are sitting here.
প্র। Is Kumud sitting? উ। Yes, Kumud is sitting.

—এইরূপ প্রত্যেককে অন্যের সম্বন্ধে।

প্র। Am I sitting? উ। Yes, you are sitting, sir.

—প্রত্যেককে।

প্র। Is Kumud walking?
উ। No, Kumud is not walking, he is sitting.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

Lie down. (সকলকে)

প্র। What have you done? উ। We have lain down.
প্র। What has Kumud done? উ। He has lain down.

—এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। Has Satya sat up?
উ। No, Satya has not sat up, he has lain down.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। What were you doing? উ। We were sitting.
প্র। What was Kumud doing? উ। Kumud was sitting.
প্র। Were you lying?
উ। No, we were not lying, we were sitting.

—এইরূপ প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। Was I lying?
উ। No, you were not lying, sir, you were sitting.

—প্রত্যেককে।

Stand here.

প্র। What are you doing? উ। I am standing here.

Sit down.

প্র। What have you done? উ। I have sat down.
প্র। What were you doing? উ। I was standing.

—প্রত্যেককে।

প্র। Was Kumud walking?
উ। No, Kumud was not walking, he was standing.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

Stand here. (সকলকে)

প্র। What are you doing? উ। We are standing.
প্র। Is Kumud standing? উ। Yes, Kumud is standing.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। Am I standing? উ। Yes, sir, you are standing.

—প্রত্যেককে।

প্র। Is Ali sitting?
উ। No, he is not sitting, he is standing.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

Sit down. (সকলকে)

প্র। What have you done? উ। We have sat down.
প্র। What has Kumud done? উ। Kumud has sat down.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। What have I done? উ। You have sat down, sir.

—প্রত্যেককে।

প্র। What were you doing? উ। We were standing.
প্র। What was Kumud doing? উ। Kumud was standing.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। Were you running?
উ। No, we were not running, we were standing.
প্র। Was Kumud running?
উ। No, Kumud was not running, he was standing.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। Was I running?
উ। No, you were not running, sir, you were standing.

—প্রত্যেককে।

Go there.

প্র। What are you doing? উ। I am going there.

Come back.

প্র। What have you done? উ। I have come back.
প্র। What were you doing? উ। I was going there.

—প্রত্যেককে।

Go there. (সকলকে)

প্র। What are you doing? উ। We are going there.
প্র। What is Kumud doing? উ। He is going there.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। What am I doing? উ। You are going there, sir.

Come back.

প্র। What have you done? উ। We have come back.
প্র। What has Kumud done? উ। He has come back.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। What have I done? উ। You have come back, sir.

—প্রত্যেককে।

প্র। What were you doing? উ। We were going there.
প্র। Was Kumud going? উ। Yes, Kumud was going.

—প্রত্যেকের সম্বন্ধে।

প্র। Was I going? উ। Yes, sir, you were going.

—প্রত্যেককে।

প্র। Were you lying down?
উ। No, we were not lying down, we were going there.
Take this book. Put it on the table.
Did you take this book?
Yes, I took this book.
Have you put it on the table?
Yes, I have put it on the table.

এইরূপে শ্লেট, পেন্সিল ও অন্যান্য পদার্থ লইয়া—

Bring that slate. Give it to me. Did you bring that slate? Have you given it to me?

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য লইয়া—

Lift up this brick. Put it down. Did you lift up this brick? Have you put it down?

অন্যান্য দৃষ্টান্ত—

Open the book. Shut the book. Did you open the book? Have you shut the book?

—এইরূপে বাক্স, দরজা ও চোখ মুখ সম্বন্ধে।

Give me the book. Take it back. Did you give me the book? Have you taken it back?

—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে।

Throw the ball up. Catch it. Did you throw the ball up? Have you caught it?

—অন্যান্য দ্রব্য লইয়া।

Draw a straight line on the board. Rub it out. Did you draw a straight line on the board? Have you rubbed it out?

—এইরূপ crooked line, curved line,
circle, dot প্রভৃতি সম্বন্ধে।

Hold this ball. Drop it. Did you hold this ball? Have you dropped it? ইত্যাদি।

Wash the slate. Wipe it. Did you wash the slate? Have you wiped it? ইত্যাদি।

Put a pencil into my pocket. Take it out. Did you put a pencil into my pocket? Have you taken it out? ইত্যাদি।

Touch this tree. What are you doing? What are you touching? Take away your hand.

Are you touching the tree now? Did you touch the tree? ইত্যাদি।

Shake this branch. What are you doing? What are you shaking? Come away.

Are you shaking the branch? Did you shake the branch? ইত্যাদি।

Hold this book. What are you doing? What are you holding? Put it down. Are you holding the book? Did you hold the book? ইত্যাদি।

Who is this?
Who is that?
Who is here?

Who is there?
Who is he?
Who is she?
Who is that boy?
Who is that girl?
Who is Ali? This boy is Ali.
Who is Jadu? This boy is Jadu, etc.
Who are you?

—একে একে সকলকে।

Who are they?
Who am I?

Where is Jadu? Jadu is here.
Where is Madhu? Madhu is there.
Where is Mani? Mani is in the corner.

Where is my pen, your book, Jadu's pencil, Madhu's marble, Abani's father, your brother, sister, your room, Madhu's home?

What is your name? My name is Madhu.
What is your age? My age is ten.
What is this? This is a slate.
What is that? That is a book.
What is here? It is a chair.
What is there? That is a board.

What is there on the table? It is a pen. (There is a pen on the table.) What is there in your pocket? It is a marble. (There is a marble in my pocket.) What is there in the ink-pot? There is ink in the ink-pot. What is there on this page? There is a picture on this page. What is there on your head? There is a cap on my head. What is there in this cup? There is milk in this cup. What is there in my hand? There is a rupee in your hand. What is there in Jadu's hand, Madhu's hand, Bipin's hand, Indu's hand? etc.

What is there in this envelope? There is a letter in the envelope.

What is there on the floor?

What is there near the door, under the table, on this chair, on that tree, under that tree, near that tree, behind that house, before the class?

Whose book is this? It is Hari's book. Whose pen is that? That is Madhu's pen. Whose book is there? Pen, pencil, picture, photograph? etc. Whose letter is here? ইত্যাদি।

Which is your book, pen, pencil? etc.
Which is Jadu's book, pen, pencil? etc.

Which is Madhu's room? Which is my knife? Which is your seat? Which is Hari's place? Which is our teacher's house?

When do you get up? In the morning?

When do you take your bath? In the morning, at noon? etc.

When do you take your breakfast?

When do you go to school?

When do you play? In the afternoon, in the evening?

When do you take your lessons?

When does Madhu get up?

When does Madhu take his breakfast? বিপিন, হরি ইত্যাদি।

When do they play?

When do you come back from the school? At noon, in the afternoon, in the evening?

When do you go to sleep? At night?

When does the sun rise? When does it set?

When do we see the moon?

When do we see the stars?

শিক্ষক মহাশয় এই প্রশ্নোত্তরে নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিখাইবেন। morning, noon, afternoon, evening, night, to-day, to-night, sunrise, sunset.

How are you? I am quite well, very well.

How is your brother? He is ill, not very well, etc.

How is Madhu, Jadu? etc.

How old is Bipin? Bipin is seven years old.

How old are you? I am ten years old.

How do you feel? Do you feel hot, cold, sleepy, lazy, fresh, angry, afraid, hungry, thirsty?

How many are you?

How many are they?

How many boys are there in the class, in the school, in the family?

How many girls are there in the class, in the school, in the family?

How many marbles (trees, bricks, windows, doors, teachers) are there?

How heavy is this? It is ten seers.

How heavy are you? I am about one maund.

How tall are you? I am about four feet.

How tall is Jadu? Jadu is about four feet and six inches.

How tall are you?—প্রত্যেককে।

How tall is Ram, Jadu, Hari? etc.

How strong are you? Can you lift this chair, this table? etc.

Do you like sweets?

Do you like milk?

Do you like honey?

Do you like the school?

Do you like your sister, your brother, your cousin?

Do you like dogs, cats, cows, other animals?
Do you like me?
Do you like him?
Do you like castor oil?
Do you like quinine?
Do you like to read?
Do you like to walk far?
Do you like to get up early?
Do you like to quarrel?
Do you like meat, fish, vegetables (potato, cabbage, cauliflower, etc.)?
Do you like to talk?
Do you like winter, spring, summer, rains?

Can you read?
Can you write?
Can you speak English?
Can you lift this chair, this table, this weight? etc.
Can you swim?
Can you ride?
Can you play football, cricket? etc.
Can you climb this tree?
Can you write your name?
Can you write your name on the slate?
Can you write your name in English on the black-board?
Can you ride a cycle?
Can you sing?
Can you sew?
Can you carry Indu, Madhu? etc.

Do you know him?
Do you know the boy?
Do you know the girl?
Do you know this flower?
Do you know how to sing?

Do you know the name of your school, your village, your town, your district, your country?

Do you know your father's name, brother's name, sister's name, teacher's name?

Do you walk to your school?

Do you know iron, copper, silver, brass, gold?

Where do you go? To your school, to the station, to the class, to the house? etc.

Where do they go? To the village, to the market, to the station? etc.

What are you doing? Reading, writing, playing, drawing?

What is Hari doing? Madhu, Bipin?

Where is he going? Hari, Jadu, Madhu? etc.

Where is your brother? In the house, in the shop?

Will you go there?
Will you come here?
Will you stand up?
Will you sit down?
Will you go to the gate?
When will you go home?
When will you go to your aunt's house?
When will you come to my house?
When will you go to your mother?
When will you go for picnic?
When will you go to play?
When will you take your bath?
Will you come with me in the afternoon?
Will you come with me to the market?
Will you come with me to the station?
Will you go with Jadu to his house, with Hari? etc.
Will you come here tomorrow, next Monday, Tuesday? etc.
Will you go to the town next week, next month, next year?

শিক্ষক মহাশয় এইখানে নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিখাইবেন, this morning, yesterday, day before yesterday, last week, last month, last year, last Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

How did you come here? Was it on foot, on cycle? etc.

How did you go to the station? Was it on foot, on cycle, in a carriage, a car?

How did you come into this room? Was it by this door, that door, this window, that window?

How did Hamid cross the river? By swimming, in a boat, in a steamer?

How did you carry the brick? In your right hand, left hand, right shoulder? etc.

How did you get this book? From your father, from the shop, from the library?

How did you like the feast? Very much, not much, not at all?

When did you go to the station? In the morning, at noon, in the afternoon, evening, at night?

Where did you go in the morning? To the school, to the river, to your friend?

When did Jadu come here? Yesterday, day before yesterday, on last Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday?

এই জিনিসগুলি শিক্ষক মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। ছাত্রগণ ঘ্রাণ-দ্বারা প্রত্যেকটিকে চিনিতে চেষ্টা করিবে।

Smell it and tell me what it is.

Clove—লবঙ্গ
camphor—কর্পূর
cinnamon—দারুচিনি
rose—গোলাপ
jasmine—জুঁই
sandal wood—চন্দন
lemon leaves—লেবুপাতা
cardamom—এলাচ
gardenia—গন্ধরাজ
lotus—পদ্ম
mint—পুদিনা
chilly—লঙ্কা
marigold—গাঁদা
oleander—করবী

প্রয়োজন : এক, দুই, তিন হইতে বার ইঞ্চি পর্যন্ত মাপের বারটি কাঠি এবং এক, দুই, তিন হইতে ছয় ফুট মাপের ছয়টি কাঠি। শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের এইরূপে আদেশ করিবেন—

Find or pick up the three-inch stick.
Pick up a longer stick.
Pick up a shorter stick.
Pick up the longest, the shortest ইত্যাদি।

ছাত্রদের শ্রেণীবন্ধভাবে দাঁড় করাইয়া—

Who is the tallest? Find the shortest.
Who is shorter than four feet?
Who is taller than Jadu?
Who are shorter than Ram?
How tall is he, is Jadu? ইত্যাদি।
How stout, thin, fair, dark? ইত্যাদি।

দ্রব্যপরিচয় (চোখ দিয়া)—

What is this? Lentils, peas, rice, husks, wheat, mustard, barley, carrot, turnip, radish, potato, leaves of mango, lemon, rose, bamboo etc.

অনুবাদচর্চা

প্রকাশ : ১৯১৭

ভূমিকা

এই অনুবাদচর্চা বইখানিতে বিবিধ-বিষয়-ঘটিত বিবিধ ইংরেজি রচনারীতির বাক্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে নানা রকমের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ছাত্রদের যেন পরিচয় ঘটে। আমার বিশ্বাস যদি যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অন্তত দুই বৎসর কাল এই অনুবাদ প্রত্যনুবাদের পন্থা ধরে ভাষাব্যবহারের অভ্যাস ঘটানো যায় তা হলে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই দখল জন্মানো সহজ হবে।

দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কথায় কথায় অনুবাদ চলতেই পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশের প্রথা স্বতন্ত্র এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের অবিকল মিল পাওয়া অসম্ভব, এই কথাটি তর্জমা করতে গিয়ে যতই আমাদের কাছে ধরা পড়ে ততই উভয় ভাষার প্রকৃতি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই জন্যে অনুবাদের যোগে বিদেশী ভাষাশিক্ষার প্রণালীকে আমি প্রশস্ত বলে মনে করি।

প্রতিদিন ছোট একটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে চর্চাই যথেষ্ট। প্রথম দিন বাংলা থেকে ইংরেজি এবং পরদিন সেই ইংরেজি থেকেই বাংলা অনুবাদ করানো চাই। বলা বাহুল্য শিক্ষক যেন ক্লাসে প্রস্তুত হয়ে আসেন। ব্যাকরণের যে সকল বিশেষ নিয়ম ও বাক্য-প্রয়োগের যে সকল বিশেষ প্রথা সেদিনকার পাঠের পক্ষে আবশ্যক, প্রথমেই সেগুলি ছাত্রদের কাছে ভালো করে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। আরম্ভে একটি করে বাক্য নিয়ে শুরু করা ভালো। ছাত্রেরা ভুল করবে, কেন ভুল হল সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়া চাই। ভুল সংশোধন হলে তার পরে মূল বাক্যটির আদর্শ তাদের কাছে ধরে দিতে হবে। সেটি তারা খাতায় লিখে রাখবে এবং সেই খাতার লেখা থেকেই পরের দিন প্রত্যনুবাদ করবে (ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদচর্চার বই ছাত্রদের হাতে থাকলে উদ্দেশ্য সফল হবে না)। এমনি করে ধীরে ধীরে চালনা করে নিলে কঠিন বাক্যও ছাত্রদের কাছে সহজ হয়ে আসবে।

পাঠের দৃষ্টান্ত

'বহুকাল পূর্বে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীলনদীর জলে স্নান করিতেছিল; এমন সময় হঠাৎ একটি ঈগল আকাশ হইতে দ্রুত নামিয়া তাহার ছোটো চটি জুতাজোড়ার এক পাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া উড়িয়া গেল।'

এই বাক্যটির যে সকল শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ছাত্রদের জানা নেই, তা বুঝিয়ে দিয়ে, বোর্ডে লিখে দেওয়া যাক, ছাত্রেরা সেগুলি তাদের নোট বইয়ে টুকে নিক। ছোঁ মারবার জন্যে চিল প্রভৃতি পাখি উপর থেকে দ্রুত নেমে আসে, তাকে ইংরেজিতে বলে to swoop down। ছিনিয়ে তুলে নেওয়াকে বলে to snatch up। Take up এবং snatch up শব্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত চটি জুতোর ইংরেজি slippers, কিন্তু প্রাচীন গ্রীস প্রভৃতি দেশে যে জুতো প্রচলিত ছিল সেই রকমের কাটা কাটা চামড়ার জুতো আমাদের দেশেও আজকাল ব্যবহার হচ্ছে, তাকে বলে sandals। শিক্ষকরা মনে রাখবেন ইংরেজি প্রতিশব্দগুলি বলে দেবার পূর্বে প্রশ্ন করে জানা চাই ছাত্রেরা জানে কিনা।

মনে করা যাক নিম্নলিখিতরূপে ছাত্রেরা তর্জমা করেছে—

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis, with her companions, was bathing in the water of the Nile river; at that time an eagle swooping down from the sky snatching up one of a pair of small sandals flew away over the desert.

বাক্য-রচনায় ইংরেজির সঙ্গে বাংলার প্রভেদ এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ (Adjective Clause)* বাংলায় কর্তৃপদের পূর্বে বসে; ইংরেজিতে বিশেষণ-সমেত কর্তৃপদ প্রথমে আসে, তার পরে adjective clause।

বাংলায় আছে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে নীল নদীর জলে স্নান করিতেছিল। এখানে সুন্দরী বালিকা কর্তৃপদ। 'Rhodopis নামে' তার পূর্বে বসেছে, কিন্তু ইংরেজিতে বসে পরে। A beautiful girl named Rhodopis সমস্তটা মিলে কর্তা। ইংরেজিতে কর্তার অব্যবহিত পরেই কখনো বা পূর্বে সাধারণত ক্রিয়াপদ বসে। বাংলায় ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অধিকাংশ স্থলেই বাক্যের শেষে, এখানেও তাই। অতএব ইংরেজিতে 'স্নান করিতেছিল' ক্রিয়াপদ কর্তার অব্যবহিত পরেই বসবে। তা হলে হবে A beautiful girl named Rhodopis was bathing। বহুকাল পূর্বে, Long ago, ক্রিয়ার বিশেষণ বাংলায় যেমন ইংরেজিতেও তেমনি বাক্যের আরম্ভেই। Long ago, a beautiful girl, named Rhodopis was bathing। বাংলায় জল শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ নেই— আমরা জলগুলি কখনোই বলি নে, ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও জল শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ হতে পারে, এখানে তাই হয়েছে।

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis was bathing in the waters of the Nile। River শব্দ না দিলে ভালোই হয়। ইংরেজিতে সমস্ত বাক্যটি এক, অতএব at that time না ব্যবহার করে 'when' বললে বাক্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে না। বাংলায় একসঙ্গে পরে পরে দুই বা ততোধিক অসমাপিকা ক্রিয়া বসানো চলে, ইংরেজিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্য ভালো শোনায় না। এখানে মূলে একটাও অসমাপিকা ক্রিয়া নেই। নীচে সমগ্র বাক্যটি উদ্ধৃত করা গেল— ছাত্রেরা নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুক, যেখানে অনৈক্য সেখানে কী দোষ ঘটেছে বুঝিয়ে দেওয়া হোক।

Long ago, a beautiful girl named Rhodopis was bathing in the waters of the Nile, when suddenly an eagle swooped down, snatched up one of her tiny sandals and flew away with it over the desert. বাংলায় এই with it নেই, ইংরেজিতে যদিচ আছে তবু না থাকলেও চলত।

মেয়েটি মনের খেদে বলিয়া উঠিল, 'মাগো, আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!' মূলে 'মনের খেদে' শব্দের ইংরেজি আছে 'in dismay'— বলে দেবার আগে ছাত্রদের ভাবতে দেওয়া ভালো। যদি ইংরেজিতে কিছু দখল থাকে তবে হয়তো তারা বলবে 'with painful heart' বা 'with anxious mind', বা 'in misery'। এগুলোও অশুদ্ধ নয়। কিন্তু মূলে যে শব্দটি আছে সেটা জানিয়ে দেওয়া যাক। 'মাগো' বাক্যোচ্ছ্বাসের ইংরেজি 'O dear' এটা ছাত্রেরা সম্ভবত অনুমান করতে পারবে না। 'আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!' হয়তো কোনো ছাত্র এর তর্জমা করতে পারে 'I do not know what will my stepmother say'। এই তর্জমায় দোষ নেই

* সংস্কৃতে এর কোনো পরিভাষা আছে কিনা জানি নে।

সে কথা স্বীকার করে নেওয়া যাক। হয়তো কোনো ছাত্র সমস্তটার এই রকম তর্জমা করবে—

The girl cried in dismay, 'O dear, I do not know what will my stepmother say!' অশুদ্ধ হয় নি কিন্তু মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ভালো। 'Oh dear,' she cried in dismay, 'what will my stepmother say!' যে ব্যক্তি কথা বলছে, তার উক্তিকে বিভক্ত করে সেই ব্যক্তির উল্লেখ ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত রীতি। এখানে তাই হয়েছে। ইংরেজিতে he পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে হয় she, বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ 'তিনি' নেই সেইজন্যে বাংলায় লিখতে হল সেই মেয়েটি। ইংরেজিতে তার বদলে 'she' বলেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত রুষ্টমুখে তাহার বিমাতা স্বয়ং সেইখানে আসিলেন।'

'সেই মুহূর্তেই' যেমন বাংলায় তেমনি ইংরেজিতেও বাক্যের আরম্ভে। At that moment। কিন্তু এই বাক্যাংশটা পরে দিলেও ক্ষতি হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে ইংরেজিতে কর্তৃপদ আগে, তার পরে তৎসম্পর্কীয় adjective clause—এই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কখনও অন্যথা হয় না তা নয়। তা ছাড়া এ কথাও ছাত্রেরা জানে যে, কর্তৃপদের অব্যবহিত পরে বা পূর্বে ক্রিয়া বসে। মূলে এখানে ক্রিয়াপদ কর্তার পূর্বে বসেছে। বলা বাহুল্য বিমাতা কর্তা। সম্ভবত ছাত্রেরা তর্জমা করবে 'At that moment came the stepmother with very angry face'। এখানে এই বাক্যটির সঙ্গে ছাত্রেরা মূল বাক্যের তুলনা করে দেখুক ও মূল বাক্যটি খাতায় তুলে নিক।

'তিনি বলিলেন, চলিয়া এসো। তুমি Hui কুম্ভকারের কাছ হইতে যে কলসী কিনিয়াছিলে সেটা ফাটা; রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে।'

কলসী—jar। কুম্ভকার—potter। ছাত্রদের পূর্বেই বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষার রীতি অনুসারে কথোপকথনে কথকের উক্তিকে ভাগ করে তার মধ্যে কথকের উল্লেখ থাকে। এখানেও সেই নিয়ম মানতে হবে। ছাত্রেরা নিজ নিজ চেষ্টায় তর্জমা শেষ করলে মূল ইংরেজি বাক্যটি তাদের সম্মুখে ধরতে হবে। 'Come along,' she said, 'that jar you bought from Hui the potter was cracked, and we must go and complain to the king.'। তর্ক উঠতে পারে যে, যদিও that jar শব্দটি কর্তৃপদ তবু ক্রিয়াপদ was cracked কেন তার সঙ্গে সংলগ্ন রইল না? জানা উচিত 'that jar you bought from Hui the potter' সমস্তটা মিলে এখানে কর্তা। বাংলায় আছে, 'রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে।' অবিকল তর্জমা করতে গেলে হত—'we must go to complain to the king', তাতেও দোষ হত না। কিন্তু মূলে যেটা আছে ইংরেজি মতে সেটাই কানে শোনায় ভালো। একটা কথা ছাত্রদের মনে রাখা দরকার—The jar was cracked and we must complain to the king—এখানে বাংলা ভাষায় এই 'and' শব্দের সার্থকতা নেই তাই 'এবং' 'ও' কিংবা 'আর' শব্দ দিয়ে ঐ and-এর তর্জমা বাংলায় চলবে না। যে দুই বিশেষণ বা ক্রিয়া সমজাতীয়, বাংলায় তাদেরকেই 'এবং' প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা জোড়া যায়, যেমন, কলসীটা ফুটো এবং দাগী; কিংবা আমি কাজ করি এবং গান গাই। কিন্তু কলসীটা ফুটো এবং আমি নালিশ করব, এ ইংরেজিতে হয় বাংলায় হয় না। আমি আপিসে যাব এবং আমার স্ত্রী যেন রাঁধে, এ বাংলা নয়, অথচ ইংরেজিতে বাধবে না যদি বলা যায়: I shall go to the office and my wife must cook.

'ঈজিপ্টের মহারাজ সে সময় মেম্ফিস্-নামক প্রাচীন নগরে তাঁহার দরবার করিতেছিলেন এবং সেখানে সকলেই বড়ো আমোদে ছিল, কারণ রাজা তখন যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন।'

দরবার করা—holding court। আমোদে থাকা—to be gay।

ছাত্রদের অনুবাদ শেষ হলে পর মূল ইংরেজি বাক্যটি তাদের সামনে রেখে বিচার করতে হবে। The great king of Egypt was at that time holding his court in the ancient city of Memphis, and all were very gay; for the king had just come back from war.

Was holding যদিও দুই শব্দে মিলিত একটি ইংরেজি ক্রিয়াপদ তবু তাকে বিভক্ত করে তার মাঝখানে কোনো বাক্যাংশ বসিয়ে দেওয়া চলে। এখানে আছে was at that time holding, তেমনি বলা যেতে পারত was when in the city of Memphis holding, কিংবা was after the war holding। এখানে কোনো একটি বিশেষ যুদ্ধের কথা নির্দেশ করা হয় নি, সাধারণভাবে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, এইজন্যে war শব্দের পূর্বে the বসে নি।

সুস্থির হয়ে বাস করা—settle down। শেষোক্ত ব্যক্তি—the latter।

ছাত্রদের অনুবাদের পরে মূল ইংরেজি বাক্যের আলোচনা : He was in his garden talking with an old priest, when the latter said, 'Now that the war is over, you can settle down and take a wife.'

পূর্বে যে প্রথার কথা বলেছি তদনুসারে was talking ক্রিয়াপদের মাঝখানে 'in his garden' বসেছে। ইচ্ছা করলে বলা যেতে পারত : He was with an old priest talking in his garden। কোনো এক বাক্যে যেখানে দুজন ব্যক্তির উল্লেখ থাকে সেখানে প্রথমোক্ত ব্যক্তি the former এবং শেষোক্ত ব্যক্তি the latter বলে নির্দিষ্ট হতে পারে। এখানে take a wife-এর পরিবর্তে marry বললে চলত। বাংলায় আছে 'সুস্থির হইয়া বিবাহ করিতে পারো'। 'সুস্থির হইয়া' শব্দকে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে যদি লেখা যেত 'you can settling down marry' অথবা 'you can marry settling down', ব্যাকরণবিরুদ্ধ হয় না, কিন্তু ভাষারীতি অনুসারে ভালো শোনায় না।

সবশেষে একটা কথা বলা আবশ্যক।

Long ago, a beautiful girl was bathing ইত্যাদি। এখানে 'long ago' শব্দ বাক্যের আরম্ভে বসেছে আর কোথাও বসতে পারে না। অথচ দেখা গেল at that time or at that moment বাক্যের অন্য অংশেও বসতে পারে। তার কারণ এই, long ago শব্দের দ্বারা ঘটনার মধ্যবর্তী কোনো একটি বিশেষ সময় সূচিত হচ্ছে না, সমস্ত গল্পটির গোড়াতেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এর সমস্ত ঘটনাই দীর্ঘকাল পূর্বে ঘটেছিল। কিন্তু at that time or moment গল্পের মধ্যকার একটা বিশেষ সময়কে জ্ঞাপন করছে, সমস্ত আখ্যানটির 'পরে তার অধিকার নেই।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আদর্শ অনুবাদের ইংরেজি বাক্যগুলি ছেলেরা তাদের খাতায় তুলে নেবে। আদর্শ পাবার আগে তারা নিজেরা যে রচনা করবে সেটা থাকবে খাতার এক পাতায় এবং আদর্শটা থাকবে আর এক পাতায়। প্রত্যনুবাদের দিনে ছেলেরা অপর একটি খাতা ব্যবহার করবে। সে খাতার এক পাতায় থাকবে তাদের স্বরচিত বাংলা, অপর পাতায় থাকবে আদর্শ। যে পাঠগুলি পূর্বনির্দিষ্ট প্রথায় অনুবাদ করা হয়েছে, পরীক্ষার জন্য মাসে একবার করে তার যে কোনো একটা সম্পূর্ণ

অনুবাদ করতে দেওয়া ভালো; তাতে শিক্ষক তাঁর কাজের ফল বিচার করবার সুযোগ পাবেন।

প্রথমে কিছুকাল চার-পাঁচটির বেশি বাক্য এগোবে না, ক্রমশই কাজ দ্রুত হতে থাকবে। ম্যাট্রিক ও তার নীচের তিনটি ক্লাসে এই নিয়মে অনুবাদ করালে ছাত্রদের উপকার হবে সন্দেহ নেই।

যে পর্যায়ে অনুবাদগুলি ছাপা হয়েছে তাই যে মানতে হবে তা নয়। শিক্ষকেরা আবশ্যক বুঝলে তার উলটো-পালটা করতে পারবেন।

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এই গ্রন্থে কোনো কোনো স্থলে নিশ্চয়ই ত্রুটি ঘটে থাকবে। ব্যবহার করবার কালে শিক্ষকদের যদি চোখে পড়ে এবং তাঁরা অসম্পূর্ণতা সংশোধন করে আমাদের জানান তবে কৃতজ্ঞ হব।

১

বহুকাল পূর্বে Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা তাহার সংগীদের সঙ্গে নীল নদের জলে স্নান করিতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ একটি ঈগল আকাশ হইতে দ্রুত নামিয়া তাহার ছোটো চটি জুতোজোড়ার একপাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া মরুভূমির উপর দিয়া উড়িয়া গেল। মেয়েটি মনের খেদে বলিয়া উঠিল, 'মাগো! আমার বিমাতা কী না জানি বলিবেন!' সেই মুহূর্তেই অত্যন্ত রুষ্টমুখে তাহার বিমাতা স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, 'চলিয়া এসো। তুমি দুই কুম্ভকারের কাছ হইতে যে কলসী কিনিয়াছিলে, সেটা ফাটা; রাজার কাছে নালিশ করিতে যাইতে হইবে।' ঈজিপ্টের মহারাজ সে সময়ে মেম্ফিস-নামক প্রাচীন নগরে তাঁহার দরবার করিতেছিলেন এবং সেখানে সকলেই বড়ো আমোদে ছিল, কারণ রাজা তখন যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাগানে একটি বৃদ্ধ পুরোহিতের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে শেষোক্ত ব্যক্তি কহিলেন, 'যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এবার তুমি সুস্থির হইয়া বিবাহ করিতে পারো।'

২

রাজা উত্তর করিলেন, 'আমার মতো একজন সাদাসিধা সৈনিক কী করিয়া যোগ্য কন্যা বাছিয়া লইবার আশা করিতে পারে? আহা, যদি দেবতা একটা কোনো নিদর্শন দিতেন!' ঠিক সেই সময়ে ঈগলটি আসিল এবং চটিজুতা রাজার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। ইহা তাঁহার প্রার্থনার উত্তর মনে করিয়া রাজা বলিলেন, 'আমি যদি সত্যই ফেরেয়ো (Pharaoh) হই, তবে যে কুমারী এই জুতাটি পরিতে পারে তাহাকে আমি বিবাহ করিব।' রাজদরবারের সকল মহিলা চেষ্টা করিল, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কেহই সফলকাম হইল না। যখন এই সম্মানের জন্য শেষ প্রার্থিনী হতাশ হইয়া চেষ্টা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক ভীড়ের মধ্য দিয়া ঠেলিয়া পথ করিয়া ভিতরে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গে একটি ছোটো বালিকা আসিল। অবশ্য তাহারাই রডোপিস এবং তাহার বিমাতা।

৩

রডোপিস বলিয়া উঠিল, 'কেন মা, ঐ তো আমার হারানো জুতা!' সভাসদের দল একেবারে নিঃশব্দ; কেননা তাহারা ভাবিতে লাগিল, ইহার পরে না জানি কী ঘটে! ইহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে, এ কথা একটুও না ভাবিয়া ঐ চারুমুখী কন্যাটি নিতান্ত সহজে জুতার মধ্যে পা গলাইয়া দিল এবং ইহার সঙ্গে জুড়ি মেলে এমন একটি পাটি তাহার জেব হইতে বাহির করিল। যখন রডোপিসের হাত ধরিয়া রাজা বলিলেন, 'ফেরেয়োর বাক্য কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না', তখন অন্য সুন্দরী কন্যাদের মধ্যে একটি ক্রুদ্ধ গুঞ্জনধ্বনি ফিরিতে লাগিল। যথাসময়ে ইহাকেই রাজা পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। গল্প চলিত আছে যে, রডোপিস মাধুর্য ও সাধ্বীতার জন্য তাঁহার স্বামীর এত একান্ত প্রিয় হইয়াছিলেন যে, তৃতীয় পিরামিড নামে বিদিত পিরামিডটি একদা রডোপিসের সমাধিরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া, মহিষীর জীবিতকালেই রাজা তাহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

৪

আফ্রিকাতে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো অংশে সিংহ পাওয়া যায়। পুরুষ সিংহ লাঙ্গুলের তিন ফুট সমেত, প্রায় ১০ ফুট হয়; সিংহী তাহার চেয়ে প্রায় এক ফুট ছোটো হয়। সিংহ বৃক্ষারোহণ করিতে পারে না, তাহারা বালুময় ও শিলাময় স্থানে এবং অনেক সময়ে নদী ও ঝরনার নিকটবর্তী গুল্মাবৃত ঝোপঝাপের মধ্যে বাস করে এবং সেই স্থানে শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। রাত্রেই তাহাদের সচেষ্টতা সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, যদিও দিনেও অনেক সময়ে তাহারা দৃষ্টিগোচর হয়। সিংহের সাহস ও তাহার গর্জনের প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে মতভেদ আছে, ঐ দুই বিষয়েই যথেষ্ট অত্যুক্তি হইয়াছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত বা উত্তেজিত সিংহ অতি ভয়ানক, বিশেষত রাত্রিকালে: মার্জারের ন্যায় গোপনে ও অতর্কিতভাবে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার অভ্যাসের গুণে সিংহ অনেক সময়ে আপনার অপেক্ষা বৃহত্তর অনেক পশুকে পরাভূত করে। সে মহিষ জেব্রা এবং এমন-কি অল্পবয়স্ক হস্তী শিকার করে। পুরুষ সিংহ শাবকদের লালনপালনে ও আহারদানে সাহায্য করিয়া থাকে।

৫

এইরূপ প্রকাশ যে, গগন মণ্ডল বলিয়া কোনো একজন বজবজের চালের ব্যবসায়ী এক দেশী নৌকায় একটা বড়ো রকমের চালের চালান লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল এবং পোজালি খাল বলিয়া হুগলী নদীর এক খালের মধ্যে রাত্রের মতো নোঙর করিয়া ছিল। মালিক এবং দাঁড়ি মাঝিরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় কে একজন আগুন চাহিতেছে শুনিয়া তাহারা জাগিয়া উঠিল। এইরূপে হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া মাল্লাদের ধাঁধা লাগিয়া গেল এবং তাহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিপরীত দিক হইতে অন্য দুটি নৌকা উপস্থিত হইল এবং তাহাদের আরোহীরা চালের নৌকার লোকদিগকে মারিতে আরম্ভ করিল এবং ইহারা ভয়ে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল; ডাকাতেরা সমস্ত মাল তাহাদের নৌকায় তুলিয়া লইল এবং দ্রুতবেগে দাঁড় বাহিয়া চলিয়া গেল।

৬

প্রিয়—

তোমার শেষ চিঠিখানি আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়াছে। কী আনন্দেই তুমি শরৎকাল যাপন করিয়াছ এবং তোমার হিমালয়বাসের কথা তুমি কেমন চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করিয়াছ! তোমার সঙ্গে যদি থাকিতে পারিতাম তবে বেশ হইত; কিন্তু তাহা একেবারেই সম্ভব হইতে পারে নাই। কেননা, তুমি তো জানই, মা পীড়িত। এখন তিনি অপেক্ষাকৃত অনেকটা ভালো আছেন, কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে দেহে বল ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে। আমরা দুই জনেই আশা করিতেছি শীতকালের পূর্বেই তুমি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। কখন তুমি আসিতে পার সে কথা অনুগ্রহ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আমাদিগকে জানাইবে।

ভরসা করি তোমরা সকলেই বেশ ভালো আছ।

আমি তোমার চিরদিনের ভালোবাসার বন্ধু

আ—

৭

গতকল্য রানী গ্রেট অর্মন্ড্ স্ট্রীটে শিশুদের হাসপাতালে গিয়াছিলেন এবং যে বিভাগে রাজকুমারী মেরী শুশ্রূষাকারিণীর কার্যে নিযুক্ত আছেন, সেই বিভাগে এক ঘণ্টার উপর অতিবাহন করিয়াছিলেন। সচরাচর মঙ্গলবার ও শুক্রবারেই হাসপাতালে রাজকুমারী কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুক্রবারে রানীর সহিত তিনি ব্রাইটনে গিয়াছিলেন বলিয়া, তৎপরিবর্তে গতকল্য অর্মন্ড্ স্ট্রীটে কাজ করিতে আসিয়াছিলেন। কন্যাকে আপন বিভাগের কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া রাজ্ঞী সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। গৃহকর্ত্রী Miss Gertrude Payne এবং চিকিৎসাবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক Dr. Pirie রানীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমতী শুনিলেন যে, রাজকুমারী মেরী তাঁহার হাসপাতালের কার্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। যে বিভাগ তিনি দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার নাম আলেকজান্ড্রা বিভাগ (রানী আলেকজান্ড্রার নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়); সেখানে ছাব্বিশটি শিশু চিকিৎসাধীনে ছিল। রাজকুমারী অস্ত্রচিকিৎসা-মতে ক্ষতসজ্জায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহার মা উহার প্রণালীটি নিরীক্ষণ করিলেন।

৮

এই বিশেষ বিভাগে রাজবংশীয়া শুশ্রূষাকারিণীর ভাগে কাল ডিনার পরিবেশনের ভার পড়িয়াছিল এবং রানী তাঁহার এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর বয়সের পেলব-আকৃতি একটি শিশুকে বাছিয়া লইয়া সাবধানে ছিন্ন-করা খাদ্যের পথ্য তাহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। ইহার পরে এক-পদ মিষ্টান্নের পালা ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীমতী উহা যথানির্দিষ্ট পরিবেশকদের হাতে দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন খর্বদেহ রোগীটির পক্ষে যেটুকু খাদ্য উৎকৃষ্ট এবং যথেষ্ট বলিয়া তাঁহার কাছে প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহার উপর আরও অধিক যোগ করিবার দায়িত্ব তিনি লইতে ইচ্ছা করেন না।

রাজকুমারীর সেদিনকার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানী অপেক্ষা করিয়াছিলেন ও পরে সেই রাজবংশীয়া শুশ্রূষাকারিণী হাসপাতালের উর্দি পরিয়াই মাতার সহিত গাড়িতে করিয়া বাকিংহাম প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

৯

৩১এ অক্টোবরে সমাপিত সপ্তাহে অল্পকয়েক স্থানে লঘুবৃষ্টিপাত হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশে আরও অধিক বৃষ্টির আশু প্রয়োজন। কোনো কোনো জিলায় আমন ধান শুকাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদন করা হইয়াছে। উত্তর এবং পশ্চিম বাংলায় শস্যের ভাবী অবস্থা সাধারণত আশাজনক নহে। অন্যত্র ভাবী অবস্থা মাঝামাঝি রকম। রবিশস্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চলিতেছে। বৃষ্টির অভাবে বীজবপনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই প্রদেশে মোটা চালের গড়মূল্য পূর্বসপ্তাহের তুলনায় প্রায় শতকরা হারে দুই মাত্রা বাড়িয়াছে।

১০

আমাদের অরণ্যের এবং ফলের বাগানের গাছসকল তাহাদের বৃদ্ধির প্রত্যেক অবস্থায় কীটশত্রুদের আক্রমণের বিষয়; এই কীটশত্রুগণ বাধাপ্রাপ্ত না হইলে শীঘ্রই বৃক্ষসকলকে সম্পূর্ণ

ধ্বংস করিত। আমাদের আরণ্যবৃক্ষ এবং ছায়াতরুগুলির বিনাশে আমাদের যে কী হইত, তাহা বর্ণনা করার চেয়ে কল্পনা করা সহজ। কাঠ আমাদের এত প্রকার সামগ্রীতে লাগে যে, ইহাকে বাদ দিয়া সভ্য মানুষের কথা চিন্তা করা কঠিন। এ দিকে আমাদের ফলবাগানের ফলসকলও যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়। সৌভাগ্যক্রমে বৃক্ষদের কীটশত্রুসকলেরও নিজেদের নিত্যনিযুক্ত শত্রু যে নাই তাহা নহে; এই শত্রুদের মধ্যে অনেকজাতীয় পক্ষী আছে, যাহাদের অস্ত্রসজ্জা এবং অভ্যাসসকল কীট-আক্রমণ-ব্যাপারে তাহাদিগকে বিশেষরূপে যোগ্যতা দান করে, এবং তাহাদের সমস্ত জীবন এই কীটের অনুধাবনে ব্যয়িত হয়।

১১

আলেকজান্ডার দি গ্রেট এবং প্রাচীনকালের পূর্বদেশীয় অনেক রাজাও সিংহ পুষিতেন। ঐ-সকল পোষা সিংহ তাঁহাদের প্রাসাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত। বর্তমানকাল পর্যন্ত আবিসিনিয়ার রাজগণ ঐ রীতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং আল্জিরিয়ার কোনো কোনো অংশে এখনো সিংহদিগকে অন্ধ করিয়া ও পোষ মানাইয়া ভূতছাড়ানোর কাজে লাগানো হইয়া থাকে। মধ্যযুগের শেষ-অংশে মিলানে ও ইটালির অন্যান্য নগরে সিংহ এবং চিতাবাঘকে অপরাধী ব্যক্তির প্রাণসংহারের কার্যে ব্যবহার করা হইত।

১২

একজন ফরাসি সৈনিক, এম্‌ব্রোজ পেরিশ', আপন জীবন-রক্ষার জন্য একটি ঘোড়ার কাছে ঋণী। তাহার দুই পা জর্মান কামানের দ্বারা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যখন রাত হইল, তখন সে তার কাছে একটা বড়ো সাদা ঘোড়ার গুরুশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল, সেই ঘোড়াটি ছোটো ছোটো ঘাস চিবাইয়া খাইতেছিল। জন্তুটির আরোহী ছিল না; সৈনিক তাহাকে শিস দিয়া ডাকিল। ঘোড়াটি আনন্দে মৃদু হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। নিজের জন্য স্বল্পমাত্র চেষ্টা করাও পেরিশ'র পক্ষে অসাধ্য ছিল। ঘোড়াটা যেন তাহা বুঝিতে পারিল, কেননা সে হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বক্ষের ঊর্ধ্বে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পরে সে উঠিল এবং সৈনিকের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। অবশেষে থামিল, আহত ব্যক্তিকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করিল এবং তাহার পর সেই সৈনিকের চামড়ার কোমরবন্ধ দাঁতে করিয়া ধরিয়া সে তাহাকে মাটি হইতে তুলিল এবং ছুটিয়া চলিয়া গেল।

১৩

চীনে ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকবার অভিযোগ-শুনানির পরেও হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীদলের মধ্যে প্রকৃত কোন্ ব্যক্তি স্বহস্তে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, বন্দীদিগকে জানাইলেন যে, তিনি সত্যনির্ণয়ের জন্য অশরীরী সত্তার সাহায্য লইতে যাইতেছেন। তদনুসারে তিনি অপরাধীর কৃষ্ণবেশ পরিহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে একটি গোলাবাড়িতে লইয়া গিয়া, দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘরের চারি ধারে সন্নিবেশিত করিলেন। শীঘ্রই একজন অভিযোক্তা দিব্যদূত তাহাদের মধ্যে আসিয়া অপরাধীর পৃষ্ঠদেশ চিহ্নিত করিয়া যাইবেন, এই কথা তাহাদিগকে বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং দরজা বন্ধ করাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে যখন দরজা খুলিয়া দিয়া ঐ লোকগুলিকে বাহিরে আসিতে আহ্বান করা হইল, তখন অবিলম্বেই দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে একজনের পৃষ্ঠে একটি

সাদা চিহ্ন রহিয়াছে। দেওয়ালে সম্প্রতি চুনকাম হইয়াছে, তাহা না জানিয়া ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আপদ হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছায় দেওয়ালের দিকে পিঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৪

মুসার আইনে এবং প্রথম খৃস্টীয় যুগে সুদ লওয়ার বিরুদ্ধে অতি বদ্ধমূল আপত্তি ছিল। তখনকার দিনের শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি অতিশয় সাদাসিধা ধরনের ছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদের নির্মাণ ব্যাপারে ধারে কারবারের প্রয়োজন ছিল না। যাহা-কিছু ধারে নেওয়া হইত, তাহা কেবল সদ্য ব্যবহার এবং দুঃখলাঘব করিবার জন্যই। এই কারণেই এই ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল যে, যে কেহ অপরের দুঃখক্লেশে লাভবান হয় সে নিন্দনীয়। এমন-কি, গ্রীক ও রোমীয় দার্শনিকগণও কোনো সংগত কারণ না দেখাইয়া উচ্চকণ্ঠে সুদ গ্রহণ করার নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক ও রোমীয় আইনে সুদ-গ্রহণে সম্মতি দেওয়া হইয়াছিল, এবং মধ্যযুগ পর্যন্ত যতদিন না খৃস্টীয় সংঘ ইহার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন তাবৎকাল ইহা সাধারণত গ্রাহ্যই ছিল।

১৫

ধনুষ্কোডি হইতে যে 'থ্রু' প্যাসেঞ্জার ট্রেন মাদ্রাজের অভিমুখে গত কল্য রওনা হইয়াছিল তাহা রাত্রে যথানিয়মে তিরুপুবনম্ পার হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্টেশনের প্রায় দেড় মাইল দূরে তাহা রেলচ্যুত হয়। প্রকাশ পায় যে কে একজন দুষ্ট অভিপ্রায়ে একখানি ত্রিশ ফুট লম্বা রেল তুলিয়া বাঁধা রাস্তার বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং তাহার ফলে সমস্ত এঞ্জিনটি সেই ফাঁকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং টেন্ডর গাড়িটি তাহার অব্যবহিত পশ্চাদ্‌বর্তী তিনটি থার্ড ক্লাস গাড়ি টানিয়া লইয়া লাইনের একেবারে বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের মধ্যে দুইটি গাড়ি উল্টাইয়া গিয়াছিল এবং তৃতীয়টি অল্প পরিমাণে এক পাশে কাত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে রেলওয়ে-কর্মচারী অথবা যাত্রীদের মধ্যে কাহারও কোনো অনিষ্ট ঘটে নাই। ট্রাফিক ইন্‌স্পেক্টরের জিম্মায় মাদুরা হইতে প্রায় বারোটা দশ মিনিটের সময় তৎক্ষণাৎ একটি রিলীফ ট্রেন চালানো হইয়াছিল এবং প্যাসেঞ্জারদিগকে অন্য গাড়িতে তুলিয়া আজ ভোর-সকালে মাদুরায় আনা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, আজ সন্ধ্যা নাগাদ অবিচ্ছিন্ন যাতায়াত পুনঃস্থাপিত হইবে।

১৬

প্রায় মধ্যাহ্নে আমরা শ্রীনগর ছাড়িলাম এবং নদীর প্রধান ধারাটি বাহিয়া অবাধে ভাসিতে ভাসিতে নগরীর মধ্য দিয়া চলিলাম। অসংখ্য বিপণি, চিত্রার্পিতবৎ সেতু-সকল এবং তীরবেগে চতুর্দিকে ধাবমান বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নৌকা চারি দিক হইতে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যায় নদীতীরের সাদিপুর-নামক একটি গ্রামে আমরা নৌকা বাঁধিলাম; পরদিন প্রাতে প্রায় ছয়টায় ছাড়িয়া সম্বলে এবং মানসবল সরোবরের প্রবেশমুখে প্রায় বেলা নয়টার সময় পৌঁছিলাম। মাঝিরা ঝড়ঝঞ্ঝার সময়ে এই সরোবরকে বড়ো ভয় করে এবং সাধারণত তাহারা তীরের কাছ ঘুরিয়া মন্দগতিতে যাওয়াই পছন্দ করে। সরোবরের দূরতর প্রান্তে একটি উৎসের নিকট আমরা নৌকা বাঁধিলাম এবং সকল সরোবরের মধ্যে সুন্দরতম এই সরোবরের সর্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যটি দেখিতে পাইলাম। ইহার গভীরতাকে যে অতলস্পর্শ বলিয়া অনুমান করা হয় তৎসম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে এবং শুনা যায় একজন লোক ইহার তলদেশে পৌঁছিতে পারে এমন একগাছি দাঁড় তৈয়ারি করিতেই সারাজীবন কাটাইয়াছে, কিন্তু কোনো ফল পায় নাই।

১৭

সেখানে আমরা এক সপ্তাহ কাটাইলাম, একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া সিন্ধু উপত্যকার মুখে অবস্থিত গান্ধর্বল দেখিতে বাহির হইলাম। সরোবরের পার্শ্ব বাহিয়া উচ্চ ভূমির উপরে ঘোড়া ছুটাইবার জন্য একটি অতি সুন্দর খোলা জায়গা দেখিতে পাইলাম—এমন সুযোগ ছাড়িবার নয়। উলার সরোবর আমাদের তৎপরবর্তী লক্ষ্য ছিল; এইটি সকল সরোবরের চেয়ে বড়ো, সভ্যদেশ হইতে সকলের চেয়ে দূরে অবস্থিত। এইসঙ্গে এখানে এই কথাটিও জুড়িয়া দিই যে, ময়দা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া এবং নিজেদের রুটি নিজেরা তৈয়ারি করিয়াছিলাম বলিয়া দেখা গেল আমাদের অধিক সুবিধা হইয়াছে। দুগ্ধসম্বন্ধে আমরা গ্রামগুলির উপরে নির্ভর করিয়াছিলাম।

১৮

প্রত্যুষে আমরা মানসবল সরোবর ছাড়িলাম এবং সম্বল গ্রামে ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়াই পছন্দ করিয়া নৌকাগুলিকে আমাদের অনুসরণ করিতে বলিলাম। বৃহৎ সম্বল সেতুটির উপর দিয়া আমরা নদী পার হইলাম এবং ঘোড়ায় চড়িয়া তীর বাহিয়া আসামের দিকে চলিলাম ও সেইস্থানেই আমরা নৌকায় চড়িলাম। এখানে স্রোত প্রখর এবং আমরা অনায়াসেই ভাসিতে ভাসিতে সন্ধ্যা নাগাইদ বন্যারে আসিলাম। উলার সরোবর পার হওয়া সে এক ব্যাপার: কারণ কাশ্মীরী মাল্লারা অনেক প্রকারের ভয়ে ও অন্ধসংস্কারে পূর্ণ। ঝড়ের ভয়ে তাহারা মধ্যাহ্নে ও অন্ধকারের ভয়ে সন্ধ্যার সময়ে পার হইবে না; একমাত্র ভোরে নির্বাত সময়ে যাইতে সম্মত হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টায় পার হইয়া আমরা কুইনকুশে আসিলাম, ইহা হরিমঞ্জের ছায়াতলে সরোবরতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; এই হরিমঞ্জ পর্বতটি সরোবরের পার্শ্বদেশ হইতে খাড়া উঠিয়াছে এবং উহার শীর্ষদেশে কোনো ফকিরের মন্দির মুকুটের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

১৯

গত মাস আমার পক্ষে যেমন দুঃখদায়ক হইয়াছিল, এমন আর কোনো কালে হয় নাই। বস্তুত কাতর হওয়া যে কাহাকে বলে ইহার পূর্বে কখনো জানিতাম না। জানুয়ারির গোড়ার দিকে ইংলন্ড হইতে পত্রযোগে আমার কনিষ্ঠ ভগিনীর মৃত্যু-সংবাদ আসে। সে যে আমার কী ছিল, তাহা কোনো বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না। আমি এ কথা বলিব না যে, জগতের যে কোনো পদার্থের চেয়ে সে আমার প্রিয় ছিল; কারণ যে ভগিনী আমার সঙ্গে ছিল সে তাহার সমতুল্য প্রিয়; কিন্তু এক মানুষ আর এক মানুষের যত প্রিয় হইতে পারে সে আমার তাহাই ছিল। এমন-কি মহাকাল যদিও বেদনামোচনের কার্য আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি এখনো তাহার কথা বলিতে গেলে একেবারে অপুরুষোচিতভাবে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমি যে এই আঘাতের ব্যথায় সম্পূর্ণ তলাইয়া যাই নাই, সেজন্য প্রধানত সাহিত্যের কাছে আমি ঋণী।

২০

পর্বতের চূড়া, সমুদ্র এবং মেরুপ্রদেশীয় তুষারক্ষেত্রের উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল সর্বত্রই ধূলি-ভারাক্রান্ত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রকাশ পায় যে, পুষ্পের পরাগ, উদ্ভিদ্‌তন্তুর অংশ, লোম, ধাতু ও প্রস্তরের কণা, জীবাণু ও রোগবীজের দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিরাশি গঠিত। বাতাসের ধূলি-কণাসকল ছায়াশূন্য স্থানে আলোক প্রতিফলিত করে; এইগুলি না থাকিলে সমস্ত ছায়াময়

স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইত। ধূলিকণা অব্যবহিত সূর্যালোকের প্রখরতা হ্রাস করে, কারণ তাহা না থাকিলে, কৃষ্ণবর্ণ আকাশে সূর্য দুর্দর্শতর উজ্জ্বলতা লাভ করিত এবং সেই আকাশে দিবাভাগেও নক্ষত্রেরা দৃশ্যমান হইত। আকাশের নীলিমা এবং সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়-কালীন মহাপ্রভ বর্ণসমূহের হেতু তাহারাই। ঐ ধূলিকণাকে বায়ুমধ্যস্থ জলীয় বাষ্প আবৃত করে, তাহার সংহতি মেঘ উৎপাদন করে ও তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। অতএব বৃষ্টি-উৎপাদন সম্বন্ধে ধূলি অবশ্য-প্রয়োজনীয় না হইলেও, একটি প্রধান উপাদান বটে।

২১

এইরূপ কথিত যে, নিউইয়র্ক-সমাজে ভাজা কুমীর সর্বাপেক্ষা অধুনাতন সুখাদ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। এই সরীসৃপকে খাদ্যরূপে ব্যবহারের প্রস্তাব ইতঃপূর্বেই য়ুনাইটেড স্টেট্সের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং একটি বৃহৎ বোর্ডিংগৃহের সভ্যেরা একত্র মিলিয়া চাঁদা করিয়া এক জোড়া অল্প বয়সের কুম্ভীর কোনো একটি কুম্ভীরপালন-শালা হইতে কিনিয়াছিল ও দেখিয়াছিল তাহা অত্যন্ত উত্তম। কিন্তু কুমীরের মাংস কিসের মতো খাইতে লাগে, ইহা যখন তাহারা বাহির করিতে চেষ্টা করিল তখন মুশ্কিল বাধিল। ত্রিশ জন লোক ভোজে যোগ দিয়াছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকের মত স্বতন্ত্র হইল। কেহ মনে করিল শূকরমাংসের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে; কেহ ভাবিল ইহা মাছের মতো; একজন বলিল ইহা চিংড়ির কথা মনে করাইয়া দেয়; কিন্তু সকলেই বলিল ইহা অত্যন্ত মুখরোচক।

২২

ধর্মমঠগুলি সকলেরই পক্ষে খোলা। যে-কোনো অজানা লোক মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইতে পারে। সন্ন্যাসীরা সকল সময়েই আতিথ্যপরায়ণ। বোধ করি, আমার ব্রহ্মদেশে বাসের সিকিভাগ আমি মঠে কিংবা তৎসংলগ্ন ধর্মশালায় কাইাইয়াছি। আমরা তাঁহাদের সকল নিয়মই লংঘন করি; আমরা মঠের পবিত্র অবরোধের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ি এবং বুট পরিয়া বেড়াই; যেখানে সকল জীবের প্রাণ রক্ষা করা হয় সেখানে আমাদের ভৃত্যেরা আমাদের ডিনারের জন্য মুর্গি মারে; সমস্ত প্রাচ্যদের প্রতি আমাদের যেরূপ আচরণ, স্বজাতিকর্তৃক পূজিত এই ধর্মাচার্যদের প্রতি আমরা অনেকটা সেইরূপ উপেক্ষাপূর্ণ অবিনীত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমরা অনেক সময়ে প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের ধর্মকে পরিহাস করিয়া থাকি; তথাপি তাঁহাদের বিশ্বাস ও অভ্যাসের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার পরিবর্তে তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরূপ আচরণ আমরা নিতান্তই কদাচিৎ পাই।

২৩

চীফ কমিশনর মাননীয় মিস্টার হেলি ইন্ফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক সম্বন্ধে এক নিবন্ধে লিখিতেছেন যে, যদিচ এই সংক্রামক দিল্লীতে এখনো বহুসংখ্যক মৃত্যু ঘটাইতেছে, তথাপি এরূপ আশা করিবার কারণ আছে যে, ইহা এক্ষণে স্পষ্টতই হ্রাসের দিকে গিয়াছে। অক্টোবরের আরম্ভ হইতে মৃত্যুর হার কিছু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গত তিন বৎসরের গড় মৃত্যুসংখ্যা ২৪টির তুলনায় বর্তমান অক্টোবরের প্রথম বারো দিনের গড় মৃত্যুসংখ্যা ৪৮টি হইয়াছিল। ১৩ই এবং ১৪ই তারিখে হিসাবের তালিকায় প্রতিদিন ৭৭ সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। সংক্রামকের প্রবলতাবশত ম্যুনিসিপাল স্বাস্থ্য-বিভাগ, স্থানীয় হাসপাতাল এবং ঔষধালয়ের উপরে অত্যন্ত কঠিন চাপ পড়িয়াছিল। ইন্দ্রপ্রস্থ-

সেবকমণ্ডল, সেন্ট স্টীফেন কলেজ এবং আর্যসেবক-সভার স্বয়ংব্রতীদের নিকট হইতে স্বাস্থ্যসচিব ম্যানিং স্ট্রীট ঔষধালয়ে মূল্যবান আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন। হাজি মহম্মদ রফি একটি ঔষধালয়ের সমগ্র খরচ জোগাইয়াছেন এবং বহুসংখ্যক বেসরকারী ডাক্তার আপন উদ্‌বৃত্ত সময় তাঁহার কাজে অর্পণ করিয়াছেন। ডাক্তার আনুসারি এবং অনেকগুলি হাকিম ও বৈদ্য বহুসহস্র রোগীর ঘরে ঘরে ফিরিয়া আনুকূল্য করিয়াছেন।

২৪

দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়া যখন তাহার সমৃদ্ধির মধ্যাহ্নকালে অবস্থিত, তখনকার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া হেরোডোটস বলিয়াছেন, 'যত দেশ আমি জানি, ইহাই তাহাদের সকলের চেয়ে উত্তম ফসলের দেশ; ইহা এতই চমৎকার যে, সব চেয়ে ভালো বছরে গড়ে ইহার উৎপন্ন ফসল দুই-তিন-শ গুণ হইয়া থাকে।'

প্রথম খলিফাদের রাজত্বের একটি তালিকায় দেখা যায় যে, প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ একর জমি কৃষির অধীনে আছে। এ.জে.টয়ন্‌বি লিখিতেছেন, 'প্রাচীনকালে উত্তর মেসোপোটেমিয়া প্রদেশটি এমন প্রজাবহুল এবং ধনশালী ছিল যে, ইহার অধিকার লইয়া রোমের সহিত ইরানের শাসনকর্তৃগণের সাত শতাব্দী ধরিয়া লড়াই চলিয়াছিল; অবশেষে আরবেরা উভয়ের নিকট হইতে ইহা জিতিয়া লয়।' ঐ গ্রন্থকারই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, নবম খৃস্টশতাব্দীতে হারুন-অল্‌রশীদকে ঈজিপ্ট যত বেশি খাজনা দিত, উত্তর মেসোপোটেমিয়া তত বেশি খাজনাই দিত এবং সেখানকার তুলা পৃথিবীর সকল হাটে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইহা সুবিদিত যে আমাদের মস্‌লিন শব্দ উত্তর মেসোপোটেমিয়ার মোসল নগরের নাম হইতে উদ্ভূত।

২৫

এই ভূমি দশ শতাব্দী পূর্বে যেরূপ শস্য উৎপাদন করিয়াছে এখন সেরূপ না করিবে কেন? মাটি এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে নাই। বৃষ্টিপাত এবং সেচনযোগ্য জল পুরাতন কালের মতোই প্রচুর আছে। তখন যে জনসমূহ দেশে বাস করিত এখনো তাহারাই বাস করে; ইহারাও তাহাদের মতো শ্রমশীল এবং মিতব্যয়ী। প্রাচ্যদেশের সুন্দরতম শস্যভূমিতে গত চারি শতাব্দী কেন এমন সর্বনাশ আনয়ন করিল? উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, সর্বত্রই এই দেশে চাষীর মহা সুযোগ; অথচ এই ভূমির অধিকাংশই অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জল-সংগ্রহের জন্য জলাশয় এবং অন্য যে-সকল সেচনব্যবস্থার উপকরণ এই মরুময় একরগুলিকে শস্যপ্রসূ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিত তাহা নির্মিত হয় নাই। অত্যন্ত-আদিমকাল-প্রচলিত কৃষিপ্রণালী এখনো এখানে ব্যবহৃত হয়; বাইবেল-কথিত কালের সেই বলদবাহিত লাঙল, সেই কাস্তে দিয়া বড়ো বড়ো খেতের ফসল কাটা, সেই ফসল মাড়াই করিবার মেঝে যেখানে পশুদের খুরের দ্বারা গোধুম দলিত হয়, সেই ক্লেশদায়ক মন্থরগতি হাতের খাটুনি— সেও এমনতরো অনিপুণ যন্ত্র-সহযোগে যে যন্ত্রে প্রয়াসপ্রয়োগের অনুপাতে ফললাভ সর্বাপেক্ষা স্বল্প।

২৬

মেরুপ্রদেশের চুক্‌চিস্‌গণ যদিও প্রকৃতির শিশু এবং সভ্যতার সকলপ্রকার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে বরফ তুষার এবং শীতের মধ্যে বর্ধিত, তথাপি তাহারা ভালোমানুষ, অবঞ্চক-স্বভাব এবং আতিথ্যপরায়ণ।

যদিও দীর্ঘ শীতকাল ধরিয়া প্রত্যহই অন্তত কুড়ি জন করিয়া মেরুবাসী ভেগা জাহাজ দেখিতে আসিত, কিন্তু দুই তিনবার-মাত্র তাহারা অসদুপায়ে কিছু আত্মসাৎ করিবার অপরাধে ধরা পড়িয়াছিল এবং ঐ চৌর্যগুলিও অতিসামান্য প্রকারের।

চুক্‌চিস্‌গণ খর্বকায় জাতি, যদিও তাহাদের মধ্যেও অতিকায় মানুষ দেখা যায়; যেমন আমরা একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলাম, সে লম্বায় ছয় ফুট তিন ইঞ্চি। তাহাদের দেহের বর্ণ অনুজ্জ্বল পীত, পুরুষদের রঙ সাধারণত মেয়েদের চেয়ে আরও কিছু ঘোর। মাঝে মাঝে উত্তর য়ুরোপের অধিবাসীদিগের ন্যায় স্বচ্ছ ও গৌরবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে।

২৭

তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ এবং অনেক সময় চীনদেশীয়দিগের ন্যায় তির্যগ্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট। তাহাদের কেশ অঙ্গারকৃষ্ণ; পুরুষেরা উহা খুব ছোটো করিয়া কাটিয়া রাখে; স্ত্রীলোকেরা উহা যথেচ্ছ বাড়িতে দেয় এবং কপালের মাঝখানে সিঁথি কাটিয়া বারো হইতে আঠারো ইঞ্চি লম্বা বিনানী রাখে, তাহা দুই কানের কাছ দিয়া ঝুলিয়া থাকে। মেরু-অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য সীলের মাংস ও চর্বি; তদুপরি যখন পক্ষী ভালুক ও বল্‌গা হরিণ পাওয়া যায় তখন তাহারও মাংস ব্যবহার করে। সমুদ্রতীর-জাত কোনো কোনো উদ্ভিদের মূল, উইলো গাছের পাতা প্রভৃতিও যথেষ্ট প্রচুর পরিমাণে তাহাদের খাদ্যশ্রেণীভুক্ত। পাতাগুলি গ্রীষ্মকালের শেষভাগে সংগ্রহ করা হয় এবং শীতকালে আহার করা হয়।

২৮

শীতকালে যখন অন্য খাদ্য শেষ হইয়া আসে, তখন গ্রীষ্মকালে যে-সকল সীল ও সিন্ধুঘোটক ধরা হইয়াছিল তাহাদের অস্থি চূর্ণ করিয়া তাহার দ্বারা ঝোল প্রস্তুত হয়, উহা মানুষ ও কুকুর উভয়েই আহার করে। ঐ শেষোক্ত প্রাণী প্রতি গ্রামেই বহুসংখ্যায় বাস করে; চক্রহীন গাড়িতে করিয়া স্বীয় প্রভুদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টানিয়া বেড়ানোর কার্যেই তাহাদিগকে প্রধানত নিয়োজিত করা হয়। এই কুকুরগুলি বৃহদাকার না হইলেও অনায়াসে তিন-চারিটিতে মিলিয়া একজন মানুষকে বহুদূরে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। কোনো চুক্‌চিস্‌ যখন তিন শত হইতে পাঁচ শত মাইল-ব্যাপী দীর্ঘভ্রমণে বাহির হয়, তখন অনেক সময়ে সে আপনার চক্রহীন যানে আঠারোটা পর্যন্ত কুকুর জুতিয়া লয়; উহাদের সাহায্যে সে দিনে সত্তর হইতে আশি মাইল পথ পর্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে।

২৯

[রোম-সেনাপতি মার্‌সেলাস তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষের কার্থেজীয় সেনানায়ক হানিবালের সম্মুখে আহত-অবস্থায় শয়ান]

হানিবাল। মার্‌সেলাস, ওহে মার্‌সেলাস! নড়িতেছেন না, ইনি মৃত। একবার ইঁহার আঙুলগুলি নড়াইলেন না কি? ফাঁক করিয়া দাঁড়াও, সৈন্যগণ—চল্লিশ পা তফাতে—উঁহার কাছে বাতাস আসিতে দাও—জল আনো—চলা ক্ষান্ত করো; ঐ যে চওড়া পাতাগুলো এবং বাকি যাহা-কিছু ব্রশউড গাছের তলায় গজাইয়াছে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনো, উঁহার বর্ম উন্মুক্ত করো। প্রথমে শিরস্ত্রাণ আলগা করো—উঁহার বক্ষতল স্ফীত হইতেছে। আমার মনে হইল উঁহার চক্ষুর্দ্বয় আমার উপরে নিবদ্ধ হইয়াছিল, আবার উল্টাইয়া গেল। কে স্পর্ধাপূর্বক আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল? এই ঘোড়া? এ ঘোড়া নিশ্চয়ই মার্‌সেলাসের ছিল। কোনো লোক যেন উহার উপরে না চড়ে। হা, হা, রোমীয়রাও বিলাসে ডুবিয়াছে, এই যুদ্ধাশ্বের গায়ে সোনা দেখিতেছি!

গলীয় সৈন্যনায়ক। জঘন্য চোর! আমাদের রাজার স্বর্ণহার একটা পশুর দাঁতের তলায়। দেবতাদের প্রতিহিংসা অপবিত্রদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

৩০

হানিবাল। যখন রোমে প্রবেশ করিব তখন প্রতিহিংসার কথা বলিব এবং ধর্মযাজকদের কাছে গিয়া পবিত্রতার কথা বলিব, যদি তাহারা আমাদের কথা শোনে। শল্যবৈদ্যের কাছে লোক পাঠাও। গভীরনিহিত হইলেও কুক্ষী হইতে এই তীর বাহির করা যাইতে পারিবে। সাইরাক্যুস-বিজয়ী আমার সম্মুখে পতিত। কার্থেজে একটা জাহাজ পাঠাইয়া দাও। বোলো, হানিবাল রোমের দ্বারে; মারসেলাস, যিনি একলা উভয় পক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি পতিত। বীর বটে! আমার আনন্দ করা উচিত, কিন্তু পারিতেছি না। কী সম্ভ্রমজনক প্রশান্ত মুখশ্রী, কী মহিমান্বিত আকৃতি এবং প্রাংশুতা!

গলীয় সৈন্যনায়ক। আমার দল উঁহাকে মারিয়াছে, বস্তুত আমার বোধ হয় আমিই উঁহাকে মারিয়াছি। ঐ হারটি আমি দাবি করি, ইহা আমার রাজার— গল্‌-এর গৌরবের জন্য ইহার প্রয়োজন। আর কেহ ইহা লইলে সে সহিবে না, বরঞ্চ সে তাহার শেষ মানুষটিকে পর্যন্ত খোয়াইবে— এই আমরা শপথ করিতেছি, আমরা শপথ করিতেছি।

৩১

হানিবাল। বন্ধু, মারসেলাস আপন গৌরবের জন্য ইহা নিজে পরিধান করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তোমাদের বীররাজার অস্ত্রগুলি যখন তিনি মন্দিরে টাঙাইয়াছিলেন তখন এই সামান্য গহনাটিকে তিনি নিজের এবং জুপিটরের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যে ঢালটি তিনি ভাঙিয়াছেন, যে উরস্ত্রাণ তিনি তাঁহার তরবারির দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তিনি জনগণকে এবং দেবতাদিগকে দেখাইয়াছেন। এইটি তাঁহার ঘোড়াকে পরাইবার আগে তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার শিশুসন্তানেরা দেখে নাই।

গলীয় নায়ক। আমার কথা শোনো হানিবাল।

হানিবাল। কী! যখন মারসেলাস আমার সম্মুখে শয়ান, হয়তো যখন তাঁহার প্রাণ ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে, হয়তো যখন আমি তাঁহাকে জয়গৌরবে কার্থেজে লইয়া যাইতে পারি, যখন ইটালি সিসিলি গ্রীস এশিয়া আমার শাসন মানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া! সন্তুষ্ট থাকো! আমার নিজের জিন লাগাম তোমাকে দিব, তাহার দাম ইহার দশটার সমান।

৩২

গলীয় নায়ক। আমারই জন্য?

হানিবাল। তোমারই জন্য।

গলীয় নায়ক। এই চুনি, পান্না এবং ঐ রক্তবর্ণ—

হানিবাল। হাঁ, হাঁ।

গলীয় নায়ক। হে মহামহিম হানিবাল! অপরাজেয় বীর! হে আমার সৌভাগ্যবান দেশ, এমনতরো সহায় এবং রক্ষক তুমি পাইয়াছ! আমি শপথ করিয়া অক্ষয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি— হাঁ, এমন কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, নিষ্ঠা, যাহা অসীমকালকেও অতিক্রম করে!

৩৩

প্রিয়—

তোমার চিঠি এইমাত্র পাইলাম এবং এত দিনে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। চিঠির জন্য আমি বহুদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু ইংলন্ডে চিঠি আসিতে আজকাল যুগযুগান্তর লাগে। তুমি যে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের খবর পাঠাইয়াছ, তাহাতে বড়ো সুখী হইলাম। ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল এবং সেজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; কিন্তু যদিও আমার স্ত্রীর শরীর অপেক্ষাকৃত একটু ভালো হইয়াছে, তবু তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট নই। ইংলন্ডে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাঁর শরীর প্রকৃতপক্ষে ভালো হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করি।

৩৪

তাঁর পক্ষে দরকার—শান্তিময় গৃহের আরাম; কিন্তু এই যে যুদ্ধ এখনো চলিতেছে, তাহাতে কেবল ভগবানই জানেন সে সময় কখন আসিবে। তোমার নিজের শরীরের কথা তুমি কিছুই লেখ নাই। আমি একান্ত আশা করি গরমে তুমি অতিমাত্র ক্লিষ্ট হও নাই। গরমে যে কেমন করিয়া প্রাণ বাহির করিয়া দেয় এবং ভিজা ন্যাকড়াখানার মতো নেতাইয়া ফেলে, তাহা আমি জানি। এখানে আমি বড়ো একা-একা বোধ করিতেছি এবং আলাপ করিতে পারি আমার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই। ভাবী আশাও অন্ধকারাবৃত। সেই সব-সুদ্ধ জড়াইয়া আমি বিশেষ প্রফুল্লতা অনুভব করিতেছি না। ভারতবর্ষে আমার শরীর যেমন ছিল তাহার চেয়ে অনেক ভালো হইলেও, আমার শরীর এখনো ভালো হয় নাই। ভালোবাসা জানিয়ো, আশা করি শীঘ্রই তোমার চিঠি পাইব।

তোমার স্নেহের—

৩৫

আমাদের পক্ষীশাবকরা ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পর, অধিকাংশই প্রথম কয়েক সপ্তাহ কীট ছাড়া আর কিছুই খায় না এবং তাহাদের অনেকেই সারা জীবন কীট-খাদক। শাবকেরা ভূরিভোজী এবং তাহাদের পিতামাতারা সমস্ত দিন তাহাদিগকে গড়ে প্রতি পাঁচ-ছয় মিনিট অন্তর খাওয়াইয়া থাকে; এ দিকে দিবালোকের সূচনা হইতেই তাহাদের দিন শুরু হয় আর অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত তাহা শেষ হয় না। এই প্রত্যেক বারে বৃদ্ধ পাখিরা একটি হইতে বারোটি কীট লইয়া আসে, ইতিমধ্যে তাহারা নিজে যাহা খায় সেটাকে আমরা ইহার মধ্যে ধরিতেছি না। এইরূপে দেখা যাইবে একটিমাত্র পক্ষীপরিবার দিনে বহু শত কীট ভক্ষণ করে। বস্তুত সতর্ক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখা গেছে—একটি পক্ষীপরিবার দিনে পাঁচ শত হইতে বারো শত কীট বিনাশ করে।

ঠিক সেই কীটগুলি ছাড়াও অনেক পাখি রাশি রাশি কীটডিম্ব ধ্বংস করে, অনেক সময়েই তাহার পরিমাণ দিনে বহুসহস্র হইয়া থাকে।

৩৬

আমি অধিক দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই সূর্য অস্ত গেল এবং গোধূলির আলোকে আমি দুইটি পশুকে বন হইতে বাহির হইয়া পথের উপর আমার এক শত গজ আন্দাজ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম। দ্বীপের ঐ অংশে যে বহুসংখ্যক বন্য মহিষ বাস করে, আমি প্রথমে অস্পষ্ট

আলোকে এই দুইটিকে তাহাদেরই অপূর্ণবয়স্ক শাবক ভাবিয়াছিলাম। আমাকে যে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে তাহারই পার্শ্ববর্তী একটি বৃহৎ বৃক্ষের অভিমুখে তাহারা মস্তক নত করিয়া অগ্রসর হইল এবং সেইখানে গাছের শিকড়ের চারি ধারে ঘ্রাণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি এখন তাহাদের যথেষ্ট নিকটবর্তী হওয়াতে দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা অতি বৃহদাকার ভল্লুক। পার্শ্বে সরিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ বনটি মহিষকণ্টক নামে খ্যাত একপ্রকার অতিদীর্ঘ কণ্টক পূর্ণ হওয়াতে মনুষ্যের দুর্ভেদ্য ছিল। ফিরিয়া যাওয়ার কথা একবারও আমার মনে আসে নাই, বাস্তব-পক্ষে আমার চিন্তা করিবার সময়ই ছিল না, কারণ, আমি এক্ষণে তাহাদের ত্রিশ পদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

৩৭

তাহারা মস্তক উত্তোলন করিল এবং একটি হ্রস্ব গর্জনে আপনাদের ক্রোধের পরিচয় দিল, উহার পরিবর্তে আমি তাহাদের দিকে ধাবিত হইয়া উহাদের তিন গজের মধ্যে গিয়া পড়িলাম; তাহারা তবুও সরিয়া যাইবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না; তাহারা আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। আমি তাহাদের দিকেই মুখ করিয়া এমন আড়ভাবে ঘুরিয়া চলিলাম, যাহাতে তাহাদের যে পার্শ্ব দিয়া আমাকে পথ অনুসরণ করিতে হইবে সেই দিকে পৌঁছিতে পারি। এমন সময়ে তাহারা আমার দিকে এক লম্ফ প্রদান করিল, আমি তাহাদের অভিমুখেই মুখ করিয়া পশ্চাতে লম্ফ দিয়া রক্ষা পাইলাম; ঐরূপে তাহারা পুনশ্চ একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল; কিন্তু দেখিলাম তৃতীয় বারই আমার শেষবার হইবে।

৩৮

আমার এইটুকু কেবল মনে আছে যে, আমি গর্জন ও আর্তনাদের মাঝামাঝি একটি ভীতধ্বনি করিয়াছিলাম এবং যখন পুরোবর্তী প্রাণীটি আমার অভিমুখে উত্থিত হইল তখন আমার হাতে একটিমাত্র যে জিনিস ছিল সেই ব্রান্ডির বোতলটি লইয়া আমার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহার নাক ও দাঁতের উপর মারিলাম। বলা বাহুল্য, বোতলটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেল এবং তাহার নাকের উপরে সেই আঘাতটিই হউক, অথবা চক্ষে ও মুখে ব্রান্ডি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিল তাহাই হউক, অথবা একসঙ্গে এই দুইটাতে মিলিয়াই হউক, তাহাকে ঘুরাইয়া দূরীভূত করিয়া দিল এবং তাহার সঙ্গী তাহার অনুসরণ করিল। বলিতে পারি, এই সমস্ত ব্যাপার এক মিনিটও সময় লয় নাই। উহার মধ্যে আমি একবারও উপস্থিতবুদ্ধি হারাই নাই; বোধ হয় সময়ের অল্পতাই তাহার হেতু।

৩৯

আমাদের এখানে য়ুরোপ হইতে যে-সকল আগন্তুক সব প্রথমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্পেনদেশীয় কন্সলবিভাগীয় কর্মচারী Adolfo Rivadeneyra একজন। ইনি পারস্য দেশের ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং জেরুজিলেমের কন্সল ছিলেন। তিনি আরবী ভাষা উত্তম-রূপেই বলিতে পারিতেন; তিনি অত্যন্ত শ্যামবর্ণ ছিলেন এবং সহজেই আপনাকে আরব বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিতেন। আমি যত মানুষ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে নিকোলাস সম্ভবত সর্বাপেক্ষা কুৎসিত, এই কথা আমি কয়েক মিনিট আগে বলিয়াছিলাম। রিভাডিনেইরা এই বিষয়ে প্রায় তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছিলেন। একদিন, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ভারি মজা লাগিল; দেখিলাম যে তিনি

এবং নিকোলাস হাত ধরাধরি করিয়া আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন ও Madame Krebel-নাম্নী এক রুশীয় সেক্রেটারির পত্নীর সম্মুখে নতজানু হইয়া, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কে বেশি কুৎসিত তাহাই স্থির করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মহিলাটি প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই একসঙ্গে নিকটতম দর্পণের নিকটে দরখাস্ত পেশ করুন।

৪০

কয়েক বৎসর পূর্বে Carl Scholz তাঁহার পরিবারবর্গকে চিকাগোতে সরাইয়া আনেন, তৎপূর্বে তিনি পশ্চিম ভর্জিনিয়াতে বাস করিতেন। তাঁহারা বাষ্পদ্বারা উত্তাপিত একটি কক্ষ লইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি লক্ষ করিয়া দেখিলেন যে শীতের সময় সর্বদাই সর্দি-কাশিতে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা ভুগিয়া হয়রান হইতেছে। ইহাও দেখিলেন যে, অন্যপ্রকার আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহার যে-সকল আসবাব মজবুত এবং শক্ত ছিল, তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, এই দুই প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ একই। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার কক্ষের বাতাস শীতের সময় অতিরিক্ত শুষ্ক থাকে। তিনি তাঁহার তাপসঞ্চার-যন্ত্রের পশ্চাতে কয়েকটি জলপূর্ণ তাম্রপাত্র জুড়িয়া দিলেন। তিনি শীঘ্রই আবিষ্কার করিলেন যে, প্রতিদিন প্রতিঘরে বাতাস এক কোয়ার্টের অধিক জল শোষণ করে। তিনি ইহাও লক্ষ করিলেন যে, বাড়িটির উত্তাপ আরামের ব্যাঘাতজনক হইয়া উঠিল এবং সর্দিকাশির প্রবণতা দূর হইল।

৪১

স্বাস্থ্যবান থাকিতে হইলে, বাসকক্ষে প্রতি ঘণ্টায় বায়ুর পরিবর্তন আবশ্যক। বাতাসটা তো কোনো এক জায়গা হইতে আসা চাই-ই। স্বভাবতই ইহা বাহির হইতে পাওয়া যায়; অতএব বাসার মধ্যে ইহা ঠাণ্ডা শুষ্ক অবস্থায় প্রবেশ করে। যদি তাজা বাতাস প্রবেশ করে, তবে বাসি হাওয়াকে বাহির হইয়া যাইতে হয়। এই হাওয়া গরম এবং আর্দ্র হইয়া যায়। প্রথমে ইহা ঘরের বাতাসের সমস্ত আর্দ্রতা গ্রহণ করে। ইহাও যথেষ্ট নহে, পরে ইহা আমাদের চর্মকে আক্রমণ করে। তখন আমাদের চর্ম হইতে ভাপ উঠিতেছে বোধ করি। তখন আমরা বলি, আমাদের শীত লাগিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমরা আরও বেশি উত্তাপ চাই। কাজেই আমরা বড়ো করিয়া আগুন জ্বালাই। বাতাসকে আমাদের চর্ম হইতে জলপান করিতে না দিয়া যদি জলপাত্র হইতে দিই, তবে অবিকল একই ফল পাওয়া যায়।

৪২

আর মাস কয়েকের মধ্যেই টিনের পাত্রে রক্ষিত তিমিমাংস ইংলন্ডের বাজারে উঠিবে। যেমন করিয়া স্যামন মাছ সংরক্ষণ করা হয়, ঠিক তেমনি করিয়া ব্রিটিশ কলম্বিয়ার কীউকাউট দ্বীপে এই প্রকাণ্ড সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জন্তুর মাংস টিনে ভরা হইতেছে। এই একটিমাত্র কারখানা হইতে আগামী মরসুমের সময় ত্রিশ হাজার বাক্স মাল প্রস্তুত হইবে; ইহার প্রত্যেকটিতে তিমি-মাংসের এক পাউন্ড টিন চব্বিশটি করিয়া থাকিবে। এই টিনে রক্ষিত তিমিমাংসের বড়ো এক অংশ শরৎকাল নাগাইদ এ দেশে আসিয়া পৌঁছিবে এরূপ আশা আছে। ক্যানেডা এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ এই উভয় দেশেই আজ এই অতিকায় জন্তুর মাংস লোকে নিয়মিতভাবে আহার করিতেছে।

৪৩

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তিমি মৎস্যই নহে, উষ্ণশোণিত জীব। সে নির্মলখাদ্য-ভোজী। কাঁকড়া, গলদাচিংড়ি, বাইন প্রভৃতি যাহা সাধারণত আমরা পছন্দ করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। ইহার মাংস স্বাদু এবং ক্ষুধাবর্ধক দুইই। আমরা খাবার জিনিসের মতোই যে কেবল তিমির ব্যবহার করিতেছি তাহা নহে, উহার ত্বক্‌কে খুব মজবুত চামড়ায় পরিণত করা যাইতে পারে, ইহাও আবিষ্কার করা হইয়াছে। একটিমাত্র তিমি হইতে, তিন হইতে চারি হাজার বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়।

৪৪

আমি এইমাত্র তোমার নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ ও চিত্তগ্রাহী পত্র পাইলাম এবং অবিলম্বে তাহার উত্তর দিতে বসিয়াছি। দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার পর G—এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ লইবার জন্য J-তে গিয়াছিলেন। স্থানপরিবর্তনের কারণে তিনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে যে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরে তাঁহাকে অমন শয্যাগত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার পরিণাম-ফল হইতে তাঁহাকে কখনো যথার্থরূপে মুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমি তোমার কথা প্রায়ই চিন্তা করি, এবং B-তে তোমার জীবনযাত্রা কিরূপ, সেই বিষয়ে আরও অধিক কিছু জানিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করি।

৪৫

৪ঠা এপ্রিল তারিখে K—রণক্ষেত্রের পুরঃসীমায় মহাযুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। আজ ২৬শে জুন, কিন্তু আমি ঐ পূর্বের তারিখের পর আর কোনো সংবাদ পাই নাই। বহির্জগৎ হইতে এমন সম্পূর্ণ-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা অতিশয় পীড়াদায়ক। মাসে বারেকমাত্র-যাতায়াতকারী একটি পালের তরণী ভিন্ন বাহিরের সঙ্গে যোগরক্ষার আমাদের আর কোনো উপায় নাই, উহাও এই যুদ্ধের সময় প্রায়ই অত্যন্ত দেরিতে আসে। ইহা নিদারুণ উদ্‌বেগের সময়। W—এবং H-ও ফ্রান্সে আছেন বলিয়াই বোধ করি। সংবাদপত্রের মারফতে আমি সর্বশেষ যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা ২রা জুনের; অবস্থা তখন অত্যন্তই আশংকাজনক দেখাইতেছিল।

৪৬

বোধ করি তুমি জান যে, W—টাইগ্রিস্‌ তীরে হত হইয়াছেন এবং G—হাসপাতালে আছেন। তিনি ও E—একজন নৌবায়ুরথী সৈনিক হইয়াছেন। তিনিও হাসপাতালে। তিনি সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং অনেক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে তোলা হয় নাই। কবে যে এই-সকলের অবসান হইবে।

G—তোমাকে তাঁহার ভালোবাসা জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। আজ সকালে ডাক লওয়া বন্ধ হইবে এবং তিনি স্বয়ং পত্র না লিখিয়া আমাকেই লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঠিক এখনি তাঁহার সময়ের অত্যন্ত টানাটানি।

৪৭

কুব্লেই খাঁর অধীনে মোগলগণ যখন সেই পূর্বতন গৌরবান্বিত এবং প্রতাপশালী সুং-বংশকে নিয়তই অধিকারচ্যুত করিয়া চীন সাম্রাজ্যকে বিদেশী শাসনের অধীন করিতেছিল, তখন ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইতেছে। দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অবশেষে সুংদিগের প্রায় শেষ সৈন্যদলও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল এবং সেই বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং প্রধান সেনাপতি ইয়ান টীয়েন শিয়াঙ্গ মোগলদের হস্তে পতিত হইলেন। আত্মসমর্পণের নিয়মপত্র লিখিবার এবং সে সম্বন্ধে স্বদলকে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইল, কিন্তু তিনি আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। বিজয়ীদিগের নিকট তাঁহাকে নিষ্ঠা স্বীকার করাইবার জন্য পরে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাঁহাকে তিন বৎসর কারাগারে রাখা হয়।

৪৮

তিনি লিখিয়াছেন—'আমার কারাগার কেবলমাত্র আলেয়া-দ্বারা আলোকিত; যে তিমিরাবৃত নির্জনতায় আমি বাস করি, বসন্তের নিশ্বাস তাহাকে একবারও নন্দিত করে না। শিশির ও কুয়াশার মধ্যে খোলা পড়িয়া থাকিয়া আমার অনেক সময় মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু দুইটি আবর্তমান বৎসরের সকল কয়টি ঋতু ধরিয়া ব্যাধি বৃথাই আমার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। ঐ আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর ভূমি আমার কাছে স্বর্গই হইয়া উঠিল; কারণ আমার মধ্যে এমন-কিছু ছিল যাহা দুর্ভাগ্য কখনো অপহরণ করিতে পারিত না। সেইজন্য আমি আমার মাথার উপরে ভাসমান শ্বেতবর্ণ মেঘের দিকে তাকাইয়া এবং আকাশেরই মতো অসীম দুঃখভার হৃদয়ে বহন করিয়া দৃঢ় হইয়া রহিলাম।'

৪৯

অবশেষে তিনি কুব্লেই খাঁর সম্মুখে আহূত হইলে কুব্লেই খাঁ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি চাও কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'শ্রীল শ্রীযুত সুং সম্রাটের অনুগ্রহে আমি তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলাম। আমি দুই প্রভুর সেবা করিতে পারিব না; আমি কেবল মৃত্যু ভিক্ষা করি।' তদনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। পুরাতন রাজধানীর অভিমুখে নমস্কার করিয়া তিনি অবিচলিত-ভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শেষ কথা—'আমার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে।'

৫০

জ্বরে শরীর যে পরিমাণ জল চায়, এমন আর কখনো চায় না। ইহার অনেক কারণ আছে। একটা আংশিক কারণ এই যে, ঘামের দ্বারা অনেক বেশি ক্ষয় হইতে থাকে বলিয়া অনেক বেশি জলের দরকার হয়: আর-একটি কারণ এই যে, জ্বরে শরীর বিষাক্ত হইতে থাকে এবং জল সেই বিষকে পাতলা করিয়া দেয়। সুরাসার পান করার পরে জল পান করিবার প্রয়োজন ঠিক অনুরূপ কারণেই ঘটিয়া থাকে। জ্বরে জিহ্বা মুখ এবং কণ্ঠ শুকাইয়া যায়; তাহার কারণ এই যে, বিষ যেখানে মর্মস্থানগুলিকে আক্রমণ করে সেখানে তাহাকে গুলিয়া পাতলা করার জন্য প্রাপ্তিযোগ্য সমস্ত জলের প্রয়োজন ঘটে। জ্বরের সময়ে রোগী জল চায়, তাহার আর-একটা কারণ এই যে, তখন সে গরম হইয়া উঠে এবং ঠাণ্ডা জলের সংযোগে তাহার দেহতাপ কমিয়া যায়। ভিতরে যে বিষ আছে জল কেবল যে তাহাকে পাতলা করে তাহা নহে, তাহা দূরে করিয়াও দেয়।

৫১

এইরূপ কথিত আছে যে, ফ্রান্সে যখন প্রথম পারস্যদেশীয় দৌত্য প্রেরিত হয়, তখন একদিন বয়সের এবং রূপবত্তার নানা অবস্থায় বিরাজিত ফরাসি মহিলাবৃন্দ-দ্বারা তাঁহার ঘর পূর্ণ দেখিয়া, রাজদূত আশ্চর্যান্বিত হইয়া যান। ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে বলা হইল যে, অজ্ঞাতপ্রায় দেশের প্রতিনিধিকে দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাঁহারা আসিয়াছেন। আরও এরূপ গল্প শুনা যায় যে মহামান্য মন্ত্রী তাঁহাদের কাহারও সহিত কথা বলিলেন না, তাঁহাদের প্রত্যেককে দেখিয়া দেখিয়া ঘরের চারি দিকে বেড়াইতে লাগিলেন ও তাঁহার সহচর দোভাষীর নিকটে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। একটি বর্ষীয়সী ও অতিভূষিতা মহিলা নিজেকে অতিপ্রকট করিয়াছিলেন; তিনি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মন্ত্রী কী বলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'মহামাননীয় কেবল আপনাদের কাহার সৌন্দর্যের কত মূল্য, তাহাই নির্ধারণ করিয়া দিলেন।' সেই মহিলা একজনকে নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভালো, ঐ যুবতীর সম্বন্ধে তিনি কী বলিলেন?'

৫২

মন্ত্রী বলিলেন, 'উনি পাঁচ হাজার ক্রাউনের যোগ্য।'

আর একজনকে দেখাইয়া মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর ইনি?'

'দুই হাজার।'

'আর ঐ যে উনি?'

মন্ত্রী বলিলেন, 'উঁহার জন্য তিনি আটশত ক্রাউন দিতে পারেন।'

'আর আমার সম্বন্ধে তিনি কী বলিলেন?'—দোভাষী ইতস্তত করিতে লাগিলেন, কিন্তু উত্তর দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন যে, তিনি কিছু বলিতে পারেন না। সেই মহিলা জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কিন্তু আমি জানি যে তিনি কিছু বলিয়াছেন।' দোভাষী অবশেষে হয়রান হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, 'সত্য কথা বলিতে কী, মহামান্য মন্ত্রী আপনার নিকটে যখন আসিলেন তখন বলিলেন যে, এ দেশের আধপয়সা পাইপয়সা প্রভৃতি তাঁহার জানা নাই।'

৫৩

উত্তর মেরুপ্রদেশে প্রথম আগমনে যে ছবি মনে মুদ্রিত হয় তাহা স্মৃতিপথে অনেক কাল লাগিয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া হয়তো তুমি সমুদ্রের মাঝখানে এক দিক হইতে অন্য দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছ; ক্রমশ জাহাজ শান্ততর জলরাশির মধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। কিছু দিন ধরিয়া যে কুয়াশা জাহাজের কয়েক গজ মাত্র দূরের সমস্ত দৃশ্য অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল, ডাঙার উপরকার ঝাপসাভাব (land haze) দেখা গেল, সূর্য সীসকবর্ণ আকাশ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

৫৪

একখণ্ড বরফ জাহাজের পার্শ্বদেশ ঘর্ষণ করিল এবং এক মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে দোলায়িত একটি সাদা জিনিসের প্রতি তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ইহাই প্রথম ভাসমান তুষারপর্বত। তুমি আরও নিকটে আসিলে তুষারগিরি-সকল এত বহুসংখ্যক হইল যে, অসুখজনক হইয়া উঠিল;

শীতলজলতল হইতে কৌতূহলী সীলগুলি তাহাদের মাথা উপরে তুলিতেছে। একটা সাদা তিমি বা ছোটো একঝাঁক নর্‌হ্বল তিমি গুরুশ্বাস ফেলিয়া জাহাজের চারি দিকে বেড়াইতেছে।

৫৫

S—তাহার পীড়িত ভ্রাতা চার্লসের সেবা করিতেছিল, ঐ ভাইটি পরে মারা গিয়াছে, ঐ ঘটনা আমাকে অত্যন্তই ব্যথিত করিয়াছে। S—অপেক্ষা চার্লি ছোটো ছিল, সে অতি মনোহর-স্বভাবের যুবক ছিল। সে আমার পিতার নিকট কাজ করিত; দুই বৎসর ধরিয়াই কাজ করিয়াছে। যতগুলিকে আমি জানি তাহাদের মধ্যে সেই-ই অল্পবয়স্ক গ্রাম্য কৃষিমজুরের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। তুমি তাহাকে দেখিলে ভালোবাসিতে। সে তোমারই একটি কবিতার মতো ছিল। বিপুল শারীরিক বল, প্রফুল্লতা ও সন্তোষ, সর্বজনীন মঙ্গলেচ্ছা এবং নিঃশব্দ পুরুষোচিত ব্যবহারে ঐ যুবকের তুলনা মেলা দুষ্কর ছিল। একটা বৃদ্ধ চিকিৎসক তাহাকে হত্যা করিল। তাহার টাইফয়েড জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বৃদ্ধ নির্বোধ দুইবার তাহার রক্তমোক্ষণ করিল।

৫৬

জ্বরাবসান অতিক্রম করিয়াও বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু আপদ কাটাইয়া উঠিবার মতো শক্তি তাহার ছিল না। সকালবেলা S—যখন দাঁড়াইয়া ছিল চার্লি তখন দুই বাহুদ্বারা S-এর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, তাহার মুখ টানিয়া নামাইয়া চুম্বন করিল। S—বলে সে তখনি জানিতে পারিল যে, শেষাবস্থা নিকটে। S—শেষ পর্যন্ত দিবারাত্রি তাহার সঙ্গে লাগিয়া ছিল। সে তোমার ধরনের মানুষ ছিল বলিয়া আমি এত করিয়া তোমাকে তাহার কথা লিখিলাম। তাহার সহিত তোমার যদি পরিচয় হইত, আমি সুখী হইতাম। তাহার মধ্যে শিশুর মাধুর্য এবং তরুণ বাইকিঙের সাহস শক্তি এবং সদাতৎপরভাব ছিল। তাহার পিতামাতা দরিদ্র। অধিক কাজের তাড়া পড়িলে তাহার মাতাও স্বামীর সহিত ক্ষেত্রে কাজ করেন।

৫৭

সেদিন অপরাহ্ণে ভারি গরম ছিল; আর জাহাজ তখন কেপ্‌টাউনের প্রায় ১৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। ছায়াতেই উত্তাপ তখন ১০৫ ডিগ্রী, আকাশ তাম্রবর্ণ, সাগর ফুটন্ত তেলের মতো। হঠাৎ আমি ডেকের উপর হইতে একটা বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলাম এবং দেখিলাম আতঙ্ক-গ্রস্ত কাফ্রিরা ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে। জাহাজের তটান্তিক ভাগের উপর দিয়া তাকাইয়া আমি এমন একটি জীবকে দেখিতে পাইলাম যাহার চেয়ে বিকটমূর্তি জলচর বা স্থলচর প্রাণী কল্পনা করার সম্ভাবনামাত্র নাই। যদি আমি শান্তভাবে এমন কথা বলি যে, ঐ যে জীবটিকে দেখিয়াই প্রাচীনকালের বর্ণিত সমুদ্রের সর্প বলিয়া বুঝিয়াছিলাম তাহার মাথাটা একটা বড়ো আয়তনের পিপার মতো, তবে মনে করিয়ো না আমি অত্যুক্তি করিতেছি।

৫৮

ঐ সামুদ্রিক সর্পের মাথাটা ছিল জলের উপরিতল ছাড়িয়া প্রায় আধ ফুট উঁচু এবং তাহার সব চেয়ে চওড়া অংশে এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত প্রায় তিন ফুট। শক্ত লোমওয়ালা কাঁটা-সকল তাহার মুখ আবৃত করিয়া কোণাকুণি-ভাবে বাহির হইয়াছে এবং তাহার বড়ো বড়ো

গোল চোখ জাহাজটার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এবং তিরস্কারসূচক-ভাবে তাকাইয়া আছে, জাহাজের চাকার শব্দ যেন তাহার বৈকালিক নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে। তাহার স্কন্ধটা বেড়ে বারো ইঞ্চির বেশি হইবে না। দৈর্ঘ্যে সেই সামুদ্রিক সাপটি কতখানি ছিল, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে তাহার নড়াচড়ার জন্য যে হিল্লোলের সৃষ্টি হয়, তাহার শেষ হিল্লোলটি হইতে আন্দাজ করিলে বোধ হয় সে একশত পঞ্চাশ ফুটের কাছাকাছি হইবে।

৫৯

কাপ্তেন Van Den Woof অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে জাহাজের সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সেই সামুদ্রিক অতিকায় জীবটি দেখিতে লাগিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, এই সর্পের খবরই ডেনমার্ক-দেশীয় একটি ছোটো জাহাজের বৃদ্ধ কাপ্তেন জ্যান্‌সেন তিন মাস আগে কেপ্‌টাউনে দিয়াছিলেন; লোকে তখন বলিল, তিনি পাগল। তখন যাহার পাহারার পালা সেই কর্মচারীকে কাপ্তেন আদেশ দিলেন যে, সাবধানে ঐ জাহাজ সর্পের চারি দিকে ঘুরাইয়া লওয়া হউক এবং অনাবশ্যক বিপদের মুখে না ছুটিয়া গিয়া তাহার যত কাছে যাইতে পারা যায় তাহাই যাওয়া হউক।

৬০

Lum-Lum জাহাজ পাঁচবার সেই সামুদ্রিক অতিকায়ের চারি পাশ ঘুরিয়া আসিল; সাপটা ধীরে ধীরে আপনার বিশাল মাথা ফিরাইয়া জাহাজটার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, যেন সে আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে এবং তাহার পৃথিবীভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করিতে চায়। জাহাজে কাহারও ফোটোগ্রাফের যন্ত্র ছিল না; কাজেই সামুদ্রিক সর্পের ছবি তুলিবার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগটা নষ্ট হইল।

৬১

প্রিয়—

লন্ডন কিংবা প্যারিসের তুলনায় রোমের সাধারণ অবস্থা কী তাহার একটা আভাস পাইলে তুমি আনন্দিত হইবে, আমি জানি; কিন্তু তাহা দিতে পারা কী করিয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর? আমি তোমাকে ইমারতগুলির কথা বলিতে পারি কারণ সেগুলি আমি দেখি— কিন্তু মানুষের কথা সম্পূর্ণ আলাদা, কেননা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আমি দেখি না— অর্থাৎ আমি বাহ্য আকৃতি মাত্রই দেখি, এবং জীবনপথে যতই অগ্রসর হইতে থাকি ততই এই বাহ্য আকৃতি হইতে মত গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে আমরা সতর্ক হইতে শিখি। যাহা আমার সামনে আসে তাহাই আমি বর্ণনা করিব; কিন্তু তোমার উপরে ভার রহিল তাহা হইতে আপনার সিদ্ধান্ত আপনি করিয়া লইবে।

৬২

প্রথমেই ভিক্ষুকেরা আমার চোখে পড়ে; আমি যতটা চিত্র করিতে পারি বা তুমি যতটা কল্পনা করিতে পার ইহারা তদপেক্ষাও হীন এবং রুগ্‌ণাকৃতি। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় সর্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়, দ্বারে দ্বারে উত্ত্যক্ত করে এবং গাড়ির চারি দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়; ইহাতে বিস্মিত হইবার কথা নাই, কেননা রোমে ভিক্ষাবৃত্তি একটা উপজীবিকা। ভিক্ষুকেরা বিশেষ কয়েকটি আড্ডা

অধিকার করিবার অনুমতির জন্য গবর্নমেন্টকে টাকা দেয়। Piazza Di Spagna হইতে Trinita পর্যন্ত যাইবার জন্য যে সোপান উঠিয়াছে, তাহার সর্বোচ্চ পৈঁঠায় দাঁড়াইবার স্থলের জন্য Beppo টাকা দিয়া থাকে। কোনো একজন শ্রমশীল শিল্পী কারিগর যেমন তাহার দোকান ও আয়-সম্বন্ধে গর্ব করিতে পারে; নিজের স্থান ও লভ্য-সম্বন্ধে ইহারাও সেইরূপ গর্ব করে।

৬৩

সেদিন এক ভদ্রলোক-সম্বন্ধে আমি এক গল্প শুনিয়াছি; তিনি কিছুকাল রোমে থাকিবার পরে একজন ইটালীয় ভৃত্য ভাড়া করিলেন; সে খুব ভদ্র ও কার্যদক্ষ। তাহার মনিব যখন নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কেবল তখনি লোকটি তাহার সে চাকরি পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে ভদ্রলোকটি রোমে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার সেই পূর্বতন ভৃত্য পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে। ইহা তাঁহার কাছে শোচনীয় হীনতা বলিয়া মনে হইল এবং আনুকূল্যযোগ্য ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি তাহার পদ পুনর্গ্রহণ করিতে লোকটির নিকট প্রস্তাব করিলেন এবং সেইরূপ চুক্তি হইল। ভৃত্যটি তাহার কার্যে ফিরিয়া আসিয়া বেশ ভালো ব্যবহারই করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের অভিজ্ঞতার পরে সে তাহার প্রভুর কাছে আসিয়া বলিল যে, তাহার প্রতি মনিবের অনুগ্রহের জন্য সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং এই স্থানে সে বেশ স্বচ্ছন্দেও আছে, কিন্তু সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ঐখানে থাকা তাহার পোষাইবে না; ভিক্ষা করার মতো ইহা লাভজনক নহে এবং সেইজন্য সে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

৬৪

প্রায় একটার সময় জনতা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল এবং দোকান-সকল লুণ্ঠন ও পথিকদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। পুলিসদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল এবং প্রায় সকল পুলিস কর্মচারীই সামান্য-পুলিস ও অস্ত্রধারী-পুলিসের সহিত রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল। দাঙ্গাকারীরা তখন পুলিসের উপর লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল, পরন্তু পুলিস বিশেষ কৌশল ও ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছিল বলিয়া রক্তপাত বাঁচিয়া গিয়াছিল। এক সময় দাঙ্গা-কারীগণ পুলিসের দিকে অগ্রসর হইল এবং লাঠি ঘুরাইয়া বহু লোককে আঘাত করিল। সৈনিকগণ তখন পুলিসের সাহায্যার্থে আসিয়া নানা চতুষ্পথে স্থান গ্রহণ করিল। দুর্ভাগ্যবশত ইহাও ঈপ্সিত ফল-উৎপাদনে ব্যর্থ হইল। জনতার লোকে পুলিসকে ইষ্টকখণ্ড ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল এবং আক্রমণের ভয় দেখাইল।

৬৫

২০শে হইতে ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত উত্তর বঙ্গের সকল জিলাতে স্বভাবাতিরিক্ত বৃষ্টি পড়িয়াছে এবং তাহাতে দূরবিস্তৃত বন্যা ঘটাইয়াছে। রাজশাহী জিলার নওগাঁ মহকুমায় এবং ঐ কয়দিনে যেখানে প্রায় বিশ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে সেই বগুড়া জিলায় ইহার ফল সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল। বগুড়া জিলার পূর্বভাগ প্রায়ই প্লাবিত হয় বলিয়া সেখানে নৌকা রাখা হয়, কিন্তু পশ্চিম ভাগে এবং নওগাঁ মহকুমায় প্লাবন বিরল বলিয়া অত্যল্পসংখ্যক নৌকা থাকে; এইজন্য প্লাবন-পরিমিত ভূভাগের অধিবাসীগণ তাহাদের গৃহ হইতে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে বড়োই অসুবিধা ভোগ করিয়াছিল এবং সংবাদ পাওয়া ও সাহায্য প্রেরণ করারও বাধা ঘটিয়াছিল।

৬৬

দেওয়ালগুলি কাদায় প্রস্তুত বলিয়া এবং জলের বৃদ্ধিতে অতি শীঘ্র ধসিয়া যাওয়ায় বাসগৃহের ধ্বংস অত্যন্ত ব্যাপক হইয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার ও কালেক্টরগণ তৎক্ষণাৎ উপহত স্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং তাঁহারা গবর্নমেন্টের সকল বিভাগের কর্মচারীগণের ও বহুসংখ্যক বেসরকারি কর্মীর সহায়তায় লোকের আনুকূল্যের জন্য যথাসম্ভব পন্থা অবলম্বন করিতে কালক্ষেপ করেন নাই। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষণিক-ব্যবহার্য বাসা তুলিয়া দেওয়া হয়, দূরবর্তী স্থানসমূহে দুঃখমোচন-দল পাঠানো যায় এবং বিতরণের পক্ষে অনুকূল কেন্দ্রসমূহে ট্রেনে করিয়া খাদ্য আনীত হয়। ৩১শে আগস্ট নাগাদ বন্যা কমিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ফসলের কী পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই।

৬৭

আমরা অবশেষে সাদা বাড়ি, বীথিকা, প্রশস্ত রাস্তা ও দোকান-পাটে পূর্ণ রুশীয় শহর নূতন বোখারায় পৌঁছিলাম এবং প্রাচীন বোখারায় যাওয়ার জন্য আমরা একটি শাখা লাইনে গাড়ি বদলাইলাম। সুখদৃশ্য প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র-সমূহের মধ্য দিয়া গাড়ি চলিল। সেগুলি দক্ষিণ-ইংলন্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও উর্বর। রৌদ্রালোকিত বারো ভর্স্ট্ পথ চলার পর মুসলমানী এশিয়ার সকলের চেয়ে সেরা এই শহরের মেটে রঙের কাদার দেওয়াল আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এমন স্থান কেবল মায়াবলে আমাদের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। আলাদিনের যে প্রাসাদকে জাদুকর মরুভূমিতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল নিশ্চয়ই তাহা যেরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিল ইহা আমাদিগকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিল। দন্তুরাকৃতি প্রাচীরবেষ্টনের অন্তর্ভাগে সংকীর্ণ রথ্যায়, আচ্ছাদিত গলিতে, অবরোধকারী দেওয়ালের পশ্চাতে দেড় লক্ষ মুসলমান সম্পূর্ণ নিজের নিজের মনের মতো করিয়া বাস করিতেছে—ইহাদের উপরে অনুভবযোগ্য কোনো বহিঃপ্রভুত্ব নাই।

৬৮

লিখিতে পড়িতে পারে না এমন একজন ব্রহ্মিককে পাওয়া দুঃসাধ্য। শিক্ষা খুব গভীর নহে—ব্রহ্মিক ভাষা পড়া ও লেখা; সরল, খুবই সরল গণিত; মাস তারিখের জ্ঞান, এবং হয়তো অল্প-কিছু ভূগোল এবং ইতিহাস। কিন্তু তাহাদের ধর্ম-সম্বন্ধে তাহারা অনেকটা শিক্ষা করে। তাহাদের ধর্মশাস্ত্রের বহুলাংশ, তাহার আখ্যায়িকা এবং উপদেশভাগ, তাহাদিগকে মুখস্থ করিতে হয়। যখন ভোর হইয়া আসিতেছে তখন ছেলেরা এবং সন্ন্যাসীরা অনাবৃত ভূমির উপরে হাঁটু গাড়িয়া গান গাইতেছে—এই দৃশ্যটি, পৃথিবীতে যত সুন্দর দৃশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে একটি। কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কাজে তাহাদের ধর্মশিক্ষা অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত সম্পূর্ণ; কেননা, যদিবা কেহ স্কুলের ছেলেমাত্রও হয়, তথাপি মঠে সন্ন্যাসীরা যেমন করিয়া বাস করেন তাহাকেও সেইরূপ পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়।

৬৯

Spalding একটি শূকরশাবককে জন্মমুহূর্তেই একটি থলির মধ্যে পুরিয়া সাত ঘণ্টা ধরিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে শূকরাঙ্গনের কাছে শূকরী যেখানে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল তাহার দশ ফুট তফাতে তাহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। শূকরশাবক তাহার মাতার মৃদু ঘোঁৎ ঘোঁৎ

শব্দ শীঘ্রই চিনিতে পারিল, এবং বেড়ার নিম্নতর বাতার নীচে দিয়া কিংবা উপর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়াস করিতে করিতে শূকরাঙ্গনের বাহিরে বাহিরে চলিতে লাগিল। অল্প যে কয়টা জায়গা দিয়া প্রবেশ করা সম্ভব, তাহারই মধ্যে একটা জায়গার বেড়ার বাতার নীচে দিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে জোর করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল। যেমনি ভিতরে প্রবেশ করা, অমনি কিছুমাত্র না থামিয়া শূকরগৃহের মধ্যে তাহার মাতার কাছে সে গেল এবং তখন তাহার ব্যবহার অন্যদের মতোই হইল।

৭০

বোধ হয় স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময়েই এই কথাটি স্পষ্টতররূপে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয় যে, মাছি আন্ত্রিক জ্বরের বাহন এবং সেইজন্য বিপৎসংকুল। এক্ষণে ইহা সাধারণত স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র আন্ত্রিক জ্বর নহে, পরন্তু সান্নিপাতিক জ্বর এবং ওলাউঠার বীজ এবং সম্ভবত শিশু-উদরাময় প্রভৃতি অন্যান্য রোগের বীজও মাছি ছড়াইয়া দিতে পারে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, মাছি যক্ষ্মাবীজাণুও বহন করে। যেখানে ইহাদের জননযোগ্য স্থান এবং রোগবীজের সংস্পর্শ-সম্ভাবনা আছে, মাছি সেখানেই অত্যন্ত ভয়ংকর রোগবিস্তারক হইয়া উঠে। Dr. Hindle দেখিয়াছেন বাতাসের উজানে যাইবার অথবা তাহা পার হইয়া যাইবার দিকেই মাছির ঝোঁক। বৃষ্টিহীন দিন এবং উত্তাপ তাহাদের ছড়াইয়া পড়িবার পক্ষে অনুকূল, এবং খোলা পাড়াগাঁয়ে মাছিরা শহরের চেয়ে বেশি দূরে ভ্রমণ করে, সম্ভবত তাহার কারণ এই যে, শহরে বাড়িগুলি তাহাদিগকে খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়া থাকে।

৭১

পীত নদীর তীরবর্তী হোনান শান্টুং এবং শান্সিতে যাহাদের আদি বাসস্থান সেই উত্তর-দেশীয় চৈনিকেরা ক্যানটুং এবং ফুকিয়েন-নিবাসী দক্ষিণচৈনিকদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জীব। উত্তরদেশীয়েরা সাধারণত বৃহদায়তন; ইহারা সকল ঘটনাই অবিচলিতভাবে গ্রহণ করে, এবং গার্হস্থ্য কিংবা রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় কোনো বাঁধা নিয়মের পরিবর্তনের বিরোধী। দক্ষিণদেশীয়েরা সাধারণত আয়তনে খাটো, উত্তরের লোকদের চেয়ে তাহাদের বর্ণ কালো, এবং তাহারা সহজে উদ্‌বেজিত হয়। ইহারা পুরাতন প্রথা-সম্বন্ধে অসহিষ্ণু এবং তাহাদের উদীচ্য স্বজাতীয়েরা যে সতর্ক গণ্ডির মধ্যে সন্তুষ্ট ইহারা তাহা ভেদ করিয়া আপনাদিগকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

৭২

এ দিকে আহার সম্বন্ধে ইহাদের উভয়ের রুচি স্পষ্টতই পৃথক। উত্তরচৈনিকেরা প্রবল-শীতপ্রধান-দেশীয় লোক, এইজন্য যে তণ্ডুল দক্ষিণদেশীয়দের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহাকে তাহারা উপেক্ষা করে এবং ময়দা ও গোধূমজাত অন্যান্য পদার্থ খাইয়াই প্রধানত বাঁচিয়া থাকে। দক্ষিণ-বাসীদের দেশ এত গরম যে, গুরুপাক খাদ্যে তাহাদের বিতৃষ্ণা; তাহারা ভুট্টা এবং স্নিগ্ধকর শাক-সবজি কিছুতে ছাড়িতে চায় না। কিন্তু দক্ষিণদেশীয়দের প্রতি উত্তরদেশীয়দের ঈর্ষ্যাই বিরোধের সকলের চেয়ে প্রধান কারণ। দক্ষিণ প্রদেশগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আধুনিক অবস্থার সংস্পর্শে আনীত হইয়াছে এবং এইজন্য যে যথেচ্ছচারী শাসন উদীচ্যদের প্রায় প্রকৃতিগত, তাহার বিরুদ্ধে ইহারা উদ্‌বেজিত হইয়া উঠে।

৭৩

দক্ষিণদেশীয়েরা বাণিজ্যে তাহাদের চেষ্টা সন্নিবিষ্ট করিয়া ধনী হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা বিদেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের উদীচ্য প্রতিবেশীদের চেয়ে অধিকতর আধুনিক ভাবাপন্ন হইয়াছে, এবং উত্তরদেশীয় যে স্বৈরশাসকগণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও সংশয়পর তাহাদের কর্তৃক উত্তরের রাজধানী হইতে শাসিত হওয়া, ইহারা ঘৃণার সহিত দেখে। তাহা ছাড়া, তাহারা চারি দিকে তাকাইলে দেখিতে পায় যে, উত্তর প্রদেশে প্রভূত পরিমাণে রেলোয়ে পাতা হইয়াছে, অথচ যে দক্ষিণ প্রদেশ সর্বাপেক্ষা বহুপ্রসূ সেখানে রেলোয়ে অল্প এবং বাণিজ্যব্যাবসা সেকেলে বহু-শ্রমসাধ্য এবং যাতায়াতের অব্যবস্থাবশত প্রতিহত।

৭৪

একদিন এরূপ ঘটিল যে, প্রায় মধ্যাহ্নকালে আমার নৌকার অভিমুখে যাইতে যাইতে সাগরতটে একটি মানুষের নগ্নপদের চিহ্নে আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিলাম; এই চিহ্ন বালুকার উপর অত্যন্ত স্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল। বজ্রাহতের মতো অথবা যেন কোন্ প্রেতমূর্তি দেখিয়াছি এমনি ভাবে দাঁড়াইলাম। আমি কান পাতিলাম, আমার চারি দিকে তাকাইলাম, কিছু শুনিতে পাইলাম না অথবা দেখিতেও পাইলাম না। আরও অধিক দূর দেখিবার জন্য ক্রমোচ্চ ভূমির উপরে উঠিয়া গেলাম। আমি তটের এক দিকে চলিয়া গেলাম আবার বিপরীত দিকে চলিয়া আসিলাম, কিন্তু সবই সমান; সেই একটি ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। আরও অধিক চিহ্ন আছে কিনা দেখিবার জন্য এবং ইহা আমার কল্পনা হইতে পারে কিনা তাহা অবধারণের জন্য পুনর্বার ইহার কাছে গেলাম; কিন্তু এরূপ সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না, কেননা সেখানে ঠিক কেবল একটি পায়েরই ছাপ ছিল—পদাঙ্গুলি গোড়ালি এবং একটি পায়ের প্রত্যেক অংশের ছাপ। ইহা কী করিয়া সেখানে আসিল তাহা বুঝিলাম না অথবা লেশমাত্র কল্পনা করিতে পারিলাম না।

৭৫

মনে করো, যদি হাইড পার্কের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বহুসংখ্যক কামান থাকিত এবং একই মুহূর্তে বৈদ্যুতদ্বারা এই-সমস্ত কামান ছোঁড়া যাইত, তবে যদিও শব্দগুলি একই কালে উৎপন্ন হইত, তথাপি যেখানেই তুমি দাঁড়াও-না কেন, একসঙ্গে সমস্ত শুনিতে পাইতে না; হাতের কাছের কামান হইতে আওয়াজ তোমার কানে প্রথমে পেঁৗছিত এবং অধিকতর দূরের শব্দ ক্রমশ পরে আসিত। তোমার নিকট হইতে কত দূরে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়াছে তাহার হিসাব করিতে গেলে, প্রথমে যে সময়ে তুমি স্ফুরণ দেখিয়াছিলে এবং তাহার পরে যে সময়ে তাহার অনুবর্তী বজ্রগর্জন শুনিয়াছ, তাহারই মধ্যকালীন প্রত্যেক পাঁচ সেকেন্ডে এক মাইল ধরিয়া লইতে হইবে। আলোক এবং শব্দ একই কালে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু শব্দ প্রত্যেক মাইল উত্তীর্ণ হইতে পাঁচ সেকেন্ড লয়, অথচ আলোক শব্দের তুলনায় তৎক্ষণাৎ ধাবিত হয় বলা যাইতে পারে। আলো এত দ্রুত চলে যে, এক সেকেন্ডে সাতবারের অধিক পৃথিবীর চারি দিকে তাহা দৌড়িয়া আসিতে পারে। আমাদের চাঁদ আমাদের এত কাছে আছে যে, এই অল্প দূরত্ব অতিক্রম করিতে আলোকের এক সেকেন্ডের কিঞ্চিদধিক সময় লাগে। কিন্তু সূর্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের আট মিনিট কাল লাগে; বস্তুত যে-সকল সূর্যরশ্মি এখনি আমাদের চক্ষুতে আসিল তাহা আট মিনিট আগে সূর্য ছাড়িয়াছে।

৭৬

দৈর্ঘ্যে তিনি মাঝারি আয়তনের চেয়ে কিছু বেশি হইবেন। তাঁহার বর্ণ পাণ্ডুর ছিল এবং তাঁহার আয়ত কৃষ্ণচক্ষু তাঁহার মুখশ্রীতে যে একটি গাম্ভীর্যের ব্যঞ্জনা অর্পণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মতো প্রফুল্ল মেজাজের লোকের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তাঁহার গড়ন পাতলা ছিল, অন্তত তাঁহার শেষ জীবন পর্যন্ত; কিন্তু তাঁহার বক্ষপট ছিল গভীর, তাঁহার স্কন্ধ প্রশস্ত, তাঁহার দেহ পেশীযুক্ত এবং প্রমাণসংগত। তাঁহার সজ্জা এমনতরো ছিল যাহাতে তাঁহার সুন্দর আকৃতির অনুকূল শোভা সম্পাদন করিত; তাহা না ছিল অত্যলংকৃত, না চমৎকৃতিজনক, কিন্তু মূল্যবান।

৭৭

উপযুক্ত প্রকারের এবং উপযুক্ত পরিমাণে জ্বালানি পদার্থ এঞ্জিনের অবশ্যই চাই, নহিলে ইহা ভালো কাজ করিতে পারে না। উপযুক্ত প্রকারের এবং পরিমাণের তাপজনক খাদ্য মানবদেহের পক্ষেও আবশ্যক, নহিলে ইহা ভালো কাজ করিতে পারে না। মানবদেহ সকল সময়েই কিছু কাজ করিতেছে—এমন-কি, নিদ্রায়, রোগে এবং বিশ্রামকালে। এঞ্জিন গড়িতে হয় এবং মেরামত করিতে হয়, তাহাতে কয়লা ভরিতে হয়, তেল দিতে হয়, এবং তাহাকে কায়দায় রাখিতে হয়। মানবদেহ-সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আমাদের তাপ জোগাইবার খাদ্য, গড়িয়া তুলিবার, মেরামত করিবার খাদ্য এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার খাদ্য চাই। এখন মনে করো, আহার্যভাণ্ডারে আমাদের এই সকল প্রকারের খাদ্য আছে এবং তাহা রাঁধিবার জন্য কয়লা আছে। এই-সব খাদ্য যথা-পরিমাণে আমরা বণ্টন করিয়া দিতে নাও পারি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলিতেছি অত্যধিক অথবা অত্যল্প উত্তাপ দিবার খাদ্য, অত্যল্প নিয়ন্ত্রণ-কাজের খাদ্য, বা অত্যধিক গড়িয়া তুলিবার বা মেরামত করিবার খাদ্য সামঞ্জস্য নষ্ট করিতে পারে।

৭৮

পাখি যেন বায়ুর প্রবাহ বলিলেই হয়, কেবল পাখাগুলি-দ্বারা আকার লাভ করিয়াছে মাত্র; ইহার সকল পালকেই বাতাস আছে, ইহা নিজের সমস্ত কলেবর এবং চর্ম দিয়া বায়ু গ্রহণ করে এবং উড়িবার কালে ইহা বায়ুতাড়িত শিখার মতো বায়ুর সংঘর্ষে জ্বল জ্বল করিতে থাকে; ইহা বায়ুর উপরে বিশ্রাম করে, তাহাকে দমন করে, তাহাকে অতিক্রম করে এবং বেগে তাহাকে পরাভূত করে। ইহা বায়ুই, সেই বায়ু আপনাকে জানিয়াছে, আপনাকে জিতিয়াছে, আপনাকে শাসন করিতেছে। পুনশ্চ, পাখির কণ্ঠেও যেন বায়ুরই বাণী দেওয়া হইয়াছে। বায়ুর মধ্যে ধ্বনিমাধুর্যে যাহা কিছু দুর্বল উদ্দাম এবং অনাবশ্যক তাহাই ইহার গানে সুগ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে।

৭৯

যুক্তরাজ্যে চাউলের বার্ষিক খরচ লোক-পিছু ছয় পাউন্ডের ঊর্ধ্বে কখনো চড়ে নাই। ইহার বিরুদ্ধ তুলনায়, আমরা যতটা চাউল খাই য়ুরোপ তাহার পাঁচগুণ অধিক খাইয়া থাকে এবং ঘন-অধ্যুষিত প্রাচ্যদেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে এমন-কি ২৫০ পাউন্ড পর্যন্ত চাউল খাইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ দ্বীপের পাঁচ কোটি লোক বৎসরে ৭৫ কোটি পাউন্ডের অধিক চাউল খাইত এবং জার্মানি বৎসরে এক শত কোটি পাউন্ডের অধিক চাউল আমদানি করিত। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কালিফর্নিয়ায় চাউল-আবাদের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন বিস্তার কৃষিবিভাগের একলার উদ্যম হইতেই লব্ধ। গত মরসুমে স্যাক্রামেন্টো উপত্যকায় ৬০,০০০ একরে ধান বোনা হয় এবং

পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের ফসল বিক্রয় হয়। এই সবে আরম্ভ। কথিত হইয়াছে যে, প্যাসিফিক উপকূলে বৎসরে যে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড চাউল খরচ হয়, তাহার চেয়ে বহুগুণ অধিকতর উৎপাদনের মতো ব্যবহার্য ধানের জমি কালিফর্নিয়ায় আছে। তাহা ছাড়া ক্ষেত্রগুলি প্লাবিত করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট জলেরও জোগান সেখানে আছে। চাউল-ব্যবসায়ের এই নূতন প্রয়াস যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিতেছে তাহাতে বোধ হয় মার্কিনেরা ভাতকেই প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবে। ইহার পোষণগুণ প্রভূত। অধিকাংশ মার্কিন-পাচকেরা ইহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় জানে না বলিয়া এবং ইহা আঠা আঠা পিণ্ডাকারে পাতে দেওয়া হয় বলিয়াই, সম্ভবত বর্তমানে লোকের কাছে ইহার আদরের অভাব।

৮০

কতকগুলি মরুজাত উদ্ভিদ জলসঞ্চয় করিয়া থাকে; ইহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত অভিসংযোগ-সাধনের সুবিদিত দৃষ্টান্তস্থল। ইহাদের শিকড়ের সংস্থান অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ইহার সাহায্যে প্রাপ্তিযোগ্য জলের আয়োজনকে তাহারা প্রকৃষ্ট পরিমাণে নিজের ব্যবহারে লাগাইতে পারে। কালিফর্নিয়ার মোহাব মরুতে F. V. Coville একজাতীয় শাখাবান মনসাসীজ দেখিয়াছেন; তাহা উনিশ ইঞ্চি উচ্চ এবং তাহার শিকড়ের জাল আঠারো ফিট পরিধির অধিক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। এই শিকড়-সকল ভূতলের কেবলমাত্র দুই হইতে চারি ইঞ্চি পর্যন্ত নীচে চলিয়া গিয়াছে; এইজন্য ধারাবর্ষণকে কাজে লাগাইবার পক্ষে ইহারা উপযুক্ত। এই উদ্ভিদের অভ্যন্তরভাগ প্রধানত জলসঞ্চয়কোষে নির্মিত, এমন-কি, ইহাতে শতকরা ৯৬ অংশ পরিমাণে জল সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপে এই উদ্ভিদ একটি জলাধার হইয়া উঠে এবং অনেক সময়েই পানের পক্ষে এই জল সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৮১

জগতের অধিকাংশ রোগই সজীব বীজাণু-দ্বারা সংঘটিত। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতীত ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না এবং ইহারা আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া রক্ত মাংস ধ্বংস করে ও তাহাই খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। প্রধানত ইহাদের আকৃতি চারি প্রকারের; ছোটো ছোটো গুলির মতো, নয় ঋজু দণ্ডের মতো, নয় দুই গোলপ্রান্তবিশিষ্ট দণ্ডের মতো, অথবা স্ক্রুর মতো। ইহারা নিজেকে বিভক্ত করিয়া অথবা ডিম্ব প্রসব করিয়া বংশবৃদ্ধি করে; তাহা এমন ভয়ংকর দ্রুত-বেগে করিয়া থাকে যে একটিমাত্র রোগবীজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বহুলক্ষ বীজ উৎপাদন করিতে পারে এবং যে জন্তুকে ইহারা আক্রমণ করিয়াছে, বিষ প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে অবশেষে মারিয়া ফেলিতে পারে। সজীব জন্তুদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্বে, মাটির উপরে সঞ্চিত ধূলি এবং ময়লার মধ্যে ইহাদের বাসা থাকে, বিশেষত সে মাটি যদি স্যাঁৎসেতে হয়।

৮২

একটি বেশ মজবুত রকমের জাপানি যুবক চৌরঙ্গির রাস্তা বাহিয়া যাইতেছিল, দুইজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার ঝগড়া বাধিল; তাহারা স্থানীয় বায়স্কোপশালায় চলিয়াছিল। জাপানি তাহাদের আচরণে বিরক্ত হইয়া বিনা কালব্যয়ে তাহাদের উভয়কে চিৎ করিয়া পাড়িয়া ফেলিল। নিকটবর্তী কর্মস্থানের দুইজন দারোয়ান সাহেবদের সহায়তা করিতে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু যাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে আসিল ইহারাও তাহাদেরই দশা প্রাপ্ত হইল। আরও দুইজন দারোয়ান এবং দুইজন কনস্টেবল ঘটনাস্থানে ছুটিয়া আসিল; তাহাদের আগমনের কয়েক সেকেন্ড

পরেই দেখা গেল তাহারাও রাস্তার মাঝখানে লুটাইতেছে। জাপানিকে দেখিয়া বোধ হইল যে, তাহার জুজুৎসু খেলা আরও কিছু দেখাইবার জন্য সে প্রস্তুত আছে। শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে মিষ্ট হাসিমুখে অন্য-সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। একজন য়ুরোপীয় সার্জেন্ট এই সংকটকালে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গে ফাঁড়ি-থানায় যাইতে তাহাকে সবিনয় অনুরোধের দ্বারা রাজি করাইল। গতকল্য রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

৮৩

একটি হিন্দুরমণীকে মিথ্যা পরিচয়ে বিবাহ করিবার অপরাধে হরিপুরের পুলিস মনোহর পাল-নামক এক ব্যক্তিকে এইমাত্র গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, অভিযুক্ত নিজেকে মথুর গাঙ্গুলীর পুত্র ব্রজ গাঙ্গুলী নামে অভিহিত করিয়াছিল এবং সে মাধব চক্রবর্তী নামে একজনের বাড়িতে বাস করিত। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সে মাধবের বাড়িতে বার্ষিক দুর্গাপুজা করিত। কানাই চাটুজ্জে নামে একজনের কাদম্বিনী বলিয়া এক অবিবাহিত ভগিনী ছিল। মথুরের পুত্রকে এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল যে, সে সন্ন্যাসী হইয়া তাহার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। মনোহর ইহাই জানিতে পারিয়া সন্ন্যাসীর মতো চলিতে লাগিল এবং লোককে জানাইল যে, সেই মথুরের নিরুদ্দেশ ছেলে। কানাই তাহার সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের বন্দোবস্ত করে এবং চার বৎসর পূর্বে হিন্দুপ্রথামতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি কানাইয়ের কাছে আসিত এবং একটা ব্যাবসা করিবে বলিয়া জানাইলে কানাই তাহাকে ৬৫০ টাকা দেয়। তাহার আচারব্যবহার কেমন সন্দেহজনক ছিল; পরে তাহার সত্য নাম ও জাতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। কানাইয়ের ভগিনী ইহা জানিতে পারিয়া তাহার ভাইকে বলে যে, তাহাকে উদ্ধার না করিলে সে আত্মহত্যা করিবে। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল এবং অভিযুক্ত গ্রেফ্‌তার হইল। আরও অনুসন্ধান চলিতেছে।

৮৪

ধনুষ্টংকার যে রোগবীজের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহারা ভূমির উপরিভাগে বাস করে; তাহারা বিশেষভাবে এমন ভূমিতলকে পছন্দ করে যেখানে ঘোড়া কিংবা গোরুর পাল বাস করিতেছে, যেমন আস্তাবল রাস্তা এবং গোলাবাড়ি। গোরু এবং ঘোড়ার শরীর হইতে যে-সকল ত্যাজ্য পদার্থ নির্গত হইয়াছে তাহা এই-সকল রোগবীজের পোষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। তাহারা চর্মের কোনো-একটা ক্ষুদ্র ক্ষত কিংবা কাটা ঘা দিয়া কিংবা নাকের কিংবা মুখের ভিতর দিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

৮৫

সেইজন্য যে-সব লোক খালি পায়ে যায়, কিংবা রাস্তায় পড়িয়া গিয়া যাহাদের ঘা লাগে বা আঁচড় লাগে, বিশেষত সেই রাস্তায় যদি ঘোড়া কিংবা গোরুর যাতায়াত থাকে, তবে ধনুষ্টংকারের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অন্য লোকদের চেয়ে ইহাদেরই অধিক। যখন ভূতলের উপরিভাগ শুকাইয়া যায় এবং মলিন পদার্থ উড়িয়া বেড়ায়, তখন বাতাসে ভাসমান ধূলি নাক মুখ বা কণ্ঠের মধ্যে কিছু পরিমাণ এই রোগবীজ বহন করিয়া আনিতে পারে। আর যদি সেখানে কোনো ক্ষুদ্র ক্ষত থাকে তবে ইহা রক্তে প্রবেশ করিয়া ধনুষ্টংকার ঘটাইতে পারে।

৮৬

এই গৃহ Madam Orange-এর; তিনি অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর বৃদ্ধা ফরাসি স্ত্রীলোকের খাঁটি নিদর্শন; তাঁহার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রের পুরঃসীমায় আছেন। প্রফুল্লভাবে স্বেচ্ছারত কর্মশীলতায় তিনি বিস্ময়জনক—এবং যদিও তাঁহার অল্পই কাপড় আছে এবং বস্তুত টাকা নাই, এবং না আছে কয়লা, না আছে বাতি, না আছে কেরোসিন, এবং পাঁচ হইতে দশ বছর বয়সের চারিটি ছোটো ছোটো শিশুর এবং চারিটি অত্যন্ত সতেজ মার্কিন সেনানায়কের সেবার ভারে তিনি ভারাক্রান্ত—তথাপি সকল সময়েই তাঁহার মুখে হাসি এবং কণ্ঠে হাস্যধ্বনি। এক অক্ষর ইংরেজি তিনি বলিতে কিংবা বুঝিতে পারেন না, আর আমাদের মধ্যে আমিই কেবল এক মাত্র আছি যে লোক ফরাসি শিখিবার জন্য, এমন-কি, প্রয়াসও করিয়াছে—সুতরাং কথাবার্তা চালাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া আমাদের কতটু বড়ো কাণ্ডটাই যে হয় তাহা কল্পনা করিতে পার।

৮৭

আমি এই ব্যাপারে নিজের ক্ষমতা-সম্বন্ধে যথার্থ গর্ব অনুভব করি; কারণ আমি দেখিয়াছি দুইশো রকমের বাঁধা অংগভঙ্গির সাহায্যে আমি প্রায় সবই বলিতে পারি। ছোটো শিশুগুলি চমৎকার, তাহাদের লইয়া আমরা সকলে খেপিয়া গিয়াছি। প্রত্যেক বার যখন আমরা বাড়ির বাহিরে যাই বা বাড়িতে প্রবেশ করি এবং তাহার মধ্যবর্তী সময়েও, যতবার তাহাদের মন যায় তাহারা সকলে অসিয়া আমাদের চুম্বন করে। তাহারা অন্য একজন ফরাসি স্ত্রীলোকের সন্তান এবং আমি যতটা বুঝিলাম তাহার স্বামী যুদ্ধে মারা গিয়াছে আর সে নিজে রুগ্‌ণ, তাই যখন সে পারে তখন যুদ্ধাস্ত্রের কারখানায় কিংবা সেই রকমের কিছু একটাতে কাজ করে।

৮৮

যুদ্ধ যত দিন চলে এই ছেলেগুলি Madam Orange-এর কাছে থাকিবে। বস্তুত তাহারা নিঃসম্বল, যথেষ্ট বলিতে যাহা বোঝায় এমন শীতের বস্ত্র তাহাদের নাই; তাহাদের জন্য জিনিসপত্র কিনিয়া দিয়া আমরা ভারি আমোদ পাইয়াছি। বর্ণনাপটু লেখকের ক্ষমতা যদি আমার আরও অধিক থাকিত তবে বড়ো ভালো হইত, কেননা, ইচ্ছা করে এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আর গৃহার মতো তাহার ছোটো ঠাণ্ডা ঘরটির চিত্র ধরিয়া রাখি, কিন্তু যথাযোগ্যমত করিয়া লিখিতে পারিলাম না।

৮৯

কিছুকাল পূর্বে সকলেই মনে করিত বাতাস যেন কতকটা সমুদ্রের জলের মতো, এবং ইহা ব্যাপ্ত হইয়া আমাদের উপরের এবং চারি দিকের আকাশ পূর্ণ করিয়াছে। নদী বাহিয়া চলিতে চলিতে জলের মাঝখানে যদি একটা গর্ত পাওয়া যাইত—একটা শূন্যতামাত্র—যাহার মধ্যে নৌকাটা পড়িয়া যাইতে পারে, তবে সে একটা ভারি অসুবিধার ব্যাপার হইত না কি? অথচ মানুষ যখন উড়া-কলে আকাশে ওঠে তখন মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটে। বাতাসে গর্ত আছে, বায়ুরথের সারথির পক্ষে তাহা পার হইয়া চলা অসম্ভব। তাহার যন্ত্রটা হঠাৎ ডুব মারে ও পড়িয়া যায় এবং সেটি যদি বহমান বাতাসের স্রোতের মধ্যে দ্রুত আসিয়া না পেঁৗছে, তবে তাহার গুরুতর আপদ ঘটিতে পারে। বাতাসের মধ্যে কেমন করিয়া যে এইরূপ গর্ত হয়, বৈজ্ঞানিক লোকেরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৯০

জিনিসপত্রের চড়া দামের গতিকে মাদুরাতে একটা গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াছিল। সোমবার সকালে একদল লোক একটি চালের বাজারের রক্ষককে মারপিট করিয়া লুঠ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আগাগোড়া সমস্ত শহরের দোকানদার লুঠের ভয় করিয়া তাহাদের দোকান বন্ধ করিয়াছিল। কালেক্টার এই উৎপাতের জায়গায় মোটরে করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লোকেরা তাঁহার কাছে দাবি করিল যে, তিনি যেন শস্য এবং কাপড়-ব্যবসায়ীদের প্রতি এই হুকুম জারি করেন যে, তাহারা সংগত দামে মাল বিক্রয় করে। তিনি বলিলেন, তাহাদের নালিশ জানাইয়া একটা দরখাস্ত দাখিল করিলে বিবেচনা করা হইবে। জনতার লোকেরা দাবি করিল—এখনি হুকুম জারি করা হউক। তাহারা কালেক্টারের গাড়ি ঘেরাও করিল এবং পাথর ছুঁড়িয়া মারিল; তাহার মধ্যে দুটো-একটা কালেক্টারকে লাগিল; যাহাই হউক, তিনি চলিয়া যাইতে পারিলেন। অল্প পরেই তিনি রিজার্ভ পুলিস লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আরও অধিক শান্তিভঙ্গ ঘটা নিবারণ করিতে কৃতকার্য হইলেন। দোকানগুলি কিন্তু সমস্ত দিন বন্ধ রহিল।

৯১

চীনের অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর মন্দ হইবার দিকে চলিয়াছে। বর্তমান মুহূর্তে গভর্ন-মেন্টের আটটি স্বতন্ত্র সৈন্যদল ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করিতেছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দক্ষিণদেশী সৈন্যদল লাগিয়া আছে। দশটি প্রদেশকে অল্পাধিক পরিমাণে দস্যুদলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহারা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো বাধা না পাইয়া লুটিতেছে, খুন করিতেছে এবং মানুষ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

৯২

স্থানীয় শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার জন্য যে প্রাদেশিক সৈন্যদলের নিযুক্ত থাকা উচিত তাহারা রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে চলিয়া গিয়াছে, এবং যখনি তাহারা স্বস্থান ছাড়িয়া যায় তখনি বড়ো বড়ো ভূভাগ চোর-ডাকাতের হাতে গিয়া পড়ে। যেখানে সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতেছে বলিয়া অনুমান করা হয় সেখানে লোকেরা যেরূপ উৎপীড়িত হইতেছে তাহা বাক্যের অতীত। গ্রামের লোকেদের ধন লুণ্ঠিত, তাহাদের গৃহ ভস্মীভূত এবং তাহারা নিহত হইতেছে। সমস্ত শহর ব্যাপিয়া লুট চলিতেছে, স্ত্রীলোক ও শিশুরা সৈনিকদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্বতে ও দুর্গম স্থানে হাজারে হাজারে আশ্রয় লইতেছে। সৈন্যেরা ন্যূনতম পরিমাণে লড়াই ও প্রভূততম পরিমাণে লুট করিবার জন্য বাহির হইয়াছে।

৯৩

তিনজন কয়েদীকে তাহাদের নিজ নিজ কুঠরি হইতে অসতর্কতাবশত পালাইয়া যাইতে দিয়াছে বলিয়া সেন্ট্রাল জেলের একজন সর্দার ও চৌকিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছিল, আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিচার শেষ করিয়াছেন। একটি দড়িতে ভাঙা কাচ আঠা দিয়া জুড়িয়া তাহাদের কুঠরির লোহার গরাদে কাটিয়া এই তিনজন কয়েদী অত্যন্ত চতুরতার সহিত পালাইতে পারিয়াছে। তাহার পরে যখন চৌকিদার দূরে গেল, তখন তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া ইহারা ইলেক্‌ট্রিক্‌ তার ধরিয়া নীচে নামিয়া এবং সীমানার প্রাচীরের উপরে চড়িয়া পালাইয়া

গেল। জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রকাশ করেন যে, অভিযুক্তেরা সে সময়ে শাসনলাঘবযোগ্য অবস্থায় কাজ করিতেছিল, যেহেতু কর্মচারীদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক হওয়াতে জেলব্যবস্থা বিশৃঙ্খলতায় উপনীত হইয়াছিল।

৯৪

খোলা জানলার কাছে পাঁচ মিনিট ধরিয়া সচেষ্টভাবে গভীর নিশ্বাস লওয়া, দিন আরম্ভ করার পক্ষে মন্দ সাধনা নহে। ইহাতে ফুসফুসগুলির সকল অংশের স্থিতিস্থাপকতা-রক্ষার চর্চা আপনি ঘটে, এবং তাহাদের মধ্যে রক্তনিশ্চলতার বাধা দেয়। ইহা স্বাস্থ্য এবং সুপরিপাকের সাহায্য এবং কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিকার করে। ইহা নিশ্চিত যে, অবাধ শ্বাসক্রিয়াকে যে-সকল ব্যায়াম বাধা দেয় সে সমস্তই মন্দ; এবং মোটের উপরে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, অন্য ব্যায়ামগুলি যে পরিমাণে শ্বাসক্রিয়ার আনুকূল্য করে এবং তদ্দ্বারা তলপেটের যন্ত্রগুলির এবং হৃদ্‌যন্ত্রের উপকার সাধন করে বহুলাংশে সেই পরিমাণেই তাহারা ভালো।

৯৫

আমি একজন ব্রহ্মিক মহিলাকে জানি; একজন ইংরেজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইংরেজটি অনেকগুলি হাঁসের বাচ্ছা কিনিয়াছিলেন, তাহারা বেশ সুন্দর হইয়া বড়ো হইয়াছিল, এবং আমার বন্ধু ইহাদের মধ্যে একটি আমাকে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু একদিন যখন দেখিলাম সব হাঁসগুলি অন্তর্ধান করিয়াছে তখন যে কিরূপ নিরাশ হইয়াছিলাম কল্পনা করিয়া দেখো। আমার বন্ধু আমাকে বলিলেন—তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রী নদীর উজানে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে হাঁসগুলি লইয়া গিয়াছিলেন।

৯৬

তাহাদিগকে যে মারা হইবে সে তিনি সহিতে পারেন নাই; এইজন্য তাহাদিগকে লইয়া গিয়া তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে এখানে একটি সেখানে একটি করিয়া বিতরণ করিলেন; কেননা তিনি জানিতেন হাঁসগুলিকে তাঁহারা ভালো করিয়া রাখিবেন এবং মারিবেন না। যখন তাঁহার স্বামীর প্রাতরাশের জন্য মুর্গি মারিতে হুকুম করিতে হইত তখন এই মহিলা ভয়ংকর কষ্ট পাইতেন। আমি দেখিয়াছি পাচককে মুর্গি মারিতে বলিয়া তিনি দৌড়িয়া বারান্দায় গিয়া কানে হাত দিয়া বসিতেন—ভয়, পাছে তাহার চীৎকার তিনি শুনিতে পান।

৯৭

পর্যবেক্ষণের দ্বারা যতগুলি নিশ্চিততম তথ্য জানা গিয়াছে তাহারই মধ্যে একটি এই যে, পৃথিবীর কঠিন আবরণটি স্থিতিস্থাপক-প্রকৃতির। হ্রাসবৃদ্ধিশীল চাপের ক্রিয়াধীনে বৃহৎ ভূখণ্ড-সকল উঠে এবং পড়ে। এইজন্য এ কথা অনুমান করা সংগত যে, সুদূর কালে মহাদেশব্যাপী দুই-এক মাইল গভীর প্রকাণ্ড হিমসংহতির সঞ্চয় এমন চাপ দিয়াছে যে, তদ্দ্বারা অধিকৃত বৃহৎ ভূখণ্ডে অধঃসরণ ঘটিয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উত্তর মার্কিন মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে ভূমির সুস্পষ্ট এবং সুপ্রত্যক্ষ উন্নয়নই এই কথাকে যেন সমর্থন করে। এইচ. এল. ফেয়ার্‌চাইল্‌ড্‌ 'সায়ান্স্‌' পত্রে লিখিবার কালে বলিয়াছেন, সর্বাপেক্ষা আধুনিক কালে মার্কিন দেশীয় তুষারাচ্ছাদনে

যে ভূখণ্ড আবৃত হইয়াছিল সেই ভূখণ্ড তাহার বর্তমান প্রতিষ্ঠাস্থানের অনেক নীচে অবস্থিত ছিল, এমন সময়ে বরফের চাদর গলিয়া গেলে মৃদুমন্দ উত্থানক্রিয়ায় ইহা বর্তমান উচ্চতায় আনীত হইয়াছে।

৯৮

ফরাসি সৈন্য কেবল তাহার দেশ, তাহার নগর, তাহার কৃষিক্ষেত্র, তাহার গৃহ ছাড়া আর-কিছুর জন্য যে লড়িতেছে এমন কোনো নিদর্শন সে কখনো দেয় নাই। যে যুদ্ধলালসার চরম লক্ষ্য যুদ্ধ করা তাহার দ্বারা সে কখনো অভিভূত হয় না। এই যুদ্ধ অমঙ্গলরূপে উপদ্রবরূপে তাহার প্রিয় স্বদেশকে ধ্বংস করিতেছে ইহাই সে জানে; এবং এই মহামারী হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করাই সে তাহার পিতৃপুরুষদের প্রতি, নিজের প্রতি এবং নিজের সন্তানদের প্রতি কর্তব্য বলিয়া অনুভব করে। যুদ্ধ যে কত দূর যুক্তিবিরুদ্ধ মূঢ়োচিত এবং বর্বর তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য উৎকর্ষবান ফরাসি বিশেষ যত্নশীল, অথচ দেখিবে এই উৎকর্ষবান ফরাসিই তাঁহার মাতৃভূমির সৈনিকবেশ পরিধান করিয়া রণমত্ত ভৈরবের মতো কলের কামানের মুখে ধাবিত হইতেছেন।

৯৯

জাপানের বর্তমানকালীন অবস্থার কঠোরতম বিচারকদের মধ্যে অধ্যাপক হাকুসন কুরিয়াগাওয়া একজন; তিনি ওসাকা মাইনিচি পত্রে ইহাই বলিতে চান যে, রাষ্ট্রনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং ন্যাশনাল জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিভাগে জাপান প্রহসন অভিনয় করিতেছে। তাঁহার নালিশ এই— রাষ্ট্রনীতিতে অধিকাংশ জাপানি আধুনিক কালের দুই শতাব্দী পিছনে আছে। তিনি বলেন— পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিবার কালে তাহাদের অন্তঃস্থিত সারতত্ত্বটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। ধার-করা প্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষসাধনের জন্য জাপান যত্নের ত্রুটি করে না, কিন্তু তাঁহার মতে জীবনের বুদ্ধিগত দিক এবং আধ্যাত্মিক দিকের চর্চা সে উপেক্ষা করে। যে জাপানি জাতি ধনের প্রতি বিদ্বেষবান বলিয়া আখ্যাত, সে কি তলে তলে সকলের চেয়ে ধনের প্রতি আসক্ত নয়?

১০০

১৬১০ খৃস্টাব্দে Galileo ভেনিসের সেন্ট্ মার্কের গির্জার উচ্চ ঘণ্টামন্দিরের (Campanile) উপর আরোহণ করিয়া সমাগত অভিজাতবর্গ ও সেনেটরদিগকে আপন নব-উদ্ভাবিত দূরবীক্ষণ-যোগে দেখাইলেন যে, শুক্রগ্রহ কলাবিশিষ্ট, চন্দ্রে উচ্চ পর্বত-সকল আছে, তাহারা চন্দ্রের বক্ষে কৃষ্ণবর্ণ ছায়াপাত করে, কৃত্তিকা-নামক তারকাগুচ্ছে— সাতটি নহে— ছত্রিশটি তারা আছে এবং ছায়াপথ তারকায় রেণুময়। কিন্তু শীঘ্রই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিল; ধর্মাধ্যক্ষগণ দেখিলেন যে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত-সকল বিপদগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহাকে শাস্ত্রদ্রোহিতা ও নাস্তিকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। তাঁহার জ্যোতির্বিষয়ক আবিষ্কারের উপর অন্ধ-সংস্কারের জয়গৌরব তখনকার মতো সম্পূর্ণ হইল।

১০১

এই মহান প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই দেখিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থ-সকল য়ুরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাসিত এবং তাহাদের প্রকাশ নিষিদ্ধ এবং জানিয়াছিলেন

যে মিথ্যা শপথ করিয়া তিনি নির্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইলেন—এই পরিচয় লইয়া সমস্ত উত্তর কালের সম্মুখীন হওয়াই তাঁহার ভাগ্যে আছে। গ্যালিলিওকে রোমে প্রথমবার আহ্বান করার ষোলো বৎসর পূর্বে ঐ নগরে Giordano Brunoকে পুড়াইয়া মারা হয়। উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি-লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রুনো ইংলন্ডে আসিয়াছিলেন। সতর্ক বুদ্ধির প্রণোদনে তিনি প্রায়ই বাসস্থান পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতেন এবং তিনি যে অবশেষে ভেনিসে আসিয়া পড়িবেন তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই।

১০২

• অন্যান্য ইটালীয় নগর অপেক্ষা এখানে ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা অধিকতর পরিমাণে দেওয়া হইত এবং এখানে কখনো দাহনযূপ স্থাপন করা হয় নাই। গ্রান্ড কেনালের উপরিস্থিত Piazzo Mocenigoএ ইন্‌কুইজিসনের দূতগণ তাঁহাকে অবশেষে তাড়া করিয়া পাড়িয়া ফেলিল। তাঁহার বিরুদ্ধে ইন্‌কুইজিসনের প্রথম এই অভিযোগ উপস্থিত হইল যে, তিনি অসংখ্য জগৎ আছে বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। Piazzo Campo di Fioreতে ১৬০০ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে পুড়াইয়া মারা হয়। গ্যালিলিওর সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে গ্রহগতির নিয়ম-আবিষ্কারক কেপ্‌লারই সর্বপ্রধান ছিলেন। ঐ নিয়মগুলি নিউটনের মহত্তর আবিষ্কারের পথ সুগম করিয়া দেয়।

১০৩

কেপ্‌লার নিন্দিত ও কারারুদ্ধ হন এবং তাঁহার মত-সকলকে বাইবেলের মতের সহিত সংগত করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। তৎকালপ্রচলিত জাদুবিদ্যায় অন্ধবিশ্বাস হইতে কেপ্‌লারের জীবনের এক অতি ভয়ানক অভিজ্ঞতা-উদ্ভব হয়। তাঁহার মাসি ও মাকে ডাইনি বলিয়া অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহাদিগকে পুড়াইয়া মারিবার দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। কেপ্‌লারের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এবং শক্তিশালী বন্ধুদিগের প্রভাবে তাঁহার মাতা রক্ষা পান, কিন্তু বর্ষাধিক কারাবাসকালে তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহার ফলে কয়েক মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেপ্‌লারের মাসিকে দাহনযূপে পুড়াইয়া মারা হয়।

১০৪

ধনী হইবার চেষ্টা ব্রহ্মীর নাই। ধন কামনা করা তাহার স্বভাবসংগত নহে এবং যখন সে তাহা পায় তখন তাহা জমাইবার চেষ্টা করাও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রাত্যহিক অভাবের পক্ষে যাহা যথেষ্ট তদতিরিক্ত অর্থের মূল্য তাহার কাছে বেশি নহে। জমির পরে জমি এবং টাকার পরে টাকা বাড়াইয়া তুলিতে সে খেয়াল করে না এবং তাহার টাকা আছে এই ঘটনাটুকুমাত্র তাহাকে কোনো সুখ দেয় না। টাকা দিয়া যেটুকু কেনা যাইতে পারে, টাকার মূল্য তাহার কাছে কেবল সেইটুকু। যখন তাহার সামান্য অভাব পূরিয়া গেল, নিজের জন্য যখন একটি নূতন রেশমের কাপড় কেনা এবং স্ত্রীকে একটি সোনার বালা দেওয়া হইল, যখন গ্রামসুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে যাত্রাগান শুনাইয়া আমোদ দেওয়া সারা হইল, তখন, কখনো-বা তাহার পূর্বেই, সে তাহার অবশিষ্ট টাকা দানে খরচ করিয়া ফেলে।

১০৫

পূর্বে যাহা-কিছু আমি মন্দ এবং হীন বলিয়া মনে করিতাম— চাষীদের গ্রাম্যতা, মোটা ভাত, মোটা কাপড়, সাদাসিধা রকমের বাসস্থান ও চালচলন—এ সকলই আমার চক্ষে ভালো এবং মহৎ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা বাহ্যত আমাকে অন্য-সকলের ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেয়, যাহা তাহাদের হইতে আমাকে পৃথক করিয়া দেয়, এমন কিছুতে এখন আমি যোগ দিতে পারি না। পূর্বের ন্যায় এখন আমি আর নিজের সম্বন্ধে বা অন্যের সম্বন্ধে কোনো পদবী পদ বা গুণকে মানবসাধারণের পদবী বা গুণের চেয়ে বড়ো করিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমি যশ বা প্রশংসা সন্ধান করিয়া ফিরিতে পারি না, আমি এমন কোনো উৎকর্ষ কামনা করি না যাহা মানবসাধারণ হইতে আমাকে স্বতন্ত্র করে। আমার সমস্ত সত্তায়— আমার বাসস্থানে, অশন বসনে, আমার লোকব্যবহারে, যাহা-কিছু জনসাধারণ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন না করে, পরন্তু তাহাদের নিকট আকর্ষণ করে, তাহাই কামনা না করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

১০৬

অতি শৈশবকালেই সমুদ্রশুশুকের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। লন্ডন হইতে বৃটিশ গায়েনার ডেমেরারা'তে আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রাকালে ইহা ঘটে। আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল এবং উত্তর আট্‌লান্টিকের শৈবালাচ্ছন্ন যে আবর্ত সারাগাসো-সাগর নামে সুবিখ্যাত তাহাই পার হইবার সময় আমাদের পুরাতন জাহাজে অলস বায়ুর বেগ এত দুর্বল ছিল যে, সেই তৃণবর্ণ পিণ্ডগুলিকে ঠেলিয়া আমরা অনেক সময়ে প্রায় পথ করিতে পারিতেছিলাম না। ক্ষণে ক্ষণে আমরা এই-সকল শৈবালের মধ্যে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা পাইতেছিলাম, সেই-সকল পরিষ্কার স্থানের কোনো একটিতে মন্দ গমনে চলিতে চলিতে সহসা আমরা এক বৃহৎ ঝাঁক মাছের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তাহারা সংখ্যায় বহু সহস্র হইবে এবং তাহারা চলমান সৈন্যগণের মতো নিবিড়ভাবে দল বাঁধিয়া সাঁতার দিতেছিল।

১০৭

একই মুহূর্তে উহারা সকলে যখন পাশ ফিরিল, উহাদের শরীর হইতে তখন একটি আভা প্রক্ষিপ্ত হইল; যেন প্রকাণ্ড একখানি দর্পণ সূর্যালোককে আমার চক্ষুর উপরে কেন্দ্রীভূত করিয়া অকস্মাৎ আবর্তন করিল। উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া একটি নাবিককে রেলিঙের নিকট লইয়া গিয়া সেখান হইতে ঝাঁকটি নির্দেশ করিয়া দেখাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহারা কী?' একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া এবং 'শুশুক' এই একটি কথা বলিয়াই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং ব্যাপারটা যে কী ইহাই আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম। বাকি দিনটা এই-সব সুন্দর মাছ আরও বেশি করিয়া দেখিবার কামনা হইতে আমি মুক্তি পাইলাম না। আমি তাহাদের প্রতি এমনই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া-ছিলাম, যেন উহাদিগকে আবিষ্কার করার উপরেই আমার জীবন নির্ভর করিতেছে।

১০৮

সহসা ইহাদের এই নিবিড়সম্বন্ধ স্তূপের মধ্যে উহাদের একটি স্বজাতীয় প্রাণী তীরবেগে আসিয়া পড়িল—সে উহাদের অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর, অন্তত পক্ষে দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট এবং সেই অনুপাতেই চওড়া হইবে। আমি দেখিলাম, উহারা লক্ষ্যশূন্যভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, যেন

জানে না কোথায় পালাইতে হইবে। এই সন্ত্রস্ত তরুণ প্রাণীগুলির মধ্যে উক্ত স্বজাতিখাদক যখন ইতস্তত তীরবেগে ছুটিতে লাগিল তখন তাহাকে ক্ষণকালের জন্য অস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল; তাহার পরে জল রক্তে এবং মৎস্যের ভাসমান ছিন্নাংশে এমন মলিন হইয়া গেল যে, কিছুক্ষণের মতো আর এই উৎপাত দেখিতে পাইলাম না।

১০৯

সমুদ্রশুশুকের জীবন নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুখের হইবে, কারণ সে বিনা বাধায় মহাসমুদ্র-সকলের উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উহার যে-সব শত্রু আছে তাহাদিগকে বেগে ছাড়াইয়া চলিতে ও এড়াইয়া যাইতে সে খুবই সমর্থ। সময় সময়ে অসতর্ক হইয়া সে হাঙগরের শিকার হইয়া পড়ে, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। এরূপ এক ঘটনা আমি একবার দেখিয়াছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরে, সম্পূর্ণ এক শান্ত দিনে মাস্তুলের উপরিস্থিত আমার আশ্রয়স্থান হইতে নীলসমুদ্রের তলে হাহা-কিছু ঘটিতেছে একটি শক্তিশালী দূরবিনের মধ্য দিয়া সে সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। খুব কাছেই প্রকাণ্ড এক কাঠের গুঁড়ি ভাসিতেছিল। ইহা নিরীক্ষণকালে জমকালো এক সমুদ্রশুশুক দেখিতে পাইলাম—ইহার চর্ম হইতে সূর্যকিরণে নীল এবং সোনালি আভা ঠিক্‌রাইতেছে; সে আলস্যভরে লেজ নাড়িতে নাড়িতে কাষ্ঠখণ্ডের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, মনে হয় যেন সে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত।

১১০

ঠিক তাহার পশ্চাতে কাষ্ঠখণ্ডের তলদেশ হইতে এক অস্পষ্ট ছায়া নির্গত হইয়া উপরিভাগে উৎক্ষিপ্ত হইল, সেখানে এক ঘূর্ণি এবং আবিলতা দেখা দিল এবং ঐ সৌখিন সমুদ্রজীবটি দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল; উহার একখণ্ড চতুর হাঙগরের গলার মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইল। অবশ্য দ্বিতীয় অর্ধাংশও সত্বর প্রথমকে অনুসরণ করিয়া হাঙগরের কণ্ঠ দিয়া নামিয়া গেল—এবং তখন শেষোক্ত প্রাণীও পুনরায় আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিল। আমি লক্ষ করিলাম, তিনবার এই হাঙগর এইরূপ কৌশলে কৃতকার্য হইল; কিন্তু একমাত্র এই উপলক্ষেই আমি দেখিয়াছিলাম যে, একটি শুশুক চতুরতায় একটি হাঙগর-কর্তৃক পরাভূত হইয়াছে।

১১১

মধ্যযুগে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এক সহস্র খৃস্টীয় শকে জগতের নিশ্চিত অবসান ঘটিবে। খৃস্টান সমাজ এই বিশ্বাস লইয়াই জীবননির্বাহ করিত এবং যে ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করিত সে শাস্ত্রদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইত। মধ্যযুগের অধিকাংশ আইন ও রাজদত্ত দলিল 'জগতের আসন্ন দিনান্তকালে' এই বাক্যের দ্বারা আরম্ভ করা হইত। দশম শতাব্দীর সমাপ্তি যখন নিকটতর হইয়া আসিল তখন ভয়ের পরিমাণও বাড়িয়া উঠিল। য়ুরোপ যেন তখন তাহার শেষ উইল লিখিয়া সারিল এবং চার্চকে যাহা দান করা হইল তাহার অধিকাংশের তারিখ সেই যুগ হইতেই শুরু। লোকেরা তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিল। তাহারা চার্চকে আপন সম্পত্তি দিয়া ফেলিল, বস্তুত সে সম্পত্তিতে তাহাদের আর অধিক প্রয়োজন থাকার কথা ছিল না; এবং সেই একই কারণে সরকারি সম্পত্তির অধিকাংশই পুরোহিতসম্প্রদায়ের অধিকারে আসিল। কিন্তু এক হাজার সালও কাটিয়া গেল এবং আমাদের ভূমণ্ডল তাহার কক্ষের চতুর্দিকে আবর্তন বন্ধ করিল না। তখন হইতে জগতের অন্ত-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করিতে অল্প লোকই সাহস করিয়াছে।

১১২

পুরাকালে লোকেরা ধূমকেতুর সহিত সংঘাতকে ভয় করিত, কিন্তু যখন হইতে এই নভশ্চর পদার্থ-সকল আমাদের নিকট অধিকতর সুবিদিত হইয়াছে তখন তাহারা আর কাহাকেও ভয় দেখাইতে পারে না। ধূমকেতু কোনো প্রাণীর ক্ষতি করিয়াছে এমন একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যাইতে পারে না। তাহাদের পুচ্ছ এত সূক্ষ্ম গ্যাসে নির্মিত যে, বহু সহস্র মাইল পুরু হইলেও তাহা একগ্লাস জলের মতোই স্বচ্ছ। এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই গ্যাস বেন্‌জইন অথবা পেট্রোলিয়ম বাষ্পের দ্বারা গঠিত, কিন্তু ধূমকেতুর যে পুচ্ছ বিমানপথচারী দুই জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্তী আকাশের সেতু রচনা করিতে পারে তাহার সমস্ত উপাদান সম্ভবত কয়েকটি মাত্র পিপার সামান্য স্থানের মধ্যে প্রবেশযোগ্য। অতএব পেট্রোলিয়ম-বর্ষণ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই।

১১৩

কিন্তু অন্য-সকল বিপত্তি আছে। আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই দেখিয়াছি বাহিরের কোনও কারণ ব্যতিরেকেও আমাদের ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে সুণ্ডা দ্বীপে কারাগাতোয়া-নামক একটি ক্ষুদ্র জ্বালামুখীর সমুদ্রতলবর্তী একটি স্থানে এইরূপ ঘটিয়া অগ্নিময় গর্তের মধ্যে সমুদ্রজলের প্রবেশপথ হইয়াছিল। অগ্নিগহ্বর সমুদ্রকে মেঘলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল; তাহাতে প্রকাণ্ড তরঙ্গ সৃষ্ট হইয়া তাহা তটভূমিতে এক শত ফুট ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত হইয়াছিল। তাহা জ্বালামুখীর নিকটবর্তী সমস্ত শহর ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল এবং পঞ্চাশ হাজার মানুষকে জলমগ্ন করিয়াছিল। ইহাই পঞ্চাশ হাজার লোকের পক্ষে জগতের অবসান, এবং সেই অবসান সম্পূর্ণ অপ্রতীক্ষিতভাবেই আসিয়াছিল। এই আপৎপাতের বেগকে বহুগুণিত করিয়া কল্পনা করা যাক—মনে করা যাক হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের Mouno Los-নামক পৃথিবীর প্রবলতম দহমান জ্বালামুখী সহসা প্যাসিফিক মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে; তাহা হইলে এমন এক তরঙ্গ সহজেই উঠিতে পারে যাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বহু জনসমূহকে ডুবাইয়া দিতে পারে। ইহা বিনা ঘোষণায় কালই, এমন-কি, আজই ঘটিতে পারে।

১১৪

জাপানে চাউল-লুণ্ঠন-ঘটিত গুরুতর দাঙ্গায় পর্যবসিত যে খাদ্যসমস্যা গত কয়দিনের টেলিগ্রামে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নূতন ব্যাপার নহে; কারণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি প্রধান আহার্য দ্রব্য পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মে মাসের শেষভাগে য়োকোহামার একজন পত্রলেখক তাঁহার লিখিত পত্রে নির্দেশ করিয়াছেন যে, বিদেশী চাউল আমদানি ও সংগত মূল্যে উহার বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত করার জন্য জাপান গভর্নমেন্ট কতকগুলি বহুপল্লবিত নিয়মপত্র বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১১৫

তিনি বলিয়াছিলেন সচরাচর জাপানের প্রয়োজনীয় সমস্ত চাউল প্রায় জাপানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং বিদেশী চাউল-সম্বন্ধে বরাবর জাপানের একটি প্রবল বিরুদ্ধ সংস্কার আছে। যাহা হউক ইদানীং জনসংখ্যার বৃদ্ধি-বশত চাউলের খরচ চাউলের জোগানকে অতিক্রম করিয়াছে। তবুও

আমদানি করা আহার্যদ্রব্যে জাপানের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত অল্প। কারণ, কোরিয়া ও হোক্কেডোর অনেক স্থান এখনো অনাবাদী পড়িয়া আছে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াও জাপানের একটি বৃহৎ শস্যস্থলী। কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চাউল-উৎপাদন অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক নিষ্কাশন-পথে জাপানি শক্তি ধাবিত হইয়াছে।

১১৬

কল্পনা করা যাক, আমাদের পদাতিক সৈন্যের একদল বিশ্রামের জন্য গর্তগড়ের বাহিরে আসিয়াছে। মাটির আঁকাবাঁকা ফাটল বাহিয়া দুই মাইল হাঁটিয়া একটি গ্রামের নিকট তাহারা উপরি-তলে পেঁীছিয়াছে। গ্রামের পূর্বদিকের দেওয়ালকয়টিতে অনেকগুলি ছিদ্র আছে, কিন্তু গ্রামখানির একেবারে ধ্বংস হয় নাই। গ্রামের প্রধান রাস্তায় যখন সৈন্যদল প্রবেশ করিল ঠিক সেই সময় কয়েকটি জার্মান কামান, ঐখানে কোথাও বৃটিশ কামান না থাকা সত্ত্বেও আন্দাজে শেল নিক্ষেপ করিয়া গ্রামময় তাহার সন্ধান করিতেছে। আরও অনেক শেল গ্রাম ছাড়াইয়া রাস্তার উপর বেশ একটু ঘন ঘন পড়িতেছে। এই রাস্তা ধরিয়াই সৈন্যদলকে এক মাইল দুই মাইল দূরে ভাঙা বাড়ির মাটির তলের কুটুরিতে তাহাদের যথানির্দিষ্ট বাসায় পেঁীছিতে হইবে। গ্রামের রাস্তা গ্রামখানির সম্মুখ-ভাগের সংগে সমান্তরাল রেখায় উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যে পর্যন্ত না বর্ষণের ঝড় সাঙ্গ হয়, সে পর্যন্ত রাস্তার পূর্বদিকে বাড়িগুলির নিরাপদ ভাগে সৈন্যদিগকে লাইন ভঙ্গ করিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য দলপতি আদেশ করিলেন।

১১৭

গর্তগড় হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্লান্ত। কোনো একটা ছুতায় থামিবার জন্য উৎসুক সৈন্যদল কুটীরের দ্বারবর্তী সিঁড়ির ধাপের উপর হইতে অসৈনিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিয়া, দীর্ঘকাল গর্তগড়ের কর্তব্যে কালযাপনের পর, আমোদ এবং কৌতূহল অনুভব করিতেছে। কুটীরের যে অধিবাসীগণ রাস্তার নিরাপদ অংশে বাস করিতেছে, তাহারা তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া সৈন্যদের সংগে নিরুদ্‌বিগ্নভাবে আলাপ করিতে লাগিল। পনেরো বছর বয়সের মতো চেহারার এক উনিশ বছরের বালককে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিয়া একজন স্ত্রীলোক তাহাকে একটু গরম কাফি আনিয়া দিল। বালক কাফির মূল্য দিতে চাওয়ায় স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, 'যুদ্ধের পরে, যুদ্ধের পরে।'

১১৮

বিধবা ছেলেপিলের মায়েরা অথবা যে-সকল ফরাসি এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন তাঁহাদের স্ত্রীরাই এখানকার মতো জায়গায় অধিকাংশ গৃহস্থালীর কর্তৃপক্ষ। উহারা গৃহত্যাগ করিতে ভয় পায়, অথবা অন্যত্র কোথায় যাইবে জানে না, এবং উহারা ইংরেজ সৈনিকদের কাছে স্বল্প কয়েক প্রকারের পণ্যদ্রব্য মাত্র আর মাটির তলার ভাণ্ডার-ঘরে ও গর্ত-সকলের মধ্যে যে-সব জিনিসের প্রয়োজনের অন্ত নাই সেই চকোলেট, কমলালেবু, আপেল, সার্ডিন মাছ, মোমবাতি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতে পারে। অন্য স্ত্রীলোকেরা সৈনিকদের কাপড় ধোলাই করিতেছে কিংবা তাহারা জানালায় 'বিলাতি বিয়ার'-লেখা একখানি কার্ড ঝোলানো ছোটো ছোটো বেসরকারি মদ্যশালা খুলিয়াছে, সেখানে একটি ঘরের চতুর্দিকের দেওয়ালের গায়ে টেবিল সাজানো।

১১৯

আমি পীড়িত ছিলাম, অত্যন্ত পীড়িত, এত বেশি যে আমার কলিকাতা-বাসের সমস্ত শেষ মাসটি আমি শয্যাগত ছিলাম এবং লেখা এমন-কি চিন্তা করাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। খুব দুর্বল অবস্থাতেই আমাকে আমার ঘর হইতে জাহাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এখনি আমি প্রায় রোগমুক্ত হইয়াছি। সুমাত্রা দ্বীপের দর্শনলাভ এবং মলয় দ্বীপপুঞ্জের স্বাস্থ্যদায়ক বায়ুপ্রবাহ আশ্চর্য পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এবং যদিও আমি এখনো দুর্বল বোধ করিয়া থাকি তবুও মোটের উপরে বলিতে পারি যে, আমি সুস্থ অবস্থায় এবং স্ফূর্তিতেই আছি। বাট্টা দেশের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত টাম্পানুলী আমি সবেমাত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি। বাট্টারা সুমাত্রার একটি সুবিস্তীর্ণ জনবহুল জাতি; দ্বীপটির যে অংশ চীন ও মেনাংগকাবুর মধ্যে সমুদ্রের উভয় তীর পর্যন্ত ব্যাপ্ত উহারা তাহারই সমগ্রভাগ অধিকার করিয়া বাস করে। তীরপ্রদেশটি বিরলবসতি কিন্তু অভ্যন্তরভাগে অধিবাসীগণ অরণ্যের পত্রপুঞ্জের ন্যায় নিবিড় বলিয়া কথিত আছে। সমস্ত জাতির জনসংখ্যা সম্ভবত দশ লক্ষ হইতে বিশ লক্ষের মধ্যে হইবে।

১২০

উহাদের রীতিমত শাসনতন্ত্র আছে এবং উহারা মহাবাগ্মী; উহারা প্রায় সকলেই লিখিতে জানে এবং উহাদের নিজের ভাষা এবং বিশেষ এক প্রকার লেখা অক্ষর আছে; উহাদের ভাষায় এবং শব্দে এবং উহাদের কোনো কোনো নিয়মে ও প্রথায় হিন্দুধর্মের প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাদের নিজেরও বিশেষ এক প্রকার ধর্ম আছে। উহারা 'দিবতা অস্‌সি অস্‌সি' নামে এক এবং অদ্বিতীয় দেবতাকে স্বীকার করিয়া থাকে এবং তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া কল্পিত উহাদের তিনটি বড়ো দেবতা আছে। উহারা যুদ্ধপ্রিয় এবং সমস্ত ব্যবহারেই অত্যন্ত ন্যায়পর, নিষ্কপট। উহাদের দেশ প্রকৃষ্টভাবে আবাদ করা হইয়াছে এবং এখানে অপরাধ অল্প। উহাদের অনুকূলে এই সমস্ত কথা বলিবার থাকা সত্ত্বেও, Mr. Marsden যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বাট্টারা যে নরভুক্‌ এ সম্বন্ধে কোনো অপক্ষপাত ব্যক্তির মনে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বাট্টারা মন্দ লোক নহে এবং আমি এখনো সেইরূপ মনে করি, যদিচ তাহারা পরস্পরকে খাইয়া থাকে এবং মানুষের মাংস বলদ বা শূকরের মাংসের চেয়ে তাহাদের কাছে রুচিকর।

১২১

এ কথা তোমাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আমি তোমাকে একটি নূতন রকম সামাজিক অবস্থার বিবরণ জানাইতেছি। বাট্টারা বর্বর নহে, কারণ তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে এবং যাহারা আমাদের ন্যাশনাল স্কুলে পড়িয়া মানুষ, ইহারা সম্পূর্ণ তাহাদেরই মতো এমন-কি তাহাদের চেয়ে বেশি চিন্তা করিতে পারে। তাহাদের বহুপ্রাচীন শাস্ত্রানুশাসন আছে এবং এই-সকল অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের অনুষ্ঠান-সকলের প্রতি ভক্তি-বশতই তাহারা পরস্পরকে খাইয়া থাকে। এই অনুশাসনে আছে যে, চারিটি বিশেষ অপরাধে অপরাধীকে জীবিত-অবস্থায় খাইতে হইবে। এবং এই অনুশাসনেই বলিতেছে যে, বড়ো বড়ো যুদ্ধে বন্দী-সকলকে জীবিত মৃত বা কবরস্থ সকল অবস্থাতেই আহার করা বৈধ। আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে এবং আমি ইহা যথার্থই বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, এই-সকল লোকদের মধ্যে অনেকেই অন্য-সকল কিছুর চেয়ে

মানুষের মাংসই বেশি পছন্দ করিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ প্রবৃত্তি সত্ত্বেও বিধিসংগত উপলক্ষ ছাড়া তাহারা কখনো এই লালসাকে প্রশ্রয় দেয় না।

১২২

আমার প্রিয়তম বন্ধু—

আমাদের পরিবারে যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হয়তো White কিংবা আমার বন্ধুদের মধ্যে কাহারও কাছ হইতে কিংবা খবরের কাগজ হইতে এত দিনে খবর পাইয়া থাকিবে। আমি কেবল তোমাকে উহার একটি মোটামুটি নকশা দিব। আমার প্রিয়তমা ভগিনী উন্মত্ততার ঝোঁকে তাহার আপন মায়ের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বর্তমানে সে পাগলা-গারদে আছে। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে।

১২৩

ঈশ্বর আমার বুদ্ধি স্থির রাখিয়াছেন। আমি আহার-পান করি, ঘুমাই এবং আমার বিশ্বাস আমার বিচারশক্তিও বেশ প্রকৃতিস্থ আছে। আমার পিতা বেচারা সামান্যরূপে আহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ও আমার পিসিকে সেবা করিবার জন্য আমিই আছি। Blue-Coat স্কুলে Mr. Morris আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেছেন, এবং আমাদের আর-কোনো বন্ধু নাই কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি খুব শান্ত ও সমাহিত আছি এবং যাহা-কিছু করিতে বাকি ছিল তাহা উত্তমরূপেই করিতে পারিতেছি। যত দূর সম্ভব একখানি ধর্মভাবপূর্ণ পত্র লিখিয়ো, কিন্তু যাহা গিয়াছে এবং চুকিয়াছে তাহার কোনো উল্লেখ করিয়ো না।

১২৪

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, Coleridge! যদিও ইহা আশ্চর্য শুনাইবে তথাপি আমি বরাবর সমাহিত শান্ত ছিলাম, তাহার কোনো অন্যথা হয় নাই। এমন-কি, সেই ভয়ানক দিনে এবং ভয়ংকর দুঃখের মধ্যেও আমি এমন ধৈর্য রক্ষা করিয়াছিলাম যাহাকে বাহিরের লোকে হয়তো ঔদাসীন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবে; এই ধৈর্য নৈরাশ্যজনিত নহে। এরূপ বলা কি আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা অথবা পাপ হইবে যে, আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্বই আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক আশ্রয় দান করিয়াছিল? আমি বুঝিয়াছিলাম যে, অনুশোচনা করা ছাড়া আমার অন্য কাজ করিবার আছে।

১২৫

সেই প্রথম দিনের সন্ধ্যায় আমার পিসি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, দেখিয়া মনে হয় যেন মুমূর্ষ; আমার পিতা তাঁহার যে কন্যাটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন এবং যে তাঁহাকে কিছু কম ভালোবাসিত না, তাহার দ্বারা আঘাত-হেতু কপালে-পলেস্তারা দেওয়া; পাশের ঘরে আমার মা একটি শব মাত্র; তবুও আমি আশ্চর্যরূপে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। সেই রাত্রিতে আমি অনিদ্রাবশত চক্ষু বুজি নাই, কিন্তু আতঙ্কশূন্য ও নৈরাশ্যশূন্য হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলাম। তাহার পর হইতে আর একটি দিনও আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ-সকলের ’পরে ভয় করার অভ্যাস আমার অনেক দিন ছিল না, ইহাই আমাকে খাড়া রাখিয়াছিল।

১২৬

পরিবারের সমস্ত ভার আমার উপরই পড়িয়াছিল, কারণ আমার ভ্রাতা (আমি তাঁহার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া বলিতেছি না) কোনো কালেই বৃদ্ধ ও দুর্বলের সেবায় উৎসাহী ছিলেন না, বর্তমানে তিনি তাঁহার পায়ের পীড়া লইয়া এই-সকল কর্তব্য হইতে দায়মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তখন আমি একাই পড়িয়াছিলাম। ঠিক ইহার পরদিনে, এরূপ ঘটনায় সচরাচর যেমন হইয়া থাকে সেইমতোই, আমাদের ঘরে অন্তত বিশজন লোক রাত্রিভোজনে বসিয়া গিয়াছিল, তাহারা আমাকে তাহাদের সহিত খাইতে বসিতে রাজি করিয়াছিল। তাহারা সকলেই ঘরের মধ্যে আমোদ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ-বা বন্ধুত্ববশত, কেহ-বা কৌতূহলবশত, কেহ-বা স্বার্থবশত আসিয়াছিল।

১২৭

আমি উহাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাইব, এমন সময় আমার স্মরণ হইল যে, আমার মৃত মাতা—এমন মা যিনি সারাজীবন সন্তানদের কল্যাণ ব্যতীত আর-কিছু কামনা করেন নাই, পাশের ঘরে, একেবারে পাশের ঘরটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন। ঘৃণা, শোকের উত্তেজনা, অনুতাপের মতো একটা কিছু আমার মনের উপর ছুটিয়া আসিল। হৃদয়াবেগের যন্ত্রণায় আমি যন্ত্রচালিতের মতো পাশের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার শবাধারের পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া পড়িলাম ও তাঁহাকে এত শীঘ্র ভুলিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে ও কখনো কখনো তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিলাম।

১২৮

অল্প কয়েক বৎসরের পূর্বপর্যন্ত দুয়ার প্রদেশের চা-আবাদী জেলাগুলি ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের জন্য অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—এই অখ্যাতি ছিল। শেষে ১৯০৬ সালে য়ুরোপীয় আবাদকারী যুবকদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি হওয়ায়, ইহার কারণ-অনুসন্ধান প্রবর্তিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, এই-সকল রোগ প্রতিনিয়ত ঘটিবার মুখ্য কারণ, সাধারণত যথেষ্ট কুইনীন ব্যবহার না করা। দৈনিক অল্পমাত্রায় কুইনীন-ব্যবহার রোগপ্রতিষেধক বলিয়া উপদিষ্ট ও প্রায় সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজ-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার ফল হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কালাজ্বর ঘটা প্রায় থামিয়া গিয়াছে। যথানিয়মে কুইনীন ব্যবহার করায় অনেক য়ুরোপীয় মহিলা ও শিশু দুয়ার প্রদেশে থাকিয়াই অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে দুয়ার প্রদেশকে মোটের উপর একটি স্বাস্থ্যকর জেলা বলা হইয়া থাকে, দশ বৎসর পূর্বে ইহা চিন্তা করাই অসম্ভব হইত।

১২৯

সম্প্রতি দুয়ার প্রদেশের সমস্ত য়ুরোপীয় সরকারি চিকিৎসকদের নিকটে, তথাকার অধিবাসী-দের মধ্যে কুইনীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অনুসন্ধানের ফল ১৯১৭ সালের বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে য়ুরোপীয়-দের মধ্যে কুইনীনের ব্যবহার শিশু ও বয়ঃপ্রাপ্ত উভয়েরই মধ্যে মোটের উপর ব্যাপক। এবং একজন চিকিৎসক লিখিতেছেন, 'প্রতিষেধক কুইনীন-প্রচলনের পর হইতে ইংলন্ড হইতে সদ্য-আগত যুবা-পুরুষ এবং এই জেলায় জাত য়ুরোপীয় শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।'

১৩০

উহারা ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রায় ততটা বেশি ভোগে না এবং উহাদের প্লীহাবৃদ্ধিরোগ দৈবাৎ দেখা যায়। কালাজ্বর-রোগের সংখ্যার হ্রাস সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে; এবং যত দূর স্মরণ হয়, গত নয় বৎসরে য়ুরোপীয় অধিবাসীগণের মধ্যে আমি চারিটি মাত্র কালাজ্বরের রোগী পাইয়াছিলাম; উহাদের মধ্যে দুটির রোগ নিতান্তই সামান্য এবং যে একজন রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল, সে আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, আমার উপদেশ-অনুযায়ী কুইনীন সে ব্যবহার করিত না। যখন হইতে কুইনীন-ব্যবহার ব্যাপক হইয়াছে তখন হইতে স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতি-সম্বন্ধে বোধ হয় সর্বসাধারণের মতের ঐক্য ঘটিয়াছে।

১৩১

আমার উপস্থিতিকাল ঘটনাক্রমে হাটবারের পূর্বদিনের সন্ধ্যায় পড়িয়াছিল এবং চারি দিকের প্রতিবেশ হইতে গ্রামবাসীরা তাহাদের পণ্য দ্রব্য লইয়া ভিড় করিতেছিল। যখন দলের পর দল তাহাদের বহুবিধ এবং উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত পোষাক পরিয়া এই ক্ষেত্রে আসিয়া পেঁছিল এবং তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ অশ্বলোমনির্মিত পটমণ্ডপ সন্নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার চেয়ে অধিক বিচিত্র ও চিত্রবৎ দৃশ্য কল্পনা করা অসম্ভব হইল। দিবালোক ক্ষীণ হইলে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার আরম্ভ হইল তখন দৃশ্যটি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল।

১৩২

অগ্নি-সকল প্রজ্বলিত হইলে শিখাগুলি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে লাগিল; এবং অশ্বসহ চতুর্দিকে-বিহরণ-কারী মুরদিগের শ্যামমূর্তির উপরে, একটিমাত্র-কেশগুচ্ছ-ধারী রিফিয়ানদের উপরে এবং তাহাদের পার্শ্ববর্তী লম্বা ও সরল তলোয়ারের উপরে ঐ শিখাগুলি বিবর্ণ পাণ্ডুর প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করিল। দূরে স্থলান্তর্দেশে আমি দীর্ঘ এক সার উটের দল আভাসে জানিলাম মাত্র; উহারা দেখিতে দূরে দিগন্তে কলঙ্করেখার ন্যায়; তাহারা পর্বতের আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া হাটের অভিমুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। যখন জনতার লোকেরা বিশ্রাম করিতে আসিল এবং তাম্বু গাড়িতে লাগিল তখন মানবশিশু ঘোড়া গাধা উট এবং মুরগিতে মিলিয়া রাত্রের মতো একত্র ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া থাকার সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

১৩৩

তখন স্ত্রীলোকেরা তাহাদের সন্ধ্যার খাদ্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল ও ততক্ষণ তাহাদের পাগড়ি-পরা স্বামীরা ব্যস্তভাবে তাহাদের পণ্যদ্রব্য-উদ্ঘাটনে অথবা তাহাদের জন্তুদলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইল। এই বহুবিচিত্র ব্যস্ততাপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে আমাদের পক্ষে এতই নূতন ও চিত্তাকর্ষক জিনিস ছিল যে, এখানে আমরা দীর্ঘকাল বিলম্ব করিতে পারিতাম। কিন্তু অনিচ্ছাসহকারেই এখান হইতে আমরা ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যখন বিশেষ সময়ে প্রতি রাত্রে সন্ধ্যা-উপাসনার জন্য শ্বেতপতাকা উন্নমিত করা হয়, সেই সময়ে ধর্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যে হউক, যদি শহরের মধ্যে না থাকে তবে তাহাকে সে রাত্রের মতো বাহিরে নির্মমভাবে অবরুদ্ধ রাখা হয়। অতএব যাহাতে যথাসময়ে আমরা Cazyold গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া এইরূপ একটা বিশ্রী উভয়সংকট উত্তীর্ণ হইতে পারি সেইজন্য যথাসম্ভব সত্বর ফিরিয়া গেলাম।

১৩৪

পরদিন সূর্যালোকের প্রথম রশ্মিগুলি সেই বিচিত্র জনতাকে দিবসের কর্মব্যাপারে জাগাইয়া তুলিল। সাম্রাজ্যের সকল বিভাগ হইতে সেখানে লোক-সমাগম হইয়াছিল—অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে কৃষ্ণকায়গণ, প্রত্যন্তদেশ হইতে রিফিয়ানেরা, মরুদেশ হইতে আরবেরা, শহরের ইহুদিরা এবং দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনজাতীয় বহুসংখ্যক Berber। সম্প্রদায়ের অপূর্ব সম্মিলনীর প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পণ্যগুলিকে সর্বোচ্চ সুবিধার হারে বিক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ব্যস্তভাবে ব্যবসায় চালাইতেছিল। এই উদ্যমপূর্ণ পণ্যবিনিময়ের দৃশ্য হইতে কেবল এক দিকে যেমনি ফিরিয়া দাঁড়ানো অমনি, পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেই পৌঁছায় এতটা দূরের মধ্যে, আমি মুরীয় কবরস্থান দেখিতে পাইলাম।

১৩৫

স্থানটি বিষাদপূর্ণ উজাড় চেহারার। আমাদেরই সমাধিভূমির মতো এখানে ছোটো ছোটো মৃত্তিকাস্তূপের দ্বারা মৃতদিগের শেষ আবাস নির্দিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত ধনীদের কবর অনুচ্চ শ্বেতবর্ণ প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেখানে কোনো খৃস্টানের প্রবেশের অনুমতি নাই এবং যাহা জীবিত কালে বহুসংখ্যক মুসলমান তীর্থযাত্রীর আশ্রয়, সেই পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে মাথা রাখিয়া মৃতদিগকে সমাহিত করা হয়। যাহা হউক পরবর্তী দিনে, শুক্রবারে, মুরদিগের বিশ্রামবাসরে এই স্থানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি প্রকাশ করিল। স্ত্রীলোকদের জনতা-দ্বারা অধিকৃত হইল; সকলেই সাদা পোশাকপরা এবং এই স্থানের গুণে তাহাদিগকে ভূতের মতো দেখাইতে লাগিল, অন্তত ইংলন্ডে ভূতের চেহারা আমরা এমনই মনে করিয়া থাকি।

১৩৬

বিচ্ছেদশোকে কেহ কেহ তাহাদের বক্ষে আঘাত করিতেছে এবং যন্ত্রণার কর্ণভেদী স্বরে মৃত-দিগকে আহ্বান করিতেছে। সেই সময়ে, যে-সকল সমাধি স্পষ্টতই অনধিক কাল পূর্বেই মৃতদিগকে আবৃত করিয়াছে তাহাদের কাছে কেহ কেহ লুটাইতে লাগিল। অপর কেহ মৃত স্বামীর কবর সজ্জিত করিবার জন্য তাজা ফুল লইয়া আসিল এবং যেখানে তাহার হৃদয় নিহিত রহিয়াছে সেই বিষাদপূর্ণ স্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকিয়া তাহার স্বামীকে (উদ্দেশ করিয়া) বলিল, জীবন এক্ষণে তাহার পক্ষে ভারস্বরূপ, সংসার আপন ভোগের দ্বারা আর তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং তাহার উৎকণ্ঠিততম কামনা ও প্রার্থনা এই যে, সে যেন শীঘ্র কবর পার হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অনুমতি লাভ করে।

১৩৭

এই বিলাপসকলের মধ্যে প্রিয় মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিতান্ত অদ্ভুত ও হাস্যকর যে-সকল উক্তি আমি শুনিলাম, তাহাতে মৃতসম্বন্ধে এই নিঃসংশয় বিশ্বাসের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, যে নগর ও সমাজ ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন তৎসম্বন্ধে এখনো তিনি প্রবল ঔৎসুক্য অনুভব করিয়া থাকেন। একজন স্ত্রীলোক একটি গোরের নিকটে একান্ত গম্ভীরমুখে বসিয়া গত সপ্তাহের ট্যাঞ্জিয়ারের যত-কিছু গালগল্প, যত-কিছু নিন্দা-অপবাদ, যাহা সেইখানে মুখে-মুখে রটিতেছিল এবং যত-কিছু গার্হস্থ্য বিবরণ, যত কলহ ও তাহার মিটমাটের কথা, সমস্তই মৃত-

ব্যক্তিকে জানাইতেছিল। একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মিছিল অকস্মাৎ একটি অমসৃণ কাষ্ঠাধারে চারিজন বাহকের স্কন্ধে বাহিত একটি মৃতদেহ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৩৮

যাহারা অন্ত্যেষ্টি-সংকারের অনুষ্ঠানে যোগ দেয় তাহারা কবরস্থানে যাইবার পথে কোরান হইতে শ্লোক গান করে। এবং তাহারা সমাধিভূমিতে আসিলে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা উচ্চারণ করা হয়। তাহার পরে মৃতদেহকে বিনা শবাধারেই গোরের মধ্যে রাখা হয়; অল্প পরিমাণে এক পাশে কাৎ করিয়া শোয়ানো হয়, যাহাতে মুখ মক্কার দিকে ফিরিয়া থাকে। দেহের উপর অল্প মাটি ফেলা হয় এবং জনতা মৃতব্যক্তির বাড়িতে ফিরিয়া যায়। অনুষ্ঠানের সময় পরিবারের স্ত্রীলোকেরা একত্র হয় এবং বিনা ব্যাঘাতে নিতান্ত অমানুষিক চীৎকার ও বীভৎস উচ্চধ্বনি করিতে থাকে। বস্তুত মৃত্যুর পর হইতেই বরাবর তাহারা এইরূপ কাণ্ড করিয়া আসিতেছে। অন্যূন আটটি দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহারা অধ্যবসায়সহকারে এই ক্লান্তিকর কণ্ঠচালনা করিয়া থাকে।

১৩৯

ভাষা মনুষ্যজাতির কেবলমাত্র মহৎ মিলনসাধক নহে, ইহা পরম বিভাগকারীও বটে। যথা, ব্রহ্মদেশে এক জাতি এবং অন্য জাতির মধ্যে তাহাদের নিজদেশীয় পর্বতশ্রেণী, নিবিড় বন, বেগবতী নদী কিংবা বিশাল সমুদ্র অপেক্ষা ভাষাই প্রায় অধিকতর অলঙ্ঘ্য ব্যবধান। ধর্ম এবং জাতিগত প্রথার বাধা অপেক্ষা এই ব্যবধান ভাঙিয়া ফেলা অধিকতর কঠিন। শান-মালভূমিতে কখনো-বা একই গ্রামে একই ধর্ম ও প্রায় একই রূপ প্রথা লইয়া যে জাতি-সকল পাশাপাশি বাস করিতেছে, একজন দো-ভাষীর সাহায্য ভিন্ন তাহাদের মধ্যে কোনো বলা-কহা চলিতে পারে না। নিকোবরবর্গের নানা দ্বীপে যেসকল জাতি-সম্প্রদায় বাস করে, যদিও তাহারা একই মূল-বংশের তথাপি তাহাদের আন্তর্দ্বৈপিক পণ্যবিনিময়-প্রথা হিন্দুস্থানি অথবা ইংরেজির মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়। যে-সকল আন্ডামানী জাতিসম্প্রদায় একই দ্বীপে বাস করে তাহারা সংকেতের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। যে Chin জাতিগুলি একটিমাত্র পর্বতমালার দ্বারা বিভক্ত অথবা একই উপত্যকার ভিন্ন অংশে পরস্পরের দৃষ্টিগোচরেই বাস করে, তাহাদের মধ্যে ভাষার অনুত্তরণীয় বিচ্ছেদ বর্তমান।

১৪০

যে স্তন্যপায়ী জীব বিশেষ কোনো জৈবক্রিয়ার যন্ত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সেই প্রাণী সাধারণত বাঁচিতে পারে না। সে তাহার কোনো অঙ্গ হারাইলে তাহা তাহার পক্ষে সংকটজনক হইয়া উঠে। তাহার পাকস্থলী অপসারিত হইলে দ্রুত তাহার সাংঘাতিক ফল ঘটিতে পারে। ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, যে-সকল ক্ষতি অনেক সময়ে সামান্য বলিয়া বোধ হয়, স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে তাহাই প্রাণহানিকর হইতে পারে। অঙ্গচ্ছেদ-সম্বন্ধে মৎস্যও অল্প ঘাতকাতর নহে। কিন্তু কীট এই নিয়মের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম, এবং ইহাই জীবনের প্রতি কীটের আকৃষ্টিপরতা সপ্রমাণ করে। যে-সব হানির দ্বারা উন্নততর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রায় অচিরাৎ মৃত্যু ঘটাইতে পারে, অনেকজাতীয় কীট সেই-সব হানি অতিক্রম করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ।

১৪১

একটি পতঙ্গের জীবনীশক্তি দেখিয়া Doctor Miller-এর মনোযোগ এই বিষয়ে প্রথম বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। Doctor Miller স্বয়ং বলিয়াছেন—'আলোচ্য পতঙ্গটিকে ধরিয়া যথাবিহিতরূপে ক্লোরোফর্ম করিয়া আমার একজন সহকারী আমার নিকটে আনিয়াছিলেন। মৃত্যুকে দ্বিগুণতর সুনিশ্চিত করিবার জন্য তাহার বুকের (thorax) ভিতর দিয়া আমি একটি জ্বলন্ত ছুঁচ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলাম। চারি দিন পরে একদিন সন্ধ্যাকালে আমি তাহার প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলাম। তাহাকে আড়ষ্ট এবং মৃত বলিয়া বোধ হইল এবং ভাবিলাম শীঘ্রই এটি আলমারিতে তুলিবার যোগ্য হইবে। পরদিন প্রাতে যখন দেখিলাম সে অনেক ডজন ডিম রাত্রির মধ্যে পাড়িয়া রাখিয়াছে, তখন আমার কিরূপ বিস্ময় হইয়াছিল, কল্পনা করিয়া দেখো।

১৪২

প্রায় সেই সময়েই উহারই নিকট শ্রেণীয় আর একটি পতঙ্গ-সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। নমুনার জন্য রক্ষিত পতঙ্গটি একেবারে মরিয়া গিয়াছে বোধ হওয়াতে একটা তক্তায় আমি তাহাকে আলপিন দিয়া বিঁধিয়া শুকাইবার জন্য সরাইয়া রাখিলাম। কয়েক রাত্রি পরে একদিন টেবিলের উপর প্রবল পাখা-নাড়ার শব্দে জাগিয়া উঠিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, পতঙ্গটি পুনরায় তাজা হইয়া উঠিয়াছে, ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া আলপিনটা তক্তা হইতে আলগা করিয়াছে এবং ধড়ফড় করিতে গিয়া পাখা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

১৪৩

Bathsheba-র পুত্র Solomon যখন রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল বিশ বৎসর। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার সিংহাসনারোহণের সময়টা অনুকূল ছিল। বেবিলন এসিরিয়া মিশর দুর্বল ছিল, চতুর্দিকের জাতি-সকল David-এর দ্বারা বশীভূত হইয়াছিল, এবং Solomon-এর আধিপত্যে বিরোধী হইতে পারে এমন কোনো শক্তি যথেষ্ট প্রবল ছিল না। অতএব তাঁহার পিতা যে মহাসমৃদ্ধ দায়াধিকার রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাই উপভোগ করিতে, রাজধানীর বিস্তার ও শোভা সম্পাদন করিতে, তাঁহার পিতা যে বৃহৎ কীর্তির উপরে তাঁহার হৃদয়কে নিয়োগ করিয়াছিলেন সেই মন্দিররচনা সম্পাদন করিতে, তাঁহার অবসর ছিল। এই কার্যে তিনি টায়ারের রাজা Hiram-এর কাছ হইতে দুর্লভ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। David-এর প্রতি এই যুবকের অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

১৪৪

হিব্রুরা সাদাসিধে কৃষিজীবী লোক ছিল, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য অল্পই ছিল, পরন্তু Hiram-এর ফিনিসীয় প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষিত কারিগর ছিল। তন্মধ্যে যাহারা সর্বোৎকৃষ্ট তাহাদিগকে Solomon-এর হস্তে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করা হইয়াছিল। মন্দির নির্মাণ করিতে সাত বৎসর লাগিল; প্রত্যেক খুঁটিনাটি কার্য নিখুঁত হইল—ব্যয়বিষয়ে কোনোই কার্পণ্য করা হয় নাই। কার্যশেষে দুই-সপ্তাহ-ব্যাপী মহোৎসব পুণ্যবিধিপূর্বক সমাধা করিয়া মন্দির উৎসর্গ করা হইল, এবং ইহাতে দেশের নানা অংশ হইতে বিপুল জনস্রোত আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময় হইতে

জেরুজিলাম ইহুদীরাজ্যের ধর্মকেন্দ্র হইয়া উঠিল এবং ক্রমে এই মন্দির এমন একটি স্থান হইল যে, প্রত্যেক খাঁটি ইহুদী উৎসুক দৃষ্টিসহকারে তাহার দিকে তাকাইত।

১৪৫

মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে Solomon-এর নির্মাণ-উদ্যোগ শেষ হইল না। জেরুজিলাম দুর্গবন্ধ হইল; মহাশোভন রাজবাটীসমূহ নির্মিত হইল; যে নগরে মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো উৎসব-উপলক্ষে দর্শকগণের ভিড় হয় তাহার জন্য জল-সরবরাহের কারখানা ও জল-নিকাশের পথের যে নিতান্ত প্রয়োজন এ কথা Solomon বিস্মৃত হন নাই। প্রথম বয়সে শাসনকার্যে নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং দেশটিও সুব্যবস্থিত ছিল। তথাপি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমস্ত প্রাজ্ঞতা সত্ত্বেও Solomon-এর জীবন অসুখী ছিল। যে-সকল প্রলোভন রাজাকে ঘিরিয়া থাকে তিনি অসহায়ভাবে তাহার কবলগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুর অভূতপূর্ব পরিমাণে বৃহৎ ছিল; তাঁহার পত্নীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিমাপূজক হওয়ায় তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় অপহরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মকর্মে শিথিল হইতে লাগিলেন— রাজ্যমধ্যে অবাধে প্রতিমাপূজার অনুমোদন করিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার প্রতি জনাদর হ্রাস পাইয়াছিল।

১৪৬

David যে ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন যত দিন তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিল তত দিন সব ভালোই চলিল, কিন্তু তাহাও যখন নিঃশেষ হইল এবং তাঁহার অতিসজ্জিত প্রাসাদগুলির ও অসংখ্য ভৃত্যবর্গের সংরক্ষণের জন্য যখন অর্থসংগ্রহ করার প্রয়োজন হইল— তখন রাজকর পীড়াদায়ক ও প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চাশের কিছু বেশি বয়সে তিনি মারা গেলেন। Solomon অনেক বিস্ময়কর সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত সাম্রাজ্য, মহাখ্যাতি এবং অগণিত ধনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। পরন্তু প্রথমত তিনি ভালোই চলিয়াছিলেন, কিন্তু সমৃদ্ধির আনুষঙ্গিক প্রলোভনসমূহ তাঁহাকে অভিভূত করিল, এবং শেষের বৎসরগুলি তিনি ইন্দ্রিয়সম্ভোগে কাটাইয়াছিলেন। তিনি যখন অকালে জীর্ণ হইয়া মারা যান, তখন তিনি শূন্য রাজকোষ, বিদ্রোহী প্রজা এবং এমন একটি সাম্রাজ্য রাখিয়া গেলেন, যাহা লেশমাত্র স্পর্শে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে প্রস্তুত।

১৪৭

বরাকর পুলিস স্টেশনের কয়েক মাইল দক্ষিণে বরাকর নদীর সহিত ইহার মিলনস্থানে, দামোদর নদ প্রথমে বর্ধমান জিলায় প্রবেশ করে। অতঃপর ইহা রানীগঞ্জ ও অন্ডাল অতিক্রম করিয়া বর্ধমান ও বাঁকুড়া জিলার মধ্যবর্তী ৪৫ মাইল-ব্যাপী সীমা রচনাপূর্বক দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং খণ্ডঘোষের কাছে বর্ধমান জিলায় প্রবেশ করে। এখানে নদী উত্তর-পূর্ব দিকে হঠাৎ বাঁক লয় এবং বর্ধমান শহরের কাছ ঘেঁষিয়া যাওয়ার পর সোজা দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া অবশেষে মোহনপুর গ্রামের নিকটে এই জিলা পরিত্যাগ করে। ইহা অতঃপর শাপুর ও হবিবপুর গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তর দিক হইতে হুগলী জিলায় প্রবেশ করে এবং একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে বাঁকিতে বাঁকিতে আরামবাগ মহকুমাকে জিলার অবশিষ্টাংশ হইতে পৃথক্‌ করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।

১৪৮

রাজবলহাটের উপর দিক হইতে ৮ মাইল দূরে পর্যন্ত ইহা হাওড়া এবং হুগলী জিলার মধ্যবর্তী সীমা রচনা করে। সীমান্তের ৮ মাইল ধরিয়া লইলে হুগলী জিলায় এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮ মাইল। তার পর ইহা ওক্‌না গ্রামের ধার দিয়া হাওড়া জিলায় প্রবেশ করে এবং পরে দক্ষিণে আমতার দিকে প্রবাহিত হয়, আরও ভাটিতে অগ্রসর হইয়া ইহা দক্ষিণ তীরে গাইমাটা খাড়ির সহিত মিলিত হয়। আমতা পশ্চাতে ফেলিয়া ইহা বাগনানের অভিমুখে আঁকাবাঁকা দক্ষিণগামী পথ লয় এবং অতঃপর ইহা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ফল্‌তার ঠোঁটার অপর ধারে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। হাওড়া জিলার মধ্যগত এবং তাহার সীমাসংলগ্ন ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৪৫ মাইল।

১৪৯

আগে আমার ঘরগুলি ঠিকঠাক করা হউক, তার পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইলে আমি সুখী হইব। ইহা আমার সত্য মনের কথা, অতএব এমন সন্দেহ করিয়ো না যে তোমাকে এড়াইবার জন্য বলিতেছি। এই যে আমি ঘর সাজাইতেছি, আমার নিজের জন্য ততটা নয় যতটা তোমার জন্য, মার্চে ভারতের দিকে পাড়ি দিব বলিয়া যে আশা করিতেছি তাহাতে যদি বিশেষ প্রতিবন্ধক কিছু না ঘটে, তবে তৎপূর্বেই তোমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিব। আমার ইচ্ছা এই যে, আমার সমুদ্রযাত্রার পক্ষে কী কী দ্রব্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তাহা তুমি Major Watson-এর নিকট খোঁজ করিয়া রাখ। আমি সহজেই Government-এর নিকট হইতে রাজদূত, Consul ইত্যাদি এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজের শাসনকর্তাদিগেরও নিকট পত্র পাইতে পারি।

১৫০

আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমার সম্পত্তি ও উইল ট্রাস্টিদের হাতে অর্পণ করিব এবং তোমাকেও আমি তাহার মধ্যে একজন নিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। H—এর কাছ হইতে কোনো খবর পাই নাই; যখন পাইব, তখন তোমাকে সব বিস্তারিত খবর দিব। এ কথা তোমাকে মানিতে হইবে যে, মোটের উপর আমার মতলবটা মন্দ নয়। এখন যদি আমি ভ্রমণ না করি, তবে আর কখনো করা ঘটিবে না; ইহা সকল মানুষেরই কোনো-না-কোনো দিন করা উচিত। গৃহে আটকাইয়া রাখিবার মতো কোনো সম্বন্ধ বর্তমানে আমার নাই, না আছে স্ত্রী, না এমন কোনো ভাইবোন যাহারা নিঃসম্বল। আমি তোমার যত্ন লইব এবং প্রত্যাবর্তনের পর সম্ভবত আমি একজন রাষ্ট্রনীতিক হইতে পারিব। নিজের দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশ-সম্বন্ধে কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাকে উক্ত কাজের জন্য অযোগ্য করিবে না। কেবল স্বজাতি ছাড়া অন্য কোনো জাতিকে যদি না দেখি, তবে মানবজাতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিচার করিতে পারিব না। পুস্তকের দ্বারা নহে অভিজ্ঞতার দ্বারাই তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা কর্তব্য।

১৫১

আমরা আমাদের দোলা-বিছানায় চড়িলাম, মেক্সিকীয় লোকগণ তাহাদের অশ্বতরের জিনের উপর মাথা দিয়া মাটিতেই সটান শুইয়া পড়িল এবং শীঘ্রই প্রভু ও ভৃত্য সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি কোনো সময়ে চারি দিকের বায়ুমণ্ডল হইতে একটা চাপের ভাব অনুভব করায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বায়ুকে আর বায়ু বলিয়া বোধ হইতেছিল না, উহা যেন কোনো

বিষময় উচ্ছ্বাস, হঠাৎ উঠিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমরা যে গিরিসংকটের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে কৃষ্ণবর্ণ পূতিবিষাক্ত কুয়াশার ঢেউ গড়াইয়া আসিল, তাহাদের অনিষ্টকর প্রভাব আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। ইহা স্বয়ং জ্বর, কুয়াশা-রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে।

১৫২

আমি যখন নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, ঠিক সেই সময়েই একটা মেঘের মতো পদার্থ যেন আসিয়া আমার উপরে স্থির হইয়া বসিল এবং আমার হস্ত মুখ কণ্ঠ প্রভৃতি দেহের যে কয়টি অংশ তিন পাক বস্ত্রের দ্বারা রক্ষিত না ছিল, সেই-সকল অঙ্গে অগ্নিময় সূচীর ন্যায় সহস্র হুল বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ নিজের দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহা মুষ্টিবদ্ধ করিলাম, ও এইরূপ উপায়ে শত শত প্রকাণ্ড মশা ধরিয়া ফেলিলাম! আকাশ তখন ঐ কীটগুলির নিবিড় ঝাঁকে পরিপূর্ণ হইল, এবং বারংবার তাহাদের বিষাক্ত দংশনের যন্ত্রণাও অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল।

১৫৩

আমার নিকট হইতে প্রায় দশ গজ দূরে Rowleyর দোলা-বিছানা টাঙানো—শীঘ্রই সে মুখর হইয়া উঠিল; আমি শুনিতে পাইলাম যে সে লাথি ছুঁড়িতেছে ও কটূক্তি করিতেছে এতই সতেজে ও সবলে যে অন্য কোনো অবস্থায় হইলে হাস্যকর হইত, কিন্তু অবস্থা ঠিক সেই সময়টাতে হাস্যের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। মশকদংশনের যন্ত্রণা এবং আমাদের চারি দিকে প্রতি মুহূর্তেই ঘনায়মান ঐ বিষাক্ত বাষ্পের ফলে আমি ইতিমধ্যেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে উত্তাপে তপ্ত ও শীতে কম্পিত হইতেছিলাম, আমার জিহ্বা শুষ্ক এবং মস্তিষ্ক যেন অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল।

১৫৪

সেই ক্ষণে আমাদের কয়েক পাদ দূরেই যন্ত্রণাকাতর ও চরম বিপদাপন্ন স্ত্রীলোকের আর্ত চীৎকারের ন্যায় একটা চীৎকার শোনা গেল। আমি আমার দোলা-বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে আমার পার্শ্ব দিয়া দুইটি শ্বেতবসনা ও কমনীয়া নারীমূর্তি তীরের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। পলাতকাদের একেবারে 'পশ্চাতেই প্রকাণ্ড দীর্ঘ পদক্ষেপে ও লাফ দিতে দিতে তিন চারিটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আসিয়া পড়িল, তাহারা পার্থিব কোনো বস্তুরই সদৃশ নয়। তাহাদের শরীরের গঠন নিশ্চিতই মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু তাহাদের চেহারা এমন কুশ্রী ও ভয়াবহ, এমন অস্বাভাবিক এবং প্রেততুল্য যে, ঐ আলোকহীন গিরিসংকটে এবং আমাদের চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারে উহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে প্রবলতম সাহসিক ব্যক্তিও বিচলিত হইতে পারিত।

১৫৫

ঐ অদ্ভুত বস্তুগুলির আবির্ভাবে আমি ও Rowley মুহূর্তকাল বিস্ময়ে গতিশক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু আর একটি কর্ণভেদী আর্তনাদ আমাদের সতর্ক মন ফিরাইয়া

আনিল। ঐ স্ত্রীলোক দুইটির মধ্যে একজন হয় উঁচট খাইয়াছিল, নয়, ক্লান্তিবশত পড়িয়া গিয়াছিল এবং শ্বেতবর্ণ স্তূপের ন্যায় ভূমিতলে শয়ান ছিল। আর একজনের দেহাবরণ-বস্ত্র ঐ প্রেতমূর্তিদের মধ্যে একজনের করায়ত্ত হইয়াছে, এমন সময় Rowley আশঙ্কার আর্তরবে সম্মুখে ধাবিত হইল এবং আপনার ছুরির দ্বারা ঐ ভীষণ জীবটিকে এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। কিরূপে ঘটিল তাহা প্রায় না জানিয়াই আমিও সেই সময়েই ঐরূপ আর-একটি প্রাণীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঐ যুদ্ধ সমকক্ষের যুদ্ধ ছিল না।

১৫৬

আমরা বৃথাই আমাদের ছুরিকা-দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলাম, আমাদের প্রতিপক্ষগণ এমন কঠিন লোমাবৃত চর্ম-দ্বারা আচ্ছন্ন ও রক্ষিত ছিল যে, আমাদের ছুরিকাগুলি তীক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাগ্র হইলেও তাহাদের চর্মভেদ করিতে অত্যন্ত বাধা পাইতেছিল, এবং অপর পক্ষে আমরা দীর্ঘ পেশীবহুল ও ঈগল পক্ষীর নখরের ন্যায় দৃঢ় ও তীক্ষ্ম নখরশালী অঙ্গুলিযুক্ত বাহু-দ্বারা ধৃত হইলাম! ঐ প্রাণী যখন আমাকে ধরিয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া ভল্লুকের ন্যায় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল তখন তাহার ঐ ভীষণ নখরের আঘাত আমি আমার স্কন্ধে অনুভব করিলাম, তাহার অর্ধমানুষ ও অর্ধপাশব মুখ তখন দন্তবিকাশপূর্বক আমাকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছিল এবং আমার মুখের ছয় ইঞ্চির মধ্যে তাহার তীক্ষ্ম ও বিশাল শ্বেত দন্ত-সকল ঘর্ষণ করিতেছিল।

১৫৭

'স্বর্গাধিরাজ ভগবান, এ যে ভয়ানক— রাউলি আমাকে সাহায্য করো।' কিন্তু Rowley আপনার দানবিক বলসত্ত্বেও তাহার ভীষণ প্রতিপক্ষদের বাহুবন্ধনে শিশুর ন্যায় শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সে আমার কয়েক পা দূরেই তাহাদের দুইজনের সহিত যুঝিতেছিল এবং হস্ত হইতে পতিত অথবা বলপূর্বক গৃহীত ছুরিকাটি পুনর্বার অধিকার করিবার জন্য অতিমানুষিক চেষ্টা করিতেছিল। নৈরাশ্যের প্রবল বলে তাড়িত একটি ছুরিকাঘাত আমার শত্রুর পার্শ্বদেশ ভেদ করিল। ক্রোধ ও যন্ত্রণাব্যঞ্জক কর্ণবধিরকর চীৎকার করিয়া ঐ বিকট প্রাণী তাহার বীভৎস দেহের সহিত আমাকে আরও সবলে চাপিয়া ধরিল, তাহার তীক্ষ্ম নখর আরও গভীরভাবে আমার পৃষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া যেন মাংস ছিঁড়িয়া তুলিতে লাগিল; সে যন্ত্রণা অসহনীয়, আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

১৫৮

ঠিক সেই সময় দুম্ দুম্ বন্দুকের শব্দ। দুই, চার, বারোটা বন্দুক ও পিস্তলের শব্দ— তাহার পরেই সমস্বরে সে কী চীৎকার গর্জন ও অপার্থিব হাস্য! আমাকে যে জন্তুটা ধরিয়াছিল সে যেন কিঞ্চিৎ চকিত হইয়া তাহার বাহুবেষ্টন ঈষৎ শিথিল করিল। সেই মুহূর্তে আমার সম্মুখে কে একখানা কৃষ্ণবর্ণ হস্ত চালাইয়া দিল, চক্ষু অন্ধকার করিয়া একটা অগ্নিশিখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল এবং একটা তীব্র চীৎকার শোনা গেল এবং আমি আমার শত্রুর আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। আমার আর কিছুই স্মরণ নাই। যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলাম পুষ্পপল্লবময় একটি নিকুঞ্জের মতো জায়গায় কতকগুলি কম্বলের উপর আমি শয়ান। তখন স্পষ্ট দিন হইয়াছে, সূর্য তখন উজ্জ্বলরূপে দীপ্যমান, পুষ্প-সকল সুগন্ধ দান করিতেছে

এবং বিচিত্রবর্ণপক্ষযুক্ত গুঞ্জং পক্ষীরা প্রাণবাণ সকোণ কাচখণ্ডের ন্যায় সূর্যালোকে ইতস্তত তীরবেগে ধাবিত হইতেছে।

১৫৯

আমার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং আমার অপরিচিত একজন মেক্সিকীয় ইন্ডিয়ান আমার দিকে কোনো তরল পদার্থে পূর্ণ একটি নারিকেলের মালা অগ্রসর করিয়া ধরিল; সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যস্থ পদার্থ পান করিয়া ফেলিলাম। ঐ পানীয়টি আমাকে অনেক পরিমাণে সজীব করিয়া তুলিল এবং কনুইয়ে ভর দিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া আমি চারি দিকে চাহিলাম এবং এমন-একটি ব্যস্ততা ও সজীবতা-পূর্ণ দৃশ্য দেখিলাম, যাহা আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে অবোধগম্য। যে মেক্সিকীয় ব্যক্তিটি তখনো আমার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল তাহাকে এই-সকলের অর্থ কী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার স্পেনীয় ভাষাজ্ঞান মনে মনে গুছাইয়া লইলাম।

১৬০

এমন সময় ঐ শিবিরের মধ্যে একটা প্রবল ব্যস্ততা অনুভব করিলাম এবং দেখিলাম, দীর্ঘপর্ণী-জাতীয় উদ্ভিদের ঝোপের ভিতর হইতে সবেমাত্র একদল লোক বাহির হইয়া আসিয়াছে— উহাদের মধ্যে আমাদের ভৃত্যবর্গকে চিনিতে পারিলাম। ঐ নবাগতগণ কোনো বস্তুর চতুর্দিকে দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে ভূমির উপর দিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিতেছিল। আমার অনুচর উল্লসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'উহারা একটি জাম্বো বধ করিয়াছে!' আমি ও Rowley যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম, ঐ দলটি লাফাইতে লাফাইতে ও হাসিতে হাসিতে তাহারি নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, 'একটা জাম্বো, একটা জাম্বো, হত হইয়াছে!'

১৬১

ঐ দলটি একটু ফাঁক হইয়া গেল, আমরা আমাদের পূর্বরাত্রের ভীষণ প্রতিপক্ষদের মধ্যে একটিকে মৃতাবস্থায় ভূতলে শায়িত দেখিলাম। আমি ও Rowley এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিলাম— 'এ কী? এই জাম্বোগণ অতি ভয়ানক, এক প্রকার বানর!' আমি বলিলাম, 'বানর!' বেচারা Rowley আপনার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে উঠিয়া বসিয়া আমার কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিল, 'বানর! আমরা বানরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম! এবং তাহারাই আমাদিগকে এইরূপে আহত করিয়াছে।'

১৬২

চা-বাগানের এক ম্যানেজার লিখিতেছেন যে, 'অঙ্কুশকৃমি'র চিকিৎসার সফলতায় এই বাগানের কুলিদের স্বাস্থ্য এবং স্বস্তির পক্ষে আশাতীত পরিমাণে উপকার ঘটিয়াছে। পূর্বে বর্ষাকালে নানাপ্রকার পীড়া-বশত প্রত্যহ আমার প্রায় ১৫০ হইতে ২০০ কুলি বেকার থাকিত। আমি নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে, এ বৎসর বেকার কুলিদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬০, এবং প্রায়ই ইহার চেয়ে অনেক কম। Colonel Lane-এর নিজের সুবিচারিত মত এই যে, 'ভারতবর্ষকে এই কৃমির সংক্রামকতা হইতে মুক্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর। এবং ইহা সম্পন্ন হইলে বর্তমানে যে ভারতবর্ষকে আমরা জানি, তাহা হইতে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভারতবর্ষ জন্মলাভ করিবে; তাহা

নীরোগতায় স্বাস্থ্যে শক্তিতে এবং সম্পদে পৃথক।' তিনি উপসংহারকালে, এই নবভারত কী উপায়ে সৃষ্ট হইতে পারে তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম উপায় তাহার যে পীড়া আছে সেই জ্ঞান; তাহার পরে তাহার রোগের প্রকৃতি, কিরূপে তাহার প্রতিকার হইতে পারে এবং কিরূপে রোগের পুনরাবর্তন নিষেধ করা যায়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান।

১৬৩

তোমাকে আমার লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাংলা দেশের পক্ষে যে জ্ঞানের এত বেশি প্রয়োজন যাহাতে সেই জ্ঞান বিস্তার করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়-সম্বন্ধে স্যানিটারি বোর্ডের উপদেশ সংগ্রহ করা হয়। এই ব্যাধি সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা হইতে দুইটি কথা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে—প্রথম, যে, ইহা অত্যন্ত দূরবিস্তৃত, এবং দ্বিতীয়, যে, ইহা সহজেই সারিয়া যায়। কিন্তু যদি বা এই পরাশিত কীট মনুষ্যের দেহতন্ত্র হইতে বিনাক্লেশে তাড়িত হয় তথাপি ইহার পুনঃসংক্রমণ নিষেধ করা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। এবং সেই পুনঃসংক্রমণ হইতে নিরাপদ হওয়া কেবলমাত্র জনগণের স্বাস্থ্যপালন-সম্বন্ধীয় অভ্যাস-সকলের পরিবর্তন-দ্বারাই ঘটিতে পারে। অতএব এইরূপ যেন বোধ হইতেছে যে, এই পরাশিত কীটের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনের চেষ্টার সময় এখনো আসে নাই। কিন্তু যাবৎ বর্তমানে অংকুশকৃমির বিরুদ্ধে নিঃশেষকারী যুদ্ধ চালনা করা সাধ্য না হয় তাবৎ আমার এই বোধ হয় যে, সংগ্রামের একটা প্রথম উপক্রম হাতে লওয়া বেশ চলে।

১৬৪

উপসংহারে আমি বলি যে, এক্ষণে এ সম্বন্ধে আমাদের যতটা জ্ঞান আছে তাহাতে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাগুলিকে স্থাপিত করা আমাদের পক্ষে অন্যায় নহে যে—১. বাংলার জনসংখ্যার বৃহদংশ, সম্ভবত শতকরা আশি ভাগ, যাহাতে মোটের উপরে প্রায় তিন কোটি ষাট লক্ষ লোক বুঝায়, এই অংকুশকৃমির দ্বারা আক্রান্ত; ২. এমন-কি, মৃদুসংক্রমণেও জীবনীশক্তির খর্বতা, রক্তহীনতা, জড়তা প্রভৃতি মন্দ ফলের জন্য ইহা দায়ী; ৩. অল্পব্যয়ে এই ব্যাধির প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু ৪. দূষিত ভূমিতলকে রোগসংক্রমণ হইতে মুক্ত করিলে তবে ইহাকে নিরস্ত করা এবং তদনুসারে ধ্বংস করা যাইতে পারে; এবং ৫. এই রোগের কারণ ও প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তৃত প্রচার এবং তৎপশ্চাতে জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় অভ্যাস-সকলের পরিবর্তনের দ্বারাই ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে।

১৬৫

মা যখন মারা গেলেন, তখন Catherina-র বয়স পনেরো বৎসর মাত্র, সেইজন্য তিনি তখন আপনার কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, যে ধর্মযাজকের দ্বারা আশৈশব শিক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহারই সহিত বাস করিতে গেলেন। তাঁহার গৃহে তিনি তাঁহার পুত্রকন্যার শিক্ষয়িত্রী পরিচারিকারূপে আবাস গ্রহণ করিলেন। Catherinaকে ঐ বৃদ্ধ আপনার সন্তানদেরই একজনের ন্যায় দেখিতেন এবং বাড়ির অন্য-সকলের শিক্ষায় নিযুক্ত যে-সকল শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদিগের দ্বারাই তাঁহাকে নৃত্যবিদ্যা ও সংগীতে শিক্ষিতা করিতে লাগিলেন। এইরূপে Catherina ক্রমশই উন্নতি লাভ করিয়া চলিলেন যে পর্যন্ত না ধর্মযাজকের মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় পুনশ্চ তাঁহাকে দারিদ্র্যে অবতীর্ণ করিল।

১৬৬

লিভোনিয়া প্রদেশ এই সময় যুদ্ধের দ্বারা উচ্ছন্ন হইতেছিল, এবং শোচ্যতম ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল। ঐ-সকল দুর্দৈবে চিরকালই দরিদ্রের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা দুর্বহ হয়, ঐ কারণে Catherina এত নানা বিদ্যার অধিকারিণী হইয়াও নৈরাশ্যজনক অকিঞ্চনতার সর্বপ্রকার দুঃখ ভোগ করিলেন। আহার্য প্রতিদিনই দুর্লভতর হইয়া উঠায় এবং তাঁহার নিজস্ব সম্বল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তিনি অবশেষে Marionburg নগরে যাত্রা করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার ভ্রমণকালে একদিন সন্ধ্যার সময় যখন তিনি রাত্রিবাসের জন্য পথপার্শ্বস্থ এক কুটীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন দুইজন সুইডীয় সৈনিকের দ্বারা তিনি উৎপীড়িত হন। ঘটনাক্রমে সেই সময় ঐ স্থান দিয়া একজন সৈন্যদলের উপনায়ক যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত না হইলে উহারা অপমানকে সম্ভবত উপদ্রবে পরিণত করিত।

১৬৭

তাঁহার আবির্ভাবে সৈনিকদ্বয় তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইল, কিন্তু Catherina যখন আপনার উদ্ধারকর্তাকে তাঁহার পূর্বতন গুরু, হিতকারী এবং বন্ধু ধর্মযাজকের পুত্র বলিয়া অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন, তখন যেমন বিস্মিত তেমনি কৃতজ্ঞ হইলেন। এই সাক্ষাৎকার Catherina-র পক্ষে সুখকর হইয়াছিল। যে অল্প অর্থসম্বল তিনি গৃহ হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা এত দিনে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। যাহারা তাঁহাকে আপনাদের গৃহে আশ্রয় দান করিয়াছিল তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য পরিচ্ছদগুলি এক-এক করিয়া নিঃশেষিত হইতেছিল। এই কারণে তাঁহার বদান্য স্বদেশী ব্যক্তিটি পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য যতটা পারেন অর্থ দান করিলেন, একটি অশ্ব জোগাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিতার বিশ্বাসী বন্ধু Marionburg-এর পরিদর্শক Mr. Gluck-এর নিকট প্রশংসাপত্রও দিলেন।

১৬৮

Catherina তৎক্ষণাৎ পরিদর্শকের পরিবারে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের শিক্ষয়িত্রী পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সুমতি ও সৌন্দর্য এত অধিক ছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রভু তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন এবং যখন Catherina তাহা প্রত্যাখ্যান করাই সংগত মনে করিলেন তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। যদিও উদ্ধারকর্তার একটি হস্ত কাটা গিয়াছিল এবং যুদ্ধব্যবসায়ে অন্য প্রকারে তিনি বিকৃতদেহ হইয়াছিলেন, তথাপি কৃতজ্ঞতার ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি উদ্ধারকর্তাকেই বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই কর্মচারী কার্যানুরোধে ঐ নগরে আসিবামাত্র Catherina তাঁহাকে আপনার পাণিদানের প্রস্তাব করিতেই তিনি তাহা উল্লাসের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যেদিন তাঁহাদের বিবাহ হইল সেই দিনেই রুশগণ Marionburg অবরোধ করিল। ঐ দুর্ভাগ্য সৈনিক একটি আক্রমণ ব্যাপারে আহূত হইলেন, কিন্তু আর তাঁহাকে ফিরিতে দেখা গেল না।

১৬৯

Marionburg শত্রুদ্বারা অধিকৃত হইল এবং আততায়ীদের প্রচণ্ডতা এরূপ ছিল যে, কেবল-মাত্র প্রহরী-সৈন্য নয়, নগরের প্রায় সমস্ত অধিবাসী— স্ত্রী পুরুষ ও শিশু তরবারির মুখে নিক্ষিপ্ত

হইল। অবশেষে হত্যাকাণ্ডের যখন প্রায় অবসান হইয়াছে তখন Catherina চুলার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় ধরা পড়িলেন। তিনি এত দিন দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাকে এক্ষণে কঠোর ভাগ্যের আনুগত্য করা এবং ক্রীতদাসী হওয়া যে কী তাহা শিক্ষা করিতে হইল। যাহা হউক, এই অবস্থায় তিনি তাঁহার ব্যবহারে ধর্মনিষ্ঠা এবং নম্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার গুণের খ্যাতি রুশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ প্রিন্স্ Memsikoff-এর নিকটেও পোঁছিল, তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে আপনার ভগিনীর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত করিলেন।

১৭০

এখানে সকলের ব্যবহারে তিনি তাঁহার গুণের উপযুক্ত শ্রদ্ধা লাভ করিলেন; এ দিকে তাঁহার সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সৌন্দর্যও উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাঁহার দীর্ঘকাল না যাইতেই যখন পীটর্ দি গ্রেট্ প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, ঘটনাক্রমে Catherina কিছু ফল লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং বিশেষ একটি চারুতার সহিত তাহা পরিবেশন করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী রাজা তাঁহার সৌন্দর্য দেখিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি পরদিন পুনর্বার আসিলেন, আসিয়া সুন্দরী দাসীকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বুদ্ধি তাঁহার সৌন্দর্য অপেক্ষাও পূর্ণতর।

১৭১

তিনি তৎক্ষণাৎ এই অষ্টাদশ বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়সের সুন্দরী লিভোনিয়াবাসিনীর জীবনকাহিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বংশের হীনতা সম্রাটের অভিপ্রায়কে কোনোই বাধা দিল না, তাঁহাদের বিবাহ গোপনে বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হইল; প্রিন্স্ তাঁহার সভাসদ্দিগকে দৃঢ় করিয়া বলিলেন যে, গুণই একমাত্র সিংহাসনে আরোহণের যোগ্য সোপান। আমরা এখন Catherinaকে অনুচ্চ মৃন্ময়প্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর হইতে পৃথিবীর বৃহত্তম রাজ্যের অধীশ্বরীরূপে দেখিলাম।

১৭২

এক ডাকেই তোমার দুইখানা চিঠি পাওয়া আমার পক্ষে বড়োই আনন্দময় বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। তুমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়ার পর আমরা ছোটোখাটো দুই-এক কথায় তোমার খবর পাইয়াছিলাম, কিন্তু এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ভারতবর্ষে পোঁছিয়াই যে তুমি কাজে-কর্মে বিষম ব্যস্ত হইয়া পড়িবে তাহা ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমাদের এখানে বহু পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। একটা বিশেষ রকমের অসুখকর সর্দিজ্বর সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, এবং সহজে এই জ্বরের যতটা অংশ আমাদের পরিবারের ভাগে পড়া উচিত ছিল তাহার চেয়ে বরঞ্চ অনেকটা বেশি পড়িয়াছে। Elsie-র যে ছোটো ভাগিনেয়টি সারা দিনই তাহার কাছে কাছে থাকে, এবং যাহার মতে জগতে 'Elsie মামী'র মতো খেলার সাথী আর নাই, তাহাকে পাইয়া Elsie খুব সুখী হইয়াছে। আমাদের সকলকেই খুব খাটিতে হইতেছে। এই ভয়ংকর যুদ্ধের সময়ে আমাদের কাহারও দিনই সহজভাবে কাটিতেছে না। তোমাকে আমাদের পরিবারমণ্ডলের অকপট প্রীতি জানাইতেছি।

১৭৩

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সকল যুগের সাহিত্যেই দেখা যায় যে, ধূমকেতুকে লোকে তখন দুঃখের ভীষণ অগ্রদূত বলিয়া বিশ্বাস করিত। লোকের সাধারণত ধারণা ছিল যে, নক্ষত্র ও উল্কা ভবিষ্যৎ শুভ-ঘটনার, বিশেষ করিয়া বীর ও মহৎ জনশাসকদের জন্মের ভাবী বার্তা বলে। সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণগুলি পার্থিব দুর্ঘটনায় প্রকৃতির দুঃখানুভব ব্যক্ত করে এবং অন্যান্য সমস্ত দৈব সংকেতসমষ্টির অপেক্ষা ধূমকেতুই গুরুতর অমঙ্গলের পূর্বসূচনা। যাহারা ইহা ভগবানের প্রেরিত সংকেত বলিয়া স্বীকার না করিত তাহারা নাস্তিক নামে কলঙ্কিত হইত। John Knox ইহা-দিগকে দেবতার ক্রোধের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অপর অনেকে পোপপূজকদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রাজার প্রতি সংকেত ইহার মধ্যে দেখিয়াছিল। Luther ইহাদিগকে শয়তানের কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগকে কুলটা তারা বলিতেন।

১৭৪

Milton বলেন যে, ধূমকেতু তাহার ভয়াবহ কেশজাল ঝাড়া দিয়া মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহ বর্ষণ করে। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম কৃষক পর্যন্ত সমগ্র জাতি এই অমঙ্গলের দূত-সকলের আবির্ভাবে ক্ষণে ক্ষণে দারুণতম আতঙ্কে নিমগ্ন হইত। ১৪৫৬ খৃস্টাব্দে, হ্যালির নামে পরিচিত ধূমকেতুর পুনরাগমনে যেমন সুদূরব্যাপী ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল পূর্বে আর কখনো তেমন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বিধাতার শেষ-বিচারের দিন আগতপ্রায় এই বিশ্বাস ব্যাপক হইয়াছিল। লোকে সমস্ত আশা-ভরসা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের বিনাদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৬০৭ খৃস্টাব্দে ইহা আবার স্বীয় আবির্ভাবে জগৎকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল এবং ভজনালয়গুলি ভয়াভিহত জনসংঘে পূর্ণ হইয়া গেল।

১৭৫

তৎকালীন প্রেগ্‌ নগরের রাজজ্যোতিষী Kepler শান্তচিত্তে ইহার গতিপথ অনুসরণ করিয়া আবিষ্কার করিলেন যে, সেই পথ চন্দ্রের ভ্রমণকক্ষের বাহিরে। Kepler-এর এই আবিষ্কারের ঘোষণা তুমুল বাদবিসংবাদ সৃষ্টি করিল, কারণ, ইহা ধূমকেতু-সম্বন্ধীয় অন্ধ সংস্কার-সকলের মূলে আঘাত করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের ন্যায় এত অধুনাতন কালেও রোমের ক্লেমেন্টিন কলেজের Father De Angelis ধূমকেতু-সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিশ্বাস সমর্থন করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ধূমকেতু-সকল চন্দ্রের নীচে আমাদের বায়ুমণ্ডলেই জন্মে। প্রত্যেক দিব্য বস্তুই নিত্যকালস্থায়ী। আমরা ধূমকেতুর আরম্ভও দেখি সমাপ্তিও দেখি, সুতরাং তাহারা দিব্য জ্যোতিষ্ক নহে। ইহারা বায়ুর শুষ্ক ও মেদযুক্ত পদার্থ হইতে নিঃসৃত এবং ইহারা আকাশ হইতে কোনো স্ফুলিঙ্গ অথবা বিদ্যুৎ-দ্বারা প্রজ্বলিত হইতে পারে।

১৭৬

Bayonne-এ পৌঁছিবার পরদিনে আমি Biarritz-এ যাইতে ইচ্ছা করিলাম। পথ না জানাতে আমি একজন Navarre-দেশীয় কৃষককে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, 'Pont Magour-এর পথ ধরো এবং Porte de Espagne পর্যন্ত ইহার অনুসরণ করিয়া যাও।'

'বিয়ারিজের জন্য একখানা গাড়ি পাওয়া কি সহজ?' নাভারীয় আমার দিকে তাকাইল, একটু গম্ভীর হাসি হাসিল এবং নিজ দেশ-প্রচলিত টান দিয়া স্মরণীয় এই যে কয়টি কথা বলিল তাহার গভীর সত্যতা আমি পরে বুঝিয়াছিলাম—'সাহেব, সেখানে যাওয়া সহজ কিন্তু ফিরিয়া আসা শক্ত।'

১৭৭

আমি Pont Magour-এর পথ ধরিলাম। এই পথে উঠিতে উঠিতে আমি অনেকগুলি দেওয়ালে লাগানো বিভিন্ন রঙের বিজ্ঞাপনফলক দেখিলাম, সেগুলিতে ভাড়াটে গাড়িওয়ালারা নানা সংগত ভাড়ায় সাধারণকে Biarritz-এ যাইবার জন্য গাড়ি দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। আমি লক্ষ করিলাম কিন্তু খেয়াল করিলাম না যে, সকল ঘোষণারই শেষে এই একই বাক্য আছে—'সন্ধ্যা আট ঘটিকা পর্যন্ত ভাড়ার বদল হইবে না।' আমি Porte de Espagne পৌঁছিলাম। সেখানে সকল প্রকারের শকট এলোমেলো ভাবে ঠাসাঠাসি করা আছে। এই ভিড়-করা গাড়ির প্রতি দৃষ্টি দিতে-না-দিতে দেখিলাম আমি স্বয়ং অকস্মাৎ আর এক প্রকার ভিড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহারা গাড়োয়ান-দল। এক মুহূর্তে আমার কানে তালা লাগাইয়া দিল। আমি একযোগে সব-রকম কণ্ঠস্বর, সব-রকম উচ্চারণের টান, সব-রকম অপভাষা, সব-রকম শপথ-বাক্য এবং সব-রকম প্রস্তাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলাম।

১৭৮

একজন আমার দক্ষিণ হস্তখানা ধরিয়া ফেলিল, 'মহাশয়, আমি Castix সাহেবের গাড়োয়ান; গাড়িতে উঠিয়া পড়ুন, এক সীটের ভাড়া ১৫ সু।' আর-এক জন আমার বাম হস্ত ধরিল, 'মহাশয়, আমি Ruspit, আমারও একখানা গাড়ি আছে—বারো সুতে একটি সীট।' তৃতীয় একজন আমার পথ জুড়িয়া দাঁড়াইল, 'আমি Anatole, এই যে আমার গাড়ি; আপনাকে দশ সুতে গাড়ি হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।' চতুর্থ এক ব্যক্তি আমার কানে কানে বলিল, 'মহাশয়, Momus-এর সঙ্গে আসুন, আমিই মোমস। ছয় সুতে পুরা দমে বিয়ারিজে।' আমার চারি দিকে আর সকলে 'পাঁচ সু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। 'দেখুন মহাশয়, সুন্দর গাড়িখানি—বিয়ারিজের সুলতান; পাঁচ সুতে এক সীট।'

১৭৯

যে আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছিল এবং আমার ডান হাত ধরিয়াই ছিল সেই শেষকালে সকল কোলাহলের উপরে গলা চড়াইল। সে বলিল, 'সাহেব, আমিই আপনার সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছি, আমাকেই পছন্দ করা উচিত।' অন্য গাড়োয়ানেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ও পনেরো সু চায়।' লোকটি অনায়াসে উত্তর করিল, 'মহাশয়, আমি তিন সু চাই।' নিবিড় নিঃশব্দতা বিরাজ করিতে লাগিল। লোকটি বলিল, 'আমিই সাহেবের সঙ্গে প্রথম কথা বলিয়াছিলাম।' তাহার পরে যখন অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা অবাক হইয়া গেছে সেই সুযোগে সে তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির দরজা খুলিল, আমি প্রকৃতিস্থ হইবার সময় পাইবার পূর্বেই আমাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিল, দরজাটা আবার বন্ধ করিল, কোচ্‌বাক্সে চড়িয়া বসিল এবং দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল।

১৮০

গাড়িখানা সম্পূর্ণ নূতন এবং বেশ ভালো; ঘোড়াগুলি অতি উৎকৃষ্ট। অর্ধ ঘণ্টারও অল্প সময়ে আমরা বিয়ারিজে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে পেঁৗছিয়া, সস্তা চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম বলিয়া আমি টাকার থলি হইতে পনেরোটি সু লইলাম এবং গাড়োয়ানকে তাহাই দিলাম। আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত ছিলাম, কিন্তু সে আমার হাত ধরিল। সে বলিল, 'মহাশয়, আমার প্রাপ্য মাত্র তিন সু।' আমি উত্তর করিলাম, 'হাঁ! তুমি আমাকে প্রথমে পনেরো সু বলিয়াছিলে। পনেরো সু'ই দিব।' 'মোটেই না সাহেব! আমি বলিয়াছিলাম আপনাকে তিন সু'তে লইব, সুতরাং ভাড়া তিন সু।' এবং উদ্‌বৃত্ত মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া প্রায় জোর করিয়া সে আমাকে তাহা গছাইয়া দিল। আমি যাইতে যাইতে বলিলাম, 'লোকটা খাঁটি বটে!' অন্যান্য যাত্রীরাও আমার মতো তিন সু মাত্রই দিয়াছিল।

১৮১

সারাদিন সমুদ্রতীরে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল এবং আমি Bayonne-এ ফিরিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং যে উৎকৃষ্ট যান ও সাধু সারথি আমাকে সেখানে পেঁৗছাইয়া দিয়াছিল তাহারই কথা স্মরণ করিয়া আমি বিশেষ কিছু আনন্দ বোধ করিলাম। যখন আমি পুরাতন বন্দর হইতে ফিরিবার মুখে ঢালু পথে উঠিতেছিলাম তখন সমতল দেশে দূরের ঘড়িগুলিতে আটটা বাজিতেছিল। চারি দিক হইতে যে-সব পদাতিক ভিড় করিয়া আসিতেছিল, এবং মনে হইল তাহারা গ্রামের প্রবেশপথে গাড়ি দাঁড়াইবার জায়গায় যাইতেছে, তাহাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দিই নাই। সন্ধ্যাটি চমৎকার হইয়াছিল, কয়েকটি তারা যেন গোধূলির নির্মল আকাশ বিদীর্ণ করিতে শুরু করিয়াছিল; শান্তপ্রায় সমুদ্রে বিপুল তৈলাস্তরণের মতো একটি নিস্তেজ অস্বচ্ছ আভা বিরাজ করিতেছিল।

১৮২

অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিল এবং অকস্মাৎ কোন্‌-এক সময়ে Bayonne নগর এবং আমার সরাইখানার চিন্তা আমার ধ্যানের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। আমি আবার চলা আরম্ভ করিলাম এবং যে জায়গা হইতে গাড়ি ছাড়ে সেইখানে আসিয়া পেঁৗছিলাম। একটিমাত্র গাড়ি অবশিষ্ট ছিল। ভূমিতলে স্থাপিত একটি প্রকাণ্ড লণ্ঠনের আলোকে আমি তাহা দেখিলাম। ইহা চারিজনের সীট-বিশিষ্ট গাড়ি। তিনটি সীট ইতিমধ্যেই অধিকৃত। আমি নিকটস্থ হইতে একটি চীৎকারস্বর উঠিল 'এই যে সাহেব, শীঘ্র করুন, একটি শেষ সীট এবং আমাদেরই শেষ গাড়ি।' আমি আমার সকাল বেলাকার সারথির কণ্ঠস্বর চিনিলাম। মনুষ্যজাতীয় সেই অপূর্ব পদার্থটিকে আমি পুনর্বার পাইলাম। এই সৌভাগ্য আমার নিকট দৈবঘটিত বোধ হইল এবং আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আর এক মুহূর্ত দেরি করিলেই আমি পদব্রজে যাত্রা করিতে বাধ্য হইতাম—খাঁটি দেড় ক্রোশ পল্লীপথ। আমি বলিলাম, 'তোমাকে আবার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।' লোকটি উত্তর দিল, 'মহাশয়, তাড়াতাড়ি ঢুকিয়া পড়ুন।' আমি সত্বর নিজেকে গাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

১৮৩

আমি উপবিষ্ট হইলে পর সারথি দরজার হ্যান্ডেলে হাত রাখিয়া আমাকে বলিল, 'মহাশয়, জানেন কি যে, ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে?' আমি বলিলাম, 'কিসের ঘণ্টা?' 'আটটা।' 'ঠিক

কথা। আমি ঐ রকমই বাজিতে শুনিয়াছি বটে।' উত্তরে লোকটি বলিল, 'সাহেব, জানেন যে, সন্ধ্যার আটটার পর ভাড়ার পরিবর্তন হয়। রওয়ানা হইবার পূর্বেই ভাড়া দেওয়া দস্তুর।' আমি টাকার থলিটা টানিয়া বাহির করিয়া উত্তর দিলাম, 'নিশ্চয়ই, কত ভাড়া?' লোকটি মিষ্টস্বরে উত্তর দিল, 'বারো ফ্রাঙ্ক্ সাহেব!' তৎক্ষণাৎ কার্যপ্রণালীটি বুঝিলাম। প্রাতঃকালে ইহারা লোকপিছু তিন সু হারে দর্শকদিগকে বিয়ারিজে গাড়ি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে এবং তখনি ভিড় জমিয়া যায়। সন্ধ্যায় লোকপিছু বারো ফ্রাঙ্ক্ হারে ইহারা সেই ভিড়টিকে Bayonne-এ ফিরাইয়া আনে।

১৮৪

৩১শে মে ৮২। আজ হইতে আমি চৌষট্টি বৎসরে পা দিলাম। যে পক্ষাঘাত রোগ প্রায় দশ বৎসর পূর্বে আমাকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছে, তখন হইতেই নানা দশান্তরের মধ্য দিয়া থাকিয়াই গিয়াছে, এখন যেন তাহা বেশ শান্তভাবে স্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে এবং সম্ভবত এইভাবেই চলিবে। আমি সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি, বেশি দূর হাঁটিতে পারি না; কিন্তু আমার স্ফূর্তি সেরা দরের। আমি প্রায় প্রতিদিনই বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াই—কখনো কখনো রেলে কি নৌকাপথে শত শত মাইল জুড়িয়া এক-একটি লম্বা চক্র দিয়া আসি, বেশির ভাগ সময় খোলা হাওয়ায় থাকি—রোদপোড়া ও মোটাসোটা হইয়াছি; লোকযাত্রা, জনসাধারণ, সমাজের উন্নতি ও সাময়িক সমস্যা-সকল সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য বজায় রাখি। দিনের দুই-তৃতীয়াংশ সময় আমি বেশ আরামে থাকি। আমার মানসিক শক্তি বরাবর যেমন ছিল সেইরূপ সম্পূর্ণ অবিকৃতই আছে, যদিও শারীরিক হিসাবে আমি অর্ধ-অসাড় এবং যত দিন বাঁচি আমার এইরূপ থাকা সম্ভবপর। কিন্তু আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—আমার বন্ধুরা একান্ত নিষ্ঠাবান ও অনুরক্ত, আত্মীয়স্বজন স্নেহশীল, আর শত্রুদিগকে বাস্তবিক হিসাবের মধ্যেই ধরি না।

১৮৫

ভারতবর্ষে নানাপ্রকার তালী-জাতীয় বৃক্ষ হইতে ন্যূনপক্ষে তিন লক্ষ টন চিনি প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণ চিনির মধ্যে বঙ্গদেশে প্রায় এক লক্ষ টন উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাদ্রাজের য়ুরোপীয় হৌসগুলি গুড় পরিষ্কার ও চোলাই করিবার অভিপ্রায়ে প্রায় পঁচিশ হাজার টন গুড় প্রতিবৎসর ক্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের এমন একটি ব্যবসায় আছে, সহজ বৎসরে যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের বাৎসরিক মূল্য মোটামুটি পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড। এ বিষয়ে অতি সামান্যই অনুসন্ধান হইয়াছে। চিনির উৎপাদন হিসাবে তালী-জাতীয় বৃক্ষের শ্রেষ্ঠতা এই যে, বৎসর হইতে বৎসরান্তে তাহার উৎপন্ন চিনির পরিমাণ সমান থাকে এবং ইক্ষুর ন্যায় ইহার উপরে অতি-বৃষ্টি বা বন্যার কোনো প্রভাব নাই। চাষের খরচ নামমাত্র লাগে; এবং ইক্ষু অপেক্ষা তালে দীর্ঘকাল চিনি করিবার মরসুম সম্ভব হয়।

১৮৬

অপরন্তু ইক্ষুর বেলায় গুড় তৈয়ারির মণ-করা খরচ অপেক্ষা খেজুর ও তালের বেলায় খরচ কম লাগে। উভয়ত্রই চিনির পরিমাণ ন্যূনাধিক সমান। তাল-গুড়ের রঙের উন্নতি করিতে পারিলে আরও ভালো দাম পাওয়া যাইতে পারিত। সতর্কতার সহিত সংগৃহীত হইলে তালের রস খুবই

বিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইক্ষু-শর্করা ব্যতীত অন্যজাতীয় চিনি ইহাতে অতিঅল্প থাকে। বাঙালা দেশে ভালো পদ্ধতিতে এই রস সংগৃহীত হয় না, কিন্তু এই পদ্ধতির উন্নতি করা যায়। এই রস পাইতে কোনো পেষণযন্ত্র লাগে না।

১৮৭

'গুড্ হেলথ্' কাগজে সম্ভবত সম্পাদক Dr. J. H. Kellogg-কর্তৃক কতকটা চমক-লাগানো এই একটি উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, তারুণ্য ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী কাল সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, দমনপ্রাপ্ত না হইলে যে-সকল অবজননকর শক্তি লোক ধ্বংস করিবে তাহাদেরই প্রভাবে এখন বার্ধক্যের বিশেষ লক্ষণ অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল দেখা দিতেছে। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও প্রতিষেধক ঔষধের উন্নতিসাধন সত্ত্বেও দীর্ঘ আয়ুতে উপনীত হয় এমন ব্যক্তির পরিমাণ পূর্বের চেয়ে এখন অনেক কম। ডাক্তার কেলগ শঙ্কা করেন যেন যৌবনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য বার্ধক্য মন্দ গতিতে নামিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে অবশেষে আমরা বিশ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ হইয়া উঠিব।

১৮৮

গত বিশ বৎসরের মধ্যে, বিশেষভাবে সভ্য দেশ-সকলে, জাতিগত জীর্ণতার প্রমাণ এত প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে যে, বর্তমান কালে কোনো নৃতত্ত্ব-অনুশীলনকারী এ কথা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবেন না যে, প্রত্যেক সভ্যসমাজে যে-সকল অবজনন-প্রভাব বর্তমান, প্রত্যহ তাহার প্রবলতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমূলে দমন প্রাপ্ত না হইলে কালক্রমে তাহা অবশ্যই লোক ধ্বংস করিবে। লোকসংখ্যার অবশিষ্ট ভাগের তুলনায় শতায়ু লোকের পরিমাণের সুস্পষ্ট হ্রস্বতাই জনগণের অবজননের সুনিশ্চিত প্রমাণ-সকলের মধ্যে অন্যতম. লেখক প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তৎপ্রতি লোকের মনোযোগ অভিনির্দেশ করিতেছেন। ফরাসি দেশে শতায়ু লোকের পরিমাণ জনসংখ্যার এক লক্ষ নব্বই হাজারে একজন; ইংলন্ডে দুই লক্ষে একজন, জর্মানিতে সাত লক্ষে একজন।

১৮৯

আজকাল কুইনাইন এবং অন্যান্য সিঙ্কোনা-জাত পদার্থের উৎপাদন অত্যধিক পরিমাণে জাভার ডচ্ গভর্নমেন্টের হস্তেই আছে। এই প্রবল একচেটিয়া ব্যাবসার প্রতিকূলে ভারতবর্ষে দার্জিলিঙে কয়েকটি এবং উহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নীলগিরিতে অবস্থিত কয়েকটি সিঙ্কোনার কৃষিক্ষেত্র আমাদের আছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে সিঙ্কোনার কারখানা-সকলকে প্রধানত জাভা হইতে ক্রীত বল্কলের উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করিতে হইয়াছে। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যত দিন কুইনাইনের প্রয়োজন অল্প ছিল তত দিন বিদেশী গাছ ক্রয় করা হয় নাই এবং বার্ষিক যে ৩০০,০০০ পাউন্ড বল্কলের জোগান পাওয়া যাইত এবং যাহা হইতে ২৬০০ পাউন্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইত, তাহাই ভারতবর্ষের তখনকার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ১৮৯২ হইতে ১৯০১ খৃস্টাব্দের মধ্যে চাহিদা যখন বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রায় ২৫০,০০০ পাউন্ড গাছের ছাল বাংলা দেশেই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু অন্যূন ২৫১,০০০ পাউন্ড ক্রয় করা হইয়াছিল এবং তাহা হইতে ৮০০০ পাউন্ড কুইনাইন উৎপন্ন হয়।

১৯০

বাঙলার সিঙ্কোনা-কৃষিক্ষেত্র সংখ্যায় দুইটি; তাহার মধ্যে যেটি প্রাচীনতর সেটি রিয়াঙ্গ উপত্যকার দুই পার্শ্বে মংপোতে অবস্থিত। ঐ উপত্যকার নদীটি তিস্তা ভ্যালি রেলওয়ের রিয়াঙ্গ স্টেশনে তিস্তার সহিত যুক্ত হইয়াছে। ঐ কৃষিক্ষেত্র ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয়, এবং বর্তমানে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার যে কারখানা আছে তাহা উহারই মধ্যে। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রটি এখন ব্যবহার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে অনেক পরিমাণে পুনর্বনান্বিত করা হইয়াছে। যত দিন পর্যন্ত না ঐ বন বাড়িয়া উঠিবে পুনর্বার পরিষ্কৃত হইবে এবং নূতন সিঙ্কোনা বৃক্ষগুলি পরিণতি প্রাপ্ত হইবে, তত দিন উহা কাজে লাগাইবার উপযুক্ত পরিমাণে গাছের ছাল জোগাইতে পারিবে না।

১৯১

অতএব আরও দশ কি পনেরো বৎসর মংপো কৃষিক্ষেত্র হইতে আবশ্যকমতো সরবরাহের আশা করা নিষ্প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে, তখনকার সিঙ্কোনা-কৃষি-পরিদর্শক Sir David Prain-এর দূরদর্শিতা ইহার প্রতিকার করিয়া রাখিয়াছিল এবং ১৯০০ খৃস্টাব্দে দার্জিলিঙের কালিম্পং সাব্‌ডিভিসনে তিস্তা নদীর পূর্বদিকে একটি নূতন কৃষিক্ষেত্রের সূচনা করা হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রটিতে প্রায় ৯০০০ একর জমি আছে এবং ইহা একদা ঘনবনাচ্ছন্ন ছিল। কর্ষণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ভূমির অনেকাংশই পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং এখন মংপো কারখানাতে যত গাছের ছাল ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই এই মন্‌সঙ্গ কৃষিক্ষেত্র নামে বিদিত স্থান হইতে আসে।

১৯২

আমাদের ভ্রমণকারীগণ পুনর্বার অশ্বারোহণ করিয়া পার্বত্য প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; এইবার একটি তরুণ সেনানায়কের অধীনে অশ্বারোহীদলের অনেকগুলি সৈন্য তাঁহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহারা দস্যুর দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন বলিয়া সৌজন্য-সহকারে এই শরীররক্ষীর দল তাঁহাদিগকে দান করা হইয়াছে। সুন্দর একটি ছোটো ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ যে হিংস্রমূর্তি ব্যক্তি সমস্ত বাহিনীকে পথ দেখাইয়া যাইতেছে, ও কে—এই কি তোমার প্রশ্ন? এ ব্যক্তি একজন বিখ্যাত দস্যু, নাম Andrea Puzzu, ও শুধু দস্যু নয় সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট শ্রেণীর একজন দস্যু—অপকর্মকারী দানববিশেষ; উহাকে যে রাগাইয়াছে তাহার প্রাণ লওয়া একটা কাকের প্রাণ লওয়ার চেয়ে উহার কাছে অধিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সে এখন অঙ্গীকারবদ্ধ অবস্থায় আছে এবং সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, ঐ অশ্বারোহী দলটিকে সে লিম্বাবা গিরিশ্রেণীর দুর্গম বাধা-সকলের মধ্য দিয়া নিরাপদে লইয়া যাইবে; এবং এ কাজে সে ব্যর্থ হইবে না, কারণ নির্দয় দস্যু হইলেও সে আতিথ্যধর্ম ভঙ্গ করিবে না।

১৯৩

ঐ পীড্‌মন্ট্‌দেশীয় তরুণ সেনানায়ক বিশেষরূপে প্রিয়দর্শন, চলনসই ধরনের শিক্ষিত, অতিশয় বিনীত। তিনি দলস্থ অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে সাসারীয় (Sassarese) লোকসমাজ-সম্বন্ধে শত শত ক্ষুদ্র কাহিনী বলিয়া আমোদ দিতেছেন। ইটালীয় মাত্রেরই ন্যায় তিনিও

সার্ডিনিয়ার উপর সম্পূর্ণ বীতরাগ এবং আগামী শরৎকালে কখন তিনি তাঁহার প্রিয় Turin-এ ফিরিয়া যাইবেন, যেন তাহারই প্রত্যেক ঘণ্টা গুনিতেছেন। তিনি বলেন, 'আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন ঐ প্রচণ্ড দস্যুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র দলের অধিনায়কত্ব করিতেছিলেন, তখন এই পর্বতগুলির মধ্যেই কোনো-এক স্থানে তিনি বন্দুকের গুলিতে নিহত হন।' ঐ দস্যুগণ চিরকালই গভর্নমেন্টের পক্ষে আপদ্‌স্বরূপ, উহাদের চিন্তা মনে আসাতেই যে তিনি শিহরিয়া উঠেন তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহার যুবক ভ্রাতাটি সেরা মানুষ ও সাহসী সেনানায়ক ছিলেন। নরঘাতক প্রচ্ছন্ন আক্রমণকারী দস্যুদলের হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা মহত্তর দশা যে তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না, ইহাতে তিনি খেদ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

১৯৪

'কিন্তু ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন' বলিয়া ঐ যুবক নম্রভাবে মস্তক নত করিলেন, উষ্ণ অশ্রুতে তাঁহার সুন্দর চক্ষু-দুটিকে ঝাপসা ও তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। তিনি বলিলেন, 'যাক, উহা ভগবানের ইচ্ছা, এখন ঐ দস্যুগণ অপেক্ষাকৃত ভদ্র হইয়াছে। কিন্তু ঐ ভয়াবহ রাক্ষস পুজ্জু—', তাঁহারা কি পুজ্জুদিগের কথা কখনো শুনিয়াছেন? তাঁহারা কি মেষপালক Scaoccatos-এর হত্যার কাহিনী কখনো শুনিয়াছেন? ঐ কাহিনী শ্রবণযোগ্য বটে, এবং তাঁহারা উহা যদি শুনিতে চাহেন তাহা হইলে অশ্বারোহীদলের পশ্চাদ্‌ভাগে Padre Antonio নামে যে এক ব্যক্তি তাঁহার গিরিসংকটমধ্যস্থ পৌরোহিত্যকর্মক্ষেত্রের উদ্দেশে চলিয়াছেন, তিনি যদি বারেকের মতো তাঁহার বৈকালিক নিদ্রা ত্যাগ করিতে সম্মত হন, তবে মধ্যাহ্নভোজনের পর ঐ কাহিনী সবিশেষ বিবৃত করিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে তুষ্ট করিবার জন্য ঐ পীড্‌মন্ট্‌বাসী তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন।

১৯৫

সকলেই রাজি হইলেন এবং যুবক সেনাপতি ঐ প্রস্তাব করিবার জন্য সত্বর বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে গেলেন। ইত্যবসরে ঐ অশ্ববাহিনী পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। সেখানকার দৃশ্য বিচিত্র ও সুন্দর এবং চারি দিকের ধ্বনি সেগুলিও কী মনোহর! বহুদূরে একটি গ্রাম্য গির্জার ঘণ্টা আপনার শ্রুতিমধুর শব্দ প্রেরণ করিতেছে ও তাহা নির্মল ও সুখ-স্পর্শ বায়ুর মধ্য দিয়া ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহা ছাড়া মেষদলের গলঘণ্টার ঝংকার, মেষ ও ছাগের ডাক, কুকুরের চীৎকার, মেষপালকের একঘেয়ে বাঁশির সুর এবং মধ্যে মধ্যে কৃষকের সংগীত; তাহার উপরে পাখির গানও ছিল—কারণ ইটালিতে পাখি দুর্লভ হইলেও এখানে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে এবং ঐ যে পর্বতচূড়ার দিকে উড়িয়া যাইতেছে উহা একটি ঈগলপক্ষী নয় কি?

১৯৬

মেষপালকদিগের 'Stazzus'-নামক যে এক প্রকার আড্ডা আছে তাহারই একটিতে এখন এই দলটি আসিয়া পৌঁছিল এবং সকলকে থামিবার জন্য সংকেত করা হইল। একটি গিরিনির্ঝরিণীর পার্শ্বে বৃক্ষতলে আহার্য প্রস্তুত করা হইবে। Padre Antonio-কে পীড্‌মন্ট্‌বাসী পরিচিত করাইয়া দিলেন, পাদ্রি একজনের পর একজনকে গভীরভাবে নত হইয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। সম্মানসূচক আসন বলিয়া একটি শায়িতপ্রায় বৃক্ষকাণ্ডের উপরে পুরোহিত মহাশয়কে অধিষ্ঠিত

করা হইল। পুরোহিত সার্ডিনিয়ার গ্রাম্যপুরোহিতের একটি খাঁটি নমুনা, তিনি খর্বকায় ও তাঁহার আচারব্যবহার সসংকোচ। ত্রিশ এবং ষাট বৎসরের মধ্যে যে-কোনো একটি বৎসর তাঁহার বয়স হইতে পারে। তিনি এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছেন এবং গল্প বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, তিনি সার্ড ভাষায় কথা বলিলেন না, ইটালির ভাষাতেও নহে, কিন্তু অতি সুবোধ্য ফরাসি ভাষাতেই।—

১৯৭

Scaoccatos একজন ধনী মেষপালক বলিয়া খ্যাত এবং বহুসংখ্যক গো এবং মেষপালের অধিকারী ছিলেন। আমি সংগত কারণ-বশতই জানিতাম যে Pietro Leonardo এবং Giovanne Puzzu ভ্রাতৃত্রয় তাহাদের সম্পত্তির সমতুল্যপ্রায় এই সম্পদের প্রতি ঈর্ষ্যা অনুভব করিত এবং তাহাদের মৌখিক বন্ধুত্ব বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। আমি যখন Stazzu পেঁৗছিলাম তখন স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী অলিন্দে বসিয়া যথানিয়মে তাঁহার শ্রমশীল অভ্যাসমতো শস্য বাছিতেছিলেন। তিনি সুন্দর. উদারমূর্তি ও প্রৌঢ় বয়সের প্রথমদশাবর্তিনী রমণী ছিলেন; যথাযোগ্য অভিবাদনের পর আমি তাঁহাকে এইভাবে সম্ভাষণ করিলাম, 'তোমার পুত্র Pietro-কে নিশ্চয়ই তুমি ঐ ভয়ংকর পরিবারে বিবাহ করিতে উৎসাহ দিবে না।' তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি শস্যঝাড়ার চালুনীটাকে একবার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তর দিলেন, 'আঃ, কাল বিকালেই যে বাগ্দানের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে।' আমি বলিলাম, 'এখনো সময় আছে।' তাঁহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। 'সে আর হইতে পারে না, এখন অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, না ঠাকুর, আপনি জানেন যে এখন আর কিছুই করা যায় না।'

১৯৮

তিনি যথার্থ কথাই বলিতেছিলেন আমি তাহা অনুভব করিলাম। আমি বলিলাম, 'ভালো, সাধুপুরুষগণ তোমাদিগকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন। Caterina নিজে একটি নম্র তরুণ বালিকা, তাহার কাছ হইতে শঙ্কা করিবার কিছুই নাই, সে তাহার স্বর্গতিপ্রাপ্ত মাতারই সদৃশ এবং পুজ্জু-বংশের রক্তের কোনো কলঙ্ক তাহার মধ্যে আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভালোই হইবে বলিয়া আশা করা যাক।' আমি দেখিলাম যে, আমার কথায় তিনি বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিলেন না, কারণ পুজ্জুর নামই যথেষ্ট। আমি বলিয়া উঠিলাম, 'তাহা হইলে একেবারেই সব স্থির হইয়া গিয়াছে?' 'হাঁ একেবারেই স্থির; অবিলম্বে, আসন্ন খৃস্টোৎসবের সময় বিবাহ হইবে।' চোখে অশ্রু ও হৃদয়ে অশুভ আশঙ্কা লইয়া তিনি গৃহের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমিও প্রায় তাঁহারই ন্যায় বিষণ্ণ হইয়া স্টাজ্জু হইতে চলিয়া আসিলাম।

১৯৯

বাগ্দানের পর কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে এবং খৃস্টোৎসবও যখন আগতপ্রায় তখন আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকারের পর Sassari হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় দূরে একটি অশ্ববাহিনীর পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি অনুমান করিলাম যে, উহা ভবিষ্যৎ বধূর গৃহসজ্জাবহনকারী মিছিল, ঐ মিছিল আমাদের দেশে বিবাহের সপ্তাহখানেক পূর্বে হইয়া থাকে—

বাস্তবিকও দেখিলাম তাই। গিরিপথ একেবারে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলি আসবাবপূর্ণ গোশকট চলিয়াছে, বলদগুলি রঙিন ফিতা ও পুষ্পদ্বারা সজ্জিত, তাহাদিগের শৃঙ্গে কমলালেবু বসানো। যাহা হউক, তাহাদের সংখ্যা বিস্তর, কারণ বালিকাটি ধনীগৃহের। কেহবা একটা জিনিস বহিতেছে, কেহবা আর কিছু— আসবাব, পরিচ্ছদ, ময়দা, তৈল, মদ্য, পনীর, মিষ্টান্ন। তাহাদিগের পশ্চাতে সুন্দরী ক্যাটেরিনা স্বয়ং আসিতেছে; উৎসবসাজে সে সজ্জিতা, তাহার ঘোড়ার মুখ ধরিয়া আসিতেছে তাহারই এক ছোটো ভাই। কী সুন্দরই তাহাকে দেখাইতেছিল। তাহার পশ্চাতে তাহার অনেক সখী, প্রত্যেকেই বধূর জন্য কোনো-একটি দ্রব্য বহন করিয়া আসিতেছিল— একখানা আয়না, একটি জপমালা, বধূর আরাধ্য সাধুর চিত্র, একটি ক্রুশকাষ্ঠ, খৃস্টমাতার প্রতিমূর্তি, একটি সেতার ইত্যাদি।

২০০

প্রত্যেক বালিকাই পূর্ণ উৎসবসজ্জায় সজ্জিতা; বাঁশির উচ্চশব্দে অশ্বগুলি কী গর্বভরেই শিরোৎক্ষেপ করিতেছিল! উহাদিগকে সামলাইয়া রাখিতে যুবকদের যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন হইতেছিল, নতুবা বালিকাগণ আসনচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইত। তরুণ Pietro যখন ক্যাটেরিনার পার্শ্বে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকেও সেদিন কী সুন্দরই দেখাইতেছিল। আমি উহার পূর্বে ও পরে ঐ শ্রেণীর আরও অনেক মিছিল দেখিয়াছি, কিন্তু আর কখনো আমার মনে ঐরূপ অশুভ আশঙ্কার উদয় হয় নাই, আমার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।— এই পর্যন্ত, বলিয়া ঐ সাধু পাদ্রি একটি বিষাদসূচক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং মস্ত এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া আরাম পাইলেন ও মাছি তাড়াইবার জন্য মাথার উপরে একটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণের সুতি রুমাল অনেকবার ঘুরাইয়া তিনি আপনার কৌতূহলজনক কাহিনীর সূত্র পুনর্বার অবলম্বন করিলেন।

২০১

যাক্, খৃস্টের জন্মোৎসব আসিয়া পড়িল এবং আমি কয়েকজন বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে, সাসারির গির্জার প্রাঙ্গণে ঐ পুজ্জু-ভ্রাতৃত্রয়কে গভীরভাবে পরামর্শ করিতে দেখা গিয়াছে এবং ইহা শুভসূচনা করে না। আমি উহা শুনিয়াই অনুভব করিলাম যে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটিবে, কারণ ঐ স্থানে উহাদের কিসের প্রয়োজন? এ দিকে খৃস্টোৎসবের দিন পিয়েত্রো ক্যাটেরিনা আমাদের প্রচলিত প্রথা-অনুসারে বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিল, যথারীতি ভোজ ও আমোদ-প্রমোদের পর বিশ্রাম করিতে গেল। পরদিন উহাদের বিবাহ হইল, এমন সমারোহ-সহকারে আমাদের পর্বতপ্রদেশে ইহার পূর্বে বিবাহ প্রায় ঘটে নাই। তরুণী বধূ যখন প্রথমবার তাহার নববিবাহিত পতির সহিত এক থালা এবং এক পানপাত্র ব্যবহার করিল তখন তাহার মূর্তি কী মধুর দেখাইতেছিল! অতঃপর তাহারা যে একই ভাগ্য উভয়ে ভোগ করিবে, আমাদের দেশে এই প্রথা তাহারই নিদর্শনস্বরূপ এবং পতিগৃহে আশ্রয়সন্ধানের পূর্বে ইহাই কন্যার পিতৃগৃহে শেষ আহারগ্রহণ। বরের গৃহাভিমুখে মিছিলটি অত্যন্ত প্রমোদময় হইয়াছিল। যথাস্থানে পোঁছিবামাত্র প্রথা-অনুসারে আনন্দসূচক বন্দুকধ্বনি করা হইল; দ্বারমণ্ডলে পুষ্পমালা ও ফলের গুচ্ছের মধ্যে বরের মা হাতে একটি গমের পাত্র লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতে লবণ মিশ্রিত— ঐগুলির প্রথমটি প্রাচুর্যের, দ্বিতীয়টি আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ।

২০২

স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী সে কী সগৌরব মূর্তিতে দাঁড়াইয়া পুত্রের নববধূর সম্মুখে ঐ পাত্রস্থ দ্রব্যগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিলেন, কী আবেগের সহিতই তিনি আশীর্বচন উচ্চারণ করিলেন! নৃত্য, ভোজ, এবং পুষ্প-মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহারদান অবশ্য প্রচুর পরিমাণেই হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহ-উৎসব দলের অনেকের মনেই পাথরের মতো কী যেন একটা গুরুভার চাপিয়া রহিল। তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময় অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্ যিনি ঐ অশুভ বিবাহদিনের পর হইতেই গম্ভীর আলাপবিমুখ এবং হতাশভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি হঠাৎ স্টাজ্জুতে প্রবেশ করিয়া স্ক্যাকাটোস্-জায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পত্নী, অনুনয় করিয়া বলিতেছি তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

২০৩

রমণী আমাকে পরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত শিরার ভিতর দিয়া যেন একটা হিমকম্পন প্রবাহিত হইয়া গেল এবং যন্ত্রের ন্যায় স্বামীর পদক্ষেপ অনুসরণ করিয়া উঠান পার হইয়া একটি বন্ধুর পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া কর্ক্ ও চেস্টনাট বৃক্ষের একটি ক্ষুদ্র বনে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি থামিলেন এবং ভূমিতলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বিশেষ এক স্থান হইতে কতকগুলি মৃত্তিকার চাপ সরাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পত্নীকে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া একটি বৃহৎ মাটির কলস তুলিলেন। অ্যান্‌ড্রিয়া বলিলেন, 'এই কলসে ৪০০০ হাজার scudi স্বর্ণমুদ্রা আছে, উহা সারা-জীবন নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের সঞ্চয়। আমি প্রয়োজনের দিনের জন্য ইহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছি, কে যেন আমাকে বলিতেছে যে সেই সময় উপস্থিত। যে-কোনো একটা বহিরুৎপাতে হয়তো আমার প্রাণ যাইতেও পারে, এবং এই সম্বল-সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ থাক ইহা আমার ইচ্ছা নহে।' এই বলিয়া তিনি সেই কলস যত্নপূর্বক পুনর্বার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন, তাহা পুনর্বার মাটির চাপড়া দিয়া আচ্ছাদিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে গম্ভীরমুখে আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

২০৪

—এই স্থানে বেচারি পুরোহিত হৃদয়াবেগের প্রবলতায় অভিভূত হইয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।—মহাশয়গণ (Signori), ইহা অতি ভয়ানক কাহিনী, অতি ভয়ানক! যাহা হউক, আমাকে আবার বলিতে হইবে। আমার এই সদ্যোবর্ণিত ঘটনাবলীর পরদিনেরই সন্ধ্যাকালে অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্ এবং তাঁহার পরিবারবর্গ একত্র কাঠের আগুনের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের পরিবারটি বড়ো সুন্দর, অতি সুন্দর। তরুণ পিয়েট্রো ও তাহার বধূ এবং তিনটি ছোটো ভ্রাতা, তাহাদের মধ্যে একজন একান্তই শিশু। এই কাহিনী বলিতে আমার হৃদয় বিক্ষত হইয়া উঠিতেছে। স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী সান্ধ্যভোজের অবশেষ তুলিয়া রাখিতে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন— এমন সময় কুকুরের প্রচণ্ড চীৎকার, যেন অশ্বারোহীদলের পদধ্বনি এবং রুদ্ধদ্বারে প্রবল আঘাতের শব্দ শোনা গেল। একটা আকস্মিক বেদনা যেন রমণীর হৃদয় ভেদ করিল, তিনি অনুভব করিলেন, সময় আসিতেছে এবং আপনার সর্বকনিষ্ঠ এবং সম্ভবত প্রিয়তম পুত্রটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি তাহাকে একটি শূন্য মদের পিপার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, যদি সে বাঁচিতে চায় তবে যেন চুপ করিয়া থাকে।

২০৫

এ দিকে অ্যান্‌ড্রিয়া দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'বাহিরে কে?' 'আমরা মিত্র' এই বিশ্বাসঘাতী উত্তর আসিল। তাঁহার পত্নী তাঁহার পার্শ্বে প্রত্যাগত হইয়া অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'স্বামিন্‌, আমি তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি তুমি দ্বার খুলিয়ো না, উহা পুজ্জুর কণ্ঠস্বর।' 'গৃহিণী, আতিথেয়তার প্রয়োজনে ইহা করিতে হইবে, ইহা ধর্মকার্য।' আবার দ্বারে আঘাত হইল, এবার প্রথম বারের অপেক্ষাও প্রবলতর শব্দে—'রাজার দোহাই, অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্‌, তোমার দরজা খোলো, শীঘ্র খোলো।' দরজা খোলা হইল এবং অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোস্‌ জিওভ্যানি পুজ্জুর নিজ হস্তের গুলিতে হত হইয়া আপনার বীর্যবতী পত্নীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। তিনি ঐ ভয়ানক ব্যাপার সম্পূর্ণ সংঘটিত হইতে দেখিয়া, ঐ সশস্ত্র হত্যাকারীদলের ভিতর দিয়া যুঝিতে যুঝিতে, কয়েকটি ভীষণ আঘাত লাভ করা সত্ত্বেও বাহির হইয়া পলায়ন করিলেন। Giovanni Puzzuকে সম্বোধন করিয়া একটি তরুণ কণ্ঠ কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, 'ধর্মপিতা—দেবতার দোহাই, ভগবানের সহিত শান্তি স্থাপনের জন্য আমাকে একমুহূর্ত জীবন ভিক্ষা দাও।' কিন্তু আবেদন বৃথাই হইল, বন্দুকের গুলি ছুটিল এবং যে গুলি তরুণ পিয়েট্রোর মস্তিষ্ক চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল তাহাই তাহার সুশীলা বধূর বক্ষ ভেদ করিয়া গেল এবং এক-একটি করিয়া তিনটি পুত্র ও একটি পুত্রবধূ ছিন্নভিন্ন মৃতদেহস্তূপে একত্র শায়িত হইল।

২০৬

উন্মুক্ত কফিনের ভিতর হতব্যক্তিগণের দেহ রক্ষিত হইল, প্রত্যেকেরই বক্ষস্থলে এক-একটি ক্রুশ। ভাড়া করা বিলাপকারিণীর দল আসিয়া পৌঁছিল—আপনারা জানেন যে, উহা অতি প্রাচীন প্রথা, অন্য দেশে বোধ করি উহা বহুকাল হইল আর পালিত হয় না—যাহা হউক, তাহারা অসংযত অঙ্গভঙ্গি-সহকারে, আলুলায়িতকেশে ভয়াবহ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদের দলের নেত্রী হত স্ক্যাকাটোসের দেহের ঊর্ধ্বে বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর অপার্থিব কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল, 'চাহিয়া দেখো, বলশালী ব্যক্তি আজ ধূলায় লুণ্ঠিত, সাধু ব্যক্তি আজ দস্যুহস্তে ভূপতিত। হায়, হায়, হায়! তাঁহার জীবন উর্বরা গোচারণভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর ন্যায় ছিল, উহা চারি দিকে উর্বরতা দান করিত। হায়, হায়, হায়! তাঁহার জীবনের দিনগুলি কী শান্তিপূর্ণ ও অক্ষুব্ধ ছিল, উহা চতুর্দিকে আশিস বর্ষণ করিত। হায়, হায়, হায়! কারণ, তিনি সিংহের ন্যায় বীর্যবান ও সাহসী অথচ কপোতের ন্যায় মৃদুস্বভাব ছিলেন। হায়, হায়, হায়! কারণ তাঁহার আত্মা অগ্নিশিখার ন্যায় নির্মল এবং তাঁহার বাক্য মধুর ন্যায় মিষ্ট ছিল। হায়, হায়, হায়!'

২০৭

'কিন্তু তোমার ঋণ পরিশোধ হইবে, তোমার ক্ষত-সকল ঐ শত্রুর বক্ষেই প্রত্যাবর্তিত হইবে। হায়, হায়, হায়! পার্বত্য গৃধিনী তাহার দেহ ভোগ করিবে এবং দাঁড়কাক তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে। হায়, হায়, হায়! তোমার রক্তাক্ত অঙ্গাবরণ তোমার প্রতিশোধকারীদিগের হস্তে অবতীর্ণ হইবে, রোষের বিগ্রহস্বরূপে তাহা বংশানুক্রমে রক্ষিত হইতে থাকিবে। হায়, হায়, হায়! অতএব তুমি তোমার নির্জন সমাধিতে বিশ্রাম লাভ করো, কারণ তোমার হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব হইবে না। হায়, হায়, হায়! হাঁ, এইরূপই ঘটিবে, তোমার হইয়া পুরা প্রতিশোধ দেওয়া হইবে।' এই বলিয়া রমণী তাহার উগ্রবাক্‌ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিল এবং শেষের দিকে

তাহার চীৎকার উচ্চতর ও দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়া নাড়ীতে নাড়ীতে যেন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। তখন স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী এক হস্তে হত স্বামীর রক্তাক্ত অঙ্গাবরণ লইয়া এবং অন্য হস্তে যে শিশুকে তিনি মদের পিপার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই নয় বৎসর বয়স্ক ক্ষুদ্র Michele-এর হস্ত ধারণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২০৮

একবার সেই মৃতদেহের নিশ্চল বিবর্ণ মূর্তির দিকে এবং একবার সেই রক্তরঞ্জিত স্মৃতি-চিহ্নের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া এবং ঐ শিশুর ক্লিষ্ট মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'শপথ করো, মিকেল, শপথ করো যে, তুমি এই গর্হিত কার্যের প্রতিশোধ লইবে; স্বর্গবাসী সকল সাধুপুরুষের দোহাই যে, যত দিন না দস্যুর নিপাত হয় তত দিন তুমি কোনো আমোদ করিবে না এবং তোমার আত্মা কোনো শান্তি পাইবে না; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, শপথ করো, এবং ঐ শপথ তোমার বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্ধিত হউক, যত দিন পর্যন্ত ঐ ন্যায়ানুমোদিত প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার মতো তোমার বাহু বলিষ্ঠ এবং চক্ষু স্থির-লক্ষ্য না হয়।' ঐ বালক খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হে আমার পিতা, আমি তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সাধুপুরুষগণ আমার সহায় হউন!' এবং ঐ ভীষণ বাক্য উচ্চারণকালে তাহার বিশাল নয়নদ্বয় বিস্ফারিত এবং তাহার আরক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ দৃঢ় ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার শিশুমুখ হইতে যখন এক-একটি করিয়া ঐ ভয়ানক কথা বাহির হইতে শুনিলাম তখন ভিতরে ভিতরে লোমহর্ষণ অনুভব করিলাম।

২০৯

মহাশয়গণ, আমার আর অল্পই বলিবার আছে, অতি অল্প। যদিও স্বদেশের প্রথা অনুসরণ করিয়া স্ক্যাকাটোস্-গৃহিণী প্রতিবৎসর ঐ ভয়ানক দিনে তাঁহার পুত্রকে ঐ ভীষণ প্রতিজ্ঞার পুনরুচ্চারণ করাইতেন, তথাপি তিনি প্রতিশোধের আঘাত হানিবার জন্য উহার তরুণ বাহুর বললাভ ও দৃষ্টির অচপলতা-লাভের অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার আপনার হস্তেই প্রতিশোধের উপায় ছিল এবং তিনি অতি প্রবলরূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি গভর্নমেন্টের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইলেন এবং আবেদন করিয়া এমন সফলতা লাভ করিলেন যে, ঐ ঘৃণ্য দুরাত্মা জিওভ্যানি পুজ্জু সাসারিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল, লিয়োনার্ডো ও পিয়েত্রো La Madalena-নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে নির্বাসিত হইল এবং ঐ পরিবারস্থ আরও পাঁচটি ব্যক্তি প্রাণ-দণ্ডের ভয়ে পর্বতে পলায়ন করিল—এই অ্যান্‌ড্রিয়া তাহাদেরই মধ্যে একজন। মহাশয়গণ, ইহার পরে আর আমার অল্পই বলিবার আছে। যাহাদের নামই ভীতিজনক ছিল এবং যাহাদের ক্ষমতা কোনোই সীমা গ্রাহ্য করিত না, এমন দুরাত্মাদিগকে সকল প্রকার বিপদাশঙ্কা স্বীকার করিয়াও সমুচিত দণ্ডিত করাইবার পরে, স্বীয় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া অ্যান্‌ড্রিয়া স্ক্যাকাটোসের বিধবা পত্নী এখন Tempis-এর এক সন্ন্যাসিনীমঠে প্রবেশ করিয়াছেন।

২১০

ইহা লক্ষ করিবার যোগ্য, যে-সকল যুগে পরাক্রম-বিস্তারকেই ন্যাশনাল অত্যাকাঙ্ক্ষার প্রধান সহায়রূপে আহ্বান করা হইয়াছে সেই যুগগুলিই মানবের শ্রেষ্ঠ বা উচ্চতম ফললাভের জন্য খ্যাত নহে। Caesar-এর রাজ্যকালে দেশজয় ও আধিপত্য-বিস্তারের পথে রোম যখন নির্মমভাবে

যাত্রা করিয়াছিল তখন বহুবিস্তৃত অধীন দেশসমূহে তাহার অস্ত্রচালনার সফলতায় মোহ প্রসার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পূর্বকালেই রোম আপন বুদ্ধিবিকাশের পরাকাষ্ঠায় উঠিয়াছিল। এশিয়াতে আপন আধিপত্য-বিস্তারের পূর্বে ঈজিপ্ট তাহার কলা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাসকল প্রকাশ করিয়াছিল এবং যে এসীরিয়া প্রাচীনকালে সামরিক শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল আত্মোৎকর্ষ-শক্তি তাহার ছিল না। এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, বুদ্ধির সাফল্যলাভ-সম্বন্ধে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের পরের জর্মানি তাহার পূর্ববর্তী জর্মানির অপেক্ষা মহত্তর।

২১১

George Brandes বিষাদের সহিত এই তথ্যটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৮৭০ সালে জর্মান-উপরাজ্যগুলির সম্মিলনের পর হইতেই জর্মানিতে উদার-মতের হ্রাস আরম্ভ হয়। ব্রান্ডেস্ বলেন, 'বর্তমান প্রজাতির বৃদ্ধ মানুষেরাই মনোভাবে তরুণ, অপর পক্ষে যুবকদের অনেকেই প্রতিমুখ মতগুলির সহিত আপনাদিগকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছে।' শতাব্দীর বিগত চতুর্থাংশ সময়ে জর্মানির আর্থিক সমৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিণতি সাহিত্যে দর্শনে এমন-কি পাণ্ডিত্যেও তেমন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে জন্ম দেয় নাই, যেমন ১৮৭০ খৃস্টাব্দের পূর্বে ঘটিয়াছিল। Kant-এর সময়েই জর্মানিতে দর্শনের মহাযুগ আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি এমন সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন জর্মানিকে বিস্তীর্ণতর করিবার চিন্তাও কোথাও ছিল না। Goethe এবং Schiller এমন সময় বিরাজমান ছিলেন যখন জর্মন জনসমূহ নেপোলিয়নীয় আধিপত্যের ছায়া-তলে বাস করিত, এবং যখন লোকেরা স্বাধীনতালাভের জন্য প্রয়াস পাইতেছে সেই সময়ে স্বাধীনতার কবি Heine তাঁহার অমর গানগুলি গাহিয়াছেন।

২১২

পূর্বে আমি এক আকাশচারী বিদ্যাধর ছিলাম। এক সময়ে আমি হিমালয়ের একটি শিখরের উপর দিয়া যাইতেছিলাম। নীচে মহাদেব তখন গৌরীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন, 'তুমি মনুষ্যগর্ভে নিপতিত হও। সেখানে এক বিদ্যাধরী স্ত্রী লাভ করিয়া ও পুত্রকে তোমার পদে স্থাপিত করিয়া তুমি নিজের পূর্বজন্ম স্মরণ করিবে এবং পুনর্বার বিদ্যাধররূপে জন্মলাভ করিবে।' শিব আমার শাপাবসানকাল জানাইয়া দিয়া তিরোহিত হইলে, আমি অচিরেই ভূতলে এক বনিগ্‌বংশে জন্ম লইলাম। আমি বল্লভী-নামক নগরে এক ধনশালী বণিকের পুত্র হইয়া বাড়িয়া উঠিলাম, আমার নাম ছিল বসুদত্ত।

২১৩

কালক্রমে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, পিতা আমার জন্য একদল পরিচর নিযুক্ত করিলেন, এবং আমি তাঁহার আদেশে বাণিজ্যের জন্য দেশান্তরে গমন করিলাম। আমি যখন যাইতেছিলাম তখন একজন দস্যু এক অরণ্যে আমাকে আক্রমণ করিল এবং আমার সর্বস্ব লইয়া আমাকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিজেদের পল্লীতে, পশুপ্রাণগ্রাসোদ্যত কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় দীর্ঘ ও চঞ্চল রক্তবর্ণ পতাকান্বিত এক ভীষণ চণ্ডীমন্দিরে লইয়া গেল। তাহারা সেখানে আমাকে বলির জন্য তাহাদের দেবীপূজারত প্রভু পুলিন্দকের নিকট উপস্থিত করিল। চণ্ডাল হইলেও, আমাকে দেখিবামাত্রই তাঁহার হৃদয় করুণাবিগলিত হইল; হৃদয়ের অহৈতুক স্নেহচাঞ্চল্য পূর্বজন্মের সখ্যের নিদর্শন।

২১৪

অনন্তর সেই শবরপতি হত্যা হইতে আমাকে বাঁচাইয়া যখন নিজেকেই বলি দিয়া পূজা সমাপ্ত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন এক দৈববাণী তাঁহাকে বলিলেন, 'এরূপ করিয়ো না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি, আমার নিকট বর প্রার্থনা করো।' তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'দেবি, আপনি প্রসন্না হইয়াছেন; ইহা ছাড়া অন্য কোন্ বরে আমার প্রয়োজন থাকিতে পারে? তথাপি আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, জন্মান্তরেও যেন এই বণিকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়।' 'তথাস্তু' এই বলিয়া দৈববাণী নীরব হইলে, সেই শবর আমাকে প্রভূত অর্থ দিয়া স্বভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

২১৫

হিমবান নামে এক মহাপর্বত আছে—ইহা জগজ্জননীর পিতা এবং কেবল গিরিরাজ নহে, শিবেরও গুরু বটে। বিদ্যাধরগণের আবাসভূত সেই মহাপর্বতে বিদ্যাধরাধিপতি রাজা জীমূতকেতু বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে পূর্বপুরুষক্রমাগত সার্থকনামা কল্পবৃক্ষ ছিল। এক দিন রাজা জীমূতকেতু তাঁহার উদ্যানে সেই দেবতাত্মক কল্পদ্রুমের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, 'হে দেব, আমরা আপনার নিকট হইতে সর্বদা সমস্ত দ্রব্যই পাইয়া থাকি; আমি পুত্রহীন, অতএব, আমাকে একটি বিজয়ী পুত্র প্রদান করুন।' কল্পদ্রুম বলিলেন, 'রাজন্, আপনার এক জাতিস্মর দানবীর ও সর্বভূতে দয়াবান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে!' ইহা শ্রবণে রাজা আনন্দিত হইয়া কল্পবৃক্ষকে প্রণামপূর্বক গমন করিলেন এবং রানীকে এই সংবাদ জানাইয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিলেন।

২১৬

তদনুসারে অচিরেই তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইল এবং পিতা সেই পুত্রের নাম রাখিলেন জীমূতবাহন। অনন্তর মহাসত্ত্ব জীমূতবাহন সর্বভূতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুকম্পার সহিত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

কালক্রমে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইলে তিনি একদিন জগতের প্রতি অনুকম্পাবশত নির্জনে পিতাকে নিবেদন করিলেন, 'তাত, আমি জানি এই সংসারে সমস্ত পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর; কিন্তু একমাত্র মহাপুরুষগণের নির্মল যশই কল্পান্ত পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে। যদি পরোপকারজনিত যশ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উদার ব্যক্তিগণের নিকটে তাহার মতো আর কোন্ ধন প্রাণাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান পরিগণিত হইতে পারে?'

২১৭

'যে সম্পদে পরের উপকার করিতে পারা যায় না তাহা তো বিদ্যুতের ন্যায় কেবল ক্ষণকালের জন্য লোকচক্ষুর কষ্টই উৎপাদন করিয়া বিলীন হইয়া যায়। অতএব এই যে আমাদের অধিকারে অভিলষিত বস্তুপ্রদ কল্পবৃক্ষ রহিয়াছেন, ইঁহাকে যদি পরোপকারে লাগাইতে পারা যায় তাহা হইলে ইঁহার নিকটে সমস্ত ফল পাওয়া যাইবে। অতএব আমি সেইরূপ উপায় গ্রহণ করিতে চাহি, যাহাতে ইঁহার ধন-দ্বারা প্রার্থী জনসমূহ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হয়।' জীমূতবাহন পিতাকে এই আবেদন জানাইয়া ও তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কল্পদ্রুমের নিকটে গমনপূর্বক বলিলেন, 'হে দেব, আপনি সর্বদা আমাদিগকে অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন। অতএব আজ আপনি আমাদের

একটি অভিলাষ পূর্ণ করুন। হে বন্ধু, আপনি এই সমগ্র পৃথিবীর দৈন্য উপশম করুন! আপনার জয় হউক, আপনি ধনার্থী জগতেরই জন্য প্রদত্ত হইয়াছেন।' সেই ত্যাগশীল-কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কল্পদ্রুম ভূতলে প্রচুর স্বর্ণবর্ষণ করিলেন এবং লোকেরা তাহাতে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

২১৮

পূর্বকল্পে কাল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া সেখানে দিবারাত্রি মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। তাঁহার জপ করিতে করিতে দেবগণের দুই অযুত বৎসর চলিয়া গেল। তখন তাঁহার মস্তক হইতে অবিচ্ছিন্ন এক মহৎ জ্যোতি আবির্ভূত হইল এবং ইহা দশ সহস্র সূর্যের ন্যায় অন্তরীক্ষে উৎসারিত হইয়া সিদ্ধ প্রভৃতির গতিকে রুদ্ধ ও ত্রিভুবনকে প্রজ্বলিত করিল। তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা আগমন করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, আপনার জ্যোতিতে এই সমস্ত ভুবন দগ্ধ হইতেছে। আপনার যে বর অভিলষিত হয় গ্রহণ করুন।' তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর দিলেন, 'জপ ভিন্ন অন্যত্র যেন আমার অনুরাগ না হয় ইহাই আমার বর, আমি অন্য কিছু চাহি না।'

২১৯

যখন তাঁহারা তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুনয় করিতে লাগিলেন, তখন সেই জপকারী সে স্থান হইতে দূরে গমন করিয়া হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন। সেখানেও যখন ক্রমশ তাঁহার অসামান্য তেজ অসহ্য হইয়া উঠিল তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ করিবার জন্য প্রলোভন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই আত্মসংযমী অবিচলিত রহিলেন। অনন্তর তাঁহার নিকটে মৃত্যুকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, মর্ত্যেরা এত দীর্ঘকাল বাঁচে না, অতএব আপনি নিজের জীবন পরিত্যাগ করুন; প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না।' ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'যদি আমার আয়ুর সীমা পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে লইয়া যাইতেছ না কেন? তুমি কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছ? হে দেব পাশহস্ত, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রাণ ত্যাগ করিব না, কেননা ইচ্ছা করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে।'

২২০

এইরূপ বলিলে, তাঁহার প্রভাববশত মৃত্যু যখন তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিলেন না, তখন যেমন তিনি আসিয়াছিলেন তেমনিই চলিয়া গেলেন। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহাকে বলপূর্বক স্বর্গে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি সেখানকার প্রমোদসম্ভোগে বিমুখ হইয়া জপ হইতে বিরত হইলেন না। তাই দেবতারা তাঁহাকে পুনশ্চ ভূলোকে নামাইয়া দিলেন এবং তিনিও হিমালয় প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে যখন দেবতারা সকলেই তাঁহাকে বরগ্রহণে সম্মত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সেই পথে রাজা ইক্ষ্বাকু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি ঐ জপকারীকে বলিলেন, 'আপনি যদি দেবগণের নিকট বর গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।'

২২১

জপকারী ইহা শ্রবণে হাস্য করিয়া রাজাকে বলিলেন, 'আমি দেবগণের নিকট যখন বর গ্রহণ করিতেছি না, তখন আপনি আমাকে বরদান করিতে পারেন!' তিনি এই কথা বলিলে ইক্ষ্বাকু ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'আমি যদি আপনাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ না হই, আপনি আমাকে দিতে পারেন। অতএব আমাকে একটি বর দান করুন।' জপকারী বলিলেন, 'আপনার যাহা অভীষ্ট হয় প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে তাহা দিব।' রাজা ইহা শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন, 'আমি দান করিব এবং তিনি গ্রহণ করিবেন এই বিহিত বিধান; কিন্তু তিনি দান করিবেন আর আমি গ্রহণ করিব ইহা বিপরীত বিধি।' রাজা যখন এই সংকট-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বিলম্ব করিতেছিলেন তখন দুইটি ব্রাহ্মণ বিবাদ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে দেখিয়া বিচারের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ আমাকে দক্ষিণার সহিত একটি গাভী প্রদান করিয়াছেন। আমি ইঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি, কিন্তু ইনি আমার হাত হইতে তাহা কেন গ্রহণ করিবেন না?' অপর ব্যক্তি বলিলেন, 'আমি ইহা প্রথমে গ্রহণ করি নাই, আর ইহা প্রার্থনাও করি নাই, তবে ইনি কেন ইহা আমাকে বলপূর্বক গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করিতেছেন?'

২২২

রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'এই অভিযোগকারীর অভিযোগ ঠিক নহে, আপনি গাভী গ্রহণ করিবার পর যিনি ইহা দিয়াছেন তাঁহাকেই আবার বলপূর্বক ফিরাইয়া দিতেছেন কেন?' রাজা ইহা বলিলে ইন্দ্র অবসর পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'হে রাজন্, আপনি যদি ইহাই ন্যায্য বলিয়া জানেন, তবে ঐ জপকারী ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিয়া তৎপরে প্রাপ্ত বরটি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন না কেন?' রাজা ইহার উত্তর ভাবিয়া না পাইয়া সেই জপকারী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'ভগবন্, আপনার জপের অর্ধেক অংশের ফল বররূপে আমাকে প্রদান করুন।' অনন্তর সেই জপকারী ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'ভালো, আমার জপের অর্ধেক ফল তুমি গ্রহণ করো।' এই বলিয়া তিনি রাজাকে বর প্রদান করিলেন। রাজা এই বরের দ্বারা সর্বলোকেই নিজের গতি লাভ করিলেন এবং সেই জপকারীও শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন।

২২৩

আর এক প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস ঘটিতে পারে। একটি প্রকাণ্ড উল্কাপ্রস্তর কোনো একদিন আকাশ হইতে পড়িতে পারে। বস্তুত প্রস্তরখণ্ড আকাশ হইতে পৃথিবীতে পড়িতেছেই। এইরূপ নানা আয়তনের প্রস্তর মিউজিয়ামে দেখা যায়, তাহাদের কোনো-কোনোটা ওজনে বহুশত পাউণ্ড ভারী। এমন হইতে পারে কোনো-এক সময়ে বহুশত মাইল আয়তনের পাথর পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইবে। সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া সমস্ত মহাদেশগুলিকে ডুবাইয়া দিবার উপযুক্ত তরঙ্গের সৃষ্টি করিবার জন্য এতবড়ো প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন-সকল শক্তি আছে, যাহার সহিত তুলনা করিলে মানবের মধ্যে যে প্রবলতম তাহারও শক্তি একটি মশকের লীলার মতো; সে এমন শক্তি যাহার আঘাতে, বাতাসের এক দমকায় একপাল মশার মতো, সমস্ত মানুষকে পৃথিবী হইতে উড়াইয়া দিতে পারে।

২২৪

জীবনসংগ্রামে গত কল্য যেমন যোগ্যতমরাই টিঁকিয়াছিল, আগামী কল্যও ঠিক সেইরূপই ঘটিবে; কিন্তু অতীত কালে স্বার্থরক্ষাই যেমন যোগ্যতার পরিমাপক ছিল, ভবিষ্যতে সেইরূপ প্রেমের বিস্তৃতি ও গভীরতা-দ্বারাই উদ্‌বর্তনের মূল্যনির্ধারণ হইবে। বর্তমান বিজ্ঞানে এই যে শিক্ষা দিতেছে যে, কোনো মনুষ্যই একাকী কেবল আপনাকে লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইতঃপূর্বে এমন করিয়া শিক্ষা আর কখনো দেওয়া হয় নাই। মনুষ্যকে যখন জঙ্গল ও প্রান্তরের বন্যপশুদের সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে হইত তখন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে এবং তাহার পরে পরিবারগণের মধ্যে পরস্পর-সহকারিতা উহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল। এক্ষণে পৃথিবীতে মানবজাতির অনবচ্ছিন্ন জীবন-ধারণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও Nation-এর পরস্পরের মধ্যে আরও অনেক অধিক সহকারিতার প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে এবং চিরকালই যে-সকল ব্যক্তি বা জনসংঘ ক্রমবিকাশের অনুসারে মহা পুরোযাত্রার সময়ে না চলিবে তাহাদের ভাগ্যে বিনাশ রহিয়াছে।

ইংরেজি-সহজশিক্ষা

প্রথম ভাগ

প্রকাশ · ১৯২৯

'ইংরেজি-সহজশিক্ষা (প্রথম ভাগ)' ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'ইংরাজি-সোপান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ।

ভূমিকা

মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ ও বাক্যগুলি নানা প্রকারে বার বার ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে ইহাই লেখকের অভিপ্রায়। শব্দগুলি বোর্ডে লিখিত থাকিবে, ছাত্ররা তাহাই দেখিয়া মুখে ও লেখায় বাক্যরচনা অভ্যাস করিবে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে অনেকগুলি বিশেষ্য বিশেষণ শব্দ দেওয়া হইয়াছে, সর্বদা ব্যবহার্য শব্দ-শিক্ষায় ও বাক্যরচনাচর্চায় সেগুলি কাজে লাগিবে। যে রীতি অনুসরণ করিয়া লেখক একদা কোনো ছাত্রকে অল্পকালের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ইংরেজি শিখাইতে পারিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

১

বাংলা অর্থ-সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে—

The man	মানুষ	big	বড়ো
The boy	ছেলে	mad	পাগল
The cat	বিড়াল	red	লাল
The dog	কুকুর	bad	খারাপ
The pen	কলম	new	নূতন
The cow	গাভী	fat	মোটা

শিক্ষক বাংলা শব্দটি বলিয়া তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দ, ইংরেজি শব্দটি বলিয়া তাহার বাংলা প্রতিশব্দ বলাইয়া লইবেন। ক্রমশ পাঠগৃহস্থিত বা তন্নিকটবর্তী কোনো কোনো বস্তু নির্দেশ করিয়া তাহার ইংরেজি নাম বলাইয়া লইবেন। শিক্ষক দেখিবেন যে ছাত্র ইংরেজি নাম বলিবার সময় the কথাটি যথাস্থানে প্রয়োগ করে; যথা—the book, the hall, the wall, the tree.

২

শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রকারে বিশেষ্য বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া তাহার অর্থ বলাইয়া লইবেন। বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে, উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ইংরেজিতে বিশেষণ যে the ও বিশেষ্যটির মাঝখানে থাকে, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

The big man
The mad dog
The red cat
The bad boy
The new pen
The fat cow

ইংরেজি করো—

নূতন মানুষ	বড়ো কলম	পাগল ছেলে
খারাপ কুকুর	মোটা বিড়াল	লাল গাভী
পাগল মানুষ	লাল কুকুর	বড়ো গাভী
খারাপ কলম	মোটা ছেলে	নূতন বিড়াল
লাল কলম	মোটা মানুষ	বড়ো কুকুর
নূতন ছেলে	পাগল গাভী	খারাপ বিড়াল

৩

বিশেষ্য ও বিশেষণ কাহাকে বলে পুনরাবৃত্তি করাইয়া পরপৃষ্ঠায় লিখিত প্রকারে কতকগুলি শব্দ ও তাহার অর্থ বোর্ডে লিখিবেন—ছাত্রকে কোন্‌গুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ বাছিতে বলিবেন।

The ink	কালি
The sun	সূর্য
The bed	বিছানা
Hot	গরম
New	নূতন
Wet	ভিজা
The mat	মাদুর
Low	নিচু
Dry	শুক্‌নো
The ass	গাধা
Old	বৃদ্ধ, পুরানো

পরে অর্থ-সহিত নিম্নলিখিত আরও কতকগুলি বিশেষণ বোর্ডে লিখিয়া এ পর্যন্ত যতগুলি বিশেষ্য মাত্রা পাইয়াছে, তাহাদের সহিত বিশেষণগুলি যোজনা করিতে বলিবেন। যোজনাকালে অর্থসংগতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

Rich	kind	ugly	soft	warm
idle	tame	wild	hard	good
flat	thin	long	lame	

ইংরেজি করো—

খারাপ লাল কালি	ভিজা ঠাণ্ডা মাদুর
বৃদ্ধ মোটা গাধা	বড়ো পাগলা কুকুর
শুক্‌নো গরম বিছানা	পুরানো খারাপ কলম
লাল মোটা গাভী	ধনী দয়ালু মানুষ
ভালো নরম বিছানা	বিশ্রী বুনো বিড়াল
বড়ো পোষা কুকুর	অলস নূতন ব্যক্তি

৪

এ পর্যন্ত যতগুলি বিশেষণ শব্দ পাইয়াছে, তাহাদের সহিত এই বিশেষ্যগুলি যোজনা করিবে। কথাগুলি বাংলা অর্থ-সহিত বোর্ডে লেখা থাকিবে।

The girl	the bird	the book
the food	the desk	the goat

the hand
the boat
the head
the nose
the lamb
the ear

ইংরেজি করো—

লম্বা শক্ত কলম
বড়ো চ্যাপ্টা নাক
কোমল গরম হাত
বড়ো বুনো ছাগল
ভালো নূতন নৌকা
পোষা বুড়ো পাখি
নিচু পুরানো ডেস্ক
বিশ্রী খোঁড়া কুকুর
ধনী দয়ালু মেয়ে
পাতলা লম্বা কান
গরম শুক্‌নো খাবার
খোঁড়া মোটা মেষশাবক

বাংলা করো—

The thin old man
The red hot sun
The wet cold bed
The new red boat
The big fat goat
The soft warm hand
The lame old cow
The hot dry bed
The ugly old ass
The old bad pen

৫

The man is big.
The cat is red.
The pen is new.
The ink is dry.
The bed is low.
The dog is mad.
The boy is bad.
The cow is fat.
The sun is hot.
The mat is wet.

শিক্ষক এখন হইতে বস্তু ও গুণ নির্দেশ করিয়া ছাত্রকে ইংরেজিতে বাক্য রচনা করিতে উৎসাহ দিবেন।

৬

ইংরেজি করো—

মানুষটি নূতন।
কুকুরটি খারাপ।
মানুষটি পাগল।
ছেলেটি মোটা।
কলমটি বড়ো।
বিড়ালটি মোটা।
কুকুরটি লাল।
গাধাটি নূতন।
বালকটি পাগল।
গাভীটি লাল।
কলমটি খারাপ।
কলমটি লাল।

কোনো ছাত্রকে দেখাইয়া—Is that boy tall? কলম দেখাইয়া—What is this? Is this pen black? Is this book thick? No, this book is not thick, this book is thin. এইরূপে নিকটবর্তী পদার্থ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

Where is Ram? Where is the book? যাহার উত্তরে here কিংবা there বলিয়া নির্দেশ করা যায় এমন প্রশ্নমাত্র করাইবেন। অনেকগুলি শব্দের বানান কঠিন কিন্তু বার বার ব্যবহারের দ্বারা তাহা ছাত্রদের আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

মানুষটি মোটা।
গাভীটি পাগল।
লাল কালিটি খারাপ।
বৃদ্ধ গাধাটি মোটা।
শুক্‌নো বিছানাটি গরম।
পুরানো ডেস্কটি নিচু।
খোঁড়া কুকুরটি বিশ্রী।
দয়ালু মেয়েটি ধনী।
লম্বা কানটি পাতলা।
শুক্‌নো খাবারটি গরম।
মোটা মেষশাবকটি খোঁড়া।
ভালো বইটি নূতন।
খারাপ কালিটি নূতন।
গাধার কানটি লম্বা।

কুকুরটি বড়ো।
বিড়ালটি খারাপ।
ভিজা মাদুরটি ঠাণ্ডা।
বড়ো কুকুরটি পাগ্‌লা।
লম্বা কলমটি শক্ত।
বড়ো নাকটি চ্যাপ্টা।
গরম হাতটি কোমল।
বড়ো ছাগলটি বুনো।
নূতন নৌকাটি ভালো।
বুড়ো পাখিটি পোষা।
মেয়ের মাথাটি ভিজে।
কৃশ বালকটি পাগল।
মোটা গোরুটি ভালো।
ছেলের হাতটি গরম।

৭

(ছাত্রকে) Is the dog mad?
Yes, the dog is mad.
(অন্যকে) Who is mad?
The dog is mad.
(অন্যকে) What is the dog?
The dog is mad.
(অন্যকে) Is not the dog mad?
Yes, the dog is mad.
(অন্যকে) Is the boy bad?
Yes, the boy is bad.
(অন্যকে) Who is bad?
The boy is bad.
(অন্যকে) What is the boy?
The boy is bad.
(অন্যকে) Is not the boy bad?
Yes, the boy is bad.

এইরূপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি who ও what-যোগে বিভিন্ন করিয়া ছাত্রদের দ্বারা উত্তর করাইয়া লইবেন। মাঝে মাঝে প্রশ্নের সহিত Tell me, say, answer me, পদ যোগ করিয়া লইবেন।

Is the cat red?
Is the pen old?
Is the ink dry?
Is the bed low?
Is the sun hot? &c.

(অন্যকে) Is the old man thin?
Yes, the old man is thin.
(অন্যকে) Which man is thin?
The old man is thin.
(অন্যকে) How is the old man?
The old man is thin.

পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

Is the red ink bad?
Is the wet mat cold?
Is the old ass fat?
Is the big dog mad?
Is the dry bed warm?
Is the long pen hard?
Is the old desk low?
Is the big nose flat?
Is the lame dog ugly?
Is the warm hand soft?
Is the kind girl rich?
Is the old goat wild?
Is the long ear thin?
Is the new boat good?
Is the dry food hot?
Is the old bird tame?
Is that fat lamb lame?
Is the cold head wet?
Is the good book new?
Is the hot sun red?
Is the red ink dry?

৮

প্রশ্নোত্তর : নেতিবাচক

Is the boy bad?
No, the boy is not bad, the boy is good.
Is the pen old?
No, the pen is not old, the pen is new.
Is the bed hard?
No, the bed is not hard, the bed is soft.

বিপরীতার্থক ইংরেজি বিশেষণ পদগুলি বাংলা অর্থ-সহ বোর্ডে লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Poor	দরিদ্র
small	ছোটো
high	উঁচু
pretty	সুন্দর
cruel	নিষ্ঠুর
cool	ঠাণ্ডা
short	খাটো
food	খাবার
good	ভালো

Is the old man rich?
No, the old man is not rich, the old man is poor.
Is the thin nose big?
No, the thin nose is not big, the thin nose is small.
Is the hot food good?
Is the hard desk low?
Is the poor girl ugly?
Is the ugly boy kind?
Is the soft hand warm?
Is the new pen long?

ষষ্ঠ পাঠের প্রশ্নগুলিকে যত দূর সম্ভব নেতিবাচক ভাবে উত্তর করাইয়া লইবেন।

৯

The man has a dog.
The boy has a book.
The girl has a goat.
The cat has a nose.
The lamb has a head.

ইংরেজি করো—

মেয়েটির একটি গাভী আছে।
ছেলেটির একটি পাখা আছে।
মানুষটির একটি মেষশাবক আছে।
সুশ্রী মেয়েটির একটি গাধা আছে।
গরিব ছেলেটির একটি নৌকা আছে।
নিষ্ঠুর মানুষটির একটি মাদুর আছে।
গরিব ছেলেটির একটি নৌকা আছে।
খাটো মানুষটির একটি সুন্দর পাখি আছে।

বিশ্রী ছেলেটির একটি উঁচু ডেস্ক আছে।
মেষশাবকের (একটি) লম্বা মাথা (আছে)।
পাতলা মানুষটির (একটি) উঁচু বড়ো নাক (আছে)।
গরিব ছেলেটির একটি পুরানো খারাপ কলম আছে।

প্রশ্নোত্তর

Has the man a dog?
Yes, the man has a dog.
Who has a dog?
The man has a dog.
What has the man?
The man has a dog.
Has not the man a dog?
Yes, the man has a dog.

উক্তরূপ পর্যায়ে নিম্নের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন।

Has the girl a goat?
Has the boy a book?
Has the cat a nose?
Has the lamb a head?
Has the girl a cow?
Has the boy a bird?
Has the man a lamb?

১০

Has the pretty girl a cat?
Yes, the pretty girl has a cat.
Who has a cat?
The pretty girl has a cat.
Which girl has a cat?
The pretty girl has a cat.
What has the pretty girl?
The pretty girl has a cat.
Has not the pretty girl a cat?
Yes, the pretty girl has a cat.

এইরূপ পর্যায়ে প্রশ্নগুলি প্রয়োগ করিবেন।

Has the poor boy a boat?
Has the cruel man a mat?

Has the ugly ass a nose?
Has the pretty lamb a head? &c.

পরে কর্মে (object) একটি বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পর্যায়ে পরবর্তী প্রশ্নগুলি করিবেন। নূতন শব্দ পাইলে শিক্ষক তাহার অর্থ ছাত্রকে দিয়া লিখাইয়া ও পুনঃ পুনঃ বলাইয়া লইবেন।

Has the poor man a tame dog?
Which man has a tame dog?
What has the poor man?
What kind of dog has the poor man?
Has not the poor man a tame dog?

Leg	পা
tail	লেজ
sweet	মিষ্ট
sour	টক
bitter	তিক্ত
dead	মৃত
live	জীবিত
cake	পিষ্টক
mango	আম
pill	বটিকা

Has the lame boy a high desk?
Has the ugly cat a flat nose?
Has the red cow a lame leg?
Has the pretty bird a long tail?
Has the kind girl a sweet cake?
Has the poor boy a sour mango?
Has the old man a bitter pill?
Has the cruel man a dead bird?
Has the rich girl a live goat?

নেতিবাচক—

Has the poor man a tame dog?
No, the poor man has not a tame dog, the poor man has a wild dog.

এইভাবে উপরিলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করাইয়া লইবেন।

১১

It is a cat.
It is a tree.
It is a bed.
It is the leg.
It is the boy.
It is the boat.

He is the boy.
He is the prince.
He is a doctor.
He is a king.
He is the brother.
He is the uncle.

She is a girl.
She is the maid.
She is the cook.
She is the queen.
She is the sister.
She is the aunt.

নেতিবাচক করো, যথা—
It is not a cat.

এ একটা সিংহ (lion)।
এ চাঁদ (moon)
এটা হাত (hand)।
এ একটা পেয়ালা (cup)।
এ একটা কলম (pen)।
এটা ঘোড়া (horse)।

এ একটি চাকর (servant)।
এ রুটিওয়ালা (baker)।
এ হরি।
এ দর্জি (tailor)।
এ একটি মাল্লা (sailor)।
এ মুটে (porter)।

এ একটি স্ত্রীলোক (woman)।
এ দাই (nurse)।
এ গয়লানী (milk-maid)।
এ মেথরানী (sweeper)।*
এ রাজকন্যা (princess)।
এ ভিখারিনী (beggar)।*

*মেথর বা ভিখারী-যে স্ত্রীলোক তাহা বিশেষভাবে বুঝাইতে হইলে sweeper ও beggar শব্দের পরে woman যোগ করিয়া দিতে হয়।

উপরের পাঠটি 'there is' বাক্যযোগে সাধাইয়া নেতিবাচক করাইতে হইবে। যথা—

There is a cat.
There is no cat.

প্রশ্নবাচক, যথা—

Is there a cat?
No, there is no cat, there is a dog.

১২

It is hot. (গরম পড়িয়াছে)
It is cold. (ঠাণ্ডা পড়িয়াছে)
It is summer. (এখন গ্রীষ্মকাল)
It is autumn.
It is winter. It is spring.

প্রশ্নোত্তর, যথা— Is it hot?
No, it is not hot, it is cold.

It is a hot summer.
It is a cold winter.
It is a wet autumn.
It is a warm spring.

প্রশ্নবাচক, যথা— Is it a hot summer? *or,*
Is the summer hot? No, it is cool.

It is hot in my room.
It is cold in her garden.
It is cold in the hills.
It is warm in Madras.
It is not hot but dry.
It is not cold but damp.

প্রশ্নোত্তর

এখন কি শীত? না, শীত নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা।
এখন কি বেশি গরম (hot)?
না, বেশি গরম নয়, অল্প গরম (warm)।
এখন কি ভিজে (wet)?
না, ভিজে নয়, কিন্তু স্যাঁৎসেতে।
হরি কি পাগল?
না, হরি পাগল নয়, কিন্তু সে ক্রুদ্ধ।
রাম কি মাল্লা?
না, রাম মাল্লা নয়, কিন্তু সে রুটিওয়ালা।
ও কি ভাই?
না, ও ভাই নয়, কিন্তু ও খুড়ো।
ও কি মা?
না, ও মা নয়, কিন্তু ও মাসি।
ও কি আপন ভাই (brother)?
না, ও আপন ভাই নয়, কিন্তু খুড়তুতো ভাই (cousin)

ও কি মেথর?
না, ও মেথর নয়, কিন্তু ও ভিখারী।
বিড়ালটি কি ভালো?
না, ভালো নয়, কিন্তু কুশ্রী।

ঐ লাল সিংহ কি বুনো?
না, ও বুনো নয়, কিন্তু ও পোষা।
ঐ মোটা পাচক কি বুদ্ধিমান (clever)?
না, সে বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু ভালো।
ঐ রাজকন্যা পীড়িত?
না, পীড়িত নয়, কিন্তু ক্ষুধিত।
They are bakers.
They are girls.
These are cats.
These are tables.
Are these books?
No, these are not books, but these are pencils.
Are these birds?
No, these are not birds, but these are flowers.

১৩

The man is not there.
There is no man.
It is a goat. It is not a goat.

ইংরেজি করো—

মানুষ আছে।	মানুষের আছে।
গোরু আছে।	গোরুর আছে।
ছাগল আছে।	ছাগলের আছে।
মেষশাবক আছে।	মেষশাবকের আছে।
বালিকা আছে।	বালিকার আছে।
গাধা আছে।	গাধার আছে।
বিড়াল আছে।	বিড়ালের আছে।
কুকুর আছে।	কুকুরের আছে।

'আছে' শব্দের ইংরেজিতে 'There is' পদের ব্যবহার এইসঙ্গেই ছাত্রদিগকে অভ্যাস করাইতে হইবে। যথা, The man is, There is the man. The thin man is, There is the thin man. এইরূপে সমস্ত পাঠটি there is-শব্দযোগে নিষ্পন্ন করাইয়া লইতে হইবে।

১৪

বাংলা করো—

In the room (ঘরেতে)

in the bag	in the sea	in the tub
in the sky	in the well	in the road
in the town	in the cup	in the tank
in the food	in the head	in the hanc

ইংরেজি করো—

বিছানাতে	মাদুরে	বহিতে
হাতে	মাথায়	সূর্যে
কালিতে	খাবারে	ডেস্কে
নৌকায়	নাকে	কানে
লেজে	পায়ে	বড়ো ব্যাগে
ছোটো ঘরে	নূতন টবে	লাল আকাশে
শুষ্ক কূপে	দীর্ঘ পথে	পুরাতন শহরে
খারাপ পেয়ালায়		ভরা পুকুরে

১৫

The cup is in the bag.
The tub is in the road.
The sun is in the sky.
The road is in the town.
The bag is in the room.

There is -শব্দযোগে এই পাঠ পুনরাবৃত্তি করাইতে হইবে।

ইংরেজি করো—

(একবার is একবার there is -শব্দযোগে অনুবাদ করাইতে হইবে)

নৌকা সমুদ্রে আছে। মাদুর বিছানায় আছে।
খাবার হাতে আছে। নাক মুখে আছে।
কালি পেয়ালায় আছে।
নূতন নৌকা লোহিত সমুদ্রে নাই।
পুরাতন মাদুর শক্ত বিছানায় নাই।
গরম খাবার ভিজা হাতে নাই।
মোটা মেয়েটি ছোটো ঘরে নাই।

মৃত ছাগলটি শুকনো রাস্তায় নাই।
সুন্দর পাখি লাল আকাশে নাই।
নরম বিছানা ভিজা ঘরে নাই।

প্রশ্নের উত্তরে 'There is' শব্দের অভ্যাস করাইতে হইবে।

Where is the cup?
What is in the bag?
Is the cup in the bag?
Is there a cup in the bag?
Is not the cup in the bag?

শেষোক্ত দুই প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক (affirmative) ও নেতিবাচক (negative) দুইরূপই বলাইয়া লইতে হইবে। যথা—Yes, there is a cup in the bag.
অথবা—No, there is no cup in the bag.

এই পর্যায়ে এই পাঠস্থিত সমস্ত ইংরেজি বাক্য, ও বাংলা হইতে ইংরেজি তর্জমাগুলি প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করাইয়া উত্তর করাইয়া লইবেন।

Is the cup in the sky?
No, the cup is not in the sky, the cup is in the bag.
Is there a cup in the sky?
No, there is no cup in the sky.
Is the mat in the sea?
No, the mat is not in the sea, the mat is in the room.
Is there a mat in the sea?
No, there is no mat in the sea.

এইভাবে পাঠস্থিত বাক্যগুলিকে অসংগত প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া সংগত উত্তর বলাইয়া লইবেন।

১৬

বাংলা করো—

The king has a crown.
The lad has a coat.
The shoe has a hole.
The thief has a ring.
The shop has a door.
The horse has a groom.
The house has a room.
The deer has a tail.

ইংরেজি করো—

মানুষটির একটি পেয়ালা আছে।
বিছানাটায় একটি মাদুর আছে।
বালকটির একটি পাখি আছে।
গাভীটির একটি লেজ আছে।
বালকটির একটি নৌকা আছে।
হরির একটি পিষ্টক আছে।
রামের একটি বই আছে।
শ্যামের একটি বিছানা আছে।
গাভীর একটি লম্বা লেজ আছে।
কুকুরের একটি বিশ্রী নাক আছে।
বালকটির একটি লাল ছাগল আছে।
বালকটির একটি সাদা মেষশাবক আছে।
খোঁড়া মানুষের একটি সরু পা আছে।

নেতিবাচক বিকল্পে—
The man has not a cup.
The man has no cup.

প্রশ্নোত্তর

What has the king?
Who has the crown?
Has the king a crown?
Has the king a cup?
What has the cow?
Who has the long tail?
What kind of tail has the cow?
Has the cow a short tail?

এইরূপ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তর করিয়া যাইবেন।

প্রশ্নোত্তর

Has the man a pen?
Yes, the man has a pen.
Where has the man a pen?
The man has a pen in the bag.

এইভাবে এই পাঠস্থিত বাক্যগুলিকে প্রশ্নরূপে প্রয়োগ করিয়া উত্তর বলাইয়া লইবেন।

Has the man a pen in the well?
No, the man has not a pen in the well,
the man has a pen in the bag.

এইরূপ অসংগত প্রশ্নের সংগত উত্তর করাইয়া লইবেন।

১৭

বাংলা করো—

On the tree (গাছের উপরে)

on the roof
on the chair
on the back
on the wall
on the hill
on the floor
on the bench
on the rose
on the flower

ইংরেজি করো—

বিছানার উপর
ডেস্কের উপর
নৌকার উপর
লেজের উপর
পেয়ালার উপর
মাদুরের উপর
হাতের উপর
নাকের উপর
টবের উপর
প্রদীপের উপর
বহির উপর।
মাথার উপর।
কানের উপর।
রাস্তার উপর।
পায়ের উপর।

একবার is ও একবার there is-শব্দযোগে অনুবাদ করাইতে হইবে।

ইংরেজি করো—

গাছের উপর পাখি আছে।
বেঞ্চের উপর পুস্তক আছে।
টেবিলের উপর খাবার আছে।
পাহাড়ের উপর মেষশাবক আছে।
ছাদের উপর বিড়াল আছে।
চৌকির উপর ফুল আছে।
কোলের উপর হাত আছে।
মাথার উপর মাছি আছে। (মাছি : fly)
নাকের উপর একটি ফোড়া আছে। (ফোড়া : boil)

চতুর্দশ পাঠের ন্যায় বিভিন্নরূপে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে। যথা—

Is the bird on the tree?
Who is on the tree?
Where is the bird?
Is the bird on the lamp? etc.

There is শব্দের ব্যবহার আবশ্যক।

পুরাতন ছাদের উপর পাখিটি আছে।
নিচু দেয়ালের উপর বিড়ালটি আছে।
শক্ত বেঞ্চের উপর বালকটি আছে।
কোমল আসনের উপর রাজা আছে। (আসন : seat)
লাল দেয়ালের উপর প্রদীপটি আছে।
শুষ্ক গোলাপের উপর মাছি আছে।
উঁচু পাহাড়ের উপর গাছটি আছে।

প্রশ্নোত্তর

There is শব্দটি ব্যবহার্য—

Is the bird on the old roof?
Where is the bird?
Is there a bird on the old roof?
Who is on the old roof?
On what kind of roof is the bird?
Is the bird on the water?
Is there a bird on the water?

এইরূপ পর্যায়ে উল্লিখিত বাংলার ইংরেজি তর্জমাগুলিকে প্রশ্নের আকারে প্রয়োগ করিবেন।

১৮

ঘরে রাজার একটি মুকুট আছে।
ঘরে রাজা আছে।
গাছের উপর হরির একটি পাখি আছে।
গাছের উপর হরি আছে।
শেল্‌ফের উপর রামের একটি বই আছে।
দোকানে রাম আছে।
বেঞ্চের উপর বালকের একটি পাত্র আছে।
বালক বেঞ্চের উপরে আছে।
ব্যাগে চোরের একটি আংটি আছে।
আংটি ব্যাগে আছে।
চৌকির উপর বালিকার একটি জুতা আছে।
বালিকাটি চৌকির উপরে আছে।
থালায় (plate) শ্যামের একটি পিষ্টক আছে।
পিষ্টক পেয়ালায় আছে।
মাদুরের উপরে মহিলার একটি আংটি আছে।
মহিলা মাদুরের উপরে আছে।
নৌকায় চোরের একটি কোর্তা আছে।
চোর নৌকায় আছে।
Has the king a crown in the room?
What has the king in the room?
Where has the king a crown?
Has the king a goat in the room?
Has not the king a goat in the room?

এইরূপ পর্যায়ে পূর্বোক্ত বাংলার ইংরেজি তর্জমাগুলি প্রশ্নের আকারে প্রয়োগ করিবেন।

১৯

বাংলা করো—

The roof of the house (বাড়ির ছাদ)
The tree of the garden
The horn of the cow
The bench of the school
The chair of the father
The wall of the fort
The back of the cow
The top of the hill

ইংরেজি করো—

হরিণের মুণ্ড	হাঁসের পা	খাইবার পাত্র
শহরের রাস্তা	বিছানার মাদুর	দোকানের দরজা
সহিসের জুতা	মহিলার আংটি	চোরের কোর্তা
ছোকরার ঘোড়া	চাকরানীর প্রদীপ	রাজার মুকুট

বাড়ির ছাদটি উঁচু। বাগানের গাছটি নিচু।
গাভীর শিংটি বিশ্রী। স্কুলের বেঞ্চটি লম্বা।
রাজার চৌকিটি নরম। দুর্গের প্রাচীরটি শক্ত।
চৌকির পিঠটি পাতলা। পাহাড়ের উপরটা চ্যাপ্টা।
হরিণের মুণ্ড সুশ্রী। হাঁসের পা খাটো।
পাচকের পাত্রটি নূতন। শহরের রাস্তা লম্বা।
বিছানার মাদুরটি ভালো। দোকানের দরজা ছোটো।
সহিসের জুতা শুক্‌নো। মহিলার আংটি ভালো।
চোরের কোর্তা পুরানো। ছোকরার ঘোড়াটি খোঁড়া।
চাকরানীর প্রদীপটি নিচু।

স্কুলের বেঞ্চটি বাগানে আছে।
বাবার চৌকিটি ছাদের উপর আছে।*
হরিণের মুণ্ডটি ব্যাগে আছে।
দুর্গের প্রাচীরটি পাহাড়ের উপর আছে।
বিছানার মাদুরটি টবে আছে।
পাচকের পিষ্টকটি পেয়ালায় আছে।*
সহিসের জুতাটি কূপে আছে।*
মহিলার আংটিটি চৌকির উপর আছে।*
পাচকের প্রদীপটি বাগানে আছে।*

রানীর কুকুরটি পাহাড়ের উপর আছে।*
রাজার জাহাজটি সমুদ্রে আছে।

চোরের কোর্তাটি গাছের মাথার (top) উপর আছে।
বালিকার বইটি বাপের ব্যাগে আছে।
বালিকার হাতটি গাভীর শৃঙ্গের উপর আছে।
রাজার মুকুটটি রানীর মাথার উপর আছে।
মানুষটির দোকান শহরের বাগানে আছে।
পাচকটির পাত্রটি স্কুলের চৌকির উপর আছে।
গাভীর খাদ্য গাধার পিঠের উপর আছে।
বালিকার গোলাপ সাহিসের হাতে আছে।

দুই প্রকারে তর্জমা করাইতে হইবে।

২০

plural (বহুবচন)

The round balls
the black boards
the strong bears
the bright stars
the white clouds
the brave lions
the blue stones
the green sticks
the sharp thorns

উজ্জ্বল মেঘগুলি
পোষা সিংহগুলি
শক্ত তক্তাগুলি
তাজা কাঠিগুলি
সবুজ পাথরগুলি
খোঁড়া ভল্লুকগুলি
তীক্ষ্ম পাথরগুলি
কালো ভল্লুকগুলি

বাংলা করো—

The balls are round.
The boards are black. ইত্যাদি।

বহুবচনে are হয় বুঝাইয়া দিবেন।

ইংরেজি করো—

মেঘগুলি সাদা। তক্তাগুলি কালো। ইত্যাদি।

উপরের ইংরেজি ও বাংলা তর্জমাগুলি ছেলেদের দিয়া ক্রিয়াযুক্ত করাইয়া লইবেন।

---

* তারা-চিহ্নিত বাক্যগুলি দুই প্রকারে তর্জমা হইবে। যথা—The father's chair is on the roof. The father has a chair on the roof. বিকল্পে there is শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার্য।

ইংরেজি করো—

লাল গোলাগুলি বড়ো।
কালো তক্তাগুলি নূতন।
সবল ভল্লুকগুলি পোষা।
উজ্জ্বল তারাগুলি লাল।
সাদা মেঘগুলি পাতলা।
সাহসী সিংহগুলি বন্য।
নীল পাথরগুলি সুশ্রী।
সবুজ কাঠিগুলি লম্বা।
তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলি শুষ্ক।

উল্লিখিত পাঠ লইয়া নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্নোত্তর করাইতে হইবে।

Are the balls round?
Yes, the balls are round.
What are round?
The balls are round.
Are the balls flat?
No, the balls are not flat; the balls are round.

বিশেষণ যুক্ত পদগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্নে পরিণত করিবে।

Which balls are big?
The red balls are big.
Are the red balls big?
Yes, the red balls are big.
Are the red balls small?
No, the red balls are not small, the red balls are big.
Are the big balls white?
No, the big balls are not white, the big balls are red.
Are not the red balls big?
Yes, the red balls are big.

২১

ইংরেজি করো—

(বিকল্পে are ও there are-যোগে নিষ্পন্ন করিতে হইবে)

গোলাগুলি চৌকির উপরে আছে।
মেঘগুলি আকাশে আছে।
তক্তাগুলি বেঞ্চের উপরে আছে।
সিংহগুলি বাগানে (park) আছে।
ভল্লুকগুলি পাহাড়ের উপরে আছে।
পাথরগুলি জাহাজে আছে।
কাঠিগুলি (লাঠিগুলি) বাগানে (garden) আছে।
গর্তগুলি জুতায় আছে।
কাঁটাগুলি গাছে আছে।

উল্লিখিত বাক্যগুলিকে একবার একবচন ও পরে অধিকরণ পদগুলিকে বহুবচন করিয়া ইংরেজি করো। যথা—

সিংহ বাগানে আছে।
সিংহগুলি বাগানগুলিতে আছে।
লাল গোলাগুলি চৌকির পিঠের উপর আছে।
সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপর আছে।
কালো তক্তাগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
বড়ো সিংহগুলি শহরের বাগানে আছে।
বিড়ালগুলি হরির দোকানে আছে।
পাথরগুলি দুর্গের প্রাচীরের উপর আছে।
লম্বা কাঠিগুলি বাড়ির ছাদের উপরে আছে।
তীক্ষ্ন পেরেকগুলি সহিসের জুতায় আছে।

অধিকরণ কারকগুলিকে বহুবচন করিয়া তর্জমা করো। যথা—

লাল গোলাগুলি চৌকির পিঠে আছে।

প্রশ্নোত্তরের দৃষ্টান্ত

Are the balls on the chair?
Are there balls on the chair?
Where are the balls?
What are there on the chair?
Are there horses on the chair?
Are there not balls on the chair?
How many balls are there on the chair?
Is there only one ball on the chair?

শেষোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে সংখ্যাবাচক বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে।

বিশেষণযুক্ত পদের প্রশ্নের নমুনা

Are the red towels on the back of the chair?
Are there the red towels on &c.
What are there on the back &c.
Where are the red towels?
Which towels are there on the &c.
On the back of what are the red &c.
What kind of towels are on the back &c.
Are there the red towels on the &c.
Are there not the red towels on the &c.

ইংরেজি করো—

রামের লাল তোয়ালেগুলি চৌকির পিঠের উপর আছে।
আকাশের সাদা মেঘগুলি পাহাড়ের মাথার উপরে আছে।

শিক্ষকটির কালো বোর্ডগুলি স্কুলের বাগানে আছে।
রাজার বড়ো সিংহগুলি শহরের পার্কে আছে।

উক্ত বাক্যগুলিকে অধিকরণপদে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করিয়া ইংরেজি করো।

২২

বাংলা করো—

The boys have a ball.
The brothers have a horse.
The uncles have a farm.
The sisters have a dove.

উক্ত বাক্যগুলিকে একবচন করো, কর্মকে বহুবচন করো।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

What have the boys?
Who have the balls?
Have the boys the balls?
How many balls have the boys?
Have the boys only one ball?
Have the boys a dish?
Have not the boys a ball?

বাংলা করো—

The mares have no stable.
The beggars have no cap.
The bees have no hive.
The crows have no nest.
The fields have no shade.

একবচন করো—

বাক্যগুলিকে অস্তিবাচক করো, যথা—
The mares have a stable.

ইংরেজি করো—

বাগানগুলির শীতল ছায়া আছে।
বাগানগুলির ছায়া শীতল।

গোলাপগুলির তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে।
গোলাপগুলির কাঁটা তীক্ষ্ণ।
ঘোড়াগুলির একটি লম্বা আস্তাবল আছে।
ঘোড়াগুলির আস্তাবলটি লম্বা।
মৌমাছিগুলির একটি গোল চাক আছে।
মৌমাছিগুলির চাকটি গোল।
ডাক্তারদের একটি চ্যাপ্টা বোতল আছে।
ডাক্তারদের বোতলটি চ্যাপ্টা।

দুই প্রকার তর্জমা করিতে হইবে—

The garden has a tall tree.
There is a tall tree in the garden.

প্রশ্নোত্তর

Is there a tall tree in the garden?
Has the garden a tall tree?
Is the tree of the garden tall?
What kind of trees has the garden?
Has not the garden a tall tree?

ইংরেজি করো—

টুপিগুলিতে একটিও ছিদ্র নাই।
চাক্‌গুলিতে একটিও মৌমাছি নাই।
গাছগুলির একটিও কাঁটা নাই।
গোলাবাড়িতে একটিও গোরু নাই।
বাসায় একটিও কাক নাই।
বালকদের একটিও গোলা নাই।
ভাইদের একটিও ঘোড়া নাই।
ডাক্তারদের একটিও বোতল নাই।

২৩

বাক্যগুলির প্রত্যেক বিশেষ্য পদের সহিত একটি করিয়া উপযুক্ত বিশেষণ যোজনা করিয়া ইংরেজি করো—

স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক আছে।
শহরের ডাক্তারের একটি দোকান আছে।
রাজার বাগানের একটি গেট (gate) আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক আছে।
ঘরের দেয়ালগুলির একটি ছাদ আছে।
পাহাড়ের রাজার একটি মুকুট আছে।

রানীর সহিসদের একটি নৌকা আছে।
স্কুলের বালকদের একটি ডেস্ক ঘরে আছে।
শহরের ডাক্তারদের একটি দোকান পাহাড়ের উপর আছে।
রাজার শহরের বাগানে একটি গেট আছে।
লোকটির ভাইদের একটি পাচক বাড়িতে আছে।
পাহাড়ের রাজার একটি মুকুট ব্যাগে আছে।
রানীর সহিসদের একটি নৌকা পুকুরে আছে।
রাজার পাচকদের বিড়ালটি প্রাচীরের উপর আছে।

ডেস্ক প্রভৃতি শব্দ বহুবচন করিয়া তর্জমা করো।

প্রশ্নোত্তর

Who have a desk in the room?
Where have the boys a desk?
Have the boys of the school a desk?
Have the boys of the school a lamb?
What have the boys of the school?

২৪

বাংলা করো—

I am angry.
You are ill.
He is happy.
Ram is sad.
It is bad.
She is kind.

We are well.
You are clever.
They are slow.
The stags are quick.
The books are good.
They are cruel.

ইংরেজি করো—

তিনি পাগল। আমি খোঁড়া। তিনি মোটা।
তাঁরা পাতলা। আমরা শক্ত। ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

Q. What am I? A. You are angry.
Q. Am I angry? A. Yes, you are angry.
Q. Am I happy? A. No, you are angry.

ইংরেজি করো—

আমি দুর্গে আছি।
তাঁরা প্রাচীরে আছেন।
তিনি পুকুরে আছেন।
তুমি গাছের উপরে আছ।
আমরা ঘরে আছি।
তোমরা বিছানায় আছ। ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর

Where am I?
Am I not in the fort?
Am I in the fort?
Am I in the well?

Who is in the fort?

২৫

বাংলা করো—

I am in my room.
He is on his bench.
They are on their boat.
You are in your shop.
We are in our gardens.
You are on your roof.

Hari and Ram are in their town.
She is in her bed.

ইংরেজি করো—

আমি আমার বিছানায় আছি।
তুমি তোমার মাদুরে আছ।
তিনি তাঁহার দোকানে আছেন।
তিনি (মেয়ে) তাঁর ঘরে আছেন।
যদু আর মধু তাঁদের আস্তাবলে আছেন।
আমরা আমাদের পুকুরে আছি।
তোমরা তোমাদের বাগানে আছ।
তাঁরা তাঁদের বাড়িতে আছেন।
তুমি আর শ্যাম তাঁর বিছানায় আছ।
শ্যাম আমার মাদুরে আছে। ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তর

Am I in bed?
Who is in my bed?
Where am I?
Am I in your bed?
In whose bed am I?

২৬

একবার 'is' 'there is' এবং একবার 'has'-যোগে তর্জমা করিতে হইবে। যথা–

My dog is in your room.
There is my dog in your room.
I have my dog in your room.

ইংরেজি করো—

আমার কুকুর তোমার ঘরে আছে।
তাঁদের মিঠাই আমাদের পাত্রে আছে।
তাঁর ঘোড়া আমাদের আস্তাবলে আছে। ইত্যাদি।

বিশেষ্যগুলিতে বিশেষণ যোগ করো।

প্রশ্নোত্তর

Is my dog in your room?
Is there my dog in your room?
Who is in your room?
Have I my dog in your room?
Have I my cat in your room?

বাংলা করো—

The ducks of our father are in our tank. &c.

ইংরেজি করো—

তাদের ইস্কুলের বোর্ডগুলি আমাদের বাগানে আছে।
আমার ভাইয়ের জামা তাঁর ব্যাগে আছে। ইত্যাদি।

২৭

বাংলা করো—

I have the milk.
He has the silk.
You have the butter.
Hari has the water.
You have the flower.
We have the sword.
They have the grapes.
I have the pure milk.
Hari and Madhu have the dolls.
You have the yellow flower.
He has the bright silk.
We have the blunt sword.
You have the fresh butter.
They have the ripe grapes.
Hari and Madhu have the nice doll.
Hari has the boiled water.

ইংরেজি করো—

আমার ফুল আছে।
তাঁহার তলোয়ার আছে।
তোমাদের আঙুর আছে।
হরি এবং মধুর গোলাপ আছে।
তোমার দুধ আছে।
আমাদের রেশম আছে।
তাহাদের মাখন আছে।
হরির পুতুল আছে।
তাঁহার ভোঁতা তলোয়ার আছে।
আমাদের উজ্জ্বল রেশম আছে।
তোমার জ্বাল-দেওয়া দুধ আছে।
তোমার কাঁচা (green) ফল আছে।
তাহাদের তাজা মাখন আছে।
হরি এবং মধুর গরম জল আছে।
আমার ধান (rice) তোমার বাড়ির ছাদের উপর আছে।
তোমার দুধ আমার পাচকের পাত্রে আছে।
তাঁহার তলোয়ার তাঁহার দুর্গের দেওয়ালের উপর আছে।
আমাদের রেশম তোমাদের বিছানার মাদুরের উপর আছে।
তোমার আঙুর আমার পিতার ব্যাগে আছে।

বাংলা করো—

My pen is on the table in my room.
The butter is on the shelf in your bed-room.
Your doll is on the bench in her garden.
Her son is on the bed in my house.
My ball is in the box in your school.

শব্দমালা

বাক্যরচনা-চর্চার উদ্দেশ্যে

Noun	*Adjective*	*Noun*	*Adjective*
Hair	Thin	Knee	Hard
Head	Thick	Bone	Soft
Eyes	Black	Foot	Cold
Nose	Dark	Toe	Severe
Face	Fair	Ear	Nasty
Teeth	Bright	Nostril	High
Tongue	Mild	Neck (গ্রীবা)	Bad
Gum	Clean	Ankle	Deep
Lips	Dirty	Shoulder (স্কন্ধ)	Old
Cheek	Long	Elbow	Young
Hand	Short	Forehead	Naughty
Arm	Straight	Cart	Noisy
Finger	Bent	(Motor) Car	Full
Nail	Broad	Steamer	Empty
Chest	Narrow	Ship	Loaded
Back	Sharp	Tram	Smoky
Stomach	Smooth	Bus	Broad
Leg	Rough	Lorry	Narrow
Temple (রগ্)	Clever	Washerman	Sour
Eyebrow	Jolly	Food	Fried
Eyelashes	Funny	Rice	Bitter
Father	Kind	Bread	Hot
Mother	Loving	Butter	Stale
Brother	Fond	Milk	Fresh
Sister	Angry	Tea	Rotten
Baby	Lazy	Egg	Soft
Cousin	Greedy	Fish	Crisp
Aunt	Fat	Flour	Raw
Grandfather	Thin	Meat	Early
Grandmother	Sick	Lemon	Late
Grandson	Strong	Orange	Long
Granddaughter	Full	Breakfast	Short
Daughter	Short	Oil	Thick

Noun	*Adjective*	*Noun*	*Adjective*
Son	Dirty	Lunch	Fine
Niece	Tidy (পরিপাটী)	Salt	Woollen
Nephew	Green	Dinner	Cotton
Servant	Cold	Vegetable	Silk
Maidservant	Cooked	Sugar	Tight
Cook	Sweet	Onion	Loose
Barber	Boiled	Potato	Torn
Turnip	Coloured	Ring	Thick
Radish	Plain	Necklace	Hard
Cauliflower	High	House	Soft
Cabbage	Low	Cottage	Scented
Cucumber	Tiled	Bed	High
Mango	Thatched	Pillow	Low
Shirt	Shut	Mattress	Hard
Socks	Open	Rug	Soft
Coat	Opened	Blanket	Warm
Vest	Airy	Quilt	Cosy
Trousers	Painted	Pillow-case	Wooden
Shorts	Marbled	Bed-cover	Double
Frock	Dark	Curtain	Single
Shoe	Red	Cot	White
Boots	White-washed	Lamp	Coloured
Slippers	Full	Horse	Plain
Sandals	Empty	Dog	White
Belt	Dry	Cat	Black
Shawl	Wet	Cow	Brown
Watch	Small	Calf	Tame
Bracelets	Large	Goat	Wild
Sheep	Lean	Kid	Fat
Lamb	Tiny	Lake	Hot
Lion	Cunning	Earth	Cold
Tiger	Clever	Rain	Dark
Rat	Foolish	Mist	Silent
Mouse	Cruel	Dew	Deep
Frog	Strong	Morning	Shallow
Snake	Grey	Noon	Muddy
Sun	Red	Evening	Thick
		Afternoon	Wet

Noun	*Adjective*	*Noun*	*Adjective*
Moon	Bright	Night	Damp
Star	Blue	Sea	Dry
Sky	Round	Cart	Slow
River	Cool	Carriage	Fast

Noun	*Noun*	*Noun*	*Noun*
Hut	Temple	Window	Wall
Doors	Gate	Floor	Ceiling
Skin	Cough	Waist	Sore
Mouth	Fever	Wrist	Boil
Throat	Measles	Thigh	Cut
Chin	Headache	Room	Roof
Bolt	Stairs	Comb	Brush
Pillar	Brick	Water	Drain
Bath	Tub	Hair oil	Rails
Tap	Bucket	Fly	Donkey
Mug	Towel	Ant	Fox
Soap	Mirror	Mosquito	

[illegible]
লইয়া বিশেষ্য বিশেষণ যোগ করিয়া বাক্য রচনার অভ্যাস করিবে। বার বার ব্যবহারের দ্বারা এই শব্দগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে, কণ্ঠস্থ করিয়া নহে।

ইংরেজি-সহজশিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকাশ : ১৯২৯

‘ইংরেজি-সহজশিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ)’ ১৯০৬ সালে প্রকাশিত ‘ইংরাজি-সোপান’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ‘দ্বিতীয় ভাগ’ অংশের র্তিত সংস্করণ।

LESSON 1

[প্রথম ইতিবাচক বাক্যগুলিকে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া রাখিতে হইবে, যথা—The boy reads, The girl cooks, The child drinks ইত্যাদি। তার পর শিক্ষার্থীকে বা শিক্ষার্থীদিগকে ক্রমান্বয়ে একটি একটি করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং মুখে মুখে যথোপযুক্ত উত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। যে ক্ষেত্রে সম্ভব শিক্ষকমহাশয় এক বা একাধিক ছাত্রদ্বারা 'ক্রিয়া'র অভিনয় করাইয়া অপরকে প্রশ্ন করিবেন।]

The boy reads—ছেলেটি পড়ে।
Who reads?
The girl cooks—মেয়েটি রাঁধে।
Who cooks?
The child drinks—শিশুটি পান করে।
Who drinks?
Gopal sells—গোপাল বিক্রি করে।
Who sells?
Hari buys—হরি কেনে।
Who buys?

এইরূপে I sit, You stand, We play, It bites প্রভৃতি বাক্যগুলি প্রশ্নের উত্তরে অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রত্যেক পাঠেই এইরূপে First ও Second Person প্রয়োগ শিখাইবেন।

LESSON 2

Present Continuous (ব্যাপক বর্তমান কাল)

'পড়িতেছে' 'রাঁধিতেছে' 'কিনিতেছে' শব্দগুলি ইংরেজিতে reads, cooks, buys ও is reading, is cooking, is buying উভয় রূপেই তর্জমা করা যাইতে পারে। রূপভেদে অর্থেরও কিছু প্রভেদ হয়। The girl cooks বলিলে শুধুমাত্র ক্রিয়ার বর্তমানতা বুঝায়, The girl is cooking বলিলে ক্রিয়ার বর্তমানতা তো বুঝায়ই, অধিকন্তু তাহার কিয়ৎ-বর্তমানকাল-ব্যাপকত্বও বুঝায় অর্থাৎ যে মুহূর্তে ক্রিয়াটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল সে মুহূর্তে ক্রিয়াটি চলিতেছে, তখনো সমাপ্ত হয় নাই—ক্রিয়া সেই মুহূর্তের কিছু পূর্ববর্তী ও কিছু পরবর্তী সময় অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

The boy is reading—ছেলেটি পড়িতেছে।
Who is reading?
The girl is cooking—মেয়েটি রাঁধিতেছে।
Who is cooking?
The child is drinking—শিশুটি পান করিতেছে।
Who is drinking?
Gopal is selling—গোপাল বিক্রয় করিতেছে।
Who is selling?

Hari is buying—হরি কিনিতেছে।

Who is buying?

LESSON 3

ইংরেজি করো—

ছেলেটি বই পড়ে।

What does the boy do?

What does he read?

মেয়েটি ভাত রাঁধে।

What does the girl do?

What does she cook?

শিশুটি দুধ পান করে।

What does the child do?

What does it drink?

গোপাল ফল বেচে।

What does Gopal do?

What does Gopal sell?

হরি রুটি কেনে।

What does Hari do?

What does Hari buy?

প্রশ্নগুলির উত্তর নেতিবাচক করো।

LESSON 4

ইংরেজি করো—

ছেলেটি বই পড়িতেছে।

What is the boy doing?

What is he reading?

মেয়েটি ভাত রাঁধিতেছে।

What is the girl doing?

What is she cooking?

শিশুটি দুধ পান করিতেছে।

What is the child doing?

What is it drinking?

গোপাল ফল বেচিতেছে।

What is Gopal doing?

What is Gopal selling?

হরি রুটি কিনিতেছে।

What is Hari doing?

What is Hari buying?

LESSON 5

অর্থ করো—

The servant closes the doors.
Mother opens the box.
Tho gardener cuts the tree.
The maid does all your work.

নেতিবাচক করো—

Does the servant close the doors?
Does mother open the box?
Does the gardener cut the tree?
Does the maid do all your work?

The servant is closing the doors.
Mother is opening the box.
The gardener is cutting the tree.
The maid is doing all your work.

Is the servant closing the doors?
Is the mother opening the box?
Is the gardener cutting the tree?
Is the maid doing all your work?
ইহার উত্তর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়রূপে দিতে হইবে।

[প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি নেতিবাচক করা হইলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বাক্যই শিক্ষার্থীর সামনে লিখিয়া রাখিতে হইবে। তার পর প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। দৃষ্টান্ত—'Does the servant close the doors?' এই বাক্যটি লেখা থাকিল। ইহার নেতিবাচক—'Does not the servant close the doors?' ইহাও পাশে বা নিম্নে লেখা থাকিল। তখন প্রথম প্রশ্নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার উত্তরই আদায় করিতে হইবে—Yes, the servant closes the doors. No, the servant does not close the doors. অপর প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত বাক্য দুইটি রচনা করাইতে হইবে। ইতিবাচক—Yes, the servant closes the doors. নেতিবাচক— No, the servant does not close the doors.]

LESSON 6

অর্থ করো—

The pupil does not smile.
The snake does not jump.
The girl does not play.

Aunt does not scold.
The tree does not move.
The wind does not blow.
The fish does not breathe.

The pupil is not smiling.
The snake is not jumping.
The girl is not playing.
His aunt is not scolding.
The tree is not moving.
The wind is not blowing.
The fish is not breathing.

হাঁতিবাচক করো—

Does the pupil smile?
Does the snake jump?
Does the girl play?
Does his aunt scold?
Does the tree move?
Does the wind blow?
Does the fish breathe?

Is the pupil smiling?
Is the snake jumping?
Is the girl playing?
Is his aunt scolding?
Is the tree moving?
Is the wind blowing?
Is the fish breathing?

LESSON 7

Who is he? (ছেলে) Who is she?
Who is he? (It is a child.)
Who are you? Who is that man?
Who is this man? Who am I?
What is he? (ভৃত্য) Who is she?
Who are they? What is that man?
What is that woman?

LESSON 8

to

অর্থ করো—

Madhu comes to my room.
Jadu writes to his father.
Hari sells books to the pupils.
The lotus opens to the sun.
Madhu is coming to my room.
Jadu is writing to his father.
Hari is selling books to the pupils.
The lotus is opening to the sun.

নেতিবাচক করো—

প্রশ্নোত্তর

What does Madhu do?
Does Jadu write to his father?
Does Hari sell books to the pupils?
Does the lotus open to the sun?
Does Madhu come to my room?
What is Madhu doing?
Is Madhu coming to my room?
Is Jadu writing to his father?
Is Hari selling books to the pupils?
Is the lotus opening to the sun?

ইতি ও নেতিবাচক-রূপে উত্তর দিতে হইবে।

LESSON 9

Greedily	লুব্ধভাবে
Loudly	উচ্চস্বরে
Slowly	ধীরে
Swiftly (Quickly)	দ্রুতবেগে
Silently	নীরবে
Brightly	উজ্জ্বলভাবে
Sweetly	মিষ্টভাবে

অর্থ করো—

The dog barks angrily.
The boy laughs loudly.
The girl writes slowly.
The horse runs quickly (swiftly).
The pupil reads silently.
The star shines brightly.
The child smiles sweetly.
The cat eats greedily.

LESSON 10

Present (নিত্যবর্তমান-সূচক)

বাংলায় 'খায়' ও 'খাইতেছে' 'হাসে' ও 'হাসিতেছে' প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ একরূপ নহে। 'খায়' 'হাসে' ইত্যাদি শব্দে 'খাইয়া থাকে' 'হাসিয়া থাকে' ইত্যাদি বুঝায়। শিক্ষক বুঝাইয়া দিবেন. The boy goes to the school বলিলে 'বালকটি স্কুলে যাইতেছে' বুঝায় এবং 'বালকটি স্কুলে গিয়া থাকে' ইহাও বুঝায়।

অনুবাদ করো—

He comes to school every day.
I go to Darjeeling every summer.
They take their meals twice a day.
You get your leave three times a year.
The girl goes to her father's house in the evening.
Our teacher takes his bath early in the morning.
Your nephew returns home late in the evening.
The lion roars fiercely.
The horse runs swiftly.
They write good English.
We drink milk without sugar.
Man comes into the world to learn.
Tigers kill their prey.
Birds fly in the air.
Snakes glide on the earth.
The dog is barking angrily.
The boy is laughing loudly.
The girl is writing slowly.
The horse is running quickly (swiftly).

The pupil is reading silently.
The star is shining brightly.
The child is smiling sweetly.
The cat is eating greedily.

প্রশ্নোত্তর

How does the dog bark?
Does the dog bark gently?
How is the dog barking?
Is the dog barking gently? etc.

ইতিবাচক ও নেতিবাচক উত্তর করিতে হইবে।

LESSON 11

at, in, on

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অনুবাদে at, in এবং on প্রয়োগের প্রভেদ বুঝাইয়া দিতে হইবে।

অনুবাদ করো—

কানাই রান্নাঘরে খায়। (in)
মালতী কুটীরে বাস করে। (in)
তোমাদের শিক্ষক চৌকিতে বসেন। (in)
তাঁহাদের ঘোড়া রাস্তায় দৌড়ায়। (in)
ছাত্রটি বাগানে বেড়ায়। (in)
তাঁহার (স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়ে জানলায় বসে। (at)
আমাদের দারোয়ান (porter) দ্বারে দাঁড়ায়। (at)
তাঁহার ভাই ডেস্কে পড়ে। (at)
হীরা (the diamond) মাতার আংটিতে জ্বলে (shines)। (on)
তারা আকাশে ওঠে। (in)
ফল মাটির উপর পড়ে। (on)

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

Who eats? (কানাই)
Where does he eat?
Does Kanai eat in the yard?

প্রশ্ন

Who is she? (মালতী)
Where does Malati live?
Does she live in a temple? (নেতিবাচক)
Who is that man?
What does the student do? (বাগানে বেড়ায়)
Where does the student walk?
Does he walk on the road? (নেতিবাচক)
Who is this man?
What does the porter do?
Where does he stand?
Does he stand in the hall? (নেতিবাচক)
What is this?
Does the diamond shine?
Where does the diamond shine?
On whose ring does the diamond shine?
Does the diamond shine on the queen's necklace?

LESSON 12

ইংরেজি করো—

মালতী শান্তভাবে কুটীরে বাস করে। (quietly)
আমাদের শিক্ষক ব্যস্তভাবে ক্লাসে আসেন। (busily)
তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধভাবে জানালায় বসেন।
তোমাদের ঘোড়া উন্মত্তভাবে রাস্তায় দৌড়ায়।
তোমার মেয়ে নীরবে শ্লেটে লেখে।
হীরা উজ্জ্বলভাবে আমার ভগিনীর ব্রেসলেটে জ্বলে।

(নেতিবাচক করো)

প্রশ্নোত্তর

Where does Malati live?
How does she live? Does she live noisily?

(উত্তর দিবার সময় সংক্ষেপে 'no' বলিলে চলিবে না। বলিতে হইবে : She does not live noisily but lives quietly.)

What does our teacher do?
How does he come?
Does he come to the football field?
Where does his father sit?

How does he sit?
Does he sit calmly?
What does your horse do?
Where does it run?
Does it run on the roof?
How does it run?
What does your daughter do?
On what does she write?
Does she write on paper?
How does she write?
What does the diamond do?
On what does it shine?
Does it shine on the crown?
How does it shine?

LESSON 13

বহুবচন

The girls laugh.
The beggars beg.
The servants sweep.
The children dance.
The dogs bite.
The birds fly.
The students sleep.
The cows graze.
The flowers bloom.
The fishes swim.
They cry.
We stand. You walk.

Who are they? What do they do?
Do they cry?
What are those men? What do they do?
Do they scold?
What are these men? What do they do?
Do they dance?
Who are they? What do they do?
Do they jump?

What are these animals? What do they do?
Do they play?
What are these? What do they do?
Do they sleep?
Who are these men? What do they do?
Do they read?
What are these animals? What do they do?
Do they run?
What are these? What do they do?
Do they droop?
Are these fishes? What do they do?
Do they float?
What do they do? Do they laugh?
What do we do? Do we sit?
What do we do? Do we run?

একবচন করো।
নেতিবাচক করো।

LESSON 14

ইংরেজি করো (ইতিবাচক ও নেতিবাচক)—

বালিকারা মধুর ভাবে হাসে।
ভিক্ষুকেরা উচ্চস্বরে ভিক্ষা করে।
ভৃত্যেরা মেঝে (floor) ঝাঁট দেয়।
ছেলেরা আঙিনায় (courtyard) নাচে।
কুকুরেরা ভীষণভাবে (fiercely) শৃগালকে কামড়ায়।
পাখিরা ওড়ে এবং গান গায়।
ছাত্রেরা গভীরভাবে (soundly) নিদ্রা দেয়।
গোচারণ ভূমিতে (pasture) গাভীগুলি চরে।
সকালে ফুলগুলি ফোটে।
মাছেরা দ্রুতবেগে (rapidly) সাঁতার দেয়।

প্রশ্নোত্তর

প্রয়োজন বোধ করিলে শিক্ষক একবচনেও প্রশ্নোত্তর করাইবেন—

What do the girls do?
How do they laugh?
Do they laugh harshly?
Who are they? (ভিক্ষুক)
How do they beg? Do they beg gently?

Who are these? What do they do?
Do they pour water?
Do they sweep the street?
What do the boys do?
Do they dance in the school?
Whom do these dog bite?
How do they bite?
Do they bite the goats?
What do the birds do? Do they also sing?
Do they sit silently?
What do the students do? Do they sleep restlessly?
What do the cows do? Where do they graze?
Do they graze in the ricefield?
When do the flowers bloom?
Do they bloom in the night?
How do the fishes swim? Do they swim slowly?

LESSON 15

ইংরেজি করো—

বালকেরা তাহাদের খুড়ার রান্নাঘরে খায়।
বালিকারা প্রাসাদের দ্বারে পৌঁছায় (arrive at)।
তোমার ভৃত্যেরা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়।
আমাদের শিক্ষকেরা স্কুল-ঘরের ডেস্কে বসেন।
তাহাদের ঘোড়াগুলি শহরের রাস্তায় দৌড়ায়।
ছোটো মেয়েরা তাহাদের পিতার বাগানে বেড়ায়।
শিশুরা পড়িবার ঘরে (reading room) তাহাদের পড়া করে।
তাঁহার কন্যারা তাহাদের খাবার ঘরে তাহাদের বন্ধুদের চিঠি পড়ে।

একবচন ও নেতিবাচক করো।
প্রয়োজন বোধ করিলে যথানিয়মে প্রশ্নোত্তর করানো যাইতে পারে।

LESSON 16

বোর্ডে ছাত্রদের সম্মুখে লেখা থাকিবে

do did, write wrote, eat ate, run ran, sit sat, stand stood, shine shone, rise rose, fall fell, drink drank, take took.

অতীত কাল : Past

I did this.
You wrote on the slate.
The boy ran quickly.
The girl stood at the gate.
The baby sat on the floor.
The child drank milk.

Past Continuous : ব্যাপক অতীত কাল

I was doing this.
You were writing on the slate.
The boy was running quickly.
The girl was standing at the gate.
The baby was sitting on the floor.
The child was drinking milk.

নিত্য অতীত : Past (অভ্যাসসূচক)

I used to do this.
You used to write on the slate.
The boy used to run quickly.
The girl used to stand at the gate.
The baby used to sit on the floor.
The child used to drink milk.

LESSON 17

ইংরেজি করো—

বালকটি তাহার কাজ করিয়াছিল।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিয়াছিল।
ভিক্ষুকটি একটি আম খাইয়াছিল।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়িয়াছিল।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিয়াছিলেন।
দারোয়ান দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল।
সূর্য প্রভাতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়াছিল।
তারা সায়াহ্নে দিগন্তে (horizon) উঠিয়াছিল।
ফলটি মাটিতে পড়িয়াছিল।
পাখিটি জল খাইয়াছিল।
ভৃত্যটি টাকা লইয়াছিল (the money)।

LESSON 18

ইংরেজি করো—

বালকটি তাহার কাজ করিতেছিল।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিতেছিল।
ভিক্ষুকটি একটি আম খাইতেছিল।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়াইতেছিল।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিয়াছিলেন।
দারোয়ান দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল।
সূর্য প্রভাতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছিল।
তারা সায়াহ্নে দিগন্তে উঠিতেছিল।
ফলটি মাটিতে পড়িতেছিল।

LESSON 19

বালকটি তাহার কাজ করিত।
মেয়েটি তাহার চিঠি লিখিত।
ভিক্ষুকটি আম খাইত।
ঘোড়াটি মাঠে দৌড়াইত।
শিক্ষকটি চৌকিতে বসিতেন।
দারোয়ান দ্বারে দাঁড়াইত।
সূর্য প্রভাতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিত।
ফল মাটিতে পড়িত।

LESSON 20

প্রশ্নোত্তর

What did the boy do?
Did the boy do his work?
What did the girl do?
What did she write?
Did she write her letter?
What did the beggar do?
What did he eat?
Did the beggar eat a mango?
What did the horse do?
Did it run?
Where did it run?
What did the teacher do?

Did he sit?
Where did he sit?
What did the porter do?
Did he stand?
Where did he stand?
Did the sun shine?
When did the sun shine?
Did the star rise?
Where did the star rise?
When did it rise?
Did the fruit fall?
Where did it fall?
Who drank water?
Did the bird drink water?
What did the bird drink?
What did the servant do?
What did he take?
Did he take money?

LESSON 21

What was the boy doing?
Was the boy doing his work?
What was the girl doing?
What was she writing?
Was she writing her letter?
What was the beggar doing?
What was he eating?
Was the beggar eating a mango?
What was the horse doing?
Was it running?
Where was it running?
What was the teacher doing?
Was he sitting?
Where was he sitting?
What was the porter doing?
Was he standing?
Where was he standing?
Was the sun shining?
When was the sun shining?
Was the star rising?

Where was the star rising?
Was the fruit falling?
Where was it falling?

বহুবচনে অতীত কালে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয় না। উপরের পাঠ বহুবচন করো এবং নেতিবাচক করো।

LESSON 22

The servants firmly close the door.
The students noisily open the window.
The boats quickly reach the shore.
The soldiers silently march along the road.
The peasants slowly walk across the field.
The boys bravely climb upon the tree.
The peacocks gracefully dance in the forest.
The crystals brightly sparkle in the sun.
The carriages suddenly stop near the river.
The children merrily play in the garden.

একবচন করো, নেতিবাচক করো, অতীতকালবাচক করো। উপরিলিখিত পাঠের ক্রিয়াপদের অতীত রূপ বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর : ইতিবাচক ও নেতিবাচক উত্তর

What did the servants do?
Did they close the door?
How did they close the door?
Are these boys students?
Did they open the windows?
How did they open the windows?
Did the boats reach the shore?
How did they reach the shore?
What did the soldiers do?
Did they march?
Where did they march?
How did they march?
What did the peasants do?
Where did they walk?
How did they walk?
What did the boys do?
On what did they climb?
How did they climb?
Who danced?

Where did they dance?
How did they dance?
What did the crystals do in the sun?
How did they sparkle?
Did the carriages stop?
Where did they stop?
How did they stop?
What did the children do?
Where did they play?
How did they play?

LESSON 23

এই ক্রিয়াপদগুলির অতীত রূপ বোর্ডে লিখিতে হইবে।

I stand at the door.*
We meet in the hall.*
You hold the book.
He sings a song.*
They bring a doll.*
She feels pain.
I sleep on the roof.*
He digs the soil in the garden.*
They swim in the river near the village.
She runs to the temple.*

বহুবচন করো। অতীতবাচক ও নেতিবাচক করো।

Did I stand?
Where did I stand?
Did we meet?
Where did we meet?
What did you hold?
Did you hold the book?
Did he sing?
What did he sing?
What did they bring?
Did they bring a doll?
How did she feel?
Did she feel pain?
Did I sleep?
Did I sleep on the roof?
What did he dig?

* চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করো।

Where did he dig?
What did they do?
Did they swim?
Where did they swim?
Did she run?
Where did she run to?

LESSON 24

অনুবাদ করো—

আমি দরজা বন্ধ করি।
তিনি জানালা খোলেন।
তিনি (স্ত্রীলিঙ্গ) তাঁহার কাজ করেন।
তোমার পুতুল ভাঙো।
তাঁহারা চৌকি নাড়ান্।
আমরা দুধ পান করি।
আমি রুটি খাই।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন, বহুবচন, বর্তমান, অতীত।
৬। ক্রিয়ার বিশেষণ-যোগে প্রশ্নোত্তর, উত্তররূপে।

LESSON 25

to

অনুবাদ করো—

The peasant goes to the field.*
The king rides to the temple.*
The porter runs to the market.
The sailor swims to the ship.*
The soldier marches to the town.*
The sparrow flies to its nest.
The pupil hastens to his teachers.*
The clerk comes to his office.*
The log drifts to the sea.
The lark soars to the sky.*

১। বহুবচন করাও।

২। অতীত করাও ও * বাক্যগুলি ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। যথাক্রমে quietly, hurriedly, swiftly, painfully, quickly, eagerly, rapidly, anxiously, slowly, joyously ক্রিয়াবিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।

৫। 'There is'-যোগে বাক্যগুলি নিষ্পন্ন করাও, যথা— There is a peasant who goes to the field; there is a peasant who went to the field. অন্যরূপ, যথা— There is a field which the peasant goes to; there is a field which the peasant went to.

৬। প্রশ্নের নমুনা— Who goes to the field? What does the peasant do? Where does he go? Does the peasant ride to the temple? এইরূপ বহুবচনে, অতীতে।

৭। ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে প্রশ্নোত্তর— বহুবচন, অতীত।

LESSON 26

অনুবাদ করো—

চাষা তাহার প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যাইতেছে।
রাজা শহরের মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে।
মুটে গ্রামের হাটে ছুটিতেছে।
মাল্লা বন্দরের (in the port) জাহাজের দিকে সাঁতরাইতেছে।
সৈন্য শত্রুর শহরে কুচ করিয়া যাইতেছে।
চড়াই তাহার মাতার নীড়ের দিকে উড়িতেছে।
ছাত্র সংস্কৃতের শিক্ষকের কাছে যাইতেছে।
কেরানি তাহার মনিবের আফিসে আসিতেছে।

১। একবচন করাও।

২। অতীত করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। উল্লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণগুলি বসাও।

৫। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি তিন প্রকারে পরিবর্তিত করা যায়, যথা— There is a peasant who goes to the field of the neighbour. There is a neighbour to whose field the peasant goes. There is a neighbour's field (or field of the neighbour) to which the peasant goes.

৬। প্রশ্নের নমুনা— Where does the peasant go? Who goes to the field? To whose field does he go? Does he ride to the temple of the town?— এইরূপে বহুবচনে, ও অতীতে।

৭। ক্রিয়ার বিশেষণ-যোগে প্রশ্নোত্তর।

LESSON 27

অনুবাদ করো—

তিনি ক্ষেত্রে যাইতেছেন।
তিনি মন্দিরে ঘোড়া চড়িয়া যাইতেছেন
তিনি (স্ত্রীলিঙ্গ) শহরে আসিতেছেন।
আমি হাটে দৌড়িতেছি।

তোমরা স্কুলে যাইতেছ।
আমরা জাহাজে সাঁতার দিয়া যাইতেছি।
তারা আকাশে উঠিতেছে।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করাও।
৫। প্রশ্নোত্তর—একবচন, বহুবচন, বর্তমান, অতীত।
৬। ক্রিয়ার বিশেষণ-যোগে প্রশ্নোত্তর, উক্তরূপে।

LESSON 28

into

অনুবাদ করো—

The frog jumps into the well.*
The fireman rushes into the fire.*
The diver dives into the water.*
The cart tumbles into the ditch.*
The thorn pierces into the skin.
The neelde drops into the box.
The river flows into the sea.
The wind blows into the cave.
The crab digs into the sand.
The spire rises into the sky.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও, *চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাক্রমে hurriedly, quickly, deeply, suddenly, painfully, silently, rapidly, strongly, diligently, majestically ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
৫। There is-যোগে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন করাও—বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতে।
৬। প্রশ্নের নমুনা—What does the frog do? What does he jump into? Where does he jump in? Does he jump into the fire?—এইরূপে বহুবচনে, অতীতে।
৭। ক্রিয়ার বিশেষণ-যোগে প্রশ্নোত্তর, অতীত ও বহুবচন।

LESSON 29

অনুবাদ করো—

তুমি কূপে ঝাঁপ দাও।
তিনি আগুনে ছুটিয়া যান।

আমি জলে ডুব দিই।
তিনি নালায় উল্টাইয়া পড়েন।
আমরা গর্তে (hole) পড়ি।
তোমরা মেঘের মধ্যে ওঠ।
তাহারা বালির মধ্যে খোঁড়ে।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

LESSON 30

অনুবাদ করো—

The boy throws his marble into the well.*
The maiden dips her pitcher into the water.*
The sweeper sweeps the dirt into the ditch.*
The doctor thrusts his needle into the skin.*
The gentleman drops the money into the box.*
The boy thrusts his fist into his pocket.
The child pokes its stick into the mud.
The cook puts the coals into the fire.*
The carpenter drives the nail into the wood.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত, Present Continuous করাও। * চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাক্রমে carelessly, hastily, carefully, deftly, suddenly, firmly, quickly, gently, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি ব্যবহার করাও।
৫। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও। অধিকাংশ বাক্যগুলি There is-যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে, যথা—

There is a boy who throws his marble into the well.
There is a marble which the boy throws into the well.
There is a well which the boy throws his marble into.

এইরূপে অতীত।
৬। has-যোগে নিষ্পন্ন করাও, যথা—

The boy has a marble which he throws into the well.
The boy had a marble which he threw into the well.

৭। প্রশ্নের নমুনা—What does the boy do? What does the boy throw his marble into? Where does the boy throw his marble in? Does the boy throw his marble into the ditch?—এইরূপে বহুবচনে, অতীতে।

LESSON 31

অনুবাদ করো—

তুমি কূপের মধ্যে তোমার মার্বেল নিক্ষেপ করো।
তিনি (স্ত্রী) জলের মধ্যে তাঁহার কলসী ডোবান্।
আমি বাক্সের মধ্যে আমার টাকা ফেলি।
তিনি চামড়ার মধ্যে তাঁহার ছুঁচ ফোটান্।
তাঁহারা পকেটের মধ্যে তোমাদের মুষ্টি প্রবেশ করান্।
তাঁহারা পাঁকের মধ্যে তাঁহাদের লাঠি খোঁচান্।
আমরা আগুনের মধ্যে আমাদের কাৎলি বসাই।

১। একবচনকে বহুবচন ও বহুবচনকে একবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

LESSON 32

from

অনুবাদ করো—

The boy plucks the fruit from the tree.*
The dog snatches the cake from the boy.
The servant hangs a lamp from the ceiling.*
The maiden draws water from the well.*
The student fetches an inkpot from the table.*
The merchant buys a desk from the shop.*
The girl takes a pice from the purse.
The groom brings a mare from the stable.*
The school boy steals an egg from the nest.
The monkey breaks a twig from the bough.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও। *চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাক্রমে stealthily, suddenly, carefully, laboriously, quickly, cheaply, quietly, forcibly, silently, cunningly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করাও।
৫। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও। প্রত্যেক বাক্য There is-যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করা যায়। অতীত করাও।
৬। প্রশ্নের নমুনা—What does the boy do? Does he pluck the fruit? What does the boy pluck the fruit from? Does he pluck it from the ceiling?—এইরূপে বহুবচনে, অতীতে।
৭। ক্রিয়ার বিশেষণ-যোগে প্রশ্নোত্তর, অতীতে ও বহুবচনে।

LESSON 33

অনুবাদ করো—

চাকর তাহার কুটীর হইতে খেতে যায়।
রাজা তাঁহার প্রাসাদ হইতে মন্দিরে ঘোড়ায় চড়িয়া যান।
মুটে গ্রাম হইতে হাটে ছোটে।
মাল্লা তীর হইতে তরীর দিকে সাঁতরায়।
সৈন্য পাহাড় (hill) হইতে শহরের দিকে কুচ করিয়া চলে।
চড়াই পাখি ক্ষেত হইতে বাসার দিকে ওড়ে।
ছাত্র খেলার জায়গা (play-ground) হইতে তাহার শিক্ষকের নিকট যায়।
কেরানি তাহার ঘর (home) হইতে আফিসে আসে।
কাষ্ঠখণ্ড নদী হইতে সমুদ্রে ভাসিয়া চলে।
লার্ক্ তাহার বাসা হইতে আকাশে ওঠে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is-যোগে তিন প্রকারে নিষ্পন্ন করাও।

LESSON 34

অনুবাদ করো—

তিনি (স্ত্রী) কূপ হইতে জল ওঠান।
আমি গাছ হইতে ফল পাড়ি।
তুমি বালকের কাছ হইতে কেক্ কাড়িয়া লও।
তিনি ছাদ (ceiling) হইতে শিকল ঝোলান।
আমরা টেবিল হইতে দোয়াত আনি।
তাঁহারা দোকান হইতে ডেস্ক কেনেন।
তোমরা আস্তাবল হইতে ঘোটকী আন।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

LESSON 35

with

অনুবাদ করো—

The potter makes a cup with clay.
The weaver weaves a cloth with his shuttle.

The crow builds his nest with sticks.
The crab digs a hole with his claws.
The carver carves an image with his chisel.
The fisherman catches fish with his net.
The boatman tows the boat with a rope.
The gardener mows the grass with a sickle.
The woodman fells the tree with an axe.
The elephant catches the leopard with his trunk.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাক্রমে deftly, cunningly, cleverly, deeply, beautifully, diligently, laboriously, sharply, gradually, strongly ক্রিয়ার বিশেষণগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করাও।
৫। There is-যোগে তিন প্রকার নিষ্পন্ন করাও।
৬। প্রশ্নের নমুনা—Who makes a cup? What does the potter do? What does the potter make his cup with? Does he make it with his shuttle?

LESSON 36

অনুবাদ করো -

কুমারী তাহার কলসী দিয়া জল তোলে।
মেথর তাহার ঝাঁটা (broom) দিয়া উঠান (court-yard) হইতে ময়লা ফেলে।
শিশু লাঠি দিয়া কাদায় খোঁচা দেয় (poke)।
ডাক্তার তাঁহার ছুঁচ দিয়া চামড়া (skin) বেঁধেন।
ছুতার তাহার হাতুড়ি দিয়া কাঠে পেরেক ঠোকে।
কুকুর তাহার দাঁত দিয়া বিড়ালকে কামড়ায়।
চৌকিদার তাহার মুষ্টি (fist) দিয়া চোরকে মারে।
বালক তাহার লাঠি দিয়া পুতুল ভাঙে।
দরজি তাহার কাঁচি দিয়া কাপড় কাটে।
বালক একটি আঁকড়সি (hook) দিয়া ফল ছেঁড়ে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাইতে হইবে।

LESSON 37

অনুবাদ করো—

আমি চাক দিয়া পেয়ালা গড়ি।
সে (স্ত্রী) তাঁত দিয়া কাপড় বোনে।
তুমি বাটালি দিয়া মূর্তি খোদো।
সে জাল দিয়া মাছ ধরে।
আমরা কাস্তে দিয়া ঘাস কাটি।
তোমরা দাঁড় দিয়া নৌকা চালাও।
তাহারা কুড়াল দিয়া গাছ কাটে।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

LESSON 38

for

অনুবাদ করো—

The potter makes a cup for his father.
The tailor cuts the cloth for his man.
The baker bakes bread for his dinner.
The boatman rows the boat for his master.
The fisherman catches fish for his family.
The boy takes his bat for a game.
The girl fetches water for her mother.
The student brings the book for his lesson.
The servant goes to his master for wages.
The milkman sells milk for money.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। যথাক্রমে obediently, quickly, slowly, laboriously, diligently, secretly, hastily, willingly, anxiously, daily ক্রিয়ার বিশেষণ প্রয়োগ করাইবে। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৫। প্রশ্নের নমুনা—What does the potter do? Who makes the cup? Whom does he make the cup for?

LESSON 39

অনুবাদ করো—

ছাত্র তাহার শিক্ষকের জন্য চৌকি আনে।*
মাতা তাহার শিশুর জন্য বিছানা করে।*
গ্রামবাসী (villager) তাহার পরিবারের জন্য কুটীর নির্মাণ করে।*
বণিক তাহার আফিসের জন্য ডেস্ক কেনে।*
স্বামী তাহার স্ত্রীর জন্য এক জোড়া (pair) ব্রেস্‌লেট্ লয়।*
ঘোড়া যুদ্ধের (war) জন্য কামান টানে।
কন্যা রান্নাঘরের জন্য চাল আনে।*
কাক তাহার বাসার জন্য কাঠিকুঠি (twigs) বহন করে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও। *চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও।

LESSON 40

অনুবাদ করো—

তুমি তোমার পিতার জন্য পেয়ালা গড়।
আমি আমার মজুরদের জন্য কাপড় কাটি।
সে (স্ত্রী) তাহার প্রভুর জন্য রুটি গড়ে।
আমরা আমাদের পাঠের জন্য বই আনি।
তাহারা তাহাদের বেতনের জন্য মনিবের কাছে যায়।
তোমরা তোমাদের মনিবের জন্য দাঁড় টান।

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।

LESSON 41

বিকল্পে to এবং for

অনুবাদ করো—

The tailor makes a coat to sell. [বিকল্পে for selling]†
The cook makes some cakes to eat.

†এইরূপ এই পাঠের অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিতে।

The blacksmith makes a razor to shave with.†
The boy brings a cap from the drawer to put on.
The cat catches a mouse to feed on.
The maid lights a fire in the kitchen to cook.
The master buys a horse from the mart to ride on.
The girl gets a doll from her mother to play with.
The fox digs a hole in the ground to hide in.
The student borrows a book from his friend to read.

১। বহুবচন করাও। (উভয় রূপে)
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও। (উভয় রূপেই)
৩। নেতিবাচক করাও। (উভয় রূপেই)
৪। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও। (উভয় রূপেই)
৫। প্রশ্নের নমুনা— Who makes a coat? For what does he make the coat? Does the tailor make a coat to eat? এইরূপ বহুবচনে, অতীত ও ভবিষ্যতে।

LESSON 42

অনুবাদ করো—

কাক বাস করিবার জন্য (to dwell in) বাসা তৈরি করে।
রুটিওয়ালা আহারের জন্য রুটি প্রস্তুত করে।*
জেলে বেচিবার জন্য নদী হইতে মাছ ধরে।*
বালক খেলিবার জন্য তাহার বাক্স হইতে মার্বেল আনে।*
কাঠুরিয়া পোড়াইবার জন্য (burn) তাহার কুড়াল দিয়া কাঠ কাটে।*
সৈন্য হত্যা করিবার জন্য দোকান হইতে বন্দুক কেনে।
মাছরাঙা (kingfisher) মাছ ধরিবার জন্য জলের মধ্যে ডুব দেয়।
ছাত্র লিখিবার জন্য টেবিল হইতে কলম আনে।*
খুড়া সাঁতরাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে।*
The carpenter makes a chair to sell it to my father.
The driver harnesses a horse to drive him to the market.
The peasant goes to the town to sell his corn to the merchant.
The sweeper sweeps the dirt into the ditch to clean the room.
The cook brings water to the kitchen to boil the rice.
The girl calls the cat to feed it with milk.
শিশু তাহার পাঠ লইবার জন্য স্কুলে আসে।*
কুমারী জল লইবার জন্য কূপে যায়।*
রাজা পূজা করিবার জন্য (pray) ঘোড়ায় চড়িয়া মন্দিরে যান।*

---

† with প্রভৃতি prepositionগুলির অর্থসংগতি ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। বুঝাইবার সময় বাক্যগুলিকে— A man shaves, A man shaves with a razor, The blacksmith makes a razor to shave with এইরূপে ভাঙিয়া লইতে হইবে।

মুটে তরকারি (vegetables) কিনিবার জন্য হাটে দৌড়ায়।
সৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য (fight) শহরে কুচ করিয়া যায়।
চড়াই তাহার বাচ্ছাদের (young ones) খাওয়াইবার জন্য নীড়ে উড়িয়া যায়।
রানী ফুল সংগ্রহ করিবার (gather) জন্য গাড়ি করিয়া বাগানে যান (drive)।*

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও। *চিহ্নিতগুলি ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও।

LESSON 43

with (সহিত)

অনুবাদ করো—

The boy comes to the school with his brother.†
The maiden goes to the well with her pitcher.
The sparrow flies to its nest with food.
The soldier marches to the town with his gun.
The king drives to the temple with his queen.
The woman runs to the market with vegetables.
The student hastens to his teacher with his books.
The gardener comes to the garden with his spade.
The hunter rides to the wood with his spear.
The peasant goes to the field with his plough.

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৫। উল্লিখিত উভয় প্রকারে প্রশ্নোত্তর। প্রশ্নের নমুনা—Who comes? Where does he come? Whom does he come with? Who goes? Where does he go? What has she with her?

LESSON 44

অনুবাদ করো—

কাঠুরিয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে কুড়াল দিয়া কাঠ কাটে।
কুমারী তাহার মাতার সঙ্গে কলসী করিয়া জল আনে।
গ্রামবাসী মিস্ত্রীর সঙ্গে ইঁট দিয়া মন্দির গড়ে।

---

† এইসঙ্গে without শব্দটির ব্যবহারও শিখাইতে হইবে।

স্বামী তাহার স্ত্রীর সহিত তাঁত দিয়া একখানা কাপড় বোনে।
দরজি তাহার মজুরদের (men) সঙ্গে কাঁচি দিয়া কাপড় কাটে।
কৃষক তাহার পুত্রের সহিত লাঙল দিয়া খেত চষে (tills)।
বালক তাহার বন্ধুদের সঙ্গে মার্বেল লইয়া খেলে।
রাজা তাঁহার সৈন্যসহ কামান দিয়া লড়েন।
প্রভু তাঁহার ভৃত্যদের সঙ্গে একটা শিকল দিয়া হাতি বাঁধেন।
শিকারি তাহার অনুচরদের সঙ্গে বর্শায় করিয়া বাঘ মারে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও।

LESSON 45

participle-যোগে by

অনুবাদ করো—

The woodman makes a path by cutting down the trees.*
The tailor makes his living by selling coats.
The beggar maintains himself by begging his food.
The fisherman catches fish by casting his net.
The porter earns money by carrying wood.
The servant cools the room by sprinkling water.
The tortoise saves its life by jumping into the river.
The cowherd fastens the ox by tying him to a post.
The peasant prepares his meal by boiling rice.
The traveller makes a fire by burning the dry grass.
The dog shows his delight by wagging his tail.

১। বচনান্তর করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। নেতিবাচক করাও।
৪। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৫। to-যোগে নিষ্পন্ন করাও, যথা— The woodman cuts the trees to make a path. বিকল্পে for-যোগে, যথা— The woodman cuts the trees for making a path.
৬। প্রশ্নোত্তর।

---

* বলা আবশ্যক এইরূপ sentence, by-যোগে এবং by বাদ দিয়াও শুদ্ধ participle দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। বাংলাতেও এরূপ হয়, যথা— 'কাঠুরিয়া বৃক্ষ কর্তনের দ্বারা পথ প্রস্তুত করিতেছে' এবং 'কাঠুরিয়া কাঠ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছে।'

LESSON 46

অসমাপিকা ক্রিয়া

অনুবাদ করো—

The gentleman, coming into the room, shut the door.*
The lady, going into the shop, bought some silk.
The horse, jumping into the ditch, broke his leg.
The child, falling into the mud, began to cry.
The dog ran to the stable barking.
The tiger, falling upon his prey, killed it.
The baby smiled lying on its back.
The watch-man, climbing up the tree, saw the fire.
The beggar came to beg, singing.
The girl, stretching her arms, ran to her mother.
The woman, spreading her mat, tried to sleep.

১। একবচন করাও।
২। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। There is-যোগে নিষ্পন্ন করাও।
৪। and-যোগে নিষ্পন্ন করাও। যথা— The gentleman came into the room and shut the door.

LESSON 47

অনুবাদ করো—

শিক্ষক চৌকিতে বসিয়া তাঁহার ক্লাসকে শিক্ষা দেন (teaches)।
খোকা বিছানায় শুইয়া তাহার দুধ খায়।
বালক তাহার বই বহন করিয়া স্কুলে যায়।
ছেলেটি প্রদীপ নিবাইয়া (put out) তাহার বিছানায় যায়।
পাখি তাহার ডানা ছড়াইয়া (stretch) দিয়া উড়িতে আরম্ভ করে।
হাতি তাহার শুঁড় তুলিয়া জলে ডুব দেয়।
উত্তর হইতে আসিয়া সৈন্যগণ পূর্বদিকে কুচ করিয়া যাইতেছে।
জলে ঝাঁপ দিয়া মাল্লা জাহাজের দিকে সাঁতরাইতেছে।
লাঙ্গল লইয়া চাষা মাঠে যাইতেছে।

১। বহুবচন করাও।
২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।
৩। and-যোগে নিষ্পন্ন করাও।

---

*এইরূপ sentence ত্রয়োদশ পাঠের sentence-এর মতো বিকল্পে by দিয়া নিষ্পন্ন করা যায় না।

LESSON 48

অসমাপিকা অন্যরূপ (করিতে করিতে)

The queen walks in the garden gathering flowers.
The woman takes her food basking in the sun.
The maiden does her work smiling and singing.
The child takes its bath weeping and screaming.
The reaper works in the field singing a song.
The dog wagging his tail, licked his master's hand.
The boys left their school making great noise.
The birds hopped about in the sun twittering.
Foaming and eddying the river rushed on.
Galloping his horse the soldier entered the town.

১। অতীতকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

২। যে যে sentence-এ while যোগ করা চলে তাহাতে while যোগ করাও, যথা— While walking in the garden the queen gathered flowers.

LESSON 49

Perfect Tense

অনুবাদ করো—

The boy has eaten his dinner.
The children have read their books.
I have done my work.
He has cried before his father.
You have stood behind the hedge.
They have laughed without reason.
His daughter has written a letter.
The fruit has fallen on the ground.
The diamond has sparkled upon the ring.
The star has risen into the sky.
The student has walked along the road.
The horses have run across the meadow.
The boy has sat beside his father.

১। বচন-পরিবর্তন করাও।

২। অতীত ও ভবিষ্যৎ করাও।

৩। নেতিবাচক করাও।

৪। ক্রিয়াগুলি is -ing রূপে পরিবর্তিত করাও। is -ing ও has-যোগে অর্থের কিরূপ প্রভেদ হয় তাহা বহুতর দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে হইবে। tense-পরিবর্তনের সময় প্রত্যেকবার বাঙলাটি বলাইয়া লইবে।

এই ভাগের ইংরেজি বাংলা সমস্ত present ক্রিয়াগুলি perfect করাইয়া লইবে এবং নানাপ্রকারে tense-পরিবর্তন ও সম্ভবপর স্থানে অন্যান্য পরিবর্তন করাইয়া লইবে।

LESSON 50

Let

অনুবাদ করো—

Let me read now.
Let Madhu go.
Let the servant come in.
Let her write a letter to her mother.
Let the car pass.
রাম তাহার সহিত বাজারে যাক।
ঐ ছবিখানা প্রথম দেখা যাক। (Let us)
বৃষ্টি থামুক।
এই বইখানা কিনি, ওখানা ভালো নয়।
এই জানলাটা খুলিয়া দিই। (Let me)
চিঠিখানা টেবিলের উপর থাকুক (lie)।

Let-যোগে এইরূপে আরও বাক্য রচনা করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 51

অনুবাদ করো—

You look tired.
The flower looks pale.
The stone feels hard.
The food tastes well.
Shanti looks healthy.
The floor feels rough.
Quinine tastes bitter.
This curry tastes hot.
এই বালকগুলি দেখিতে সুস্থ।
এই শিশি'র (in the bottle) ঔষধ খাইতে কটু।
শিরিস কাগজ (sand-paper) খসখসে।
মহিলাটিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে।
এই টেবিলখানা মসৃণ (smooth) বোধ হইতেছে।
কেকগুলি মিষ্ট লাগিতেছে।

The teacher makes the student do his lessons.
The mother makes her daughter do some work in the kitchen.

The child sets the bird free.
The driver sets the car moving.

এইরূপে look, taste, feel, make, set প্রভৃতি ক্রিয়া-যোগে সচরাচর-প্রচলিত ইংরেজি idiom অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 52

can

অনুবাদ করো—

Fish can swim in the water.
Birds can fly in the air.
I can jump from that branch of the tree.
She can bring the book from her room.
The carpenter can make a chair for me.

আমাদের দরজি কোট তৈয়ারি করিতে পারে।
চড়াই তাহার নীড়ের দিকে উড়িতে পারে।
শিশু টেবিল হইতে দোয়াত আনিতে পারে।
এই বালকেরা নীরবে পড়িতে পারে।
আমার ভগিনী দ্রুতবেগে লিখিতে পারে।

১। বচনান্তর করাও।
২। প্রশ্নোত্তর।

পরিশিষ্ট (ক)

LESSON 2

এই পাঠের শিক্ষাপ্রণালী প্রথম পাঠের অনুরূপ।

LESSON 3

ব্ল্যাকবোর্ডে প্রথম বাংলা বাক্যটি লিখিতে হইবে। অনুবাদ করানো হইলে ইংরেজি বাক্যটিও লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইবে। 'What does the boy do?' ইহার উত্তরে 'The boy reads' এবং 'What does he read?' ইহার উত্তরে 'He reads the book'—এই প্রকার অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 4

এই পাঠের শিক্ষাপ্রণালী তৃতীয় পাঠের অনুরূপ।

LESSON 6

এই পাঠের প্রথম অংশের বাক্যগুলি ইতিবাচক করাইতে হইবে। প্রথম বাক্যটি ইতিবাচক করা হইলে 'The pupil smiles' এই বাক্যটিকে অবলম্বন করিয়া 'Does the pupil smile?' এই প্রশ্নের উত্তরে—'Yes, he smiles' এই বাক্যটি রচনা করাইয়া লইতে হইবে। 'The pupil does not smile' এই বাক্য সম্পর্কেও ঐ একই প্রশ্ন করিয়া—'No, he does not smile' এই উত্তর আদায় করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে প্রশ্নবাচক বাক্যগুলির উত্তর একে একে অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রত্যেক বাক্যই প্রথমে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করিতে হইবে।

LESSON 7

কোন চিত্র অবলম্বনে অথবা ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া এই পাঠের প্রশ্নগুলির উত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 8

ষষ্ঠ পাঠের অভ্যাসপ্রণালী প্রয়োজনমত কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া বর্তমান পাঠেও প্রয়োগ করিতে হইবে।

LESSON 10

এই পাঠের প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইবার সময় নবম পাঠের বাক্যগুলিও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিতে হইবে। এক একটি বাক্য লেখা হইলে প্রশ্নোত্তর করানো আরম্ভ হইবে।

LESSON 11

বাংলা বাক্যের ইংরেজি অনুবাদ করানো হইলে, ইংরেজি বাক্যটি বোর্ডে লিখিতে হইবে। তাহার পর নমুনার অনুরূপ প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 12

একাদশ পাঠের প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

LESSON 13

ইতিবাচক বাক্যগুলি বোর্ডে লিখিয়া প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। শেষ বাক্য দুইটি (We stand ও You walk) অভিনয় করাইয়া প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে।

LESSON 14

একাদশ পাঠের প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

LESSONS 16, 17, 18, 19, 20 & 21

এই কয়েকটি পাঠ একত্র ভাবিতে হইবে। ষোড়শ পাঠের বাক্যগুলি বাংলায় অনুবাদ করাইয়া প্রয়োগের বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিতে হইবে। সপ্তদশ পাঠের বাক্যগুলির ইংরেজি অনুবাদ করাইয়া বোর্ডে লিখিয়া রাখিতে হইবে; তৎপর বিংশ পাঠের প্রশ্নোত্তর অভ্যাস করাইতে হইবে। এইরূপে অষ্টাদশ ও একবিংশ পাঠও একত্রে অভ্যাস করাইতে হইবে।

পরিশিষ্ট (খ)

শব্দগুলি বোর্ডের উপর লিখিত থাকিবে। এই শব্দযোগে ছোটো ছোটো বাক্য রচনা করিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয় দেখিবেন যে বাক্যগুলির মধ্যে একটি সংলগ্ন চিন্তার ধারা রক্ষিত হয়।

Morning

Dark, Night, Pass, Fade, Day, Dawn, Break, Wake up, Awake, Feel, Fresh, Lazy, Like, Hate, Leave, Bed, Wash, Face, Mouth, Hands, Teeth, Brush, Fresh, Clothes, Well, Bed, Make, Morning, Breeze, Cool, Cold, Shiver, Room, Clean, Floor, Sweep, Slowly, Quickly, Briskly, Carefully, Outside, Go, Find, Grass, Wet, Dew, Bud, Open.

A Meal

Meal, Cook, Together, Single, Alone, Take, Serve, Much, Little, Eat, Food, Hungry, Thirsty, Drink, Hot, Cold, Rice, Water, Boiled, Fish, Butter, Vegetables, Curry, Hot, Sugar, Salt, Slowly, Hurriedly, Willingly, Unwillingly, Greedily, Finish, Wash, Mouth, Teeth.

A Class

School, Time, Collect, Take, Book, Pencil, Pen, Fountain pen, Exercise book, Carry, Put, Together, Start, Hear, Bell, Ring, Run, Walk, Arrive, Late, Timely, Very, Little, Other, Boy, Girl, Already, Absent, Present, Teacher, Mistress, Come, Stand, All, Tidy, Shabby, Lesson, Work, Begin, Open, Write, Recite, Poem, Prose, Well, Badly, Loudly.

Bath

Bath, Room, Well, Pond, Lake, River, Sea, Carry, Take, Change, Put on, Far, Near, Hot, Cold, Water, Bucket, Cistern, Soap, Towel, Wet, Dry, Fresh, Feel, Bath, Bathe, Dip, Hair, Scrub, Use, Clothes, Old, Fresh, Eyes, Smart, Carefully, Carelessly, Go.

Fever

Fever, Headache, High, Slight, Feel, Shiver, Chilly, Lie, Cover, Clothes, Warm, Best, Doctor, Visit, Fees, Thermometer, Measure, Record, Temperature, Degree, Ordinary, Solid, Liquid, Light, Diet, Food, Stop, Mother, Sister, Nurse, Patiently, Attend, Impatient, Wear, Bed, High, Low.

A Picnic

Go, Picnic, Boys, Girl, Meet, Early, Morning, Together, Carry, Food-stuff, Vegetable, Sweets, Uncooked, Green, Hire, Cart, Walk, Mile, Near, Lake, Tank, River, Cook, Open-air, Sit, Row, Bathe, Late, Hungry, Silently, Slowly, Swiftly, Cold, Warm, Hot.

Dressing a Cut

Knife, Glass, Broken, Sharp, Cut, Finger, Toe, Blood, Bleed, Flow, Much, Little, Quickly, Take, Hospital, Wash, Clean, Well, Clumsily, Neatly, Bandage, Stop, Smart, Pain, Doctor, Assistant, Septic, Antiseptic, Lotion, Ointment.

Translation

মা,

আজ আমাদের স্কুল খুলিয়াছে। শিক্ষকেরা সকলে এখানে আসিয়াছেন। যদু ও বিনোদ অনুপস্থিত। তাহারা অসুস্থ। সব ঘরগুলি চুনকাম করা হইয়াছে। এখন আমি আমার নিজের কাজ করি। ঘর ঝাঁট দিই, বিছানা করি ও নিজের কাপড় ধুই। এটা আমার বেশ লাগে। আমাদের নতুন একজন ভূগোলের শিক্ষক আসিয়াছেন। তিনি খুব হাসিখুশি। ছেলেদের খুব ভালোবাসেন, কখনো রাগ করেন না। তিনি আজ বিকেলে আমাদের আফ্রিকার বন্য পশুপাখির ছবি দেখাইবেন। তাহার মধ্যে অনেক ভয়ংকর জানোয়ারের ছবি আছে। অঙ্কের মাস্টার মশায় আগামী কাল আসিবেন। তিনি বড়ো কড়া লোক। সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। তাড়াতাড়ি আমায় চিঠি লিখিয়ো। ইতি—

সেবিকা অমিতা

দিদি,

কাল আমরা কোপাই নদীর পারে পিক্‌নিকে যাব। ঠাকুর চাকর সঙ্গে যাবে না, আমরা নিজেরাই রান্না করব। চাল ডাল তরকারি তেল ঘি ও মসলা সবই আজ সকালবেলা কিনেছি। আমরা সবসুদ্ধ (all together) একুশজন। একটা গোরুর গাড়ি ভাড়া করেছি। সেটা কাল খুব সকালে আসবে। জিনিসপত্র সেটায় তুলে দেব। আমরা হেঁটে যাব। অনেক দূর যখন যাই তখন আমরা গান করি। তাই আমরা ক্লান্ত হই না। আমার বন্ধু শান্তি খুব ভালো গান করে। সেও আমাদের সঙ্গে যাবে। আমার গলা ভাঙা। এখন সন্ধ্যা ৯টা বেজেছে। শুতে যাচ্ছি। কাল খুব ভোরে উঠব। ইতি—

স্নেহের বীণা

মা,

এখন এখানে বেশ শীত। বড়দিনের ছুটিতে এখানে মেলা হবে। অনেক লোক জড়ো হয়। কেউ কাছ থেকে আসে, কেউ বা অনেক দূরের। মেলা দু-দিন ধ'রে হয়। অনেকে প্রথম দিন বাড়ি ফেরে না। তারা পাশের গ্রাম থেকে শুক্‌নো খড় নিয়ে আসে। তাই রাত্রে মাটিতে বিছায়। তার উপরে শুয়ে রাত কাটায়। ওদের কেন অসুখ হয় না? কখনো বা ওরা দিনের বেলায় শুক্‌নো ডাল ও গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ ক'রে রাখে। রাত্রে আগুন জ্বালায়। আগুনের চারি দিকে ঘিরে বসে। দোকানগুলো সারারাত খোলা থাকে। একদল স্বেচ্ছাব্রতী (volunteer) মেলা পাহারা দেয়।

তুমি ও রানী এবার এসো। আমার গরম শালটা সঙ্গে এনো। আমি স্টেশনে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। ইতি—

প্রণতা উমা

ওরে তোরা কি জানিস্‌ কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা দিবস রজনী নাচে
তাহা শিখেছে কাহার কাছে?
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে ব'সে দুলে?
আমি ব'সে ব'সে তাই ভাবি—
নদী কোথা হতে এল নাবি?
কোথায় পাহাড়-সে কোন্‌খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে?
কেহ যেতে পারে তার কাছে?
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে?
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশু-পাখিদের বাস।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের (children of the house) মতো।
সেথায় বাস করে শিং-তোলা (upraised horns)
যত বুনো ছাগ দাড়িঝোলা (with hanging beard)।
সেথায় মানুষ নূতনতরো—
তাদের শরীর (limbs) কঠিন বড়ো,
তাদের চোখ দুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা,
তারা পাহাড়ের ছেলেমেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে,
তারা সারা দিনমান খেটে
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে,
তারা চড়িয়া শিখর (mountaintop)-'পরে
বনের (wild) হরিণ শিকার করে।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
কোথাও চাষীরা করিছে চাষ (till),
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস।
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিস দিয়ে দিয়ে নাচে।
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে।
সেথা মহিষের দল থাকে
তারা লুটায় (wallow) নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তারা দাঁত (tusk) দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে
রাতে হুয়া হুয়া ক'রে ডাকে।

যেদিন পূর্ণিমা রাত আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে—

সবাই ঘুমায় কুটীরতলে,
তরী একটিও নাহি চলে,
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে
জলে নাহি ঢেউ ওঠে পড়ে।

হোথায় গহন গভীর বন
তাহে নাহি লোক নাহি জন,
শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথায় দেখা যায় চিতা বাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।

সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়। গাছের তলায় অন্ধকার। পুকুরের জল কালো দেখাচ্ছে। বুড়ি নদীর ধারে চুপড়ি নিয়ে শাক তুল্‌ছে। হাট থেকে কানাই ফিরে আসে। চাষীরা মাঠের থেকে ফিরে আস্‌ছে। সন্ধ্যার তারা জ্বল্‌ছে। ছেলেরা তাদের মার কাছে এল। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। মেয়েরা ঘরের দুয়ারে প্রদীপ জ্বালল। পাখিরা বাসায় ফিরে এসেছে। শেয়ালগুলো জঙ্গলে ডাক্‌ছে। বাদুড়গুলো দলে দলে উড়ে চলেছে।

অ আ

ছোটো খোকা বলে অ আ
শেখে নি সে কথা কওয়া।

ই ঈ

হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ
বসে খায় ক্ষীর খই।

উ ঊ

হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ
ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ।

ঋ

ঘন মেঘ বলে ঋ
দিন বড়ো বিশ্রী।

এ ঐ

বাটি হাতে এ ঐ
হাঁক দেয় দে দৈ।

ও ঔ

ডাক পাড়ে ও ঔ
ভাত আনো বড়ো বৌ।

ক খ গ ঘ

ক খ গ ঘ গান গেয়ে
জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।

ঙ

চরে ব'সে রাঁধে ঙ
চোখে তার লাগে ধোঁয়া।

চ ছ জ ঝ

চ ছ জ ঝ দলে দলে
বোঝা নিয়ে হাটে চলে।

ঞ

খিদে পায় খুকি ঞ
শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ কিয়োঁ।

ট ঠ ড ঢ

ট ঠ ড ঢ করে গোল
কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল।

ণ

বলে মূর্ধন্য ণ,
চুপ করো, কথা শোনো।

ত থ দ ধ

ত থ দ ধ বলে, ভাই
আম পাড়ি চলো যাই।

ন

রেগে বলে দন্ত্য ন
যাব না তো কক্ষনো।

প ফ ব ভ

প ফ ব ভ যায় মাঠে
সারাদিন ধান কাটে।

ম

ম চালায় গোরু-গাড়ি
ধান নিয়ে যায় বাড়ি।

য র ল ব

য র ল ব ব'সে ঘরে
এক-মনে পড়া করে।

শ ষ স

শ ষ স বাদল দিনে
ঘরে যায় ছাতা কিনে।

হ ক্ষ

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ
কোণে ব'সে কাশে খ ক্ষ।

প্রথম পাঠ

বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখি।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।
বাঘ আছে আম-বনে।
গায়ে চাকা চাকা দাগ।
পাখি বনে গান গায়।
মাছ জলে খেলা করে।
ডালে ডালে কাক ডাকে।
খালে বক মাছ ধরে।
বনে কত মাছি ওড়ে।
ওরা সব মৌ-মাছি।
ঐখানে মৌ-চাক।
তাতে আছে মধু ভরা।

আলো হয়,
গেল ভয়।
চারি দিক
ঝিকি মিক্‌।
বায়ু বয়
বনময়।
বাঁশ গাছ
করে নাচ।
দিঘিজল
ঝলমল্‌।
যত কাক
দেয় ডাক।
খুদিরাম
পাড়ে জাম।
মধু রায়
খেয়া বায়।

জয়লাল
ধরে হাল।
অবিনাশ
কাটে ঘাস।
ঝাউডাল
দেয় তাল।
বুড়ি দাই
জাগে নাই।
হরিহর
বাঁধে ঘর।
পাতু পাল
আনে চাল।
দীননাথ
রাঁধে ভাত।
গুরুদাস
করে চাষ।

দ্বিতীয় পাঠ

রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি।

জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে নাল ফুল।

ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধুনা।

পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মালা নিয়ে ছোটে। ছোটো খোকা দোলা চ'ড়ে দোলে।

থালা-ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা-ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা।

রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। সাত দিন ছুটি। তিন ভাই মিলে খেলা হবে।

কালো রাতি গেল ঘুচে,
আলো তারে দিল মুছে।
পুব দিকে ঘুম-ভাঙা।
হাসে উষা চোখ-রাঙা।
নাহি জানি কোথা থেকে
ডাক দিল চাঁদেরে কে।
ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি
চাঁদ তাই যায় বুঝি।

তারাগুলি নিয়ে বাতি
জেগে ছিল সারা রাতি,
নেমে এল পথ ভুলে
বেলফুলে জুঁইফুলে।
বায়ু দিকে দিকে ফেরে
ডেকে ডেকে সকলেরে।
বনে বনে পাখি জাগে,
মেঘে মেঘে রঙ লাগে।
জলে জলে ঢেউ ওঠে,
ডালে ডালে ফুল ফোটে।

তৃতীয় পাঠ

ঐ সাদা ছাতা। দাদা যায় হাটে। গায়ে লাল জামা। মামা যায় খাতা হাতে। গায়ে সাদা শাল।

মামা আনে চাল ডাল। আর কেনে শাক। আর কেনে আটা।

দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আনা দিয়ে। আর, আখ আর জাম চার আনা। বাবা খাবে। কাকা খাবে। আর খাবে মামা। তার পরে কাজ আছে। বাবা কাজে যাবে।

দাদা হাটে যায় টাকা হাতে। চার টাকা। মা বলে, খাজা চাই, গজা চাই, আর ছানা চাই। আশাদাদা খাবে।

আশাদাদা আজ ঢাকা থেকে এল। তার বাসা গড়পারে। আশাদাদা আর তার ভাই কালা কাল ঢাকা ফিরে যাবে।

নাম তার মোতিবিল, বহু দূর জল,
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ্ ক'রে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে, ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকাবাঁকা।
কোথাও বা ধানখেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারিগান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।

চতুর্থ পাঠ

বিনিপিসি, বামি আর দিদি ঐ দিকে আছে। ঐ যে তিনজনে ঘাটে যায়।

বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি নিয়ে নিজে ঘটি মাজে। রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিনদিন কাশি। তার কাছে আছে মা, মাসি আর কিনি।

চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলখেত। তার পরে তিসিখেত। তার পরে দিঘি। জল খুব নীল। ধারে ধারে কাদা। জলে আলো ঝিলিমিলি করে। বক মিটি-মিটি চায় আর মাছ ধরে।

ঐ যে বামি ঘটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ভাই, ঘড়ি আছে কি? দেখি। ছ'টা যে বাজে, আর দেরি নয়। এইবার আমি বাড়ি যাই। তুমি এসো পিছে পিছে। পাখি খাবে, দেখো এসে।

এ কী পাখি? এ যে টিয়া পাখি। ও পাখি কি কিছু কথা বলে? কী কথা বলে? ও বলে রাম রাম, হরি হরি। ও কী খায়? ও খায় দানা। রানীদিদি ওর বাটি ভ'রে আনে দানা। বুড়ি দাসী আনে জল।

পাখি কি ওড়ে? না, পাখি ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি। ও আগে ছিল বনে। বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জল খেত। দীনু এই পাখি পোষে।

—

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দিঘি তার মাঝখানটিতে,
তালবন তারি চারি ভিতে।
বাঁকা এক সরু গলি বেয়ে
জল নিতে আসে যত মেয়ে।
বাঁশগাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে,
ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে।
পথের ধারেতে একখানে
হরি মুদি বসেছে দোকানে।
চাল ডাল বেচে তেল নুন,
খয়ের সুপারি বেচে চুন।
ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ি,
খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি।
বিধু গয়লানী মায়ে পোয়
সকাল বেলায় গোরু দোয়।
আঙিনায় কানাই বলাই
রাশি করে সরিষা কলাই।
বড়োবউ মেজোবউ মিলে
ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।

পঞ্চম পাঠ

চুপ ক'রে ব'সে ঘুম পায়। চলো, ঘরে আসি। ফুল তুলে আনি।

আজ খুব শীত। কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়। দুখি বুড়ি উনুন-ধারে উবু হয়ে ব'সে আগুন পোহায় আর গুন্ গুন্ গান গায়।

গুপী টুপি খুলে শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওকে চুপি চুপি ডেকে আনি। ওকে নিয়ে যাব কুলবনে। কুল পেড়ে খাব। কুলগাছে টুনটুনি বাসা ক'রে আছে। তাকে কিছু বলি নে।

আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুশি। সেও যাবে কুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়ি ভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভ'রে নিয়ে বাড়ি যাব। উমা খুশি হবে। উষা খুশি হবে। বেলা হল। মাঠ ধু ধু করে। থেকে থেকে হু হু হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে। চুনি মালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু।

—

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিক্‌চিক্‌ করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিখের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।
আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।
আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো—
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,
ঘোলাজলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

ষষ্ঠ পাঠ

বেলা যায়। তেল মেখে জলে ডুব দিয়ে আসি। তার পরে খেলা হবে।

একা একা খেলা যায় না। ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়।

ঐ-যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বংশী সেন। আর ঐ-যে আসে মধু শেঠ আর খেতু শেঠ। ফুটবল খেলা খুব হবে।

বল নেই। গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব। তেলিপাড়া মাঠে গিয়ে খেলা হবে।

খেলা সেরে ঘরে ফিরে যাব। দেরি হবে না।

বাবা নদী থেকে ফিরে এলে তবে যাব। গিয়ে ভাত খেয়ে খাতা নেব। লেখা বাকি আছে।

এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার 'পরে,
সকালবেলায় ঘাসের আগায়
শিশিরের রেখা ধরে।
আমলকী-বন কাঁপে, যেন তার
বুক করে দুরু দুরু—
পেয়েছে খবর পাতা-খসানোর
সময় হয়েছে শুরু।
শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এল,
টগর ফুটিল মেলা,
মালতীলতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুই বেলা।
গগনে গগনে বরষন-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া—
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।
দিঘিভরা জল করে ঢল ঢল,
নানা ফুল ধারে ধারে,
কচি ধানগাছে খেত ভ'রে আছে—
হাওয়া দোলা দেয় তারে।
যে দিকে তাকাই সোনার আলোয়
দেখি যে ছুটির ছবি—
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।

সপ্তম পাঠ

শৈল এল কই? ঐ-যে আসে ভেলা চ'ড়ে বৈঠা বেয়ে। ওর আজ পৈতে।

ওরে কৈলাস, দৈ চাই। ভালো ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ। শৈল আজ খৈ দিয়ে দৈ মেখে খাবে।

দৈ তো গয়লা দেয় নি। তৈরি হয় নি। হয়তো বৈকালে দেবে।

পৈতে হবে চিঠি পেয়ে মৈনিমাসি আজ এল। মৈনিমাসি বৈশাখ মাসে ছিল নৈনিতালে। তাকে যেতে হবে চৈবাসা। তার বাবা থাকে গৈলা।

গৈলা কোথা?

জান না, গৈলা বরিশালে। সেইখানে থাকে বেণী বৈরাগী। এখন সে থাকে নৈহাটি।

কাল ছিল ডাল খালি,
আজ ফুলে যায় ভ'রে।
বল্ দেখি তুই মালী,
হয় সে কেমন ক'রে।

গাছের ভিতর থেকে
করে ওরা যাওয়া-আসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে,
কোথা যে ওদের বাসা।
থাকে ওরা কান পেতে
লুকানো ঘরের কোণে।
ডাক পড়ে বাতাসেতে
কী ক'রে সে ওরা শোনে।
দেরি আর সহে না যে,
মুখ মেজে তাড়াতাড়ি
কত রঙে ওরা সাজে,
চ'লে আসে ছেড়ে বাড়ি।
ওদের সে ঘরখানি
থাকে কি মাটির কাছে?
দাদা বলে, জানি জানি
সে ঘর আকাশে আছে।
সেথা করে আসা-যাওয়া
নানারঙা মেঘগুলি।
আসে আলো আসে হাওয়া
গোপন দুয়ার খুলি।

এ ছন্দটি দুই মাত্রায় অথবা তিন মাত্রায় পড়া যায়।

দুই মাত্রা, যথা—
কাল। ছিল। ডাল। খালি।
আজ। ফুলে। যায়। ভ'রে।

তিন মাত্রা, যথা—
কাল ছিল ডাল। খালি—।
আজ ফুলে যায়। ভ'রে—।
তিন মাত্রার তালে পড়লেই ভালো হয়।

অষ্টম পাঠ

ভোর হ'ল। ধোবা আসে। ঐ তো লোকা ধোবা। গোরাবাজারে বাসা। ওর খোকা খুব মোটা, গাল ফোলা।

ঐ-যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা। খুলে দেখো। আছে ধুতি। আছে জামা, মোজা শাড়ি। আরও কত কী।

ওর খুড়ো সুতো বেচে, উল বেচে। ওর মেসো বেচে ফুলের তোড়া।

ধোবা কোথা ধুতি কাচে, জান? ঐ-যে ডোবা ওখানে। ওর জল বড়ো ঘোলা।

গাধা ছোলা খেতে ভালোবাসে। ওকে কিছু ছোলা খেতে দাও।

ছোলা কোথা পাব? ঐ-যে ঘোড়া ছোলা খায়। ওর ঘর খোলা আছে।

ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আজ বিয়ে। তাই ঢের ঘোড়া এল, গাড়ি এল। এক জোড়া হাতি এল। মেজো মেসো হাতি চ'ড়ে আসে। ওটা বুড়ো হাতি। তার নাতি ঘোড়া চড়ে। কালো ঘোড়া। পিঠে ডোরা দাগ। পায়ে তার ফোড়া, জোরে চলে না। ঢোল বাজে। ঘোড়া ঘোর ভয় পায়।

দিনে হই এক-মতো, রাতে হই আর।
রাতে যে স্বপন দেখি মানে কী যে তার!
আমাকে ধরিতে যেই এল ছোটো কাকা
স্বপনে গেলাম উড়ে মেলে দিয়ে পাখা।
দুই হাত তুলে কাকা বলে, থামো থামো—
যেতে হবে ইস্‌কুলে, এই বেলা নামো।
আমি বলি, কাকা, মিছে কর চেঁচামেচি,
আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেছি।
ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধনু খুঁজি,
আলোর অশোক ফুল চুলে দেব গুঁজি।
সাত সাগরের পারে পারিজাত-বনে।
জল দিতে চ'লে যাব আপনার মনে।
যেমনি এ কথা বলা অমনি হঠাৎ
কড়কড় রবে বাজ মেলে দিল দাঁত।
ভয়ে কাঁপি, মা কোথাও নেই কাছাকাছি—
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি বিছানায় আছি।

নবম পাঠ

এসো, এসো, গৌর এসো। ওরে কৌলু, দৌড়ে যা। চৌকি আন্।

গৌর, হাতে ঐ কৌটো কেন?

ঐ কৌটো ভ'রে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।

তুমি কী ক'রে এলে গৌর?

নৌকো ক'রে।

কোথা থেকে এলে?

গৌরীপুর থেকে।

পৌষ মাসে যেতে হবে গৌহাটি।

গৌর, জান ওটা কী পাখি?

ও তো বৌ-কথা-কও।

না, ওটা নয়। ঐ-যে জলে, যেখানে জেলে মৌরলা মাছ ধরে।

ওটা তো পানকৌড়ি। চলো, এবার খেতে চলো। সৌরিদিদি ভাত নিয়ে ব'সে আছে।

—

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।

আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে নৌকো কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।
জানি না কোন্ দেশে
পৌঁছে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।
থাকি ঘরের কোণে,
সাধ জাগে মোর মনে,
অম্‌নি ক'রে যাই ভেসে ভাই,
নতুন নগর বনে।
দূর সাগরের পারে
জলের ধারে ধারে,
নারিকেলের বনগুলি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।
পাহাড়-চূড়া সাজে,
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না যে।
কোন্ সে বনের তলে
নতুন ফুলে ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।
কত রাতের শেষে
নৌকো-যে যায় ভেসে—
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?

দশম পাঠ

বাঁশগাছে বাদর। যত ঝাঁকা দেয় ডাল তত কাঁপে।

ওকে দেখে পাঁচু ভয় পায়, পাছে আঁচড় দেয়।

বাঁশগাছ থেকে লাফ দিয়ে বাঁদর গেল চাঁপাগাছে। কী জানি, কখন ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে।

এইবার বাঁদর ভয় পেয়েছে। ভোঁদা কুকুর ওকে দেখে ডাকছে। খাঁদু ওকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়া করেছে।

পাঁচটা বেজে গেছে।

ঝাঁকায় কাঁচা আম নিয়ে মধু গলিতে হেঁকে যায়।

আঁধার হল। ঐ-যে চাঁপাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদ। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উড়ে গেল।

দূরে ঠাকুর-ঘরে শাঁক বাজে, কাঁসি বাজে। কানাই ছাদে বসে বাঁশি বাজায়।

ঐ কে যেন কাঁদে।
না, কাঁদা নয়, কাঁটা গাছে পেঁচা ডাকে।

কত দিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব ভারি মজা হবে।
তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা,
প্রজাপতি হল, তারে কে করিবে মানা।
রোজ রোজ ভাবে ব'সে প্রদীপের আলো
উড়িতে পেতাম যদি হ'ত বড়ো ভালো।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে কবে পেল পাখা,
জোনাকি হল সে, ঘরে যায় না তো রাখা।
পুকুরের জল ভাবে, চুপ ক'রে থাকি,
হায় হায়, কী মজায় উড়ে যায় পাখি।
তাই একদিন বুঝি ধোঁয়া-ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে।
আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হব পার।
কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার।
কভু ভাবি পাখি হয়ে উড়িব গগনে।
কখনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে?

সহজ পাঠ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রকাশ : ১৯৩০

প্রথম পাঠ

বাদল করেছে। মেঘের রং ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে ৯টা বাজল। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়। সেখানে কংস-বধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজসিংহ আসবেন। কংস-বধ অভিনয় তাঁকে দেখাবে। বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি নয়। তিনি পাংশুপুরের রাজা। সংসারবাবু তাঁরি সংসারে কাজ করেন। কাংলা, তুই বুঝি সংসারবাবুর বাসায় চলেছিস? সেখানে কংস-বধে সং সাজতে হবে। কাংলা, তোর ঝুড়িতে কী? ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। সংসারবাবুর মা চেয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ

আজ আদ্যনাথবাবুর কন্যার বিয়ে—তাঁর এই শল্যপুরের বাড়িতে। কন্যার নাম শ্যামা। বরের নাম বৈদ্যনাথ। বরের বাড়ি অহল্যাপাড়ায়। তিনি আর তাঁর ভাই সৌম্য পাটের ব্যাবসা করেন। তাঁর এক ভাই ধৌম্যনাথ কলেজে পড়ে, আর রম্যনাথ ইস্কুলে। আদ্যনাথ বড়ো ভালো লোক। দান-ধ্যান পুণ্য কাজে তাঁর মন। দেশের জন্য অনেক কাজ করেন। সবাই বলে, তিনি ধন্য। আদ্যনাথবাবু তাঁর ভৃত্য সত্যকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছি তাঁর কন্যার বিবাহে অবশ্য অবশ্য যাব। এখানে এসে দেখি, আঙিনায় বাদ্য বাজছে। চাষীরা এ বৎসর ভালো শস্য পেয়েছে। তাই তারা ভিড় ক'রে এসেছে। ভিতরে ঢুকি—সাধ্য কী! অগত্যা বাইরে বসে আছি। দেখছি, ছেলেরা খুশি হয়ে নৃত্য করছে। কেউ বা ব্যাটবল খেলছে। নিত্যশরণ ওদের ক্যাপটেন।

হাট

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি—
বোঝাই-করা কলসি হাঁড়ি।
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে-যে যায় ভাগ্নে মদন।
হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে।
জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
উচ্ছে বেগুন পটল মুলো,
বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,
শীতের র‍্যাপার নক্সাকাটা,
ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।
কলসি-ভরা এখো গুড়ে
মাছি যত বেড়ায় উড়ে।
খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে
আনুল ঘাটে চাষীর মেয়ে।

অন্ধ কানাই পথের 'পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।
পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে
জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে।

তৃতীয় পাঠ

আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। রঙ্গলালবাবুও এখনি আসবেন। আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। সিঙ্গি, তুমি দৌড়ে যাও তো। অনঙ্গদাদাকে ধরো, মোটরগাড়িতে তাঁদের আনবেন। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেব ভিঙ্গি মেথরকে। এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে। ক্ষিতিবাবুর ক্ষেতে একটি ঘাস নেই। অক্ষয়বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ ক'রে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে। ঈশানবাবু ইঙ্গিতে বলেছেন, তিনি কিছু দান করবেন।

চতুর্থ পাঠ

চন্দননগর থেকে আনন্দবাবু আসবেন। তিনি আমার পাড়ার কাজ দেখতে চান। দেখো, যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে ব'লে দিয়ো, তাঁর আতিথ্যে যেন খুঁত না থাকে। তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো। তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে। রঙ্গু বেহারাকে বোলো, তাঁর শোবার ঘরে তাঁর তোরঙ্গ যেন রাখে। ঘর বন্ধ যেন না থাকে। সন্ধ্যা হ'লে ঘরে ধুনোর গন্ধ দিয়ো। দীনবন্ধুকে রেখো পাশের ঘরেই। তাঁদের সঙ্গে সিন্ধুবাবু আসবেন, তাঁকে অন্য ঘরে রাখতে হবে। বিন্দুকে ব'লে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই। বন্দেমাতরং গান নন্দী জানে তো? সেই অন্ধ গায়ককেও ডেকে এনো। সে তো মন্দ গায় না।

পঞ্চম পাঠ

বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকানি চলছে। শিলং পর্বতে ঝর্ণার জল বেড়ে উঠল। কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে। সর্ষে ক্ষেত ডুবিয়ে দিলে। দুর্গানাথের আঙিনায় জল উঠেছে। তার দর্মার বেড়া ভেঙে গেল। বেচারা গোরুগুলোর বড়ো দুর্গতি। এক-হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চাষীদের কাজকর্ম সব বন্ধ। ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি। কর্তাবাবু বর্ষাতি পরে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর আর্দালি তুর্কি মিঞা। গর্ত সব ভ'রে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হ'ল। পাড়ার নর্দমাগুলো জলে ছাপিয়ে গেছে।

—

ঐখানে মা পুকুরপাড়ে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী—
কেউ কোথাও নেই।

ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক, অনেক আছে—
আসবে না কেউ তোমার কাছে,
দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে,
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।
আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।
শিংগুলি সব আঁকাবাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবে না ভয় একটুও-যে
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁষে।
ফল্‌সাবনে গাছে গাছে
ফল ধ'রে মেঘ ঘনিয়ে আছে,
ঐখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।
শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি ল্যাজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে।

ষষ্ঠ পাঠ

উস্রি নদীর ঝর্ণা দেখতে যাব। দিনটা বড়ো বিশ্রী। শুনছ বজ্রের শব্দ? শ্রাবণ মাসের বাদ্‌লা। উস্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরন্ত। অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। অনন্ত, এসো একসঙ্গে যাত্রা করা যাক। আমাদের দু-দিন মাত্র ছুটি। কলেজের ছাত্রেরা গেছে ত্রিবেণী, কেউ বা গেছে আত্রাই। সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উস্রির ঝর্ণায়। শান্তা কি যেতে পারবে? সে হয়তো শ্রান্ত হয়ে পড়বে। পথে যদি জল নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব। সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র কিছু খেয়ে নিক।

তার খাবার আগ্রহ দেখি নে। সে ভোরের বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোন ক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।

সপ্তম পাঠ

শ্রীশকে বোলো, তার শরীর যদি সুস্থ থাকে সে যেন বসন্তের দোকানে যায়। সেখান থেকে খাস্তা কচুরি আনা চাই। আর কিছু পেস্তা বাদাম কিনে আনতে হবে। দোকানের রাস্তা সে জানে তো? বাজারে একটা আস্ত কাৎলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন। আর বস্তা থেকে গুনতি ক'রে ত্রিশটা আলু আনা চাই। এবার আলু খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল আনিয়ে নিয়ো। রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রেখো—কড়া চাই, খুন্তি চাই, জলের পাত্র একটা নিয়ো। অত ব্যস্ত হয়েছ কেন। আস্তে আস্তে চলো। ক্লান্ত হয়ে পড়বে-যে।

—

আমি যে রোজ সকাল হ'লে
যাই শহরের দিকে চ'লে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ড়ে,
সকাল থেকে সারা দুপর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গ'ড়ে।
সমস্ত দিন ছাতপিটুনি
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নীচে চলছে গাড়ি ঘোড়া।
বাসনওয়ালা থালা বাজায়,
সুর ক'রে ঐ হাঁক দিয়ে যায়
আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া,
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হোহো ক'রে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।
রোদ্দুর যেই আসে প'ড়ে
পুবের মুখে কোথা ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে,
জান না কি আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি-গাড়া
পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।

অষ্টম পাঠ

আর্মানি গির্জের কাছে আপিস। যাওয়া মুশকিল হবে। পূর্বদিকের মেঘ ইস্পাতের মতো কালো। পশ্চিম দিকের মেঘ ঘন নীল। সকালে রৌদ্র ছিল, নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেখতে দেখতে বিস্তর মেঘ জমেছে। বাদ্‌লা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হ'লে বাঁচি। শরীরটা অসুস্থ আছে। মাথা ধরেছে, স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আপিসের ভাত এখনো হ'ল না। উনানের আগুনটা উস্‌কিয়ে দাও। ঠাকুর আমার ঝোলে যেন লঙ্কা না দেয়। বঙ্কিমকে আমার অঙ্কের খাতাটা আনতে বোলো। দোতলা ঘরের পালঙ্কের উপর আছে। কঙ্কা খাতা নিয়ে খেলতে গিয়ে তার পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে।

নবম পাঠ

বৃষ্টি নামল দেখছি। সৃষ্টিধর, ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আয়, না পেলে ভারি কষ্ট হবে। কেষ্ট, শিষ্ট শান্ত হয়ে ঘরে ব'সে থাকো। দুষ্টামি কোরো না। বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। সঞ্জীবকে ব'লে দেব, তোমার জন্যে মিষ্টি লজঞ্চুস এনে দেবে। কাল যে তোমাকে খেলার খঞ্জনি দিলাম সেটা হারিয়েছ বুঝি? ও বাড়ি থেকে রঞ্জনকে ডেকে দেব, সে তোমার সঙ্গে খেলা করবে। কাঞ্জিলাল, ব্যাঙগুলো ঘরের মধ্যে আসে যে, ঘর নষ্ট করবে। ওরে তুষ্টু, ওদের তাড়িয়ে দে। ঘন মেঘে সব অস্পষ্ট হয়ে এল। আর দৃষ্টি চলে না। বোষ্টমী গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, কষ্ট পাবে।

—

সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে।
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পুজোর সানাই বাজায় দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগ্‌নি রঙের শাড়ি,
চেয়ে চেয়ে চুপ ক'রে রই—
তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া
তক্ষনি যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে ক'ষে,

যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙগমা আর ব্যাঙগমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় ব'সে।

দশম পাঠ

এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে? কেউ না, বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে। এখন অনেক রাত্রি। উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে—হুক্কাহুয়া। রাস্তায় ও কি এক্কাগাড়ির শব্দ? না, মেঘ গুর্‌গুর্‌ করছে। উল্লাস, তুমি যাও তো, কুকুরের বাচ্ছাটা বড়ো চেঁচাচ্ছে, ঘুমতে দিচ্ছে না। ওকে শান্ত ক'রে এসো। ওটা কিসের ডাক উল্লাস? অশত্থ গাছে পেঁচার ডাক। উচ্ছের খেত থেকে ঝিল্লি ঐ ঝিঁ ঝিঁ করছে। দরজার পাল্লাটা বাতাসে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ ক'রে পড়ছে। বন্ধ ক'রে দাও। ওটা কি কান্নার শব্দ? না, রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে। যাও-না উল্লাস, থামিয়ে দিয়ে এসো গে। আমার ভয় করছে। বড়ো অন্ধকার। ভজ্জুকে ডেকে দিই। ছি ছি উল্লাস, ভয় করতে লজ্জা করে না? আচ্ছা, আমি নিজে যাচ্ছি। আর তো রাত নেই। পুব দিক উজ্জ্বল হয়েছে। ও ঘরে বিছানায় খুকি চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও। বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্যে চা আনুক আর কিঞ্চিৎ বিস্কুট। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি। রক্ষামণি থাক্‌ খুকুর কাছে। তুমিও সাজসজ্জা ক'রে তৈরি থাকো উল্লাস। বেড়াতে যাব। উত্তম কথা। কিন্তু ঘাস ভিজে কেন? এক পত্তন বৃষ্টি হয়ে গেল বুঝি। এবার লণ্ঠনটা নিবিয়ে দাও। আর মণ্টুকে বলো, বারান্দা পরিষ্কার ক'রে দিক। এখনি রেভারেন্ড অ্যান্ডার্‌সন আসবেন। পণ্ডিত মশায়েরও আসবার সময় হ'ল। ঐ শোনো, কুণ্ডুদের বাড়ি ঢং ঢং ক'রে ছটার ঘণ্টা বাজে।

আকাশপারে পুবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
বন্ধ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে
লাগায় ঝিলিমিলি,
বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে
বাদলবেলার কথা,
হারিয়ে পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
ঝুমকো ফুলের লতা।

একাদশ পাঠ

ভক্তরামের নৌকো শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভক্তরাম সেই নৌকো সস্তা দামে বিক্রি করে। শক্তিনাথবাবু কিনে নেন। শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। যে-পাড়ায় থাকেন তার নাম জেলে-বস্তি। তাঁর বাড়ি খুব মস্ত। সামনে নদী, পিছনে বড়ো রাস্তা। তাঁর দারোয়ান শত্রু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে কুস্তি করে। শক্তিনাথবাবুর চাকরের নাম অক্রূর। তাঁর বড়ো ছেলের নাম বিক্রম। ছোটো ছেলের নাম শত্রুনাথ। শক্তিবাবু তাঁর নৌকো লাল রঙ করে নিলেন। তার নাম দিলেন রক্তজবা। তিনি মাঝে মাঝে নৌকোয় ক'রে কখনো তিস্তা নদীতে কখনো আত্রাই নদীতে কখনো ইচ্ছামতীতে বেড়াতে যান। একদিন অঘ্রান মাসে পত্র পেলেন, বিপ্রগ্রামে বাঘ এসেছে। শিকারে যাত্রা করলেন। সেদিন শুক্রবার। শুক্লপক্ষের চন্দ্র সবে অস্ত গেছে। আক্রম বন্দুক নিয়ে চলল। আরও দুটো বল্লম ছিল। সিন্দুকে ছিল গুলি বারুদ। নদীতে প্রবল স্রোত। বেলা যখন দুই প্রহর, নৌকো নন্দগ্রামে পৌঁছল। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। এক ভদ্রলোক খবর দিলেন, কাছেই বন্দীপুরের বন, সেখানে আছে বাঘ।

শক্তিবাবু আর আক্রম বাঘ খুঁজতে নামলেন। জঙ্গল ঘন হয়ে এল। ঘোর অন্ধকার। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন, এক পোড়ো মন্দির। জনপ্রাণী নেই। শক্তিবাবু বললেন, এইখানে একটু বিশ্রাম করি। সঙ্গে ছিল লুচি, আলুর দম আর পাঁঠার মাংস। তাই খেলেন। আক্রম খেল চাটনি দিয়ে রুটি। তখন বেলা পড়ে আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে রৌদ্র পড়ে। প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের উপর কতকগুলো বাঁদর; তাদের লম্বা ল্যাজ ঝুলছে। শক্তিবাবু কিছু দূরে গিয়ে দেখলেন, একটা ছোটো সোঁতা। তাতে এক হাঁটুর বেশি জল হবে না। তার ধারে বালি। সেই বালির উপর বড়ো বড়ো থাবার দাগ। নিশ্চয় বাঘের থাবা। শক্তিবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা কর্তব্য। অঘ্রান মাসের বেলা। পশ্চিমে সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা হতেই ঘোর অন্ধকার। কাছে তেঁতুল গাছ। তার উপরে দুজনে চড়ে বসলেন। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চাদর দিয়ে নিজেদের বাঁধলেন। পাছে ঘুম এলে পড়ে যান। কোথাও আলো নেই। তারা দেখা যায় না। কেবল অসংখ্য জোনাকি গাছে গাছে জ্বলছে।

শক্তিবাবুর একটু নিদ্রা এসেছে এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করে একটা শব্দ হওয়াতে চমকে জেগে উঠলেন। দেখলেন কখন বাঁধন আল্‌গা হয়ে আক্রম নীচে পড়ে গেছে। শক্তিনাথ তাকে দেখতে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। হঠাৎ দেখেন, কাছেই অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। কী সর্বনাশ! এ তো বাঘের চোখ। বন্দুক তোলবার সময় নেই। ভাগ্যে দুজনের কাছে দুটো বিজ্‌লি বাতির মশাল ছিল। সে-দুটো যেমনি হঠাৎ জ্বালানো অমনি বাঘ ভয়ে দৌড় দিলে। সে-রাত্রি আবার দুজনের গাছে কাটল। পরের দিন সকাল হল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা মেলে না, যতই চলেন জঙ্গল বেড়ে যায়। গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে। রক্ত পড়ে। খিদে পেয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে। এমন সময় মানুষের গলার শব্দ শোনা গেল। এক দল কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে চলেছে। শক্তিবাবু বললেন—তোমাদের ঘরে নিয়ে চলো। রাস্তা ভুলেছি। কিছু খেতে দাও। নদীর ধারে একটা ঢিবির 'পরে তাদের কুঁড়ে ঘর। গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। কাছে একটা মস্ত বটগাছ। তার ডাল থেকে লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে। সেই গাছে যত রাজ্যের পাখির বাসা।

কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন করে খেতে দিলে। তালপাতার ঠোঙায় এনে দিলে চিঁড়ে আর বনের মধু। আর দিলে ছাগলের দুধ। নদী থেকে ভাঁড়ে করে এনে দিলে জল। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। শরীর ছিল ক্লান্ত। শক্তিবাবু বটের ছায়ায় শুয়ে ঘুমোলেন। বেলা যখন চার প্রহর তখন কাঠুরিয়ার সর্দার পথ দেখিয়ে নৌকোয় তাঁদের পৌঁছিয়ে দিলে। শক্তিবাবু দশ টাকার নোট বের করে বললেন, বড়ো উপকার করেছ, বকশিশ লও। সর্দার হাতজোড় করে

বললে, মাপ করবেন, টাকা নিতে পারব না—নিলে অধর্ম হবে। এই বলে নমস্কার করে সর্দার চলে গেল।

—

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
'চেয়ে দেখো' 'চেয়ে দেখো' বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা-কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে দুদ্দাড় জানালা দরজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেন্টের দোল যেন খ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্কুল ছোটে হন্‌হন্,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছট্‌ফট্,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।
ঘণ্টা কেবলি দোলে ঢঙ্ ঢঙ্ বাজে—
যত কেন বেলা হোক তবু থামে না-যে।
লক্ষ লক্ষ লোক বলে, 'থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে এ কী পাগলামো।'
কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে—
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।
আমি মনে মনে ভাবি চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লি লহোরে যাক, যাক না আগরা,
মাথায় পাগড়ি দেব, পায়েতে নাগ্‌রা।
কিংবা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট হ্যাট্ কোটে।
কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই
দেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।

দ্বাদশ পাঠ

গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভরবাবু পাল্কি চড়ে চলেছেন সপ্তগ্রামে। ফাল্গুন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠাণ্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর গায়ে এক মোটা কম্বল। পাল্কির সঙ্গে চলেছে তাঁর শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি। পাল্কির ছাদে ওষুধের বাক্স, দড়ি

দিয়ে বাঁধা। শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর। একবার কুম্ভীরার জঙ্গলে তাকে ভল্লুকে ধরেছিল। সঙ্গে বন্দুক ছিল না, সুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল। শম্ভুর হাতের লাঠি খেয়ে ভল্লুকের মেরুদণ্ড গেল ভেঙে। আর তার উত্থানশক্তি রইল না। আর একবার শম্ভু বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন। পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউগাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা নিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাঁধল। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। নদীতে শম্ভু জল খেতে গেল। এমন সময় দেখলে, একটা বাছুরকে ধরেছে কুমীরে। শম্ভু এক লম্ফে জলে পড়ে কুমীরের পিঠে চড়ে বসল। দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমীর যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে। শম্ভু সাঁতার দিয়ে ডাঙায় উঠে এল। বিশ্বম্ভরবাবু ডাক্তার। রোগী দেখতে চলেছেন বহুদূরে। সেখানে ইস্টিমার ঘাটের ইস্টেশন্‌মাস্টার মধু বিশ্বাস, তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাণ্ড। সেখানে যখন পাল্কি এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে চলেছে গোষ্ঠে ফিরে। বিশ্বম্ভরবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পার?'

রাখাল বললে, 'আজ্ঞে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীষ্মহাটের মাঠ, তার কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।'

ডাক্তার বললেন, 'বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।' তিলপুনি খালের ধারে যখন পাল্কি এল, রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আল্‌গা হয়ে পাল্কির ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল প'ড়ে! ক্যাস্টর অয়েলের শিশি ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত ক'রে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দাজ দু-ক্রোশ পথ গেছে এমন সময় মড়্‌ মড়্‌ করে ডাণ্ডা গেল ভেঙে, পাল্কিটা পড়ল মাটিতে। পাল্কি হাল্‌কা কাঠের তৈরি; বিশ্বম্ভরবাবুর দেহটি স্থূল।

আর উপায় নাই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তারবাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লন্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময় বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বললে, 'ঐ-যে কারা আসছে, ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।'

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, 'ভয় কী, তোরা তো সবাই আছিস।'

বুদ্ধু বললে, 'বগ্‌গু পালিয়েছে, পল্লুকেও দেখছি নে। বক্সি লুকিয়েছে ঐ ঝোপের মধ্যে। ভয়ে বিষ্ণুর হাত-পা আড়ষ্ট।'

শুনে ডাক্তার ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন, 'শম্ভু!'

শম্ভু বললে, 'আজ্ঞে!'

ডাক্তার বললেন, 'এখন উপায় কী?'

শম্ভু বললে, 'ভয় নেই, আমি আছি।'

ডাক্তার বললেন, 'ওরা-যে পাঁচজন।'

শম্ভু বললে, 'আমি-যে শম্ভু।'

এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে এক লম্ফ দিলে, গর্জন করে বললে, 'খবরদার!'

ডাকাতরা অট্টহাস্য করে এগিয়ে আসতে লাগল।

তখন শম্ভু পাল্কির সেই ভাঙা ডাণ্ডাখানা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারলে। তারি এক ঘায়ে তিনজন একসঙ্গে পড়ে গেল। তার পরে শম্ভু লাঠি ঘুরিয়ে যেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি দুজনে দিল দৌড়।

তখন ডাক্তারবাবু ডাকলেন, 'শম্ভু!'

শম্ভু বললে, 'আজ্ঞে!'

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, 'এইবার বাক্সটা বের করো।'

শম্ভু বললে, 'কেন, বাক্স নিয়ে কী হবে?'

ডাক্তার বললেন, 'ঐ তিনটে লোকের ডাক্তারি করা চাই। ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।'

রাত্রি তখন অল্পই বাকি। বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভু দুজনে মিলে তিনজনের শুশ্রূষা করলেন।

সকাল হয়েছে। ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্যের রশ্মি ফেটে পড়ছে। একে একে সব বেহারা ফিরে আসে। বল্গু এল, পল্লু এল, বক্সির হাত ধরে এল বিষ্ণু, তখনো তার হৃৎপিণ্ড কম্পমান।

—

স্টিমার আসিছে ঘাটে, প'ড়ে আসে বেলা,
পুজার ছুটির দল, লোকজন মেলা
এল দূর দেশ হ'তে; বৎসরের পরে
ফিরে আসে যে-যাহার আপনার ঘরে।
জাহাজের ছাদে ভিড়; নানা লোকে নানা
মাদুরে কম্বলে লেপে পেতেছে বিছানা
ঠেসাঠেসি ক'রে। তারি মাঝে হরেরাম
মাথা নেড়ে বাজাইছে হারমোনিয়াম।
বোঝা আছে কত শত—বাক্স কত রূপ
টিন বেত চামড়ার পুঁটুলির স্তূপ,
থলি ঝুলি ক্যাম্বিশের, ডালা ঝুড়ি ধামা
সব্‌জিতে ভরা। গায়ে রেশমের জামা,
কোমরে চাদর বাঁধা, চণ্ডী অবিনাশ
কলিকাতা হ'তে আসে, বঙ্কু শ্যামদাস
অম্বিকা অক্ষয়; নতুন চীনের জুতা
করে মস্‌মস্‌, মেরে কুনুয়ের গুঁতা
ভিড় ঠেলে আগে চলে—হাতে বাঁধা ঘড়ি
চোখেতে চমশা কারো, সরু এক ছড়ি
সবেগে দুলায়। ঘন ঘন ডাক ছাড়ে
স্টিমারের বাঁশি; কে পড়ে কাহার ঘাড়ে,
সবাই সবার আগে যেতে চায় চ'লে—
ঠেলাঠেলি, বকাবকি। শিশু মার কোলে
চীৎকারস্বরে কাঁদে। গড় গড় করে
নোঙর ডুবিল জলে; শিকলের ডোরে
জাহাজ পড়িল বাঁধা; সিঁড়ি গেল নেমে,
এঞ্জিনের ধক্‌ধকি সব গেল থেমে।
'কুলি' 'কুলি' ডাক পড়ে ডাঙা হ'তে মুটে
দুড়দাড় ক'রে এল দলে দলে ছুটে।
তীরে বাজাইয়া হাঁড়ি গাহিছে ভজন
অন্ধ বেণী। যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন
অপেক্ষা করিয়া আছে; নাম ধ'রে ডাকে,
খুঁজে খুঁজে বের করে যে চায় যাহাকে।
চলিল গোরুর গাড়ি, চলে পাল্‌কি ডুলি,
শ্যাক্‌রা-গাড়ির ঘোড়া উড়াইল ধূলি।

সূর্য গেল অস্তাচলে; আঁধার ঘনালো;
হেথা হোথা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো
দুলিতে দুলিতে যায়, তার পিছে পিছে
মাথায় বোঝাই নিয়ে মুটেরা চলিছে।
শূন্য হয়ে গেল তীর। আকাশের কোণে
পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে। দূরে বাঁশবনে
শেয়াল উঠিল ডেকে। মুদির দোকানে
টিম্‌ টিম্‌ ক'রে দীপ জ্বলে একখানে॥

ত্রয়োদশ পাঠ

উদ্ধব মণ্ডল জাতিতে সদ্গোপ। তার অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা। ভূসম্পত্তি যা-কিছু ছিল ঋণের দায়ে বিক্রয় হয়ে গেছে। এখন মজুরি করে কায়ক্লেশে তার দিনপাত হয়।

এ দিকে তার কন্যা নিস্তারিণীর বিবাহ। বরের নাম বটকৃষ্ণ। তার অবস্থা মন্দ নয়। ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য দিয়ে সহজেই সংসারনির্বাহ হয়। বাড়িতে পূজা-অর্চনা ক্রিয়াকর্মও আছে।

আগামী কাল উনিশে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন। বরযাত্রীর দল আসবে। তার জন্যে আহারাদির উদ্যোগ করা চাই। পাড়ার লোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। অভাব তবু যথেষ্ট।

পাড়ার প্রান্তে একটি বড়ো পুষ্করিণী। তার নাম পদ্মপুকুর। বর্তমান ভূস্বামী দুর্লভবাবুর পূর্বপুরুষদের আমলে এই পুষ্করিণী সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পেত। এমন-কি গ্রামের গৃহস্থ-বাড়ির কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রয়োজন উপস্থিত হলে মাছ ধরে নেবার বাধা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি দুর্লভবাবু প্রজাদের সেই অধিকার বন্ধ করে দিয়েছেন। অল্প কিছু দিন আগে খাজনা দিয়ে বৃন্দাবন-জেলে তাঁর কাছ থেকে এই পুকুরে মাছ ধরবার স্বত্ব পেয়েছে।

উদ্ধব এ সংবাদ ঠিকমত জানত না। তাই সেদিন রাত্রি থাকতে উঠে পদ্মপুকুর থেকে একটা বড়ো দেখে রুইমাছ ধরে বাড়ি আনবার উপক্রম করছে। এমন সময় বিঘ্ন ঘটল।

সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন। খুব সমারোহ করে লোক খাওয়ানো হবে। তারই মাছ-সংগ্রহের জন্য বাবুর কর্মচারী কৃত্তিবাস কয়েক জন জেলে নিয়ে সেই পুষ্করিণীর ধারে এসে উপস্থিত।

দেখে, উদ্ধব এক মস্ত রুই মাছ ধরেছে। সেটা তখনি তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। উদ্ধব কৃত্তিবাসের হাতে পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কোনো ফল হল না। ধনঞ্জয় পেয়াদা তাকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেল দুর্লভবাবুর কাছে।

দুর্লভের বিশ্বাস ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অত্যাচারী বলে উদ্ধব তাঁর দুর্নাম করেছে। তাই তার উপরে তাঁর বিষম ক্রোধ। বললেন, 'তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দণ্ড দিতে হবে।'

ধনঞ্জয়কে বললেন, 'একে ধরে নিয়ে যাও। যতক্ষণ না দশ টাকা দণ্ড আদায় হবে, ছেড়ে দিয়ো না।'

উদ্ধব হাতজোড় করে বললে, 'আমার দশ পয়সাও নেই। কাল কন্যার বিবাহ। কাজ শেষ হয়ে যাক, তার পরে আমাকে শাস্তি দেবেন।'

দুর্লভবাবু তার কাতরবাক্যে কর্ণপাত করলেন না। ধনঞ্জয় উদ্ধবকে সকল লোকের সম্মুখে অপমান করে ধরে নিয়ে গেল।

দুর্লভের পিসি কাত্যায়নী ঠাকরুন সেদিন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে অন্তঃপুরে উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধবের স্ত্রী মোক্ষদা তাঁর কাছে কেঁদে এসে পড়ল।

কাত্যায়নী দুর্লভকে ডেকে বললেন, 'বাবা, নিষ্ঠুর হোয়ো না। উদ্ধবের কন্যার বিবাহে যদি অন্যায় কর তবে তোমার কন্যার অন্নপ্রাশনে অকল্যাণ হবে। উদ্ধবকে মুক্তি দাও।'

দুর্লভ পিসির অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে গেলেন। কৃত্তিবাসকে ডেকে কাত্যায়নী বললেন, 'উদ্ধবের দণ্ডের এই দশ টাকা দিলাম। এখনি তাকে ছেড়ে দাও।'

উদ্ধব ছাড়া পেলে। কিন্তু অপমানে লজ্জায় তার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগল।

পরদিন গোধূলিলগ্নে নিস্তারিণীর বিবাহ। বেলা যখন চারটে, তখন পাঁচজন বাহক উদ্ধবের কুটীর প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত। কেউ বা এনেছে ঝুড়িতে মাছ, কেউ বা এনেছে হাঁড়িতে দই, কারও হাতে থালায় ভরা সন্দেশ, একজন এনেছে একখানি লাল চেলির শাড়ি।

পাড়ার লোকের আশ্চর্য লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, 'কে পাঠালেন?' বাহকেরা তার কোনো উত্তর না করে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই কুটীরের সম্মুখে এক পাল্কি এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে থেকে নেমে এলেন কাত্যায়নী ঠাকরুন। উদ্ধব এত সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। কাত্যায়নী বললেন, 'দুর্লভ কাল তোমাকে অপমান করেছে, সে কথা তুমি মনে রেখো না। আমি তোমার কন্যাকে আশীর্বাদ করে যাব, তাকে ডেকে দাও।'

কাত্যায়নী নিস্তারিণীকে একগাছি সোনার হার পরিয়ে দিলেন। আর তার হাতে এক শত টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন, 'এই তোমার যৌতুক।'

অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল-ধরা—এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।
আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর,
আছে এক ল্যাজ-কাটা ভক্ত কুকুর।
আর আছে একতারা, বক্ষেতে ধ'রে
গুন্ গুন্ গান গায় গুঞ্জন-স্বরে।
গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দু-মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।
সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান।
'হরি হরি' রব উঠে অঙ্গনমাঝে,
ঝন্ঝনি ঝন্ঝনি খঞ্জনি বাজে।
ভঞ্জের পিসি তাই সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান।
চিঁড়ে মুড়কিতে তার ভরি দেন ঝুলি,
পৌষে খাওয়ান ডেকে মিঠে পিঠে-পুলি।
আশ্বিনে হাট বসে ভারি ধুম ক'রে,
মহাজনী নৌকায় ঘাট যায় ভ'রে—
হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি মহা সোরগোল,
পশ্চিমী মাল্লারা বাজায় মাদোল।
বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি,
চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি।

কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি
অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী।
সেই গান মিলে যায় দূর হতে দূরে
শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে।

আদর্শ প্রশ্ন

প্রথম ভাগ

প্রকাশ : ১৯৪০

'জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যাবিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদের পাঠ্যতালিকা-অবলম্বনে' রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ প্রশ্ন রচনা করেন তা বিশ্বভারতীর Bulletin No. 27-রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। 'আদর্শ প্রশ্ন' পুস্তিকার পাদটীকায় নির্দেশ ছিল 'এই সব প্রশ্নের উত্তর বই দেখে লিখলে আপত্তি নেই, কিন্তু লিখতে হবে নিজের ভাষায়।'

'পরিশিষ্ট' অংশে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রশ্নপত্রাবলী মুদ্রিত হল।

প্রবেশিকা-পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(ক) গদ্য

পাঠপ্রচয়

তৃতীয় ভাগ

রোগশত্রু

১। প্রাণ আছে যারই আয়ু ফুরোলেই সে মারা যায়। সেই মৃতবস্তু খেয়ে ফেলে সরিয়ে দেয় দুই দল জীবাণু। তাদের খবর কী জান বলো।

২। জলে স্থলে বাস করে ছোটো বড়ো জীবজন্তু, সেই সঙ্গে থাকে অসংখ্য জীবাণু। তা ছাড়া তারা থাকে বাতাসে। বিখ্যাত রসায়নবিৎ প্যাস্টুর তাদের সম্বন্ধে কী তথ্য সন্ধান করে বের ক'রেছিলেন বিবৃত করো।

৩। শ্বেতকণা ও লোহিতকণা এই দুই কণার যোগে আমাদের রক্তপ্রবাহ। শরীরে তারা কোন্ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।

৪। বায়ুবিহারী রোগের আকর জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ ক'রে রক্তবিহারী জীবাণুদের সঙ্গে কী রকম দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেয় তার বর্ণনা করো।

আমেরিকার একটি বিদ্যালয়

১। য়ুনাইটেড স্টেট্‌সের 'পোসাম ট্রট' নামে এক গ্রাম আছে। তাদের বাসিন্দারা ছিল অশিক্ষিত এবং শিক্ষার জন্য তাদের উৎসাহ ছিল না। মিস মার্থা বেরি নগর থেকে সেখানে বাস করতে এসেছিলেন, পর্বতের শোভা ভোগ ক'রে সেখানে আরাম করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু নিজের আরাম ভুলে পাহাড়িয়া ছেলেদের শিক্ষাদানব্রতে কেমন করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার ইতিহাস বর্ণনা করো।

প্রথমে কী কাজ আরম্ভ করলেন। গ্রাম্য ছেলেদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি কী বিচার করেছিলেন। তাঁর কাজ কী রকম ক'রে চলল। য়ুনাইটেড স্টেট্‌সের দাক্ষিণাত্যে কাফ্রিরাই হাতের কাজ করে ব'লে শ্বেতকায়রা সে সব কাজ ঘৃণার বিষয় ব'লে মনে করে। মিস মার্থা সেই আপত্তির বিরুদ্ধে কী রকমে কৃতকার্য হয়েছিলেন। যাঁরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ভার নিয়েছিলেন তাঁরা কী রকম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে লেখক আমাদের দেশের লোকের ঔদাসীন্য ও সংকল্পের দুর্বলতা সম্বন্ধে কী বলেছেন জানাও।

কাবুলিওয়ালা

বাঙালি মেয়ের সহিত কাবুলিওয়ালার স্নেহসম্বন্ধের ভিত্তিটি কোন্‌খানে।

কাবুলিওয়ালার সঙ্গে কখন কী রকমে মিনির পরিচয় আরম্ভ হল।

মাঝখানে বাধা ঘটল কিসের। মিনির বিবাহ-দিনে জেল-ফেরত রহমতের উপস্থিতিতে মিনির

বাপের অপ্রসন্নতা কেমন ক'রে মিলিয়ে গেল, কী মনে হ'ল তাঁর। গল্পের শেষ ভাগে কী বেদনা জেগে উঠল কাবুলির মনে।

সমস্ত গল্পের মর্মকথাটা কী।

বাগান

বাড়ির চারি দিকে একখানি বাগান তৈরি ক'রে তোলা যে বিলাসিতার আড়ম্বর নয়, চরিত্র-গঠনের পক্ষে তার যে একটা প্রয়োজন আছে, তার প্রতি অবহেলায় নিজেকে এবং অন্য সকলকে অসম্মান করা হয় সে কথা বুঝিয়ে বলো।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

এই লেখায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে যে বিশেষত্বের কথা পড়েছ তার উল্লেখ ক'রে লেখো।

সাক্ষী

সহজ ক'রে সরল ভাষায় এই গল্পটি লেখো। এই কথাটি মনে রেখো যে ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কেবল যে রামকানাইয়ের শাস্তি হল তা নয়, তাঁর নিজের সাধুতার খ্যাতি হল না। বুদ্ধিমানেরা তাঁকে নির্বোধ ও চতুর লোকেরা তাঁকে দুর্বল ভীরু ব'লে অবজ্ঞা করল, এতেই তাঁর চরিত্রগৌরব আপনার ভিতর থেকে যথার্থ মূল্য পেয়েছে।

ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম

বাগান প্রবন্ধে যে তত্ত্বটি আছে এই প্রবন্ধে তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। গরিব চাষী, কঠিন পরিশ্রমে তাকে দিন কাটাতে হয়, তবু সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে বাসস্থানকে সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যে এই যে উৎসাহ তাকে দেওয়া হয় ভেবে দেখতে গেলে এটা সমস্ত দেশের প্রতি কর্তব্যসাধন। দেশকে শ্রীসম্পন্ন ক'রে তোলবার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোকের স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত। এই অধ্যবসায়ের অভাবে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের কী রকম দুরবস্থা তোমার অভিজ্ঞতা থেকে তার বর্ণনা করো।

জাহাজের খোল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশের যে হিতসাধনায় নিজের সর্বস্ব ক্ষয় করেছিলেন এই লেখায় তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই জাহাজ-চালানো অবলম্বন করে অনেকে এমন ব্যবসায় ক'রে থাকেন যাতে তাঁদের অর্থলাভ হতে পারে কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের ব্যবসায় যে সিদ্ধি-লাভের অভিমুখে ছিল তা অর্থলাভের বিপরীত দিকে। তাঁর সেই দেউলে হওয়া অধ্যবসায়ের বিবরণ আপন ভাষায় লেখো। যে উৎসাহের উৎস তাঁর মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে ছিল ব'লে এত বড়ো ক্ষতির মধ্যে তাঁকে অবসাদগ্রস্ত করতে পারে নি সেইটিই এই প্রবন্ধের মূল কথা।

উদ্যোগশিক্ষা

দেহে ও মনে. জ্ঞানে ও কর্মে. মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হবে--তাকে শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্য এই। পুঁথিগত বিদ্যায় আমরা এমন অভ্যস্ত যে এই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকে আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করি। চারি দিকের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য চ'লে গেছে। নানা প্রয়োজনের দাবি আমাদের চার দিকে অথচ মনের জড়ত্ববশত সে দাবি আপন বুদ্ধিতে মেটাবার প্রতি উৎসাহ নেই. বহুকেলে বাঁধা প্রণালীর প্রতি ভর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি। এ সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রমে লেখক যে সব ব্যর্থতার লক্ষণ দেখেছেন তারই উল্লেখ করে প্রসঙ্গটির আলোচনা করো।

দেবীর বলি

এই গল্পাংশের মধ্যে যে কয়টি বর্ণনা আছে তাদের কী রকম ক'রে ফলিয়ে তোলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করো। প্রথম জনশূন্য রাত্রি, দ্বিতীয় জয়সিংহের চরম আত্মনিবেদনের সংকল্প, তৃতীয় মন্দিরে রঘুপতির অপেক্ষা, চতুর্থ জয়সিংহের আত্মহনন।

আহারের অভ্যাস

বাংলাদেশের আহার অত্যন্ত অপথ্য, এ কথা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়ে গেছে। অথচ ভোজনে আমাদের রুচি এতই অত্যন্ত সংস্কারগত যে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে তার পরিবর্তন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টার গুরুত্ব ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগা নিয়ে নয় এই কথা মনে রেখে, সমস্ত বাংলাদেশের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে, আহার সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন করাই চাই—এ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

দান প্রতিদান

এই গল্পে রাধামুকুন্দের যে ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে তাকে নিন্দা করা যায় কি না এবং যদি করা যায় তবে তা কেন নিন্দনীয় বুঝিয়ে বলো।

বলাই

গাছপালার উপরে বলাইয়ের ভালোবাসা অসামান্য। তাদের প্রাণের নিগূঢ় আনন্দ ও বেদনা ও যেন আপন ক'রে বুঝতে পারত। গল্পের আরম্ভ অংশে তার যে বর্ণনা আছে সেটা ভালো ক'রে প'ড়ে বোঝবার চেষ্টা করো। গাছপালার সঙ্গে ওর প্রকৃতির সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, কেননা ওর স্বভাবটা স্তব্ধ, ওর ভাবনাগুলো অন্তর্মুখী; মেঘের ছায়া, অরণ্যের গন্ধ, বৃষ্টির শব্দ, বিকেল বেলার রোদ্দুর গাছেদের মতোই ও যেন সমস্ত দেহ দিয়ে অনুভব করে; আমের বোল ধরবার সময় আমগাছের মজ্জার ভিতরকার চাঞ্চল্য ও যেন নিজের রক্তের মধ্যে জানতে পারত; মাটির ভিতর থেকে গাছের অঙ্কুরগুলো ওর সঙ্গে যেন কথা কইত।

তরুলতা প্রাণের প্রকাশ এনেছিল পৃথিবীতে বহুকোটি বছর আগে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত দ্যুলোক থেকে আলোক দোহন ক'রে নিয়েছে, পৃথিবী থেকে নিয়েছে প্রাণের রস। লেখক বলছেন এই ছেলেটি যেন সেই কোটি বছর আগের বালক, যেন সেই প্রথম প্রাণবিকাশের সমবয়সী। একটি শিমুল গাছের সঙ্গে কী রকম ক'রে আত্মীয়সম্বন্ধ বেড়ে উঠেছিল এবং তার পরে কী ঘটল তাই বলো।

কবিতা

কাঙালিনী

ধনীর ঘরে পুজোর আয়োজন ও সমারোহ আর দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে কাঙালিনী—বিস্তারিত ক'রে এই দৃশ্যের বর্ণনা করো। পুজোবাড়িতে তোমরা যে দৃশ্য দেখেছ সেইটি মনে রেখো।

ফাল্গুন

জ্যোৎস্নারাত্রে ছেলেটি একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী কল্পনা করেছে, আর তার চারি দিকের দৃশ্যটি কী রকম, তোমাদের ভাষায় বলো। এই কবিতার ছন্দের বিশেষত্ব কী।

দুই বিঘা জমি

এই কবিতার ভাবখানি কী বুঝিয়ে বলো। এই আখ্যানের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে এমন ক'রে রস দেওয়া হয়েছে কেন।

পূজারিনী

অজাতশত্রু প্রাণদণ্ডের ভয় দেখিয়ে বুদ্ধের পূজা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রাণদণ্ডই পূজার ব্যাঘাত না হয়ে পূজাকে কোন্‌ চরম মূল্য-দ্বারা মূল্যবান ক'রে তুলেছিল সেই কথাটি প্রকাশ ক'রে লেখো।

দিদি

এ একটি ছবি। বালিকাবয়সী দিদি। তার মনে মাতৃস্নেহ রয়েছে বিকশিত; সে বাহিরে কাজকর্ম করতে যাওয়া আসা করে, সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় শিশু ভাইটিকে। ছেলেটা খেলা করে আপন মনে, দিদি কাছাকাছি কোথাও আছে এইটি জানলেই সে নিশ্চিন্ত। এই অত্যন্ত সরল কবিতাটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে কেন লাগে লেখো।

স্পর্শমণি

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যখন দেখলে সনাতন স্পর্শমণিকে নিস্পৃহমনে উপেক্ষা করলেন তখন বুঝতে পারলে যে, লোভেই এই পাথরটাকে মিথ্যে দাম দিয়ে মনকে আসক্ত ক'রে রেখেছে। লোভকে সরিয়ে নিলেই এটা হয় ঢেলা মাত্র। লোভ কখন চলে যায়?

বিবাহ

রাজপুতানার ইতিহাস থেকে এই গল্পটি নেওয়া। বিবাহসভায় মৈত্রির রাজকুমারকে যুদ্ধে আহ্বান, বিবাহ অসমাপ্ত রেখে বরের যাত্রা রণক্ষেত্রে। তার অনতিকাল পরে বিবাহের সাজে চতুর্দোলায় চ'ড়ে বধূর গমন মৈত্রিরাজপুরে, সেখানে যুদ্ধে নিহত কুমার তখন চিতাশয্যায়। সেইখানেই মৃত্যুর মিলনে বরকন্যার অসম্পূর্ণ বিবাহের পরিসমাপ্তি। কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটিকে আগাগোড়া উজ্জ্বল ক'রে মনের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়াই এই কবিতার সার্থকতা।

বিবাহসভায় বরের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান এবং বিবাহের প্রতিহত প্রত্যাশায় কন্যার মৃত্যুকে বরণ এই দুই আকস্মিকতার নিদারুণতায় এই কবিতার রস। এক দিকে করুণতা অন্য দিকে বীর্য মহিমালাভ করেছে তারি ব্যাখ্যা করো।

আষাঢ়

আষাঢ়ে বর্ষা নেমেছে। পল্লীজীবনের একটি উদ্‌বেগের চাঞ্চল্যের উপর এই ছবিটি ঘনিয়ে উঠেছে। সেই উদ্‌বেগের কী রকম বর্ণনা করা হয়েছে মনের মধ্যে এ'কে নিয়ে তোমাদের ভাষায় প্রকাশ করো।

নগরলক্ষ্মী

শ্রাবস্তীপুরীতে দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দিল, বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন এ নগরীর ক্ষুধা-নিবারণের ভার কে নেবে। তাদের প্রত্যেকের উত্তর শুনে বোঝা গেল স্বতন্ত্র ব্যক্তিগতভাবে কারো সাধ্য নেই এই গুরুতর কর্তব্য সম্পন্ন করা। তখন অনাথপিণ্ডদের কন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া বললেন, এই ভার আমি নেব। ভিক্ষুণী আপন নিঃস্বতা সত্ত্বেও এই গুরুভার নিলেন কিসের জোরে।

বিম্ববতী

সুন্দরকে যে নারী সৌন্দর্যে ছাড়িয়ে যেতে চায় সে কি সুন্দরের বিপরীত মনোভাব ও চেষ্টা-দ্বারা জগতে কৃতকার্য হতে পারে। সেই প্রয়াসে ফল হল কী।

কর্ম

কর্মের বিধান নিষ্ঠুর। মানুষের নিবিড়তম বেদনার উপর দিয়েও তার রথচক্র চ'লে যায়। এই কবিতায় যে ভৃত্যটির কথা আছে রাত্রে তার মেয়েটি মারা গেছে, তবু কাজের দাবি থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই কবিতায় যে সকরুণতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা কেবল এ নিয়ে নয়। সকাল বেলায় কয়েক ঘণ্টা কাজে যোগ দিতে তার দেরি হয়েছিল সেইজন্য মনিব যখন ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময়ে মেয়েটির মৃত্যুসংবাদ পাবামাত্র মনিব লজ্জিত হলেন। প্রভু মনিবের ভেদের উপরেও কোন্ এক জায়গায় উভয়ের গভীর ঐক্য প্রকাশ পেল?

সামান্য ক্ষতি

কাশীর রাজমহিষী যখন সামান্য এক ঘণ্টার কৌতুকে গরিব প্রজাদের কুটীরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি অনুভব করতে পারেন নি ক্ষতিটা কতখানি। তার কারণ, তারা ওঁর কাছে এত ক্ষুদ্র যে ওদের ক্ষতিলাভকে নিজের ক্ষতিলাভের সঙ্গে এক মাপকাঠিতে মাপা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। সামান্য ব্যক্তির সত্যকার দুঃখ ও রানীর দুঃখের পরিমাণ যে একই এইটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে রাজা কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

বঙ্গলক্ষ্মী

এই কবিতা বাংলাদেশের মাতৃস্বরূপিণী মূর্তির বর্ণনা। মাতা আপন সন্তানের অযোগ্যতা ক্ষমা ক'রেও অকুণ্ঠিত ভাবে ক্ষমাপূর্ণ কল্যাণ বিতরণ করেন, সেই মাতৃধর্ম বঙ্গপ্রকৃতির সঙ্গে কী রকম মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকাশ ক'রে লেখো।

মূল্যপ্রাপ্তি

স্পর্শমণি কবিতার মধ্যে যে অর্থ পাওয়া গেছে এই কবিতার মধ্যেও সেই অর্থটি আর এক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

অকালে যে পদ্মটি ফুটেছিল সেইটি বুদ্ধদেবকে পুজোপহার দেবার জন্যে যখন দুই ক্রয়েচ্ছুক ভক্তের আগ্রহে তার মূল্য ক্রমশই বেড়ে চলেছিল তখন মালীর মনে হল, যাঁর জন্যে এই প্রতিযোগিতা, স্বয়ং তাঁর কাছে এই পদ্মটি নিয়ে গেলে না জানি কত স্বর্ণমুদ্রাই পাওয়া যাবে। ভগবান বুদ্ধের কাছে যাবামাত্র তার মনে মূল্যের স্বভাব কী রকম বদলে গেল। কেন গেল। সনাতনের কবিতাটি স্মরণ ক'রে সেটি বুঝিয়ে দাও।

মধ্যাহ্ন

মধ্যাহ্নে পল্লীপ্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ গন্ধ শব্দ ও চঞ্চলতার সঙ্গে কবিচিত্তের একাত্মকতা এই কবিতার বর্ণনীয় বিষয়। সেটি গদ্য ভাষায় লেখো।

আদ্য পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(ক) গদ্য

বিচিত্র প্রবন্ধ

ছোটোনাগপুর

এ লেখাকে ঠিক-মতো ভ্রমণবৃত্তান্ত বলা চলে না, কেননা এতে নূতন-পরিচিত স্থান সম্বন্ধে কোনো খবর দেওয়া হয় নি, কেবল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর ছবি দেওয়া হয়েছে। এই ছবিতে দেখা যায় বাংলাদেশের দৃশ্যের সঙ্গে এর তফাৎ। বাংলাদেশে তোমাদের পরিচিত কোনো পল্লীর ভিতর দিয়ে গোরুর গাড়িতে ক'রে যাত্রা এমন ভাবে বর্ণনা করো যাতে এই লেখার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

অসম্ভব কথা

এই গল্পটার মানে একটু ভেবে দেখা যাক। মানুষ চিরকাল গল্প শুনে আসছে, কত রূপকথা, কত কাব্যকথা, তার সংখ্যা নেই। এ রকম প্রশ্ন তার মনে যদি প্রবল হত যে ঠিক এ রকম ঘটনাটি সংসারে ঘটে কি না, তবে সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাকাব্যগুলির একটিও টিঁকতে পারত না। রাবণের দশমুণ্ড অসম্ভব, হনুমানের এক লম্ফে লঙ্কা পার হওয়া কাল্পনিক, সীতার দুঃখে ধরণী বিদীর্ণ হওয়া অদ্ভুত অত্যুক্তি, এই অপবাদ দিয়ে মানুষ গল্প শোনা বন্ধ করে নি। মানুষের কল্পনা এ সমস্ত অপ্রাকৃত বিবরণ পার হয়ে পৌঁচেছে সেইখানে গিয়ে যেখানে আছে মানুষের সুখদুঃখ। গল্পের ভিতর দিয়ে যদি তার হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় তা হলে মানুষ নালিশ করে না।

অসম্ভব গল্প ব'লে যে গল্পটা পড়েছ তার মধ্যে কোনটুকু অসম্ভব এবং তৎসত্ত্বেও এ গল্পে কৌতূহল ও বেদনা সত্য হয়ে উঠেছে কেন বুঝিয়ে দাও। এবং যদি পার এ গল্পটিকে বদল ক'রে দিয়ে সম্ভবপর ক'রে দিয়ে লেখো। বাপের অনুপস্থিতিতে মেয়েটি অরক্ষণীয়া হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি কুলরক্ষার উপযোগী পাত্রে বিয়ে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল এটাকে বাস্তবের রূপ দিয়ে লেখার চেষ্টা করো।

গল্প শোনা সম্বন্ধে প্রাচীন কালের সঙ্গে আধুনিক কালের রুচির কী প্রভেদ হয়েছে তাও জানিয়ে দাও।

কেকাধ্বনি

কেকাধ্বনি বস্তুত কর্কশ অথচ বর্ষার সংগীতের সঙ্গে মিলিয়ে কবিরা তাকে প্রশংসা করেছেন, লেখক এর কারণ যা বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন তোমার ভাষায় তা সহজ ক'রে বলো।

বাজে কথা

সাহিত্যে দুটি বিভাগ আছে। এক দরকারি কথার, আর এক অপ্রয়োজনীয় কথার। লেখক এই দুই বিভাগের লেখার কী রকম বিচার করেছেন জানতে চাই। যে যে বাক্যে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের অর্থ ফুটে উঠেছে বই থেকে তা উদ্ধৃত করে দিলে ক্ষতি হবে না।

মাভৈঃ

এই প্রবন্ধে সহমরণের প্রসঙ্গ গৌণভাবে এসেছে কিন্তু এর মুখ্য কথাটা কী।

পরনিন্দা

এই প্রবন্ধে পরনিন্দার প্রশংসাচ্ছলে কিছু আছে তার প্রতি ব্যঙ্গ, কিছু আছে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশংসা। এই কথাটার আলোচনা করো।

পনেরো আনা

'বাজে কথা' প্রবন্ধে যে কথা বলা হয়েছে 'পনেরো আনা' প্রবন্ধে সেই কথাটা আর-এক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। দুইয়ের মধ্যে মিল কোথায় ব্যাখ্যা করো।

আদ্য পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(খ) পদ্য

বাংলা কাব্যপরিচয়

রামায়ণ : অযোধ্যাকাণ্ড

রামনির্বাসন গদ্য ভাষায় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে লেখো। নমুনা—

অযোধ্যার রাজা দশরথ একদা পাত্রমিত্রগণকে ডেকে বললেন, স্থির করেছি কাল রামের রাজ্যাভিষেক হবে; আজ তার আয়োজন করা আবশ্যক।

কৈকেয়ীর এক চেড়ী ছিল তার নাম মন্থরা, সে ভরতের ধাত্রীমাতা। সে ঈর্ষ্যান্বিতা হয়ে কৈকেয়ীকে গিয়ে বললে, ভরতকে এড়িয়ে রামকে যদি রাজা করা যায় তা হলে অপমানে দুঃখের সাগরে ডুবে মরবি, এর প্রতিবিধান করতে হবে।

প্রথমে কৈকেয়ী এ কথায় কান দেন নি কিন্তু বার বার তাঁকে উত্তেজিত করাতে তাঁর মন বিগড়ে গেল, তিনি মন্থরাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী উপায় করা যেতে পারে।

মন্থরা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে, এক সময় তাঁর ব্রণক্ষতের শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন-উপলক্ষে এক বরে রামের চোদ্দ বৎসর নির্বাসন, আর-এক বরে ভরতকে রাজ্যদান প্রার্থনা করতে হবে।

বাকি অংশের সূচী—

কৈকেয়ীসম্ভাষণে কৈকেয়ীর ঘরে দশরথের গমন।

ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীর ক্ষুব্ধ অবস্থায় দশরথ যখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উপলক্ষে তাঁর ক্ষোভের কারণ দূর করতে স্বীকৃত হলেন, তখন শুশ্রূষাকালীন পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে কৈকেয়ীর দুই বর প্রার্থনা। শুনে রাজার দুঃখবিহ্বল অবস্থা।

এ দিকে অভিষেকসভার বিলম্ব দেখে অন্তঃপুরে এসে দশরথের কাছে সারথি সুমন্ত্রের কারণজিজ্ঞাসা।

কৈকেয়ী-কর্তৃক সমস্ত ঘটনাবিবৃতি ও রাজার কাছ থেকে সত্যপালনের দাবি।

সুমন্ত্রের কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনে অন্তঃপুরে গিয়ে পিতার সত্যরক্ষার জন্য রামের কথা দেওয়া।

অন্যায় সত্য-লঙ্ঘনের জন্য ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের অনুরোধ। পিতৃসত্য-রক্ষায় রামের দৃঢ় সংকল্প। রামের বনযাত্রায় সীতা ও লক্ষ্মণের অনুগমন।

মহাভারত

মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ার বিবরণ পূর্বোক্ত রীতিতে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লেখো।

বারমাস্যা

বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন মাসে সিংহল-রাজকন্যা ধনপতিকে কী উপায়ে ও উপকরণে খুশি করবার প্রস্তাব করছে আপন ভাষায় তার বর্ণনা করো। যেমন—

বৈশাখ মাসে যখন প্রচণ্ড সূর্যের তাপ অসহ্য হয় তখন তোমাকে চন্দন মাখিয়ে সুগন্ধ জল দিয়ে স্নান করাব, শ্যামলবর্ণ গামছা দিয়ে তোমার গা মুছিয়ে দেব। আর নববর্ষে দান দক্ষিণা দেব ব্রাহ্মণকে।

দারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাকে আমের রস খাওয়াব তার সঙ্গে নবাৎ মিশিয়ে।

আষাঢ় মাসে যখন মেঘ গর্জন করে, ময়ূর নাচে, নববর্ষাধারায় মত্ত হয়ে দাদুরী ডাকতে থাকে তখন নৌকায় চোড়ো না, থেকো আমার মন্দিরে, ক্ষীরখণ্ডের সঙ্গে তোমাকে শালিধানের ভাত খাওয়াব। আষাঢ় মাস সুখের মাস, এর মধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত তিন ঋতু একসঙ্গে মিশেছে। ইত্যাদি।

গোষ্ঠযাত্রা

গদ্যে লেখো। নমুনা—

সাজো সাজো ব'লে সাড়া প'ড়ে গেল। বলরামের শিঙ্গা বাজতেই রাখালবেশে প্রস্তুত হল গোয়ালপাড়া। ইত্যাদি।

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি লাটিন গ্রীক ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যরচনার প্রথম সাধনা হয় ইংরেজি ভাষায়। এই চতুর্দশপদী বাংলা কবিতায় তাঁর বলবার বিষয়টা কী।

চিত্রদর্শন

এই কবিতায় যে ছবিগুলির নির্দেশ আছে তাদের বর্ণনা করো।

গ্রাম্যছবি

এই কাব্যে বর্ণিত পল্লীচিত্র গদ্যে রূপান্তরিত করো।

এবার ফিরাও মোরে

এই কবিতায় যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে কী তার উপলক্ষ। কবি নিজেকে কোন্ সংকল্পে উদ্‌বোধিত করছেন। তিনি যে-গান শোনাতে প্রস্তুত হলেন তার মর্মকথা কী। মানবলোকের মর্মস্থানে কবি যে-দেবতাকে উপলব্ধি করেছেন মানুষের ইতিহাসে তাঁর আহ্বান কী রকম কাজ করে। নমুনা—

লোকালয়ে কর্মের অন্ত নেই, কোথাও বা প্রলয়ের আগুন লেগেছে, কোথাও বা যুদ্ধের শঙ্খ বেজেছে, কোথাও বা শোকের ক্রন্দনে আকাশ হয়েছে ধ্বনিত, অন্ধ-কারাগারে বন্ধনজর্জর অনাথা

সহায় প্রার্থনা করছে, স্ফীতকায় অপমানদানব লক্ষ মুখ দিয়ে অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্তশোষণ ক'রে পান করছে স্বার্থোদ্ধত অবিচার ব্যথিতের বেদনাকে পরিহাস করছে, ভীত ক্রীতদাস সংকোচে আত্মগোপন করেছে—ইত্যাদি—ইত্যাদি—কিন্তু তুমি কবি, পলাতক বালকের মতো, কেবল বিষণ্ণ-তরুচ্ছায়ায় বনগন্ধবহ তপ্ত বাতাসে দিন কাটিয়ে দিলে একলা বাঁশি বাজিয়ে। ওঠো কবি, তোমার চিত্তের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে তবে তাই তুমি দান করতে এসো। ইত্যাদি।

দেবতার গ্রাস

এই কবিতার গল্প-অংশ সংক্ষিপ্ত ক'রে লেখো, কেবল রস দিয়ে লেখো এর বর্ণনাগুলি। যেমন—

মৈত্রমহাশয় সাগরসংগমে যেতে প্রস্তুত হলে মোক্ষদা তাঁর সহযাত্রী হবার জন্য মিনতি জানালে। বললে তার নাবালক ছেলেটিকে তার মাসির কাছে রেখে যাবে। ব্রাহ্মণ রাজী হলেন। মোক্ষদা ঘাটে এসে দেখে তার ছেলে রাখাল নৌকোতে এসে ব'সে আছে। টানাটানি ক'রে কিছুতেই তাকে ফেরাতে যখন পারলে না তখন হঠাৎ রাগের মাথায় বললে, চল্, তোকে সাগরে দিয়ে আসি। ব'লেই অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ-মোচনের জন্যে নারায়ণকে স্মরণ করলে। মৈত্রমহাশয় চুপিচুপি বললেন, ছি ছি এমন কথা বলবার নয়।

সাগরসংগমের মেলা শেষ হল, যাত্রীদের ফেরবার পথে জোয়ারের আশায় ঘাটে নৌকো বাঁধা। মাসির জন্য রাখালের মন ছট্‌ফট্‌ করছে।

চারি দিকে জল, কেবল জল। চিকন কালো কুটিল নিষ্ঠুর জল, সাপের মতো ক্রুর, খল সে ছল-ভরা, ফেনাগুলি তার লোলুপ, লক্‌লক্‌ করছে জিহ্বা, লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের ফণা তুলে সে ফুঁসে উঠছে, গর্জে উঠছে, লালায়িত মুখে মৃত্তিকার সন্তানদের কামনা করছে। কিন্তু আমাদের স্নেহময়ী মাটি সে মূক, সে ধ্রুব, সে পুরাতন, শ্যামলা সে কোমলা, সকল উপদ্রব সে সহ্য করে। যে কেউ যেখানেই থাকে তার অদৃশ্য বাহু নিয়ত তাকে টানছে আপন দিগন্তবিস্তৃত শান্ত বক্ষের দিকে। ইত্যাদি।

হতভাগ্যের গান

হতভাগার দল গাচ্ছে যে, আমরা দূরদৃষ্টকে হেসে পরিহাস ক'রে যাব। সুখের স্ফীতবুকের ছায়াতলে আমাদের আশ্রয় নয়। আমরা সেই রিক্ত সেই সর্বহারার দল, বিশ্বে যারা সর্বজয়ী, গর্বিতা ভাগ্যদেবীর যারা ক্রীতদাস নয়। এমনি ক'রে বাকি অংশটা সম্পূর্ণ ক'রে দাও।

বীরপুরুষ

বালক তার মাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করবার যে গল্প মনে মনে বানিয়ে তুলেছে সেটি রস দিয়ে ফলিয়ে লেখো।

সবলা

এই কবিতায় আপন শক্তিতে আপন ভাগ্যকে জয় করবার অধিকার পেতে চাচ্ছে নারী। দৈবের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত ধৈর্য নিয়ে সে পথপ্রান্তে জেগে থাকতে চায় না। নিজে চিনে নিতে চায় নিজের সার্থকতার পথ। সতেজে সে সন্ধানের রথ ছুটিয়ে দিতে চায় দুর্ধর্ষ অশ্বকে দৃঢ় বল্‌গায় বেঁধে। সমস্ত কবিতাটিকে এইরূপে গদ্যে ভাষান্তরিত করো।

প্রশ্ন

এই কবিতায় কী প্রশ্ন করা হয়েছে।

নতুন কাল

এই কাব্যে বিবৃত সে-কালের বর্ণনা করো।

সমুদ্রের প্রতি

এই কবিতাটির বিশেষত্ব এই যে, এর বিষয়টি গম্ভীর, অথচ সমস্তটা ব্যঙ্গের সুরে অবলীলায়িত ভঙ্গিতে লিখিত। অপবাদের ভান ক'রে কবি কী বলছেন সমুদ্রকে, উদ্ধৃত ক'রে দাও। যথা—

ধরণীর প্রতি তার ব্যবহার, কিংবা তার নিরর্থক অস্থিরতা। অবশেষে কী ব'লে তাকে প্রশংসা জানাচ্ছেন। যেমন— তার নূতন দেশসৃষ্টির উদ্যম, কিংবা মোক্ষকামী তপস্বীর মতো যোগাসনে তার ধ্যানমগ্নতা।

দেশের লোক

কবি-কর্তৃক বর্ণিত সাধারণ দেশের লোকের দিনযাত্রা ও মনোভাবের ছবিটি আপন ভাষায় প্রকাশ করো।

চম্পা

বসন্ত যখন শেষ হয়েছে, বিষণ্ন বিশ্ব যখন নির্মম গ্রীষ্মের পদানত, তখন আধেক ভয়ে আধেক আনন্দে একলা এল চাঁপা, রুদ্রের তপোবনে সাহসিকা অপ্সরীর মতো।

এই কবিতাটির বাকি অংশটুকু এই রকম ক'রে গদ্যে লেখো।

হাট

লোকালয়ের মাঝখানে হাটের চালাগুলি, সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বলে না, সকাল বেলায় ঝাঁট পড়ে না, বেচাকেনা সারা হোলেই যে যার ঘরে চ'লে যায়। এক সময়ে সংসারে আবশ্যকের ভিড়, আর এক সময়ে প্রয়োজনের শেষে তার শূন্যতা ও উপেক্ষা। এই যে আছে বিপরীতের লীলা, হাটের প্রসঙ্গে কবি তার কী রকম বর্ণনা করেছেন জানাও।

দেখব এবার জগৎটাকে

জগৎকে সত্য ক'রে দেখতে গেলে কেমন ক'রে দেখতে হবে, তার ভিতরের রহস্য অবারিত হয় কিসের আঘাতে, এ সম্বন্ধে কবি নজরুল ইস্‌লামের নির্দেশ কী জানাও।

সিন্ধু

কবি সমুদ্রকে নমস্কার করছেন। তিনি তার মধ্যে কী ভাব দেখেছেন। এক দিকে দেখছেন তার আত্মনিমগ্ন বিরাট ঔদাসীন্য, আর এক দিকে তার দানের অবিশ্রাম অজস্রতা—সেইসঙ্গে তার হৃত ঐশ্বর্য, রিক্ততার শূন্যময়তা, তার গর্জিত ক্রন্দন। কবির ভাষা অনুসরণ ক'রে এই বিচিত্র ভাবের আলোড়নকে ব্যক্ত করো।

গোঁফচুরি

এই কবিতাটির মজা কোন্‌খানে। আপিসের বড়োবাবু খেপে উঠে গোঁফ-চুরি ব্যাপারটাকে নিশ্চিত সত্য ব'লে মনে ক'রে প্রতিবাদকারীদেরকে নির্বোধ ব'লে তর্জন করছেন। এই অসম্ভব ব্যাপারকে কোনো উচ্চপদস্থ লোক সত্য মনে ক'রে আপন মর্যাদা নষ্ট করছে এইটেই কি কৌতুকের

বিষয়, অথবা যেটা ঘটে নি, যেটা কেউ বিশ্বাস করে নি, সেটাকে বিশ্বাস করার চোখ-টেপা ভঙ্গিতে কবি গম্ভীর ভাবে ব'লে যাচ্ছেন সেইটেই হাসির কথা।

বঙ্গলক্ষ্মী
লক্ষ্মীর উদ্দেশে কবি কী কথা বলছেন।

বনভোজন
কবি কাকে বলছেন বনভোজন। কে ভোজন করাচ্ছে। কী রকম তার বর্ণনা।

প্রেমের দেবতা
যিশুখৃস্টকে উদ্দেশ ক'রে এই কবিতায় যে নিবেদন আছে তার ব্যাখ্যা করো।

বন্দী
কবি কারাবন্দী অবস্থায় পৃথিবীর নানা বন্ধনে বন্দীদের কথা স্মরণ ক'রে কী বলছেন লেখো।

শুধু এক বেরসিকেরই তরে
এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনাটি তোমার ভাষায় লেখো।

ময়নামতীর চর
ময়নামতীর চরের বর্ণনা গদ্য ভাষায় লেখো।

আদ্য পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

(গ) ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ

বাংলা ভাষাপরিচয়

একান্ত একলা মানুষ অসম্পূর্ণ, অশিক্ষিত, অসহায়। তাকে মানুষ হতে হয় দূরের এবং নিকটের, অতীতের এবং বর্তমানের বহুলোকের যোগে। তাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় গোচর এবং অগোচর অসংখ্য লোকের সঙ্গে সম্বন্ধে জড়িত হয়ে। মানুষের সৃষ্ট কোন্ উপায় আছে প্রধানত যার দ্বারা এই যোগসাধন ঘটে।

বাইরের জগৎ নানা বস্তুতে তৈরি, যার রূপ আছে, আয়তন আছে, ভার আছে। মানুষের মনের মধ্যে আছে সেই জগতের একটি প্রতিরূপ, যার স্থূল আকৃতি নেই, বস্তু নেই, কিন্তু তা কী দিয়ে গড়া।

প্রতীক কাকে বলে।

'তিনটে সাদা গোরু' এর মধ্যে 'তিন' এবং 'সাদা' শব্দকে 'নির্বস্তুক' নাম দেওয়া যায় কেন।

জ্ঞানের বিষয় ও ভাবের বিষয়-প্রকাশের ভাষায় পার্থক্য কী। দৃষ্টান্ত দেখাও। ভাষা রচনায় কবিত্বের বিশেষত্ব কী।

ভাষার কাজ জ্ঞানের বিষয়ের সংবাদ দেওয়া, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা, হৃদয়ভাবকে প্রতীতি-গোচর করা, ভাষার অন্য আর-একটি কী কাজ আছে জানাও। কী দিয়ে তার মূল্য নির্ণয় করি।

প্রাকৃত জগতে যা দুঃখজনক সাহিত্যে তা আদর পায় কেন।

প্রাচীন সাহিত্যে কি ছন্দের একমাত্র প্রয়োজন ছিল কাব্যকে সৌন্দর্য দেওয়া।

কোন্ কোন্ অক্ষর-মাত্রা বাংলা ছন্দের মূলে। চলতি ভাষা ও সাধু ভাষার কবিতায় ছন্দো-বিন্যাসের প্রভেদ কী।

মধ্য পরীক্ষা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য

অতিরিক্ত পাঠ্য

বিশ্বপরিচয়

প্রাকৃত জগৎ আর সচেতন প্রাণীর জগৎ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। এই প্রাণীর জগৎ ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়ে চেতনের কাছে বিশেষত্ব লাভ করে। এই বোধের জগৎ প্রাকৃত জগতের বিপরীত বললেই হয়। প্রকৃতিতে যা বৃহৎ আমাদের কাছে তা ছোটো, যা সচল তা অচল, যা ভারহীন তা ভারবান, যা বৈদ্যুতের আবর্তনমাত্র আমরা তাকে কঠিন তরল ও বায়ব পদার্থরূপে ব্যবহার করি। যে প্রাকৃত শক্তি আমাদের কাছে সব চেয়ে মূল্যবান, যা বিশ্বপরিচয়ের প্রথম ভূমিকা করে দিয়েছে, যা আমাদের বোধের কাছে আলোরূপে প্রতীয়মান, তার গতিবেগ এবং তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্বপরিচয় গ্রন্থে যা পড়েছ তার আলোচনা করো।—

(ক) আলো যে চলে তার সব চেয়ে নিকটের প্রমাণ পেয়েছি কোথা থেকে।

(খ) মানুষ আলোর গতিভঙ্গির কী খবর আবিষ্কার করেছে।

(গ) আলোকের ধারা একটি নয়, অনেকগুলি, সে সম্বন্ধে বলবার কী আছে।

(ঘ) বিশ্বব্যাপী তেজের কাঁপন সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে।

(ঙ) সূর্যালোকের ভিন্ন ভিন্ন রশ্মি সম্বন্ধে বক্তব্য কী। অদৃশ্য রশ্মির কথা বলো।

(চ) মৌলিক পদার্থের উদ্দীপ্ত গ্যাসের বর্ণলিপি থেকে তার পরিচয় পাবার বিবরণ।

(ছ) যদিও সূর্যের সমষ্টিবদ্ধ আলো সাদা, তবু নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি কেন।

১। বিশ্বের সূক্ষ্মতম মৌলিক ও যৌগিক উপাদানের অর্থ কী।

২। এক কালে অ্যাটম অর্থাৎ পরমাণুকে জগতের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য উপাদান বলে মনে করা হত। অবশেষে তাকেও বিভাগ করে কী পাওয়া গেল। যা পাওয়া গেল তার স্বরূপ কী। দুই জাতের বৈদ্যুতের কথা।

৩। অণু-পরমাণুগুলি যতই ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে তবু তাদের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে। কেন ফাঁক থাকে।

৪। আমরা যে তাপ অনুভব করি তা কিসের থেকে।

৫। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে যে দুটি বৈদ্যুতকণা আছে তাদের ভিন্নতা কী।

৬। ইলেকট্রিসিটির প্রসঙ্গে যে চার্জ কথার ব্যবহার হয় দৃষ্টান্তসহ তার অর্থ ব্যাখ্যা করো।

৭। ইলেক্‌ট্রোনের আবর্তন সম্বন্ধে কোন্ দুই মত আছে।

৮। একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের নিত্যতা আছে। কোন্ বিশেষ ধাতুর সাক্ষ্যে তা অপ্রমাণ হয়ে গেল। সে সাক্ষ্য কী রকম।

৯। যে-সব ধাতুকে তেজস্ক্রিয় বলা হয়েছে তাদের স্বভাব কী।

১০। ইলেক্‌ট্রোন বা প্রোটোন আপন স্বজাতীয় বৈদ্যুতকণার সঙ্গ কিছুতেই স্বীকার করে না। কিন্তু কোনো পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে একাধিক প্রোটোন ঘনিষ্ঠভাবে থাকে, তার থেকে কী প্রমাণ হয়েছে।

১১। কস্‌মিক্ রশ্মির তথ্য।

১। নীহারিকার বিবরণ।

২। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোকের দূরত্ব দুষ্পরিমেয়। সংখ্যাসংকেতে তার গণনা লিপিবদ্ধ করতে হলে জায়গা জোড়ে। জ্যোতিষ্কশাস্ত্রে কী উপায়ে তাদের প্রকাশ করা হয়।

৩। সূর্য যে নক্ষত্রজগতের অন্তর্গত, আলোবছরের পরিমাপে তার ব্যাসের পরিমাণ আন্দাজে কতখানি।

৪। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব কতখানি।

৫। ঘন নীল রঙের আলো এবং লাল রঙের আলোর ঢেউয়ের পরিমাপ।

৬। কোনো নক্ষত্র যখন আমাদের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে বা দূরে যায় তখন তার আলোর বর্ণলিপিতে কী প্রভেদ ঘটে।

৭। মহাকায় নক্ষত্রদের বৃহত্ত্ব এবং বেঁটে সাদা তারাদের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে কারণ আলোচনা করো।

৮। আমাদের নক্ষত্রজগতের তারাগুলি ভিন্ন দিকে ভিন্ন বেগে চলেছে অথচ একই নক্ষত্র-জগতে একত্রে বাঁধা রয়েছে, তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যও আছে অথচ মূলে তাদের একত্র অবস্থানের ঐক্য। যেন তারা এক নেশন-ভুক্ত অথচ তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাব নেই—ব্যাপারখানা কী।

—

১। সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের জন্মগত সম্বন্ধের প্রমাণ।

২। গ্রহদের জন্ম সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ মত কী। আরও কী কী মত আছে।

৩। গ্যাসদেহী সূর্যের ভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব।

৪। পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের বৃহত্ত্ব এবং গুরুত্বের তুলনা।

৫। পৃথিবী আপন কাল্পনিক মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরপাক খায়, সূর্যও তাই করে। উভয়ের ঘুরপাকের সময়ের পার্থক্য কী।

৬। সূর্য যে আপনাকে আবর্তন করছে জানা গেল কী উপায়ে।

৭। সূর্যের গায়ের যে কালো দাগ, সাধারণ ভাষায় যাকে সৌরকলঙ্ক বলে, তাদের বৃত্তান্তটা কী।

৮। নক্ষত্রজগৎটা অচিন্তনীয় প্রভূত তাপপুঞ্জ। এই তাপ তো নিত্যই খরচ হয়ে চলেছে, কিন্তু তাপের তহবিল পূরণ করে রাখে কিসে।

—

১। আদিম ঘূর্ণ্যমান সৌরবাষ্প থেকে সব গ্রহ যে ছিট্‌কিয়ে পড়েছে তার প্রমাণ কী।

২। সূর্যের কাছ থেকে পৃথিবীর দূরত্বের সঙ্গে বুধগ্রহের দূরত্বের প্রভেদ কী। তার সূর্য-প্রদক্ষিণ করতে কত সময় লাগে।

৩। পৃথিবীর স্বাবর্তনকালের ও বুধগ্রহের স্বাবর্তনকালের তুলনা করো।

৪। বুধগ্রহে বাতাস থাকা সম্ভব নয় কেন, কিন্তু পৃথিবীতে সম্ভব হয়েছে তার কারণ কী।

৫। বুধগ্রহের ওজন আবিষ্কার হয়েছিল কী উপায়ে।

৬। বুধগ্রহের চেয়ে পৃথিবী কতগুণ ভারী।

৭। গ্রহপর্যায়ে বুধগ্রহের পরে আসে শুক্রগ্রহ। সূর্য থেকে শুক্র কতদূরে, এবং সূর্য প্রদক্ষিণ করতে তার কত সময় লাগে।

৮। কোন্ গ্যাসীয় মেঘের ঘন আবরণে এই গ্রহ ঢাকা।

৯। আদিমকালে পৃথিবীর বায়ব মণ্ডলে জলীয় বাষ্প এবং আঙ্গারিক গ্যাসের প্রাধান্য ছিল। ক্রমশ তাদের বর্তমান পরিণতি হল কী করে।

১০। পৃথিবীর পরের গ্রহ মঙ্গল। এর আয়তন কী, এর সূর্যপ্রদক্ষিণ এবং আপনাকে আবর্তনের সময়-পরিমাণ কত।

১১। এর বায়ব মণ্ডলের সংবাদ কী।

১২। মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা। তাদের আবর্তনের নিয়ম।

১৩। গ্রহিকারা গ্রহলোকের কোন্ অংশে থাকে।

১৪। উল্কাপিণ্ডের বিবরণ।

১৫। সূর্য থেকে পৃথিবীর এবং বৃহস্পতিগ্রহের দূরত্বের তুলনা।

১৬। বৃহস্পতির তাপমাত্রার পরিমাণ ও তার বায়ুমণ্ডলের উপাদান।

১৭। বৃহস্পতির দেহস্তরগুলি কী ভাবে কী পরিমাণে অবস্থিত।

১৮। বৃহস্পতির আয়তন। বৃহস্পতির উপগ্রহ কয়টি।

১৯। বৃহস্পতির সূর্যপ্রদক্ষিণ ও স্বাবর্তনের সময়-পরিমাণ।

২০। বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ লাগা থেকে আলোর গতিবেগ ধরা পড়েছিল কী করে।

২১। বৃহস্পতিগ্রহের পরে আসে শনিগ্রহ। সূর্য থেকে তার দূরত্ব এবং সূর্যপ্রদক্ষিণের সময়-পরিমাণ ও বেগ।

২২। পৃথিবীর তুলনায় শনির বস্তুমাত্রার ওজন।

২৩। শনির বড়ো উপগ্রহ কয়টি। টুকরো টুকরো বহুসংখ্যক উপগ্রহের যে মণ্ডলী চক্রাকারে শনিকে ঘিরে, তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের কী মত। একদিন পৃথিবীরও দশা শনির মতো ঘটতে পারে এ রকম অনুমানের কারণ কী।

২৪। শনির বায়ব মণ্ডলের উপাদানের খবর কী পাওয়া গেছে এবং তার দেহস্তরসংস্থান কী রকম।

২৫। শনিগ্রহের পরের গ্রহ য়ুরেনস। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, তার আয়তন, তার সূর্য-প্রদক্ষিণের কাল-পরিমাণ ও গতিবেগ, তার উপগ্রহের সংখ্যা।

(য়ুরেনসের পর আরও দুটি গ্রহ আছে নেপচুন ও প্লুটো—তারা সূর্য থেকে বহুদূরে থাকাতে আলো উত্তাপ এত কম পায় যে এদের অবস্থা কল্পনা করা যায় না। এদের সম্বন্ধে জানা যায় অতি অল্প—এদের বিবরণ বিশেষ করে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই।)

১। পৃথিবীর উপরিস্তরের কী রকম পরিণতি-ক্রমে সমুদ্র ও পাহাড়-পর্বত তৈরি হল।

২। পৃথিবীর জলীয় বাষ্প গেল তরল হয়ে, কিন্তু বাতাসে যে-সমস্ত গ্যাস সেগুলো তরল হল না কেন।

৩। পৃথিবীর হাওয়ার প্রধান দুটি গ্যাস কী। পরস্পরের তুলনায় তাদের পরিমাণ কত।

৪। এক ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া জিনিসে যতটা হাওয়ার চাপ পড়ে তার কতটা ‘ওজোন্’-এর মাপ।

৫। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল থাকার কী কী ফল।

৬। গাছপালা কী উপায়ে আপন দেহে সূর্যের আলো এবং খাদ্য সঞ্চয় করে।

৭। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের দুটো স্তরের কথা বলা হয়েছে, সে দুটোর বিবরণ কী।

৮। বাষ্প-আকারে যখন পৃথিবী ছিল তার থেকে একটা অংশ বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা হয়ে চাঁদ হয়েছে। এই চাঁদ পৃথিবী থেকে কত দূরে থেকে কত দিনে তাকে প্রদক্ষিণ করছে।

৯। চাঁদে বাতাস বা জল নেই কেন।

১০। পৃথিবীসৃষ্টির কতকাল পরে পৃথিবীতে প্রাণের আরম্ভ দেখা গেল। কী আকারে তার আরম্ভ।

১১। সেই আরম্ভ থেকে কী করে প্রাণীদের মধ্যে পরিণতি ঘটতে লাগল।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

পাঠপ্রচয়

চতুর্থ ভাগ

বিদ্যাসাগরজননী

১। বিদ্যাসাগরজননী ভগবতী দেবীর দয়ার বিশেষত্ব কী। সামাজিক কী কারণে এইরূপ দয়া আমাদের দেশে দুর্লভ। দৃষ্টান্ত দেখাও।

লাইব্রেরি

লাইব্রেরি বিস্ময়কর কী কারণে।

অসভ্যজাতির ভাষায় প্রকাশ শব্দে। সেই সশব্দ ভাষাই আমাদের ভাবপ্রকাশের একমাত্র উপায় হইলে লাইব্রেরি সম্ভব হইত না। কী অসুবিধা ঘটিত। ভাষাকে চুপ করাইল কিসে।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের অর্থ ব্যাখ্যা করো।

চতুর্থ প্যারাগ্রাফে 'এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির' থেকে আরম্ভ করিয়া বাকি অংশের অর্থ কী।

গঙ্গার শোভা

'গঙ্গার শোভা' রচনাটির কোন্ কোন্ অংশের বর্ণনা তোমার বিশেষ ভালো লাগিয়াছে।

অনধিকার প্রবেশ

জয়কালী দেবীর চরিত্রের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিয়া লেখো। মাধবীমণ্ডপের পবিত্রতা-রক্ষার কর্তব্য অপেক্ষাও তাঁহার কাছে কোন্ কর্তব্যনীতি কী কারণে শ্রেয় হইয়াছিল।

বোম্বাই শহর

[অনুচ্ছেদ]

১।২। বোম্বাইয়ের সমুদ্র ও কলিকাতার গঙ্গার মধ্যে প্রভেদ ঘটাইল কিসে।

৪। সমুদ্রের বিশেষ মহিমা কী।

৬। বোম্বাইয়ের কোন্ দৃশ্য লেখকের মন সব চেয়ে হরণ করিয়াছিল।

৯। জনসাধারণের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে লেখক কী বলিয়াছেন ব্যাখ্যা করো।

১০। কলিকাতার সঙ্গে বোম্বাইয়ের ধনশালিতার প্রভেদ সম্বন্ধে লেখকের মত কী।

স্বাধীন শিক্ষা

৫। জ্ঞানচর্চার প্রণালী কী।

৬। এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ত্রুটি কী লইয়া।

৭। এই ত্রুটিবশত কী ক্ষতি ঘটে।

১০। এ সম্বন্ধে ছাত্রদের কী উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

১১।১২।১৩।১৪। তথ্যসংগ্রহ, ব্যাকরণ, ধর্মসম্প্রদায়, নৃতত্ত্ব, ব্রতপার্বণ সম্বন্ধীয়।

ভ্রাতৃপ্রীতি

রাজার দায়িত্ব সম্বন্ধে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কী বুঝাইলেন।

[জীবনস্মৃতি]

রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রবর্ণনা যতটুকু পড়িয়াছ তাহার ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় করো।

খোকাবাবু

যেটুকু না রাখিলে নয় সেইটুকুমাত্র রাখিয়া খোকাবাবু গল্পটিকে সংক্ষিপ্ত করো। একটুকু নমুনা দেখাই—

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল। সেই শিশুটি কালক্রমে অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিয়াছে এবং রাইচরণ তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। তাহাকে সে দুই বেলা হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত। বর্ষাকাল আসিল। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন ফু।' অনতিদূরে একটি কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় কদম্ব ফুল ফুটিয়া ছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাইচরণ বলিল, 'তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি।' কিন্তু শিশুর মন সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। জলের ধারে গেল। একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল। রাইচরণ গাছ হইতে নামিয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই।

এইরূপে সংক্ষেপ করিয়া সমস্ত গল্পটি সম্পূর্ণ করো।

মেলা

মেলার উদ্দেশ্য এই যে, আপন সংকীর্ণ পরিবেষ্টনের বাহিরে পল্লীর মনকে প্রসারিত করা। কী উপায়ে মেলা আধুনিক কালের উপযোগী হইতে পারে সে সম্বন্ধে লেখকের মত নিজের ভাষায় প্রকাশ করো। এই মেলাগুলির উৎকর্ষ-সাধনকল্পে জমিদারদের কর্তব্য কী। আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে তোমার নিজের যদি বিশেষ বক্তব্য থাকে তবে তাহা ব্যক্ত করো।

বিদ্যাসাগরের দয়া

বিদ্যাসাগরের দয়াবৃত্তির মধ্যে যে পৌরুষ ছিল দৃষ্টান্তসহ তাহা ব্যাখ্যা করো।

য়ুরোপের ছবি

কিছু বদল করিয়া চলতি ভাষায় লেখো। নমুনা—

রাত্রে এডেন বন্দরে জাহাজ থামল। সমুদ্রে ঢেউ নেই, ডাঙার পাহাড়গুলির উপরে জ্যোৎস্না পড়েছে। আলস্যে জড়ানো চোখে সমস্ত যেন স্বপ্নের মতো ঠেকছে। রাত্রেই জাহাজ ছেড়ে দিল।

সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলির 'পরে রৌদ্রের তাপে বাষ্পের ছোঁয়া লেগেছে, জলস্থল যেন তন্দ্রার আবেশে ঝাপসা।

দূরে দূরে এক-একটা জাহাজ চোখে পড়ে, মাঝে মাঝে দেখা যায় পাহাড়, জলের থেকে

উঠে পড়েছে, এবড়ো-খেবড়ো, কালো, রোদে পোড়া, জনমানবহীন। যেন সমুদ্রের চৌকিদার, আনমনা রয়েছে তাকিয়ে, কে আসে কে যায় খেয়াল রাখে না।

বিলাসের ফাঁস

১। জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য বাহবা পাওয়া। সাবেক কালে যাহা লইয়া বাহবা পাওয়া যাইত এখন তাহার কী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথম প্যারাগ্রাফ হইতে চতুর্থ প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া লেখো।

২। ইহার ফলাফল কী এবং ইহার পক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠিতে পারে তাহার মীমাংসা করো। (৫ হইতে ১১ প্যারাগ্রাফ)

৩। বিবাহে পণ-গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তব্য কী। (১২ প্যারাগ্রাফ)

৪। বর্তমানকালে দেশে বিলাসিতার ফল কী ঘটিতেছে। (১৩ প্যারাগ্রাফ)

সম্পত্তি-সমর্পণ

এই গল্পটি সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিয়া সমালোচনা করো। যজ্ঞনাথের স্বভাবের যে-বিশেষত্ব সমস্ত ঘটনার মূল কারণ, তাহা আলোচনার বিষয়।

খাদ্য চাই

এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব লইয়া যে সমস্যা উঠিয়াছে এই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া তাহার আলোচনা করো।

প্রার্থনা

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে এই কবিতায় যে-সকল প্রার্থনার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে তাহার প্রত্যেকটিরই অভাব আছে। সেগুলিকে স্পষ্ট করিয়া বলো।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

এই কবিতাটির তাৎপর্য কী।

প্রতিনিধি

এ কবিতায় শিবাজীর প্রতি তাঁহার গুরু রামদাসের উপদেশের মর্ম ব্যাখ্যা করো।

তপস্যা

এই কবিতায় যে পয়ার ছন্দ আছে তাহার বিশেষত্ব কী। সূর্যকে তপস্বীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, গদ্যে তাহা বিশ্লেষণ করো।

শরৎ

এই কবিতায় বঙ্গজননীর যে শারদীয়া মূর্তি রচিত হইয়াছে গদ্য ভাষায় তাহার বর্ণনা রূপান্তরিত করো। নমুনা—

হে মাতঃ বঙ্গ, আজ শরৎ-প্রভাতে অমল শোভায় সমুজ্জ্বল কী মধুর মূর্তি তোমার দেখিলাম। ভরা নদী তাহার জলধারা আর বহিতে পারে না, মাঠেও ধান আর ধরে না, তোমার বনসভার দোয়েল কোয়েলের গানে আর বিরাম নাই—হে জননী, শরৎ-প্রভাতে তুমি দাঁড়াইয়া আছ তাহাদের সকলের মাঝখানে। হে জননী, তোমার শুভ আহ্বান নিখিল ভুবনে পরিব্যাপ্ত। তোমার ঘরে ঘরে আজ

নূতন ধান্যের নবান্ন। তোমার শস্যের ভার যতই ভরিয়া উঠিবে ততই তোমার আর অবসর থাকিবে না। গ্রামের পথে পথে কাটা শস্যের গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় প্রসারিত হইবে, তোমার আহ্বানলিপি যে পৌঁছিল সমস্ত ভুবনে।

এইখানে একটি কথা বলা উচিত। কবির এই বর্ণনা শরতের নহে ইহা হেমন্তের। আশা করি এই ভ্রম সত্ত্বেও কবিতাটি সম্ভোগ করিবার ব্যাঘাত হইবে না।

দেবতার বিদায়

এই কবিতাটির অর্থ কী। ইহার সহিত 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের মূল কথাটির ঐক্য আছে, বোধ করি লক্ষ করিয়া থাকিবে।

বন্দীবীর

এই শ্রেণীর কাব্যে পরীক্ষাপত্রে প্রশ্নোত্তর করিবার কিছু নাই। যাঁহারা ইচ্ছা করেন মৃত্যু-স্বীকারী শিখবীরদের কথা ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া পড়িতে পারেন। এইরূপ কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিবার যোগ্য।

বঙ্গমাতা

নির্জীব ভালোমানুষি-চর্চার বিরুদ্ধে কবির ভর্ৎসনা লক্ষ করিয়া এই কবিতাটি তোমার ভাষায় লেখো।

মায়ের সম্মান

গদ্য ভাষায় লেখো। নমুনা—

অপূর্বদের বাড়ি ছিল ধনীর ঘর, আসবাবে ভরা, গাড়িঘোড়া লোকজনে ঠেসাঠেসি ভিড়। এইখানে আশ্রয় লইয়াছিল অপূর্বদের এক মাসি। মোক্ষকামী স্বামী তার স্ত্রী এবং বালক দুইটি ছেলে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেছে ঠিকানা নাই।

কথ্য ভাষাতেও লেখা চলিতে পারে।

পদ্মা

পদ্মার প্রতি কবির প্রীতি-সম্বন্ধ এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, প্রশ্নোত্তরের কোনো অবকাশ নাই। পড়িয়া যদি রস পাও সেই যথেষ্ট।

বিচারক

নির্ভীক কর্তব্যপরায়ণ ত্যাগী ব্রাহ্মণের চরিত্র এই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য। তাহার কাছে দর্পান্ধ নৃপতির বিপুল যুদ্ধ-আয়োজন তুচ্ছ। গদ্য ভাষায় বর্ণনা করো।

বিশ্বদেব

গদ্যে লেখো। যথা, হে বিশ্বদেব, পূর্বগগনে আমার স্বদেশে তোমাকে আজ কী বেশে দেখিলাম। নীল নভস্তলের নির্মল আলোকে চিরোজ্জ্বল তোমার ললাট, হিমাচল যেন বরাভয়হস্তরূপে তোমার আশীর্বাদ তুলিয়া ধরিয়াছে; আর বক্ষে দুলিতেছে জাহ্নবী তোমার হার-আভরণ। হৃদয় খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিমেষের মধ্যে দেখিলাম, বিশ্বদেবতা, তুমি মিলিত হইয়াছ আমার সনাতন স্বদেশে।

দীনদান

ঐশ্বর্যমণ্ডিত মন্দিরে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ভক্ত কেন সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। 'দেবতার বিদায়' কবিতার সঙ্গে ইহার ভাবের মিল আছে।

ভোরের পাখি

ভোরের পাখির ভাবখানা কী। শেষের কয়েকটি শেলাকে ইহার আসল কথাটি পাওয়া যাইবে। বুঝাইয়া দাও।

পরিশিষ্ট

THE NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION, BENGAL
Fifth Standard Examination, 1906

BENGALI

SECOND PAPER

Full Marks 50

Paper set by BABU RABINDRA NATH TAGORE

Examiners BABU KSHIRODPRASAD VIDYABINODE, M. A.
„ PURNA CHANDRA DE, B. A.
„ KSHETRAMOHAN SEN GUPTA

N. B. Candidates are required to answer any THREE out of the four questions of this paper.

১। প্রবন্ধ-রচনা

(ক)

ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবনসম।

গোদাবরীতীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করো, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ; অর্থাৎ কুটীরের সম্মুখবর্তী নদীর তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কী কী গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায় কী আছে তাহা প্রত্যক্ষবৎ লিখ।

অথবা—

(খ) পুরাণে বা ইতিহাসে যাঁহার চরিতে তোমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করো।

অথবা—

(গ) যে-কোনো বাল্যপরিচিত প্রিয় আত্মীয় বন্ধুর বা পুরাতন ভৃত্যের বা পোষা প্রাণীর কথা ও তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া লিখ।

২। পত্র-রচনা

নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া অভিভাবক বা বন্ধু বা যাঁহাকে ইচ্ছা পত্র লিখ।

(ক) 'মেস্' অর্থাৎ ছাত্রাবাসে কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে কিরূপে দিন যাপন করা হয়।

(খ) বর্তমান বৎসরে জলবায়ু ও শস্যাদি-ঘটিত পল্লীবাসীদের অবস্থা।

(গ) যে পাড়ায় বাস কর তাহার বর্ণনা।

৩। অনুবাদ

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যেটির ইচ্ছা বাংলা করো।

(ক) The day is full of the singing of birds, the night is full of stars— Nature has become all kindness, and it is a kindness clothed upon with splendour.

For nearly two hours have I been lost in the contemplation of this magnificent spectacle. I felt myself in the temple of the Infinite, God's guest in this vast nature. The stars, wandering in the pale ether, drew me far away from earth. What peace beyond the power of words they shed on the adoring soul! I felt the earth floating like a boat in this blue ocean. Such deep and tranquil delight nourishes the whole man—it purifies and ennobles. I surrendered myself—I was all gratitude and docility.

(খ) There was once a king who had three sons. He was equally fond of all of them, and he could not decide to which to leave the kingdom after his death. When the time came for him to die, he called them to his bedside, and said, 'My dear children, I have had something on my mind for a long time, which I will now disclose to you; whichever of you is the laziest shall inherit my kingdom.'

The eldest said, 'Then father, the kingdom will be mine, for I am so lazy that when I lie down to sleep, if something drops into my eye I don't even take the trouble to shut it.'

The second said, 'Father, the kingdom belongs to me. I am so lazy that when I sit by the fire warming myself, I would sooner let my toes burn than draw my legs back.'

The third said, 'Father, the kingdom is mine. I am so lazy that if I were going to be hanged and had the rope round my neck, and some one were to give me a sharp knife to cut it with, I would sooner be hanged than raise my hand to the rope.'

When his father heard that, he said, 'You certainly carry your laziness furthest, and you shall be king.'

৪। ব্যাখ্যা

(ক) বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো জাপানী লেখকের নিম্নলিখিত মন্তব্যের সরল ব্যাখ্যা করো—

'জগতে যুদ্ধ কবে নিরস্ত হইবে? য়ুরোপে ব্যক্তিগত ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত আছে বটে, কিন্তু সেখানে জাতিসাধারণের ধর্মবুদ্ধি সে পরিমাণে সচেতন হয় নাই। লুব্ধস্বভাব জাতিদিগের ন্যায়পরতা থাকিতে পারে না এবং দুর্বলতর জাতিদের সহিত ব্যবহারকালে তাহারা বীরধর্ম বিস্মৃত হয়। এ কথা চিন্তা করিতেও হৃদয়ে বেদনা লাগে যে আজিও বাহুবলই জগতে প্রধান সহায়। য়ুরোপে এ কী অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখিতে পাই? এক দিকে হাঁসপাতাল, অন্য দিকে লোকহননের নব নব কৌশল; এক দিকে খৃস্টধর্ম-প্রচারক, অন্য দিকে রাষ্ট্রবিস্তারের বিপুল আয়োজন। শান্তিরক্ষার উপায়সাধনের জন্য এ কী নিদারুণ অস্ত্রসজ্জা! এশিয়াখণ্ডের প্রাচীন সভ্যসমাজে এরূপ বৈপরীত্য

কোনো দিন স্থান পায় নাই। জাপানের প্রথম অভ্যুদয়ের দিন এরূপ আদর্শ তাহার ছিল না এবং এই আদর্শের প্রতি অগ্রসর হওয়া তাহার বর্তমান রাজনীতির লক্ষ্য নহে। এশিয়াকে দীর্ঘকাল যে মোহরজনী আচ্ছন্ন করিয়াছিল, জাপানের দিক্‌-প্রান্তে তাহার আবরণ যখন কথঞ্চিৎ উন্মোচিত হইল তখন দেখা গেল জগতের মানবসমাজ এখনো কুহেলিকায় আবিষ্ট। য়ুরোপ আমাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, কবে সেই য়ুরোপ শান্তির কল্যাণ নিজে শিক্ষা করিবে?'

অথবা—

(খ) নিম্নোদ্ধৃত যে-কোনো একটি কাব্যাংশ গদ্যে প্রকাশ করো। বাক্যগুলিকে পূর্ণতর করিবার জন্য আবশ্যকমত পরিবর্তন বা নূতন কিছু যোজনা করিলে অবিহিত হইবে না।

(১) (যজ্ঞশালায় গোপনে প্রবিষ্ট লক্ষ্মণের দ্বারা আক্রান্ত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দ্বার-রোধ করিতে দেখিয়া কহিলেন)—

'হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড়ো দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমনভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।'
উত্তরিলা বিভীষণ,—'বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?'
উত্তরিলা কাতরে রাবণি,—
'হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে।
... ...
কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজকাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে?'

(২) (কলিঙ্গদেশে অতিবৃষ্টি)—
ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥

নিমেষেকে ঝাঁপে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
কলিঙ্গে থাকিয়া মেঘ করে ঘোর নাদ।
প্রলয় ভাবিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ॥

...

করিকর-সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার, পথ হৈল হারা॥
ঘন বাজধ্বনি চারি মেঘের গর্জন।
কারও কথা শুনিতে না পায় কোনো জন॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সোঙরে সকল লোক জনক জননী॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ॥
গর্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভাসি বুলে জলে।
নাহিক নির্জন স্থান কলিঙ্গ নগরে॥

...

মাঝিয়াতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রমাসেতে যেন পড়ে পাকা তাল॥

...

চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্বত বিশাল।
উড়ি পড়ে ঘর গোলা করে দোলমাল॥

Seventh Standard Examination, 1906

BENGALI

Second Paper

Full Marks 50

Paper set by BABU RABINDRA NATH TAGORE
Examiner : PANDIT TARAKUMAR KAVIRATNA

N. B. Candidates are required to answer any THREE out of the four questions of this paper.

১। প্রবন্ধ-রচনা

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যে-কোনোটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ—

(ক) সঞ্চয় ও সঞ্চার।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক; তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষ বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এক কালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বত সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য।

And the entire object of true education is to make people not merely *do* the right things, but *enjoy* the right things: not merely industrious but to love industry: not merely learned, but to love knowledge: not merely pure, but to love purity: not merely just, but to hunger and thirst after justice.

অথবা—

(গ) রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

২। পত্র-রচনা

নিম্নলিখিত যে-কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া পত্র লিখ—

(ক) জীবনের কোনো একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ।

(খ) জীবিকা-অর্জন ও জীবনের লক্ষ্যসাধন সম্বন্ধে যে শিক্ষা ও যে পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর অভিভাবককে তাহার জ্ঞাপন।

৩। অনুবাদ

নিম্নোদ্ধৃত রচনার ভাবার্থ লিখ। অবিকল অনুবাদ অনাবশ্যক।

(ক) Do you know what slavery means? Suppose a gentleman taken by

a Barbary corsair—set to field-work; chained and flogged to it from dawn to eve. Need he be a slave therefore? By no means; he is but a hardly treated prisoner. There is some work which the Barbary corsair will not be able to make him do, such work as a Christian gentleman may not do, that he will not, though he die for it. ... ... He is not a whit more slave for that. But suppose he take the pirate's pay, and stretch his back at piratical oars, for due salary—how then? Suppose for fitting price he betray his fellow prisoners, and take up the scourge instead of enduring it—become the smiter instead of the smitten, at the African's bidding—how then? Of all the sheepish notions in our English public 'mind', I think the simplest is that slavery is neutralized when you are well paid for it! Whereas it is precisely the fact of its being paid for, which makes it complete. A man who has been sold by another may be but half a slave or none; but the man who has sold himself! He is the accurately Finished Bondsman.

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত রচনার ভাবার্থ লিখ। অবিকল অনুবাদ অনাবশ্যক।

(খ) The peasant has become more of an individual, with less sense of his duty to his community and fellows. United action by the village has become more rare. In the old days a village would combine to build a bridge, a road, a well, a monastery. They hardly ever do so now. The majority cannot impose its will on the minority as it used to do. The young men are under less command; they are more selfish, each for himself, and let the community go hang. Hence the community suffers and the individual also. All morality and all strength depend on combinations; the higher the organism, the better the morality and the greater the strength. With the loosening of this comes weakness, a deterioration of mutual understanding and a lower ethical standard. Both these are noticeable to all who knew the villager twenty years ago. ... The people are not able to retain all that was good in their old system and at the same time accept the new. They think that they are antagonistic. Japan, however, knows they are not so. ... The conflict of the old and new is seen continually. Yet must the village system still endure, as without it there would be only chaos. It is one real and living organism that exists, that belongs to the people and which they understand. I am sure they will not let it go entirely.

৪। নিম্নোদ্ধৃত (ক) ও (খ) দুইটি কাব্যাংশের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গদ্যে প্রকাশ করো। গদ্য রচনারীতির প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও নূতন যোজনা অসংগত হইবে না।

(ক) (কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর মৃতদেহ)

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শবচক্র মহাবেলা; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, ঊর্মির মতন

উদ্‌বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথী মহারথীগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকরতলে।
বাণবিদ্ধমীন-মত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্ছিত বিরাটপতি; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু! ক্ষত কলেবর
রক্তজবাসমাবৃত; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্ছিতা; মূর্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার-সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে; কেবল অচল
এই মহাশোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত পুত্রমুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শবীরত্বক্ষে প্রীতির প্রতিমা!

(খ) (কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুদত্তের আগমন)

ভেট লয়া কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ফোঁটা-কাটা মহাদম্ভ ছিড়া জোড়া কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়া খুড়া খুড়া।
ছিঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইলাম বড়ই আশে বসিতে তোমার দেশে
আগে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলে শীলে বিচারে মহত্ত্বে॥
কহি যে আপন তত্ত্ব আমি দত্ত বালীর দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ বসুর কন্যা দুই জায়া মোর ধন্যা
মিত্রে কৈনু কন্যা সমর্পণ।

গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক কায়স্থ আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পট্টবস্ত্র অলংকার দিয়া করি ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে বন্ধন॥

—

Fifth Standard Examination, 1907

BENGALI

Full Marks 50

Paper set by BABU RABINDRA NATH TAGORE

Examiners { BABU KSHIRODPRASAD VIDYABINODE, M. A.
„ AMULYA CHARAN VIDYABHUSHAN

১। 'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।'

সমস্ত সমাসগুলি ভাঙিয়া উল্লিখিত বাক্যটিকে লিখ। অথবা—

সমাসব্যবহার-দ্বারা ও সর্বপ্রকারে নিম্নলিখিত বাক্যটিকে সংহত করো—

যাঁহার হৃদয় সরল, যাঁহার আচার শুদ্ধ, পতিই যাঁহার প্রাণ এমন স্ত্রীলোককে, কোনো অপরাধ করেন নাই জানিয়াও, যখন আমি অনায়াসে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি তখন এমন কে আছে যে আমা অপেক্ষা মহাপাতকী।

২। সীতার বনবাস গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাটিকে অল্প কয়েক ছত্রের মধ্যে লিখ।

অথবা—

পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তিসম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহার সহিত কবি হেমচন্দ্রের বর্ণনার কী প্রভেদ দেখাইয়া দাও।

৩। অনুবাদ করো—

These old Greeks learnt from all the nations round. From the Phoenicians they learnt shipbuilding; and from the Assyrians they learnt painting and carving, and building in wood and stone; and from the Egyptians they learnt astronomy, and many things which you would not understand. Therefore God rewarded these Greeks, and made them wiser than the people who taught them in everything they learnt; for he loves to see men and children open-hearted, and willing to be taught; and to him who uses what he has got. He gives more and more day by day. So these Greeks grew wise and powerful, and wrote poems which will live till the world's end. And they learnt to carve statues, and build temples, which are still among the wonders of the world; and many other wondrous things God taught them, for which we are wiser this day.

৪। (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে-কোনো দুইটির উত্তর লিখ।

(ক) 'পড়ে থাকে দূরগত
জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মতো ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে।'

মনের কিরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত উপমাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

অথবা—

হাস্ রে শরৎচাঁদ কিরণ বিস্তারি।
পথে মাঠে কী বাহার চেয়ে দেখো একবার
পদব্রজে পথিকের সারি।

এই বর্ণনাটি ফলাইয়া লিখ।

(খ) পল্লীগ্রামে অন্ধকার রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল; বিধবা স্ত্রীলোকের রুগ্ণ ছেলেটির জন্য ডাক্তার ডাকিবার কোনো লোক নাই জানিয়া অবিনাশ ভীতস্বভাব হইলেও ভয় সংবরণ করিয়া ডাক্তারের বাড়ি গেল।

এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করিয়া লিখ।

অথবা—

কলিকাতার অথবা পরিচিত কোনো গ্রাম বা শহরের কোনো একটি পথের কিয়দংশ যথাযথরূপে বর্ণনা করো।

(গ) মনে করো একশো টাকা লাভ করিয়াছ, এই টাকা লইয়া কী করিতে চাও, তাহা বন্ধুকে জানাইয়া লিখ।

অথবা—

তোমার পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্টা তোমার বিশেষ ভাবে ভালো লাগে বা লাগে না, তাহার আলোচনা করিয়া পত্র লিখ।

(ঘ) কবি হেমচন্দ্রের যে কবিতা তোমার সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে, তাহার ভাষা, ছন্দ ও কবিত্ব বিচার করো।

('কবিতাবলী' দেখিয়া লিখিতে পার)

৫। নিম্নোদ্ধৃত অংশ সরল ভাষায় লিখ—

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতাসহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, 'হে দাশরথে, ধর্মচারিণী এই সীতা লোকাপবাদহেতু আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। এই অপাপা পতিপরায়ণা তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন।' রাম বাল্মীকি-কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্বক, জনগণের সমক্ষে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, 'হে ধর্মজ্ঞ, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য। আপনার পবিত্র বাক্যেই আমার প্রত্যয় হইতেছে। এই জানকীকে আমি পবিত্রা মনে জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, সীতাশপথ-দর্শন-জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।' তখন কাষায়বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, 'আমি রাম ভিন্ন জানি না, আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন!' বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে দিব্য সিংহাসন সহসা রসাতল হইতে আবির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী সীতাকে দুই বাহু-দ্বারা গ্রহণ করিলেন। সিংহাসনারূঢ়া সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

অথবা, নিম্নলিখিত কাব্যাংশ গদ্য করিয়া লিখ—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা
হরিলেন পৃথিবী কী আপন দুহিতা?

রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে,
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর, দীপ্ত তারাগণ
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ,
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার—
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।

উল্লিখিত কবিতার তৃতীয় ছত্রে চিন্তান্বিতা শব্দটি কাহার বিশেষণ?

—

Seventh Standard Examination, 1907

BENGALI

Full Marks 50

Paper set by BABU RABINDRA NATH TAGORE

Examiner : BABU KSHIRODPRASAD VIDYABINODE, M. A.

১। (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নচারিটির মধ্যে যে-কোনো দুইটির উত্তর লিখ–

(ক)

'কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্‌ ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর? কোন্‌ গুণে কহ, দেব, শুনি,
কোন্‌ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী, তুমি, প্রভঞ্জনসম
ভীম পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্‌ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী,
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্করেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।'

উল্লিখিত কাব্যাংশকে গদ্য করো। যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাষা সরল করিতে হইবে।

(খ)

অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য;
ক্ষুদ্রকণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব;
ক্ষুদ্রদন্তে তোর মোহন হাস্য;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া, ছুটি'
আসিস্, ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে;
দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণবিক্ষেপে,
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ;
ধরিয়া আমার অংগুলিটি চেপে,
সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।

উহ্য শব্দগুলির পূরণ করিয়া উল্লিখিত কাব্যাংশটিকে গদ্যে লিখ।

(গ) যথাসম্ভবরূপে সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া নিম্নলিখিত গদ্যকে সরল করো—

'সূর্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, এ সে চক্ষু নহে। সূর্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ-সমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্বাকৃতি, সূর্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিতলতার ন্যায় সৌন্দর্য-ভরে দুলিতেছে।'

(ঘ) চারুপাঠের যে-কোনো গদ্যপ্রবন্ধের মর্ম সরল ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

২। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের ভাষায় কোনো নূতন প্রথা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য কী এবং সে প্রথা পরবর্তী কাব্যে প্রচলিত হইয়াছে কিনা?

৩। মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের ছন্দ, ভাষা ও কাব্যরীতির তুলনা করিয়া আলোচনা করো। (গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে)

অথবা—

মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের যে অংশ তোমার বিশেষ ভালো লাগিয়াছে, সেই অংশের সৌন্দর্য বিচার করো। (গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে)

অথবা—

অক্ষয়কুমারের সহিত বিদ্যাসাগরের রচনাসম্বন্ধে কী পার্থক্য তাহা আলোচনা করো।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়টিকে বাংলায় ব্যাখ্যা করিয়া লিখ—

There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that imitation is suicide; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till.

৫। অনুবাদ করো। বাংলাভাষার রীতিরক্ষার জন্য যেটুকু পরিবর্তন আবশ্যক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—

(*a*) The characteristic of heroism is its persistency. All men have wandering impulses, fits, and starts of generosity. But when you have chosen your part, abide by it, and do not weakly try to reconcile yourself with the world. The heroic cannot be the common, nor the common heroic. Yet we have the weakness to expect the sympathy of people in those actions whose excellence is that they outrun sympathy, and appeal to a tardy justice. If you would serve your brother, because it is fit for you to serve him, do not take back your words when you find that prudent people do not commend you. Adhere to your own act, and congratulate yourself if you have done something strange and extravagant and broken the monotony of a decorous age.

অথবা—

(*b*) We are lovers of the beautiful, yet simple in our tastes, and we cultivate the mind without loss of manliness. Wealth we employ, not for talk and ostentation, but when there is a real use for it. To avow poverty with us is no disgrace: the true disgrace is in doing nothing to avoid it. An Athenian citizen does not neglect the state because he takes care of his own household; and even those of us who are engaged in business have a very fair idea of politics. We alone regard a man who takes no interest in public affairs, not as a harmless, but as a useless character. The great impediment to action is, in our opinion, not discussion, but the want of that knowledge which is gained by discussion preparatory to action. For we have a peculiar power of thinking before we act and of acting too, whereas other men are courageous from ignorance but hesitate upon reflection.

৬। সাধারণত এ দেশে যেরূপ নিয়মে ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে হয়, তাহার কোনো পরিবর্তন প্রার্থনীয় কী না, ছাত্রগণ কী পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে এরূপ উপায়ে তাহার যথার্থ পরীক্ষা হয় কী না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করো।

অথবা—

মফঃস্বলের ছাত্রগণকে কলিকাতায় মেসে থাকিতে হইলে সুবিধা-অসুবিধা বিঘ্ন-বিপদ কী ঘটে তাহার বিচার করো।

অথবা—

মোল্লাদের চেষ্টায় সম্প্রতি পারস্যদেশে রাষ্ট্রকার্য-চালনার জন্য প্রজাদের প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত আলোচনা পাঠ করিয়া আমাদের দেশের অবস্থার সহিত তুলনা করো—

The question is whether the whole nation can now transform itself with something of Japan's spirit. The Persians are an intellectual people, full of charm and brilliant qualities, but imitation brings them unusual dangers. Instead of their own beautiful carpets, they turn out rugs representing motors

or lions in aniline dyes. Instead of their own beautiful music, they listen to comic operas on musical boxes and gramophones. Will their last experiment in borrowing from Europe be as uncritical? There is reason to hope, not. The very influence of the priests in the movement seems to show that it is a determined stand for nationality against the predominance of outside interference. We cannot doubt that it is part of that strange movement throughout the east which is borrowing European methods to oppose European exploitation.

৭। নিম্নলিখিত কোনো একটি বিষয় আলোচনা করিয়া বন্ধুকে পত্র লিখ—

(ক) যে পল্লীতে বাস কর তাহার উন্নতির জন্য ছুটির সময় তুমি কী করিতে ইচ্ছা কর।

(খ) শিক্ষার কাল অতীত হইলে নিজের স্বভাব ও সাধ্য-অনুসারে দেশের হিতসাধনের জন্য তুমি কী কাজে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে চাও।

শিক্ষা

প্রকাশ : ১৯০৮

গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্দশ ভাগ রূপে 'শিক্ষা'র প্রথম সংস্করণে (১৯০৮) যে সাতটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তার মধ্যে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' 'আত্মশক্তি'তে (১৯০৫) পূর্বেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯০৭) অন্তর্ভুক্ত না হলেও 'সাহিত্য'-এর পরবর্তী সংস্করণে স্থান পায়। বর্তমান রচনাবলীতে এ দুটি প্রবন্ধ তদনুযায়ী 'আত্মশক্তি' এবং 'সাহিত্য'-এ অন্তর্ভুক্ত। 'তপোবন' প্রবন্ধটি 'শিক্ষা'র ১৩৪২-সংস্করণে কিঞ্চিৎ-পূর্ণতররূপে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বর্তমান রচনাবলীতেও তদনুযায়ী মুদ্রিত। ফলে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

১৩৪২-সংস্করণভুক্ত 'শিক্ষার বাহন' তৎপূর্বেই 'পরিচয়' (১৯১৬) গ্রন্থভুক্ত হয় এবং বর্তমান রচনাবলীতে তদনুযায়ী মুদ্রিত। ফলে 'শিক্ষার বাহন' বর্তমান রচনাবলীতে 'শিক্ষা' গ্রন্থে পুনর্বার মুদ্রিত হয় নি। একই কারণে 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধটি 'সঞ্চয়' (১৯১৬) গ্রন্থভুক্ত, 'শিক্ষা' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

১৩৪২-সংস্করণের পর প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক দুটি প্রবন্ধ ('আশ্রমের শিক্ষা' ও 'ছাত্র সম্ভাষণ') 'সংযোজন' অংশের সূচনায় মুদ্রিত হয়েছে, পরবর্তী রচনাগুলি 'শিক্ষা'র প্রথম সংস্করণে (১৯০৮) অসংকলিত তৎপূর্ববর্তী কালের।

শিক্ষার হেরফের

আমাদের বঙ্গসাহিত্যে নানা অভাব আছে সন্দেহ নাই; দর্শন-বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই; এবং সেই কারণে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় সেজন্য আক্ষেপ পরে করিলেও চলে, আপাতত শিশুদের পাঠ্যপুস্তক দুই-চারিখানি না পাইলে নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না।

পৃথিবীর পুস্তকসাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্‌সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার হয় না।

কেহ-বা মনে করেন আমি শুদ্ধমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে; তেলের কল, সুরকির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারিপুজো কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্যসম্পর্কীয় কোনো কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদ্গতি হয় না। অতএব কমিটি-নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; 'সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।

অতএব, কমিটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টবিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎসম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও সাধারণত বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য পুস্তকগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণী হইতে বহির্ভূত করা যাইতে পারে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোলবিবরণ এবং নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষাপুস্তক।

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, পাস দিয়া, কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুত বেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে? বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার, দুর্ভাগারা ইংরেজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরেজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত, শিশুপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থ

এরূপ খাস ইংরেজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প, ঘরের কথা যে, বড়ো বড়ো বি.এ. এম.এ.দের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা-সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধ-মাত্র বেত হজম করিতেছে মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মশলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা— এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায় মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি.এ. এম.এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিক-শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার ’পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো একটা শিশুপাঠ্য রীডারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে; ইংরেজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক। অথবা snowball খেলায় চার্লি এবং কেটির মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরেজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাৎড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাস, কেহ বা এন্‌ট্রেন্‌স্‌ ফেল; ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না। Horse is a noble animal : বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরেজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূত-রকম হয় না; এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত, অল্প বয়সে আমরা যে ইংরেজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনো প্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়, কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না; মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, 'আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকরি জোটে।' সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিয়ো, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী? যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া, শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরেজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনা-রাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে—যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা, সর্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহসঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার একতিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তি-কালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না?

এক বয়স হইতে আর-এক বয়স পর্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশ পরিণত হইয়া উঠে, এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যক জিনিস হস্তপদের মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোনো প্রস্তুত সামগ্রীর মতো নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর

সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্‌ট্রেন্‌স্‌ এবং ফার্স্ট্‌-আর্ট্‌স্‌ পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি.এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়; তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই, শক্তিও নাই— সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না ইহার অর্থ এই যে স্তূপ উঁচা করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইঁট সুরকি কড়ি বরগা বালি চুন যখন পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণ-স্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে? ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে? ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে? ইহা কি আমাদিগকে বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে? ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়?

মাল-মশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা-নির্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট-পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনি কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ, সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনি হাতে আসে তখনি তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ এক দিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর-এক দিকে জমা হইতেছে; খাদ্য এক দিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর-এক দিকে আপনার জারক রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে—আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব, ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা, কেবলই ঠেঙালাঠি মুখস্থ এবং এক্‌জামিন— আমাদের এই 'মানব-জনম'-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না।

বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনা-সকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা-সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুর-গুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে—যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে—তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করতে পারি না। যদিবা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া, পরম গর্ব অনুভব করে—স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই; আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা সস্তা বিলাতি কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে-সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা সস্তা চক্‌চকে বিলাতি কথা লইয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসংগত প্রয়োগ করি: আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতনশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের

পিতা মাতা— আমাদের সুহৃৎ বন্ধু— আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী— আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা— আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পেঁাছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জীবনকে ভাবের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত— তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়— ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যে দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সে দিকে সভ্যতা-নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি— উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব?

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর

বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ-পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই-যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালি কখনোই ইংরেজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদিবা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরেজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশ-চেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনোই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনি ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনি বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা জান? ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার গভীর মর্ম কি কখনো বুঝিয়াছ? হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, 'আমি যখন মিল্-স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব ক'টা পাস করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরেজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সৌভাগ্য কী হইতে পারে! আমি যখন ইংরেজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড়ো বড়ো ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয় তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধা-বিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখো, আমি তোমার কত উপকার করিতে আসিয়াছি! আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই-চারি কথা

বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুট্‌নোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব এবং বিলাতি সাহিত্যের কোন্‌ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্‌ সমালোচক কী কথা বলেন তাহাও বাঙালির অগোচর থাকিবে না— কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না; আমি ওকালতি করিব; ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইব; ইংরেজি খবরের কাগজে লীডার লিখিব; তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।'

বঙ্গদেশের পরমদুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন-কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলা গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে; যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্য দিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়সম্বন্ধ রূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।' প্রকৃত কথা আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি; দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, 'আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি-যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি, এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।'

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র, কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য; নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

পৌষ ১২৯৯

শিক্ষা-সংস্কার

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলন্ডে ফ্রান্সে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

এমন সময়ে স্পীকার-নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে আইরিশ শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

য়ুরোপের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর-আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়র্লন্ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়া ছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়র্লন্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল তখন তাহারা আহার বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনা মূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মতো আর-কি।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগীগণ বিদ্যা এবং খৃস্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজা শার্ল্‌মান অষ্টম শতাব্দীতে পারিস য়ুনিভর্সিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্লেমেন্‌সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজেরা আয়র্লন্ড আক্রমণ করে তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়র্লন্ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল তখন আয়র্লন্ডের স্বায়ত্ত বিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়র্লন্ডবাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুলি বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক, টুয়ামের আর্‌চ্‌বিশপ, জন ম্যাক্‌হেল্‌, এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাক্‌সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল স্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বল আর মন্দই বল, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয় তখন আয়র্লন্ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল। আইরিশ ভূবৃত্তান্তও ভালো করিয়া শেখানো হইত না। ছেলেরা বিদেশের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত শিখিয়া নিজের দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত।

ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল, আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।

ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা : Intermediate Education। আটশ বৎসর ধরিয়া আয়র্লন্ডে সেই মাধ্যমিক শিক্ষার পরখ করা হইয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ বিদ্যাশিক্ষা সেখানে একেবারে দলিত হইয়া গেল। পরীক্ষাফলের প্রতি অতিমাত্র লোভ করিয়া কলেজে শেখাইবার চেষ্টা হয় না—কেবল গেলাইবার আয়োজন হয়। ইহাতে হাজার হাজার আইরিশ ছাত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বুদ্ধি বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অতিশ্রমের দ্বারা অকালে তাহাদের মন জীর্ণ হইয়া যায় এবং বিদ্যার প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকে না।

এই বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ আইরিশ জাতি কী প্রার্থনা করিতেছে? তাহারা বিপ্লব বাধাইতে চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহারা নিজের হাতে চালাইতে চায়। ব্যয়ের জন্যও কর্তৃপক্ষকে বেশি ভাবিতে হইবে না। শিক্ষাব্যয়ের জন্য আয়র্লন্ডের যে বরাদ্দ নির্দিষ্ট হইতেছে তাহা অতি যৎসামান্য। ইংলন্ডে পুলিস এবং আদালতে যে খরচ হয় তাহার প্রত্যেক পাউন্ডের হারে বিদ্যাশিক্ষায় আট পাউন্ড খরচ হইয়া থাকে। আর আয়র্লন্ডে যেখানে অপরাধের সংখ্যা তুলনায় অত্যন্ত কম, সেখানে পুলিস ও আদালতের বরাদ্দের প্রত্যেক পাউন্ডের অনুপাতে বিদ্যাশিক্ষায় তেরো শিলিং চার পেন্স মাত্র ব্যয় ধরা হইয়াছে।

ঠিক একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সকল অংশের তুলনা হইতেই পারে না। আয়র্লন্ডের শিক্ষানীতি যে ভাবে চলিয়াছিল, ভারতবর্ষেও যে ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু আয়র্লন্ডের শিক্ষাসংকটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না, আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয় সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। তত দিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কুলুপ খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো-চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে; সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া? প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত মারামারির পর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু তত দিন আমাদের মন কী খোরাকে বাঁচিয়াছে? আমরা কী ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্যচর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে? যাহা গ্রহণ করি তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা

হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত, প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। key মুখস্থ করিয়া, শেখা এবং লেখা দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়। যে বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায় সে বয়সের লাভ পুরা লাভ নহে। যে কাঁচা বয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে তখনি সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে মাঠ শস্যশূন্য অনুর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে!

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়; আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি তাহা হয় কোনো-না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, এ কথা কোনো মতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।

আর-একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাক্সন্ করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিকাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষা-ব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক হইতে খর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিস-ভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালির ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিকাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে—ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষির চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে। তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায় তবে ইহাই এক দিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতাসৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন। ইংলণ্ডে এই ক্ষমাগুণের চর্চা যথেষ্ট দেখা যায়—এমন-কি, আমাদের কাছে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক; আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের যখন

সুদিন ছিল তখন ইংলন্ডও কোনো জাতি সম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না, ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে—এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেন্ট-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিন্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেন্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্য-স্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি তখনি আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয় তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশী লোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নহিলে এ দেশের দুর্গতি কিসের! অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি, অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই-যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার—বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

বর্তমান কালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টল্‌স্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।—

It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishments which it controls : schools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on that struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

আষাঢ় ১৩১৩

শিক্ষাসমস্যা

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ এই পরিষদের স্কুল-বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেননা, গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ, বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমনি বলা যাইতে পারে, ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না, এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোন্ ভাবে এই শিক্ষাকার্য চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন 'জাতীয়' ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তবে প্রশ্ন উঠিবে, শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়? 'জাতীয়' শব্দটার কোনো সীমানির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা-কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল, একটা-কিছু চায়, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি এই কথাই সত্য।

আমরা চাই, কিন্তু কী চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য-আবিষ্কারের 'পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি—যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি, তবে বড়ো বড়ো নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্ব-সাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত, নিজের অভাব, বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে আমাদের একটা সুবিধা আছে—আপনারা সমস্তটাকে

কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল 'পস্টারিটি' অর্থাৎ কোনো-একটা অনির্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদ্গতি কল্পনা করিয়া আশ্বাসলাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আজ আপনাদের নিকট বহুল পরিমাণে ধৈর্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়; এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে, সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজে-কর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে, তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই— যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেই প্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে— মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম, কলের কাছে নয়— তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে

হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক আব্‌স্ট্রাক্ট্‌ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল-আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়; তাহা বারিক, পাগ্‌লাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে; কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্‌ আদর্শ বহু দিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়িয়াছি, যে দিকে তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনো বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুশকিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে, অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে তাহার যথাস্থানে, দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এদেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না, অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্‌ কলেজে কোন্‌ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কী, ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতী মনে করে যে লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেক দিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি; তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞানশিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কল-নিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে। তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেন্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে, কিন্তু যাহাকে শিখাইবার তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।

এক দিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল, এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারি দিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই, সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যত দিন অধ্যয়নের কাল তত দিন ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্যপালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্যপালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ—ইহা একটা বরাদ্দ, শিশুকে ভালো করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায় নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎ কথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর-কিছুই নয়—অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতি মুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভানের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্ম সম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকেই বাহ্য ভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে

অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময়, উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইঁট কাঠ পাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্যের কোনো দাবি নাই—তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না—তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতি দিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য—ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাব-সিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজ বটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জল স্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানা-ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের-লোকেরা এ-সকল কথা মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌ বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি—তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনি তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্ত-দীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতি-নাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথম-যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ-

গর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে—এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই—তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়েনয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার 'হরিণবাড়ি'র মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া, মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে! শিশু যে অ্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা-বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই। শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল; সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো, মাতৃগর্ভের দশ মাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না—তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক্, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ-বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার

অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ড-স্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চ টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক্ সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি-টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো-আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায়, অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে, সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যত দিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি তত দিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না; এখন বাজারে স্লেট পেন্সিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুশকিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে এক দিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর-কিছু না হউক হাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি—মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা। এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা, বর্বরতা; বস্তুত তাহা গলদ্ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে, পা'কে, ঘরের মেঝেকে, মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা

নহে—আমাদের পিতা পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থ-ভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিসটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে—সে মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে? প্রথমেই, জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে, গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরু-মহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়—একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। এক পক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্য পক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্‌বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যাবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন, সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন; তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকা-লুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাস-বশতই ছোটো ছোটো ছেলেদের উপরে কন্‌স্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না।

কিন্তু এ-সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ ধরি বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো জোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়। কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি শিল্পীগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে— তাহার কারণ, তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়— তখন এ কথা কেহ বলে না যে বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষা-ফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইঁহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক-একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক, ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা-কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে মানব-সন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে। ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়। প্রথমেই তো বদ্ধ-ডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে, হাত পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই; সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে হতভাগ্য সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে-সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না; ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্তব্য করিতে হইলেও এই-সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই-সকল ভার লইয়া করিতে হয়, ভ্রমণ

করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে, এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয়, কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। জগতে এত বড়ো বন্দী, এত বড়ো পঙ্গু আর-কেহ নাই। তবু কি বলিতে হইবে— এই-সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী? যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধুলা-মাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে যাহাদের সুখ— নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই— তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতা-মাতার দ্বারাই সম্ভব; সেই পিতা-মাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়— অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে : Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming। বাঙালি ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে! বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই-সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে।

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না, কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্বনাশ করিতে বসে!

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত, তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে-কোনো প্রকার অভ্যাসদোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে-সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন— তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর-কাহারও অনিষ্ট অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার রোষ-দ্বেষ অন্যায়-পক্ষপাত বিবাদ-বিরোধ নিন্দা-গ্লানি কু-অভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদ। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাহারই মধ্যে আর-কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতোই

চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারি দিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে; বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়— জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে। কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তিসংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না— বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেক দিন হইতেই সে আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ-আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানি সেরেস্তাদার দারোগা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি; তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়। আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না, কোনো দেশেই কোনো সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্য দেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে— এ দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি। এ ভুল যে সভাস্থলে কোনো-একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশঙ্কা হয় আজ আমরা 'জাতীয়' শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্বত্রই নজির খুঁজিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আরও একটা ছাঁচে-ঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি, নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই— নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের

যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে, এরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয় সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে— শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না। বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তি-লাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর, যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্‌ডিকেট, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

আষাঢ় ১৩১৩

জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর-কোনো প্রয়োজন আছে।

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিসই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে এ কথা বুঝাইয়া দিলেই যে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব তো অনেক আছে, অভাব আছে এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড়ো জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারে না। স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের তালিকা-যোগে লাভ সুবিধা প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুশকিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ বল, আমাদের উপরে যে কিছু নির্ভর করিতেছে এ কথা আমরা একরকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ-সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না-বোঝা দুইই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেন্টের, অতএব আমাদের অভাব কী আছে না-আছে তাহা বোঝার দরুন কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতরো দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরও বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমন-কি অন্যে অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে— এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব তখনি আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে

না, যুক্তি যেখানে আছে পথ সেখানেই। কিন্তু, আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না-করা সে অন্যের হাত, তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণাম-বিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়োই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত বড়ো অনুকূল তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত বড়ো শক্তি ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালির মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয় বিদ্যাব্যবস্থা আকারগ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন—আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘ কালেও হইবার নহে, পূর্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক অসম্ভব অসংগত বলিয়া সবলে পক্কশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে কত অল্প সময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেক দিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল-যে একটা উপস্থিত লাভ আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচজনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই—আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে; আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো; তোমরা অনুভব করো বাঙালি জাতির শক্তির একটি সফলমূর্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই-যে জাতীয় শক্তির তেজ ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড়ো বাড়ি, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গৌরব নহে; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালির নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা—ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অন্যের সঙ্গে

আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়; যেটুকু মেলে সেইটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিত বস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জীব ব্যাপার নহে— আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণসৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে; ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে— ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনোমতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না; সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীব সত্যের সেই সমগ্রমূর্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব করো, সমস্ত বাঙালি জাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো— ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরম ধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোটো হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো, ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো; ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে; সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ, ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না— ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না— কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় নাই সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যাবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্সন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে— দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য যে শক্তি আছে সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তি-

হীনতার অপবাদ দেয় তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয় বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তি সঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি জাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে, এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্প কালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের-শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপযুক্ত দাতা-সকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না। তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া, বড়ো হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম। ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ কেবল কথার কথা হইলে চলে না; চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাংকে ডিপজিট ও চাকরির সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না; কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষুকের মতো দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনোই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয় বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে

আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়; যেটুকু মেলে সেইটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিত বস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জীব ব্যাপার নহে— আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণসৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে; ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে—ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনোমতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না; সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীব সত্যের সেই সমগ্রমূর্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব করো, সমস্ত বাঙালি জাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো—ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরম ধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোটো হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো, ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো; ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে; সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ, ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় নাই সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যাবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্সন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে—দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য যে শক্তি আছে সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তি-

হীনতার অপবাদ দেয় তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয় বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তি সঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি জাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে, এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্প কালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের-শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপযুক্ত দাতা-সকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না। তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া, বড়ো হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম। ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ কেবল কথার কথা হইলে চলে না; চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাংকে ডিপজিট ও চাকরির সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না; কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষুকের মতো দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনোই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয় বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে

রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না, তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব; তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না; তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ-সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথ দুর্গম: আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায় সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি; তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্বহ দুঃখ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা; যে পোলিটিকাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি তাহা আমাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে; সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায় সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়। আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে

ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই। আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞান-সামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না; সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই-সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন-দীপ্তি নূতনব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনি সে অমৃতলাভ করে। ভাবতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে; নানা তথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে। পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণত জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ'—হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি। 'ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ'—হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি। জাতীয় বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরু বিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি, আমরা ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায় সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব, আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকল-বাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতনপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে; তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়; দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে; তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে; সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্। তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে : ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহবান করিয়াছিলেন সে মন্ত্র বহুদিন এ দেশে ধ্বনিত হয় না। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর

স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন : যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। জল-সকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাস-সকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা। সহ বীর্যং করবাবহৈ। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্যপ্রকাশ করি। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক। মা বিদ্বিষাবহৈ। আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি। ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ। হে দেব, আমাদের মনকে মংগলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

ভাদ্র ১৩১৩

আবরণ

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যে দিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম সেই দিন হইতে তেলোটিকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল; এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগের লইতে হইল, এখন খালি পায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ ঘটে। ওখানে ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর; অবশেষে মোজা চটি গোড়তোলা-জুতা বুট প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যংগটির পুজা করিয়া ইহাকে সকল কর্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে খুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেক-গুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাস-ক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়-জুতাকে একটা অন্ধ সংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক তো সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল। তাহার 'পরে বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেক দিন পর্যন্ত কাপড়-জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সংগে উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দর ভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাত-ফেরত নহে, শহরবাসী সাধারণ বাঙালি গৃহস্থও আজকাল বাড়ির বালককে অতিথির সামনে অনাবৃত দেখিলে সংকোচ বোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহ সম্বন্ধে সংকুচিত করিয়া তোলেন।

এমনি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে বয়স পর্যন্ত শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোনো কুণ্ঠা থাকা উচিত নয় সে বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না; এখন আজন্মকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্-একদিন দেখিব, চৌকি-টেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চায় না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই, এক কান্না সম্বল।

অভিভাবকদের লজ্জা-নিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপ-মায়ে এক্‌জিক্যুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর, দুঃখ অভিভাবকের। অকাল লজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশুমাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে শুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল। উলঙ্গতার একটা সুবিধা, তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই শখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন, রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমানপ্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ-সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক হইতে বলিতেছি। মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনো কালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত; অর্থাৎ, বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয় তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্চেস্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতি-সাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশুর ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে; আমরাই তো তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি, সাত বছর। সে-পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবী-মায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে? সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায় তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে, সব জায়গা হইতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাত স্থাপন করা যায় তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে-উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না, কিন্তু দর্জির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম— লক্ষ্মী-ছাড়া কোথা হইতে তাহাতে কালি মাখাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কান-মলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী প্রকারে খাতির করিয়া

চলিতে হয় শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই সে কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন! বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে-কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখসম্ভোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন অতি অকিঞ্চিৎকর পোশাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন ছিল! মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না! আমার ভালো লাগে, অতএব যেমন করিয়া হউক উহারও ভালো লাগা উচিত, এই জবরদস্তির যুক্তিতে কি জগতের চারি দিকে কেবলই দুঃখ বিস্তার করিতে হইবে!

যাহা হউক প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভালো কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সংগে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমরা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্মল বাল্য অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্বদাই অভ্যস্ত না থাকি, তবে বিলাতের লোকের মতো শরীর সম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় তাহা যথার্থই বর্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই-সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই; কোনো কালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা-জিনিসটা যে নৈমিত্তিক, ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলা গায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এ সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে য়ুরোপীয়-দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতিলজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ, অতিলজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতি'র বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাতও করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্যই এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাস-দোষে আমাদের কর্তা হইয়া না উঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে : এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালি গা কিছুমাত্র লজ্জার নহে; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে কাপড় জুতা মোজা যেমন আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বই-পড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বই-পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত— ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখ-কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে, তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিসটা আছে সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি— জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বই-পড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবু-নামক জীব চাকর-বাকর জিনিস-পত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট, যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেই-টুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বই-পড়া বাবুয়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারা লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়; সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বই-পড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়-পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিয়াছে আমাদের মনেরও তেমনি ঘটিয়াছে; সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপন-ভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া, আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া

দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমতো বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা, আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার। কিন্তু সত্যকার মানুষ-যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত; এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই তাহারা 'সভামধ্যে ন শোভন্তে'। কিন্তু সভা তো চিরকাল চলে না। এক সময়ে তো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুশকিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বানরা সভার বাহিরে 'ন শোভন্তে'; তাঁহারা বই পড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; তাহাকে সে দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে, জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আসবাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজা-জানলাগুলোকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে-সকল জিনিস উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উদ্ভাবিত হইয়া দুই-চারিদিন ফ্যাশানের আবর্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে তাহাই কেবল পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানির বলদের মতো ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে-মুখে সহস্র লোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে, অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে—এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চার দিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই-সকল বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে, তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়, সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌-নামক পদার্থ ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত

কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এই-সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়; সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড়ো শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন তো বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজের সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল; তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয় মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই; যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে; সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চের মত, চর্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে, কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই-সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য মতকেও অবিচলিত-সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্বত্র সর্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি-অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে; অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত তাহা ছোটো হউক বড়ো হউক খাঁটি জিনিস হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া ধ্রুবলক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানোকে সে হিতকর্ম বলিয়া মনে করে। সেজন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে। এই-সকল কথার একটুখানি এ দিক-ও দিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায় অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারি দিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে ইহার মোদো গন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে; শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটিদুই-তিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই; নির্মল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতিসভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে, স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ

এবং হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া, উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি, যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই; তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখে-মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশজনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর-দশজনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, যেন তাহা বিদেশী ইস্কুল-মাস্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায় তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা নূতন প্রবেশ করে তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়, অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে তাহারা এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে-সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্-এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতি বুলি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় শেখানোই যে একমাত্র 'শিক্ষা' নামের যোগ্য এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু, বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচারমাত্র উপস্থিত হয় না, তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলা-মেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক! জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে সন্দেহ নাই, আমাদের সহিত সর্বপ্রকার সামাজিক যোগ-বিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর একটা কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প। এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে; সেই অহংকারের যেটুকু সুখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ

করিতাম তবে এতগুলি শিক্ষিত লোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়ান্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র, এবং কতকগুলা পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্তি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল জজ কেরানির অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়।

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই, বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে, যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে, তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। 'আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খৃস্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদরচনা হইয়াছে', এ-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি। বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুট-হীন নির্বিকার, তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে; তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানিতে হইবে, এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে-অল্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইবে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না, বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বালক অল্প-মাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না; শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়—ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয়; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা; তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে—সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন-বশত চিরকালের মতো হারায়—তবু ইহা বিদ্যা, কারণ, ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এতক'টা অঙ্ক এবং এতটা

পরিমাণ বি-এল-এ রে, সি-এল-এ ক্লে! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা; আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের 'পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন; সেইজন্য গুরু-পাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কী বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন না; কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন না; কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

ভাদ্র ১৩১৩

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট-কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন-সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানা দিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত, এ ছাড়া অন্যরকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চার দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সারপদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বসে তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হোক, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে, এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদীসরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল ফাঁকাও ছিল; ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি, এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহির্রভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্প-স্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্‌বিজয়ী হয়েছে—এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন : যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশ সমিৎ জুগিয়েছে; তাঁদের প্রতি দিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য ব'লে, নির্জীব ব'লে, পৃথক ব'লে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যে তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন; সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে যে, বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষের যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য-সাম্রাজ্য নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে; দেশবিদেশের সঙ্গে তার পণ্য-আদান-প্রদান চলেছে; অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে

নিজের ঋণ-স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদিপুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি; তখন চীন হূন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চার দিকে ভিড় করে এসেছে; তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনি উদ্ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনের বনান্তর হতে কুশ সমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করছে। সেখানে হরিণগুলো ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো, তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনি-কন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন, পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবারধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ঐ, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটীরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেববলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংস-শাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে, হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ঐ। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজন্যেই অন্য দেশের সাহিত্যে

দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই, প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই-যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই-যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র— এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা-কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্রমুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে-ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত, আপক্ব শালিরুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরবনূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্দ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না; সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের দুই-একটি খণ্ডকাব্য আছে, নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়; কিন্তু সেই-সকল কাব্যে আসক্তিই একবারে একান্ত। তার চার দিকে আর-কিছুরই স্থান নেই, আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সে-সকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে; কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে, কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্তপ্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

অকালবসন্তসমাগমে বনস্থলীতে যখন অশোকের গাছে গুঁড়ি থেকে একেবারে পল্লব পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফুল ফুটে উঠল, সহকারের শাখা নতুন কিশলয়ে ছেয়ে গেল, তখন মধুকর তার প্রিয়ার সঙ্গে এক পুষ্পপাত্রে মধুপান করতে বসে গেল; কৃষ্ণসার হরিণ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীর গায়ে শিঙ দিয়ে কণ্ডূয়ন করে দিতে লাগল; তখন হস্তিনী পদ্মরেণুগন্ধি গণ্ডূষজল হস্তীকে পান করিয়ে দিলে এবং চক্রবাক আধখানা মৃণাল নিজে খেয়ে বাকি আধখানা চক্রবাকীকে খাইয়ে দিতে লাগল। এমনি করে, কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যানির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে

বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি, যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা-পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্র বর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয়, সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্‌ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা, প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারংবার দুর্গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায়. ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এইরকম এক দিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্যকারু-বিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন : সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম গিয়েছিল; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত— আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বোঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া

কোনো মহৎফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ ক'রে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গলজটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তা-পাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতারণ করে এবং নব-জীবনের অভ্যুদয়বার্তায় জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর, নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিমআকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী! সে কালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর এ কালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

এইজন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে

ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল; অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ; কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের, সকল কালের—কামনাত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের অনুশাসন। এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা—লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার, এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন, এই দুঃখ স্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখ-রূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধা-হীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যেই তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এইজন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্ব-জনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই-যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল, এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদীতৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন—এই তপোবনটি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর, সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষীনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, সেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বীবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ, প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া-ভালো। এই যেমন-হওয়া-ভালোর দিকে যেমন-হয়ে-থাকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। যেমন-হয়ে-থাকে হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর যেমন-হওয়া-ভালো হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্যার দ্বারা অবশেষে যেমন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস-লোকের এই-যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রাকৃতিক ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী; সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ; অতএব, কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন; তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেন নি। এই-সমস্ত নদী-গিরি-অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল; এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি, তিনি বনের আনন্দকেই বারংবার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই-সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়,

সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

> একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
> অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
> রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
> সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
> বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্
> রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে-সকল তরুগুল্ম কিংবা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দবোধ করলেন।

প্রথমে বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি—

> সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
> ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

> দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে, একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

> ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্‌ভির্বিনাভবঃ
> মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম 'শরণাং সর্বভূতানাম্'। ইহা ব্রাহ্মী লক্ষ্মী-দ্বারা সমাবৃত। কুটীরগুলি সুমার্জিত, চারি দিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল, কোথাও বা রমণীয় বনে কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগপক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন; এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদ-বেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়, সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল, সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘন শ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের As You Like It নাটক একটি বনবাসকাহিনী—Tempestও তাই,

Midsummer Night's Dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত, অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি; হয় তাকে জয় করবার নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে হয় বিরোধ নয় বিরাগ নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদিদম্পতি প্রেমের আনন্দপ্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

> Beast, bird, insect, or worm, durst enter none
> Such was their awe of Man...

অর্থাৎ, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই-যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই, ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না; মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয়; সে মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন 'যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে'; তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, 'মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গলে যাচ্ছে।'

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহদুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায়-প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-অরণ্য-নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এইজন্যই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ীহৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে— এক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে; এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই, যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান; মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ-সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই— এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না; এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়; অন্তত সেই-সমস্তই এখানে মুখ্য নয়, এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি-সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে এইজন্যেই তা পুণ্য স্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয়-সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানসসরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্য-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি; তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন-কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায়, কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে, কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে। এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো-একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন-স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্য-

ময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এইজন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরমচৈতন্য তার চেতনাকে এক ভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এইজন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে, নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে; যে লোক চেতনভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব একটি মহৎসিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নতে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না। কারণ, এই-সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা; তার মধ্যেও চিত্তের উদ্‌বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূলে বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্যমাংস-আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে, পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই-যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রতসাধনের জন্যে নয়; নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়; তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমাদের অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে-স্থলে আকাশে গুহায়-গহ্বরে দেশে-বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে, তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্ব-চরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল; সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে, আর এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের মধ্যে নেই। এইজন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

> ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
> মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ? না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু, সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব, যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয়; স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা; বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে-সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক—তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি; সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই। লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্য ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন, এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানবিহীনের দুরাশা মাত্র। কিন্তু, সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেইজন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে, এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে, টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি; তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব, প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনি দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে,

আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়াম-চর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি—ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয়, আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহুপ্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্যপিতামহেরা প্রবেশ করে-ছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয় দল ঠিক তেমনি করেই নূতন-আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু, এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেইসঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল; যা বর্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়; ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্য স্থান হয়ে ওঠে নি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগরনগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; এই নগরস্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর, তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা

নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চার দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যে দিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা-পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদল-বদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্ব-মানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে— দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি— একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদ-রূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে; এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এইজন্যেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না, এইজন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর

শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন ক'রে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

পৌষ ১৩১৬

শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইব, শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কি না তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আর-এক দল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত, এ দ্বন্দ্ব কোনোদিনই মিটিবে না, কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য—সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ, জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না—অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না; অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থানপরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ, আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে; কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সৎশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো একজন

বা এক দল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো? যেমন নদী সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে; খেয়ানৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা-নাপিত বন্ধ। সুতরাং, ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্ব-কালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই; এখনো সে মানুষকে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই, মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকলসমেত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি, অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে— শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে 'ব্যবহারত যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যত তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই'। এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্য পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন

করিতে লজ্জাবোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প; অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়— মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে, অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্যবিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতন কালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বন্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে— তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বন্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না, ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বার বার সেই চেষ্টা করিয়া বার বারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা-বিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্য স্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিও, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার, ইঁহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না, তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে

চান এইটেই তাঁহাদের সব চেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই 'জাতীয়' বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। চ্যাল্‌ফোর্ড্‌, ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

লক্ষ্য ও শিক্ষা

আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যে-সব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে এ কথা বলিতে সময় লাগে না, কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না। যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী? সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে? তাহার আশা-তাপমানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের

জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে চক্ষুষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। এইজন্য বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই পলায়নের শক্তিও তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই; কিন্তু সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তি-সম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।

এই পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধনুক-বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে, এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে' তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতি-হীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না; ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁয়ার কতকগুলা কৃত্রিম নিরর্থক নিয়ম-পালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই'। পাখির ছানা তো বি.এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে

সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বসের সমতুল্য কীর্তি করিয়াছি।'

'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু যদি কেহ মনে করেন, তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আমরা এ পর্যন্ত বার বার নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্ব-সংসারের সকল সমাজের সেরা; এত বড়ো একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে তাহাকে আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়ের-জোরি কৈফিয়ত; যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই। বিষফোড়ায় চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু সুচিকিৎসক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন সুস্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়াদেওয়া আকস্মিক জিনিস নহে। ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার বুদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে; সেইজন্যই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের

দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়? কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়; এক দিকে যাহার ভাগে বেশি পড়ে অন্য দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক-না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থত কী তাহা আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই। সেই পরখ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি। মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত-পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমন-কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠাল গাছকে দ্রুত বেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশে-পাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজন্য কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জন্য সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু সেই চারাটির মজ্জার মধ্যে এই দুর্নিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে; আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব; মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্য দিকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ছাড়িব না।' 'চেষ্টা করাই অপরাধ, যেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমনি।

মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ

বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা এক মুহূর্ত ভুলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি; সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্য যখন আলোক আসন্ন তখনো অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পেঁাছিয়াছে। ইহার বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে; সেই আমাদের দুর্জয় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনি আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথ-যাত্রার আহ্বান বারংবার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর কিছু নাই; ইহাই মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে— এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে। চ্যাল্‌ফোর্ড্‌, গ্লস্টর্‌শিয়র, ১৯ অগস্ট ১৯১২

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই—

এক দল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষেরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে, তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার, যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন, তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পঙ্ক্তিতে পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানবপ্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়ীনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে

তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ কমে না। তেমনি, বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে, মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিংবা টেক্সট্‌বুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিংবা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কান্ট্‌-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দুর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষ কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু, মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই-যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালো বাসুক আর না-বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাব-বশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে, তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্যন্তই যাক্‌ সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন

যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন'।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

ছাত্রশাসনতন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই, বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে মনে বা কানে কানে বা মুখে মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া; এমনতরো অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক্, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো-একটা জায়গায় শাস্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে, এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু, প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই, স্বভাব ওল্টায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষ ভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটা খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার 'পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যই আমাদের

দেশে বলে : প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে; কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশেই য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সে সুযোগে তাদের জীবনের 'পরে মানবসংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্ম-সম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়; কেননা, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতা-পুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্‌বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারও বাধে না; কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না; কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটিমাত্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফর্মাশ তার উপরে। সুতরাং, সেই কলের হিসাবে যে-কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে; তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মতো ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, চীৎকার করিয়া, তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেন্ট্ বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার

অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃস্ট বলিয়াছেন, 'শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে; বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণ-রেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজন্যই চারি দিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানবস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকলপ্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতন্ত্র। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে; এইজন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ-রাজের

প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত-উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন—এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, 'তুমি এই পর্যন্ত আসিবে তার ঊর্ধ্বে নয়', তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, 'তোমরা হঠো, হঠো, আরও হঠো।'

তাই বলিতেছি এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্‌ব্রিজে অক্সফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের ইঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, 'বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্‌জামিন পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকো, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।'

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কাঁচ তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেঁকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়; যা এতদিন ঠান্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, 'কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্টীম্‌রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি করো।'

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লৌহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তর-রুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইস্‌টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুমরুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তার পরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম 'জীবন সার্থক হইল।' জীবন-যাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেঁকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু টিঁকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমাত্র খৃস্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্যব্রতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্যা নহে, নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অন্নপানীয়ের দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন I শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে : Myself—I, by myself I। ইংরেজি এই I শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছু দিন সময় লাগিয়াছে; ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাস্টারমশায় I হইতে ঐ myself-টাকে কালির দাগে লাঞ্ছিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃস্টান হেড্‌মাস্টার বলিতেছেন, 'আমাদের দেশে I শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারে না।' কিন্তু ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে তার ডবল সময়েও কুলায় কিনা সন্দেহ করি। কেননা, ঐ I শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ংকর কড়া, গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন তো কোনো বালাই থাকিত না; এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পোঁছিয়াছে, এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড়ো শক্ত জিনিস।

ইংলন্ড যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্‌সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরও বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্যসভ্যতাও যেমন সত্য দ্রাবিড়সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্তিহীন; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নীচে, এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে; তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার

মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাববশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো এক-জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে. আমাদের দেশ ইংলন্ড নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়; সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাত। এ-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈক্য লইয়াই প্রথম হইতে শুরু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই, কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britannica আমাদিগকে 'শান্তি' দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ, ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু 'বার্ডেন' কেন হইতে যাইবে? এ কেন সৃজন-কার্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভালো, যদি না পারে তবে এই land of regrets-এর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারত-ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে, কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এত দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে; ইতিহাস-রচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইজন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবনমন্ত্রের তপস্বী রাগদ্বেষে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ, ইংরেজ ভারতের ইতিহাস-ধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতে আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবি করিতেই হইবে; আমরা খৃস্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্‌বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ।

এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভালো করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেক দিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম। তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেড্‌মাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু, আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে-দুটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিত-উদ্ধারের দুঃসহ কর্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁরা গ্রীকদের মতো বর্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না। তাঁরা তাঁদের পরমগুরুর মতো করিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছেন, 'ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে, হোক-না তারা বাঙালির ছেলে।' ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন্‌-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজ-বিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয়তো কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না, কিন্তু তাদের অ্যাক্‌সেন্ট্‌ বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ অ্যাক্‌সেন্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি, তাঁর মনে হইল ইংলন্ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি।

য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্‌ট্ সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু, যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে 'নিদারুণ'। বিশেষণপদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, রাশিয়ানের ধর্মপরতা সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবামাত্র তার মানবধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে; তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালি আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাঙালির বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ো কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বর্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালি যুবকদিগকে ভলন্‌টিয়ার্ রূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালিও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপ্‌সা থাকিত না; সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ তো চলিয়া গেল। এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে; এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলই ভুল-বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধুলা উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনই কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার আলোক। এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃস্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনই কি 'চ্যারিটি'র প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই-যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বজ্রবর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে, সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির 'পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের

বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয় তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে; ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলই বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না; আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে-সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফর্মাশ দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো আশ্চর্য হইয়া বলিবেন 'এত করিয়াও বাঙালির ছেলের মন পাওয়া গেল না— কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই' এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন: Father, do not forgive them!

চৈত্র ১৩২২

অসন্তোষের কারণ

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কেন সেই অসন্তোষ? দুইটি কারণ আছে; একটা বাহিরের, একটা ভিতরের।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেক দিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারে অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকের নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই যে এত কাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পানের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীর-বিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা-কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই

বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।

অথচ, বুদ্ধির এই কৃশতা নির্জীবতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নয় তার বর্তমান প্রমাণ: জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল। আমাদের শিক্ষার একান্তদীনতা ও পরবশতা-সত্ত্বেও ইঁহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা বিশ্বজ্ঞানের মহাকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, অতীত কালের একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নানা শাখায় প্রশাখায়, নানা পরীক্ষায় ও উদ্ভাবনায় বিচিত্র বৃহৎ ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরের-ইস্কুলে-শেখা চিকিৎসা-বিদ্যায় আজ আমাদের এত ক্ষীণতা ও ভীরুতা কেন!

ইহার প্রধান কারণ, ভাণ্ডারঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাণ্ডারঘর যাহা-কিছু পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরুর গাড়ির মতো ভাড়া খাটিয়া বাহিরে বহন করিবার জন্য নহে, তাহাকে অন্তরে রূপান্তরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য। আজ আমাদের মুশকিল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটবুকের বস্তা-ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোরুর গাড়িও বাহিরে তেমন করিয়া ভাড়া খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিব্য পাক করিয়া ও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই। তাই আমাদের বাহিরের থলিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাকযন্ত্রটাও রহিল উপবাসী। গাড়োয়ান তাহার লাইসেন্সের পদক গলায় ঝুলাইয়া মালখানার দ্বারে চোখের জল মুছিতেছে, তাহার একমাত্র আশাভরসা কন্যার পিতার কাছে। এমন অবস্থাতেও এখনো যে যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তোষ জন্মে নাই তাহার কারণ, বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না এবং নিষ্ফল অভ্যাস আপন বেড়ার বাহিরে ফললাভের কোনো ক্ষেত্র চোখেই দেখিতে পায় না। উপবাসকৃশ অক্ষম আপন ব্যর্থতার মধ্যেই চিত হইয়া পড়িয়া মনে করিতে থাকে, এইখানেই এক পাশ হইতে আর-এক পাশে ফিরিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া দৈবকৃপায় যেমন-তেমন একটা সদুপায় হইবেই। জামা কিনিতে গেলাম, পাইলাম একপাটি মোজা; এখন ভাবিতেছি, ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনোমতে জামা করিয়া পরিব। ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া অট্টহাস্য করিতেছে।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই, নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।

অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়, সেই কথার আলোচনা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

বিদ্যার যাচাই

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি মনে একটা শ্রেণীবিভাগ-করা ফর্দ লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পয়লা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ তিনি আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া মুখস্থ করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেটুকু ইংরেজি জানা ছিল তাহাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্ তেসরা নম্বরেরও কাছ ঘেঁষিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা, রুচিরসনা দিয়া রসবিচার ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেতু আমাদিগকে চাখিয়া নহে কিন্তু গিলিয়া খাইতে হইবে, কাজেই কোন্‌টা মিষ্ট কোন্‌টা অম্ল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে ভুল করার আশঙ্কা আছে। ইহার ফল কী হইয়াছে বলি। আমাদের শিশু বয়সে দেখিতাম, কবি বায়্‌রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি-পোড়োদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নাই। অল্প কিছু দিন আগেই আমাদের যুবকেরা টেনিসনের নাম শুনিলেই যেরূপ রোমাঞ্চিত হইতেন এখন আর সেরূপ হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলন্ডে কাব্যবিচারকদের রায় অল্পবিস্তর বদল হইয়া গিয়াছে, ইহা জানা কথা। সেই বদল হইবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, সে কারণ তো আমাদের মধ্যে নাই। অথচ তাহার ফলটা ঠিক ঠিক মিলিতেছে। আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত পাছে তাহার উল্টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এইজন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দরটা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না, নহিলে মাসিকপত্রে ইব্‌সেন মেটার্লিঙ্ক ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নয়, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলাইয়া যদি না চলি, যদি জন স্টুয়ার্ট্ মিলের মন্ত্র কার্লাইল-রাস্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় বুঝিয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মিলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারি দিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে; তার কারণ যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এইজন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে, এইজন্য নিজের হিসাব-মত সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা লইবে কোন্‌টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই, জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের 'পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইস্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

আষাঢ় ১৩২৬

বিদ্যাসমবায়

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার্' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তাহার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনো দিন সে কোনো রিভার্ দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গাযমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না, আমি দেখি নাই।' অর্থাৎ এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়; তাহা বহুদূরবর্তী, অথবা তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফিবিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভার্ও রিভার্। কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যন্ত এই খবরটি সে পায় নাই— শেষ পর্যন্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই— তবে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গৃহহীন গৌরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পণ্ডিত আসিয়া কথাচ্ছলে তাহাকে বলে যে 'তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড়ো দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড়ো পাহাড় তার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড়ো নদী', তখন হঠাৎ এই-সমস্ত খবরটায় তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়; নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না; অনেক কালের অগৌরবটাকে একদিনে শোধ দিবার জন্য সে চীৎকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, 'আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।' একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে 'পৃথিবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদের নাই' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; আর আজ যখন সে মাথা তুলিয়া অসংগত তারস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায় যে 'আর-সকলের দেশ আছে, আর আমাদের আছে স্বর্গ' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তাহা মার্জনীয়; এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-পিছনে; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক

বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশবিবর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন্ ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন. এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদিই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সংকল্প হইল তখন তাঁর অতিসম্মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহাকে সর্বসাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে বিপুল বিশ্বসাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হইল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো, আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে সেই শোগুন হইয়া আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করিতেছে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ইহাকেই প্রত্যক্ষ সেলাম করিলাম, ইহাকেই খাজনা দিলাম এবং ইহারই কানমলা খাইলাম। ঘরে আসিয়া ইহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গাল দিলাম; ইহার শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলাম; এ দিকে স্ত্রীর গহনা বেচিয়া, নিজের বাস্তুবাড়ি বন্ধক রাখিয়া, ইহার খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করিবার জন্য ছেলেটাকে নিত্য ইহার কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিলাম।

শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকা-ঢুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া রাখি তাহা হইলে উল্টা ফল হয়। অর্থাৎ, যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। শুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে খেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান

ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-বশতই পোলিটিকাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিকাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্‌ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়া যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

শিক্ষার মিলন

এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি, যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐ-ই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুযোগ এপর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পেঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোনো-একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ ক'রে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব, কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনই আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুত, ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব, শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই—তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে করো, এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কী করে। অন্য ছেলেটি ভালোমানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে; তাঁর দুই হাত মোটরের হাল্ যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁশই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালোমানুষ ছেলে দেখলে, ভায়াটি তার পাকা ফসলের খেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর বললে, 'আমার আর কিছুতে দরকার নেই।'

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে মানুষ খাটো করেছে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পেঁছতে পারে ব'লে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল 'শুধু তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে' তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়।

ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে অনুরূপ শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে : মানব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মরণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ার্‌কে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভল্‌টেয়ার্‌ জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদু-মন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এইজন্যে, এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না; তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিমদেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামি করে এসেছে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকে মেনেছে, নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমুদ্র সাঁতরিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধমরা করে পৌঁছিয়ে দিলে। এর

কারণ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাইরে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?' তারা তখনি বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে করে হোক এরা একটা কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন: যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ ভয়ে, ও ভয়ে, সে ভয়ে, পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু, তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশ-ধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে: যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক; এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিকাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানি হবে; কেবল ছোট্টো ঐ স্ব'টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্যনক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপোষণ হয়, জীবনের সকলপ্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা; এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল

তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বোঝা যেত; কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে তর্কের সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম-ইস্কুলমাস্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বলবে, আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে তো পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বলবে, আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করতে হয়। এ জবাবটা একেবারেই ভালো নয়। কারণ, যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয় চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হবে; নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকবে না, সুতরাং কর্তা না হলে তাদের অচল হবে। আর-একটি কথা, ভুল যখন সত্যের সহায়তা করতে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। 'মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে' না ব'লে যেই বলা হয় 'অপবিত্র করে', তখনই সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিস কিছুকে অপরিষ্কার করে কি না-করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। সে স্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া—হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল—হিন্দুপাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমানপাড়ার স্বাস্থ্য—যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের; কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম; তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি; সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্য বস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বুদ্ধি ও চেষ্টার বাইরে নির্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ সারার পক্ষেও ভালো রাস্তা? এক দিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর-এক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো, এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি, আর চালক যে তার দিকে অসত্য, এই দুয়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শংকরাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাইরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। এ কথা অনেকে বলবেন, পশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম পরে মৃগয়া করত, তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাই নি? বস্ত্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ পারে, ও পারে, দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজ-শাসনবিধি আবিষ্কার করি নি? নিশ্চয় করেছি, কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলেম। পশুচর্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্য-চালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে, বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব, আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সমালোচনা যাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শংকরাচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব

মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপে দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক্ ওয়েল্‌থ্। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে; সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর, যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড়ো পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জানলায় বসেছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরি মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারও হাতে ছিল মাদল, কারও হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দুন চৌদুন লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারোটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তা হলে সমও থাকত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই, উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই। সেই তালমাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল ভরপুর মজা হচ্ছে। আমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড়ো অসহ্য।

তেমনি করেই আটলান্টিকের ও পারে ইঁটপাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচ'র অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়! আরও চাই, আরও চাই, আরও চাই এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে : ততঃ কিম্!

এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর-তালের চেষ্টা থাকে রসের সংযমরক্ষার; বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃংখল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার ধর্মানুষ্ঠান. সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপুরি মাল্লার দল আড্ডা করেছে; তালের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়। সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ—বস্তুকে নয়—আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে; সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না। সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ আনন্দময় মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের 'পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু, বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্বনিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু, যদি এমন ধারণা হয় যে, ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয়, তা হলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে তো আমরা আত্মীয় ব'লে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এমনিতরো চা-বাগানের ম্যানেজারির সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেননা, ভালোমানুষ লোকের নিয়ম-বোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে-ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে—তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক, উকিলের দালাল হোক, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক। কিন্তু এই নেহাত ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার; সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে, 'সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান, আমার 'পরে এই দয়া করো।' অথচ, এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজার-সম্প্রদায় নিখুঁত করে উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচিছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা ডাক্তারখানা হাট-বাজারের যে ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে। কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক'রে তুলে পশ্চিমসমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে।

এ দিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বল, আরোগ্য বল, জীবিকার সুযোগসাধন বল, নানাপ্রকার হিত-কর্মেও মানুষের ষোলো আনা জিত হয়। কেননা পূর্বেই বলেছি, বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফললাভ করে, ফললাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সুবিধাসুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোম-জামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির-মহলের ব্যাবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভের ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানব-সমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড় গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই। কেননা কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই ব'লেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে এ কথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, য়ুরোপে ব্যবহারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেননা আচারই হোক আর ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয়; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কাকে বলে? যিশু বলেছেন: আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

> ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন: মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই:

ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর-কিছুই না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সাধনা হত। তা হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা। আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' সেটাই ডলারের ঘন ধুলায় আচ্ছন্ন। এইজন্যেই সেখানে 'ভুঞ্জীথাঃ' এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য। ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তা ছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে; সেইজন্যে সেই শূন্যতার ক্ষোভে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়, 'আর' 'আর' হাঁকতে-হাঁকতে হাঁপাতে-হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড়দৌড় করাতে-করাতে ঘূর্ণি লাগে; ভুলেই যেতে হয় অন্য যা-কিছু পাই আনন্দ পাচ্ছি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বলবে 'ততঃ কিম্'। তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণ-তত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'বাস্! হয়েছে।'

এই তো গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্‌সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপপ্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে ইতিহাসে আর-কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ঐ কথাটাই তো আমরা বার বার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা, ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।' এক দিকে

এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা-ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিষৎ বলেছেন : অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্য দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অংগ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম-মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নীচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি ক'রে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফুরসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া; এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিমমহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের ক'রে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্বমহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশংকা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির

জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তারাই প্রকাশ পেয়েছে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি, মানুষের দল পর্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতি-রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহা-দুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু ক'রে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেছে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা 'আরে আরে! হাঁ হাঁ' করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েছে— কিছুতে নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, এক দল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বললে, 'শাবাশ! একেই তো বলে উন্নতি।' এ দিকে, আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থা-বিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডির ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডির বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডির মধ্যে সত্যকে পায় ব'লেই সত্যের পুজো ছেড়ে গণ্ডীর পুজো ধরে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডি-দেবতার পুজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, একেই কি বলে ইষ্টদেবতা! এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করে না! এ যখন একদিন পূর্বদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং 'ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায় ধরি ধরি চিবায় সমস্ত'— তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, 'এর পুজো আমাদের বংশে সইবে না।' যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই

অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ প'রে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁৎকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে: বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারোর ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টো দিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় একে ধুলো ক'রে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে। তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আনলে শকুনির মতো কপট দ্যুতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডি-দেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মনি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল ব'লে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মনি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য ক'রে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'—

> যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ
> তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।' এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন: শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শুরু করেছে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পীঠ

স্থাপন ক'রে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা ক'রে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে না ব'লে লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়। সেইজন্যেই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, 'আমি ভিখারি, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারও নেই।' কে বলে নেই? আমি তো শুনেছি পশ্চিমদেশ বারংবার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে।' তাই তো দেখি, আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্সমূলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়িমধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিম রাগেরই তার সপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

আশ্বিন ১৩২৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষে নিজের ন্যূনতা-প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলংকারগুলি বস্তুত শোভন নয়, এবং তা নিষ্ফল। কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা

প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে, এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাই নে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরুণ তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারও অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি, কর্মটি আমার যে উপযুক্ত সে বিচার কর্তৃপক্ষদের দ্বারা পূর্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে—তার থেকে অনুমান করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো-একটি নূতন সংকল্পের সূচনা হয়েছে। হয়তো মহৎ তার গুরুত্ব। এইজন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো-একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েছি। আমি সাহিত্যিক; অতএব, সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্‌বেগের বিষয় নয়, বহু দিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, যুক্তিপ্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল; সর্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি কবির কীর্তি কীর্তিস্তম্ভ নয়, সে কীর্তিতরণী। আবর্তসংকুল বহুদীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর ক'রে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায়, তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো-একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচারদরবারে চূড়ান্ত শুনানির লগ্ন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটে না, বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচারসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরবগম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হল। সুতরাং এই রীতিবিপর্যয় অত্যন্ত বেশি ক'রে চোখে পড়বার বিষয় হয়েছে। এরকম বহুতীক্ষ্ণদৃষ্টিসংকুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি-অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা কঠোর হত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে। বাহির থেকে আমি এসেছি আগন্তুক, এইজন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে, সেই আশ্বাসের আভাস পূর্বেই দিয়েছি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেছি কোনো-একটি ঋতু-পরিবর্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রথম-পদার্পণ-কালে এই কথাটির আলোচনা ক'রে অন্যের কাছে না হোক, অন্তত নিজের কাছে বিষয়টিকে স্পষ্ট ক'রে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব, আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হল তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসংগত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের

বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কিরকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভর্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অর্থাৎ য়ুনিভর্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত-সমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ তার রূপকরণ এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই য়ুনিভর্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভর্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্রপরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো-এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বার বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর কিন্তু ইতিহাসবিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেকপ্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের

সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত ক'রে কী-একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেছে; এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সক্রিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার ক'রে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল; তার কারণ, ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্গতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত ক'রে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎস-রূপে উৎসারিত ক'রে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই এর অলংকরণরেখায়িত শুক্তিরক্ত স্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়া-নিবিড় আম্রবন, নীলপদ্মে-প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল; তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয়তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সংঘের বিস্তারসাধন করেছেন; চারি দিকে উন্নত চৈত্য উঠেছে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারি দিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্মাণে কিরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন, আধুনিক কালে যে রকমের ইঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও যোজনা-পদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন-নির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েছে; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী; তাঁদের চরিত্র পবিত্র, অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের 'পরে সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল ক'রে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে—কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাঁদের 'পরে; সমুদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকাব ক'রে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে

সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে; ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকারচেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ পাই নে। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলি নে; কেননা সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন ক'রে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভাপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক, অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাই নে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না ব'লেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধূমকেতুর সম্মার্জনী কাজ করেছে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিরক্ষাচেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি, দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূতত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণউৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তি বহ্নিশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্সট্ বুক্ থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্নবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান্, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, এই পরীক্ষায় দশজনের মধ্যে অন্তত সাত-আটজন বর্জিত হত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরূক। লোকের মনে উদ্‌বেগ ছিল, পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত; তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরও নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল; কিন্তু, জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ ক'রে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরও-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এইসঙ্গে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সঙ্ঘ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সঙ্ঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ

পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের 'পরিষদ'এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খৃস্টধর্মের আরম্ভকালে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নূতন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন ক'রে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ুরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সঙ্ঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয়, কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসঙ্ঘ, তারই সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্‌টিক সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই-সকল আপ্তবাক্যের অবিসংবাদিত অর্থে পৌঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কিরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তখনকার য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ুনিভর্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন লাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তন-হীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের

প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না ক'রে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে য়ুনিভর্সিটি যেমন উদারভাবে সকল দেশের তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এশিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্রজাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

য়ুনিভর্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেছে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়; তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্‌বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে য়ুনিভর্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লন্ডন য়ুনিভর্সিটিতে, এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা ব'লে কোনো-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভর্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদ্ঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিক কালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহমান

চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য যেমন জলে-স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলন্ডের য়ুনিভর্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্সফোর্ডে দর্শন রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারি দিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্ দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ুনিভর্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেস্টর য়ুনিভর্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। বর্তমান কালের চিন্তা-দ্বন্দ্ব ও কর্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে-সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য ব'লে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্সট্‌বুক-সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধ'রে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজনদরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ ব'লে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এরকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহণেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো কখনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান ক'রে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে; শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে সৃষ্টিকার্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো-বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষা-পদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক ক'রে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়; বাজার-দরের হিসাব ক'রে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায় সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য

দুর্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য ক'রে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন, তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক য়ুরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানবসমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো ক'রে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এইজন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেছে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য ক'রে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের ক'রে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ-বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকরা খুঁটে তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মসলায়। আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই; কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা-নিবারণ ঘটে, লোকদেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ ক'রে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরও শক্ত ক'রেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে : শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব-প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠে নি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা ক'রে, সাহস ক'রে, শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের-

আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার ক'রে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণাবিভাগ স্থাপন করেছিলেন— বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল তার মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশপথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়ীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গি, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাতড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময় লন্ডন য়ুনিভর্সিটিতে মাস-তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেন্‌রি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্স্‌পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের বেরিয়ল আর্ন এবং মিল্‌টনের প্যারাডাইস রিগেন্‌ড্‌ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট-বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর, সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্যশিক্ষার আর-একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্ট্‌শিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তার ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্যবসিতপ্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্যশিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ-অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম শোকাবহ হত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সংকট কাটিয়ে এসেছি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমত কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ ক'রে নেবার ভার আমার 'পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূমমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যুষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

ভাষণ : ডিসেম্বর ১৯৩২

শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কতজনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি ক'রে মনে মনে খুশি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার-ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধু ধু করছে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত-পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি য়ুনিভর্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো-একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এক কালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না, যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে; রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুণ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয় নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষীরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই

বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরুশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা—দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝংকার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই, যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ; বললে, 'তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।' যাত্রী বললে, 'সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল।' দ্বারী বললে, 'ঐ-যে তোমার কাপড়ের নীচে লুকোনো, ঐ-যে তোমার আপনি, ওটা ষোলো-আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়।' এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্‌সিলের মোটা দাগ ডবল ক'রে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, এমন একটা-কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বার বার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুবপ্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা করুণকণ্ঠে কখনো-বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বল, পথকষ্ট বল, রোগ বল, অজ্ঞান বল, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখা-শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে

নেই। জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে যে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে-সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত-সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধু ধু করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারই সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্তজলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত এরা নেমে

গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে-নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে; আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষভাবে; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, ব'হে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্যজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট্‌বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ও পারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বর্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁয়া, কিন্তু খাদ্য তো ও পার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্ঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলাসাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব-যুগান্তরে; আর যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেশন, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির অয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ ক'রে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে; তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ণ বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশ-ধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত; তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুড়ঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই-সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে, আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এজন্যে অন্তত বাঙালি সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে একে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ও দিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা-হোক-কোনো-একটা আস্বাদন পায়। আর, যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারি পর্যন্ত পেঁছিতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায় নি অন্তত তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন, এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যহ; পণ্যের আদান-প্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চার দিক থেকে ঘনঘোর ক'রে। একদা রাজদরবারে বাঙালির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালি কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন; অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এ দিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালি নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুণ্ন করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষ্যা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়োদেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য-সকলকে খর্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দু-মুসলমানে যে-একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে; আত্মীয়কে তুলছে শত্রু ক'রে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙালি হয়ে বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই, কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে

দর-দস্তুর করে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোল টেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না। তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে; দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন ক'রে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরে মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলাসাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় 'শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে ক'মে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্টিজ-হানি হত। শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এন্ড. ও. কোম্পানির ডিনার-কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও

ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা; আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলছি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি : তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধি-পথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগ্‌ড়িয়ে, ধুলায় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী? এত কাল ধরে যা-কিছু সে গড়ে তুলছিল, যা-কিছুকে সে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হলে সান্ত্বনা পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক; বলতে পারছে না 'আমার অন্তরে সম্পদ আছে'। আজ তার মূল্য নেই; কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ ক'রে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যাবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল্‌ চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্‌ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল ক'রে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-

নিরপেক্ষ হয়ে কী ক'রে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষ্যা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন ক'রে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারি'। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এশিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'আমি সব জানব, সব পারব।' এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে যে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না—প্রাণপণ সাধনা এমন-কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত— তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্বল-আত্মা!

'আমরা সব-কিছু পারব' এই কথা সত্য ক'রে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী ক'রে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর ক'রে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবন-যাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষ্যা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করি নে একটু উপলক্ষ ঘটবা-মাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতায় সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ম মেধার গুণে আমরা পড়া মুখস্থ করি; বি.এ., এম.এ. পাস করি; কিন্তু আত্মলাঘবকারী পরস্পরের সৌভাগ্য-বিদ্বেষী নিন্দালোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকলপ্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে পড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর-একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্ত-পিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্ম-সংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলেম শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথি-মাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি, তারা নিন্দা-

বিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়; অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে। ১৫ জুলাই ১৯৩৫

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে—তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন আদালত, সকলপ্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধান-বশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি 'এহ বাহ্য'। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ, শিক্ষায় পরধর্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি, আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম; যেখানে ব্যথা সেখানে বার বার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না; কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয় নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসি নি। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া যেমন নিত্যই আপনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দুঃখগুলির সেই দশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য নয় এ কথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস তাদেরই অজেয় ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দুর্যোগের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। অনাশ্রেণীয় দুঃখও নিজের পৌরুষের দ্বারা প্রতিহত হতে পারে এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্তব্যতা স্মরণ করে অপটু দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তার চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন; মাল-মসলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের; ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুত; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল, সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবে নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে এক-তলার লোকের নিত্যবাস এক-তলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে ঊর্ধ্বপথযাত্রায় এক-তলার প্রয়োজন ছিল; এই ছিল তার উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে ওঠে নি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে: তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্বকার লেখায় এ দেশের সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্‌বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ, অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর-নীচে সম্বন্ধস্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি। সেইজন্যেই ইতিপূর্বে আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে, কিন্তু আসন পায় নি। তবু আর-একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটা জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। ইন্‌ক্যুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত; কিন্তু মুর্গির জীবনধর্মানুগত ডিম পাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজ টিঁকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-পরে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম-মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব-নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেন্ট যেরকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন সেরকম উদ্‌বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সংকোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দু বেলা দু মুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো-আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না। নিরুৎসাহ অবসাদ অকর্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত তা হলে দেখতে পেতুম এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু; সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা দিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ; সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে, অন্য পিঠ সূর্যবিমুখ। তেমনি করে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের

বিরুদ্ধ দিকে চলছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরও প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্য-যোগে চিত্তের ঐক্য-রক্ষাকে সভ্য সমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য বলে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এশিয়ায় নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে, এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে; তার প্রথম ভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

শিক্ষার ঐক্য-সাধন ন্যাশনাল ঐক্য-সাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট করে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখ্‌লে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলা-প্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষার অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনিই ছিল মজ্জাগত। অভ্যাসে চিন্তার যে জড়ত্ব আনে আমাদের দেশে তার আর-একটা দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই আছে। আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখরোচক; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি, ওষুধের কথা ভাবি, হাওয়া-বদলের কথা ভাবি, তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভাবি, এমন-কি, বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি, কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটার নোঙর থাকে মাটি আঁকড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না; মনে করি পালটা ছেঁড়া বলেই পারঘাটে পৌঁছনো হচ্ছে না।

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পূর্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরে নি—তখনো কি আমাদের দেশ শিক্ষায় অশিক্ষায় যেন জলে স্থলে বিভক্ত ছিল না? তখনকার টোলে চতুষ্পাঠীতে তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের যে প্যাঁচ-কষাকষি চলত সে তো ছিল পণ্ডিত পালোয়ানদের ওস্তাদি-আখড়াতেই বদ্ধ; তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্বত্র ঐরকম পালোয়ানি কায়দায় তাল ঠুকে পাঁয়তারা করে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যা-নামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতি তো তার শুঁড় আস্ফালন করে নি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর, নিরবচ্ছিন্ন পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী। পাশ্চাত্য দেশেও স্থূলপদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডান্ট্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কারখানাঘর বানাতে হয় নি; দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা-উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি ক'রেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে—নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা-বা স্থূল, কোনোটা-বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবর-ভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণ-ভরা রক্ত।

অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নীচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু। যেখানে মাটিতে সেই উদ্ভিদসার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বেঁকেচুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নীচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হত। আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য; ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা-সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পরবিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল; সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্‌বৃত্ত-উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্সে-গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি; জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চাত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্‌তলে; তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে— নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই। আধুনিক কালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট-দশ জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা ক'রে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশ জন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে আছে, কেম্‌ব্রিজে আছে, লন্ডনে আছে। আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গি ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে ক'রে বসি এরা পরস্পরের সবর্ণ; যেন ওটিন ক্রিম ও পাউডার মাখলেই মেমসাহেবের সঙ্গে সত্যসত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্যাপ্ত। অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ বলতে শুধু ঐটুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলন্ডকেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্তমানের অসমাপ্তিবশত নয়। এখনো বয়স হয় নি ব'লে যে মানুষটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম নেই তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতীয় বলে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এ দেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই, তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকির প্যাটার্ন দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছুকাল পূর্বে একদিন কাগজে পড়েছিলুম, অন্য-এক প্রদেশের রাজ্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত-পত্তনের সময়ে বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো দালানে বসে পড়াশুনো করা সেও একটা শিক্ষা। অর্থাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বৈ কম নয়। আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামি করা অর্থাভাববশত অসম্ভব ব'লে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে

ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে মূল্যবিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করি নে। বিদ্যা জিনিসটি অমৃত, ইঁটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে। অন্তত, এতকাল সেইরকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না। এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারত, না আছে অতিজটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাপ্রণালী। সেখানে বিদ্যা-দানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে— কেননা, সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্য দেশের কারিগররা যেরকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি ক'রে থাকে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে পারে না। যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিস তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিসটি চাপা পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরিব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষ্যা করে তখন এইরকমই বুদ্ধিবিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি তখন ইঁট-কাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিসের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই, পূর্বদেশে জীবন-সমস্যার আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলই আমরা স্খলিত হচ্ছি। তার ফলে হল এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ববৎ, এমন-কি, তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রি নীচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে করে দেখো-না— এ দেশে বহুরোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্যবিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতিবিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমন-কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেশনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস-জোগানে টানাটানি চলেছে। তা হোক, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

আজকালকার অস্ত্রচিকিৎসায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করছে। কিন্তু বাইরে-থেকে-জোড়-লাগা জিনিসটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে মিলিত না হলে সেটাকে সুচিকিৎসা বলে না। তার ব্যান্ডেজ-বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্ফীতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব এবং তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু মুমূর্ষু প্রাণপুরুষের এতে সান্ত্বনা নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা পূর্বেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হুন্ডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধনহারা

ব্যবসায়ে মুনফা বলে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরপরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে এই দালানের নিভৃত খ্যাতি-হীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথযোগে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তখন মানহানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য ভবিষ্যৎদৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরও অনেক বেশি অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে-সকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে, অবকাশকালেও বার বার তার পাতা উল্টিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষাপরিবেশনের স্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরিব-ভাবে-ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল— এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল-বিল-নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি-পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জে মশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজিবিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলৎশক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরও এগোত। হয়তো সেই চালনার সংকেত মন্ত্রণাসভার দফ্তরে এখনও পরিণতির দিকে উন্মুখ আছে।

তবু আমি যে আজ উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যাসমাধান দুরূহ ব'লে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবী কালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দুয়েক ধরে ছেলেটার কেবল পা'খানা তয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কনুইটা

পর্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে মূর্তি কারখানাঘরে-তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালকবিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, এক দল ছাত্র স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে ম্যাট্রিকের দেউড়িটা পেরিয়ে যায় উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলায় বসে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরত। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব ক'জন ছেলের কাছে আশা করা যায়?

শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে আন্ডামানে চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলণ্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না বলেই ফাঁসি? না বুঝে বই মুখস্থ ক'রে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।

তা হোক, যে উপায়েই তারা পার হোক, নালিশ করতে চাই নে। তবু এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহুসংখ্যক যে-সব হতভাগা পার হতে পারল না তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই নাহয় দু-ফাঁক হয়েছে, কিন্তু কোনো রকমেরই সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটবে না— একটা লাইসেন্স্-দেওয়া পান্সি, মোটর-চালিত নাই-বা হল, নাহয় হল দিশি হাতে-দাঁড়-টানা?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্বত নড়েন না, কাজেই সচল মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ইংরেজ ম্যাজিস্‌ট্রেটকে জানতুম; তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই; কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙালি বক্তাদের মধ্যে যা যা বক্তব্য ছিল বলা হলে পর ম্যাজিস্‌ট্রেটের মনে হল, গ্রামের লোককে বাংলায় কিছু বলা তাঁরও কর্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজি বক্তৃতা এইমাত্র তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বেশি আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হয় না। ম্যাজিস্‌ট্রেট নিজেই জানতেন, তাঁর বাংলা-কথনের ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন আনন্দে যার অর্থবোধ করতে পারে সম্যক্। তাই নিয়ে তিনি হেসেওছিলেন। আমরা হলে কিছুতেই হাসতে পারতুম না, ধরণীকে অনুনয় করতুম দ্বিধা হতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের

বিদেশিত্বের কৈফিয়ত আত্মীয় বা অনাত্মীয়-সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জর্মান তত্ত্বজ্ঞানী অয়্‌কেনের ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যুক্তি ব'লে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুনলে আমি বুঝতে পারি সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়্‌কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধা লেগেছিল। এ নিয়ে অয়্‌কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এ দশা আমার হলে কী হত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞা-সূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে; কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্য ব'লে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারি নে। আমাদের কারও ইংরেজিতে ত্রুটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক, অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো ক'রে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো ক'রে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি, তাই মন বলতে থাকে, কী জানি! আমার সেই শিক্ষানেতা গুরুজনের মতো অভিভাবক বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যাবে না, তাই বেশি দাবি ক'রে লাভ নেই। বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবিকে পুরাতন অধীনতার সেফ্‌গার্ড্‌স্‌এর দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে, এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মসলায় বিলিতি ডেক্‌চিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বসুক, আর যারা রবাহূত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল, কলাপাত পড়ুক।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই, এই কঠিন তর্ক তুললে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘূর্ণি হাওয়াতেই আবর্তিত হতে পারত; দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ ক'রে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প; সেইজন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া এ কথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর-কিছুই হতে পারে না। ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দু ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারই প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারতও হল, সিঁড়িও হল, নীচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চলছে। হতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারি দিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে যিনি এমন মহৎ সংকল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আকবর হয়্‌দরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞানসাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দুভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে

প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্যে দাবি করবে কোন্ স্পর্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি য়ুনিভর্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটেছুঁটে কুর্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত ক'রে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদ্‌ঘর্ম চেষ্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারি দিকে, না পৌঁচচ্ছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারংবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনও যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভর্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জৃম্ভিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে', যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I, by myself I', তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদ্গতি ছিল 'নর্মাল স্কুল'-নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা-পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা-ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হতে হয় নি। এমন-কি, সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে মেঘনাদবধ পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বাঁ গালে একটা বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত; যতদূর মনে পড়ে মহাকাব্যের শেষ সর্গ পর্যন্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটে নি, অথবা সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরও আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী

ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারি নে ব'লে, তুলনা করতে পারি নে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কচি বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক ক'রে তুলতে হয় নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই ক'রে ক'রে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখে নি। আমার ইংরেজিশিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা-কিছু ছেঁড়া-ফাটা, যা-কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানি নে হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন, এ কথাটা কাজের কথা নয়, এ কবিকল্পনা। তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

সংযোজন

আশ্রমের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ— নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।' বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য বলে জেনেছি।

আরও একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি ঝর্নার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী', তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র; প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে 'চুপ চুপ'; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি

পাবার জন্যে তারা ছটফট করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বের্গ্‌সঁ-এর বচন! এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্ব-প্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা : তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথিপরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রমবালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্য-বিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আশ্রম-বাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী ও মলিন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরে প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণলাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তু-পরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বচর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক আপদ-জনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে ক'রে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আব্দার বেড়ে ওঠে, এমন-কি, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ ক'রে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, 'তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পার না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির করে রেখেছ যে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মসম্মান থাকে না।'

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো; অভ্যস্ত

হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে ক'রে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত করে তুলি। শরীরমনের শক্তির সম্যক্ চর্চা সেখানেই ভালো ক'রে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট নমুনামত রূপ নেবার জন্যে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষে আর-একটি কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরতন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো ক'রে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে. সমস্ত পৃথিবীর সব-কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সব-শেষে বলব যেটাকে সব-চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব-চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পরজাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে. এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়—মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

আষাঢ় ১৩৪৩

ছাত্রসম্ভাষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হল।

দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এ দেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা, যে বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ-সুযোগ-প্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলংকারপ্রসাধনের সামগ্রী বলেই আদরণীয় হয় নি; নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে বলেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এইজন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষ্যাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার ক'রে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলের বড়োমাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি; জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশনকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারামরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচ-বশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তিব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব ক'রে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছে

যারা এই শিক্ষায় পার হল তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী বলে গণ্য হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী ক'রে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া?

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, এ'কে অঙ্গীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত ব'লে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতা ধন্য ও গ্রহণ করবার শক্তি দ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থ-ভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারে সর্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যা-গণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করে নি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান ব'লে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্ত-ভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্মবিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্যসৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক লাটিন আয়ত্ত ক'রে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্‌বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথমপদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসি

বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্‌টন-হোমর-প্রতিভার অতিথিসৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজিভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। কিন্তু, যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। যেমন দূর গিরিশিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জনস্থানের মধ্য দিয়ে তখন দুইতীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান করে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান ক'রে তুলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে-পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরসভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তালাভে গৌরবান্বিত হবে. সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন ক'রে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশাধিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয় নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তার পর কিশোরবয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমত একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে। সেই এক দিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন-কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলেম এবং আর যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের এক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনা-পুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।

বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার 'পরেই। বুদ্ধিপরিশীলনার

বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভ্য পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা ঐক্যলাভে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই এবং চিন্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, য়ুরোপীয় চিত্তের ভূমিকার উপরে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হত, যদি-না এই চিত্ত জয়যুক্ত হত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসারযাত্রার কৃতার্থতালাভের জন্য আজ পৃথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই য়ুরোপের এই চিত্তস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত ক'রে দেবার চেষ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রজাদের মনঃক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববিদ্যাসেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবযুগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষা-সঞ্চিত স্তূপাকার নিরক্ষরতার বাধা অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে; সেখানে যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায় সে আজ অবারিত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এ দিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনগুলি স্বল্পপরিমিত ছাত্রদেরকে স্বল্পমাত্র বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার স্বল্পায়তন খেয়ানৌকোর কাজ করে চলেছে। দেশের আত্মচেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়; সে স্পর্শও ক্ষীণ, যেহেতু তা প্রাণবান নয়, যেহেতু সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধার ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচ্যমহাদেশের যে-যে অংশে নবদিনের উদ্‌বোধন দেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতির্বিকীর্ণ আত্মপরিচয়ের সম্মান-লাভে তাদের সকলের থেকে বহুদূরে পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।

আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে, আমরা নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্‌যোগকে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণক্ষেত্র থেকে পৃথক ক'রে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় ব'লে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজিভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গ মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তার পরে তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত ক'রে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলালেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য-আবহাওয়ার-শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।

অন্যত্র ভারতবর্ষে সম্প্রতি এমন বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিয়েছে যেখানে স্থানীয় প্রজাসাধারণের ভাষা না হোক, শ্রেণীবিশেষের ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে আদ্যোপান্ত গণ্য হয়েছে এবং সেখানকার প্রধানবর্গ এই দুঃসাধ্য চেষ্টাকে আশ্চর্য সফলতা দিয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব সংকল্প এবং আশাতীত সিদ্ধিও কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সমস্ত প্রদেশের প্রজাসাধারণ তার লক্ষ্য। বাংলাভাষার অধিকৃত

এই প্রদেশের কোনো কোনো অংশ যদিও শাসনকর্তাদের কাটারি দ্বারা কৃত্রিম বিভাগে বিক্ষত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে তবু অন্তত পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে এই শিক্ষার কেন্দ্র আপন ভাষারূপে স্বীকার করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই-যে সম্মান নিবেদন করলেন এর দ্বারা তিনি আজ সম্মাননীয়। যে শৌর্যবান পুরুষ স্বদেশের এই সৌভাগ্যের সূচনা করে গেছেন আজকের দিনে সেই আশুতোষের প্রতিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।

আমি জানি. য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যেরকম প্রচণ্ড মূর্তি ধ'রে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয় নি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাকে এমন বৃহৎ আয়তনে, এমন প্রভূত পরিমাণে, এমন সর্ববাধাজয়ী নৈপুণ্যের সঙ্গে জয়যুক্ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষম হয় নি। আজ তা হতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরম্ভে ও মাঝামাঝি কালে যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিলুম মানুষকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভ্যতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষীণ হল যে, বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের যে-সকল বিশ্ববিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন তারা পরস্পরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষসাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপরিসীম ভীতি, এমন দৃঢ়বদ্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায় নি। মানবজগতের যে ঊর্ধ্বলোক থেকে আলোক আসে, মুক্তির মন্ত্র যেখানকার বাতাসে সঞ্চারিত হয়, মানবচিত্তের সেই দ্যুলোক রিপুপদদলিত পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আবিল, সাংঘাতিক মারীবীজে নিবিড়-ভাবে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমরা যে-সকল মহা মহা সভ্যতার পরিচয় পেয়েছি তাদের প্রধান সাধনা ছিল, মানবজগতের ঊর্ধ্বলোককে নির্মল রাখা, সেখানে পুণ্যজ্যোতির বিকিরণকে অবরোধমুক্ত করা। ধর্মের শাশ্বত নীতির প্রতি বিশ্বাস-হীন আজকের দিনে এই সাধনা অশ্রদ্ধাভাজন; সমস্ত পৃথিবীকে নিষ্ঠুর শক্তিতে অভিভূত করবার স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ব'লে যারা গর্ব করে এই সাধনা তাদের মতো শাসক ও শোষক জাতির পক্ষে অনুপযুক্ত ব'লে গণ্য। উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস-পানে উন্মত্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চাত্য মহাদেশ। যে শিক্ষায় কর্মবুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধির এমন বিচ্ছেদ, যে সভ্যতা অসংযত মোহাবেশে আত্মহননোদ্যত তার গৌরব ঘোষণা করব কোন্ মুখে!

কিন্তু একদিন মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চাত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা ব'লে অস্বীকার করতে পারি নে। তার উজ্জ্বল সত্তাই মিথ্যা এবং তার ম্লান বিকৃতিই সত্য, এ কথা বলব না।

সভ্যতার পদস্খলন ও আত্মখণ্ডন ঘটেছে বার বার, নিজের শ্রেষ্ঠ দানকে সে বার বার নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দুর্ঘটনা দেখেছি আমাদের স্বদেশেও এবং অন্য দেশেও। দেখা গেছে, মানবমহিমার শোচনীয় পতন ইতিহাসের পর্বে পর্বে। কিন্তু এই-সকল সভ্যতা যেখানে মহামূল্য সত্যকে কোনো দিন কোনো আকারে প্রকাশ করেছে সেইখান থেকেই সে চিরদিনের মতো জয়

করেছে মানুষের মনকে; জয় করেছে আপন বাহ্য প্রতাপের ধূলিশায়ী ভগ্নস্তূপের উপরে দাঁড়িয়েও। য়ুরোপ মহৎ শিক্ষার উপাদান উপহার দিয়েছে মানুষকে। দেবার শক্তি যদি না থাকত তা হলে কোনো কালেই তার বিশ্বজয়ের যুগ আসত না এ কথা বলা বাহুল্য। সে দিয়েছে আপন অদম্য শৌর্যের, অসংকুচিত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত; দেখিয়েছে প্রাণান্তকর প্রয়াস জ্ঞান-বিতরণের কাজে, আরোগ্যসাধনের উদ্‌যোগে। আজও এই সাংঘাতিক অধঃপতনের দিনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ যাঁরা নিঃসন্দেহই ন্যায়ের পক্ষে, দুর্বলের পক্ষে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তাঁরা বলদৃপ্তের শাস্তিকে স্বীকার করছেন, দুঃখীর দুঃখকে আপন করে নিচ্ছেন। বারে বারে অকৃতার্থ হলেও তাঁরাই আশু পরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারি দিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিত্রবিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই পৃথিবী শিক্ষা গ্রহণ করবে, পাশ্চাত্য জাতির লজ্জাজনক অমানুষিক আত্মাবমাননা থেকে নয়।

তোমরা যে-সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরবদিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামী কালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।

আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেবদৈত্যে মিলে মন্থন শুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প, বহুফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ ক'রে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখনো তার প্রমাণ পাই নি। ভারতবর্ষে আমরা আছি কালের রুদ্রলীলাসমুদ্রের তটসীমায়। বর্তমান মানবসমাজের এই দুঃখের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ আমাদের ঘটে নি। কিন্তু, ঘূর্ণির টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে এবং ভিতরের থেকেও দুর্গতির ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর-বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠল; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বুকে খর নখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখদারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর ক'রে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে— অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাষাবিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ ক'রে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয় তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্‌যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব-কিছুকে অত্যুক্তিবর্জিত করে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের

সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ ক'রে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন ব'লে ওঠে : তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে আশ্রয়ের ভিত্তি।—

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্‌কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদাবিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

৫ ফাল্গুন ১৩৪৩

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি

'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধ যখন লিখিত হয় তখন মনে করি নাই যে, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি প্রদর্শনে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। বিশেষত উক্ত প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখেই পঠিত হয়। সেখানে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কোনোরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই; বরং যতদূর জানা গিয়াছিল অনেকেই অনুকূলভাবে লেখকের মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

অবশেষে উক্ত প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হইলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পাঠক উহা ইংরেজিতে অনুবাদ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং কলেজের অনেক পুরাতন ছাত্রের নিকট উহার ঐক্যমত শুনা যায়। বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি যাঁহাদের হৃদয়নিকুঞ্জে প্রিয়স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত লোকের মুখে তাহার কোনোরূপ অমর্যাদার কথা শুনিলে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অতএব বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমি আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি। কেবল, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা গৌরবস্থল এমন অনেক মহোদয়ের উৎসাহবাক্যে আমি নিজের লজ্জা নিবারণে সক্ষম হইতেছি।

তর্কের আরম্ভেই যখন মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন হয়, তখন সেই নিষ্ফল বাক্‌যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাই সুবুদ্ধিসংগত। সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না, এরূপ তর্কও সেইমত রুদ্রমূর্তি ধারণ করে কিন্তু শীতল শান্তিবারি বর্ষণ না করিয়াই বায়ুবেগে উড়িয়া যায়।

ভাষা একে অসম্পূর্ণ, তাহাতে তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পাঠকসাধারণেরও পূর্বাপর মিলাইয়া দেখিবার অবসর নাই, সেই কারণে প্রতিবাদমাত্রেই তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং 'শিক্ষাসংকট'[১] প্রবন্ধে আমাদের যে-সকল কথার যথার্থ অর্থনির্ণয় হয় নাই তাহার পুনরবতারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :

> আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে অত্যাবশ্যক বিষয়ে নিবন্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন। সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কেন বর্তমান শিক্ষার ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন বলিতে পারি না।

দোষ যে কে কাহার ঘাড়ে কেন চাপায় বোঝা শক্ত; অবশেষে অদৃষ্টকেই দোষী করিতে হয়। আমি যে ঠিক পূর্বোক্তভাবে কথা বলিয়াছি এ দোষ আমার ঘাড়েই-বা কেন চাপানো হইল তাহা কে বলিতে পারে।

আমি কেবল বলিয়াছিলাম আমাদের দেশে শিশুদের স্বেচ্ছাপাঠ্য গ্রন্থ নাই। ইংরেজের ছেলে কেবল যে ভূগোল এবং জ্যামিতির সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া মরে তাহা নহে, বিবিধ আমোদজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইতিহাস পড়িতে পায়।

---

[১] শিক্ষাসংকট। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ভারতী। জ্যৈষ্ঠ, ১৭শ ভাগ।

বিশেষত তাহারা স্বভাষায় শিক্ষালাভ করে বলিয়া পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে যতটুকু সাহিত্যরস থাকে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা কায়ক্লেশে কেবলই শিক্ষণীয় বিষয়ের শুষ্ক অংশটুকু মুখস্থ করিয়া যায়।

এ-স্থলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলি নাই।

মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলাভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ঐ-দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না এবং অনভ্যস্ত ভাষায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে স্বভাবতই তাহারা বিমুখ হয়, এবং ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য, অতএব দায়ে পড়িয়া আমাদের ছেলেদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্য পুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে; এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।

আমি বলিয়াছিলাম ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধ-বুদ্‌বুদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; লোকপ্রবাহের গভীর তলদেশে তাহার মূল নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা তুলনাসাপেক্ষ। যে-সকল কথা কাব্যে পুরাণে প্রচলিত, যে-সকল কথা দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সর্বদা প্রবাহিত, যে-সকল কথা সহজে স্বাভাবিক নিয়মে অনুক্ষণ কার্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী। অতএব কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমি যখন বলিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ বলিয়া প্রতীত হইবে তাহার এমন অর্থ নহে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কাজ বা অকাজ করিতেছে না এবং ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কোনো উপকার বা অপকার হয় নাই। আমার কথার অর্থ এই ছিল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কাল যদি ইংরেজ দেশ হইতে চলিয়া যায় তবে ঐ বড়ো বড়ো সৌধগুলি কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পায় না।

ইংরেজিশিক্ষার সুফলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাহাতে সেই শিক্ষা মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া গভীর ও স্থায়ীরূপে দেশের অন্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে, এই ইচ্ছা যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদাহরণের দ্বারা বলা বাহুল্য যে, পূর্বে 'বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু' এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের অন্য কারণ প্রচার করিতেছে। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, ভূমিকম্পের কাল্পনিক হেতুনির্ণয়ের মূলচ্ছেদন করিতে হইলে ইংরেজিশিক্ষাকে সহজ স্বাভাবিক ও সাধারণের আয়ত্তগম্য করিতে হইবে, যাহাতে শিশুকাল হইতে তাহার সার গ্রহণ করিতে পারি, যাহাতে বহুব্যয়ে ও সাংঘাতিক চেষ্টায় তাহাকে ক্রয় করিতে না হয়, যাহাতে অন্তঃপুরেও তাহার প্রবেশ সুলভ হয়। নতুবা শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বাসুকির গাত্রকণ্ডু ভূমিকম্পের কারণরূপে ফিরিয়া দেখা দেয় এমন উদাহরণের অভাব নাই।

'ইংরাজিশিক্ষায় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত' ইংরেজিশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে

যে-কথা[১] বলিয়াছেন 'শিক্ষাসংকট' প্রবন্ধে তাহার উচিত অর্থ গ্রহণ হয় নাই, আমার এই বিশ্বাস। শিক্ষাটা কতদূর হয় বা না-হয়, ইহাই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও তিনি বলেন নাই যে, পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে লোক ঘুষ অধিক লইতেছে অথবা জাল করিতে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল এই বলিয়াছেন যে, বর্তমান প্রণালীতে ছাত্রেরা কেবল যে ভালো শেখে না তাহা নহে পরন্তু ভুল শেখে। কিন্তু প্রতিবাদক সমস্ত প্রবন্ধের সহিত ভাব না মিলাইয়া একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন পদ অবলম্বন করিয়া সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাকালে লোকে ঘুষ লইত, জালিয়াতকে আশ্রয় দিত, এবং বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু বলিয়া বিশ্বাস করিত।

লেখক আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> যাঁহার মত এক্ষণে আলোচিত হইল তিনি তো ইংরেজিশিক্ষা নিষ্ফল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত।

—যদি সত্যই আমি এইমাত্র বলিতাম তবে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইতাম বলা শক্ত; তবে এখনকার ছেলেরা আমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত, এবং বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু ও আনন্দমোহন বসু মহাশয় কখনোই আমার লেখার তিলমাত্র অনুমোদন করিতেন না।

লেখক সর্বশেষে বলিয়াছেন :

> আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর-একটি ভাব মনে উদয় হয়—সন্দেহ উঠে যে, লেখকগণ হয়তো অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এদেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক—এটা ভারতবর্ষ, ইংলন্ড নয়।

আমরা ঠিক সেই কথাটাই ভুলি না; আমরাই বারংবার বলিতেছি, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এখানকার দেশী ভাষা বাংলা, ইংরেজি নহে। যদি কর্ষণ করিয়া সম্যক্‌ ফললাভ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বাংলায় করিতে হইবে, নতুবা ঠিক 'কালচার' হইবে না।

আমরা এ কথা স্বপ্নেও ভুলি না যে, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এইজন্যই আমরা বাংলায় যাহা পাই তাহাকেই বহুমান্য করি; ইংরেজির সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে হতাদর করিবার চেষ্টা করি না। এইজন্যই আমরা বাঙালির শিক্ষাসাধনের ভার কতক পরিমাণে বাংলার প্রতিও অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। এইজন্যই আমরা মনে করি ইংরেজিশিক্ষা বাংলাভাষার মধ্যে যে-পরিমাণে অংকুরিত হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহার ফলবান হইবার সম্ভাবনা।

বাংলার শস্য, বাংলার ভাষা, বাংলার সাহিত্যের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এবং একান্ত বিশ্বাস আছে, এ কথায় যাঁহাদের 'সন্দেহ' হয় তাঁহারা পুনর্বার ধীরভাবে আলোচ্য প্রবন্ধগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। এবং যদি কোথাও দৈবক্রমে কোনো একটি বা দুটি কথায় কোনো ত্রুটি বা কোনো অলংকারদোষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিবেন; কারণ, আমরা তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখি নাই, যথার্থই আবশ্যক এবং বেদনা অনুভব করিয়া লিখিয়াছি।

১৩০০

প্রসঙ্গকথা

১

অল্পকাল হইল বাংলাদেশের তৎসাময়িক শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জিসাহেবকে সভাপতির আসনে বসাইয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের

[১] শিক্ষাপ্রণালী। সাধনা। মাঘ ১২৯৯।

দুরবস্থা উপলক্ষে নিজের সম্বন্ধে করুণা, স্বদেশ সম্বন্ধে আক্ষেপ, এবং স্বদেশীয়ের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে একটা নালিশের সুর ছিল। বাদী ছিলেন তিনি, প্রতিবাদী ছিল তাঁহার অবশিষ্ট স্বজাতিবর্গ এবং জজ ও জুরি ছিল ম্যাকেঞ্জিপ্রমুখ রাজপুরুষগণ। এ বিচারে আমাদের নিরপরাধে খালাস পাইবার আশামাত্র ছিল না।

কবুল করিতেই হইবে আমাদের অপরাধ অনেক আছে এবং সেজন্য আমরা লজ্জিত— অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য-বশত লজ্জাবোধও আমাদের নাই। কিন্তু সেই অপরাধখণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়োলোকদের উপর। মানবসমাজের বিচারালয়ে বাঙালির নাম আসামীশ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। নালিশ করিবার লোক ঢের আছে এবং বাঙালির নামে নালিশ শুনিবার লোকও রাজপুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে।

প্রাণীদের মধ্যে মনুষ্যজাতিটা খুব শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; তথাপি ইতিহাসের আরম্ভভাগ হইতেই দেখা যায় মনুষ্যের উপকার করা সহজ কাজ নহে। যাঁহারা ইহাকে বিপুল চেষ্টা ও সুদীর্ঘ সময়-সাধ্য বলিয়া না জানেন তাঁহারা যেন সাধারণের উপকার করার কাজটায় হঠাৎ হস্তক্ষেপ না করেন। যদি করেন তবে অবশেষে পাঁচজনকে ডাকিয়া বিলাপ পরিতাপ ও সাধারণের প্রতি দোষারোপ করিয়া সান্ত্বনা পাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে। তাহা দেখিতেও শোভন হয় না, তাহার ফলও নিরুৎসাহজনক, এবং তাহাতে গৌরবহানি ঘটে।

অবশ্য সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি মহেন্দ্রবাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ আছে এবং সেই অনুরাগের টানে তিনি অনেক করিয়াছেন। কিন্তু অনেক করিয়াছেন বলিয়া বিলাপ না করিয়া তাঁহাকে যে আরও অনেক করিতে হয় নাই সেজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত ছিল। বিজ্ঞান-প্রচারের উৎসাহে কোনো মহাপুরুষ জেলে গিয়াছেন, কোনো মহাপুরুষকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। বড়োলোক হইয়া বড়ো কাজ করিতে গেলে এরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে।

মহেন্দ্রবাবুর অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিয়া তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ফল অনেকে হইয়াছেন। ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্যন্ত সমস্ত বঙ্গদেশে এমন কয়টা অনুষ্ঠান আছে যে নিজের ঘর-দুয়ার ফাঁদিতে পারিয়াছে, বহুব্যয়সাধ্য আসবাব সংগ্রহ করিয়াছে, যাহার স্থায়ী অর্থের সংস্থান হইয়াছে, এবং যাহার সভাপতি দেশের ছোটোলাট বড়োলাট সাহেবকে সম্মুখে বসাইয়া নিজের মহৎ ত্যাগস্বীকার ঘোষণাপূর্বক অশ্রুপাত করিবার দুর্লভ অবসর পাইয়াছে। যতটা হইয়াছে বাঙালি তাহার জন্য ডাক্তার সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু সেজন্য তিনিও বাঙালির নিকট কতকটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিতেন।

বড়োলোকেরা বড়ো কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা আলাদিনের প্রদীপ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁহারা রাতারাতি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের নাম ছোটোখাটো আলাদিনের প্রদীপবিশেষ। সেই প্রদীপের সাহায্যে এবং ডাক্তার সরকারের নিজের নাম ও চেষ্টার জোরে এই বিজ্ঞানচর্চাবিহীন বঙ্গদেশে অকস্মাৎ পাকা ভিত এবং যন্ত্রতন্ত্রসহ এক সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন উঠিয়া পড়িল। ইহাকে একপ্রকার ভেলকি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বাস্তবজগতে আরব্য উপন্যাস অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভেলকির জোরে জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা সম্ভব নহে। আজ প্রায় সিকি শতাব্দীকাল বাংলাদেশে বিজ্ঞানের জন্য একখানা পাকাবাড়ি, কতকগুলি আসবাব এবং কিঞ্চিৎ অর্থ আছে বলিয়াই যে বিজ্ঞান আপনা-আপনি গোকুলে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। আরও আসবাব এবং আরও টাকা থাকিলেই যে বিজ্ঞান আরও ফুলিয়া উঠিবে এমনও কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম দেখা যায় না।

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক-ছাত্রদিগের পালনীয় আদর্শের খসড়া-পাণ্ডুলিপি

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক-ছাত্রদিগের পালনীয় আদর্শের খসড়া-পাণ্ডুলিপি

অবশ্য, দেশ কাল পাত্র সমস্তই ষোলো-আনা অনুকূল যদি হয় তবে তাহার মতো সুখের বিষয় আর-কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সর্বত্রই প্রায় কোনো-না-কোনোটা সম্বন্ধে টানাটানি থাকেই; আমাদের এ দরিদ্র দেশে তো আগাগোড়াই টানাটানি। অন্তত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনই কাল, তেমনই পাত্র! এখানে সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে বিজ্ঞান একদমে বাঁশি বাজাইয়া রেলগাড়ির মতো ছুটিতে থাকিবে, অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না। গাড়ি চলে না বলিয়া দেশাধিপতির নিকট দেশের নামে নালিশ রুজু না করিয়া আপাতত রাস্তা বানাইতে শুরু করা কর্তব্য।

রাস্তা বানাইতে গেলে নামিয়া আসিয়া একেবারে মাটিতে হাত লাগাইতে হয়। আমাদের দেশের বড়োলোকদের নিকটে সে প্রস্তাব করিতে সংকোচ বোধ করি, কিন্তু অগত্যা না করিয়া থাকা যায় না। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি গত পঁচিশ বৎসর এই কার্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষ-বর্গের সমুচ্চ প্রাসাদবাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ হইত।

নালিশ এই যে, বিজ্ঞানসভা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্তমত খোরাকি এবং আদর পায় না। কেমন করিয়া পাইবে। যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে এবং সফলতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দিগন্তে বিলীন হইবে না।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণদের জ্ঞানানুশীলনের অধিকার ছিল। ব্রহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ সেই কারণেই ক্রমে ম্লান এবং বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমে কর্ম নিরর্থক, ধর্ম পুঁথিগত, এবং পুঁথিও মুখস্থ বিদ্যায় পরিণত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ, নিম্নের মাধ্যাকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে চতুর্দিক অনুন্নত সেখানে সংকীর্ণ উন্নতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অদ্য ব্রাহ্মণ নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহার তিন দিনের উপনয়ন ব্রহ্মচর্যের বিদ্রূপমাত্র, তাহার মন্ত্রার্থজ্ঞানহীন সংস্কার বর্বরতা। তাহার কারণ, অশিক্ষিত বিপুলবিস্তৃত শূদ্রসম্প্রদায় আপন দূরব্যাপী প্রকাণ্ড মূঢ়তার গুরুভারে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মণ্যের উচ্চশিরকে ধূলিসাৎ করিয়া জয়ী হইয়াছে।

অদ্য ইংরেজিশিক্ষিতগণ কিয়ৎপরিমাণে সেই ব্রাহ্মণদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাধারণের কাছে ইংরেজিভাষা বেদের মন্ত্র অপেক্ষা সরল নহে। এবং অধিকাংশ জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজিভাষার কড়া পাহারার মধ্যে আবদ্ধ।

তাহার ফল এই, বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি সমাজে তাহার কোনো চর্চা নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিদ্যার প্রধান গৌরব দাঁড়াইয়াছে অর্থোপার্জনের উপায়রূপে।

সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই স্বল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণস্থানীয়দের জন্য আপন শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। যে-কয়জনা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরেজিভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে; বাকি সমস্ত বাঙালির সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। অথচ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের জন্য বাঙালি বিশেষ উদ্যোগী হইতেছে না, এ আক্ষেপ তাহার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত বিজ্ঞানঘেঁষা ছাত্রেরাও কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের

হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রামলাভ করেন। যেমন পাথুরে জমির উপর আধহাতখানেক পুষ্করিণীর পাঁক তুলিয়া দিয়া তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে গাছটা প্রথম প্রথম খুব ঝাড়িয়া মাথা তুলিয়া ডালেপালায় গজাইয়া উঠে, অবশেষে শিকড় যেমনি নীচের কঠিন স্তরে গিয়া ঠেকে অমনি অকস্মাৎ মুষড়িয়া মরিয়া যায়— আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষারও সেই অবস্থা।

ঘরে-বাইরে চারি দিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এ দেশে স্থায়ীরূপে বর্ধিত হইতে পারিবে। নতুবা আপাতত দুইদিনের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই— কেননা, চারি দিকের দিগন্তপ্রসারিত মূঢ়তা দিনে নিশীথে অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ণমূল উচ্চতাকে আপনার সহিত সমভূম করিয়া আনিবে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের অধোগতির প্রধান কারণ এই ভিত্তির সংকীর্ণতা, ব্যাপ্তির অভাব, একাংশের সহিত অপরাংশের গুরুতর অসাম্য।

অথচ বাংলাভাষায় ইংরেজি-অনভিজ্ঞদের কাছে বিজ্ঞানপ্রচারের কোনো উপায় এ দেশে নাই। ইহা ব্যয়সাধ্য, চেষ্টাসাধ্য, ইহাতে আশু ফললাভের আশাও নাই— কোনো ব্যক্তিবিশেষের একান্ত উৎসাহ রক্ষার উপযোগী কোনো উত্তেজনা ইহাতে দেখা যায় না। ইহাতে অর্থনাশ ছাড়া অর্থাগমেরও সম্ভাবনা অল্প। বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টার কাজ— বিজ্ঞানের যাথাতথ্য রক্ষাপূর্বক তাহাকে জনসাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া সরলভাষায় প্রকাশ করাও শক্ত।

অতএব যেমন করিয়াই দেখি সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের ন্যায় সামর্থ্যশালী বিশেষ সভার দ্বারাই এই কার্য সম্ভবপর বোধ হয়। ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য অনেক ইস্কুল কলেজ আছে, তাহার গ্রন্থ ও আচার্যের অভাব নাই। এমন-কি, যাঁহারা ইংরেজিতে বিজ্ঞানশিক্ষা সমাধা করিতে চান তাঁহারা বিলাতে গিয়াও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু নানা কারণে ইংরেজিশিক্ষায় বঞ্চিত আমাদের অধিকাংশ, আমাদের সর্বসাধারণ, আমাদের প্রকৃত দেশ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারাও উপেক্ষিত; অথচ এমনই দৈব বিড়ম্বনা, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই দেশের নামে অবহেলার অভিযোগ আনিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ায় কার্য যথোচিতরূপে অগ্রসর হইতেছে না। এই কার্যে সাহিত্য-পরিষদের সহিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের যোগ দেওয়া কর্তব্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিজের উপযোগিতা উপকারিতা সর্বতোভাবে প্রমাণ করা আবশ্যক। তবেই দেশের সহিত সভার দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র বিলাপের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। এমন-কি, রাজপ্রতিনিধির মধ্যস্থতা দ্বারাও বেশি কিছু হইবে না। রাজা সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের অর্থাগমের সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে সফল করিতে পারেন না।

যাহাই হোক, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি যথার্থ পথে কাজ করিতে অগ্রসর হন তবে তাঁহার ভর্ৎসনা সহিতে আমরা প্রস্তুত আছি; কিন্তু কাজও করিবেন না, চোখও রাঙাইবেন, দেশকে দূরে রাখিবেন অথচ সাহেবকে ডাকিয়া দেশের নামে নালিশ করিবেন, ইহার অপরূপ সৌন্দর্যটুকু আমরা দেখিতে পাই না।

১৩০৫

২

বর্তমানসংখ্যক 'ভারতী'তে "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আধুনিক বাঙালি ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।[১] তাঁহার প্রস্তাবটির প্রতি পাঠকগণ মনোযোগ করিবেন।

ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ো কঠিন। কথা সজীব পদার্থের মতো বাড়িয়া চলে; মুখে মুখে কালে কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সৃজনশক্তি মানুষের মনের স্বাভাবিক শক্তি—যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না, কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয়। এইজন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি।

কেহ কেহ এইরূপে প্রাত্যহিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু একটি কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতি বহুতর লোকের মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে এবং সেই ঘটনার বিবরণে সাময়িক লোকের মনের ছাপ পড়িয়া যায়। তাহা হইতে ঘটনার বিশুদ্ধ সত্যতা আমরা না পাইতেও পারি কিন্তু তৎসাময়িক অনেক লোকের মনে তাহা কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা পাওয়া যাইতে পারে।

অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

এই বিচিত্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ-উপকরণমূলক ইতিহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অপ্রমাণ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দুই সাক্ষীর মধ্যে কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব তাহা অনেক সময়ে কেবলমাত্র বিচারকের স্বভাব ও পূর্বসংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরেজ মিথ্যা বলে না, ইংরেজ জজ ইহা কতকটা স্বভাবত এবং কতকটা টানিয়াও বিশ্বাস করেন; এই প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস-বশত তাঁহারা অন্যদেশীয়দের প্রতি অনেক সময়ে অবিচার করিয়া থাকেন, তাহা ইংরেজ-ব্যতীত আর-সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

ইতিহাসে এইপ্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাস-পাঠের পীড়ন কেন সহ্য করিব। আমরা যে ইতিহাস সংকলন করিব, তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না; কিন্তু ইতিহাসের যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে, সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।

তাহা ছাড়া ইতিহাস একতরফা না হইয়া দুইতরফা হইলে সত্যনির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক একভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্যভাবে সাক্ষী সাজাইবেন, তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।

যাহা হউক, বিদেশীলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে বিনা বিচারে গ্রহণ ও মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া আমাদের গৌরবের বিষয় হইতেছে না। কোনো ইতিহাসই কোনোকালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও ভূরি ভূরি চিরপ্রচলিত দৃঢ়নিবদ্ধ বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশীয় ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাছিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করি।

লেখকমহাশয় আমাদের দেশীয় ইতিহাস সমালোচন ও সংকলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

---

[১] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

আমাদের দেশে সভাস্থাপনের প্রতি আমাদের বড়ো-একটা বিশ্বাস নাই। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের দেশের মাটিতে শিব গড়িতে গিয়া কিরূপ লজ্জা পাইতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভা নামক বড়ো শিব গড়িতে গিয়া আরও কি বড়ো প্রহসনের সম্ভাবনা নাই।

যে দেশে কেনো-একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলি লেখকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে, সেই দেশে উৎসাহী লোকেরা একত্র হইয়া বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যে দেশে উৎসাহী লোক স্বল্প সে দেশে সভা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ, সে সভায় অধিকাংশ বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লোকের উদ্যম খর্ব করিয়া দেয় মাত্র।

আমরা লেখকমহাশয় ও তাঁহার দুই-চারিজন সহযোগীর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রতিই লক্ষ করিয়া আছি। তাঁহারা নিজেদের উৎসাহের উদ্যমে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকাংশের মনে এ-সকল বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ নাই। অতএব তাঁহারা প্রথমে নিজের রচনা ও দৃষ্টান্তদ্বারা দেশে ইতিহাসানুরাগ বিস্তার করিয়া দিলে যথাসময়ে সভাস্থাপনের সময় হইবে।

সমবেত চেষ্টার জন্য উৎসাহী অনুরাগী লোকমাত্রেরই মন কাঁদে। মানুষ কাজ করিবার যন্ত্র নহে—অন্য পাঁচজন মানুষের সহিত মিশিয়া পাঁচজনের সহানুভূতি, সমাদর ও উৎসাহ-দ্বারা বললাভ প্রাণলাভ করিতে হয়; জনহীন শূন্য সভায় একা দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র কর্তব্য করিয়া যাওয়া বড়ো কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশে যাঁহারা কোনো মহৎ কার্যের ভার লইবেন, লোকসঙ্গ লোকসাহায্যের সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই।

বিনা আড়ম্বরে বিনা ঘোষণায় 'ঐতিহাসিক চিত্রাবলী' নামক যে-কয়েকটি মূল্যবান ইতিহাস-গ্রন্থ বাংলায় বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই আমাদের বিপুল আশার কারণ। যাঁহারা 'সিরাজদৌল্লা' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সভার দ্বারা তেমন কাজ হয় না প্রতিভার দ্বারা যেমন হয়।

১৩০৫

প্রাইমারি শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বাংলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগ-অনুসারে চার রকমের গ্রাম্য উপভাষা চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে এ-কথা সকলেই জানেন।

এ সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলিবার, কাগজে পত্রে তাহা নানা প্রকারে বলা হইয়া গেছে; কিন্তু দেশের উৎকণ্ঠা ঘুচিতেছে না। আমাদের পক্ষে যুক্তি আছে বলিয়া যে জয়ও আমাদের দিকে, তাহা আশা করা কঠিন।

আমরা দেখিয়াছি গবর্মেন্টের কোনো প্রস্তাবে আমরা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত বেশি আপত্তি করিলে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করিতে গবর্মেন্ট যেন আরও বেশি নারাজ হন।

ইহার অনেকগুলা কারণ আছে। প্রথমত, আমরা যেটাকে অনিষ্ট বলিয়া মনে করি, সরকারের শাসননীতির পক্ষে যে-কোনো কারণে সেইটেই যদি ইষ্ট হয়, তবে আমাদের তরফের সমস্ত যুক্তি-গুলা তাঁহাদের সংকল্পকেই সবল করিবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারের ভয় হয়, পাছে আমাদের দোহাই শুনিয়া কোনো সংকল্প হইতে নিরস্ত হইলে প্রজার কাছে প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, প্রবল পক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের কতদূর পর্যন্ত যে আত্মবিস্মৃতি ঘটে, সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

অতএব আমরা সকলে মিলিয়া আপত্তি তুলিয়াছি বলিয়া সেটা যে আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

না তুলিলেই যে বিশেষ আশার কারণ হইত, তাহাও বলিতে পারি না। হতভাগ্যের পক্ষে কোন্‌টা যে সৎপথ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

তথাপি মোটের উপর, কমিটির প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে যে ভয়ের কারণ আছে, আমার তাহা মনে হয় না। সেইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

ভাবিয়া দেখো-না, চাষার ছেলে প্রাইমারি স্কুলে কেন যায়। ভালো করিয়া চাষার কাজ শিখিতে যে যায়, তাহা নহে। গুরুমশায় যে তাহার ছেলেকে কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ করিতে পারে, এ কথা শুনিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।

তার পরে, প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়া তাহার ছেলে ডাক্তারও হইবে না, উকিলও হইবে না, কেরানিও হইবে না। প্রাইমারির পরে যদি তাহার ছাত্রবৃত্তি পড়ার শখ থাকে, তবে উপভাষা ছাড়িয়া আবার তাহাকে সাধুভাষা শিখিতে হইবে।

যাই হোক, যে চাষা তাহার ছেলেকে প্রাইমারি স্কুলে পাঠায়, তাহার একটিমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তাহার ছেলে নিতান্ত চাষা না থাকিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে ভদ্রসমাজ-ঘেঁষা হইবার যোগ্য হয়; চিঠিটা পত্রটা লিখিতে পারে, পড়িতেও পারে, জমিদারের কাছারিতে দাঁড়াইয়া কতকটা ভদ্রছাঁদে মোক্তারি করিতে পারে, গ্রামের মোড়লি করিবার যোগ্য হয়, ভদ্রলোকের মুখে শুনিতে পায় যে, 'তাই তো রে, তোর ছেলেটা তো বলিতে-কহিতে বেশ!'

চাষা একটু সম্পন্ন অবস্থার হইলেই ভদ্রসমাজের সীমানার দিকে অগ্রসর হইয়া বসিতে তাহার স্বভাবতই ইচ্ছা হয়। এমন-কি, তাহার ছেলে একদিন হাল-লাঙল ছাড়িয়া দিয়া বাবুর চালে চলিবে এ সাধও তাহার মনে উদয় হইতে থাকে। এইজন্য সময় নষ্ট করিয়াও, নিজের ক্ষতি করিয়াও ছেলেকে সে পাঠশালায় পাঠায় অথবা নিজের আঙিনায় পাঠশালার পত্তন করে।

কিন্তু চাষাকে যদি বলা হয়, তোর ছেলেকে তুই চাষার পাঠশালায় পাঠাইবি, ভদ্রের পাঠশালায় নয়, তবে তাহার উৎসাহের কারণ কিছুই থাকিবে না। এরূপ স্থলে ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইবার উদ্দেশ্যই তাহার পক্ষে ব্যর্থ হইবে।

শুধু তাই নয়। পল্লীর মধ্যে চাষার পাঠশালাটা চাষার পক্ষে একটা লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। কালক্রমে ভাগ্যক্রমে যে চাষাত্ব হইতে তাহারা উপরে উঠিবার আশা রাখে, সেইটাকে বিধিমত উপায়ে স্থায়ী করিবার আয়োজনে, আর যেই হউক, চাষা খুশি হইবে না।

ওষুধ বলিতে যেমন তিক্ত বা ঝাঁঝালো কিছু মনে আসে, তেমনই শিক্ষা বলিতে চাষা এমন একটা-কিছু বোঝে যাহা তাহার প্রতিদিনের ব্যাপার-সংক্রান্ত নহে। তাহার কাছে শিক্ষার গৌরবই তাই।

তাহার ছেলে যদি এত করিয়া পাঠশালে গিয়া তাহাদের অভ্যস্ত গ্রাম্যভাষা এবং তাহাদের নিজের ব্যবসায়ের সামান্য দুটো কথা শিখিতে বসে, তবে সে শিক্ষার উপরে চাষার অশ্রদ্ধা হইবেই।

চাষা সাধুভাষা ব্যবহার করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাধুভাষা যে তাহার অপরিচিত তাহা নহে। যাত্রায়, গানে, গ্রন্থশ্রবণে নানারূপেই সাধুভাষা তাহার কানে পেঁৗছিয়া থাকে, ভদ্রদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় সেও যথাসাধ্য এই ভাষার মিশাল চালাইতে চেষ্টা করে।

তাহার ছেলেকে বিশেষ শিক্ষার দ্বারা যখন সেই ভদ্রভাষা ভুলাইবার চেষ্টা করা হইবে, তখন চাষা যে তাহা বুঝিবে না তাহা নহে, বুঝিয়া যে খুশি হইবে তাহাও বলিতে পারি না।

'Observer, thinker and experimenter' কাহাকে বলে তাহা চাষা বুঝে না, কিন্তু ভদ্র এবং অভদ্র কাহাকে বলে তাহা সে বুঝে। অতএব যাহা কিছুই বুঝে না তাহার প্রলোভনে, যাহা বুঝে তাহার আশা প্রসন্ন মনে বিসর্জন দিবে, চাষা এতবড়ো চাষা নহে।

এই-সকল কারণে আশা করিতেছি, চাষার সদ্‌বুদ্ধি চাষাকে এবং দেশকে শিক্ষা-কমিটির গুপ্তবাণ হইতে রক্ষা করিবে।

১৩১২

র ১৪।১৫

পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি

বৈশাখের ভাণ্ডারে যে প্রশ্ন[১] তোলা হইয়াছিল অর্থাৎ আমাদের দেশের পব্লিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃতসাধারণের যোগ রক্ষার উপায় কী—দেশের নানা বিশিষ্ট লোকের[২] কাছ হইতে তাহার উত্তর পাওয়া গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের আধুনিক উদ্‌যোগ-গুলির উপকারিতা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবু মোটের উপর তাঁহাদের উত্তরগুলির মধ্যে কোনো অনৈক্য নাই।

তাঁহারা সকলেই এই কথা বলেন যে, প্রাকৃতসাধারণকে আমাদের পব্লিক উদ্‌যোগে আহ্বান করা এখন চলে না। আগে তাহাদের শিক্ষার ভালো বন্দোবস্ত করা চাই।

তাহার কারণ ইঁহারা বলিতেছেন, দেশ বলিতে কী বুঝায় তাহা দেশের সাধারণ লোকে বুঝে না, এবং দেশের হিত যে কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাও ইহাদের বুদ্ধিতে আসিবে না। অতএব, ইস্কুল করিয়া এবং অন্য পাঁচরকম উপায়ে ইহাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দেওয়া চাই।

কথাটা একটা বড়ো কথা, প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের স্থিরতা হওয়া চাই, তার পরে কাজে লাগিতে হইবে।

ভাণ্ডারের পরীক্ষায় এটা দাঁড়াইতেছে যে, মতের মিল হইয়াছে। কিন্তু কর্তব্যসম্বন্ধে মতের মিল হওয়া সহজ, উপায় সম্বন্ধে মিল হওয়াই কঠিন।

তবু কাজ আরম্ভ করিতে হইলে কাজের কথা পাড়িতেই হইবে, কোথায় কী বিঘ্ন আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া না দেখিলে চলিবে না।

আমরা দেখিতেছি, গবর্মেন্ট আমাদের দেশের প্রাকৃতসাধারণের শিক্ষার একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। ইহাও দেখিতেছি, সেইসঙ্গে তাঁহারা ভারি একটা দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, দেশের লোক রোগে এবং দুর্ভিক্ষে একেবারে অবাধে মারা পড়িতেছে। ইহাতে তাঁহাদের শাসনকার্যের একটা ভারি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজার অন্নবস্ত্র এবং প্রাণটা বাঁচানো কেবল যে প্রজার হিত তাহা নহে, তাহা রাজারও স্বার্থ।

কর্তারা মনে করিতেছেন, চাষারা যদি আর-একটু ভালো করিয়া চাষ করিতে শেখে এবং স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া চলিবার উপদেশ পায়, যদি সাধারণ হিসাবপত্রটা লিখিয়া জমিদার ও মহাজনের অন্যায় প্রবঞ্চনার হাত এড়াইতে পারে, তবে তাহাতে দেশের যতটুকু শ্রীরক্ষা হইবে, তাহাতে প্রজার লাভ এবং রাজারও লাভ। অতএব গোড়ায় তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

কিন্তু শিক্ষা-জিনিসটাকে একদিকে একবার শুরু করিয়া দিলে তার পরে তাহাকে গণ্ডি টানিয়া কমানো শক্ত। বিদেশী রাজার পক্ষে সেটা একটা বিষম ভাবনা। প্রজা বাঁচিয়া-বর্তিয়া থাকে, এটা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বাঁচার চেয়েও যদি বেশি অগ্রসর হইয়া পড়ে, তবে সেটা তাঁহার প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

এইজন্য প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানা রকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন খাল কাটিয়া বেনো জল ঢোকানো কাজটা ভালো নয়—শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।

অতএব চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া

---

[১] প্রশ্নকর্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[২] নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল—ভাণ্ডার, বৈশাখ, ১৩১২।

যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে; পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া তাহাদের ভাষাশিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার।

অতএব প্রথমেই দেখিতেছি, আমরা চাষাদের শিক্ষালাভ হইতে দেশের যে সুবিধাটা আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই সেটাকে আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

আমাদের দেশহিতৈষীরা যদি মনে করেন, সরকারের কর্তব্য দেশের সাধারণ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আমাদের কর্তব্য তৎসম্বন্ধে রেজোল্যুশন পাস করা, তবে এ কথাটা আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, সরকারের হাতে শিক্ষার ভার দিলে সে শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই চেষ্টা করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য দেখিবেন না। তাঁহারা চাষাকে গ্রামের চাষা রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে ভারতবর্ষের অধিবাসী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

শিক্ষা যদি নিজের হাতে লই, তবেই নিজের মতলবমত শিক্ষা দিতে পারিব—ভিক্ষাও করিব, ফরমায়েশও দিব, এ কখনো হয় না। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।

আমাদের নিজের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিজেরা করিব, এ কথা তুলিলেই আপত্তি এই উঠে যে, আমাদের পাঠশালার শিক্ষায় অন্নের সংস্থান কেমন করিয়া হইবে। সরকার যদি এমন কথা বলেন, সরকারি বিধানের ছাঁচে বিদ্যালয় না বানাইলে সেখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে আমরা উমেদারির বেলা আমল দিব না, তবে আমরা কী উপায় করিব।

এই প্রশ্নের সদুত্তর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উত্তর দিবার পূর্বে প্রশ্নের বিষয়টাকে পরিষ্কার করিয়া সম্মুখে ধরা যাক।

প্রথম কথা—দেশের কাজে দেশকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিতে হইলে গোড়ায় সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা—শিক্ষার যদি একটা প্রধান উদ্দেশ্য এই হয় যে, দেশের লোককে দেশের কাজে যোগ্য করা, তবে স্বভাবতই শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হইবে না।

তৃতীয় কথা—যদি তাহা না হয় তবে পরের বাঁধা-চালে কতকগুলা বিদ্যালয় বানাইয়া বিদেশের শাসনে স্বদেশের সরস্বতীকে জিঞ্জির পরাইলে বিশেষ ফললাভ প্রত্যাশা করা চলিবে না। শিক্ষা-প্রণালীকে সকল প্রকারেই স্বদেশের মঙ্গলসাধনের উপযোগী করিবার জন্য দেশের বিদ্যালয়কে সরকারের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার।

শেষ কথা—তাহার বাধা এই যে, অন্নের দায়ে বিদ্যা সরকারের দ্বারে বাঁধা পড়িয়াছে। সে বন্ধন না কাটিলে বিদ্যাকে স্বাধীন করিব কী উপায়ে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, বাধা যে শুধু এইমাত্র, তাহা নহে। দেশের যে-কোনো একটা মঙ্গল-সাধনের ভার নিজের হাতে লইতে গেলে, যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন, আমরা যে ততদূর প্রস্তুত আছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদি বা প্রস্তুত হই, তবে গোড়াতেই যে বিঘ্নটা আছে, সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার। এ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন ও চিন্তা করা উচিত বোধ করেন তাঁহাদের কাছ হইতে ইহার বিচার প্রার্থনা করি। আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, দেশকে ভালো করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের হিতৈষীগণ 'ভাণ্ডারে' তাহারই আলোচনা উপস্থিত করুন।

১৩১২

বিজ্ঞানসভা

স্বর্গগত মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় গবর্মেন্টের উৎসাহে ও দেশের লোকের আনুকূল্যে একটি বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া গেছেন।

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারই এই সভার উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের লোকহিতকরী সভাগুলির মতো এ সভাটি নিঃস্ব নয়। ইহার নিজের চালচুলা আছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, দেশে বিজ্ঞানচর্চার তেমন ভালোরকম সুযোগ জুটিতেছে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্প্রতি কিছু বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে আমরা পরাধীন, তাহার 'পরে আমরা অধিক ভরসা রাখি না। আমাদের ছেলেদের যে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, সেখান হইতে এমন খোঁটা খাইবার সম্ভাবনা আমাদের আছে।

বিজ্ঞানচর্চাসম্বন্ধে দেশের এমন দুরবস্থা অথচ এই বিদ্যাদুর্ভিক্ষের মাঝখানে বিজ্ঞানসভা তাঁহার পরিপুষ্ট ভান্ডারটি লইয়া দিব্য সুস্থভাবে বসিয়া আছেন।

সেখানকার হলে মাঝে মাঝে লেকচার হইয়া থাকে জানি—সেটা কলেজের লেকচারের মতো—তেমন লেকচারের জন্য কোনো বিশেষ বন্দোবস্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এটুকু নিঃসন্দেহ যে, বিজ্ঞানসভা নাম ধরিয়া একটা ব্যাপার এ দেশে বর্তমান এবং তাহার যন্ত্রতন্ত্র-অর্থসামর্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে।

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধন্না দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া বেড়াই—কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সেদিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত করিব না। আমাদের অভাবের মাঝখানে এই যে বিজ্ঞানসভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ইহার কি ঘুম ভাঙাইবার সময় হয় নাই।

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে যশোলাভ করিয়াছেন. বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন। দেশের বিজ্ঞানসভা দেশের বিজ্ঞানবীরদের মুখের দিকে তাকাইবেন না? ইহাতে কি তাঁহার লেশমাত্র গৌরব বা সার্থকতা আছে।

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী ছাত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন।

স্বদেশে বিজ্ঞান প্রচার করিবার দ্বিতীয় সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানপণ্ডিত, দেশের ভাষায় দেশের লোকের কাছে বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সেজন্য তাঁহাদের নাম থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞানসভা কী করিলেন।

দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগকে ও সুযোগ্য অনুসন্ধিৎসুদিগকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দান করা, ও দেশের ভাষায় সর্বসাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুগম করিয়া দেওয়া, বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশে বিজ্ঞানসভার এই দুটি মস্ত কাজ আছে; ইহার মধ্যে কোনোটাই তিনি করিতেছেন না।

কেহ যেন না মনে করেন যে, আমি বিজ্ঞানসভার সম্পাদক প্রভৃতিকে এজন্য দায়ী করিতেছি। মন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার ভার তাঁহাদের উপরে আছে মাত্র। কিন্তু সভা যে আমাদের সকলের। ইহা যদি সমস্ত আয়োজন উপকরণ লইয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সেজন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। ইহাকে কাজে লাগাইবার কর্তা আমরা সকলেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নহে।

আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকার লইবার জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞান-

সভার মতো ব্যাপারগুলি দেশের জমি জুড়িয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকিলে প্রতিদিন প্রমাণ হইতে থাকে যে, আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকারী নহি। কারণ, যে-অধিকার আমাদের হস্তে আছে তাহাকে যদি ব্যর্থ করি, তবে যাহা নাই তাহাকে পাইলেই যে আমরা চতুর্ভুজ হইয়া উঠিব এ কথা স্বীকার করা যায় না।

এই কারণে বিজ্ঞানসভার মতো কর্মশূন্য সভা আমাদের জাতির পক্ষে লজ্জার বিষয়। ইহা আমাদের জাতির পক্ষে নিত্য কুদৃষ্টান্ত ও নিরুৎসাহের কারণ।

আমার প্রস্তাব এই যে, বিজ্ঞানসভা যখন আমাদের দেশের জিনিস, তখন ইহাকে হাতে লইয়া ইহার দ্বারা যতদূর পর্যন্ত সম্ভব দেশের কাজ করাইয়া, স্বজাতির অন্তত একটা জড়তা ও হীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণকে দূর করিয়া দিতে যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করি।

১৩১২

ইতিহাসকথা

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে—একমাত্র পুরাণকথার ভিতর দিয়া সকল প্রকার উপদেশ চালানো যায় না। অথচ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।

একেবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই-সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনোই ঘটিবে না। তা ছাড়া ইস্কুলে-পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।

ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কী করিয়া বড়ো হইয়াছে, প্রবল হইয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কী করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কী করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ-সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিতলোকের অনেক ভাবনা-চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজ-কর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের পক্ষে শোচনীয় অজ্ঞতা।

কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমন-কি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।

আজকাল য়ুরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাসশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়—এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই চলিত আছে—য়ুরোপ আজ সেইরূপ সরস উপায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে, আর আমরাই কি আমাদের জ্ঞানপ্রচারের স্বাভাবিক পথগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনালোকবর্জিত ইস্কুলশিক্ষার শরণ লইব।

আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার

দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্যপ্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি— কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্যে দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমন-কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজি, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন। এমন-কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন।

১৩১২

স্বাধীন শিক্ষা

দেশের শিক্ষাকে বিদেশী রাজার অধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য কী উপায় করা যাইতে পারে, এই প্রশ্ন 'ভাণ্ডারে' উঠিয়াছে।

যতদিন বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের উপরে অন্নলাভ নির্ভর করিবে, ততদিন মুক্তির আশা করা যায় না এই কথাই সকলে বলিতেছেন।

কিন্তু কথাটা কেবল উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেই খাটে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ে প্রাকৃতগণ যে শিক্ষালাভের জন্য ছেলেকে পাঠশালায় পাঠায়, সে শিক্ষার দ্বারা গবর্মেন্টের চাকরি কেহ প্রত্যাশা করে না।

আমাদের দেশে এই পাঠশালা চিরকাল স্বাধীন ছিল। আজও এই-সকল পাঠশালার অধিকাংশ ব্যয় দেশের লোক বহন করে; কেবল তাহার উপর আর সামান্য দুই-চার-আনার লোভে এই আমাদের নিতান্তই দেশীয় ব্যবস্থা পরের হাতে আপনাকে বিকাইয়াছে।

এই প্রাথমিক পাঠশালার চেয়ে উপর পর্যন্ত উঠে অথচ কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে না এমন একদল ছাত্র আছে, সাধারণত ইহারাও সরকারি চাকরির দাবি করিতে পারে না। ইহারা অনেকেই সদাগরের আপিসে, জমিদারের সেরেস্তায়, ধনীগৃহের দপ্তরখানায়, গৃহস্থঘরের বাজার-সরকার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।

কিন্তু দেশে ইহাদের শিক্ষার তেমন ভালো ব্যবস্থা নাই। পূর্বে ছাত্রবৃত্তি স্কুল ইহাদের কতকটা উপযোগী ছিল। কিন্তু মাইনর স্কুল এখন ছাত্রবৃত্তিকে প্রায় চাপিয়া মারিল। ইংরেজি শিক্ষাই যে-সব স্কুলের প্রধান লক্ষ্য এবং কলেজই যাহার গম্য স্থান, সে-সকল স্কুলে কিছুদূর পর্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলে না বাংলা না ইংরেজি না কিছুই শেখা হয়।

অতএব যাহারা পাঠশালা পর্যন্ত পড়ে এবং যাহারা নানাপ্রকার অভাব ও অসুবিধাবশত তাহার চেয়ে আর-কিছুদূর মাত্র পড়িবার আশা করিতে পারে, দেশ তাহাদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইলে বাধার কারণ তো কিছুই দেখা যায় না।

গুনতি করিয়া দেখিলে কলেজে পাশ-করা ছাত্রদের চেয়ে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি হইবে। এই বহুবিস্তৃত নিম্নতন শ্রেণীর শিক্ষা আমরা যদি উপযুক্তভাবে দিতে পারি, তবে দেশের শ্রী ফিরিয়া যায় সন্দেহ নাই।

ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা ভালো করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে-কলমে সকল রকমে তৈরি

হইয়া উঠিতে পারে। পাঠশালায় শিশুবয়সে যে-সকল ভাব, জ্ঞান ও অভ্যাস সঞ্চার করিয়া দেওয়া যায়, বড়োবয়সে বক্তৃতার দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হয় না।

যাই হোক, উচ্চশিক্ষায় দেশের লোকের পক্ষে গবর্মেন্টের প্রতিযোগিতা করিবার যে-সকল বাধা আছে নিম্নশিক্ষায় তাহা নাই।

কিন্তু এতবড়ো দেশব্যাপী কাজের ভার আমাদিগকে নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা বলিলেই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হতাশ হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহারা ইহাও জানেন, এ কাজ সরকারের হাতে দিলে কিন্টারগার্টেনের ধুয়া ধরিয়া নিতান্ত ছেলেখেলা হইতে থাকিবে এবং লাভের মধ্যে ম্যাক্‌মিলন কোম্পানির উদরপূরণ হইবে। কিছু না-হউক, এ শিক্ষা আমরা যেমন চাই তেমন হইবে না, বরঞ্চ কতক অংশে বিপরীত হইবে।

অন্যত্র ইহা তো দেখিয়াছি দয়ানন্দের দল আপন সম্প্রদায়ের জন্য স্বচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ চেষ্টা কী করিলে সাধ্য হইতে পারে এবং এই-সকল নিম্নতন বিদ্যালয়গুলিতে কী কী বিষয় কী নিয়মে শিক্ষা দিতে হইবে, সুধীগণ 'ভাণ্ডার' পত্রে তাহার আলোচনা করিলে সম্পাদক কৃতার্থ হইবেন।

১৩১২

শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা

সমাজকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশ কোনোদিন স্বদেশী বা বিদেশী রাজার আইনের বাঁধনে ধরা দেয় নাই। নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের লোক নিজেরাই করিয়াছে। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে যে কেবল টোল এবং পাঠশালাই বুঝাইত তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয় এই ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় যে বিদ্যায়তন ছিল, তেমন বৃহৎ ব্যাপার এখনো কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিথিলা কাশী নবদ্বীপে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহায্য ব্যাতিরেকেই চিরদিন চলিয়াছে।

বর্তমানকালে নানা কারণে শিক্ষালাভের জন্য আমাদিগকে বহুল পরিমাণে রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যথোচিত শিক্ষালাভের কী পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমাজ আত্মহিতসাধনের শক্তি হইতে যে প্রত্যহ ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই আমি সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমাদের যে-পাঠশালা যে-টোল অনায়াসে স্বদেশের মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া দেশকে চিরদিন ফলদান করিয়া আসিয়াছে, সেই আমাদের স্বকীয় পাঠশালা ও টোলগুলিও ক্রমশই রাজার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়া আত্মপোষণের স্বাধীন শক্তি হারাইতেছে। মোগলসাম্রাজ্যসূর্য যখন অস্তমিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বভাবের নিয়মে একদিন ইংরেজকেও নিশ্চয় এ দেশ হইতে বিদায় হইতে হইবে, তখন তাঁহাদের অন্নজীবী টোল-পাঠশালাগুলি ভিক্ষান্নের জন্য আবার কাহার দ্বারে হাত পাতিতে যাইবে।

শক্তিলাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা কেবলমাত্র খাদ্যলাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্বলাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে তখন সে ক্ষতি কোনোপ্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিমনি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল সেই তার সেই চিমনির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ করি-না কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র; যখনই জাগ্রত হইব তখনই সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সংকীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার শক্তি ইংরেজ এদেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরও অনেকগুলি শক্তি আছে যাহার উৎকর্ষ-সাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারও সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই-সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্টস্বীকারের অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এমন-কি, আমাদের বিধিদত্ত স্বাতন্ত্র্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে-মানবে কোনোদিন কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই কথা লইয়া বাংলাদেশে কিছুদিন আলোচনা চলিতেছিল—এমন-কি, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা কেহ কেহ নিজের সাধ্যমত সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই আলোচনা এবং সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব ও আনুকূল্য কিরূপ ছিল, তাহা কাহারও অগোচর নাই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে-পর্যন্ত না পার্টিশন রহিত হইবে সে-পর্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, পরের উপরে রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না; আমরা পরাধীনজাতির মজ্জাগত দুর্বলতাবশত মুগ্ধভাবে বিলাতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশীবস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি তবে স্বদেশ একটি নূতন শক্তি লাভ করিবে। যে-সকল দ্রব্য ত্যাগ করিব, তাহা অপেক্ষা যে-শক্তিলাভ করিব তাহার মূল্য অনেক বেশি। এক শক্তি আর-এক শক্তিকে আকর্ষণ করে—বলিষ্ঠভাবে ত্যাগ করিবার শক্তি বলিষ্ঠভাবে অর্জন করিবার শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এ-সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে পার্টিশনের সঙ্গে বিদেশীবর্জনকে জড়িত করা শ্রেয় নহে। মনে আছে এই আলোচনাও তখন অনেকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

তাহার পরে মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধি-বিবর্জিত সার্কুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে, আমরা বর্তমান য়ুনিভর্সিটিকে ‘বয়কট’ করিব; আমরা এ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

অবশ্য এ কথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়ের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই ঔচিত্য বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই চেষ্টা যদি কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্তিত হয়, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অনেক সময় প্রবর্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ এবং সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে অনেক বিশাল ব্যাপারের প্রারম্ভ দীর্ঘ কাল ধরিয়া একটা আকস্মিক ক্ষণিক আঘাতের অপেক্ষা করিয়া থাকে ইহা দেখা গেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে ও অন্যান্য নানা অভাবের প্রতিকার সম্বন্ধে এ দেশের স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্‌বোধন সম্ভবত বর্তমান আন্দোলনের প্রতীক্ষায় ছিল, অতএব এই উপলক্ষকে অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না।

তথাপি, স্থায়ী মঙ্গল যে-উদ্যোগের লক্ষ্য আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে-দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো ত্যাগসাধ্য ক্লেশসাধ্য মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই, পরের প্রতি রাগ করিয়া

আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়োই কঠিন। রাগারাগির স্টীম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কী। গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তুবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না।

আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনই আস্ত একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন-কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোনোমতেই ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবলক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। অনিবার্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ছোটো আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। সেইজন্য শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পিতৃমাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয়। যথার্থ স্বদেশপ্রীতির প্রবর্তনায় যখন আমরা কোনো কাজ আরম্ভ করি, তখন ক্ষুদ্র আরম্ভের প্রতিও আমরা অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারি। তখন কেবলই এই ভয় হইতে থাকে, পাছে অতিরিক্ত প্রলোভনের তাগিদে তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। তখন আমরা এক মুহূর্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেইজন্য আরম্ভকে আমরা কেবলই বার বার আঘাত করিতে থাকি।

দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই-যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়। কাজের সূত্রপাত হইতেই আমরা বিবাদ শুরু করিয়াছি। আমাদের যাঁহার যতটুকু মনের-মতো না হইতেছে, যাঁহার যে-পরিমাণ কল্পনাবৃত্তি অপরিতৃপ্ত থাকিতেছে, তিনি তাহার চতুর্গুণ আক্রোশের সহিত এই উদ্‌যোগকে আঘাত করিতেছেন। এ কথা বলিতেছেন না, 'আচ্ছা, হউক, পাঁচজনে মিলিয়া কাজটা আরম্ভ হউক; কোনো জিনিস যে আরম্ভেই একেবারেই নিখুঁতসুন্দর এবং সর্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারকে যদি খাড়া করিয়া তোলা যায় যাহা চিরদিনের মতো জাতীয় সম্বল হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জাতির সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিবে।'

বাংলাদেশের স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সকল সভা-সমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা-কিছু স্থির করিতেছেন. তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই-সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমতো প্রণালীই বাস্তবিক সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে প্রণালীর প্রবর্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে, এ ধৈর্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সাধারণের সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের আদর্শ-

রচনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম ও বিচক্ষণতা সহকারে আদর্শরচনা কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ববিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল হউক বা না হউক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে অন্তত আমার তো কোনো আপত্তি নাই।

কারণ, কাজের বেলা একজনকে মানিতেই হইবে। পাঠশালায় ডিবেটিং ক্লাবকে সর্বত্র বিস্তার করা চলে না। সকলে মিলিয়া বাদবিতণ্ডা এবং পরস্পরের প্রত্যেক কথার অন্তহীন সমালোচনা, এ কেবল সেই প্রকার বৈঠকেই শোভা পায় যাহার পরিণাম কেবল তর্ক। আমাদের তর্কের দিন যদি গিয়া থাকে, আমাদের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকেই প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিনয়ের সহিত একজনের নায়কতা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষচালনার নায়কপদ দেশ কাহাকে দিবে তাহা এখনো স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ নাই যে, এই শিক্ষাব্যাপারের কাণ্ডারীপদ হইতে যদি কোনো কারণে গুরুদাসবাবু অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহার উপর হইতে দেশের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে।

নূতন বিদ্যালয়ের প্রবর্তনব্যাপারে গুরুদাসবাবুকে প্রধান স্থান দিবার নানা কারণ আছে, তাহার মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের বর্তমান আন্দোলনব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই; তিনি এই আন্দোলনের সুবিধাটুকুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার আঘাতের প্রতি অমনোযোগী হইবেন না। কোটালের জোয়ারে নৌকাকে কেবল অগ্রসর করে তাহা নহে, ডুবাইতেও পারে। প্রবল জোয়ারের বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবলে হাল বাগাইয়া ধরা চাই। ভাসিয়া যাওয়াই লক্ষ্য নহে, গম্যস্থানে পৌঁছানোই লক্ষ্য, আন্দোলনের উত্তেজনায় এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া থাকি। আপাতত কর্তৃপক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া আমাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু কার্যসিদ্ধিতেই আমাদের চিরন্তন কল্যাণ এ কথা যাঁহারা এক মুহূর্ত ভোলেন না, দেশের সংকটের সময় তাঁহাদের হাতেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন রাগের মাথায় সর্বস্ব খোয়াইয়া মকদ্দমা জিতিবারই জেদ জন্মায়, তখনই শান্তচিত্ত প্রবীণ অভিভাবকের প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা সমস্ত স্বীকার করিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছি, এমন অবস্থায় যদি দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গলকর কর্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়, তবে গুরুদাসবাবুর মতো লোকের প্রয়োজন। স্পর্ধা প্রকাশের জন্য সভা উত্তম, সংবাদপত্রও উত্তম, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় নৈব নৈব চ।

যাহাই হউক, আমাদের সংকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহা জানি না। যদি দেশ যথার্থভাবে এ কাজের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্পনা-কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে। সেজন্য ক্ষোভ করা বৃথা। ইহা নিঃসন্দেহ, দেশ যদি বাঁচিতে চায়, তবে আজ না হউক কাল পুনরায় এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ডও হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্‌যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে।

১৩১২

প্রাক্তনী

প্রকাশ : ১৯৩৬

১৯৩৬ সালে প্রথম প্রকাশকালে 'প্রাক্তনী'তে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ-উৎসবে কথিত ভাষণটি গৃহীত হয় নি। পরবর্তীকালে এটি কালানুক্রমে ৪-সংখ্যক ভাষণরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান সংস্করণেও সেই ক্রম অনুসৃত।

এই আশ্রমে আমি একটি সম্পূর্ণ জীবনের আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম—ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলে একটি সমগ্র সত্তা সৃষ্টি করে তুলবেন এই আমার লক্ষ্য ছিল। খণ্ড করে যদি দেখি তা হলে দেখব আমরা এখানে পড়তে এসেছি বা অন্যান্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের আছে—যেমন অন্যান্য বিদ্যালয়—সেখানে ছাত্রেরা বেতন দিচ্ছে এবং তার পরিবর্তে তারা বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় শিখতে পাচ্ছে; এই দুটোতে মিলে একটা দেনাপাওনার সম্বন্ধ। এখানকার প্রধান উদ্দেশ্য সকলে মিলে আত্মাকে সৃষ্টি করে তোলা; ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সৃষ্টি।

এক সময় ছাত্র যখন অল্পসংখ্যক ছিল, তখন আমি তাদের মধ্যে থেকে কাজ করেছি, খেলা করেছি—তখন এ উদ্দেশ্য সফল হয়ে উঠেছিল। আমার বিশ্বাস সংখ্যার অল্পতাই তার কারণ, তারা আমার সঙ্গ লাভ করতে পেরেছিল, আমার নিকটবর্তী ছিল। আমাকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়েছে, একটা সত্য গড়ে উঠেছে।

তার পর অনেকদিন চলে গেল। আজ আমার বয়স অনেক হল। নানা কারণে আমাকে বিদ্যালয়ের কেন্দ্র থেকে দূরে সরে আসতে বাধ্য করেছে। শুধু শারীরিক ক্লান্তি নয়, অন্যান্য কর্মভার গ্রহণ করাও এর কারণ। ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য আমাকে টেনেছে। সম্পূর্ণ মন আশ্রম-বিদ্যালয়ে আমি দিতে পারি নি, যেমন করে আমার দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তথাপি আমার বিশ্বাস, সেই আদর্শ বরাবর ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে।

এ কথা তো সত্য যে, তোমরা যখন আশ্রমে ছিলে, দিনরাত্রি নানা বিচিত্র সুখদুঃখ ভোগ করেছ, ভাবী জীবনের কথা চিন্তা করেছ, এখানে তোমরা কেবল বই পড় নি, সংগীতে উৎসবে জীবন এখানে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া এখানে গ্রামের সেবার যে আয়োজন করা হয়েছে, তারও প্রভাব তোমাদের জীবনে পড়েছে। সব মিলে এখানে একটি সমগ্রতার আদর্শ জাগ্রত রয়েছে।

বাইরে থেকে এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা আশ্রমের এই বিপুল সমগ্রতার রূপটি দেখতে পান না। যাঁর যেটাতে রুচি, শুধু সেইটিই আংশিকভাবে দেখতে পান, চিত্রবিদ্যায় যাঁরা অনুরাগী তাঁরা সেই আয়োজনটিই দেখতে পান, যাঁরা গ্রামসেবায় উৎসাহী তাঁরা সেই ব্যবস্থাই লক্ষ করেন। কিন্তু এমন লোক অতি অল্পই দেখলুম যাঁরা এর সমগ্র রূপটি দেখতে পেয়েছেন, এখানে যে একটি প্রাণের বিকাশ স্বতই জেগে উঠেছে সেটি অনুভব করেছেন। এইটি দেখতে পান না বলেই তাঁরা যে সমালোচনা করেন তাও আংশিক।

কিন্তু তাঁরা তো বাইরের লোক। দুঃখের বিষয় হবে, যারা এখানে মানুষ হয়েছে, তারা যদি এর বৃহত্তর রূপটি উপলব্ধি না করতে পারে। সকলের শক্তি সমান নয়, পরিপূর্ণ দৃষ্টি দুর্লভ, সে কথা আমি জানি। পাখিরা যে বনস্পতির আশ্রয়ে থাকে, তার যে শাখায় তারা থাকে প্রধানত সেইটাকেই অনুভব করে, নিজ বাসাতেই তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ। কিন্তু বনস্পতির যে বিচিত্রতা, ঋতুতে ঋতুতে তার যে বিকাশ, তা তারা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পায় না। মানুষের মধ্যেও এইরকম আছে, যেটুকু তাদের জীবনের আশ্রয় সেইটুকুতেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমাদের অনেক ছাত্র আশ্রমের সম্পূর্ণ রূপটি না দেখে চলে গিয়েছে। অবশ্য এ অপরিহার্য, সকলের শক্তি সমান নয়। আমি যখনই উপলক্ষ পেয়েছি তখনই জীবনের এই পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, জীবনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে চেষ্টাকে নিবদ্ধ করি নি।

এই আশ্রমে যে নানা বিচিত্র আয়োজন আছে তাকে বহন করতে আজ আমি ক্লিষ্ট ক্লান্ত। কারণ, এই আশ্রমকে আমার দেশ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নি। বহুকাল এর ভার একলা আমার উপরেই পড়েছে। বয়স যতদিন অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল ততদিন ভ্রূক্ষেপ করি নি। তার পর এমন দিন এল, যাঁরা এর হিতৈষী তাঁরা বললেন যে, এ পর্যন্ত এ আশ্রম আমাকেই অবলম্বন করে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা থাকে, সাধারণে মনে করতে পারে যে এক

ব্যক্তির জিনিস। এই আলোচনার ফলে সেই সময় একটা কনস্টিট্যুশ্যন প্রবর্তিত হল, অতি জটিল এবং বিচিত্র সে নিয়মাবলী।

কনস্টিট্যুশ্যন একটা নৈর্ব্যক্তিক যান্ত্রিক জিনিস, তাতে কার্যপ্রণালীর একটা বাঁধা নিয়ম থাকে, সেইটেই সকল কর্মকে চালনা করে। লোকে আশঙ্কা করে যে, ব্যক্তিগত প্রভাব ও পরিচালনার একটা ক্ষণিকতা আছে, তা ছাড়া উত্তরকালবর্তী দ্বিতীয় ব্যক্তির মতান্তর হতে পারে; বাঁধা নিয়ম দ্বারা চালিত হলে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা থাকে। আমি এই কনস্টিট্যুশ্যনের প্রবর্তনায় আপত্তি করি নি—যাঁদের নিয়ে কাজ করি তাঁদের সিদ্ধান্তে বাধা দেব না এই আমার মত। এর দায়িত্ব তো চিরদিন আমি স্বীকার করতে পারব না। যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা মনে করলেন এইভাবে স্থায়িত্ব সম্ভব হবে, তাই আমি সম্মতি দিয়েছিলাম।

কনস্টিট্যুশ্যনের মধ্যে যে ত্রুটি আছে সে হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভাব এবং যান্ত্রিকতার প্রবলতা। কিন্তু আধুনিক কালের মনোভাবই অনুষ্ঠানকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে রক্ষা করা, এখানেও তাই হল। কিন্তু এই যন্ত্রের মধ্য দিয়েই তো কাজ করতে হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে যে মানবশক্তি কাজ করে তা যাতে খর্ব না হয়, যান্ত্রিকতা যাতে প্রবল না হয়ে ওঠে, তা তো দেখতে হবে। এটা যখন চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে তখন আমি তাদের সহানুভূতি কামনা করি—যারা এখানে মানুষ হয়েছে, এখানকার ভাবের আদর্শ যারা পেয়েছে; কোনো দিকে চিত্তবৃত্তির বিকাশ যাদের এখানে হয়েছে, তারা যদি এখানকার সঙ্গে যোগ রক্ষা না করে তবে এই প্রতিষ্ঠান মানবধর্মহীন হবে। যে-সকল প্রাক্তন ছাত্রের এখানে কর্মের ক্ষেত্র আছে তারা এখানকার পরিচালনায় কর্তৃত্বলাভ করবে—আমি সর্বদাই এই ইচ্ছা করেছি। এর প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যে, তাদের আশ্রমের প্রতি যতই অনুরাগ থাকুক, সংসারের গতিকে তাদের দূরে থাকা অনিবার্য। দ্বিতীয়ত কোনো কোনো ছাত্রের মনে আশ্রমের স্মৃতি ও আশ্রমের প্রতি প্রীতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা অসম্ভব নয়। একটি তৃতীয় কারণও হয়তো বা আছে—দেশের লোকের মনে আশ্রমের সম্বন্ধে যে অহৈতুক বিরাগ দেখা যায় তার প্রভাব প্রাক্তন ছাত্রদের উপরেও বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব নয়।

একটি অনুষ্ঠানের তিনটি দিক আছে—তার অতীত বর্তমান এবং ভাবীকাল। অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ সুস্থ প্রাণের ধর্ম নয়। এই অতীতের প্রতিনিধিই প্রাক্তন ছাত্র; তারা যদি অনুরাগ ও সহযোগিতার সম্বন্ধে আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকে তা হলেই আশ্রমের প্রাণধর্ম বল পেতে পারে।

ভাবীকালের জন্য এই আশ্রমে আমি প্রচুর স্বাধীনক্ষেত্র প্রসারিত রেখেছি—এখানে কোনো বিশেষ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করি নি। কালে কালে মানুষের পরিবর্তন ঘটে থাকে—যারা একই কালকে জীবনে স্থায়ী করতে চায় তারা মৃত্যুর সঙ্গে রফা করে। তাই এটা আমি কখনও আশা করি নি যে এখানে যারা বয়স্ক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাঁদের মনকে আমি একটা ছাঁচে-ফেলা রীতিতে চালনা করব। ভাবীকালের বিকাশের জন্য প্রশস্ত পথ আমি রেখেছি।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, তোমরা আশ্রমের অতীতের প্রতিনিধি, তোমরা যদি সহায় হও তবে এর বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক আনুকূল্য হতে পারে। তোমরা যদি এই সহায়তা কর তা হলে এই আশ্রম শুধু ভারতবর্ষ নয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

ছাত্রদের সহযোগেই এই আশ্রমের আদর্শের রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এমন বলতে পারি নে; তার কারণ, বিরূপ চিত্ত নিয়ে এখানে অনেকে এসেছেন। আমি সবাইকেই স্থান দিয়েছি। বড়ো প্রাণের মধ্যেই ছোটো ছোটো রোগের বীজ থাকে; আকাশে বাতাসে বহু রোগের বীজাণু আছে, শরীর যদি সুস্থ থাকে তবে তা আমরা উপেক্ষা করে চলতে পারি। নিজেকে একান্তভাবে আবৃত করে চললে প্রাণধর্মকেই আহত করা হয়। এইজন্যেই জীবনে বিরুদ্ধতার আঘাত স্বীকার করা প্রয়োজন—এমন-কি মর্মে আঘাতও মেনে নিতে হয়—তার পরেও যদি বাঁচি তবেই সত্যি বাঁচলুম।

আমার আজ বিপদের দিন। ঠিক সময়েই তোমরা এসেছ, এই সময়েই তোমাদের আমার দরকার ছিল। বিচিত্র আঘাতে ও বিরুদ্ধতায় আজ আমার মন ক্লান্ত ক্লিষ্ট। আজ যদি আমি এ কথাটা উপলব্ধি করে যেতে পারি যে আশ্রমের প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা আছে, যদি জানতে পারি যে তোমাদের প্রাণের মধ্যে এর বেঁচে থাকবার শক্তি রয়ে গেল, আমি তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। একসঙ্গে তোমাদের সকলকে আমি দেখতে পাই নে। কিন্তু তোমরা যখন যাবে তখন সতীর্থদের যদি স্মরণ করিয়ে দাও তাদের প্রতি আশ্রমের কী দাবি, কী দায়িত্ব তাদের, তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস সে দায়িত্ব তারা স্বীকার করবে।

তোমাদের পক্ষ থেকেও তেমনি জিজ্ঞাসা করবার আছে যে, এমন কোনো ব্যবস্থা আছে কি না যার দ্বারা তোমরা আশ্রমের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকতে পার। সে ব্যবস্থা বোধহয় হয় নি, হয়তো তার সূচনা হয়েছে মাত্র। তোমাদের ইচ্ছাতে এবং চেষ্টাতেই সেটা তোমরা গড়ে তুলবে।

নূতন যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁরা হয়তো তোমাদের চিনবেন না, বিশ্বাস করবেন না, সেজন্য তোমরা কুণ্ঠিত হোয়ো না—আমি তো তোমাদের চিনি, আমি তো তোমাদের স্নেহ করি। তোমাদের যে জোর আছে সেই ভালোবাসা ও নিষ্ঠার জোরে তোমরা দাবি করতে পার এবং করবে এবং সেই দাবিতে এমন একটি ক্ষেত্র রচনা করে তুলবে যাতে তোমাদের অনুরাগ ও সহকারিতা এই আশ্রমকে বলশালী করে তুলতে পারে। বস্তুগত আনুকূল্য, আর্থিক সহায়তা আমি তোমাদের কাছে আশা করি নে। আপন নিষ্ঠার দ্বারা, ভালোবাসার দ্বারা যদি এই আশ্রমকে তোমরা বাইরের সমস্ত আঘাত থেকে আবৃত করে রাখতে পার তা হলে তার চেয়ে বড়ো তোমাদের কাছ থেকে কিছু পাবার নেই।

শান্তিনিকেতন
৬ আগস্ট ১৯৩৪

২

আশ্রম-বিদ্যালয়ের আরম্ভকালের কথা আজকের দিনে আমার মনে পড়ে। এক সময়ে নদীবক্ষে আমি দীর্ঘকাল কাটিয়েছি; সেখান থেকে চলে এসেছিলাম মনে এই সংকল্প নিয়ে যে, ছেলেদের কিছু আনন্দ দেব। অল্পবয়সে বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার দুঃখকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল—তখনকার বিদ্যালয়ের শুধু দীনতা নয়, নানাপ্রকার হীনতাও আমাকে অত্যন্ত আঘাত করেছে। তবে এ কথা বলে রাখা ভালো যে, আমি এই বিদ্যালয় রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম কোনো লোকহিতৈষণার বশবর্তী হয়ে নয়। প্রকাশের ইচ্ছাই আমার জীবনের একমাত্র ইচ্ছা, অন্তরের মধ্যে যে চিত্র আছে সেটাকে বাইরে কর্মে গানে চিত্ররূপে দেবার কাজই আমার—আমার উপর এই ভার, উপরওয়ালার এই ফরমাশ। আমার চরিত্র প্রকাশধর্মী, তপোবন-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার মনে যে-একটি ছবি ছিল তাকেই আমি শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম, এর মধ্যে বিশ্বমানবের উপকার করবার কোনো আগ্রহ ছিল না। আমার মনের এই সুস্পষ্ট ছবি নানা অভাবের মধ্য দিয়ে বাইরে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, আমি অন্য কারও নকল করতে যাই নি, কোনো বিদেশী শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ করি নি, সে দিকে আমার দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা ছিল না। কালিদাসের গ্রন্থে তপোবনের যে বর্ণনা পড়েছি সেইটি বাল্যকাল থেকে আমার অন্তরে ছিল—আধুনিক যুগের ব্যবহারের জন্য এক সময় যখন তার আভাসমাত্র দিয়েছিলাম তখন দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ঈষদ্‌ধাস্যে মন্তব্য করেছিলেন যে ওটা এখনকার জন্য নয়। প্রকৃতির শিক্ষার কথা আমি বলেছিলাম; অনেকে বলেছিলেন তার কোনো মানে হয় না। আমি বলেছিলাম যে, প্রকৃতি অগোচরে যে মানবচরিত্রকে গড়ে তোলে তা মরুপ্রদেশের আরব ও নীলনদের তীরে উর্বর ভূমির অধিবাসীদের প্রকৃতির ভিন্নতা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। প্রকৃতির দান অজ্ঞাতসারে চরিত্রকে গড়ে তোলে।

তপোবনের যুগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হতে পারে কিন্তু তখনকার কালে যে আদর্শ সক্রিয় ছিল তা সত্য, তা কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ নয়। তাকেই রূপ দেবার কথা আমার মনে ছিল— প্রাচীনের অবিকল নকল হবে না, অনেক বৈসাদৃশ্য থাকবে, এমন-কি অনেক কিছু উল্টোও থাকবে— কিন্তু মূল আদর্শটি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই সংকল্প মনে নিয়ে পাঁচ-সাতটি ছেলেকে নিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করেছিলুম। এটি আমার মনে ছিল যে যারা আসবে তাদের সঙ্গে আমার দেনাপাওনার সম্পর্ক না থাকে— বিদ্যাদানকে ব্যবসায় করে তুললে শিষ্যদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে অন্তরায় ঘটে; ছাত্র মনে করে, আমি কিছু দিচ্ছি তার পরিবর্তে কিছু পাচ্ছি। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে শিষ্যের সমস্ত ভারই গুরুর, শিষ্য গুরুর পরিবারের অন্তর্গত। আমি প্রথম যখন আশ্রম আরম্ভ করেছিলুম তখন ছাত্রদের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি। আমি তখন একরূপ নিঃস্ব, তার পর প্রভূত ঋণ, তবুও কৃপণতা করি নি— তখনকার ছোটো বিদ্যালয়ের ভার সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলুম। সর্বদা সেটা সম্ভব হল না, বিদ্যালয়ের প্রকৃতি বদলাল— তবুও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় আনন্দময় যোগ রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। তার পর অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে। এই চল্লিশ বৎসরে দারিদ্র্য, মৃত্যুশোক, অনেক দুঃখ আমাকে বহন করতে হয়েছে— কোনো ইতিহাসে তার চিহ্ন নেই। মনে হয়, দুঃখতাপের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। যদি প্রশ্রয় পেতুম, অর্থানুকূল্যে পেতুম, তা হলে সেই অর্থেরই দাসত্ব করতে হত, নিজের স্বরূপ নানা ভাবে প্রতিহত হত।

এই সময়ে আমার সহকর্মী হয়ে এসেছিল কবি-বালক সতীশ, অদ্ভুত তার চরিত্র, মাধুর্যের সঙ্গে বীর্য, ত্যাগের সঙ্গে সৌন্দর্যভোগের শক্তি এমন আমি আর কোথাও দেখি নি।

এই বিদ্যালয় যে নিজেই শুধু ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে তা নয়, আমাকেও এ যুগ থেকে যুগান্তরে নিয়েছে, এই বিদ্যালয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমারও জন্মান্তর ঘটেছে। কখনও জনতার মধ্যে প্রবেশ লাভ করি নি, সর্বদা নিভৃতেই কাটিয়েছি— বাইরের বিশ্বে আমার প্রবেশ অনেক দুঃখে। এই বিদ্যালয়ের কাজে হাত দেবা মাত্র এর দাবি প্রশস্ত হতে হতে আমার স্বল্প সম্বলের বিশেষ অবশিষ্ট রাখে নি— তিনি যখন মানুষের কাছে দাবি নিয়ে আসেন তখন তো কিছু হাতে রাখতে দেন না।

এত অকিঞ্চনতার মধ্যে বোধ হয় আর-কোনো প্রতিষ্ঠানেরই সূচনা হয় নি। সকলেই চাঁদা সংগ্রহ করে পাথেয় সঞ্চয় করে থাকে— আমি বিষয়বুদ্ধিহীন, জলে ঝাঁপ দিয়ে হাবুডুবু খেয়েছি, পূর্বে কোনো উদ্যোগ করি নি। সকলে যে একে বিশ্বাস করে নি সেজন্য দোষ দেওয়া চলে না, এতই ক্ষীণ ছিল এর প্রারম্ভ। যে-সব ছেলে এসেছিল তারাও যে সব রত্ন তা নয়; কোথাও যাদের গতি নেই, বাপ-মা ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে, তারাই প্রথমে এসেছিল এখানে। একজন অভিভাবক আমাকে বলেছিলেন তাঁর ছেলের সম্বন্ধে, 'এ অত্যন্ত অবাধ্য, একে যথাসাধ্য মারবেন, আমি খাটের খুরোতে বেঁধে একে মেরেও কোনো ফল পাই নি, তাই আপনার হাতে দিচ্ছি।' কোনো কোনো ছাত্র এমন দুর্দান্ত ছিল যে, তারা সাপ দেখলেই ধরতে যেত, কেউ বা কাচ খেতে চাইত, কেউ তালগাছের চূড়ায় উঠে বসে থাকত— সেখান থেকে পড়েও মরে নি। আশ্রম তখন ছোটোখাটো পূর্ববঙ্গ হয়ে উঠেছিল, গোয়ালন্দের ইস্টিশন। অধ্যাপকরা ধৈর্য হারাতেন, বলতেন— এরা থাকলে আমাদের কোনো দায়িত্ব থাকবে না। অনেকবার তাই আমাকে সেই-সব দুর্দান্ত ছাত্রদের জামিন হতে হয়েছে— সেরকম ক্ষেত্রে তারা সর্বদাই আমার মান রেখেছে। সর্বদাই আমি তাদের পক্ষ নিয়েছি, আমার কাছে নালিশ হলে প্রায়ই রায় দিয়েছি তাদের পক্ষে।

তৎসত্ত্বেও তখন আমাদের আনন্দের কোনো ব্যাঘাত হয় নি, দুঃখ কষ্ট সহজেই সহ্য করতে পেরেছি— নিয়মপালনই তখন একান্ত হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে স্বাধীনতা ছিল। বিদ্যালয়ে তখন হেডমাস্টার বলে কেউ ছিলেন না, প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষকরাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। পরে যখন

পরীক্ষাপাসের শনি প্রবেশ করলে, তখন বেছে বেছে একজন হেডমাস্টার নেওয়া হল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ যশ। তিনি এসে যখন দেখলেন ছেলেরা গাছে চড়ে পড়া মুখস্থ করছে, ডালে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে, তিনি অসম্মতি প্রকাশ করলেন, বললেন এ-সব চলবে না। ছেলেরা হাসলে তিনি তাকে চপলতা মনে করতেন, অপরাধ বলে গণ্য করতেন। শিক্ষার নানা বিচিত্র প্রণালী তিনি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন, শুনে আমাদের হাস্যকর বলে মনে হত। পদে পদে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে লাগল, ছেলেরা বেশি করে হাসতে লাগল—অবশেষে একদিন তাঁকে বিদায় দিতে হল। এইরকম বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেক ভার চেপেছিল, কোনো-এক রকমে তা বহন করেছি, কিন্তু বৈশ্যবুদ্ধির আশ্রয় নিই নি।

পূর্বতন ছাত্রদের কাছে আমার শুধু একটি কথা বলবার আছে। শান্তিনিকেতনে যে অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে পূর্বতন ছাত্রেরা যেন পরিপ্রেক্ষিতে সেটিকে সম্পূর্ণ করে দেখতে পারে। তোমরা যখন নিকটে ছিলে তখন লেখাপড়া করেছ, খেলাধুলো করেছ, আনন্দ পেয়েছ, দুঃখও অনেক পেয়ে থাকবে—এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে অনেক সময় অকিঞ্চিৎকরতার দিকটাই বড়ো হয়ে চোখে পড়ে। মনে রেখো এমন কোনো সৃষ্টি নেই যার মধ্যে ত্রুটি না আছে—অনেক সময় সেইটাই বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে, তারই আমরা বেশি মূল্য দিই—কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে বেষ্টন করে আছে যে প্রাণের পরিমণ্ডল তা আমাদের চোখে পড়ে না। নিকটে থেকে অনেক সময় আমরা বস্তুগত হিসাব করে থাকি—এখানে কতগুলি বাড়ি আছে, কী এর পাঠ্যতালিকা। কিন্তু দূর থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা সহজেই অনুভব করতে পারেন এর ভাবরূপটি, এর atmosphere—তাঁরা বলেছেন, অন্যত্র এমনটি দেখি নি।

আমার সাধ্য সংকীর্ণ, সব মানুষকে একত্র করবার, নিষ্ঠা উদ্রেক করবার শক্তির অভাব আমার মধ্যে। লোকের সঙ্গে বাইরে যেভাবে মিলিত হলে নিষ্ঠার সঞ্চার করা সহজ হয় তা হয়তো আমি পারি নি; কিন্তু এ কথা বলতে পারি যে অন্তরে আমার প্রীতির অভাব ছিল না। নিঃশেষে নিজেকে নিঃস্ব করতে আমি কৃপণতা করি নি—আমার ক্ষতি করেছেন অনেকে, কিন্তু আমার দ্বারা অন্তত কারু ক্ষতি হয় নি।

আমার ভাগ্যক্রমে আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত আসন পেয়েছি, সেই আসন আমি পেতেছি শান্তিনিকেতনে। নিঃসন্দেহ সেই যোগ শ্লাঘ্য, তার মূল্য আছে। শান্তিনিকেতনের সে গৌরব রক্ষা করবার ভার তোমাদের উপর—তোমরা যদি অনুভব কর যে তোমরা এক সময় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলে, তোমাদের প্রীতি ও নিষ্ঠা যদি অটুট থাকে, তা হলে আমি তোমাদের কাছে থেকে আর কোনো প্রতিদান চাই নে। যদি কখনও এই বিদ্যালয়ের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, যদি বাধাবিপত্তি আত্মদ্রোহ আসে, তা হলে তোমাদের নিষ্ঠা যেন অবিচলিত থেকে একে রক্ষা করে।

কলিকাতা
২৭ বৈশাখ ১৩৪৩

৩

আজকের দিনে তোমরা আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এই যে মিলিত হয়েছ, এ বিশেষ আনন্দের কথা। শান্তিনিকেতনের যে বাহ্য-প্রকৃতির রূপ—ঘরবাড়ি, সেটি এর বড়ো পরিচয় নয়; তোমরা এখানকার অধিবাসীরা তোমাদের যে প্রাণের অংশ এখানে দিয়ে গেছ, এর ইতিহাসে সেইটিই সব-চেয়ে বড়ো কথা। প্রতিক্ষণে এখানে যে প্রাণের প্রবাহ চলেছে, এখানকার স্তরে স্তরে যে প্রাণের পলি পড়েছে, তাই এখানকার ইতিহাসে রয়ে গেছে, সেটি এর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তোমাদের যে প্রত্যেকের নাম এখানে গাঁথা হয়ে রইল তা নয়, কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তোমাদের যতটুকু যথার্থ সত্য সম্বন্ধ হল ততটুকু তোমরা এখানে দান করে গেলে। এখানকার যে বাইরের বিধিবিধান, তার ভার

অধ্যাপকদের উপর, এর পরিচালনার ধারা কোনো একভাবে চলবেই, কিন্তু এখানের যে প্রাণের ঐক্যধারা তার ভার তোমাদের প্রাক্তনদের উপর। ভবিষ্যতে তোমাদের অন্তরের প্রীতি এই অনুষ্ঠানকে গঠিত করবে, এই কথা ভাবতে আমি ভালোবাসি।

আমি যখন প্রথম এই অনুষ্ঠান স্থাপন করি তখন বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে ছাত্র এখানে এসেছিল; বিশেষত পূর্ববঙ্গের। আমি প্রতিদিন দেখেছি, তারা আমাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধটি ভোলে নি; আশ্রম থেকে দূরে গেলেও তাদের এই যোগ ছিন্ন হবার নয়, তাদের মনের মধ্যে এই ভাবটি আমি লক্ষ করেছি। তখনকার ছাত্ররা বার বার ফিরে ফিরে এখানে এসেছে, পরবর্তী ছাত্রদের আত্মীয় বলে দেখেছে, বড়োদের 'দাদা' বলে স্নেহের সম্পর্ক জানিয়েছে; আশ্রমের বাইরে যেখানেই তারা মিলিত হয়েছে পরম আত্মীয়তার যোগে যুক্ত হয়েছে।

আশ্রমের এই প্রীতির ধারাটি লক্ষ করে আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছিল। মনে হয়েছিল এই অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে বঙ্গদেশব্যাপী এক পরম আত্মীয়তার যোগ স্থাপিত হবে, বাংলার নাড়ির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের গভীর যোগ হবে। তার পর সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমের সঙ্গে নানা দেশবিদেশের যোগ হল, এর পরিধির বিস্তার হল। কিন্তু সেই মূল আদর্শটি এখানে রয়ে গেছে। এখানকার ছাত্ররা উপাধি নিয়ে চলে যাবে, পরীক্ষা-পাসের মন্ত্রে মার্কামারা হয়ে বেরোবে, এর জন্য এখানে আমি আমার শক্তি নিয়োগ করি নি। আমি তো যান্ত্রিক নই, হাইড্রলিক প্রেসের চাপে যেমন কারখানার মাল তৈরি হয়, তেমনি দাগা দেবার যন্ত্র এখানে পাকা হয়ে থাকবে, এ আমার সংকল্প নয়। যাতে প্রাণের ধর্ম নেই তেমন বিদ্যায়তনে আমার উৎসাহ নেই। আমি ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধির দাবি রাখি নে; যদি হৃদয়ের প্রেমের সূত্রে ভক্তি ও প্রীতির দ্বারা এই আশ্রম দূরে দূরে ভারতের সকল মানুষকে বাঁধতে পারে, যদি এই আশ্রমে বিশ্বপ্রাণের রূপটি ব্যক্ত হয়, তবেই যথার্থ সফলতা লাভ হবে।

আশ্রমের সেই প্রাণের রূপের পরিচয় সাধনের ভার তোমাদের উপর রয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এখানে এমন একটি কেন্দ্র হোক যেখানে সর্বভারতের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্র গ্রথিত হবে, যেখানে মানবহৃদয়ের একটি মিলনক্ষেত্র হবে। তোমরা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এখানে ফিরে ফিরে এসে এই প্রতিষ্ঠানের মূলগত সেই একান্ত অকৃত্রিম প্রীতিকে ব্যক্ত করেছ। যদি এই আশ্রমের সঙ্গে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ প্রবল হয়, সত্য হয়, তবেই এখানকার ভাবটি দেশে দেশে বিস্তীর্ণ হবে এবং আমার জীবনব্যাপী চেষ্টা ও ত্যাগের সার্থকতা হবে।

তোমরা কখনও মনে কোরো না যে, পরীক্ষায় বেশি মার্কা পেলে বা কর্মজীবনে বেশি খ্যাতি লাভ করলে এর দ্বারা আশ্রমকে যথার্থ বিচার করবে। তোমরা জান, এই অনুষ্ঠানকে অনেক নিন্দা ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছে। কারণ বাঙালির ধর্মই নিন্দাবাদ করা, দেশবাসীর স্বভাব সর্বকর্মে অহৈতুকী প্রতিকূলতা করা— চিত্তদৈন্যবশত তারা সকল প্রচেষ্টাকে ছোটো করতে চায়। তোমাদের এই প্রীতি ও নিষ্ঠার সহযোগিতা তাই একে বাঁচাবে। তোমরা সকলে সংসারক্ষেত্রে সম্মান না পেতে পার, কিন্তু আশ্রমের প্রতি তোমাদের এই প্রীতি এখানকার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে, এর ইতিবৃত্তে তোমরা বড়ো স্থান নেবে।

ভারতের এই একটি কেন্দ্রে বিদ্যা ও প্রাণের সঙ্গে গভীর যোগ-সাধনের চেষ্টা হয়েছে, আমি আশ্রমের ভিতরকার এই লক্ষ্যটি কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দিই নি। ত্রিশ বছরের ঊর্ধ্বকাল যে দুঃখ দিয়ে এর আদর্শকে বহন করেছি তার ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ থাকবে না, তা তোমরা কেউ জানবে না, অল্প লোকের সঙ্গেই তার পরিচয় আছে। আমার এই দীর্ঘজীবনের প্রয়াস সার্থক হবে, যদি তোমরা এর অন্তর্নিহিত সত্যটিকে উপলব্ধি কর। শুধু বিধিবিধানের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমরা জীবনের যে ছাপ এখান থেকে পেলে তার চিহ্ন দিয়ে তোমাদের শুদ্ধ প্রীতি নিষ্ঠা ও ত্যাগের দ্বারা একে রক্ষা করতে হবে। অন্য বিদ্যালয় শুধু মাইনের দাবি রাখে। এই আশ্রম এখানকার ছাত্রদের কাছে ত্যাগের দাবি করে। তোমাদের সেই কল্যাণকামনা ও ত্যাগের দ্বারা এর

সত্যটিকে পরিপুষ্ট করতে হবে। দূরে নিকটে যে অবস্থায় থাক মনে রেখো, তোমাদের আত্মদানের উপর আশ্রমের আদর্শ নির্ভর করছে।

আমি নিজের জীবনে যা দিয়েছি তার প্রতিদান চাই নি। এই আশ্রমে যে দুর্লক্ষ্য সত্য কাজ করছে, এখনকার পাঠ ও শিক্ষাপ্রণালীর ঊর্ধ্বে যে সত্তা আছে, তোমরা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা তা গ্রহণের দ্বারা এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হও, তোমরা আশ্রমকে এই প্রতিদান করো।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৩৯

৪

এক সময় তোমরা এই বিদ্যালয়ে ছিলে— দূরে গেলে মনের বিচ্ছেদ ঘটতেও পারে, সেইজন্য দু-একটি কথা তোমাদের কাছে বলা প্রয়োজন মনে করি।

আমাদের এই বিদ্যালয় নানারকম যোগাযোগে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সর্বদাই এর মধ্যে একটা মূলতত্ত্ব কাজ করছে। আমি যদি বলি সে তত্ত্ব আমার, কঠিন ছাঁচে ঢালাই করে তাকে রক্ষা করতে হবে— তা হবার নয়; আমি বলব না যে, এমন একটা কাঠামো তৈরি করতে হবে যা চিরকাল থাকবে। এর ভিতরকার সে মূল কথাটি এই যে, একটি বৃহত্তর জীবনের ভূমিকায় আমরা অনেকে একসঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছি— নানা বিচিত্রতা-বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে একটি প্রাণবান অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সে নিজেও জানে না কোন্ পথে যাবে, তার কোনো বাঁধা পথ নেই।

একলা যখন ছিলুম তখন আমার অভিপ্রায়ই এ অনুষ্ঠানের মধ্যে কাজ করেছে। পথ তখন সহজ ছিল। যখন কথা হল যে, সাধারণের হাতে সমর্পণ না করলে এ বেশি দিন স্থায়ী হবে না, দেশের যোগ থাকবে না, তখন একটা কনস্টিট্যুশ্যন করতে হয়েছিল— তৎপূর্বেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে এর যোগ ঘটেছিল, অনেকে জেনেছিল এর কথা। আমার মতে, এই কলাকৌশলের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার প্রয়োজন আছে। তোমরা অনেকে জান এই বিদ্যালয়ের জন্য নিজেকে আমি অনেক বঞ্চিত করেছি— সাহিত্য যে আমার পন্থা তাতেও আমি আঘাত সয়েছি। আমার অবর্তমানে এ যদি একটা কল মাত্র হয়, তবে কেন এত করেছি? আমার সেই গোপন দুঃখের ইতিহাস কখনো কেউ জানবে না। আনুকূল্যের চেয়ে অধিক মিথ্যে উক্তি আমি লাভ করেছি— বহু বিদ্রূপ নিন্দা মাথায় করে এখন আমার জীবনের শেষ ভাগ উপস্থিত। এখন যদি এ একটা জীবন্মৃত পদার্থে পরিণত হয়, এর প্রাণশক্তি না থাকে, তবে ব্যর্থ হলুম। যতটা দিয়েছি তার কিছুই ফল পাব না তা ইচ্ছে করে না।

তোমরা সবাই অনুকূল হবে এমন আমি আশা করি নে, তবে আশা করি এক দল আছে যাদের এর সম্বন্ধে মমতা থাকা স্বাভাবিক। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বিদ্যালয় প্রাণবান, এর মধ্যে অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু এর অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত। তোমরাও যদি তাই মনে কর তবে এর অঙ্গীভূত হয়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা স্থায়ী প্রভাব এর উপরে বিস্তার করতে পার।

বিরুদ্ধতাকেও আমি স্বীকার করি— তোমাদের কাছে আমি শুধু এইটুকু চাই যে অকৃত্রিম মমতার সঙ্গে একে তোমরা গ্রহণ করো।

কী করে তার অবকাশ হতে পারে তা আমি জানি নে— কনস্টিট্যুশ্যন সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি অক্ষম— আমি শুধু আমার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারি; যখন আমি থাকব না তখন এর মধ্যে প্রাণকে জাগিয়ে রাখতে পারে এমন একটা শক্তি থাকা দরকার— তোমরা যদি অগ্রসর হয়ে একে গড়ে নাও তবে সেই অভাব মোচন হতে পারে।

শান্তিনিকেতন
পৌষ-উৎসব। ১৩৪১

৫

আমাদের এই আশ্রম-বিদ্যালয় বিংশতিবর্ষে পদার্পণ করেছে। একটা বয়স আছে যখন পা ঠিকমত ফেলতে পারা যায় না—সে বয়সটা পার হয়েছে। এখন এর কতকটা পরিণতিলাভ হয়েছে, ধাত্রীর ক্রোড় থেকে একে এখন নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হবে। কিছুকাল থেকে কতকগুলি শক্তির কাজ এর ভিতরে দেখা দিচ্ছে— অনুভব করছি, এর কতক কতক পরিবর্তন এর স্থায়িত্বের জন্য দরকার।

প্রথম যখন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় তখন তার মূলে যে অভিপ্রায় এবং আদর্শ ছিল সে যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে তা বলতে পারি না।

প্রত্যেক দেশেরই নিজের শিক্ষাবিধি পরিচালনা করবার অধিকার আছে—সে বিষয়ে আমাদের খর্বতা দেখে গ্লানি অনুভব না করে থাকতে পারি না। আমাদের শিক্ষায় বাইরের দিক থেকে চাপ পড়েছে, বিদেশী যে বুলি বলাচ্ছেন তাই বলছি। কথা হতে পারে, বিদ্যার তো বিশেষ একটা জাতীয়তা নেই, অতএব আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির কোনো দোষ নেই। কিন্তু মনকে তো স্বাধীন রাখতে পারা চাই। বাল্যকাল থেকে যা শিখছি যা শুনছি, তাই ঘাড় পেতে নিচ্ছি—বাইরের আত্ম-কর্তৃত্ব এবং অন্তরে শক্তির অভাবে জীবনে আমাদের গভীর অবসাদ এসেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে আমাদের দেশে অনেক এন্‌জিনিয়র অনেক উকিল হয়েছে, কিন্তু মাথা হেঁট হয় যখন ভাবি, খালি মুখস্থ করেছি এবং ডিগ্রি পেয়েছি কিন্তু পৃথিবীকে কিছুই দিই নি।

জাপান আমাদের চোখের সামনে রয়েছে— বিদেশী শিক্ষাকে সে নিজের প্রয়োজনমত প্রয়োগ করেছে, গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা তাকে নিজের উপযোগী করেছে। মানুষের চিত্তকে জাপান যে নূতন কোনো সম্পদ দান করেছে তা নয়, তাদের চিত্তও যে অন্তরে বিশেষ শক্তি লাভ করেছে তা নয়, কিন্তু তবু তাদের হাত দক্ষতা লাভ করেছে, কর্মনৈপুণ্যে অস্ত্রশস্ত্রে পণ্য-উৎপাদনে বিদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার শক্তি তারা লাভ করেছে। বাইরের থেকে আত্মরক্ষার শক্তি জাপান অর্জন করেছে— ছিদ্র পেলে কলি যেমন করে প্রবেশ করে অন্য জাতি তেমন করে জাপানে প্রবেশ করতে পারবে না।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের মূলে যে দুর্বলতা, তাকে মূঢ়ের মতো অস্বীকার করে বিদেশীর কর্তৃত্বকে তাদেরই অপরাধ বলে গণ্য করে বসে আছি। যতদিন আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে লোকাচারে বিরোধ-বিচ্ছেদ পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা এমন উগ্র হয়ে থাকবে ততদিন আমাদের দৈন্য ঘুচবার নয়। মানুষকে কোথায় দূরে রেখে দিয়েছি, শক্তির সঙ্গে শক্তিকে মেলাতে পারছি না। আজ অনেক দুঃখে তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

এই পৃথিবীতে যে নজরবন্দী হয়ে থাকব সে তো বিধাতা হতে দেবেন না—মানুষকে তিনি মানুষের সঙ্গে মেলাবেন; যদি এমন প্রাচীর গড়ে রাখি যাতে অন্য দেশের সঙ্গে মিলন না হয়, তবে আঘাতের পর আঘাত এসে সব বাধা ভাঙবে—প্রেমের পথে মিলন না হলে বিরোধের পথে হবে। নিজের নিজের কোণে বসে উৎকর্ষ লাভ করবার দিন গেছে। শিশু চিরকাল শিশু থাকবে না, ধাত্রীর ক্রোড়ে তাকে লুকিয়ে রাখলে চলবে না। চীন পারস্য সবাই একদিন মানুষ হয়েছে ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত হয়ে। কিন্তু প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলে বাইরের জগৎকে দূর করে রাখলে কিছুদিন হয়তো বেড়ে ওঠা যায়, কিন্তু তার পরে প্রাণের প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে শরীর মন বুদ্ধি ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

ঐক্যের যোগে হঠাৎ বল লাভ করলে যে জাত সে এসে ভারতবর্ষকে আঘাত করলে। দেশে শক্তির বীরত্বের অভাব ছিল না, কিন্তু বীরত্বে তো বাঁচাতে পারে নি; ধর্মভীরুতা কম ছিল না, যথার্থ মনুষ্যত্বও যে ছিল না তা নয়— কিন্তু কিছুতে কিছু হল না, মার খেলুম। বিধাতা দেখালেন মঙ্গল কোন্ পথে— যাদের ঘর নেই, দুয়ার নেই, সেই যাযাবর জাতিদের মধ্যে কী আশ্চর্য ঐক্য— এত বড়ো প্রবীণ প্রাচীন ভারতবর্ষ তার সামনে দাঁড়াতে পারলে না। কোথায় ছিল তখন ভারতবর্ষ! কেউ অতীত নিয়ে গৌরব করতে ব্যস্ত, কেউ শাস্ত্র-আচার নিয়ে, কেউ বা আফিম খেয়ে ঝিমচ্ছে।

কে বলতে পেরেছে আমার ভারতবর্ষ, কে তার জন্য সর্বস্ব দিয়েছি, সকলকে আপন, বিচ্ছিন্নকে মিলিত করবার জন্য চেষ্টা করেছি? যদি না তা পেরে থাকি তবে হঠাৎ আজ কেমন করে বলতে পারব, ভারতবর্ষ আমাদের?

অন্তরে এই ঐক্যবন্ধন না থাকলে শুধু কান্নাকাটি হাতজোড় দেখে দয়া করে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কেউ বাইরে থেকে দিতে পারে না। চেমস্‌ফোর্ড-মন্টেগুর রাষ্ট্রবিধান তো আমাদের মুক্তি দিতে পারে না; কেবল বারিবর্ষণ হলেই হয় না, তাকে গ্রহণ করবার জন্য জলাশয় প্রস্তুত থাকা চাই, তার জন্য অঞ্জলি পাততে পারা চাই।

দৈন্য আমাদের অন্তরে বাহিরে। সবচেয়ে আমাদের বড়ো অপমান, আমরা কোনো শক্তির চিহ্ন দেখাতে পারি নি, বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত শুধু মন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছি, জীবন আমাদের ছাঁচে ঢালা।

সেই অপমান থেকে এই আশ্রমে আমরা দেশের চিত্তকে মুক্তি দেব, এই ছিল আমাদের আদর্শ; আপনাকে জানব, কোনো শক্তি যাকে বদ্ধ করতে পারে না সেই মুক্তির সাধনা করব, মানুষের আত্মা এখানে স্বাধীন হবে। সে আদর্শ সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারি নি, নিজের মন মুক্ত ছিল না, অপরিসীম আমাদের ভীরুতা। কিন্তু বন্ধনকে তো ছেদন করতেই হবে, বিদ্যার উদার মুক্তরূপ প্রতিষ্ঠা করা চাই। শুধু নিজের শক্তিতে তা সম্ভব হবে না, দেশের আনুকূল্য ও শ্রদ্ধা চাই। লন্ডন-প্যারিসের আমদানি আদর্শের দাসত্ব থেকেও মুক্তি পেতে হবে।

আমাদের দেশে এক সময় যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, নালন্দা-তক্ষশিলার বিদ্যায়তন, তারা তো লন্ডন-প্যারিসের ছাঁচে তৈরি হয় নি। দেশবিদেশ থেকে সেখানে মানুষ এসেছে— বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যেই সর্বমানবের বিশ্বমানবের শক্তিকে ডাক দিয়েছে, অমনি আশ্চর্য ফললাভ করেছে, দেশবিদেশের বড়ো-বড়ো জায়গা থেকে লোক এসে এইসব বিদ্যায়তনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। মানুষকে তফাত করলে চলবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে কেউ এসেছে তাদের সকলকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের চারি দিকে অতিথিরা এসেছেন, বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উপকরণ আমাদের চারি দিকে; আমাদের পূর্বতন ভ্রাতা পারসিক, তাঁদের জেন্দ্‌ সেও আমাদের, দূর থেকে মুসলমান যে শাস্ত্র ও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন সেও আমাদের, সমুদ্র পার হয়ে আজ যাঁরা এসেছেন তাঁদেরও যা দেবার আছে তা আমাদের নিতে হবে। আমাদের নিজের দেশের যা-কিছু সাধনা তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় সাধন করতে হবে, তার পরে বাইরে হাত বাড়াব, মনের ভীরুতা থাকবে না।

যখন আমাদের দেশের মহৎদের পায়ের কাছে বিদেশ থেকে শিষ্যরা আসবে, সেদিন পৃথিবীর কাছে আমাদের দাবি প্রমাণ হবে। নইলে শুধু ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা আমাদের মুক্তির কোনো আশা নেই।

বিদ্যার দিক থেকে জ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষের কি কিছু দেবার নেই? মেনে নিলুম, আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছি, বাইরে করি নি— দেশবিদেশে বাণিজ্য না-হয় করিই নি। কিন্তু পূর্বপুরুষদের চিত্তশক্তি আমাদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। লড়াই করতে পারি না, বাণিজ্য করতে পারি না— সে লজ্জার বিষয় হবে না, যেদিন গৌরবের সঙ্গে আমাদের সেই চিত্তসম্পদ সকলকে দিতে পারব।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩২৫

৬

আমাদের এই বিদ্যালয়ে সম্প্রতি একটা নূতন অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছে, পত্রবিকাশের মধ্য থেকে ফলের দণ্ডের মতো। এতদিন আমাদের বিদ্যালয়, দেশের বিদ্যাশিক্ষার প্রচলিত প্রথা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করাকেই একরকম অনুসরণ ক'রে ভয়ে ভয়ে চলছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবার বিদ্যালয়ের বাংলায় ভারতবর্ষে সীমা-সংখ্যা নেই; তৎসত্ত্বেও একটা এন্ট্রান্স স্কুল এখানে যে স্থাপন করা হয়েছিল, সে একটা অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শকে গড়ে তোলবার জন্য। যন্ত্রের মধ্যে সজীব চিত্তকে পেষণ করবার যে আয়োজন আমাদের দেশের সাধারণ ইস্কুলে তাকে লাঘব করবার ইচ্ছা হয়েছিল— কিন্তু সে পদ্ধতিকে একেবারে ভাঙতে পারি নি, ভয়ে ভয়ে চলেছিলুম।

আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলিত আয়োজন কঠিন ও কঠোর— ওষুধ যত তিক্ত হবে ততই উপকার হবে বলে সকলের বিশ্বাস— শিক্ষা যত কৃচ্ছ্রসাধ্য হবে ততই বুঝি অধিক ফল দান করবে। কিন্তু আনন্দের ভিতর দিয়ে, মুক্তির হাওয়ার মধ্যে শিশুচিত্ত যেমন বিকশিত হয়, তেমন আর কিছুতে হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে ফল পাওয়ার আশা অল্প। কাজেই যখন দেখলুম শিশুচিত্ত বিদ্যার নামে বন্দী হয়ে আছে তখন মন ব্যাকুল হল; যাতে করে শিশুর দুঃখ দূর হয়, অধ্যাপকের স্নেহে কল্যাণে অভিষিক্ত হয়ে মুক্ত সমীরণে শিক্ষালাভ করতে পারে, এখানে তার ব্যবস্থা হল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিধির সঙ্গে আপসরক্ষা করে এর ভিতর একটা দ্বন্দ্ব রয়ে গেল। তবু এই যে বালকদের আনন্দ-কলধ্বনি প্রত্যহ আকাশকে মুখরিত করে, তাদের গানে শালবন আম্রকুঞ্জ ধ্বনিত হয়, এও সামান্য তৃপ্তির কথা নয়।

তবু এমন করে জ্ঞানের অন্নদানের মধ্যে যে কৃপণতা আছে সে নিয়তই অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে। সাংসারিক লাভের প্রতি দৃষ্টি না রেখে জ্ঞানের চর্চা করব, মানুষের মনুষ্যত্ব এইখানেই। তার জ্ঞানের ক্ষুধা প্রয়োজনের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়। অন্য-সকল দেশে যেমন অর্থকরী বিদ্যা আছে, তেমনি জ্ঞানকে বস্তুনিরপেক্ষ করবার ইচ্ছাও আছে; কেবল ভারতবর্ষেই কি তা লোপ পাবে? আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষা রাহুগ্রস্ত, বিদ্যাকে আমরা প্রয়োজনের সামগ্রী মনে করছি— যে সরষে ভূত ছাড়াবে তাকেই ভূতে পেয়েছে।

ভারতবর্ষে এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের আদর্শরক্ষার আয়োজন কোথাও থাকা উচিত। আজ আমাদের দেশে এত অর্থের প্রয়োজন হয়েছে যে এরকম অনুষ্ঠানে হাত দেওয়া শক্ত। কিন্তু সে অভাবকেও আমরা স্বীকার করব না, এও আমাদের সাধনা। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে পেয়েছি, তিনি এই বিশ্বভারতীর যে সংকল্প তা জীবনে গ্রহণ করেছেন। আনন্দের সঙ্গে শাস্ত্রী-মহাশয় এই আসন গ্রহণ করাতে আমাদের আশা হয়েছে, কেননা তাঁর সাধনা সত্য। এই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে কাজ ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে; বাইরে দেখাবার কিছু নেই— 'বিশ্বভারতী' যত বড়ো নাম, বাইরের উপকরণ থেকে তাকে প্রমাণ করতে গেলে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু আমার এতে লজ্জা নেই। অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি, এর মধ্যে সুর লেগেছে। এখন যাঁরা ছাত্র আছেন তাঁরাই যদি ছাত্র থাকেন, আর ছাত্র যদি নাও আসে, তাতেও ক্ষতি নেই— মানুষের মাথা গুনে তো সত্যের মহিমা প্রমাণ হয় না। এই ছাত্রদের মধ্যে চিত্তের আলো বিকীর্ণ হবে, কলাবিদ্যা প্রভৃতি ফল ফুল ফলিয়ে তুলবে. সকলকে সৌগন্ধ্যে রসে অধিকার করবে। মহাত্মা মহাস্থবির এখানে এসেছেন, জ্ঞান-পিপাসু লোকদের চিত্ত তিনি নিশ্চয়ই অধিকার করবেন। এইরকম কত অযাচিত দান আমরা পাচ্ছি হয়তো তা ভালো করে অনুভব করতে পারছি না।

সামনে খুব আশার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হবে এই আশার খবর, দেশবিদেশে এ ঘোষিত হবে না। প্রতিপত্তি ইন্দ্রের প্রলোভনের মতো, অর্থও তাই হতে পারে। থাকুক আমাদের দারিদ্র্য, তবু খুব আশা করবার আনন্দ করবার দিন এসেছে।

আমাদের পূর্বতন ছাত্ররা আশ্রমের এ দিকটি দেখে যান নি। পড়াশুনার দিক দিয়ে আশ্রমের

যে চিত্র তাঁরা মনে মনে রেখেছেন তার সঙ্গে মূলত একটা তফাত হয়ে গেছে, বিদ্যাকে যে শৃঙ্খল এখানে আমরা পরিয়েছিলুম তার দৌরাত্ম্য থেকে তাকে মুক্ত করেছি। বড়ো সাধনা বড়ো তপস্যার স্থান এখানে প্রস্তুত হল। মুক্তির আদর্শ আজ আমাদের সম্মুখে; 'অয়মহং' বলে যে অতিথি দ্বারে এসেছেন, শকুন্তলার মতো আমরা অন্যমনস্ক বলে যেন তিনি ফিরে না যান; অধ্যাপকেরা অন্তরের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে এর পাদ্য অর্ঘ্য জোগাতে থাকুন— কর্ম যেন আমাদের চিত্তে ক্লান্তি না আনে, শ্রদ্ধা যেন জাগ্রত থাকে; সমস্ত ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড একটা অভাব মোচন করব, জ্ঞানকে শৃঙ্খল-মুক্ত করব, এই সাধনাকে বড়ো করে অনুভব করা চাই; শক্তি নেই এ দীনতাকে মনে প্রশ্রয় দেবেন না।

ভারতবর্ষের যা অন্তরতর বস্তু তার তপস্যা ধ্যান আলোচনা কত যুগ ধরে হয়েছে, কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহের এই জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কোনোই পরিচয় নেই। দুঃখ-দারিদ্র্য অনেক আমাদের স্বীকার করতে হয়েছে, কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রে কেন দীনতা থাকবে? এ তো আমাদের হাতেই আছে। ভারতের বিদ্যার ভাণ্ডারকে চাবিবন্ধ করে রাখব না। আমাদের দেশের যাঁরা জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু দিয়েছেন, সকল দেশের সকল বিদ্যার সঙ্গে তার তুলনা হওয়া চাই— বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে তুলনা করে তবে তার মূল্য অনুভব করতে পারব। জানবার একটা উপায় অপরের সঙ্গে তুলনা করা, যাচাই করা; নইলে কোনোদিন নিজেকে যথার্থ জানব না— টোলে পুঁথিপড়া লোকেরা বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি বলেই তাঁরা ভারতবর্ষকেও সম্পূর্ণ করে জানেন না। আমাদের দেশের জ্ঞানকে সত্য করে ভালো করে জানবার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যার ক্ষেত্রে উপস্থিত করতে হবে; বিশ্বের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে দাঁড়াবার আমাদের এই-যে অনুষ্ঠান, এ সত্যে বড়ো হয়ে উঠবে, ব্যাপ্তিতে নয়, এই কথাই আজ আমি বলতে চাই।

সব নদী যেমন করে সমুদ্রে যায় তেমনি করে এসো— সমস্ত ভারতবর্ষে এই আহ্বান এসেছে। ভারতবর্ষের জ্ঞান আজ আপনার রূপকে প্রকাশ করতে চাচ্ছে। এসো সব কর্মী সাধক গুরু, সকলে মিলিত হয়ে এটিকে সার্থক করো। সাড়া পাই বা না পাই, যত দিন জীবন আছে এই সাধনা থেকে নিজেদের ভ্রষ্ট হতে দেব না, শান্তিনিকেতন আমাদের কাছে এই আশা করছে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩২৬

৭

প্রতি বৎসর ৮ই পৌষে আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে যে সভা হয়, এতে প্রায় আমাদের বাইরের কাউকে-না-কাউকে সভাপতি করা হয়। তার কারণ এই যে, আমরা যারা এর ভিতর থেকে কাজ করি তারা হয়তো এর সম্পূর্ণ রূপটি সব সময়ে দেখতে পাই না; বাইরের যাঁরা এই বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা এসে মনের ভাব প্রকাশ করলে আমাদের কাজের সহায়তা হয়, উৎসাহ বাড়ে। আজও আশা করেছিলুম বাইরের কাউকে সভাপতি করে তাঁরই মুখ থেকে কিছু শুনব। কিন্তু এর অনুষ্ঠাতা যাঁরা তাঁরা বিশেষভাবে আমাকেই আজ সভাপতি করতে চেয়েছেন। আমার মনে হল এর একটু কারণ আছেও বা। সম্প্রতি আমি বিশ্বভারতীর কাজ নিয়ে দীর্ঘকাল আশ্রম থেকে দূরে দক্ষিণ-ভারতে ও সিংহলে ভ্রমণে রত ছিলুম— তাই নানা দেশের নানা লোকের চোখ দিয়ে এই আশ্রমকে দেখবার অবকাশ আমার হয়েছে। আমরা আমাদের কর্মের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে যখন বদ্ধ হয়ে থাকি তখন উপস্থিত প্রয়োজনের নানা ছোটোখাটো খুঁটিনাটি অত্যন্ত বড়ো আয়তন নিয়ে দেখা দেয়, দৃষ্টিকে একেবারে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তাই মাঝে মাঝে দূরে গিয়ে এই-সমস্ত অবরোধের ঊর্ধ্বে উঠে আশ্রমের বৃহৎ পরিচয়টি গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। আমি সেই দিক থেকে, প্রাত্যহিক কর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরের থেকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা করি।

বীজ আপন অন্তর্নিহিত সংকল্পকে আবৃত করে কেবল ক্ষুদ্র নিজেকেই প্রকাশ করে। যে মুহূর্তে তার অংকুর উদ্গত হয়, পূর্বের সঙ্গে তার পরের পরিচয়ের পার্থক্য তখন এতই অত্যন্ত হয়ে উঠে যে, মনে হয় বীজের সঙ্গে বুঝি-বা তার কোনো সাধর্ম্য নেই। কিন্তু বস্তুত বীজ যখন আপন ক্ষুদ্র রূপটিকে পরিহার করে তখনই তার সত্য পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে বীজ যে সাধনা বহন করছিল অংকুর উদ্গত হবা মাত্র তারই বৃহৎ রূপটি প্রকাশিত হয়।

এতদিন বৎসরে বৎসরে আমাদের বালকদের নিয়ে এখানকার ব্যবস্থা শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, তাদের কল্যাণ-সাধনের পথে যে-সব বাধা আছে তা দূর করবার চেষ্টা করেছি, তার সফলতা-নিষ্ফলতার সম্বন্ধে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু এই-সমস্তকে ছাড়িয়ে উঠে আশ্রম আজ যে মূর্তি ধারণ করেছে পূর্বে তা আমরা স্পষ্ট করে দেখি নি।

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের বিশেষ করে বলা দরকার; একদা তাদের আশ্রমে এখানে যা ছিল তার পরিণাম কোথায় দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে তা বলতে চাই। তাদের কাছে এর নূতন রূপ এত অভিনব ঠেকতে পারে যে তারা ভাবতেও পারে, পূর্বের সঙ্গে পরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

আজ আমরা মনে করছি, আমরা নিজের ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলুম। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এক সময়ে আমরা এই বলে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি যে, এখানে শিক্ষার ব্যবস্থাকে বড়ো করব, ভারতীয় সকল শাস্ত্র-আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার এখানে সমাবেশ হবে; তা হলেই এখানে শিক্ষার যে আয়োজন করেছি তা পূর্ণাঙ্গ হবে। কিন্তু বিশ্বকর্মা যিনি, যিনি আমাদের অগোচরে কাজ করেন এবং আমাদের চিত্তকে উপাদান করে বড়ো বড়ো জিনিস গড়ে তোলেন, তিনি পিছনে থেকে একে চালনা করছিলেন এবং মনের মতো করে গড়ে তুলছিলেন। দেখলুম আমাদের হাতে-গড়া পরিধির মধ্যে এ কুলোল না। সমস্ত বিশ্বের অতিথি আজ এর দ্বারে এসে চিত্তের অন্ন দাবি করছেন, এই অতিথিসেবার মহৎ দাবির সঙ্গে আমাদের কর্মের আয়োজনকে মিলিয়ে চলতে হবে। এ কথা বলতে পারব না যে আমরা পাঁচজনে মিলে যা গড়ছি তাই চূড়ান্ত; আমার মন অন্তত এমন কথা বলে না। বিশ্বভারতীকে আশ্রয় করে একটি বাণী এসেছে, তাকে কার্যে পরিণত করতে হবে, জীবনে ব্যবহার করতে হবে, সে বাণীকে আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে আমাদের চিত্তকে অনুকূল করতে হবে; যাঁদের সঙ্গে যোগে আমাকে কাজ করতে হবে, তাঁদের অত্যন্ত উৎসুক হয়ে ডেকে বলছি—সমস্ত যুগের বাণী আজ দ্বারে এসেছে, সমস্ত চিত্তকে অনুকূল করে তাকে গ্রহণ করুন—এই আমার একান্ত ইচ্ছা।

অব্যক্ত বাণী মানুষের ইতিহাসে ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়, সে কোনো বিশেষ যুগের নয়, সে সর্ব যুগের। বৃন্তের এক প্রান্তে যে ফুলটি ফোটে সে ফুল সেই বৃন্তটুকুর নয়, সমস্ত গাছেরই সে। মানুষের ইতিহাসে একমাত্র যে কথাটি চিরদিনই আছে আজকের যুগে সেই চিরযুগের চিন্তাটি সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে হচ্ছে এই যে, মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যেই সার্থক। এই সত্য ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, আপন আত্মার মধ্যে সকল আত্মাকে এবং সকল আত্মার মধ্যেই নিজের আত্মাকে যিনি দেখেছেন, ন ততো বিজুগুপ্সতে, তিনি আর প্রচ্ছন্ন থাকেন না, তাঁর সত্য প্রকাশিত হয়।

মানুষের ভিতরকার এই-যে পরমসত্য মানুষের ইতিহাসে ব্যক্ত হবার চেষ্টা করছে সব সময়েই যে তার প্রতি আনকূল্য দেখতে পাই তা নয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে ভগবানের শত্রুতা করেও তাঁকে পাওয়া যায়—শত্রুতার দ্বারা পরাভূত হয়ে সত্যকে পাই। মৈত্রীসাধনা এবং বৈরসাধনায় মিলে সত্যের সাধনা হচ্ছে, ইতিহাসে এই তো দেখতে পাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির ভেদ-বিভেদ নিয়ে যারা মাতামাতি করছে তারা সত্যের বিরোধী হয়েছে। তারা মনে করেছে

ভেদবুদ্ধিকে জয়ী করেই বুঝি মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমরাও আজকের দিনে ঈর্ষ্যাভরে ভেবেছি এই ভেদবুদ্ধির সাধনা করেই আমরা ধনী হব, মানী হব, প্রবল হব। ভুলে গিয়েছি আমাদের শাস্ত্রেই বলেছে, অধর্মের দ্বারা তখনকার মতো মানুষের সমৃদ্ধি হয়, শত্রুজয়ও হয়, কিন্তু মূলেতে তাকে বিনাশ এসে আক্রমণ করে।

সেই মূলের বিনাশমূর্তি মানুষ আজ উপলব্ধি করছে। জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে যারা পূজার সামগ্রী করেছিল, মানুষ দেখেছে অপঘাতে তাদের অভিভব হল। নিজে বড়ো হব, নিজের জাতকে বড়ো করব, এ অহমিকার দ্বারা মানুষের ভালো হয় না। উপস্থিতমত এতে কাজ হলেও সমস্ত বিশ্বশক্তি তাকে বাধা দেয়। ‘বড়ো বাড়’ যার হয় তাকে পড়তেই হয় এ কথা মুখে মুখে চলছে। বৃদ্ধিটাই তাকে পতনের দিকে আপন প্রকাণ্ড ভার নিয়ে টানতে থাকে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩২৯

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

প্রকাশ : ১৯৪১

প্রথম প্রকাশকালে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'-এ যে দুটি প্রবন্ধ ছিল, তার প্রথম প্রবন্ধ 'আশ্রমের শিক্ষা' নামে 'শিক্ষার ধারা' (১৩৪৩) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরে 'শিক্ষা' গ্রন্থের ১৩৫১-সংস্করণভুক্ত হয়। বর্তমান রচনাবলীতেও প্রবন্ধটি 'শিক্ষা'র 'সংযোজন' অংশে মুদ্রিত।

বর্তমান সংস্করণে 'সংযোজন' রূপে মুদ্রিত প্রবন্ধটি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'-এর ১৩৫৮-সংস্করণভুক্ত হয়।

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' : পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবী-লতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পূর্ব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকী-বনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারই সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর-একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারই মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ববোধিনী এবং আরও-কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর-একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়িঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারি দিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার, ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকাবাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অনুচর-পরিচর নিয়ে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা-কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভুলেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠ ভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নিত্যপ্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমারই ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে, ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্মভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর-একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি.এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর-কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের

রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইনপরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে-সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নীচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্রে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই-সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাবমোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায়

কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যহ অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধু অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়স অল্প ও যোগ্যতার সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিদ্র্যে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল না তবুও তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাব-সংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার অনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলুম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। স ষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।

আষাঢ় ১৩৪৮

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনের আরম্ভকালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের কোনো শিষ্য কয়েকজন আত্মীয়সহ এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি সেই কথা স্মরণ করিয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন।

উপাধ্যায় মশায়ের কাছে আমি যে আনুকূল্য পেয়েছি সে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি। ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারের যে রীতি প্রবর্তনে তিনি আমার সাহায্য করেছেন সে আজও চলে আসছে।

কিন্তু আরম্ভকালের পূর্ববর্তী সূচনার কথা যাঁরা জানেন না তাঁদের কাছে বিষয়টা আরো স্পষ্ট করার প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি, শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা সহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলুম। কিন্তু বাড়িতে তবু বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল সন্ধ্যার ছায়া এ পার ও পার করত — হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জল-ভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারবাঁধা নারকেল গাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার সঙ্গীত সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এইরকম আদিমকালের যোগ, প্রাণমনের

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' : পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার-ওপার করত—হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলেভরা নীলবর্ণ পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ু-বৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে-সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহচালনা ও চারি দিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে-সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না; মানুষের পক্ষেও সেইরকম। দেহটাকে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন তার অভাব দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, যে সমাজে আমরা মানুষ সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ

এখানে পৌঁছতে পারত না, এমন-কি, তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে-সকল আরামে ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দূরে। বড়ো শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে অভ্যাসগুলি অপরিহার্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যেরকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে— কোনোদিন-বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্নে। তা নিয়ে ঘরে উদ্‌বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্‌বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয় নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নীচে তখন আমি তাকে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু এক দিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্য দিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করি নি।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাসসম্বন্ধীয় যে-সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো অদ্ভুত অপব্যয়ে আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার কুইক্‌সটিত্বের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরও ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভৃত্যদের ভাষা বুঝতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভৃত্যদেরই অসৌজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদত্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত সুলেমান। এর মনস্তত্ত্বরহস্য কী জানি নে। এতে বার বার অসুবিধা ঘটত। কারণ চাষিঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভুলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরও কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলাদেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইঁট পাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতির দুর্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না—তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না; সমস্তই গেল ভেসে; সুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহী থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা—সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ—কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়িচলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্তি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠে নি।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব,

শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। এক দিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি—এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি—সেই মানুষই বিচিত্র ফলশস্যশালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্ত-গঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায় আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হত অন্যপ্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ-সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবন-যাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন করে অতিথিরা যাতে দুই-তিনদিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। এজন্য উপাসনা-মন্দির লাইব্রেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিৎ সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার সুযোগে এবং বায়ুপরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইঁটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন

ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্ব-দেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোকচলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফরাসিপ্রুশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসি সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল; সে ফরাসি রান্না রেঁধে খাওয়াত আমার দাদাদের আর তাঁদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার বোলপুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়ো-গোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আংটির মতো বাঁধিয়ে কলকাতার কোন্ ধনীর কাছে বেচেছিল আশি টাকায়। আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝরনা ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোটো জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখাপ্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজানমুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশুভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর, কোথাও-বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূরমাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল; এখানে না আছে কোনো জীবজন্তুর বাসা; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর, আর নীচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানারকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্তার ছেলেমানুষি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না।

বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা-মেরামতের মসলা এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র করে দিয়েছে, চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর-একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী, এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতিপ্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলায় হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্রশাসনের কালে। এই সর্দার সেই ডাকাতি-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলকলাঞ্ছিত ভদ্র বংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

একদা এই দুটি মাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পেঁচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দানগ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। যখন রেললাইন স্থাপিত হল তখন বোলপুর স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা-ভঙ্গ করতেন। আমি যে বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে বারেও ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা-গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।

তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন

তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার কালের জোয়ার-জলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না—যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব করে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবল-ভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমত কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্ছে নানা লোকের সঙ্গে, এমনি অগোচরভাবে ভিৎপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে. বি.এ. ক্লাসে। তার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যমূর্তি, দেখে মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। সতীশকে আমি শক্তিশালী বলে জেনেছিলেম বলেই তার রচনায় যেখানে শৈথিল্য দেখেছি স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধরে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারলে। অল্প দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিস্মিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যেরকম করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি দুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসক্তি ছিল না। সেগুলিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্মমভাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অব্‌জেক্‌টিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শ-চেতনা। যে জগতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে

সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উতঙ্কের যে উপাখ্যানটি সে লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সংবরণ করতে পারলে না। সে বললে, আমাকে আপনার কাজে নিন। খুব খুশি হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভালো নয় জানতেম। বি.এ. পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই। তখনকার মতো আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই-সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে সে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত যে, শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।

তখন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ—তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ—বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতো, আহার-ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখি নে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এইসঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।[১] তার পরে সেই কবি-বালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

বি.এ. পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড়ো রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে-সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি

[১] কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে—অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয়স্বত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনে-শুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না—এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবিথীকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে—রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত—সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্না-মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্রশ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিমপ্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভ-কালের প্রথম সংকল্পন, তার দুঃখ তার আনন্দ তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা—আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত—অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল—প্রণাম করে যাই তাকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এত-কালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।

আশ্বিন ১৩৪০

পরিশিষ্ট

১ বিশ্বভারতীর সূচনাপর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৫১ সালে (৭ পৌষ ১৩৫৮) 'বিশ্বভারতী' নামে সেগুলি বিশ্বভারতীর উদ্যোগে সংকলিত হয়। বর্তমান সংস্করণে সেই নামেই প্রবন্ধগুলি একত্রে মুদ্রিত হল।

১৯১৮ সালে 'আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে' (২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮। ৮ পৌষ ১৩২৫) বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়। পরের বৎসর জুলাই মাসে (৩ জুলাই ১৯১৯। ১৮ আষাঢ় ১৩২৬) নিয়মানুযায়ী বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয়। ১৯২১ সালে ২৩ ডিসেম্বর বিশ্ব-ভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করা হয়।

২ পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৫১ সালে 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ প্রদত্ত 'প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ' এবং পত্রাকারে লিপিবদ্ধ 'প্রথম কার্যপ্রণালী' প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে সে দুটি রচনাও অন্তর্ভুক্ত।

॥ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ॥

মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই-সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা-দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণী-তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড়

বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

বৈশাখ ১৩২৬

২

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে শাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিস্থ হতে আমাদের বাধা দেয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষবুদ্ধিকে তৃপ্তিদান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জনাকুণ্ডের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোটো হয়ে যায়, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্য-সকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই, আমাদের লক্ষ্য, সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর করে দেয়।

তাই বলে এ কথা বলি নে যে, বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে; বলি নে যে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরি-সঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশ রকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে— সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তা হলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সব চেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন-কি, বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিঁকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যে-সব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেই দিকে পৌঁছে না দেয় তা হলে কী জানি কী হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য, অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডি-টুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগলাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনে পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন-কি, তখনকার কোনো কোনো পুরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষার কপালে-পিঠে এখনো অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে, অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে— আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়,

আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি তা হলেও সেটাও কেমনতরো বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য-সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য-সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যোগ্য ক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অংকুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী-মহাশয়। ওদিকে অ্যান্ড্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।

শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তা হলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে,

এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

শান্তিনিকেতন
১৮ আষাঢ় ১৩২৬

৩

আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষী-বৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন, আজ এখানে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমসুহৃদ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধি রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যে-সকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতিক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের পরমসুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃতশিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রূপে যে-সকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেন্টের দ্বারা যে-সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয়গুলির মিল আছে; এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন, তার

আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায় তো বুঝতে হবে তারা সাড়া দিচ্ছে না, মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম, যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনিভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড়ো গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩২৮

৪

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা

হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশু-প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনো কখনো বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে—এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণ-নিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না. মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনো রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলেকয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।'—তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনো তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিন্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম 'তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি—আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে—জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ,

অল্পে সুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে, সব চেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে আর-কিছু না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোটো ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্‌বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম-মহাদেশ-যাত্রার যথার্থ পাথেয়স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন অংকুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার এক-প্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে

আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিঁকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটে-ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

শান্তিনিকেতন
২০ ফাল্গুন ১৩২৮

৫

আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার রূপটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইডিয়ালকে বাইরে

আকার দান করতে গেলে দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আইডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা অনেকের কাছে হতাশার ও লজ্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারও একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয় কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যটিকে যথার্থ ব্যক্ত করতে পারে না। এইজন্যই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে, তা বাইরে থেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এমন-কি, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিংবা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অন্যদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা আছে যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে, প্রতি শিশুটি পর্যন্ত তাদের অবকাশমুখরিত সংগীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যেটুকু কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে; আশা আছে যে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে যে-সব ছাত্রের উৎসাহ ও কৌতূহল আছে তারা কেন এই বৃক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্বভারতীতে আমরা যে চিন্তা করছি, যে সত্য সন্ধান করছি, সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যা-কিছু দিচ্ছেন, ছোটো জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অল্প পরিধিতে বদ্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। যদিচ শান্তিনিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল তবুও সেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে যে সৃষ্টি হচ্ছে, যে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে, যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার চর্চা হচ্ছে না, সেজন্য সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম, কিন্তু অতি সসংকোচে; কারণ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। ভয় হয়েছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভুল বুঝে এসেছে হয়তো তারা

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' : পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র

বিদ্রূপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মতো এত সহজ জিনিস আর নেই। যে খুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে ধুলো দিতে পারে, তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমার কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্য-সব কাজ ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্ ডাকে কোন্ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহকর্মীরাও অনেকে তা পুরোপুরি জানে না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এই-সকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ-পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয়সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে যে, আমাদের এ-সব ভালো লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এ-সব অধ্যাপকদের আনানো; ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিংবা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন—এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সংবর্ধনা করা হল। এই পণ্ডিত বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না—ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এঁর সঙ্গে যে পরিচয়সাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। কেন। আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব কেন দেখা দিলে। পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যে-সকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সে-সব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে পর্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশযানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে সাধনার পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিস; সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে—নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি

মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য যতই হোক, বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বোলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এ-সব কথা কেন।' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশবিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে—বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণগৌরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।

১ ভাদ্র? ১৩২৯
কলিকাতা

৬

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার মনে এর ভাবটি সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে, আমি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে করে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানবসমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। 'জীবনস্মৃতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল। কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছপালা আর একটি পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনো-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর, কখনো-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান, আর উৎসব-কোলাহলের নানারকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলাবৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি

আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায়-আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য রয়েছে।' তখনো এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইঁটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্পলোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পানসি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দু ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এই-সকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব। এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতি-পরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধুর্য তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যেরকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকাস্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর সর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস; নির্জন চরে কলধ্বনিমুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যাতারায়-জ্বলজ্বল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এ-সব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয়বন্ধুদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যে-সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনোরকমে

আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এ-সবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই-সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষালাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়োদাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই, তেমনি তিনি খাতায় যতটি লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেই-সব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই-সকল অবারিত সাহিত্যরচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা জানেন, আমি খুব অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি, আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড়ো সুবিধা ছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসে নি, ছোটো হাটেই পশরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার বাল্যরচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয়বন্ধুদের যা একটু-আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তার পরে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্য-ক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনো সুস্থ বোধ করি নি। আমি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছি। আমার কাব্য-সৃষ্টির যা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে, আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে— সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না— সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানব-জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেনু দোহন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা

ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনো উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে, যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে জোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য-করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ-সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এই-সব বানানো গল্পের অনেক-গুলি আমার 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানববিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং— তাই জ্ঞান-তপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং— দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই

অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশদেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে, যা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃউৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব না; কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্মল হব।

'স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যখন বিশ্ব-ভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে আমি কি বিশ্ব-সংসারে জন্মাই নি। আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে, য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের অন্তরপ্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতিবিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসংকোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি. কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে, সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনো ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্ত করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাস করেই সব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না। এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলাম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্তত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ফরাসি পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি। তাঁর সঙ্গে

যদি আপনাদের নিকটসম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম। তাঁকে বললুম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র-সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না; অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি যেমন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অনুভব করেছেন; তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জর্মনি সুইজারল্যান্ড অস্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠাসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা আমাকে কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে।' আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনো প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি যে, বাঙালির মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে বাঙালি পাশ্চাত্যবিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র, যাদের কষ্টের সীমা নেই, তারাও বিদ্যা-শিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশেই করে। বাঙালি যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্রসমাজেই উঠতে পারল না। তাই তো বাঙালির বিধবা মা ধান ভেনে সুতো কেটে প্রাণপাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে, বাঙালি বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞা করবে না; তাই আমি পাশ্চাত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে, 'তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার, তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না।'

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্যহোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই গৌরব আমাদের। মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে কোনো মোহবশত আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই। আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

কলিকাতা
৪ ভাদ্র ১৩২৯

৭

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন—'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পাত্রকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এ কথা বলবারও জোর থাকত না। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্যে উপনিষদের ঋষি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।'

মানুষ যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মানুষ নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অন্তরাত্মা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ যে পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্ত-মাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মানুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মানুষের মধ্যে বাহ্যশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রস্ত এ কথা মানুষ প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে পদার্থটা তার কাছে নিরর্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলন-তত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপনি বলছে—'অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'—সে আর গোপন থাকে না অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্গময়'—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও; 'আবিরাবীর্ম এধি'—হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান ক'রে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই

মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষ্যা, যত ঝগড়া যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আজ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার দিন। যে তপস্যা এখানে স্থান পেয়েছে তার সৃষ্টিশক্তিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইনকানুন চলছে, সে আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্তু এর নিজের ভিতরকার একটি তত্ত্ব আছে যা নিজেকে নিজে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত করছে, এবং সেই নিয়ত উদ্‌ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে তার সৃষ্টি। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের আত্মনিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সত্য যখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়েছি।

স্বজাতির নামে মানুষ আত্মত্যাগ করবে এমন একটি আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মানুষের কাছে এতদিন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই যে, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পৃথিবী জুড়ে একটা দস্যুবৃত্তি চলছিল। এমন-কি, যে-সব মানুষ স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, মানুষ নির্লজ্জ-ভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ যে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মানুষ ধর্মেরই অঙ্গ বলে মনে করেছে। স্বজাতির গণ্ডিসীমার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা; এর আশুফল খুব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই সৃষ্টিশক্তি; সেই ত্যাগ যতটুকু পরিধির পরিমাণেই সত্য হয় ততটুকু পরিমাণেই সে সার্থকতা বিস্তার করে। এইজন্যে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহদ্দৃষ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু সত্যকে সংকীর্ণ করে কখনোই মানুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। এক জায়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে; যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা মুষড়ে যেতে আরম্ভ করে। মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে আপন পূর্ণ-খাদ্য পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝখানেই দারিদ্র্যে এসে উত্তীর্ণ হয়। তাই যে য়ুরোপ নেশনসৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র সেই য়ুরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'— আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন

আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ-মুক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলন-তীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজেই আপনার স্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সম্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন ব'লে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্ন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অরুণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তরশেষে যেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদ-বাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় আরম্ভ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৩০

৮

অল্প কিছুকাল হ'ল কালীঘাটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখলাম। তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর করেছিল। তাই এই নদী পুণ্যনদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন। কেননা এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো ঢের আছে—তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে; কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারায় এই বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে

নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহায্য করে নি। সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হল না। যেখান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে কত বড়ো বড়ো নগর হয়েছে— সে-সব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এই-সব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে থাকেন; এই গঙ্গাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল, তেমনি আর-এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্রতা কোথায়? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড়ো ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে— আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে একা একা বন্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যখনই তার ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হল, তখনই তার গভীরতাও কমে গেল। গঙ্গা দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুশি হল না। যদিও এখনো লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাসমাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অন্ন পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝতে হবে তা আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না; সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে যাবার জন্যে, থাকবার জন্যে নয়। যেমন কলকাতার বড়োবাজার— সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না; সেখানে লাভ-লোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতায় জন্মেছি— সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ি আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেন্ট দেখে, বড়ো বড়ো বাড়িঘর দেখে তার কী হবে। ওখানে কার আহ্বান আছে। বণিকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেখানে কী হয়। সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেলবার জন্যে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কাল একটি পত্র পেলাম। আমাদের সুরুলের পল্লীবিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তিনি জাহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, জাহাজের লোকেরা তাসখেলা ও অন্যান্য এত

ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে তারা এর মধ্যে থাকে। যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে তার মধ্যে থাকে, কী করে তারা মনে তৃপ্তি পায়।

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্‌স্‌ট্‌ এই-যে বেদনা অনুভব করেছেন তার কারণ কী। কারণ এই যে, তিনি আশ্রমে যে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে বৃহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমস্ত গ্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্যে নয়। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে সকলের সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-যে আশেপাশের গরিব অজ্ঞ, এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে যে-সমস্ত বড়ো বড়ো ধনী ছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জজ, কেউ-বা ম্যাজিস্ট্রেট— তাঁদের তিনি মনে মনে অত্যন্ত অকৃতার্থ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা এখানে প্রভূত ক্ষমতা পেলেও, সমস্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুঁজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো তীর্থে এসে পৌঁছলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজতন্তায় এসে ঠেকলেন, কেউ-বা লোহার সিন্ধুকে এসে ঠেকলেন, তাঁরা পুণ্যতীর্থে এসে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব সুরুলে এসে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এখানে থেকেও যদি সেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অকৃতার্থ আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ জায়গা শুধু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে— আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৩০

৯

আমাদের অভাব বিস্তর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে। সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দূর করবার জন্যে, নালিশের বৃত্তান্ত বোঝাবার ও তার নিষ্পত্তি করবার জন্যে যাঁরা অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রাজ্ঞতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তাঁরা দেশের হিতকারী; তাঁদের 'পরে আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিদ্র্যের দ্বারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছন্ন করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। অন্ধকার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বদ্ধ করে, আলোক তাকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করে রাখে।

ভারতের যেখানে অভাব যেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই দৈন্যপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণা করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের অমাবস্যা সেখানে তার কার্পণ্য। কিন্তু একমাত্র সেই কার্পণ্যকে স্বীকার করেই

কি সে বিশ্বের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকবে। যেখানে তার পূর্ণিমা সেখানে তার দাক্ষিণ্য থাকা চাই তো। এই দাক্ষিণ্যেই তার পরিচয়, সেইখানেই নিখিল বিশ্ব তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ না রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু স্বদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান। বুদ্ধদেব যখন অকিঞ্চনতা গ্রহণ করেই সত্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তখন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সত্য আত্মমহিমাতেই গৌরবান্বিত। সূর্য আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ; স্যাকরার দোকানে সোনার গিল্টি না করালে তার মূল্য হবে না, ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

যে স্বদেশাভিমান আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অশুচিতা রয়ে গেছে। সেইজন্যেই আজকের দিনে ভারত-বাসীও এমন কথাও বলতে লজ্জা বোধ করে না যে রাষ্ট্রীয় গৌরব সর্বাগ্রে, তার পরে সত্যের গৌরব। কোনো কোনো পাশ্চাত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেখানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে। সেখানে বিপুল ধনের ভারাকর্ষণে মানুষের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমকে খোঁটা দিয়ে স্বজাতিদম্ভ প্রকাশ করবার বেলায় আমরা যে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্তুলুব্ধতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই যখন সত্যসম্পদকে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখবার প্রস্তাব করে থাকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের অশুভগ্রহ কুটিল হাস্য করে। যেমন কোনো কোনো শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আসে বাইরে এসে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমত।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্‌'—আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।

তোমরা সকলে শুনে যাও, পিতামহদের এই নিমন্ত্রণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব হয়ে থাকে তবে সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, কিছুতেই আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশ্বের প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশ্বাসকে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুক ও সর্বদেশবাসীর কাছে প্রচার করুক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।

পৌষ ১৩৩০

১০

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে

পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করাও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে। এই যোগবিচ্ছেদের দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয় তাতে করে মানুষের অকল্যাণ হয়েছে। পৃথিবীতে এই দুর্ভাগ্য অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমনি করে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছু ছিল না, কারণ আমি নিজে বরাবর ইস্কুলমাস্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মুগ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য, তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে, তা আমি নিজে জানি। আমি কতখানি একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবন যাপন করেছি। এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির যা-কিছু দান তা আমি যতই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি, আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে। তাই শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মুখর করে তুলছে— আমার মনে হয়েছে যে, এরা এমন-কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়; কিন্তু তাদের চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসিগান-আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাসের নম্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে আমার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হল।

তার পর একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল।

এখানকার এই মুক্ত বায়ুতে আমরা যে মুক্তি পেয়ে গেলুম আজ তা গর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দূর হল, তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা সব মানুষকে আপনার বলে স্বীকার করতে শিখেছি, এখানে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এটি যে পরম সৌভাগ্যের কথা তা আমাদের জানতে হবে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে একটি মস্ত পীড়া হচ্ছে, তার লোকালয়ে একান্তভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিত্তশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে, তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শত্রু। এটি খুব সাংঘাতিক কথা।

এর মধ্যে যে তার কতখানি চিত্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দম্ভে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বঞ্চিত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপসারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিত্তসম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মরু, এরা মানুষের আত্মাকে কারারুদ্ধ করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু এ কথা জানতে হবে যে, নীচেকার ভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ জায়গায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার গভীরতম নাড়ীর যোগ। এই তার ধাত্রীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত তবে এমন করে বাংলার শ্যামলতা দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো জায়গাতেও তো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু তাতে করে যথেষ্ট ফল লাভ হয় না। বড়োজায়গায় যে মাটি তাতেই যথার্থ ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে, বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায় সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি।

পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না—সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার জাতরক্ষা করবার সপক্ষে কি পাশ্চাত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভুলে গেছি যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন ন্যাশনালিজ্‌মের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কখনো হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না; 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনো বড়ো হতে পারল না, ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। তাই কার্থেজ ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেজ বিশ্বের সমস্ত ধনরত্ন দোহন করতে চেয়েছিল। সুতরাং সে এমন-কিছু সম্পদ রেখে যায় নি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের পাথেয় রচনা হয়। তাই ভেনিসও কোনো বাণী রেখে যেতে পারল না। সে কেবলই বেনের মতো নিয়েছে, জমিয়েছে, কিছুই দিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু মানুষ যখনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম

যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণপরিচয় লাভ করেছে।

এ কথা আজকার দিনে যদি আমরা না উপলব্ধি করি তবে কি তার দণ্ড নেই। মানুষের এই বড়ো সত্যের অপলাপ হলে যে বিষম ক্ষতি, তা কি আমাদের জানতে হবে না। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অন্যায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সত্য স্বীকার করব বলে এসেছি। অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন-না— বণিক বাণিজ্যবিস্তার করুন, ধনী ধন সঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলন-ক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে যে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তো তার কোনো চিহ্ন নেই; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠীগোত্রের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না। কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই; তা তো শুধু ভারতীয় নয়, তা যে চিরন্তন সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ হয়ে রইল। যখন সবাই বলবে যে, এটা আমার, আমি পেলুম, তখনই তা যথার্থ দেওয়া হল। এই-যে দেবার অধিকার লাভ করা এর জন্য উৎসাহ চাই, সাধনার উদ্যম চাই। আমাদের কৃপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপুল আনন্দে সমস্ত আঘাত অপমান সহ্য করে অকাতরে সব ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রূপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি। আত্মপ্রকাশের পথ অবারিত হোক, ত্যাগের দ্বারা আনন্দিত হও।

আজকার উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও— সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্মলোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক। আনন্দ-স্বরূপ, তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। রুদ্র, তোমার রুদ্রতার মধ্যে অনেক দুঃখদারিদ্র্য আছে— আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি। 'বেদাহম্' — জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'— অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির রূপ। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধকার নিজেদের ছোটো গণ্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি।

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৩৩০

১১

আজ আমার আর-একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘ-কালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্বে আর একবার এই আশ্রম সম্বন্ধে, এই কর্ম সম্বন্ধে আমাদের যা কথা আছে তা সুস্পষ্ট করে বলে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি—এই ছাত্রনিবাস কলাভবন গ্রন্থাগার অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। ভাবছি, কী করে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়। সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য যে, যে লোক একেবারে অযোগ্য—মনে করবেন না এ কোনোরকম কৃত্রিম বিনয়ের কথা—তাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের যেদিন এখানে আহ্বান করলুম সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড়ো ঋণভারে তখন আমি একান্তবিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই জানেন। আমি ভালো করে পড়ি নি, আমাদের দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব রকমের অযোগ্যতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিলুম। এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল ছিল, গুটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানি নে। স্বপ্নের ঘোরে যে মানুষ দুর্গম পথে ঘুরে বেরিয়েছে সে যেমন জেগে উঠে কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন আমারও সেই রকমের হৃৎকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কী, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা আপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়-ভাবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেসেছি। আমি খুব প্রবলভাবেই অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চার দিকে যন্ত্রের প্রাচীর তুলে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত-শরতের পুষ্পোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে দিয়েছি তারই আনন্দে দুঃসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেখেছিল। প্রকৃতি মাতা যে অমৃত পরিবেশন করেন সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর একটি কথা অনেকদিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। কখনো বেতন দিয়ে, কখনো ত্যাগের বিনিময়ে, কখনো-বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হওয়া চাই। এ আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন,

খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিখিয়েছি জানি নে, কিন্তু যে জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্যসকল অভাব ভুলে ছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরও দূরে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা কোনো-দিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কখনো ভাবি নি।

আমরা চেষ্টা করি নি, আমরা প্রত্যাশা করি নি। চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চাত্য দেশের যে-সব মনীষী এখানে এসেছিলেন—লেভি, উইন্টার্‌নিট্‌জ, লেস্‌নি, তাঁরা যে এমন-কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলা-দেশের কোণের মধ্যে বদ্ধ নয়, তা থেকে বুঝতে পারি এখানে কোনো একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে আনন্দ যে শ্রদ্ধা যে উৎসাহ অনুভব করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে স্ফূর্তি পাচ্ছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনো একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দূরাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে উঠেছেন, যাঁরা কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আজ ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েছে, মানুষে মানুষে এমন জগদ্‌ব্যাপী পরম শত্রুতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে-দেশান্তরে এই আগুন ছড়িয়ে গেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে ছিলুম, আমরা যে জাগলুম সে এরই আঘাতে। জাপান মার খেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিয়েছিল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দম্ভের ঘা খেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মানুষের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বের ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে—মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই-যে খর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই-যে পুজা, এই-যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও একে নিরস্ত করবার প্রয়াস কি থাকবে না। আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন তাই বলেই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি সাধনা সত্য হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হেঁট করে সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বুদ্ধ বললেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।' দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য—আমি যদি সাধক হতুম সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু

মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাব-জনিত যে দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি—ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য—কটিই বা আমাদের ছাত্র, কটিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এর অধিকারের সীমা নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকে অবলম্বন করে বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি করুক—সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব, সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক মাত্র; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি কৃপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১৭ ভাদ্র ১৩৩১

১২

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম তখন মনে পড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারও কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম—যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন, 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারি নি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ—যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ সে বিচ্ছিন্ন বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পর-বিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-

বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা অবজ্ঞা আত্মপর-ভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন ক'রে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন ক'রে বুঝেছিলেন, তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে পড়ে আসছি, পঞ্জাবে অকালি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধ-বন্ধনকে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে থাক, আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্যন্ত জাগে নি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিল তখন সে-সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমাজ ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জানবার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানি নে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, কেননা সেটা বাহ্য; তাকে বন্ধু সম্ভাষণ করে অশ্রুপাত করতে পারি, কেননা সেটাও বাহ্য· কিন্তু 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ' আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে। কারণ যাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনই তারা মহাজাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্‌বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ, শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে-সকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম, এই ঔদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য, এইটিই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক-রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। আজ যদি

এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকুমাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে একে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই-যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্মে ব্যাপৃত, এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করলুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনো আছে। তবুও সংশয় ও সংকোচ থাকা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় করে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলি নে, কিন্তু সে দিনের সূচনাও কি হয় নি। যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন। সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভুলতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এত কাল প্রত্যহ পীড়িত হয়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা একে কত দিক থেকে ক্ষুন্ন করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রদ্ধা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বন্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গ-বন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়ারূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্তরূপটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দূরে দূরে বারবার ভ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে

হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি, ভারতের এমন-কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবি সমস্ত বিশ্বের। জাত্যভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত করে নম্রভাবে সেই দাবি পূরণ করবার দায়িত্ব আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হল যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে রুগ্‌ণকক্ষে বদ্ধ ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়; যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে; অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষ-ভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারও ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমন-সকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায় নি, রেখে যায় নি; তাদের অর্থ যতই থাক্, তাদের ঐশ্বর্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইজিপ্ট গ্রীস রোম প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমত কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আহরণ করছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্ব-পৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'— তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন সর্বজনীন, যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্‌বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে

পারবে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদ্‌শালী করে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্বতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই— পশুধর্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা; বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্বভুক্‌ ক্ষুধিত পলিটিক্স তার বিনাশকেই সৃষ্টি করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল করব যদি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা-দ্বারা, জাত্যভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি-দ্বারাই য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন— যে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিস কিছু নেই। আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে, ঐশ্বর্য নেই। বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে। দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কখনোই বলি নে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন-না, আমাদের মনে যে উত্তর এসেছে বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক্‌, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি; সে কাজ কি এখনই আরম্ভ হয় নি। অন্য দেশ থেকে যে-সকল মনীষী এখানে এসে পৌঁচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেছেন। আমার সুহৃদ্‌বর্গ, যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে-কিছু পরিবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্‌ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ

হচ্ছে, এ-সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এ-সমস্ত আজ আছে কাল না থাকতেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সত্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করবেন না, এমন-কি, পরিহাসরসিকেরা বিদ্রূপও করতে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়। আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধা লাভ করে, পাছে সেটাকে কেবলমাত্র অহংকারের সামগ্রী করে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। যখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরও বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের বলে জানি। বারংবার এটা দেখেছি, বিদেশের যে-সব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর করতে পেরেছেন সেটুকু আমরা ষোলো-আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার করি নি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসা-বাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্ধিত হয়ে উঠি; এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব তখনো যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

শান্তিনিকেতন
৯ পৌষ ১৩৩২

১৩

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটীর নির্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন— সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত, এবং দুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে— তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল— কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে— মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের— তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলাদেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এইজন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয়, তা হলে অভিমান করে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলাদেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবি নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পয়সা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি, কিন্তু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অমূল্য— সেই দান আমি নম্রশিরেই গ্রহণ করি, ঊর্ধ্বশিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি— শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, 'ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর্।'

কাজ শুরু করে দিলুম— সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েকজন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শুরু করে দিলুম। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতসাধন করছি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ— যে প্রভু কেবল বাংলাদেশের নন— সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্রপার হতে এলেন বন্ধু অ্যান্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তখনই আমার অহংকার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জানতে পারি।

আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি— আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করছি। আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম, এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই-যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেন না, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণ শোধ করবার মতো অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত ঊর্ধ্ব বেতন তাঁদের আহ্বান করছে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন— অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ-দ্বারা অনুধাবিত হয়ে গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হলেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে

বড়ো করলেন না, প্রভুর আদেশকে বড়ো করলেন, প্রেমকে বড়ো করলেন, কাজকে বড়ো করে তুললেন।

এই তো আমার 'পরে ভগবানের দয়া— তিনি আমার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আমার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এত দূরে পৌঁছত না। যিনি সমুদ্রপার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেছেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবি বেশি সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে তো খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি-বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেননা সে তার নীচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে আনুকূল্য পেয়েছে, সেই তো আশীর্বাদ— সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জন করে বাংলাদেশাভিমান বর্জন করে বাইরে আশ্রমজননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েছি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃত-লোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডির, আমাদের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী। যা সকল মানুষের তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক, সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা, তাঁর সেবকেরা, পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্মল হোক— এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি; সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণসৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

১৪

বহুকাল আগে নদীতীরে সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর-কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুঃসময়ে এখানে এসেছি, দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘ-কাল চলেছি— কেন তা ভেবে পাই নে। ভালো করে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিয়ে তবে আমরা আপনাকে

পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভ্যস্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিয়েছিলুম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তর-যুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম বলে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলমাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হল, এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।

আনন্দের ত্যাগে স্নেহের যোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেয়েছি। সেদিনও প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমশ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহুদূর পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আজ একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারংবার মনে ভেবেছি, আমার সত্য-সংকল্পের সাধনায় কেন সবাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েছি, তাই বলতে পারছি, এ দুর্বল চিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা যায় না, যার একমাত্র মূল্য অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা চলে না, অপর লোকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলব্ধি যার, দায় শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে; অংশী যদি জোটে তো ভালো, আর না যদি জোটে তো জোর খাটবে না। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না, এর বদলে পেলুম কী। আদেশ কানে পৌঁছলেই তা মানতে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সংকল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না— কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি। এ ভাবনা যেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা বহন করে যেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি দুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অহংকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে যোগে কোন্‌ রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণবেগে ভাবী কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কখনো হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধঃ'—

নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনসুলভ স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক; আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্ত সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১৫

আমার মধ্য-বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশঙ্কা ও উদ্‌বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাস ও তদুপযোগী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনাকর্মে নিপুণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে, আমাদের দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষা-বস্তুকেই জমানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভুলি নি। আমার বালক-মনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যন্ত্রের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনতায় বালক-মনকে অভ্যস্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদবিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল, জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্ত-বিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে—মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভুত সম্পদের

অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্ত-সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্তসাগরতীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।

আদিকালের মানুষ একদিন আগুনের রহস্য ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগাল। আগুনের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্যের অধিকারী হল। তেমনি পরিধেয় বস্ত্র, ভূ-কর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যুগের আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের সর্বত্র চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্‌ উপলব্ধি করি না। আমাদের তেমনি দান চাই যা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম যিনি, সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়— এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিত্তলোকেও মানুষ মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহ-যোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব; শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য-পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিকুলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা যে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সেই সংকল্পটি আছে, তা স্মরণ করতে হবে। শুধু কেবল আনুষঙ্গিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার জটিল জাল বিস্তৃত করে বাহ্যিক শৃঙ্খলাপারিপাট্যের সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আদর্শের খর্বতা হবে।

প্রথম যখন অল্প বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খুলি তখনো ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তখন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কর্মীকে পাই— যেমন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ। এঁরা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অন্যরূপ। কেবলমাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকতা উপলব্ধি করতেম। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্য দেখেছি। মনে পড়ে, যে-সব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে তাদের বিদায় দিই নি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বার বার তাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেই-সকল ছাত্র পরে কৃতিত্বলাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ করেছি।

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে. কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাত করি নি এবং এই-যে কাজ শুরু করলেম তার প্রচারেরও

চেষ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা—এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। এইসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্য। আজও তাঁর বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

মোহিতবাবু অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুমতি চাইলেন, এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জানাই। বললেম, 'গুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভুল বুঝবে।'

এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যে ভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মম বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে—যেমন জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রসসঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষেত্র অনুর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুকূল নয়। বিনা কারণে বিদ্বেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দুর্বুদ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেঁচেছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রয় পেলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দুরূহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেঁচে উঠেছে।

এক সময় এল, যখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শুধু বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ত্রীমশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন, ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে জুটলেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অনুরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে, দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপকতা-সাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষাপাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মুক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে। সেই সাধনার ভার যাঁরা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা এসে জুটলেন।

আমার শিশু-বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি সাধন হল—সভাসমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অল্পপরিসর

প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কী করে এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাজ যে কিছু সফল হয়েছে আমাদের কর্মীদের চোখে তার স্পষ্ট প্রতিরূপ ধরা পড়ে না, তারা সন্দিগ্ধ হয়, বাহ্যিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকতা কোথায় তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিতুষ্টি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল—তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হৃদয়ে হৃদয়ে তা বিস্তৃত হল। পরীক্ষার ফল ছোটো কথা—এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ বুঝেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হৃদয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হল।

আমার মরবার আগে এই ব্যাপার দেখে খুশি হয়েছি। এই-যে এরা ভালোবেসে ডাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে শ্রদ্ধা ও শক্তি পেয়েছে। এ জনতা ডেকে 'মহতী সভা' করা নয়, খবরের কাগজের লক্ষ্যগোচর কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এই গ্রামবাসীর ডাক, এ আমার হৃদয়ে স্পর্শ করল। মনে হল, দীপ জ্বলেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, মানুষের শক্তির আলোক হৃদয়ে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হল।

এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চেষ্টা চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে। তাই ভরসার কথা, এ কৃত্রিম উপায়ে হয় নি। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে এ কাজ হয় নি। ভয় নেই, প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আমাদের অবর্তমানে এই অনুষ্ঠান জীর্ণ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি—এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদান-প্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে, তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্যসাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই—সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।

আধুনিক কালের মানুষের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা সংকল্পের ঘোষণা করতে হয়। দেখি যে আজকাল কখনো কখনো বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্রলেখকেরা সংবাদপত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ্য হলে সত্যের চেয়ে খ্যাতিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই খ্যাতির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুণ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক কালের ধর্ম, ব্যাপ্তির দ্বারা কাজকে বিচার করা, গভীরতার দ্বারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ডালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

আমি এক সময়ে নিভৃতে দুঃখ পেয়েছি অনেক, কিন্তু তাতে শান্তি ছিল। আমি খ্যাতি চাই নি, পাই নি; বরং অখ্যাতিই ছিল। মনু বলেছেন—সম্মানকে বিষের মতো জানবে। অনেক কাল কর্মের পুরস্কার-স্বরূপে সম্মানের দাবি করি নি। একলা আপনার কাজ করেছি, সহযোগিতার

আশা ছেড়েই দিয়েছি। আশা করলে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তেমন স্থলে বাহ্যিকভাবে না পাওয়াই স্বাস্থ্যজনক।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কী হবে। মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে ফল দাবি করলে তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজুরি চুকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেষ্টা বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অন্ত্যেষ্টি-সংকার হবে, তার দ্বারা সত্যের দেহ-মুক্তি হবে, কিন্তু তার পরে নবজন্মে তার নবদেহ-ধারণের আহ্বান আসবে এই কথা মনে রেখে—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

শান্তিনিকেতন
৯ পৌষ ১৩৩৯

১৬

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত—তার ভাবরূপ তখনো অস্পষ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। কারণ তখন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখণ্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্য প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি—যেমনতর সূর্য যখন পশ্চিম-অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীত কাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা-কিছু অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে যত-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু অসংগত সংযুক্ত থাকে তা তখন স্খলিত হয়ে ধূলিবিলীন; পূর্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্য গতকালের যে চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, যাত্রারম্ভের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদ-রূপে অন্য অংশকে খণ্ডিত করতে থাকে। এইজন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড়ভাবে মনে অনুভব করে থাকি। কালের দূরত্বে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যরূপের অসম্পূর্ণতা ঘুচে যায়, সাধনার কল্পমূর্তি অক্ষুণ্ন হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার উপকরণ-বিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা, অত্যন্ত বেশি ছিল। কটি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড়ো জামগাছ-তলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা—এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর

পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপের বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়ো। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে সংসার উপকরণ-বহুলতায় প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন-কি, খ্যাতিরও না— অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটোবড়ো জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত ক'রে রটনা করে, তার অয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্ব্যাপী দুঃসময়ও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না— চাইও নি। এইজন্যই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হতে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন— পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে— সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতি-বৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে; একতারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে। আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা— সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে; নানা ভুলত্রুটি ঘটে, নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে— এ-সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনো অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়— প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি; দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো— আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্য-কালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না— তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি— সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে, এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে; কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়— নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু— তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে— কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বতাই বড়ো।

আমি এমন কথা কখনো বলি নি, আজও বলি নে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য— সেরকম অভিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করি নি; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক্। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান যেন প্রাণবান হয়, কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে; হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন, অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সত্য। আমার বিশ্বাস, সেই দৃষ্টিমান অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন— এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা দ্বারা নয়, এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন, তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এইজন্য আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্য-সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়— তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেইজন্যই আহ্বান করি তাঁদের

যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাঁদের মনে এখনো সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এর কর্মকে সফল করেন—এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪১

১৭

এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প নিয়ে কিসের অভিমুখে এ চলেছে, সে কথা প্রতি বর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে—বিশেষ করে আমার—কেননা অনুভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইতিহাস বিশেষ নেই; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানবশিশু নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। গুরুর শাসনে তারা অনেক দুঃখ পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কখনো ভাবি নি, আমার দ্বারা এর কোনো উপায় হবে। তবু একদিন নদীতীর ছেড়ে এখানে এসে আহ্বান করলুম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়—সেদিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনায় এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি—তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এই-সব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে—অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম—মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়—তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে—

শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।

ছাত্রসংখ্যা তখন অল্প ছিল, এও একটা সুযোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তখন এক হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহ্য করেছি; অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে, তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ রেখেছি, যেন ছাত্র শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়— শিক্ষার যে-সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে এল কনস্টিট্যুশন, ঠিক হল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীনে থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কনস্টিট্যুশন, নিয়মের কাঠামো— যাতে প্রাণ-ধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে; সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, কনস্টিট্যুশনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে যে, এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না— কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এখন এসেছেন তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না— বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।

আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দুঃখ স্বীকার করে নিয়েছি— আশা করি আমার এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করবার অধিকার আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিন্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা বুক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অনুষ্ঠান নেই যার দুঃখ নেই, বন্ধু তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে একত্র হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করি, বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর-একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন, আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা

শুনেছেন। বাইরে আমরা অতি দরিদ্র, কী দেখাতে পারি—তবুও বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন। শ্রীনিকেতনকে যিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী—কী না তিনি দিয়েছেন। অ্যান্ড্রুজ দরিদ্র তবু তিনি যা পেরেছেন দিয়েছেন—আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্তু কখনো তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্‌নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য সকল ক্ষতির দুঃখে সান্ত্বনা। একান্তমনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধুদের কাছে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪২

১৮

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান—ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়—সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এই-সকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে—আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই-সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা; মন যেখান সুস্থ সরল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যে-সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই-সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেহ

স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়— এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভৃত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম গুটি-পাঁচ-ছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইস্কুলমাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে— এইটেই আমার সার্থকতা। এই-যে আমার সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন, আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্যসাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির 'পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্য-হানির দাগা দিই নি।

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে; বলতে হবে ওঁ— আমি জেগে আছি।

এখানে এলুম যখন তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই বলতে পারি, সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারই মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অনুকূল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি, তাতে কর্মের মূল্যই বেড়েছে।

যাঁরা সংকীর্ণ কর্তব্যসীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনের কাজ করেছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব দীর্ঘকাল চলেছিল। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— কখনো পীড়িত মনে, কখনো উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্ব-সাধনার সঙ্গে এক বলে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের পূর্ণপরিণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ এবং দুরূহ প্রয়াসের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে তাঁদের সেই অনুকূল দৃষ্টি থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিষ্কার শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দূরের থেকে এসেছেন মনীষীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রমের সম্পদভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্যসংরচনকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই একরকম শেষ করে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু-একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা মনীষীরা আমাদের পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪৫

১৯

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মুখে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির ব্যবধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্যকর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুধু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভৃত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পদ্মানদীর নির্জন তীরে। মন যখন সে দিকে তাকায়, দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রত্যূষের আভা। কখন এক উদ্‌বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুবেছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি-একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হয়েছি— অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরও চেষ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের

স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনো বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্নানপান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশবাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সবকিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্‌দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই-যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখস্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা-দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না—একে স্বীকার করে নাও।

ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান তরী-উদ্ধার-চেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পেঁছয় না। একদিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে যাবে তখন সংশয়শুষ্ক বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্‌বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

শান্তিনিকেতন
৮ শ্রাবণ ১৩৪৭

প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ

হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন; তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

যথার্থ বড়ো কাহাকে বলে? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি. ধনীকেই আমরা বলি বড়োমানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে যে-সব ঋষিদর পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তা হলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়িজুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত করে নমস্কার করা নয়—তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন—কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন-একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন-একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজামহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমন-কি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই—বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্যু কিংবা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত

সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত— কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড়ো বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা-মুক্তো ছাতা-জুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, সুতরাং সেজন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন— কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐরকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাগত দরিদ্র অনাথ কাউকেই ভুলতেন না— প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন— তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ— আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তা হলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে

নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এই-সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে—তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই—সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেইরকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে—কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না—কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্ল-চিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ ক'রে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ করো :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

৭ পৌষ ১৩০৮

প্রথম কার্যপ্রণালী

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে, পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি

যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংযমের দ্বারা ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এ-সব কার্য ফরমাশমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়—অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমন-কি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্যব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে ...র পুত্র ...র শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে—সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শৌখিনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া খেলা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে, ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তক্‌তকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে

তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনোমতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহার-স্থানে হিন্দু-আচার-বিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন. সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি। সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতা রূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে—এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব :

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতা নোহসি' উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষমাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়—সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূর করো, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই-সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মতো না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশত নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনো মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে[১] লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

---

[১] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নষ্ট হইলে, হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে, রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনোরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গোরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে।[১] জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে— কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম-সম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

---

[১] বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রস্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন— আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয় সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্রের অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু-মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

—

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বতউৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্য-কর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের

কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য—অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো যায় না—এবং এ-সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা-বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না—কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এ-সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ-সমস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই—এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই-সমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকটে কোনো আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ

যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ-সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে—নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্‌বেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ-নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঔপনিষদ ব্রহ্ম

প্রকাশ : ১৯০১

'ব্রহ্মোপনিষদ', 'ব্রহ্মমন্ত্র' এবং 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৬, ১৩০৭ এবং ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে পঠিত ভাষণ তিনটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটি পুস্তিকা কার্যত তৃতীয় পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমান সংস্করণে কেবলমাত্র 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'ই মুদ্রিত হল।

ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি— ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমুদয় যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি ঝরিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া যায়— সূর্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ব্রহ্ম-সূর্যলোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান্ সত্য আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানাশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন বনস্পতির, এই ভারতব্যাপী পুরাতন আর্যজাতির, মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া যান নাই?

তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায় মনে বাক্যে তাঁহাদের মহাবাক্যকে প্রতি মুহূর্তে পরিহাস করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেৎ ইহাবেদীর্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে 'মহতী বিনষ্টিঃ', মহা বিনাশ। অতএব ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তৎ বয়ং
ন চেৎ অবিদির্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন— আমরা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ— সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ, যাঁহারা সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরু-সম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম এক, ব্রহ্ম এক; যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, এখানে তাঁহাকে জানিলেই

জীবন সার্থক হয়, নচেৎ মহতী বিনষ্টিঃ, তবে বিনয়ের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্যপথই অবলম্বন করিতে হইবে।

সত্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেরই পক্ষে এক মাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন আমাদের মুক্তিবিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাঁহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্মল নির্ঝরিণী অভ্রভেদী অগম্য গিরিশিখর হইতে অহোরাত্র নিঃস্যন্দিত, আর যাঁহার অল্প পিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা—হে পান্থ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট লইয়া আইস, যাহার যতটুকু পিপাসা পান করিয়া যাও।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সংকীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অবরুদ্ধ অন্ধকূপই আমাদের মতো ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার অপরিমেয় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিরন্তর লোক-লোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই-না কেন তথাপি ভূমৈব সুখং, ভূমাই আমাদের সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমাদের সুখ নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মতো স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে—কিন্তু তাহা চলে না। ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং—যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোকরহিত—য এতদ্‌বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমর হন—অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি, আর-সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

উপনিষৎ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ করো!

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং—

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া—

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত—

উপাসনা-দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি!

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য-স্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করো!

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবলতনু আর্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, তখনকার সেই টংকারমুখর অরণ্য-নিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসংকোচ বাক্য কাহারও মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম

তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ। প্রমাদশূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগর-নগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান-বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে কিন্তু সেই কত শত শতাব্দীর পূর্ববর্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে তদেতৎ সত্যং, সেই-যে একমাত্র সত্য, যদ্ অণুভ্যোণুচ, যাহা অণু হইতেও অণু, অথচ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ, যাহাতে লোক-সকল এবং লোকবাসী-সকল নিহিত রহিয়াছে, সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। তদমৃতং, তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন তদ্ভাবগতেন চেতসা, তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা, তাঁহাকে লক্ষ্য করো—তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ করো! শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ, লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও।

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরলপ্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য ঋষিদের বুদ্ধিশক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত।

কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে—সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র তদেতৎ সত্যং বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না—একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবল-বেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরম সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবলমাত্র সত্যনিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

কারণ, সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এইজন্য সেই অমৃত পুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ।

অর্থাৎ, যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন—প্রিয়ং রোৎস্যতীতি—তাঁহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! যে সত্য আমাদের জ্ঞানের পক্ষে সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ, আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই-যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইরে প্রিয়, অন্য-সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোনো ধর্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে—প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—ব্রহ্মর্ষি

এ কথা কোনো ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না; তিনি বলিতেছেন না, যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য-সকল হইতে প্রিয়— তিনি বলিতেছেন আত্মার নিকটে তিনি সর্বাপেক্ষা অন্তরতর— জীবাত্মামাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য-সকল হইতে প্রিয়— জীবাত্মা যখনি তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর-কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব তদেতৎ সত্যং, তাহা নহে; তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব তদমৃতং। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব, এবং সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম-সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা। তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে; ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মামাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হইবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমাণ হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত-দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

কোনো রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরসাবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি, তখন এ কথা বুঝিলে চলিবে না যে, কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্বশ্রেষ্ঠ— ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতি। কিন্তু কোনো অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোনো পাঁচালি গানে অধিক সুখ অনুভব করে তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সে লোক অশিক্ষাবশত বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতাবশত, সেখানে সে প্রবেশলাভ করিতে পারে না— কিন্তু তাহার অশিক্ষাবাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে তখনি সে স্বভাবেতই মানবপ্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য-সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক— ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র বিত্ত ও অন্য-সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রহ্মের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দ-সাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে, সংসারযাত্রা সে সহজে নির্বাহ করিতে পারে না— সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে। এইজন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা-কিছু তিনি দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে। সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে— সেই ভোগে সে ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে না, নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না— সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত

না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি, তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এই জন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে—কারণ, সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা-নির্বাহ সম্ভব হয়।

পরের শ্লোকে বলিতেছেন—

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে—

কর্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না; কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারকর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্তব্যকর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপরে স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম-নির্বাহও ভালো তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ-সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গলকর্ম-সাধনেই আমাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদ্‌গত বন্ধন-সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপু সকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গলকর্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্তব্যকর্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা—এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে—ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্মের মূলমন্ত্র—কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য-সাধন। কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ

করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি? কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি, কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া, কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোনো অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্তব্য সর্বথা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃগৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কী প্রয়োজন— সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দে সে তৃপ্ত হয়— অবশেষে কৃতকার্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি— এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া, এখানকার কর্তব্য একান্ত-চিত্তে পালন করিয়া, পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা— তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ, সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে— অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ বিচিত্র রস আকর্ষণ করি— মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে— কিন্তু তাহা নহে— আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস-নির্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচারপূর্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, তাঁহার দত্ত সুখসমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে— সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর পক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া

আমাদের আত্মায় কল্যাণরস প্রেরণ করেন; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক্ হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্ব-সংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার, উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্তব্যবন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই 'না' করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের এক দিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশপালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান করে সে কঠিন কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার— আমাদের এই কর্মক্ষেত্র; ইহাই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান জগৎসৌন্দর্যের ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে— সংসারের সেই জ্ঞান সৌন্দর্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ এবং ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়, এবং সেই অবস্থায়--

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন এবং সর্বভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য এবং অবলম্বনীয়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহলাভ হয় না, এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহে গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভালোবাসে, পথকেও সে ভালোবাসে; পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না— সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্মকে ব্রহ্মের কর্ম বলিয়াই জানে।

আর্যধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগসাধন করিতে হয় তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কী? সংসার তো আছেই— কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কী? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন, আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্বিকার অক্ষয় পুরুষের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে— সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা, সছিদ্র তরণীর ন্যায়, আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব—

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়?

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে— সে প্রার্থনা অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া

যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে স্বহস্তে মৃত্যুধর্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ— যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্বত্র অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন।

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখশোকের নির্বাপণ সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখনির্বাপণের, মুক্তিলাভের অন্য যে-কোনো উপায় আরও কঠিন— কঠিন কেন, অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহনস্নান যদি কঠিন হয় তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন— তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র-কলস পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন অতি সহজ হয়, তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবৃত হইয়া আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্বাংশে দূর হইয়া যায়। এই জন্যই উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্যমনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাঙ্‌মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া, খণ্ড করিয়া, দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ, লাভ করিতে পারি না। আমরা তো সংসারের সংকীর্ণতা-দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা-দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা-দ্বারা শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া আছি— আমরা জানি সংসারের 'স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি'— সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ— সকলেরই মধ্যে ভয়দুঃখক্লেশ জরামৃত্যু-বিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে— অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই, তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যঃ— তিনি সংসার কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার কাল ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে তো সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল— তবে তো তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা-স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না, সেই জন্য তাহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই, তাঁহারা উপনিষৎকথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন—

যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাক্‌ অভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

যিনি বাক্য-দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জানো—এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জানো—এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে—যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে—তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে।

শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব সংস্কার-দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে, তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না; জানি যে, তাঁহা হইতে বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ; এবং মাতৃ-অংক-কামী শিশুর মতো ইহাও জানিতে পারি যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোনো ভয় নাই।

যাঁহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া, ঋষিবাক্য অমান্য করিয়া, ব্রহ্মলাভের সহজ উপায়স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন, তাঁহারা এ কথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সন্তরণ অপেক্ষা পদব্রজে চলা সহজ বলিয়া মানিয়া লইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জলের উপর দিয়া পদব্রজে চলা সহজ নহে—সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ। অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে মনন-দ্বারা জানা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষু-দ্বারা দেখা সহজ এ কথা স্বীকার্য, কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষু-দ্বারা দেখা সহজ নহে—এমন-কি, তাহা অসাধ্য। তেমনি সাকার মূর্তির রূপ-ধারণা সহজ সন্দেহ নাই কিন্তু সাকার মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য; কারণ, স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ—তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে, সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেই জনাই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়—অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে, তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় তো ভালো, যদি না হয় তবু সত্য বৈ গতি নাই। পৃথিবী কূর্মের পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে এ-কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয়, তথাপি বিজ্ঞানপিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া

তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরুপ্রান্তরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ ক্ষুধার্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ; কিন্তু সে বলে আমি তো সহজ চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই— সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে, নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসারমধ্যে আমরা যখন অধ্যাত্মপিপাসা মিটাইতে চাই তখন কল্পনামরীচিকায় সে কিছুতেই মিটে না— যত দুর্লভ হউক সেই পিপাসার জল— আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পরমাত্মাকেই চাই— তিনি নিরাকার নির্বিকার বাক্যমনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্মপথ তো সহজ নহে, ব্রহ্ম-লাভ তো সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে— দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি— সেই জন্যই মোহ-নিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন; উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। না উঠিলে, না জাগিলে এই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না— আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না— এবং ব্রহ্ম ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ বিত্তলাভ যশোলাভ সহজ না হয়, তবে ধর্মলাভ সত্যলাভ ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে! কোন্ মূঢ় বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে, খনি-অন্বেষণের প্রয়োজন নাই? উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য-আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভালোমন্দ সুন্দরকুৎসিত অন্তরবাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য। তাই যদি হইবে তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন শাস্ত্রকার বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন— এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ, তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিলেন তাহা যেন অজ্ঞাননিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মে নিরত হইবেন এবং যদ্‌যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ, যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। অতএব শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে— কেবল, জ্ঞানে নহে, কর্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায়, সর্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্বদা সর্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে, তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং— এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোনো-প্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্তি-দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি, এই যাহা কিছু জগৎ-সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে এ কথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুল্মলতাপুষ্পপল্লব পশুপক্ষী মনুষ্য চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু পরমাণু, এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই— এক মহাপ্রাণের অনন্ত-কম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বসংগীত ঝংকৃত শুনিতে পাই। অনন্তপ্রাণের সেই অনির্দেশ্যতা অনির্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদ্‌ব্যাপী জগদতীত প্রাণকে কোনো নির্দিষ্ট সংকীর্ণ আকারের মধ্যে কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না— আমাদের

রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্বাঙ্গের বিচিত্র স্পর্শ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিশ্বসিত রোমকূপের মধ্যে পাই না— আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মূর্তির অলঙ্ঘনীয় অন্তরালে, তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অন্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলির কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে— আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীরকোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন— ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না? কোনো মূর্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে— অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সংনিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।

> যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে
> অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি।

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

> যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

কিন্তু যখন তিনি ইহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয় এবং তখন আমাদের আত্মার অভয়প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন—

> অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কী করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন ইহার অধিক আর কী বলিবার আছে? তিনি আছেন এ কথা যখনি আমরা সর্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখনি যথার্থত বুঝিতে পারি যে, আমি আছি; বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই; আত্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল, নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলি-পিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথনভোমণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না; তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গাম্ভীর্যে উদ্গীত হইয়া উঠে— ওঁ; একটি বাক্য শুনিতে পাই— অস্তি, তিনি আছেন— এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎচরাচরের, সমস্ত কার্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান অস্তি শব্দকে কোনো আকারের দ্বারা মূর্তি-দ্বারা সহজ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর-কিছু আছে যে 'তিনি আছেন'? 'আমি আছি' এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ, 'তিনি আছেন' এ কথা না বলিলে 'আমি আছি' এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা

হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে— তিনি আছেন। সাকার মূর্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষ্য আর-কিছু দিতে পারে?

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে?—

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

কী ঊর্ধ্বদেশ, কী তির্যক, কী মধ্যদেশ, কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না— তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ।

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল— ওঁ।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোনো মূর্তিকল্পনা ছিল না— পূর্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোনো বিশেষ অর্থ-দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোনো বিশেষ আকার-দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটিমাত্র ওঁ শব্দের মহাসংগীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যতপ্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা সে আকারবদ্ধ— সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র— তাহার কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না— সাধনা-দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যত দূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সংগীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অনির্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা-দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব ও আবদ্ধ করে, কিন্তু এই ওঁ ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেই জন্য উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন— ওমিতি ব্রহ্ম। ওম্‌ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। ওমিতীদং সর্বং, এই যাহা-কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধন-হীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে— সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে, অথচ কোনো সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন ওমিত্যেতদ্‌ অনুকৃতির্হ স্ম— ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ ইহা করো বলিলে, ওঁ অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকু মাত্র অবলম্বন— ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরাজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yea অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই— তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া

স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ, তিনিই চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yea। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ। এই মহৎ নিত্য এবং সর্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইঁহাকেই নির্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোনো প্রতিমা ছিল না, কোনো চিহ্ন ছিল না—কেবল এই একটি মাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা-কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইয়া থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক্‌ আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর আমাদের সমস্ত কর্মের উপর মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য—আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

তিনি যেখানে, সেখানে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

> তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
> প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই-যে অন্তরতর পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

> সত্যান্ন প্রমদিতব্যং।
> ধর্মান্ন প্রমদিতব্যং।
> কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।
> ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন তিনিই ওঁ।

অনেকে বলেন, দুর্বল মানবপ্রকৃতির সর্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায়, আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্তিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভূষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।

এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা মানবপ্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করি; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেই জন্যই শাস্ত্রে গৃহস্থকে

ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্তব্যপালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান করিয়া আমরা দেবসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্মের মহত্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির পরম পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান প্রেম ও কর্মের এইরূপ মহত্ত্বসাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মানবপ্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই— ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, বস্ত্র পরাইয়া, অন্ন নিবেদন করিয়া, আমাদের কর্মচেষ্টার কোনো মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না; তাহাতে আমাদের কর্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সংকীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সেই পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণপাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক-মোচনের জন্য বিবিধ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গল-চেষ্টা নিয়োগ করিয়া ভক্তিবৃত্তিকে সফলতা দান করে। দীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ইহাতেই আমাদের সেবাচেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বস্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র, তাহা কর্ম নহে; তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাসমাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মুগ্ধহৃদয়ের কোন সুখসাধন হয় তবে সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেব-সেবার উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্মানুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যা করিয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কী ফল লাভ করিয়াছি? কর্তব্যকে খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্মকে, মানবপ্রকৃতির সর্বোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খেলা করিতে করিতে আমরা কোন্‌খানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকুণ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্বপ্রকার মনুষ্যোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎপ্রয়াস হইতে নিষ্কৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্জনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশা-পূর্বক নিদ্রা ক্রীড়া ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিস্তেজ নির্বীর্য হইতে থাকি; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ভক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রহ্মকে চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরীভূত করিয়া, হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীজ বপন করিয়া, আমরা জাতীয় দুর্গতির শেষ সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্ছনা, অন্তরে গ্লানি, চতুর্দিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের 'চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং', মনে বাক্যে ও কর্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্মে এবং কর্মে ঐক্য নাই—সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাজ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসত্যে আদ্যোপান্ত জর্জরীভূত হইয়াছে। আমাদিগকে এক হইতে হইবে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়? সে কোন্‌

সর্বব্যাপী সত্য কোন্ অদ্বিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনে বাক্যে ও কর্মে একতা দান করিবেন? সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়-জয়ী পরমনির্ভর পাই নাই; সংসার গুরুভার লৌহশৃঙ্খলে আমাদের অবমানিত মস্তককে আরও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড় দুর্বল দেহকে আরও গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাঁহার মধ্যে আবৃত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি—কোনো প্রবল রাজা কোনো পরম শত্রু, কোনো প্রচণ্ড উপদ্রবে তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্‌কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করজোড়ে ঊর্ধ্বমুখে বলিতে পারি না যে—

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোন ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। তিনি রহিয়াছেন—ভয় নাই, ভয় নাই! সম্মুখে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর করো, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ করো। অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলো; কেবল তাঁহাব মুখের দিকে চাও এবং তাহার কর্ম করো! তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটে তিলক করিয়া লও, যদি দুঃখ ঘটে সে দুঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য করিয়া লও, যদি মৃত্যু আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করো। অক্ষয় আশায়, অক্ষুণ্ণ বলে, অনন্ত প্রাণের আশ্বাসে, ব্রহ্মসেবার পরম গৌরবে সংসারের সংকটপথে সরল-হৃদয়ে ঋজুদেহে চলিয়া যাও। সুখের সময় বলো, অস্তি—তিনি আছেন! দুঃখের সময় বলো, অস্তি—তিনি আছেন! বিপদের সময় বলো, অস্তি—তিনি আছেন! পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয়লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈন্য গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলো! বলো, যে মহান অজ আত্মা হইতে বাক্য মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আনন্দলাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না—আবার ন জরাঃ ন মৃত্যুঃ শোকঃ। বলো—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাঃ
তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

উপনিষৎ-কথিত সর্বান্তর্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অংগকে পরিতৃপ্ত করুন! ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন; সেই পরমাত্মায়-নিরত আমাতে উপনিষদের যে-সকল ধর্ম তাহাই হোক, আমাতে তাহাই হোক!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

প্রকাশ : ১৯০৯

উৎসব

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন—এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ডপদার্থ প্রত্যেক খণ্ডঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—

নিখিলে তব কী মহোৎসব। বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে. তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা—মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না—তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি—আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে-সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্ট পরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা

হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য— এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—' তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে-সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে; কারণ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ্‌পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ— তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ তাহার প্রেম উদ্‌বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই— কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— এই যে যাহা-কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে— এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ— এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎপ্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরনা আকাশময় ঝরিয়া পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি— ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া ফুল ফুটিয়া পাতা গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশি রাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। সূর্যোদয়ে

সূর্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শত শত কণ্ঠ হইতে উদ্গীরিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারি দিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ—সৌন্দর্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি। প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন।

আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদান-টুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর কাহারই বা কী। কিন্তু এক দিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর-এক দিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধি দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন—ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মতো ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাত-প্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়, প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্যলাভ করিবে কী করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাৎ একদিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব। হে বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসব-দেবতা, আমি কে? আজি উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার

অধিকার আমার কী আছে? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনাবাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজও পৌঁছিয়াছে? তাহার বাধা কি একটি? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই তাহাকে আহ্বান করো। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান করো। ফিরাও, ফিরাও, তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিরজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্রনতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই তুমি অপসারিত করিয়া দাও— কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্বনিম্নস্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসব-সভার মহাসংগীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসবের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত— সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্ত-লিখিত আলোক-লিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে তোমার উদার বায়ু নিশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণ-প্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করো—তোমার উৎসব-প্রাঙ্গণের ধূলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না মানুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান—আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।

মাঘ ১৩১২

দিন ও রাত্রি

সূর্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই যে দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কী রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো বৃহৎ অর্থ নাই? আমরা এই যে অনন্ত গগনতলের নাড়িস্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে

প্রতি বর্ষায় যে একটা জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া শস্যবপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই। সূর্য একসময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়—রাত্রি নিঃশব্দ করে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষনেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্তন কী বিপুল, কী আশ্চর্য। কী অনায়াসে মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে। অথচ মাঝখানে কোনো বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্যের আরম্ভের মধ্যে কী স্নিগ্ধ শান্তি, কী সৌম্য সৌন্দর্য।

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড়ো হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টার সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন-আপন কর্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্মোদ্‌যোগের আকর্ষণই জগতের আর-সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্যপ্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব—দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে, অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিস আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালোবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে, আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম—প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়—তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের

সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়— আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বল-রূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্য রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোক-নির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্‌যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকারগর্ভ হইতে এক-একটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে এক-একটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না, শোনে না, তখনই নিবিড়তর ভাবে মাতাকে অনুভব করে; সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক— স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব, নিজের শক্তি, নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক-পৃথক করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃতনিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারি হইয়া দাঁড়াই— বলি, জননী, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কর্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম— কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না— কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ করো, মার্জনা করো, গ্রহণ করো। তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্ব-জগৎ যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্মললালাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি

তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন যেন আমার গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়—তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি—সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক, যেন বলিতে পারি—সকলের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতেছি—তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্তদিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে-রাত্রে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকা-পাতে প্রতিদিন বিচিত্র হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেখিয়া বিষাদের নিশ্বাস ফেলি, পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে তো কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্বল্যমান করিয়া তুলে, আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে—সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড়ো যে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও তো আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে দ্বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ময় বিচিত্ররহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখদুঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলই অভাব, কেবলই শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ, একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক

করিয়া পৃথক করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা, আমাদের জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ, দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে, লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে। তাই আমরা কিছুই জানি না, কোথা হইতে এই নিঃশেষবিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্য-সঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না, এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত-করস্পর্শে মুছিয়া গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে, জানি না, কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্‌যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে, সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চলশক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমুহূর্তে বলপ্রেরণ, প্রতিমুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবক-দিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরম-স্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহংকারসুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব যে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।

ঐ দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতিরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎ রূপে দেখা দেয়।— কিন্তু আকাশের ঐ যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোক তরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়—তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন তো কিছুই নহে, তোমার অন্ধকার-বসনাঞ্চলতলে তোমার অবনত

স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্তশিশুর মতো নিশ্চল নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্রতেজ মাধুর্যরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ. কিছুই আর থাকে না, তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ করো— আমাকে রক্ষা করো,

যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে তোমার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্মশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরবসংকেতে আহ্বান করিবে, তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননী, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্কহৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই, প্রীতি লইয়া যাই, কল্যাণ লইয়া যাই—বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়, সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি। যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্রবল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ববিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যেন দিন হইতে রাত্রে, জীবন হইতে মৃত্যুতে, আমার অক্ষমতা হইতে তোমার করুণার মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিতে পারি। ইহা যেন মনে রাখি—জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিয় করিবে—তোমার দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে— তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘ ১৩১০

মনুষ্যত্ব

'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!' উত্থান করো, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না— কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' এই বাক্য বার বার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক দুঃখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে-ঝংকার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'—উত্থান করো, জাগ্রত হও। অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নব-জাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠো!' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোনো অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ-সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণ-পাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না? সে তাহার সমস্ত দলগুলি

সংকুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কী আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য আসিয়া অরুণকরে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পক-কিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দাও।' রজনী নিঃশব্দ পদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃ-সম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর-তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্ঘাটন করিয়া দাও—আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন করো।' নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতে ফুলের মতো করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারি দিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মতো আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত পর্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘযাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা দ্বারা আবর্ত-বেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান, একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে—সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা! মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্, অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ—মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্বসম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ,

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে আমাদের আনন্দ নাই।

যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা

না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরমদুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্ধ্বে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই আত্মা (জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল) ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ ঘটে, ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধলাভ করো।
সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়-চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মানুষ মহৎ; কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি, তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্য দিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ অবিরাম-যুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে এক দিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্য দিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না,

আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন— ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
যে-যে কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে এক দিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দলাভ করি।

প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব, তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে— যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের— সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মূর্তিলাভ করিতেছে— এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানাদুঃখের এক আনন্দ-অবসান— ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দসংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ— প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে; ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই— বলরক্ষা হয় না, আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করো।

১৩১০

ধর্মের সরল আদর্শ

আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয়, তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়— সেটুকুর জন্য কত লোকের উপর আমার নির্ভর। কোথায় সর্ষপ-বপন

হইতেছে, কোথায় তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়-বিক্রয়—তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্‌যোগ—এত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না—তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না, কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যদি কেহ বলে প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্য একটি অত্যন্ত নিগূঢ় কৌশল কোথাও গুপ্ত আছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই কথা মনে হয়, নিশ্চয় তাহা প্রভাতের আলোক নহে—নিশ্চয় তাহা কোনো কৃত্রিম আলোক—সংসারের কোনো বিশেষ-ব্যবহারযোগ্য কোনো ক্ষুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মস্তকের উপরে আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে—ক্ষুদ্র আলোকের জন্যই অনেক কল-কারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা, তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তরবাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্‌যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেক সময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভান করিয়া আমাদের মূঢ়চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞবুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কল-কারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃংখল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা—পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক-এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন-আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই—কিন্তু সেইজন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকাল-পাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের

পক্ষে আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে তো। ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতি বিচিত্র— সুতরাং সেই বৈচিত্র্য-অনুসারে যাহা এক, তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক, সেখানে জটিলতা অনিবার্য— যেখানে জটিলতা, সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি, তাহা তিনি নহেন, তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম নহে, তাহা সংসার। সুতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি, তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্তকিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি, তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে—

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই।

সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখ সৃষ্টি করিবে— দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবরস্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি, 'আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব'— যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি— কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতিদ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না পাইবার আনন্দের অধিকারী সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেরই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জালদ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোনো অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্ঠির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে, আর আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না—তাহা দুর্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র—তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন।

মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই-সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি।

দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি একমুহূর্তেই পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারি দিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল।[১] আমার স্বহস্তজ্বালিত একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ লাভ করিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুৎকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কী পাইলাম। বাতির মতো কোনো নাড়িবার জিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই— পাইয়াছিলাম আলোক আনন্দ সৌন্দর্য শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম— অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ-বিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা এক-নিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়— তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ— গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি-শব্দের অর্থ— চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগতকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়, মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী— আমি কোনো বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি— আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন— স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যুষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।

এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে

[১] তুলনীয় 'পূর্ণিমা', 'চিত্রা', রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৭৬, 'ছিন্নপত্র' হইতে উদ্ধৃত পত্র (শিলাইদা ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫), রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৫৪৮।

কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তিদ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই-যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার-কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগতকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্তশক্তি দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। বস্তুত ইহাই হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে দ্বিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল হইয়া আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না—সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব—আমাদের জীবনের

সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে-সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়। সেইজন্যেই আমাদের মন অসত্য, অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে 'আমার দুঃখ দূর করো' তখন সে শেষ পর্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে—যখন সে বলে 'আমার দৈন্যমোচন করো' তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে, তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে 'আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো', তখনও এই কথা। সে না বুঝিয়াও বলে—

আবিরাবীর্ম এধি।
হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তরবাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য যে জ্যোতি যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা, সেই অসত্য সেই অন্ধকার সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়, যাহা দূরে তাহাকে সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে, সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন। সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে—তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই, বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায়, সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিতশিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মতো নিষ্ঠুরবেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্যবেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারি দিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন : সংযতো ভবেৎ। প্রবৃত্তিবেগ সংযত করো। চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই আমরা সংসারের যে-সকল স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যকে, প্রতিদিনের শতশত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া, স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই, তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারি দিকেই আছে, যাহা

অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়—কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা—আমরা যে অমৃত-লোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারত-বর্ষের প্রার্থনা—চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে; জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া—যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম, সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে সুগম, তাহা আমাদের সম্যক্-ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরজীবনের আশ্রয়—তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেক্ষা সুদূর—তাহাকে আমাদের কোনো আবশ্যক-বিশেষের উপযোগিরূপে, বিশেষ আয়ত্তগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই তাহাকে কঠিন করা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা হয়—অধীর হইয়া তাহাকে বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের সৃষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়—এইরূপে চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্তু চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম নিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধা-বিভক্ত খর্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহন মধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জিত তোমারই পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারি দিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারি দিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়গর্জনে চারি দিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্কমৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিক্‌বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়-তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন

প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। একের আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না। ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মাঘ ১৩০৯

প্রাচীন ভারতের 'একঃ'

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ। যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। হে সৌম্য, পক্ষীসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা কিছু সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। নদী যেমন নানা বক্রপথে সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনের গম্ভীরমন্ত্রে এই বার্তা উদ্গীত হইতেছে : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্। বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ। সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর লইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্য-কারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল : একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে। সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতা-সন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল : এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়। এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট-বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনি, সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতেই প্রিয়। মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ব বিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ বিচ্ছিন্ন জগতকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যুষে পূর্ব দিক যখন অরুণবর্ণ, লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান—যখন মনে হয়, যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনো সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল গৃহের অসংখ্যজীবপালনকার্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন দিবসারম্ভে ওংকারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্‌ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন—তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহার-মণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিযোজন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তিসৌন্দর্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটিমাত্র কহিতেছে না, শব্দটিমাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ সগর্জন তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে-অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে-পল্লবে যে মর্মরধ্বনি, আমরা তাহার কী জানিতেছি। বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্মশালায় দিবা-রাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্বাণ নাই, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে—তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট প্রশান্ত সুন্দর—এত কর্মে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিন্তিত চিহ্নিত ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্ত গম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণ-কোমল, তাহার রাত্রি কী উদার-উদাসীন। এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই এক। সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারি দিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য; অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতিহীন মহাসূর্য-মণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে—একান্তনির্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া? ইহার কারণ : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি এক-বিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মতো অনুভব করিতেছি। এই-যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-বিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ

করিতেছে, তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথক্‌কৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না— সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি— এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে, এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে-দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে— এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত আত্মীয়সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি— যিনি, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাত-প্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন বিপৎসম্পদ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যে নানা বিরোধবিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ড-ভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত— তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি, কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেইজন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না! ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গলসংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে— কেননা, বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খণ্ড খণ্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কর্মচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার অহংকার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হৃদ্‌বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই স্তব্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না— দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি— যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎসংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অখণ্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে ইহাকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে

পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ-ইষ্টককাষ্ঠ মর্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকি, এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মুহূর্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইঁহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন— মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না— সে খণ্ড খণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিকধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে, কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে— সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন একমুহূর্তেই বলিয়া উঠে— আমি অমৃতকে পাইয়াছি— বলিয়া উঠে—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পারে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন— এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন : যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম? যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব? যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়— কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; বিপদসম্পদ মুহূর্তে-মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

> এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,
> এষোহস্য পরমো লোকঃ এষোহস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন— যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশম-পশম আসন-বসন কাষ্ঠ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে? তাহারা আমার

কে? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত শ্রীহীন মলিন, কেবল বসনে-ভূষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না; কেননা শয্যা আসন-বেশভূষার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ-জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি, সেই-সকল ধূলিময় পদার্থের ধূলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টাপর্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না—এতবড়ো অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্, যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা, মনের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে, তাহাতে আমার আনন্দ নাই; আমার আনন্দ, আমার গর্ব কেবল উপকরণ-সামগ্রীতে—এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দেশে জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্, যিনি দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্মে আমার কোনো আস্থা নাই, কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন। আমি জানি না আমি দেখিতে পাই না : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্। আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্ণ।

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে, অন্তরে-বাহিরে, জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো, তুমি আহ্বান করো, তোমার প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহু দ্বারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের দুর্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত-ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়। এক তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে,

আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই— কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিস্মৎ হইয়া উঠে। আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞান-মদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃ-শোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই-সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা সেই উপকরণ-বিহ্বলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্? যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব? কামান-ধূম্র এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না; তোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত করো।— যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ। যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয় তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ। শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার; হে শংকর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার; হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার।

ফাল্গুন ১৩০৮

প্রার্থনা

সকলেই জানেন, একটা গল্প আছে— দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এতবড়ো সুযোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্বল হইল— শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে-তিনটে প্রার্থনা জানাইল, তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, আমরা মনে করি পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না-জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব-চেয়ে জাজ্বল্যমান— আমি সব-চেয়ে কী চাই, তাহাই বুঝি সব-চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট— কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে— সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে— যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে সর্বাংশে তাহার অনুকূল

করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব-চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা? যে-ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহস্য, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়—কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? আমি কী, আমার মধ্যে যে-একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কী, তাহার গতি কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কী, তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমত হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয়তো ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি—আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি—আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কী চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার প্রার্থনা কী, তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন—শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—

> অসতো মা সদ্‌গময়
> তমসো মা জ্যোতির্গময়
> মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
> আবিরাবীর্ম এধি।
> রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
> তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরও বৃথা। আমরা যখন সত্যকে আলোককে অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনই এ প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল—কিন্তু তবু এখনো প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অংকুরিত হইয়া আকাশে আলোকে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না-থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না, যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী, তাহা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে

জানিতে হয়। জগতের মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতে চাই— কিন্তু যখন দেখি, কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি— কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

তখন আরও একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে-সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার সুগোচর, যাহারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্তি দিতেছে না, তাহাকে কেবলই আমার চেতনার অন্তরালবর্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে-মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যাহা মানব সমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে— অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়— এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর-সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী, তাঁহার পদতলগত। তিনি জানেন— সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের ইহা না হইলেই নয়; অন্নবস্ত্র-ধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা খাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই— মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে-জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে-জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়— যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার বহুপূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা— তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ— পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে— তাহা অধিকাংশস্থলেই পাইয়াও না-পাওয়া, এবং অবশিষ্টস্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন—

আবিরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই

আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারই কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা চোখ খুলি, তখন সূর্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই আমরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে— আমরা যে কী চাই, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড়ো বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে— এই সুমহৎ আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে, অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই, কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে— আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টা সম্বন্ধে আরও বেশি করিয়াই খাটে।

যেমন দেশহিতৈষা। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমাদের আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য, পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে, সার্থকতালাভের ইচ্ছাকে প্রবল-বেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে— এমন লোলুপভাবে, এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ— পথ নহে— ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী; বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে— 'বিনিপাত!' বলা কঠিন। প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

আষাঢ় ১৩১১

ধর্মপ্রচার

'এসো আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনই পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সদুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা

যায় না, বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবন্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে-নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অন্য উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে, গৃহসজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে— কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা মনে করি, দল বাঁধিলেই বুঝি ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অনুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব চেয়ে প্রধান— কী করিব, কে করিবে, সেটা বড়ো-একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে— তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না— সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; যাঁহাদের অভ্যুদয়, বসন্তের ন্যায়, অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণ-সমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন— অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গন্ধে রূপে সজীব সরস প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্তবাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি— কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

এইরূপে ধর্মও যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্ত অসাড়তায়, নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্ম-প্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের বিশেষ স্থানের বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির

সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না, ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে-তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কি না; যদি করে, তবে ধর্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃন্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে— পাছে ধর্ম-সীমানার মধ্যে মানুষ আপন হাস্য, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়— বাকি সমস্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন-কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না— সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত— তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটো-বড়ো, অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শ-দ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে— তাহা পলিটিক্‌স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে, কাব্য-কলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে, যাহা অধর্ম, তাহাই অনুপযোগী ছিল - ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরম-সাধনা, তখন ব্রহ্মচর্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায়, সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। য়ুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে, তাহার সমাজে, তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই য়ুরোপ দেশজয় করে, ঐশ্বর্য লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবাকার্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিদ্ধকাম

হইয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পাবলিক-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে তাহারা রণজয়ের চর্চা করিয়া লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এককালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, তখন সমাজের সর্বত্রই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রিলিজন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনোই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্মপালন তখন সংকুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অনুকূল ছিল—এবং যে ঋষিরা লব্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা বলিয়াছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ধর্মকে যে আমরা শৌখিনের ধর্ম করিয়া তুলিব; আমরা যে মনে করিব, অজস্র ভোগবিলাসের একপার্শ্বে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না; আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্মকে যেটুকু পরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অনুবর্তন করিয়া অগত্যা সেটুকু পরিমাণ ধর্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আসবাবের সঙ্গে ভারতের সুমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা-কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—ইহা কাজের কথা—ইহা কাল্পনিক কিছু নহে—ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণ দ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি—তাঁহারা বলিয়াছেন—

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

এই যে ব্রহ্মলোক— অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে— ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা-কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপনরহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ।

ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা, এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই-যে ব্রহ্ম, ইঁহার উপাসনাই তপস্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি

সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষ্যার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না, বৈষয়িকতার বন্ধন ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের প্রলোভন-পাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না, এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কতদূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি।

আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না— তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম, অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি। 'সর্বভূতান্তরাত্মা' ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়— কারণ, মানবসমাজের উত্তরোত্তরবিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্ম দ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি প্রীতি ও কর্ম-দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ

করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানবসংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক, কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা—সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

এ কথা সকলেই জানেন, অনেক সময়ে মানুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে, তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয়, সেই রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজ-রচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর-কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে, সে কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যে ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয়, আমরা সেই ভাবেই ধর্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি'—'হে ভগবন, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?' ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন—'স্বে মহিম্নি'—'আপন মহিমাতে।' তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে—আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

ফাল্গুন ১৩১০

বর্ষশেষ

পুরাতন বর্ষের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে কয়-বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায়যাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধ্বনি এই নির্বাণালোকে নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোনো চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরন্তন, অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক করো—আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলই যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক, মধুময় হউক, তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়ামাত্র না পড়ুক। আজ বর্ষাবসানের অবসানদিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক। রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক। সূর্য মধুমান হউক।

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লীঝংকারসুপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

যে বিষাদ ধ্যানের পূর্বাভাস, যে শান্তি মঙ্গলকর্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুরু তাহাই আজিকার আসন্ন রজনীর অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বলগৃহ-প্রত্যাগত শ্রান্ত বালকের মতো অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক।

পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে এবং যাইতেছে—কিছুই স্থির নহে; সকলই চঞ্চল—বর্ষশেষে সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিরকাল স্থির থাকে, যাহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান—গত বর্ষে সেই ধ্রুবের কি কোনো পরিচয় পাই নাই—জীবনে কি তাঁহার কোনো লক্ষণ চিহ্নিত হয় নাই? সকলই কি কেবল আসিয়াছে এবং গিয়াছে? আজ স্তব্ধভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই, হে নিস্তব্ধ, তাহা তোমার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যে তারা নিবিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত—আমি যাহার লয় দেখিতেছি, তোমার নিকট হইতে তাহা কোনোকালেই চ্যুত হইতে পারে না। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্ত হইয়া তোমার মধ্যে নিখিলের সেই স্থিরত্ব অনুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে অবসানকে বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভুলিয়া যাই। গত বৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোনো প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করজোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারই। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের, তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে, আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদরণ্যের মধ্যে আমিও হারাই নাই, সেও হারায় নাই—তোমার মধ্যে অতি নিকটে অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোনো চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্যের সহিত তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়া ক্ষত উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাভূত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় কৃপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধনগুলিকে অপূর্বভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে সহসা আমার ললাটে স্থাপনপূর্বক আমাকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিবে এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

যে-কোনো ক্ষতি, যে-কোনো অন্যায়, যে-কোনো অবমাননা বিগত বৎসর আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক, কার্যে যে-কোনো বাধা, প্রণয়ে যে-কোনো আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে-কোনো প্রতিকূলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক্—তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশিস-হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব স্মিত-মুখে তাহার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্য কী লইয়া আসিয়াছিল সেদিন তাহা আমাকে জানায় নাই—আমাকে কী যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার সুখদুঃখের দূতগুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কী সঞ্চিত করিয়া গেল সে সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম আছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না—একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্য আগে হইতেই অদ্য সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছি।

এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত সহ্য করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

১৩০৮ [বর্ষশেষ]

নববর্ষ

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া—

অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি—

দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম—তুমি আনন্দিত হও, তুমি বরলাভ করো।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ আমরা নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই-যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য। এই-যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য। এই-যে গীতগন্ধবর্ণ-স্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য। অদ্যকার প্রভাতে এই-যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব; এই-যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। এই-যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহামান্বিত জগতের অদ্যকার নববর্ষদিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশ-তলে আসীন হইবার গৌরব, তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন।

আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত, তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত, তাই সূর্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত, তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত, তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত, তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহতারকার সহিত লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত—তাহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।

তাঁহার প্রতিনিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতিমুহূর্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি—আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি, নাই পারিলাম—আমাদের বোধশক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি, এক মুহূর্ত সর্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়—যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

তবে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারি দিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা-কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড়ো হইয়া উঠে—তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে—সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এই-সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও; প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত করো; অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—অহংকারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা হইতে আমাকে মুক্ত করো; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও—আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্তকাল অবসর দিতেছে না; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান করো, সেই আনন্দই অমৃতলোক।

আজিকার নববর্ষদিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলিতেছি—

আবিরাবীর্ম এধি।
হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও।

অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব, জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়—তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যে নিখিল ভুবন পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি এ কথা মনে থাকে না—তোমার সমস্ত জগতের একসঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যতদিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর-একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাস-সূত্রের বন্ধন না হয়—একটা বৎসরের সহিত আর-একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁহারই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোনো সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের ন্যায় তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই—তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি দল দিনে দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। অদ্য বৎসরের অনুদ্ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্যে সৌগন্ধ্যে শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব। তাহা কখনোই অসাধ্য নহে—সে শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—

নাত্মানমবমন্যেত।
নিজেকে অপমান অবজ্ঞা করিয়ো না।

ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।

আপনাকে যে ব্যক্তি দীন বলিয়া অবমান করে তাহার কখনোই শোভন ঐশ্বর্য লাভ হয় না।

ধর্মের যে আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রহ্মের জ্যোতি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য, অসাধ্য নহে, তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে; নিজেকে জাগ্রত রাখিবার শক্তি আমাদের আছে—এবং জাগ্রত থাকিলে অন্যায় অসত্য হিংসা ঈর্ষা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ করিতে পারি, হীনতা পরিহার করিতে পারি, আমরা

প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি—এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতায় সেই শক্তিকে অবিশ্বাস করি বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে পারি না। সেই শক্তি আমাদিগকে কী ভূমানন্দে, কী চরম সার্থকতায় লইয়া যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে আমরা স্বার্থে এবং ব্যর্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি অর্থলাভেই আমাদের চরম সুখ, বাসনা তৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন্দ, ইচ্ছার বাধা মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে-শক্তি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একাগ্রধারায় ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম সহজ হয়, সুখদুঃখ সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ষার স্রোতের মতো অনায়াসেই বহন করিয়া লইয়া যায়; দুঃখশোক বিপদ-আপদ বাধাবিঘ্ন, তাহার পথের সম্মুখে শরবনের মতো মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। কেবল, চারি দিকে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে; প্রত্যেক কাজের আশানৈরাশ্য-লাভক্ষতির সমস্ত ঋণ নিজেকে শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে তেমনি ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার চিত্ত একাগ্রভাবে ধাবমান, তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং কোনো বোঝা তাঁহার স্কন্ধকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চারি দিক হইতে আহ্বান করি। ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গলশঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি—সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহংকার হইতে, স্বার্থ হইতে, বিলাস হইতে, প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে—তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অদ্য নববর্ষের প্রভাতে তোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য পুরোহিত হইয়া নিঃশব্দে আমাদের আলোকের অভিষেক সম্পন্ন করিল। আমাদের ললাটে আলোক স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দুই চক্ষু আলোকে ধৌত হইয়াছে। আমাদের পথ আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। আমাদের সদ্যোজাগ্রত হৃদয় ব্রতগ্রহণের জন্য তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে শরীরকে অদ্য তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাখিয়া তোমার কর্মে নিযুক্ত করি। যে মস্তকে তোমার প্রভাতকিরণ বর্ষিত হইল সে মস্তককে ভয় লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণত করি। তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যুষে যে হৃদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল, সে যেন আনন্দে পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণকর্মে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারে, আনন্দে দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে দুঃখকে মহীয়ান্ করিতে পারে এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতরূপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি যেন বিস্মৃত না হই। প্রতিদিনের প্রাতঃসূর্য যেন আমাদিগকে লজ্জিত না দেখে; তাহার নির্মল আলোক আমাদের নির্মলতার, তাহার তেজ আমাদের তেজের সাক্ষী হইয়া যায়—এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্মল অর্ঘ্যের ন্যায় তাহার রক্তিম স্বর্ণথালিতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে। হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়তকাল তোমার যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব, সূর্যাস্ত প্রতিসন্ধ্যায় আমার নিকট রমণীয়, যে আনন্দে অজ্ঞাত ভুবন আমার আত্মীয়, অগণ্য নক্ষত্র আমার সুপ্তরাত্রির মণিমাল্য, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহুলোকের প্রিয় পরিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী, যে আনন্দে দুঃখ নৈরাশ্য বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমাত্র

নিরর্থক নহে— আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে, পাপের লজ্জায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া পথের পঙ্কে যদৃচ্ছা লুণ্ঠিত হওয়াকেই আমার সুখ আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি। জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিশ্বাস, এই কথা স্মরণে রাখিয়া জীবনধারণের যে পরম পবিত্র গৌরব তাহার অধিকারী হই, অস্তিত্বে যে অপার অজ্ঞেয় রহস্য তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই— এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিয়া ধ্যান করি—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

বিশ্বসবিতা এই-সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন— তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন— তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি— তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতন-স্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

বৈশাখ ১৩০৯

উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে-উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই-সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখিরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে— আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্তিমান উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্বশস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে— সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না— যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না— যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলির মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে; সেদিন তো আমরা জড়ের মতো উদ্ভিদের মতো সাধারণ জন্তুর মতো— সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না— সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট— সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না— সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না— সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী— কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি— আজ আলোক জ্বলিয়াছে, সংগীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে— আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে— আজ আমরা কেহ একাকী নহি— আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক— আজ অতীত সহস্র বৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে— আজ অনাগত সহস্রবৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্যশক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্ধ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্মী কর্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে? জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সেই শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়। প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি মানুষের উদ্যম মানুষের উদ্‌যোগ রহিয়াছে— আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে— গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে— কোমল ত্বক এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন— তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে এ কী জোয়ার আসিয়াছে— সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া অহর্নিশি অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে কোন্ অনির্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। যাহাকে জানিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কী প্রয়োজন। যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়। যাহার কর্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন-কি, প্রাণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই। আশ্চর্য। ইহাই আশ্চর্য। আনন্দ। ইহাই আনন্দ। যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দ-সংগীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।

এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই-সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে। মানুষ এই-যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা কোনো নিত্য-নৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়, যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর—মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতি-দিনের ঘটনা, বিপদ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে মস্তক তুলিয়া এ কী কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্র-শীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

বহুসহস্র বৎসর পূর্বের উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা। অন্তরতর এই যে আত্মা, ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।

সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-নিকটের অন্তরতর তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে এক মুহূর্তে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি—স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি—পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির

অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেযং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না—এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য—ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্তে হীনপ্রভা করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই-সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই-সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি—আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্প-পর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের

মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসংঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই-সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই—সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মতো দীনহীন জগতে আর কে থাকিত। সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন বস্ত্র আবাস ভাষা জ্ঞান ধর্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়া সে যে একমুহূর্তে ধন্য হইয়াছে। তাহার জন্ম উপলক্ষে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব। অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে, ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমংগল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানব-সমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে—এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে—তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা এক-একদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এতকালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনীমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারও স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর খাদ্য প্রচুরতর আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে—কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা আমাদের দীনতা আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে এই গৃহসজ্জায় এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্তমঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্নমুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো। আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্‌বোধিত করো, প্রতিদিনের নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা হইতে আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার করো। যে কঠোরতায়

যে উদ্যমে যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি। আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব যে প্রেমের গৌরব যে মঙ্গলের গৌরব যে কঠিনবীর্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল— যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়-বাণী-অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খ নির্ঘোষের মতো আজ না শুনিতে পাই— শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌বিন্যাস— তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই-সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই-সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও— যেখানে ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন যেখানে তোমার সর্বত্যাগী সেবক কর্তব্যের কঠিন পথে রিক্ত হস্তে ধাবমান হইয়াছেন— যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য। কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য, সেইখানেই তুমি। দূর করো, দূর করো এই-সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, এই-সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই-সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই-সমস্ত অপবিত্র আয়োজন— মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদীচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজ-নিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও। সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভু।

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

মাঘ ১৩১১

দুঃখ

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনি আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনি, এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহ-বা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি— কেহ-বা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া জানি— কিন্তু তাহাতে দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একেবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে

বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই-সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই-যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর-একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর-একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না—এই-যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই-সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়।

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারের আপনপরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা-কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কী বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমন-কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার

আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—'মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ'—কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, কশাহত কালোঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে; তার পর সেই জলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশেহারা হইয়া আসিয়া পড়িল, সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই-সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে, ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্র রূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া। এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড়ো রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে? না, পরিবেশনের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব হোক হোক কঠিন হোক কিন্তু ইহাকে ভরপুর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইয়া উঠুক?

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই—হঠাৎ কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই—বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই, সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই।

যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব।

ইহা কি তর্কের বিষয়? ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে, আরামকে

নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ; দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা-কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে— সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের—কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনই পূর্ণতার মূল্য আছে— তাহাই দুঃখ· সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ মুক্তি ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন—নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কী করিয়া। এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার বর্ষণ করিবার প্রবাহিত করিবার এই-যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্যে যোগ— এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্যনক্ষত্র-খচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি; সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়তো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি কত রাজ্য কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষমারী অন্যায় অত্যাচার তাহার

সহায়; যেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধর-মূর্তিতে সুতীক্ষ্ম লাঙল দিয়া সে মানব-হৃদয়কে বারংবার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন, তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জিত বলিতে পারি না, সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই—ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎ সংসারে আমাদের সমস্ত দাবি চলিয়া যায় আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না; আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব—মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এতবড়ো অভাব আর-কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-একদিক দিয়া বলা হইয়াছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে।

আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এতবড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—দুঃখকে অপারিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খৃস্টানধর্মের মর্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে-মূর্তিকে বাহ্যত কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহার-রূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি, সংসার সুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সকরুণ বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই-সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারীগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের, মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই—

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।

তুমিই—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ।

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎ-বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ, সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, হে বিষ্ণু, তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মতো সংকুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি—তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি—তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বল-ভাবে নিজের আরামের নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না—তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই-যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে—

আবিরাবীর্ম এধি।
হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও। এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে মানুষের কর্মে মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন—

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।
হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে। যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে-অপমানে দারিদ্র্যে-দুর্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত

শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো। জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন একমুহূর্তে জাগাইয়া তুলিবে তখন, হে রুদ্র, সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

ফাল্গুন ১৩১৪

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশ দিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল অনন্ত কোলাহলের মর্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কী উপায়ে? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতিক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া

সুদূরেতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতিক্ষুদ্র ব্যক্তির অতিক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎ চরাচর বিভীষিকাময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কী করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলাকেই বড়ো করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানা দিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে; আমাদের মনকে তাহারা একবার এ-পথে একবার ও-পথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্ব-লাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচলপ্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায়, তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সেই-ই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্টপরিমাণ চলাকে যথেষ্টপরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই-সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়--সে জানে ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী। সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবং। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিল-জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোটো হতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলি-কণাটুকুও লক্ষযোজনদূরবর্তী সূর্যচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে নাড়ীর যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবর রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত।

সেই রক্ষণী শক্তি সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ লাভক্ষতি সকলেরই মধ্যেই শিবং শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ-সকল ভার এক মুহূর্ত বহন করিত কে। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধবন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল-স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মতো নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ সকল সম্বন্ধ সকল কর্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্ম-সমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি—শুভকর্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ-ক্ষোভবিক্ষোভের ঊর্ধ্বে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনই জগতের সকল কর্মের সকল উত্থান-পতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক করিয়া বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা তো চিন্তা করিতে পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তো একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতিমুহূর্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন তো একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকেই, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথকরূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের

দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাঁধিয়া যায়— খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে; কারণ মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করেনা; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই হয় অভাবের, নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে।

কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই; নিজের স্বার্থের দিকে যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্য স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখো।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্রশক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত কত ভয় কত সংশয় কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং, তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই-সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে স্থলে আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে নিয়মিত করিয়া অনাদিঅনন্ত কাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য— শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালোমন্দ যত পাপপুণ্য যত আঘাত-প্রতিঘাত। শান্তি যেমন শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়, তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎপ্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসংকুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসংকুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য— প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ক হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তার পরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়।

কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পরিপূর্ণ; কোথাও সে আর অসংগত অসমাপ্ত অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন্, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুদ্ধিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও আমাদের দুঃখের মধ্যেও আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া, হে অন্তর্যামিন্, আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ করো যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পৌষ ১৩১৩

স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল— দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই।

স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কী না লড়াই করিয়া থাকে।

নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চায় না। ইহাতে যেখানে বাধা পায় সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে ক্রুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-সকল মালমসলা যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে; আমাদের ইচ্ছামত কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা আপস করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছু পরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্তু এটা দায়ে পড়িয়া করা—ইহাতে সুখ নাই। একেবারে যে সুখ নাই, তাহা নহে। বাধাকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনের অনুগত করিয়া আনিতে যে বুদ্ধি ও যে শক্তি খাটে, তাহাতেই সুখ আছে। অর্থাৎ কেবল পাইবার সুখ নয়, খাটাইবার সুখ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জোর স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অনুভব করা যায়—বাধা না পাইলে তাহা করা যাইত না। এইরূপে

যে অহংকারের উত্তেজনা জন্মে, তাহাতে আমাদের জিতিবার ইচ্ছা প্রতিযোগিতার চেষ্টা বাড়িয়া উঠে। পাথরের বাধা পাইলে ঝরনার জল যেমন ফেনাইয়া ডিঙাইয়া উঠিতে চায়, তেমনি পরস্পরের বাধায় আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

যাই হোক, ইহা লড়াই। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে শক্তিতে শক্তিতে চেষ্টায় চেষ্টায় লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাগ গায়ের জোরেই খাটাইত, ভাঙিয়া-চুরিয়া কাজ-উদ্ধারের চেষ্টা করিত। ইহাতে যাহাকে চাই, তাহাকেও ছারখার করা হইত; যে চায়, সেও ছারখার হইত, অপব্যয়ের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বুদ্ধি আসিয়া কর্মকৌশলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেদন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। এ কাজটা ইচ্ছার অন্ধতা বা অধৈর্যের দ্বারা হইবার জো নাই; শান্ত হইয়া সংযত হইয়া শিক্ষিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এখানে জিতিবার চেষ্টা নিজের সমস্ত অপব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের বলকে গোপন করিয়া বলী হইয়াছে। ঝরনা যেমন উপত্যকায় পড়িয়া কতকটা বেগসংবরণ করিয়া প্রশস্ত হইয়া উঠে, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের বেগ তেমনি বাহুবল ছাড়িয়া বিজ্ঞানে আসিয়া আপনার উগ্রতা ছাড়িয়া উদারতা লাভ করে।

ইহা আপনিই হয়। জোর কেবল নিজেকেই জানে, অন্যকে মানিতে চায় না। কিন্তু বুদ্ধি কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া কাজ করিতে পারে না। অন্যের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিতে হয়— অন্যকে সে যতই বেশি করিয়া বুঝিতে পারিবে, ততই নিজের কাজ উদ্ধার করিতে পারিবে, অন্যকে বুঝিতে গেলে, অন্যের দরজায় ঢুকিতে গেলে নিজেকে অন্যের নিয়মের অনুগত করিতেই হয়। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা জয়ী হইতে গিয়াই নিজেকে পরাধীন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-পর্যন্ত কেবল প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের জয়ী হইবার চেষ্টাই দেখা গেল। ডারউয়িনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব এই রণভূমিতে লড়াইয়ের তত্ত্ব— এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না, সকলেই সকলের চেয়ে বড়ো হইতে চায়।

কিন্তু ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিৎরা দেখাইতেছেন যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা, নিজেকে টেঁকাইয়া রাখিবার চেষ্টাই প্রাণিসমাজের একমাত্র চেষ্টা নয়। দল বাঁধিবার, পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অল্প প্রবল নহে; বস্তুত নিজের বাসনাকে খর্ব করিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইয়াছে।

তবেই দেখিতেছি এক দিকে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি এবং অন্য দিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অহংকার এবং প্রেম, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকে একসঙ্গে গড়িয়া তুলিতেছে।

স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতালাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব, ইহা হইলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে। অর্জন করিয়া আমার পুষ্টি হইবে এবং বর্জন করিয়া আমার আনন্দ হইবে, জগতের মধ্যে এই দুই বিপরীত নীতির মিলন দেখা যাইতেছে। ফলত, নিজেকে যদি পূর্ণ করিয়া না সঞ্চিত করি, তবে নিজেকে পূর্ণরূপে দান করিব কী করিয়া। সে কতটুকু দান হইবে। যতবড়ো অহংকার, তাহা বিসর্জন করিয়া ততবড়ো প্রেম।

এই-যে আমি, অতিক্ষুদ্র আমি, এতবড়ো জগতের মাঝখানেও সেই আমি স্বতন্ত্র। চারি দিকে কত তেজ কত বেগ কত বস্তু কত ভার, তাহার আর সীমা নাই, কিন্তু আমার অহংকারকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারে নাই, আমি এতটুকু হইলেও স্বতন্ত্র। আমার যে অহংকার সকলের মধ্যেও ক্ষুদ্র আমাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, এই অহংকার যে ঈশ্বরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে দিয়া ফেলিলে তবেই যে আনন্দের চূড়ান্ত। ইহাকে জাগাইবার সমস্ত দুঃসহ দুঃখের তবেই যে অবসান। ভগবানের এই ভোগের সামগ্রীটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে কে।

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ববর্তী অবস্থায় যত-কিছু দ্বন্দ্ব।

তখনই এক দিকে স্বার্থ, আর-এক দিকে প্রেম; এক দিকে প্রবৃত্তি, আর-এক দিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায়, এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শরক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল। যাহা এক দিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহংকারকে এক সৌন্দর্যের পরিণয়সূত্রে বাঁধিয়া দেয়, তাহাই মঙ্গল। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইয়া তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়। মঙ্গল সেই শক্তি ও প্রেমের মাঝখানে থাকিয়া প্রবল অর্জনকে একান্ত বিসর্জনের দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবস্থাতেই মঙ্গলের রশ্মি লাগিয়া মানবসংসারে সৌন্দর্য প্রাতঃসন্ধ্যার মেঘের মতো বিচিত্র হইয়া উঠে।

নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের যেখানে সংঘাত, সেখানে মঙ্গলকে রক্ষা করা বড়ো সুন্দর এবং বড়ো কঠিন। কবিত্ব যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর, এবং কবিত্ব যেমন কঠিন তেমনি কঠিন।

কবি যে-ভাষায় কবিত্বপ্রকাশ করিতে চায়, সে-ভাষা তো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে-ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে-ভাবটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাশ মানে না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যদি সেই দ্বন্দ্বটা কেবল দ্বন্দ্ব-আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে, তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে, বলে, ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেও তাহা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না। যে-কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্যরক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্য হন। যেটা বলিবার কথা তাহা পুরা বলা কঠিন, ভাষার বাধাবশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না— কিন্তু তবু সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে সৌন্দর্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।

তেমনি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি; সে সংসার তো আমার নিজের হাতে গড়া নয়; সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত, তেমন আয়োজনটি চারি দিকে নাই; সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারো জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলই চোখে পড়িতে থাকে; সে কেবলই বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য। সংসারের প্রতিঘাতে তাঁহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্যবিকাশের যে ক্ষতি হয়, মঙ্গল তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুত দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত হইয়া উঠিবার অবকাশ দেয়; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপূরণের প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেখা যাইতেছে, স্বাতন্ত্র্য আপনাকে সফলতা দিবার জন্যই আপনারই খর্বতা স্বীকার করিতে থাকে; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌঁছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে, সেখানে সে বিনাশের দিকে চলিতেছে। অতিবৃদ্ধিদ্বারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে; কিছুদিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে, তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের দুর্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গলসোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়।

পৌষ ১৩১৩

আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিলেই পশুপাখির শেখা সম্পূর্ণ হয়; সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু সামাজিক জীব বলিলেই মানুষের সব কথা ফুরায় না। মানুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহারা মানুষকে সেইভাবে দেখিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে,

আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো।

আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মানুষের চরমসিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নীচের ধাপ বরাবর উপরের ধাপেরই অনুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে শুদ্ধমাত্র জীবলীলা সমাজধর্মের অনুবর্তী। ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি—কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিমপ্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন-কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।

কিন্তু মানুষের সত্যকে যাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথায়, মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরমলক্ষ্য—জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে, সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে—কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।

আমরা প্রাচীন সংহিতায় ছাত্রশিক্ষার যে আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা কবে হইতে এবং কতদূর পর্যন্ত দেশে চলিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিচার করিতে আমি অক্ষম। অন্তত এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন তাঁহাদের মনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল; তাঁহারা মানুষকে কী বলিয়া জানিতেন এবং সেই মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কোন্‌ উপায়কে সকলের চেয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

সংসারে কিছুই নিত্য নয়, অতএব সংসার অসার অপবিত্র এবং তাহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়, এইরূপ বৈরাগ্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা য়ুরোপে সাধুগণ মধ্যযুগে প্রচার করিতেন। তখন সন্ন্যাসীদলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। য়ুরোপের এখনকার ভাবখানা এই যে, সংসারটা কিছুই নয় বলিয়া মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দেবাসুরের ঝগড়া বাধাইয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয়। সংসারের হিতসাধন করাই সংসারীর জীবনের শেষ লক্ষ্য—ইহাই ধর্মনীতি। এই ধর্ম-নীতিকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিতে গেলে সংসারকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। এই সংসারক্ষেত্রে জীবনের শেষদণ্ড পর্যন্ত পুরাদমে কাজ করিতে পারাই বীরত্ব—লাগাম-জোতা অবস্থাতেই মরা অর্থাৎ কাজে বিশ্রাম না দিয়াই জীবন শেষ করা ইংরেজের কাছে গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

সংসার যে অনিত্য এ কথা ভুলিয়া, মৃত্যু যে নিশ্চিত এ কথা মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া, সংসারের সঙ্গে চিরন্তন-সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয়জাতি একটা বিশেষ বললাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহারা morbid অর্থাৎ রুগ্‌ণ অবস্থা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্ররা এমন করিয়া মানুষ

হইবে, যাহাতে তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রাণপণবলে সংসারের কর্মক্ষেত্রে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে; বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা জেতে, তাহারাই পৃথিবীতে টিঁকিয়া যায়। এক দিকে 'চাইই চাই, নহিলেই নয়' মনের এই গৃধ্নু ভাবকে খুব সতেজ রাখিবার জন্য ইহাদের চেষ্টা, অপর দিকে মুঠাটাও ইহারা খুব শক্ত করিতে থাকে। আটঘাট বাঁধিয়া রশারশি কষিয়া দশ আঙুল দিয়া ইহারা আঁটিয়া ধরিতে জানে। পৃথিবীকে কোনো অংশেই এবং কোনোমতেই ছাড়িব না, ইহাই সবলে বলিতে বলিতে মাটি কামড়াইয়া মরিয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে বীরের মৃত্যু। সব জানিব, সব কাড়িব, সব রাখিব, এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সাধন করিবার শিক্ষাই ইহাদের শিক্ষা।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি,

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।
মৃত্যু যেন চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আছে, এই মনে করিয়া ধর্মাচরণ করিবে।

য়ুরোপের সন্ন্যাসীরাও যে এ কথা বলে নাই, তাহা নহে এবং সংসারীকে ভয় দেখাইবার জন্য মৃত্যুর বিভীষিকাকে তাহারা সাহিত্যে চিত্রে এবং নানাস্থানে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংহিতার মধ্যে যে ভাবটা দেখা যায়, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে।

সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের অন্ত নাই, এমন মনে করিয়া কাজ করিলে কাজ ভালো হয় কি মন্দ হয়, সে পরের কথা—কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সে কথা মিথ্যা। সংসারে আমাদের সমুদয় সম্বন্ধেরই যে অবসান আছে, এতবড়ো সত্য কথা আর কিছুই নাই। প্রয়োজনের খাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাজ করিয়া যায়; সোনার রাজদণ্ডকেই যে-রাজা চরম বলিয়া জানে, তাহারও হাত হইতে চরমে সেই রাজদণ্ড ধুলায় খসিয়া পড়ে; লোকালয়ে প্রতিষ্ঠালাভকেই যে-ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে, সমস্ত জীবনের সমস্ত চেষ্টার শেষে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড়ো বড়ো কীর্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বড়ো বড়ো জাতিকেও উন্নতির নাট্যমঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রঙ্গলীলা সমাধা করিতে হয়। এ-সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তবু ইহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা অসত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা যে-পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি তবে হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয়তো কোনোদিন কোনোদিক দিয়া সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিদ্যালয়ে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু যতদিন বিদ্যালয় আছে, ততদিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয়, তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়—তবেই বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জোর করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিদ্যার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। পথ গম্যস্থান নয়, এ কথা ঠিক—পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আগে পথটাকে ভোগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পেঁৗছিতে পারি। অতএব, ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা—কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিমুখ হওয়াই সাধনা নহে। পথকে যদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপথে তবে সাতগুণ বেশি ঘুর খাইয়া মরিতে হইবে।

জর্মান মহাকবি গায়টে তাঁহার ফাউস্ট নাটকে দেখাইয়াছেন যে-ব্যক্তি মানব-প্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের

ধুলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে. তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি—উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনি সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি, তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না—অন্ত দেখিলে বিধাতাকে ধিক্‌কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি; সেখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিদ্বেষ; সেখানেই কোনো-কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিলোপ।

জীবনটাকে না-হয় যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিদ্যা আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরথী ঘিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরূপ মরিয়াও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি. কিন্তু যুদ্ধে জয় তো তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে, যাহারা ব্যূহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত, সেই কাপুরুষদের বীরের সদ্‌গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই দুয়ের দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন—বিশ্ব-চরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল, এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এই সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মানুষকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে চলিবে না। আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না; এইজন্য তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই; তাহাকে কাঁচা পাড়িয়া আনিয়া তাহার কষিটাকে মাটি করিয়া দিই! গাছকে যদি জ্বালানি কাঠ বলিয়াই দেখি, তবে তাহার ফলফুলপাতার কোনো তাৎপর্যই দেখিতে পাই না। তেমনি মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি, তবে তাহাকে সৈনিক করিয়া তুলিব, তাহাকে যদি জাতীয়সমৃদ্ধিবৃদ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাকে বণিক করিবার একান্ত চেষ্টা করিব—এমনি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার অনুসারে যেটাকেই আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অভিলষিত বলিয়া জানি, মানুষকে তাহারই উপকরণমাত্র বলিয়া দেখিব ও সেই প্রয়োজনসাধনকেই মানুষের সার্থকতা বলিয়া মনে করিব। এমন করিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না, তাহা নহে—কিন্তু সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া শেষকালে অহিত আসিয়া পড়ে—এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকাশে উড়াই তাহা খানিকক্ষণ ঠিক তারার মতোই ভঙ্গি করে, তাহার পরে পুড়িয়া ছাই হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মানুষকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধারণে-প্রচলিত একটি চাণক্যশ্লোকেই দেখা যায়—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোটো নয়। প্রথমে মানুষের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দৈশিক ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্যসম্বন্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইয়াছিল; শাস্ত্রকারগণ মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি। আর যাহাতেই মানুষকে শেষ করিয়া দেখ, তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেখা হয়—তাহাকে citizen করিয়া দেখো, কিন্তু কোথায় আছে city আর কোথায় আছে সে, cityতে তাহার পর্যাপ্তি নহে; তাহাকে patriot করিয়া দেখো, কিন্তু দেশেই তাহার শেষ পাওয়া যায় না, দেশ তো জলবিম্ব; সমস্ত পৃথিবীই বা কী। ভর্তৃহরি, যিনি এক সময়ে রাজা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং।
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্॥
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং।
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্॥

সকলকাম্যফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই না-হয় লাভ করিলে, তাহাতেই বা কী; শত্রুদের মাথার উপরেই না-হয় পা রাখিলে, তাহাতেই বা কী; না-হয় বিভবের বলে বহু সুহৃদ সংগ্রহ করিলে, তাহাতেই বা কী; দেহধারীদের দেহগুলিকে না-হয় কল্পকাল বাঁচাইয়া রাখিলে, তাহাতেই বা কী।

অর্থাৎ এই-সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া ছোটো করিয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা মানুষের আত্মাকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ য়ুরোপের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে—তাঁহারা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত খাটিয়া মরাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন নাই—কর্মকেই তাঁহারা শেষলক্ষ্য না করিয়া কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মুক্তিই যে প্রত্যেক মানুষের একমাত্র শ্রেয়, এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড়ো কম জিনিস নয়—এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল—ততঃ কিম্। এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু স্বাধীন হইলাম মনে করিলেই তো স্বাধীন হওয়া যায় না।—নিয়ম অর্থাৎ অধীনতার ভিতর দিয়া না গেলে স্বাধীন হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যদি বড়ো মনে কর, তবে সৈনিকরূপে অধীন হইতে হইবে, বণিকরূপে অধীন হইতে হইবে। ইংলন্ডে যে কত লক্ষ সৈনিক

আছে, তাহারা কি স্বাধীন? মনুষ্যত্বকে যে তাহারা মানুষমারা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির অন্ধ রসাতলে, কারখানার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যশ্রীর পায়ের তলায় বুকের রক্ত দিয়া আলতা পরাইতেছে। তাহারা কি স্বাধীন? তাহারা তো নির্জীব কলের সজীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। য়ুরোপে স্বাধীনতার ফলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে? Individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি কি অন্যত্র দেখা গিয়াছে?

ইহার উত্তরে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই স্বাতন্ত্র্যে যাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি যতবড়ো লাভের টাকা আনিতে চাও, ততবড়ো মূলধনের টাকা ফেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলই লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেমনি সুদের মতো, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইয়া তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে— আগাগোড়া সমস্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমস্তই স্বাধীনতা, এ কখনও সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল Individualism— ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সে তো কোনো ছোটোখাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতিদিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়মসংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল নিয়মসংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা বড়ো বেশি।

আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে, তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনও নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ, তাহা তো নষ্ট হইতেছেই; য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার পথেও পদে পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্ত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটেঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে, তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃকসম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধা-বাঁধি, অনাবশ্যক আচার-বিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। য়ুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন বাঁধনের অসহ্য ভারের দ্বারাই তাহার পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার পরিমাপ হইবে। এখনি কি ভার অনুভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না? এখনি কি তাহার উপায় ক্রমশ উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে না?

কিন্তু সে তর্ক থাক্; আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই মুক্তির একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার

লাগাম দিয়ে বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন—ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ-লক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।

এইরূপে বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিয়ত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা—সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কর্ম করিয়া শতবৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই; কর্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে-কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে।

এবং

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌।

তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন—তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া

যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন-নির্বাহের গোড়াকার কথা।

ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই— সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

য়ুরোপে মানুষের জীবনের দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা— তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু কাজ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্যস্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase— শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

যাহা হাতে পাওয়া যায়, তাহাতে সুখ নাই, এ কথা কি আমরাও বলি না? আমরাও বলি—

> নিঃস্বো ব্যষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো।
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ॥
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি।
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধিং কো গতঃ॥

এক কথায়, যে যাহা পায়, তাহাতে তাহার আশা মিটে না— যতই বেশি পাও-না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া? পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে, তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্যস্থাপন করি, তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এতবড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এতবড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে, আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক, তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে, সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যু দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইস্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ কথা ঠিক; জীব-সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উন্নতি-অবনতির ঢেউখেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া

আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল?

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলই একটা হইতে আর-একটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই চির-চলমান বহিঃসংসারের দোলায় দুলিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি—আমার পক্ষে একদিন সে-দোলার কাজ ফুরাইলেও কোনোদিন একবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিয়া, আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরের এই অশেষের মধ্যে আমিশুদ্ধ ভাসিয়া গেলে নষ্ট হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পন্থা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে সন্তোষ আছে; বাহিরে দুঃখবেদনার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ধৈর্য আছে; বাহিরে প্রতিকূলতার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ক্ষমা আছে; বাহিরে লোকের সহিত সম্বন্ধভাবের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে প্রেম আছে; বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিন্তু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। এক দিকের অশেষের দ্বারাতেই আর-এক দিকের অখণ্ডতার উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির দ্বারাতেই স্থিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপ বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন, ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিককালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কাজ করিতে চেষ্টা করি। মুষ্টি যখন স্বভাবতই শিথিল হইয়া আসে, তখনো আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর-কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে যখন আমাদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি কানে ধরিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিদ্রোহ, নয় বিষাদ উপস্থিত হয়—তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে-ভঙ্গরূপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে লাগাইতেই পারি না। যে পরিণামগুলি নিশ্চয় পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমস্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদেপদেই সত্যের নিকটে পরাস্ত হইতে থাকি।

কাঁচা আম শক্ত বোঁটা লইয়া ডালকে খুব জোরে আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার অপরিণত আঁটির গায়ে তাহার অপরিণত শাঁস আঁটিয়া লাগিয়া আছে। কিন্তু প্রত্যহ সে যতটুকু পাকিতেছে, ততটুকু পরিমাণে তাহার বোঁটা ঢিলা হইতেছে, তাহার আঁটি শাঁস হইতে আলগা, সমস্ত ফলটা গাছ হইতে পৃথক হইয়া আসিতেছে। ফল যে একদিন গাছের বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার সফলতা—গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে ব্যর্থ। ফলের মতো

আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিও একদিন সংসারের ডাল হইতে সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ডালকে ত্যাগ করিয়া ধূলিসাৎ হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে আমাদের হাত নাই। কিন্তু ভিতরে যেখানে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্ব, যেখানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেখানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এঞ্জিনের বয়লারের গায়ে যে তাপমান যন্ত্রটা আছে, তাহার পারা স্বভাবের নিয়মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সংকেত বুঝিয়া বাড়াইব কি কমাইব, তাহা এঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্মে উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব, তাহা আমাদের হাতে। সেই যথাসময়ে বাড়ানো-কমানোর দ্বারাতেই আমরা সফলতালাভ করি।

পাকা ফলে এক দিকে বোঁটা দুর্বল ও শাঁস আলগা হইতে থাকে বটে, তেমনি অন্য দিকে তাহার আঁটি শক্ত হইয়া নূতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু ভিতরের কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলবান বলিয়া এই বৃদ্ধি এই পরিণতি আমাদের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মানুষ তাহার আয়ুর শেষপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনোমতেই সহজে সংসার হইতে আপন বোঁটা আলগা হইতে দিল না— প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন-কি, মৃত্যুর পরেও সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান রহিবে, ইহা লইয়া জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আধুনিককাল ইহাকে গর্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর-কোনো কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর, শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্রসংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি এক দিকে সাধারণ মানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্য দিকে সে অবসন্নপ্রায় মানবজীবনের সঙ্গে নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ীর বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতিসহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্তলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষপরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়শিক্ষা কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না, তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য। নিয়মসংযমের অভ্যাসদ্বারা এমন একটি বললাভ হইত, যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত নিষ্ঠার সহিত অতিসাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরমসত্য, সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গাছপালায় এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের বাতাসের খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেইরূপ ঘটে। জিহ্বায় খাদ্যসংযোগের উত্তেজনায় আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাকরসের উদ্রেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বশক্তির সহজ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া ইচ্ছা বলিয়া আর-একটা পদার্থ যোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর-একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। খাইবার অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুধু আমাদের আবশ্যকের কাজ নহে, আমাদের খুশির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতি-যন্ত্রের সাধনা বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সুর অনেকদিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সেজন্য বড়ো ভাবিতে হয় না; কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সুরবাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। খাদ্যসম্বন্ধে প্রাণশক্তির আবশ্যক হয়তো ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না—শরীরের আবশ্যকসাধনে সে যে আনন্দ পাইল, সেই আনন্দকে সে আবশ্যকের বাহিরেও টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল—সে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিমুখ রসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রান্ত পাকযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এমনি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের সহিত মনের একতানতা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্যক চেষ্টা, অনাবশ্যক উপকরণ ও শাখাপল্লবায়িত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহই যথেষ্ট দুরূহ, তাহার উপরে ভূরিপরিমাণ অনাবশ্যকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশ্যকের আয়োজনও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়—ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে, তখন কোথাও তাহার আর থামিবার কারণ থাকে না, তখন সে 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে'—কেবল সে চাই-চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনেরো-আনা দুঃখের কারণ ইহাই। অথচ এই ইচ্ছাশক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এইজন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরমলক্ষ্য। গোড়ায় তাহা যদি না করি, তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রেম কলুষিত ও কর্ম বৃথা পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম বিশ্বের সহিত সহজ মিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আত্মম্ভরি ইচ্ছার কৃত্রিম সৃষ্টি-সকলের মধ্যে মরীচিকা-অনুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইজন্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যপালনদ্বারা ইচ্ছাকে তাহার যথাবিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতেই আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানস-প্রকৃতির সুর বাঁধা হইয়া আসিবে। তাহার পরে সেই সুরে তোমার সাধ্যমত ও ইচ্ছামত যে-কোনো রাগিণী বাজাও-না কেন, সত্যের সুরকে মঙ্গলের সুরকে আনন্দের সুরকে আঘাত করিবে না।

এইরূপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মনু বলিয়াছেন—

> ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
> বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযমন করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিত্যশ যেমন করিয়া করা যায়।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান পূর্ণতালাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা

লব্ধ নহে, তাহা পূর্ণসংযম নহে— তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরালমাত্র— তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক।

সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম, বিশেষত মঙ্গলকর্ম করা সহজ ও সুখসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম জগতের কল্যাণের আধার হইয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম মানুষের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহায় হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ যে-কোনো কর্ম করেন, তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমস্ত কর্ম যখন মঙ্গলকর্ম হয়— তাহা যখন ধর্মকর্ম হইয়া উঠে, তখন, সেই কর্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে-বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে-কর্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।

আয়ুর দ্বিতীয় ভাগকে এইরূপে সংসারধর্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের তেজ যখন হ্রাস হইতে থাকিবে, তখন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইল— সেই খবরটা আসিল। শেষ হইল খবর পাইয়া চাকরি-বরখাস্ত হতভাগার মতো নিজেকে দীন বলিয়া দেখিতে হইবে না। আমার সমস্ত গেল, ইহাকেই অনুশোচনার বিষয় করিলে চলিবে না, এখন আরও বড়ো পরিধি-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া সেই দিকে আশার সহিত বলের সহিত মুখ ফিরাইতে হইবে। যাহা গায়ের জোরের, যাহা ইন্দ্রিয়শক্তির, যাহা প্রবৃত্তি-সকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে পিছনে পড়িয়া রহিল— সেখানে যাহা-কিছু ফসল জন্মাইয়াছি, তাহা কাটিয়া মাড়াই করিয়া গোলা বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেষ করিয়া চলিলাম— এবার সন্ধ্যা আসিতেছে— আপিসের কুঠরি ছাড়িয়া বড়ো রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌঁছিলে তো চরমশান্তি নাই। যেখানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটিলাম, সে কিসের জন্য? ঘরের জন্য তো? সেই ঘরই ভূমা— সেই ঘরই আনন্দ— যে আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তাহা যদি না হয়, তবে ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌।

তাই গৃহাশ্রমের কাজ সারিয়া সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া এবার বড়ো রাস্তায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বুক ভরিয়া লইতে হইবে— খোলা আকাশের আলোতে দৃষ্টিকে নিমগ্ন এবং শরীরের সমস্ত রোমকূপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার একদিককার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়ঘরে নাড়ী কাটা পড়িল, এখন অন্য জগতে স্বাধীন সঞ্চরণের অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার পূর্বে কিছুকাল মাতার কাছে-কাছেই থাকে। বিযুক্ত হইয়াও যুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমও সেইরূপ। সংসারের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও বাহিরের দিক হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীয়-আশ্রমধারীর যোগ থাকে। বাহিরের দিক হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের ফলদান করে এবং সংসার হইতে সহায়তা গ্রহণ করে। এই দান-গ্রহণ সংসারীর মতো একান্তভাবে করে না, মুক্তভাবে করে।

অবশেষে আয়ুর চতুর্থভাগে এমন দিন আসে, যখন এই বন্ধনটুকুও ফেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্মুখীন হইতে হয়। মঙ্গলকর্মের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধকে পূর্ণপরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া নানা কর্ম সমাধা করিয়া স্বামীরই কর্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থভাবে স্বীকার করেন; অবশেষে দিন-অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিসগুলি তুলিয়া রাখিয়া, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া, কর্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া নির্মল মিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণ-সম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য নির্জনগৃহে প্রবেশ করেন, সমাপ্তকর্ম পুরুষ সেইরূপ একে একে কাজের জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচাইয়া দিয়া অসীমের সহিত সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত

হইয়া অবশেষে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরূপেই মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য হয়, জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে বৃথা চেষ্টা করে না ও মৃত্যু শত্রুপক্ষের ন্যায় জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক পরাস্ত করে না। জীবনকে আর আমরা যেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড বিক্ষিপ্ত করি, অন্য যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার, লোকহিত বা যে-কোনো বড়ো নাম দিই-না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না—তাহা আমাদিগকে মাঝপথে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলই বাজিতে থাকে—ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্। আর ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসংগীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়। বিদ্রোহ-বিরোধ থাকে না; অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে-সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ-সত্যসম্বন্ধ-ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।

আমি জানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে যে, একটা দেশের সকল লোককেই কি এই আদর্শে গড়িয়া তোলা যায়? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যখন ঘরে আলো জ্বলে, তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জ্বলে? জীবনযাপন-সম্বন্ধে ধর্মসম্বন্ধে যে-দেশের যে-কোনো আদর্শই থাক্-না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটামাত্র জ্বলাকেই সমস্ত দীপের জ্বলা বলে। তেমনি দেশের এক অংশমাত্র যে ভাবকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন, সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকুমাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়—ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মান্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন, তখন সমস্ত আর্যসমাজের মধ্যেই—রাজকার্যে যুদ্ধে বাণিজ্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্মার্চনায়—সর্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল, কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।' সে বাণী চিরদিনের মতোই নীরব হইয়া গেছে এমনিই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে আমাদের এই মৃতসমাজকে এত উপকরণ জোগাইয়া বৃথা সেবা করিয়া মরিতেছি কেন? তবে তো এই মুহূর্তেই আপাদমস্তকে পরজাতির অনুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়—কারণ, পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা অকারণে বহিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সজীবভাবে কিছু-একটা হইয়া উঠার চেষ্টা করা ভালো। কিন্তু এ কথা কখনোই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই দুর্গতি হউক, আমাদের অন্তরতম স্থান এমনভাবে তৈরি হইয়া আছে যে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন পরমলাভ বলিয়া সায় দিতে পারিবে না। এখনও যদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের যন্ত্রে সংসারের সকল চাওয়া সকল পাওয়ার চেয়ে উচ্চতম সপ্তকে একটা বড়ো সুর বাজাইয়া তোলেন, সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনি প্রতিঝংকৃত হইতে থাকে—তাহাকে আমরা ঠেকাইতে পারি না। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতাকে আমরা যতবড়ো কণ্ঠে যতবড়ো করিয়াই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বহির্দ্বারে একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। আমাদের সমাজে আজকাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে

দেশী রোশনচৌকির সঙ্গে সঙ্গে একইকালে গড়ের বাদ্য বাজানো হয় দেখিতে পাই। ইহাতে সংগীত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটা সুরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গণ্ডগোলের ঝঞ্ঝনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রোশনচৌকির বৈরাগ্যগাম্ভীর্যমিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে, আর গড়ের বাদ্য তাহার প্রচণ্ড কাংস্য-কণ্ঠ ও স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্রভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর অন্তরতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে—তাহা আমাদের উৎসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতেছে না। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহার অসংগত ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর-আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে, কিন্তু যে আমাদের অন্তঃপুরের খবর রাখে, সে জানে, সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহ্যাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই, ভাড়া-করা গড়ের বাদ্য একসময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায়, তখনও ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড়ো সুর যাহা শুনিয়াছি, এ সুর যে তাহাকে আঘাত করিতেছে—আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর-পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য নাই, শিষ্টতাশীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না। কর্ণ যেমন তাঁহার কবচকুণ্ডল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে আমরা সেইরূপ একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের কবচ লইয়াই জন্মিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বহুদিনের অধীনতা ও দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—আমাদের সম্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশ্বের মধ্যে লজ্জিত। এখন আমাদের বেশে-ভূষায় আয়োজনে-উপকরণে একটু কোথাও কিছু খাটো পড়িয়া গেলেই আমরা আর মাথা তুলিতে পারি না। সম্মান এখন বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপাধির জন্য খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছি, এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহার অন্ত কোথায়? যে ভদ্রতা আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল, তাহাকে আজ যদি বাহিরে টানিয়া জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, ঘোড়ার হাট এবং গাড়ির কারখানায় ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে বলিব, ব্যস, হইয়াছে, এখন বিশ্রাম করো। আমরা সন্তোষকেই সুখের পূর্ণতা বলিয়া জানিতাম; কারণ, সন্তোষ অন্তরের সামগ্রী—এখন সেই সুখকে যদি হাটে-হাটে ঘাটে-ঘাটে খুঁজিয়া ফিরিতে হয়, তবে কবে

বলিতে পারিব, সুখ পাইয়াছি। এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতি গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে— এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর, তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর যে-সকল পরিণামহীন উত্তেজনা-উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মতো বহির্বিষয়ে পরাধীন-জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

কিন্তু তবু বলিতেছি, এই উপসর্গ এখনো আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনো ইহা বাহিরেই পড়িয়া আছে; এবং বাহিরে আছে বলিয়াই ইহার কলরব এত বেশি—সেইজন্যই ইহার এত আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয়। এখনো এ আমাদের গভীরতর স্বভাবের অনুগত হয় নাই বলিয়াই সন্তরণমূঢ়ের সাঁতারকাটার মতো ইহাকে লইয়া আমাদিগকে এমন উন্মত্তের ন্যায় আস্ফালন করিতে হয়।

কিন্তু একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ কথা বলেন যে, 'অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, অনিত্য ঐশ্বর্যে আমাদের শ্রেয় নহে—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, সকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি আছে, এবং সেই পরিণাম সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা—তাহার নিকটে আর-সমস্তই তুচ্ছ'—তবে আজও এই হাট-বাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে, বলে, 'সত্য, ইহাই সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই।' তখন, ইস্কুলে যে-সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম; কাড়াকাড়ি-মারামারির কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা অত্যন্ত ক্ষীণ-খর্ব হইয়া আসে; তখন লালকুর্তিপরা অক্ষৌহিণী সেনার দম্ভ, উদ্যতমাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধজাহাজের ঔদ্ধত্য আমাদের চিত্তকে আর অভিভূত করে না; আমাদের মর্মস্থলে ভারতবর্ষের বহুযুগের একটি সজলজলদগম্ভীর ওংকারধ্বনি নিত্যজীবনের আদিসুরটিকে জগতের সমস্ত কোলাহলের ঊর্ধ্বে জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না; যদি করি, তবে ইহার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না, যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভান করিতেছে, তাহার উৎকটমূর্তি দেখিয়া সমস্ত মনে-প্রাণে কেবলই পরাস্ত পরাভূত হইতে থাকিব, কেবলই সংকুচিত শঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেড়াইব।

অথচ এ কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেয় বলিতেছি, তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেয়। আমরা অক্ষম বলিয়া ধর্মকে দায়ে পড়িয়া বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিদ্র্য গোপন করিবার একটা কৌশলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা কখনোই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতররূপে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে যেখানেই হউক,

তাহার অকস্মাৎ অবসান অসংগত অসমাপ্ত। এ কথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি, তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে—নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্?

অগ্রহায়ণ ১৩১৩

আনন্দরূপ

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব? সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে।

কিন্তু উপনিষদ্ এ কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন? কোথায়?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান? এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? যাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে 'কোথায়' বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায়?

প্রকাশ কোন্‌খানে? এই যে চারি দিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে ঊর্ধ্বে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই তো প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর তো কোনো কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ-সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ, সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার? এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কই? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না! যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য! সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে-লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না—যুগে-যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে, তিনি ধরা দেন না? তিনিই যে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে? যদি ধরিতেই চাও, তবে বাহু কতদূর বিস্তার করিলে সে-ধরার অন্ত

হইবে? এ যে আশ্চর্য। মানুষজন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছি! এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্যলীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎতন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম—পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারা-সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না—তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পার না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নবজাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও।

আজ প্রভাতের এই মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধভূখণ্ডের নবজাগ্রত সংসারে কর্মের কী তরঙ্গই জাগিয়া উঠিয়াছে! এই-সমস্ত প্রবল প্রয়াস, এই-সমস্ত বিপুল উদ্‌যোগে যত পুঞ্জ-পুঞ্জ সুখ-দুঃখ-বিপৎসম্পদ্‌ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে দূরে-দূরান্তরে হিল্লোলিত-ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের কর্ম-কলরবের সংগীতকে একবার স্তব্ধ হইয়া অধ্যাত্মকর্ণে শ্রবণ করো—তার পরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বলো—সুখে-দুঃখে তাঁহারই আনন্দ, লাভে-ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে-মরণে তাঁহারই আনন্দ—সেই 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন'—ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া তোলো—তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি, আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভয় কোনো সংশয় কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাখিয়ো না; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম করো, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা করো—যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা করো—

সম্পদে সংকটে থাকো কল্যাণে
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে।

নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে আকাশভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না; তেমনি আমাদের ছোটো মনের ছোটো ছোটো বিষাদ-অবসাদ-নৈরাশ্য-নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়—আনন্দরূপমমৃতং আমরা আর দেখিতে পাই না—নিজের কালিমাদ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারি দিকে কেবল ভাঙাচোরা কেবল অসম্পূর্ণতা কেবল অভাব দেখি—কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি

সেই আনন্দ সপ্তকে সপ্তকে বাজিয়া উঠে, যে-আনন্দে জগদ্‌ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাঁহাকেই দেখি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। বধে-বন্ধনে দুঃখে-দারিদ্র্যে অপকারে-অপমানেও তাঁহাকেই দেখি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ— এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্‌। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে-আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ— সেই আনন্দে আমি কাহারো চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই ক্ষতি নাই অসম্মান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন, কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে? এমন কী ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণতা হইবে? তাই আজ আনন্দের দিনে, আজ উৎসবের প্রভাতে আমরা যেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি— এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ— এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একটু অংশ লাভ করিতে পারি, যাহাতে সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনে সর্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি, ভয়কে নয়, দ্বিধাকে নয়, শোককে নয়— তাঁহাকেই স্বীকার করি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যে এই যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সংকুচিত হইয়া দীন হইয়া অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই অবারিত ঐশ্বর্যের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? হাত বাড়াও। বক্ষকে বিস্তৃত করিয়া দাও। দুই হাত ভরিয়া চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া অবাধ আনন্দে সমস্ত গ্রহণ করো। তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি যে সর্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে— তুমি একবার তোমার দুই চোখের সমস্ত জড়তা সমস্ত বিষাদ মুছিয়া ফেলো— তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া চাহিয়া দেখো, তখনই দেখিবে, তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে— সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য, সে কী প্রেম, সে কী অনন্দরূপমমৃতম্‌! যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নাই সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন? ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসী, তোর সম্মুখেই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিয়া পাতিয়া ধর্‌— বলের সহিত বল্‌— 'অল্প নহে, আমার সবই চাই। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। তুমি যতটা দিতেছ, আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্য বড়োটাকে বাদ দিব না, আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি এমন সহজ ধন লইব, যাহা দশ দিক ছাপাইয়া আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্য জগতে কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না। তোমার যে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনায় অবিশ্রাম আনন্দে-অমৃতে বিকাশিত, কোথাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠুক।

যেখানে সমস্তই দেওয়া হইতেছে, সেখানে কেবল পাওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া যেন কাঙালের মতো না ঘুরিয়া বেড়াই। যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি আপনাকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছ, সেখানে চিরজীবন আমার এমন বিভ্রান্তি না ঘটে যে, সর্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখিয়াও না দেখি এবং কেবল শোকদুঃখ শ্রান্তিজরা বিচ্ছেদক্ষতি লইয়া হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মাঘ ১৩১৩

শান্তিনিকেতন

প্রকাশ : ১৯১৬

১৯০৯ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে সতেরোটি খণ্ডে যখন 'শান্তিনিকেতন' প্রকাশিত হয় তখন প্রতিটি রচনা নামাঙ্কিত ছিল। পরে ১৩৪১ এবং ১৩৪২ বঙ্গাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত শিরোনাম-বর্জিত 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে পূর্বের সতেরোটি খণ্ডের সঙ্গে তৎপরবর্তীকালের ধর্ম ব্যাখ্যানগুলি নানা পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়। এই দুই খণ্ড রবীন্দ্রনাথের 'সংশোধন ও নির্বাচন'। গ্রন্থের উনশেষ ব্যাখ্যানটি (আষাঢ়, ১৩১১ তারিখচিহ্নিত) 'ধর্ম' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

বর্তমান সংস্করণে মূলত এই পাঠই অনুসৃত এবং দুই খণ্ড একত্রে মুদ্রিত। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সব তারিখ বা উপলক্ষ পাওয়া গেছে ভাষণ বা রচনার শেষে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়— সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে? সমস্ত দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মতো জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানা দিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে— চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই-সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে! ওরে, 'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!'

দিন যখন নানা কর্ম নানা চিন্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি একটি পাক আমাদের চারি দিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মাঝখানে একটা আবরণ গড়ে তুলতে থাকে, সেই সময়েই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি— 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্রব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয়ে না উঠতে থাকে তা হলে পাকের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে ফেলে; তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না, নিজের চারি দিকের বেষ্টনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি— আর অতীত যে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই থাকে না, এমন-কি, তার প্রতি সংশয় অনুভব করবারও সচেষ্টতা আমাদের চলে যায়। অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজতে থাকে ওরে, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।'

১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে— তার হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি। নিজের অজ্ঞতাসম্বন্ধে অজ্ঞানতার মতো অজ্ঞান আর তো কিছু নেই। ঈশ্বরকে যে জানি নে, তাঁকে যে পাই নি এইটে যখন অনুভবমাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক। আমি বুঝছি নে আমি পাচ্ছি নে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি এই বলে যেন কেঁদে উঠতে পারে। মনের সমস্ত তারে এই গান বেজে উঠুক, 'সংশয়তিমির-মাঝে না হেরি গতি হে।'

আমরা মনে করি যে ব্যক্তি নাস্তিক সেই সংশয়ী, কিন্তু আমরা যেহেতু ঈশ্বরকে স্বীকার করি অতএব আমরা আর সংশয়ী নই। বাস্, এই বলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি— এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে আমাদের মতে না মেলে তাদেরই আমরা পাষণ্ড বলি, নাস্তিক বলি, সংশয়াত্মা বলি। এই নিয়ে সংসারে কত দলাদলি, কত বিবাদ বিরোধ, কত শাসন পীড়ন, তার আর অন্ত নেই। আমাদের দল এবং আমাদের দলের বাহির, এই দুইভাগে মানুষকে বিভক্ত ক'রে আমরা ঈশ্বরের অধিকারকে নিজের দলের বিশেষ সম্পত্তি বলে গণ্য করে আরামে বসে আছি। এ সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই সন্দেহ নেই।

এই ব'লে কেবল কথাটুকুর মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করে আমরা সমস্ত সংসার থেকে তাঁকে নির্বাসিত করে দেখছি। আমরা এমনভাবে গৃহে এবং সমাজে বাস করছি যেন সে গৃহে সে সমাজে ঈশ্বর নেই। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিশ্বজগতের ভিতর দিয়ে এমনভাবে চলে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের কোনো স্থান নেই। আমরা সকালবেলায় আশ্চর্য আলোকের অভ্যুদয়ের মধ্যে জাগ্রত হয়ে সেই অদ্ভুত আবির্ভাবের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই নে, এবং রাত্রিকালে যখন অনিমেষজাগ্রত নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে আমরা নিদ্রার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাই তখন এই আশ্চর্য শয়নাগারের বিপুলমহিমান্বিত অন্ধকার শয্যাতলের

কোনো এক প্রান্তেও সেই বিশ্বজননীর নিস্তব্ধগম্ভীর স্নিগ্ধমূর্তি অনুভব করি নে। এই অনির্বচনীয় অদ্ভুত জগৎকে আমরা নিজের জমিজমা ঘরবাড়ির মধ্যেই সংকীর্ণ করে দেখতে সংকোচ মাত্র বোধ করি নে। আমরা যেন ঈশ্বরের জগতে জন্মাই নি—নিজের ঘরেই জন্মেছি—এখানে 'আমি আমি আমি' ছাড়া আর কোনো কথাই নেই—তবু আমরা বলি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো সংশয় নেই।

গৃহের মধ্যে সংসারের মধ্যে আমরা কোনোদিন এমন করে চলি নে যাতে প্রকাশ পায় যে এই গৃহের গৃহদেবতা তিনি, এই সংসার-রথকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মহাসারথি। আমিই ঘরের কর্তা, আমিই সংসারের সংসারী। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙবামাত্রই সেই চিন্তাই শুরু হয় এবং রাত্রে ঘুম এসে সেই চিন্তাকেই ক্ষণকালের জন্য আবৃত করে। 'আমি'র দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রয়েছে—কত দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসংবাদ! কিন্তু ঈশ্বর কোথায়? কেবল মুখের কথায়! আর কোথাও যে তিলধারণের স্থান নেই।

এই মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে? আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি—ঈশ্বরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়ে দিয়ে তার পরে বাকি সমস্ত জায়গাটা অসংকোচে নিজে জুড়ে বসবার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানে না বলেই এত ভয়ানক। এই স্পর্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা জানি নে, এটাও জানতে দেয় না।

সংশয়ের বেদনা তখনই জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাই নে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চলবে না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্ছি নে। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।

যখন প্রসবের সময় আসন্ন তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ী সম্পূর্ণ ছাড়ছে না অন্য দিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করছে. মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনো কোনো মীমাংসা হয় নি। এই সময়ের বেদনাই জন্মদানের পূর্বসূচনা, এই বেদনার অভাবকেই চিকিৎসক ভয় করেন।

যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার এক দিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বিমুক্ত সত্য অন্য দিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্বান করছে—সে অন্ধকারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অনুভব করছে। সে মনে করছে বুঝি তার এই ব্যাকুলতার কোনো পরিণাম নেই, কেননা সে তো সম্মুখে পরিণামকে দেখতে পাচ্ছে না, সে গর্ভস্থ শিশুর মতো নিজের আবরণকেই চারি দিকে অনুভব করছে।

আসুক সেই অসহ্য বেদনা—সমস্ত প্রকৃতি কাঁদতে থাক্—সে কান্নার অবসান হবে। কিন্তু যে-কান্না বেদনায় জেগে ওঠে নি, ফুটে ওঠে নি, জড়তার শত বেষ্টনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার যে কোনো পরিণাম নেই। সে যে রক্তেমাংসে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েই গেল—তার ভার যে চব্বিশ ঘণ্টা নাড়ীতে নাড়ীতে বহন করে বেড়াতে হবে।

যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে আরাম পাই নে; সেদিন আমরা একমুহূর্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না। আমরা জেনেও জানি নে কখন? যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হয় না। একবার ভেবে দেখো-না এই পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের যে জানি নে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে

কিছুই নয়। সংসারে আমি এমনভাবে চলি যেন এই অগণ্য লোক তাদের সুখদুঃখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে? যারা আমার আত্মীয়স্বজন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণ্য জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি লোকই আমার সংসার। কেননা এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা যে সত্য, আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই প্রেম যাদের মধ্যে প্রসারিত হতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি—তাই তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মতো সত্য।

ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয়, কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমনভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এইজন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন তাঁকেই সকলের চেয়ে পাই নে—তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পেরোতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না—এতবড়ো প্রকাণ্ড না-থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে। এই না-থাকার ভারে আমরা প্রতি-মুহূর্তেই মরছি। এই না-থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না-থাকারই শুষ্কতায় জগতের লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই, এতবড়ো ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে রাত্রে এইজন্যেই যে গেলুম। সব জানি সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হত তা হলে তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় অভাব পূরণের সন্ধানে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কী অভাব হচ্ছে? যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে একমুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন, 'তুমি এসেছ!'

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম—মায়ের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্তু যেন নেই এমনিভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কী হচ্ছে। তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেশন করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল এটুকু হচ্ছে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না, তুমি এসেছ! অন্ন

জল ধন জন সমস্তই আছে কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায়, তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জগতে কোনো জিনিসের কাছে, কোনো মানুষের কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরম আত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ আনাগোনা করি বটে কিন্তু দৈবাৎ একমুহূর্ত তার কাছে গিয়ে পেঁছোই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি কিন্তু এর মধ্যে হয়তো সকলের চেয়ে কেবল একদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিসের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসছে খেলছে গল্প-গুজব করছে, নানা লোকের সঙ্গে দেনাপাওনা আনাগোনা চলছে, তারা ভাবছে এই তো আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি তা জানতুম না। আমি ভাবতুম দেখা বুঝি এই রকমই— সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোনো সঙ্গীর চশমা নিয়ে চোখে পরেই দেখি, সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তখন মনে হল আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি, সমস্তকে এই যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলুম— অথচ এতদিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াচ্ছি তা জানতুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত তুলে ধরে বলে, তুমি এসেছ! এই যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করছে, কিন্তু আমাদের হাত ধরছে না, অনন্দিত হয়ে বলছে না, তুমি এসেছ! যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম তা হলে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম, তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়ো। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলছে না, তুমি এসেছ! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ডিমের মধ্যে পক্ষীশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না, এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম— জীবচৈতন্যের থেকে বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে— তখন মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা, কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমরা জানি নে, কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাই নে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না; আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র

প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখি নে— ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ, বা প্রয়োজনের মানুষ, বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি— সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়—সেইখানেই দরজা রুদ্ধ—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে—তকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বলত, তুমি এসেছ!

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। এই সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে—সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছোলে সে দ্বারে এসে ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং যদ্‌বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান, সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না—সে আর সমস্তই দেখে কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার-মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়-ভাবে তো এটা হবে না। চেতনভবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে—একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে— মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায়, আর-কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না, তখনই পাপ জিনিসটা কী তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমাদের চৈতন্য যখন বরফগলা ঝরনার মতো ছুটে বেরোতে চায় তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে না—তাকে ক্ষয় করবার জন্যে, তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পীড়িত চৈতন্য পাপের চারি দিকে ফেনিল হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত আমাদের চিত্ত যখন চলতে থাকে তখন সে তার গতির সংঘাতেই ছোটো নুড়িটিকেও অনুভব করে, কিছুই তার আর অগোচর থাকে না।

তার পূর্বে পাপ পুণ্যকে আমরা সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধার জিনিস বলেই জানি; নিজেকে এমন করে গড়ি যাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, যাতে ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। সেই-

টুকুতে কৃতকার্য হলেই আমাদের মনে আর কোনো সংকোচ থাকে না; আমরা মনে করি, চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হল।

এমন সময় একদিন যখন আত্মা জেগে ওঠে, জগতের মধ্যে সে আত্মাকে খোঁজে, তখন সে দেখতে পায় যে শুধু ভদ্রতার কাজ নয়, শুধু সমাজ রক্ষা নয়—প্রয়োজন আরও বড়ো, বাধা আরও গভীর। উপর থেকে কেটে কুটে রাস্তা সাফ করে দিয়েছি, সংসারের পথে কোনো বাধা ঘটছে না, অভাব কারও চোখে পড়ছে না; কিন্তু শিকড়গুলো সমস্তই ভিতরে রয়ে গেছে—তারা পরস্পরে ভিতরে ভিতরে জড়াজড়ি করে একেবারে জাল বুনে রেখেছে, আধ্যাত্মিক চাষ-আবাদের সেখানে পদে পদে ঠেকে যেতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্ম শিকড়টিও জড়িয়ে ধরে, আবরণ রচনা করে। তখন পূর্বে যে পাপটি চোখে পড়ে নি তাকেও দেখতে পাই এবং পাপ জিনিসটা আমাদের পরম সার্থকতার পথে যে কী রকম বাধা তাও বুঝতে পারি। তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি—তাকে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠে। সে যে দলবল নিয়ে চরম মিলনের, পরম প্রেমের পথ জুড়ে বসে আছে—তার সম্বন্ধে অন্যকে বা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর চলবে না—লোকের কাছে ভালো হয়ে আর কোনো সুখ নেই—তখন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সেই নির্মল স্বরূপকে বলতে হবে, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—সমস্ত পাপ দূর করো—একেবারে বিশ্বদুরিত, সমস্ত পাপ—একটুও বাকি থাকলে চলবে না—কেননা তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায়—সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওয়া, সেই তার শেষ চাওয়া। হে সর্বগ, তোমাকে, সর্বতঃ প্রাপ্য, সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হব, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করব, সেই আশ্চর্য সৌভাগ্যের ধারণাও এখন আমার মনে হয় না কিন্তু এই অনুগ্রহটুকু করতে হবে যে, তোমার পরিপূর্ণ প্রকাশের অধিকারী নাই হই তবু আমার রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র দিয়ে তোমার সেইটুকু আলোক আসুক যে আলোকে ঘরের আবদ্ধ অন্ধকারকে আমি অন্ধকার বলে জানতে পারি। রাত্রে দ্বার জানালা বন্ধ করে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে ছিলুম। সকাল বেলায় দ্বারের ফাঁক দিয়ে যখন আলো ঢুকল তখন জড়শয্যায় পড়ে থেকে হঠাৎ বাইরের সুনির্মল প্রভাতের আবির্ভাব আমার তন্দ্রালস চিত্তকে আঘাত করল। তখন তপ্তশয্যার তাপ অসহ্য বোধ হল, তখন নিজের নিশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ ঘরের বাতাস আমার নিশ্বাস রোধ করতে লাগল; তখন তো আর থাকতে পারা গেল না; তখন উন্মুক্ত নিখিলের স্নিগ্ধতা নির্মলতা পবিত্রতা, সমস্ত সৌন্দর্য সৌগন্ধ্য সংগীতের আভাস আমাকে আহ্বান করে বাইরে নিয়ে এল। তুমি তেমনি করে আমার আবরণের কোনো দুই-একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তোমার আলোকের দূতকে তোমার মুক্তির বার্তাবহকে প্রেরণ করো—তা হলেই নিজের আবদ্ধতার তাপ এবং কলুষ এবং অন্ধকার আমাকে আর সুস্থির হতে দেবে না, আরামের শয্যা আমাকে দগ্ধ করতে থাকবে, তখন বলতেই হবে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

২৫ অগ্রহায়ণ

আমাদের উপন্যাসের মন্ত্রে আছে, নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সুখকরকে নমস্কার, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারি নে। কল্যাণকর সুখকর নন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি আর দুঃখকে কোনো দুর্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এইজন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলই লুকিয়ে থাকতে চাই। তাতে কী হয়? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কী হয়? তাতে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে; নিজের হাত-পায়ের উপর তার

অধিকার থাকে না, যে-সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম-অভাবে পরিণত হতে পারে না, মুষড়ে যায়, বিগড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কখনোই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য জোগাতে পারে না, এইজন্যে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মতো হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয় সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

যাদের স্বভাব অতিবেদনাশীল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে; সে ছোটোকে বড়ো করে তোলে বলেই লোকে কেবলই বলে কাজ নেই—তার সম্বন্ধে লোকের কথাবার্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হয় না। সে সব কথা শোনে না কিংবা ঠিক কথা শোনে না—তার যা উপযুক্ত পাওনা তা সে সবটাই পায় না কিংবা ঠিকমত পায় না। এতে তার মঙ্গল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পায় না, কেবলই প্রশ্রয় পায়, সে হতভাগ্য বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়—বন্ধুরা তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না।

জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত হবেই তা নয়। যাকে আমরা অন্যায় বলি অবিচার বলি তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে—অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্মহিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা—সে তো হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত-ভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমত পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলি নে? কিন্তু কখনো তো মনে করি নে আমি তার অযোগ্য। সবটুকুই তো দিব্য অসংকোচে দখল করি। দুঃখের বেলাতেই কি কেবল ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব মেলাতে হবে?

ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিস যে আমরা পাই নে, তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ, এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের—আমাদের প্রাণের, আমাদের বুদ্ধির, আমাদের সৌন্দর্য-বোধের আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্মই এই যে, সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয় সে ত্যাগও করবে।

এইজন্যই আমাদের আহার্য পদার্থে ঠিক হিসাবমত আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না, তাতে যেমন খাদ্য অংশ আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজনমত নিছক খাদ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তবে তাতে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে? আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র আছে—সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ-বর্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না, এও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার মতো আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনাক্ষোভে ত্যাগ করতে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হোক বা অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।

এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে তা নয়, যে-সমস্ত অতি-বেদনাশীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নষ্ট হয়—আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা জমতে থাকে; যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলো লোকচক্ষুর সামনে বের করতে না চায় ততই সেগুলো দূষিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিকৃত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখকষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয়, তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত গেলে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও—যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম করো এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম করো—তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে, শক্তিলাভ করবে—যিনি শিব যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করছি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অল্পে অল্পে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। নিতান্তই প্রস্তুত হওয়া চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম আছে, তার বিধান অমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না; সে বলে কেবলই ছাড়তে হবে এবং এগোতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে যেখানে পৌঁছে বলতে পারি এইখানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান থেকে আর কোনোকালেই নড়ব না।

সংসারের ধর্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া—তখন তারই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন না করলে দুটোতে কেবলই ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আমরা যদি কেবলই বলি, আমরা থাকব আমরা রাখব আর সংসার বলে, তোমাকে ছাড়তে হবে চলতে হবে তা হলে বিষম কষ্ট উৎপন্ন হতে থাকে। আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়—যা আমরা ছাড়তে চাই নে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্মের সুরে বাঁধতে হবে।

বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তা হলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে—তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না, তখন দাসের মতো সংসারের কানমলা খাব।

অতএব একদিন এ কথা যেন সংসার না বলতে পারে যে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমিই যেন বলতে পারি আমি ত্যাগ করব। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমুখে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু ও ক্ষতি যখন তার বড়ো বড়ো দাবি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তখন তাকে কোনোমতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে, অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চলবে না—সে বড়ো দুঃখের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি, এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আসব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্য আবৃত শিশু তার মাকে পায় না—সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনই সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হতে হবে—তা হলেই যথার্থভাবে আমরা জগৎকে পাব—কারণ, স্বাধীনভাবে পাব। আমরা জগতের মধ্যে বন্ধ হয়ে ভ্রূণের মতো জগৎকে দেখতে পাই নে—যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

এইজন্যই বলছি, যে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সেই যে আসল সংসারী তা নয়—যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সংসারী—কারণ, সে তখন সংসারে থাকে না, সংসার তারই হয়—সেই সত্য করে বলতে পারে আমার সংসার।

ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে লাগামে বন্ধ হয়ে গাড়ি চালায়—কিন্তু ঘোড়া কি বলতে পারে গাড়িটা আমার? বস্তুত গাড়ির চাকার সঙ্গে তার বেশি তফাত কী? যে সারথি মুক্ত থেকে গাড়ি চালায় গাড়ির উপরে কর্তৃত্ব তারই।

যদি কর্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এইজন্য গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে—নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে।

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই যে দুটো বিপরীত ধর্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে—এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তা হলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি দেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তা হলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তা হলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয় তা হলে আমরা বিলুপ্ত হই।

বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে, ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারি নে সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।

এইজন্যে খৃস্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড়ো কঠিন। কেননা, যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু ধনই যে তাকে বাঁধে, এই বন্ধনটাকে যে যতই বড়ো করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।

এই-সমস্ত বন্ধন প্রত্যহ শিথিল হয়ে আসছে, প্রত্যহ ত্যাগ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আসছে, আমাদের উপাসনা থেকে এই ফলটি যেন লাভ করি। নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাথরের মতো আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরনা ঝরতে থাক—আমাদের অণুপরমাণুর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে থাক—এই পাষাণটিকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক, আর্দ্র করতে থাক, তার পরে ক্রমে এটা খইয়ে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জীবনের মাঝখানে একটি বৃহৎ আকাশ রচনা করে সেই আকাশটিকে পূর্ণ করে দিক। দেখো, একবার ভিতরের দিকে চেয়ে দেখো—অন্তরের সংকোচনগুলি তাঁর নামের আঘাতে প্রতিদিন প্রসারিত হয়ে আসছে, সমস্ত প্রসন্ন হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে, কর্ম সহজ হচ্ছে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও সরল হচ্ছে, এবং ঈশ্বরের মহিমা এই মানবজীবনের মধ্যে ধন্য হয়ে উঠছে।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

কিন্তু ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনো মনের মধ্যে এসে পৌঁছোল না। শাস্ত্রে

উত্তর দেয়, ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বন্ধ করে রাখবে— ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব।

মুক্তিলাভ করব, এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা তো মুক্তি চাচ্ছি নে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে— আমরা যে ইচ্ছা করে খুশি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি— আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন— এতবড়ো জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে, মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে; যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বন্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জানত তার সমস্তই বিলুপ্ত— সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে তো একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেইরকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্‌ যদ্‌ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ— যা কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও— এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না— লাভ করে কী হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কী হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কী হবে?

যখন কোনো ছেলেকে পয়সা দিই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে পয়সা নিয়ে কী হবে? উত্তর যদি দিই বাজারে যাবে, তা হলেও প্রশ্ন এই যে বাজারে গিয়ে কী হবে? পুতুল কিনবে। পুতুল কিনে কী হবে? খেলা করবে। খেলা করে কী হবে? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যায়— খুশি হবে। খুশি হয়ে কী হবে এ প্রশ্ন কেউ কখনো অন্তরের থেকে বলে না। ইচ্ছার পূর্ণ চরিতার্থতা হয়ে যে আনন্দ ঘটে সেই আনন্দের মধ্যেই সকল প্রশ্ন সকল সন্ধান নিঃশেষিত হয়ে যায়।

কেমন করে সংগ্রহ করব যার দ্বারা ত্যাগের শক্তি জন্মাবে? আমাদের এই প্রতিদিনের উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করছি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে নিবিড়ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখবার জন্যে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্যেও সমস্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্ছে, অনাবৃত হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠছে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্চয় ক্রমশই কিছু-না-কিছু সহজ হয়ে আসছে।

কেমন করে ত্যাগ করব? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গল-যজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোটো দরজাও যদি খুলে রাখ তা হলে দেখবে আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে, যার মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরছে না— ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে— একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও— প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও— সেই নিঃস্পৃহ ভিখারি তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না,

ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তাঁর জন্যে কোনো মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া সেটুকু একরকম করে দিয়ে অন্যরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুকে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখলে হবে না, তার রসিদ চাইলে চলবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা-কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে— সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

বেদমন্ত্রে আছে, মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া— উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।

সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো-একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্যে আর একটা সত্যকে মানতে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তা হলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে শয়তানকে মানতে হয়।

কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো শরিককে মানি নে— আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে; আমরা জানি তিনিই এক; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।

কিন্তু এ তো হল তত্ত্বকথা। তিনি সত্য এ কথা জানলে কেবল জ্ঞানে জানা হয়— এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ কোথায়। এই সত্যের কি কোনো রসই নেই।

তা বললে চলবে কী করে। সমস্ত সত্য যেমন তাঁতে মিলেছে তেমনি সমস্ত রসও যে তাঁতে মিলে গেছে। সেইজন্যে উপনিষৎ তাঁকে শুদ্ধ সত্য বলেন নি, তাঁকে রসস্বরূপ বলেছেন— তাঁকে সেই পরিপূর্ণ রসরূপে জানলে জানার সার্থকতা হয়।

তা হলে দাঁড়ায় এই যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ। নইলে তাঁর মধ্যে কিছুরই সমাধান হতে পারতই না— ভেদ ভেদই থাকত, বিরোধ কেবলই আঘাত করত এবং মৃত্যু কেবলই হরণ করে নিত। তাঁর মধ্যে যে সমস্তই মেলে— সেটা একটা জ্ঞানতত্ত্বের মিলন নয়— তাঁর মধ্যে একটি প্রেমতত্ত্ব আছে— সেইজন্য সমস্তকে মিলতেই হয়— সেইজন্যই বিচ্ছেদ বিরোধ কখনোই চিরন্তন সত্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে না।

ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে— কেন, কী হবে, এ-সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না— প্রেমে আপনাতেই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য।

যদি বল, ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তু থেকে মুক্তিলাভ করবে, তাতে আমাদের মন সায় দেয় না, যদি বল, ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তুকে পূর্ণতররূপে লাভ করবে তা হলেও আমাদের মনের সম্পূর্ণ-রূপে সাড়া পাওয়া যায় না। যদি বল, ত্যাগের দ্বারা প্রেমকে পাওয়া যাবে, তা হলে মন আর কথাটি কইতে পারে না— এ কথাটাকে যদি সে ঠিকমত অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে, 'তা হলে যে বাঁচি।'

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে— এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ সত্য হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম সত্য হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয়— আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে পূর্ণ হয়ে

ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত, সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না— প্রেমের সূর্য একেবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহংকারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে— ত্যাগটা যেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আলগা হয়ে আসে। তা হলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব। হাঁ, মুক্তি পাবে। মুক্তি পেয়ে কী পাব। মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম, যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করছেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন— সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না— সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বত-উৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ হতে গেলেই যার সঙ্গে যার যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।

কিন্তু প্রেম যে মুক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তফাতই নেই— কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মুক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেয়ে উপরের আর কারো কাছে কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত দেয় না।

সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান-প্রদান চলতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই কথাবার্তা হয়ে গেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন, তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এসো— যে ব্যক্তি দাস তার জন্য আমার আম-দরবার খোলা আছে বটে কিন্তু সে আমার খাস-দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস-দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই— কিন্তু দ্বারী বার বার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে, তোমার নিমন্ত্রণ পত্র কই। খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বার বার ফিরে আসতে হল— বার বার!

টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার জো নেই। আমরা দাম দিয়ে যে ইস্টেশনের টিকিট কিনেছি সেই ইস্টেশনেই আমাদের নামতে হবে। আমরা বহুকালের সাধনা এবং বহুদুঃখের সঞ্চয় দিয়ে এই সংসার লাইনেরই নানা গম্যস্থানের টিকিট কিনেছি অন্য লাইনে চলবে না। এবার থেকে প্রতিদিন আবার অন্য লাইনের ধন সংগ্রহ করতে হবে। এবার থেকে যা-কিছু সংগ্রহ এবং যা-কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জন্যে।

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি, নিজের ভিতর থেকে একটি কথা বুঝে নিয়েছি, সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব একসঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী; হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না— আবার তাদের বিরুদ্ধরূপে থাকলেও চলবে না। যা

বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যই, কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই, নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারি নে— কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, দুই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না, এ যে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক, তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজনসকল বিধান করতে যান। তিনি যে প্রেমস্বরূপ— তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি সার্থক।

স পর্যগাৎ শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ— অর্থাৎ অনন্ত দেশে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি, গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায় দেখতে পাই; সে হচ্ছে প্রেম। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম, কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি— আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতি-গতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্নশ্রেণীভুক্ত— তারা বিপরীত পর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালোবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়— সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ, এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন, এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়া-পাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার এক দিক বলে, আমি আছি, আর-এক দিক বলে, আমি নেই। 'আমি' না হলেও প্রেম নেই, 'আমি' না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ, সে-সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে— সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে, আমাদের অনন্ত উন্নতি— আমরা ক্রমাগতই তাঁর দিকে যাই, কোনো কালে তাঁর কাছে যাই নে। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন, আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারি নে, আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি; তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ— আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায় নি। শুধু বাক্য ফেরে না, মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে— এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত না-জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক

থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে কিন্তু প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, যেখানে এক দিকে কিছুই জানি নে সেখানে অন্য দিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে— তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায়, মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিস, পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেম। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন, তা হলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন, তা হলে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তা হলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা, এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড়ো কথা? ঈশ্বর শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত, এইটে? না তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ— এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এরকম অন্ধ সংস্কারই আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটোকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ— যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিতে থাকি। যেন, সীমা জিনিসটা যে কি, তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়। এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ। এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি— এরই বা নাশ কোথায়। এরই বা সীমা কোন্‌খানে। সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তনপরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এতবড়ো সাধ্য আছে কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি, কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে, এ কথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়, সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব, এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই, আবার প্রেমের যে অধীনতা এতবড়ো অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে।

অধীনতা জিনিসটা যে কত বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে, ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন— সেই পরম

গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে, তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন—নইলে আমরা আছি কী করে।

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা-জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারি দিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে জাগছে তার সীমা নেই—চোখের জল বয়ে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না, তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—তাই তো, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

আমরা এতদিন প্রত্যহ আমাদের উপাসনা থেকে কী ফল চেয়েছিলুম। আমরা চেয়েছিলুম শান্তি। ভেবেছিলুম এই উপাসনা বনস্পতির মতো আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিন সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলে শান্তি পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আরও অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিফল হয়।

জ্বরের রোগী কাতর হয়ে বলে, আমার এই জ্বালাটা জুড়োক; হয়তো জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তাতে যেটুকু শান্তি হয় সেটা তো স্থায়ী হয় না—এমন-কি, তাতে তাপ বেড়ে যেতে পারে। রোগী যদি শান্তি চায়, স্বাস্থ্য না চায়, তবে সে শান্তিও পায় না, স্বাস্থ্যও পায় না।

আমাদেরও শান্তিতে চলবে না, প্রেম দরকার। বরঞ্চ মনে ঐ যে একটুকু শান্তি পাওয়া যায়, কিছুক্ষণের জন্যে একটা স্নিগ্ধতার আবরণ আমাদের উপর এসে পড়ে, সেটাতে আমাদের ভুলায়—আমরা মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, আমাদের উপাসনা সার্থক হল—কিন্তু ভিতরের দিকে সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কেননা, দেখতে পাই, ব্যাধি যে যায় না। সমস্ত দিন নানা ঘটনায় দেখতে পাই, সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সহজ হয় নি। রোগীর সঙ্গে তার বাহিরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যেরকম সেইরকম হয়ে আছে। বাহিরে যেখানে সামান্য ঠান্ডা, রোগীর দেহে সেখানে অসহ্য শীত; বাহিরের স্পর্শ যেখানে অতি মৃদু, রোগীর দেহে সেখানে দুঃসহ বেদনা। আমাদেরও সেই দশা, বাহিরের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের ওজন ঠিক থাকছে না। ছোটো কথা অত্যন্ত বড়ো করে শুনছি, ছোটো ব্যাপার অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠছে।

ভার বাড়ে কখন? না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হাল্কা জিনিস আমরা সহজেই তুলছি, যদি বৃহস্পতিগ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকুও আমাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কেননা সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখছি, আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি—আমাদের স্বার্থ ভিতরের দিকেই টানছে, এই অহংকার ভিতরের দিকেই টানছে, এইজন্যেই সব জিনিসই অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে—যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ঐ ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপছে—

সব জিনিসই আমাকে ঠেসে ধরেছে— সব কথাই আমাকে ঠেলে দিচ্ছে— ক্ষণকালের শান্তির দ্বারা এটাকে ভুলে থেকে আমাদের লাভটা কী।

এই চাপটা হাল্কা হয় কখন? প্রেমে। তখন যে ঐ টানটা বাহিরের দিকে যায়। আমাদের জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। যেদিন প্রণয়ীর সঙ্গে আমাদের প্রণয় বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে সেদিন কেবল যে আকাশের আলো উজ্জ্বলতর, বনের শ্যামলতা শ্যামলতর হয়েছে তা নয়, সেদিন আমাদের সংসারের ভারাকর্ষণের টান একেবারে আলগা হয়ে গেছে। অন্য দিন ভিক্ষুককে যখন একপয়সামাত্র দিই, সেদিন তাকে আধুলি দিয়ে ফেলি; অর্থাৎ অন্যদিন এক পয়সার যে ভার ছিল, আজ বত্রিশ পয়সার সেই ভার। অন্য দিন যে-কাজে হয়রান হয়ে পড়তুম আজ সে-কাজে ক্লান্তি নেই— হঠাৎ কাজ হাল্কা হয়ে গেছে। পয়সা সেই পয়সাই আছে, কাজ সেই কাজই আছে, কেবল তার ওজন কমে গেছে কেননা টান যে আজ আমার নিজের কেন্দ্রের দিকে নয়; প্রেম যে আমাকে বাইরে টান দিয়ে একেবারে এক মুহূর্তে সমস্ত জগতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেছে।

আমাদের সাধনা যেমনই হোক আমাদের সংসার সেইসঙ্গে যদি হাল্কা হতে না থাকে তবে বুঝব যে হল না। যদি বুঝি টাকার ওজন তেমনি ভয়ানক আছে, উপকরণের বোঝা তেমনিই আমাকে চেপে আছে, তার মধ্যে অতি ছোটোটুকুকেও ফেলে দিতে পারি এমন বল আমার নেই; যদি দেখি কাজ যত বড়ো তার ভার যেন তার চেয়ে অনেক বেশি, তা হলে বুঝতে হবে প্রেম জোটে নি— আমাদের বরণসভায় বর আসে নি।

তবে আর ঐ শান্তিটুকু নিয়ে কী হবে? ওতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট করে রাখবে। প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নেই, তাতে অশান্তিও আছে; জোয়ারের জলের মতো কেবল যে তার পূর্ণতা, তা নয়; তারই মতো তার গতিবেগও আছে; সে আমাদের ভরিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখবে না, সে আমাদের ভাঁটার মুখের থেকে ফিরিয়ে উল্টো টানে টেনে নিয়ে যাবে— তখন এই অচল সংসারটাকে নিয়ে কেবলই গুণ-টানাটানি লগি-ঠেলাঠেলি করে মরতে হবে না— সে হুহু করে ভেসে চলবে।

যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই— ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকাল বেলায় জেগে উঠি— চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিয়ো না।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন যেন দেখতে পাই, বন্ধু, দাঁড়িয়ে আছ; সুখের দিন হোক, দুঃখের দিন হোক, বিপদের দিন হোক, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আজ সমস্তই সহ্য হবে। যখন প্রেম না থাকে, হে সখা, তখনই শান্তির জন্যে দরবার করি। তখন অল্প পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারি নে। কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন যে-দুঃখে যে-অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই দুঃখ সেই অশান্তিকেও মাথায় তুলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না— আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে অশান্তিরূপেও আসবে, সে যে-কোনো বেশেই আসুক তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বলতে পারি তোমাকে চিনেছি, বন্ধু, তোমাকে চিনেছি।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময়, তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্যে পল্লবিত, তা নয়; এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে— তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ঐ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী দুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন না, তা হবে না, তবে কিনা উপকরণবন্তের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেইরকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব। এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে এ কথা বলেন নি—তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'আমি যা চাই এ তো তা নয়।'

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্তস্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে. উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম; এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই, আমরা ধন এনে বলি, এই নাও। খ্যাতি এনে বলি, এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কত দিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বলছে, এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনো স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে. এ সবে আমার কোনো ফল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে—টাকা আরও চাই. খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরও-র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে—একদিন একমুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ঐ যে বলেছিলেন, আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব, তার মানেটা কী। অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা। অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে জন্মান্তরে বা অবস্থান্তরে টিঁকে থাকা? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, এ কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কী ভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন।

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায়, আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না—যেটা পেলে সে বলতে পারে, এ ছাড়া আমি আর বেশি চাই নে—যাকে পেলে আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠবে না। তা হলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্ মানুষ এমন

কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি, এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই তো স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, এ-সব নিয়ে আমি কী করব। আমি যে অমৃতকে চাই।

আচ্ছা, বেশ, উপকরণ তো অমৃত নয়, তা হলে অমৃত কী! আমরা জানি, অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাই নি, তা নয়। যদি না পেতুম তা হলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ, ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।'

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাই নে, আমি প্রেম চাই—এ কী কান্না!

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তনকালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এসো, সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ-দুটি আজ স্থাপন করো, তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও—নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে, আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

৩ পৌষ ১৩১৫

প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রস-সম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।

এমনি করে বস্তুত আমরা গাছকে কেটে ফেলে ফুলকে নেবার চেষ্টা করি; ফুলের সৌন্দর্যে যতই মুগ্ধ হই-না, গাছকে যদি তার সঙ্গে তুলনায় নিন্দিত করে, তাকে কঠোর বলে, তাকে দুরারোহ বলে উৎপাটন করে ফুলটি তুলে নেবার চেষ্টা করি তা হলে তখনকার মতো ফুলকে পাওয়া যায় কিন্তু চিরদিন সেই ফুল নূতন নূতন করে ফোটবার মূল আশ্রয়কেই নষ্ট করা হয়। এমনি করে ফুলটির প্রতিই একান্ত লক্ষ করে তার প্রতি অবিচার এবং অত্যাচারই করে থাকি।

কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর—ছন্দ

এবং ভাষা; তা ছাড়া, ভাবকে যেটির পরে যেটিকে যেরূপে সাজালে তার প্রকাশটি সুন্দর হয় সেই বিন্যাসনৈপুণ্য। এই কলেবর-রচনার কাজ যেমন-তেমন করে চলে না— কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়— তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতিঃপতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ, ভাষা এবং ভাববিন্যাসে কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করতেই হয়, এতে যথেচ্ছাচার খাটে না। তার পরে আর-একটা বড়ো আশ্রয় আছে, সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে এমন একটা-কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্‌বোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে-কাব্যে রসের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়— সে-কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। তার তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয় হচ্ছে ভাবের আশ্রয়— এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে-রস তাই আমাদের স্থায়ীরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।

চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে মদো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বরবিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মত্ততার মধ্যে যে-একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়— সেটাতে নিজের স্বভাবের অন্য সর্বদিক থেকেই হরণ করে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়। তাতে যে কেবল যে-সকল অংশের থেকে হরণ করা হয় তাদেরই ক্ষতি ও কৃশতা ঘটে তা নয়, যে অংশকে ফাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলা হয় তারও ভালো হয় না। কারণ, স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন সহজভাবে সক্রিয় থাকে তখনই প্রত্যেকটির যোগে প্রত্যেকটি সার্থক হয়ে থাকে— একটির থেকে আর-একটি যদি চুরি করে তবে যার চুরি যায় তারও ক্ষতি হয় এবং চোরও নষ্ট হতে থাকে।

তাই বলছিলুম, প্রেম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে— নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।

আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে— তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে।[১] এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, কাজে কর্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটোয় বড়োয়, সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে সুতরাং সংযতভাবে নির্মলভাবে মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক হ্রী আছে সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জ্বলে উঠে হয়তো কর্মকে নষ্ট করে, জ্ঞানকে বিকৃত করে, সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে ফেলে। হ্রী দ্বারাই সাধ্বী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়— এইরূপে

---

[১] স্ত্রীলোকের কোন্ গুণগুলি শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রজ মহাশয় কোনো একটি খাতায় লিখিয়াছিলেন— শ্রী, হ্রী ও ধী।

সে-প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে—সেটি হচ্ছে বাতাসের আবরণ। এই আবরণটির দ্বারাই ধরণী সূর্যের আলোককে পরিমিত এবং ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রৌদ্র যেখানটিতে পড়ত সেখানটিকে দগ্ধ এবং রুদ্ররূপে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পাশেই যেখানে ছায়া সেখানে হিমশীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিতভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জায়গায় উগ্রজ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।

আমাদেরও এই মানস-পুরীতে সাধ্বীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মূঢ় প্রেম নয়। পশুদের মতো এ একটা সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত। কোনো কল্পনার দ্রব্য দিয়ে এ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না—এ যাকে চায় তার অবাধ পরিচয় চায়, তার সম্বন্ধে সে যে নিজের জ্ঞানকে অপমানিত করে রাখবে এ সে সহ্য করতে পারে না। এর মনে মনে কেবলই এই ভয় হয় যে, পাছে পাবার একান্ত আগ্রহে একটা-কোনো ভুলকে পেয়েই সে নিজেকে শান্ত করে রাখে। পাখি যেমন ডিমে তা দেবার জন্যেই ব্যাকুল, তাই সে একটা নুড়ি পেলেও তাতে তা দিতে বসে, তেমনি পাছে আমাদের প্রেম কোনোমতে কেবল আত্মসমর্পণ করতেই ব্যগ্র হয়, কাকে যে আত্মসমর্পণ করছে সেটার দিকে পাছে তার কোনো খেয়াল না থাকে এই আশঙ্কাটুকু যেন না যায়—পতিকে দেখে নেবার জন্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের প্রদীপটিকে যেন সে সাবধানে জ্বালিয়ে রাখতে চায়।

তার পরে আমাদের এই প্রেমে শ্রী থাকবে, সৌন্দর্যের আনন্দময়তা থাকবে। কিন্তু যদি হ্রীর অভাব ঘটে, যদি ধীর বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়।

আত্মা পরিপূর্ণতার উদ্দেশে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করে তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব থাকে না। যে অমৃত চায়, তা পরিপূর্ণ প্রেম—তা কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। বলে, অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। বলে, আমি যাঁকে চাই তিনি যে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তায় কর্মে সত্য হতে হবে, তা হলেই যিনি বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।

সেই সঙ্গে বলে, তমসো মা জ্যোতির্গময়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ—বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি ধ্রুব সত্যরূপে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি সেই জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ। সেইজন্যই তো গায়ত্রী মন্ত্রে এক দিকে ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে তেমনি অন্য দিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে—যিনি ধীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধীস্বরূপ বলেই জানতে হবে। বিশ্বভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিলতে হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের দ্বারা যোগের দ্বারা এই মিলন।

তার পরের প্রার্থনা—মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত খণ্ডিত করছি; তোমার অনন্ত প্রেম অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অন্তঃকরণের বহুবিভক্ত রসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্রে মিলিত হয়ে চরিতার্থ হোক। এমনি করে অন্তরাত্মা সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রকাশই যার স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ করুক, তা হলেই রুদ্রের যে প্রেমমুখ তাই আমাদের চিরন্তন কাল রক্ষা করবে।

৩ পৌষ

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্পকুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশা বহন করে আনছে; যে কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্‌গম হয়েছে মাত্র, তাদের বলছে, তোমরা আজ জান না কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠবে। এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, 'তোমরা মনে করছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারি দিকের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু তা নয়; একদিন তোমাদের জীবনের মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।' যে ফুল ফোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতীক্ষা নিয়ে আসছে—যে ফসল ধরে নি, আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিন্ত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্যক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্যের খেতে আসছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই। আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনছে না, যে আশার সফল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনো আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মাথা তোলে নি?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে—'দেখো।' বাস্। 'একবার চেয়ে দেখো।' আর কিছুই না।

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনো তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিষটি এখনো হয় নি। বিকশিত দেখা এখনো হয় নি, ভরপুর দেখা এখনো দেখি নি।

কিন্তু তবু রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে—দেখো। সেই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনো আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এ কথা মনে কোরো না, আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে কোরো না, আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

আলোক যে-দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু, শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না—দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে, সে কী অদ্ভুত জিনিস। তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি।

এই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি, এই দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার। এ কি নিতান্ত অকারণে মুক্তহস্ত ধনীর অপব্যয়ের মতো আমাদের চার দিকে কেবল নষ্ট হবার জন্যেই হয়েছে। এতবড়ো দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিয়ে, কিছু খ্যাতি নিয়ে কিছু ক্ষমতা ফলিয়েই যেমনি একদিন চোখ বুজব, অমনি এমন বিরাটজগতে চোখ মেলে চাবার আশ্চর্য সুযোগ একেবারে চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবে! এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক এই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরো হিসাব ঐ টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?

না, তা পাওয়া যায় না। তাই আমি বলছি এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে

যাচ্ছে যে, একটি চরম দেখা, একটি পরম দেখা আছে সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।

তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এতবড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এতবড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্র-সূর্যখচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারি দিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চার দিকে পৃথিবী ঘুরছে—নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল, এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এতবড়ো জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে।

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে, কিন্তু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে—তা হোক। কিন্তু আমি যে বলছি চোখের দেখার কথা। আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনো পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চার দিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি—ঐ তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশন-বসনের ভাবনা নিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে—তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে তার সীমা নেই, সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয় কাকে যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই—এই-সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্ত ভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যেরকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো। কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না, তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্ত কাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারি দিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারি দিকে আমার যে-কেউ আছে, যা-কিছু আছে, এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এটুকু জানি, আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে, তা এখনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ, সে-দেখা এখনো আমাদের দেখা হয় নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ, সে-দেখার এখনো অনেক বাকি—'আনন্দরূপমমৃতং' এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনেই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরমসুন্দর প্রসন্নমুখ, তাঁর দক্ষিণং মুখং, একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাবে। তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধি-বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করেই বলতে পারব, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

৪ পৌষ

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে— 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছি নে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী-মাঝে,
কাজল ঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীণ-রণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে, 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়— আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর করে খেলিয়ে ওঠে তখন তাদের সেই আশ্চর্য মিলন এবং সৌন্দর্যকে আমাদের চোখ দেখতে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়। আবার আকাশের মধ্যে যখন আলোর ঢেউ ধারায় ধারায় বিচিত্র তালে নৃত্য করতে থাকে তখন সেই অপরূপ লীলার কোনো খবর আমাদের কান পায় না, চোখের মধ্যে সেইটে রূপ হয়ে দেখা দেয়। যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহদ্বার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তা হলে বিশ্ববীণার এই ঝংকারকে আমরা গান বলেও চিনতে পারতুম।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিরা বিশ্বভুবনের রূপবিন্যাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অল্পই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশ্বের মধ্যে নিয়ত একটা গতির চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু শুধু তাই নয়— এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে।

ছবি যে আঁকে তার পট চাই, তুলি চাই, রঙ চাই, তার বাইরের আয়োজন অনেক। তার পরে সে যখন আঁকতে থাকে তখন তার আরম্ভের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ দেখা যায় না— অনেক রেখা এবং অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস পাওয়া যায়। তার পরে আঁকা হয়ে গেলে, চিত্রকর চলে গেলেও সে ছবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— চিত্রকরের সঙ্গে তার আর কোনো একান্ত সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু যে গান করে গানের সমস্ত আয়োজন তার নিজেরই মধ্যে— আনন্দ যার, সুর তারই, কথাও তার— কোনোটাই বাইরের নয়। হৃদয় যেন একেবারে অব্যবহিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো উপকরণের ব্যবধানও তার নেই। এইজন্যে গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে, তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ সুরটিও হৃদয়কে যেন প্রকাশ করতে থাকে। হৃদয়ের এই প্রকাশে শুধু যে উপকরণের ব্যবধান নেই, তা নয়— কথা জিনিসটাও একটা ব্যবধান— কেননা ভেবে তার অর্থ বুঝতে হয়— গানে সেই অর্থ বোঝবারও প্রয়োজন নেই— কোনো অর্থ না থাকলেও কেবলমাত্র সুরই যা বলবার তা অনির্বচনীয় রকম করে বলে। তার পরে আবার গানের সঙ্গে গায়কের এক মুহূর্তও বিচ্ছেদ নেই— গান ফেলে রেখে গায়ক চলে গেলে, গানও তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। গায়কের প্রাণের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়। যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।

এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দ রূপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরেই সেই সম্পূর্ণ গানের প্রেরণা। এক সুরকে আর-এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোনো বচনগম্য অর্থও না পাই তখনো আমাদের চিত্তের কাছে এর প্রকাশ কোনো বাধা পায় না। এ যে চিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই, সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ, তাঁর তেজ তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।

কাল কৃষ্ণএকাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীনকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম; সেই ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল। তার পরে যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে, আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনো সেই জাগ্রত বীনকারের নিশীথ রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না—তখনো তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবে না, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীব-কোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার সংগীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।

'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' আবার আমাদের ওস্তাদজি আমাদেরও হাতে একটি করে ছোটো বীণা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে আমরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে শিখি। তাঁর সভায় তাঁরই সঙ্গে বসে আমরা একটু একটু সংগত করব, এই তাঁর স্নেহের অভিপ্রায়। জীবনের বীণাটি ছোটো কিন্তু এতে কত তারই চড়িয়েছেন। সব তারগুলি সুর মিলিয়ে বাঁধা কি কম কথা। এটা হয় তো ওটা হয় না, মন যদি হল তো আবার শরীর বাদী হয়—একদিন যদি হল তো আবার আর-একদিন তার নেবে যায়। কিন্তু ছাড়লে চলবে না। একদিন তাঁর মুখ থেকে এ কথাটি শুনতে হবে—বাহবা, পুত্র, বেশ। এই জীবনের বীণাটি একদিন তাঁর পায়ের কাছে গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া তার সব রাগিণীটি বাজিয়ে তুলবে। এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই—ঢিল দিলেই ঝন্‌ঝন্‌ খন্‌খন্‌ করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে—তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো, তারে যেন ধুলো না পড়ে—মরচে না পড়ে—আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা কোরো—হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।

৫ পৌষ

রোজ কেবল লাভের কথাটাই শোনাতে ইচ্ছে হয়। হিসাবের কথাটা পাড়তে মন যায় না। ইচ্ছে করে, কেবল রসের কথাটা নিয়েই নাড়াচাড়া করি, যে-পাত্রের মধ্যে সেই রস থাকে সেটা বড়ো কঠিন বলে মনে হয়।

কিন্তু অমৃতের নীচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন, তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই আনন্দলোকে যাবার জো নেই।

সত্য হচ্ছেন নিয়মস্বরূপ। তাঁকে মানতে হলেই তাঁর সমস্ত বাঁধন মানতেই হয়। যা-কিছু সত্য অর্থাৎ যা-কিছু আছে এবং থাকে, তা কোনোমতেই বন্ধনহীন হতে পারে না—তা কোনো নিয়মে আছে বলেই আছে। যে-সত্যের কোনো নিয়ম নেই, বন্ধন নেই, সে তো স্বপ্ন, সে তো খেয়াল—সে তো স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা, খেয়ালের চেয়েও শূন্য।

যিনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ তিনি অন্যের নিয়মে বন্ধ হন না, তাঁর নিজের নিয়ম নিজেরই মধ্যে। তা যদি না থাকে, তিনি আপনাকে যদি আপনি বেঁধে না থাকেন, তবে তাঁর থেকে কিছুই হতে পারে না, কিছুই রক্ষা পেতে পারে না। তবে উন্মত্ততার তাণ্ডবনৃত্যে কোনো-কিছুর কিছুই ঠিকানা থাকত না।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সত্যের রূপই হচ্ছে নিয়ম— একেবারে অব্যর্থ নিয়ম— তার কোনো প্রান্তেও লেশমাত্র ব্যত্যয় নেই। এইজন্যেই এই সত্যের বন্ধনে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হয়ে আছে, এইজন্যই সত্যের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যোগ আছে এবং তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে।

গাছের যেমন গোড়াতেই দরকার শিকড় দিয়ে ভূমিকে আঁকড়ে ধরা, আমাদেরও তেমনি গোড়ার প্রয়োজন হচ্ছে স্থূল সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় দিয়ে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করা।

আমরা ইচ্ছা করি আর না-করি, এ সাধনা আমাদের করতেই হয়। শিশু বলে, আমি পা ফেলে চলব; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বহু সাধনায় সে চলার নিয়মটিকে পালন করে ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপন সামঞ্জস্য করতে না পারে ততক্ষণ তার আর উপায় নেই— শুধু বললেই হবে না, আমি চলব।'

এই চলবার নিয়মকে শিশু যখনই গ্রহণ করে এ-নিয়ম আর তখন তাকে পীড়া দেয় না। শুধু যে পীড়া দেয় না, তা নয়; তাকে আনন্দ দেয়; সত্য-নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করবামাত্রই শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আহ্লাদিত হয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে যখন সে জলের সত্য, মাটির সত্য, আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ মানতে শেখে তখন যে কেবল তার কতকগুলি অসুবিধা দূর হয় তা নয়, জল মাটি আগুন সম্বন্ধে তার শক্তি সফল হয়ে উঠে তাকে আনন্দ দেয়।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্যসম্বন্ধে যুক্ত হয়ে ওঠবার জন্যে বিস্তর সাধনা করতে হয়, তাকে বিস্তর নিয়ম স্বীকার করতে হয়— তাকে অনেকরকম আবদার থামাতে হয়, অনেক রাগ কমাতে হয়— নিজেকে অনেকরকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধনগুলি মানা তার পক্ষে সহজ হয় তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হয়ে ওঠে— তখনই তার সামাজিক শক্তি সেই-সকল বিচিত্র নিয়মবন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হয়ে স্ফূর্তিলাভ করে।

এমনি করে অধিকাংশ মানুষই যখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে মোটামুটি রকমে চলনসই হয়ে ওঠে তখনই তারা নিশ্চিন্ত হয়, এবং নিজেকে অনিন্দনীয় মনে করে খুশি হয়।

কিন্তু এমন টাকা আছে যা গাঁয়ে চলে কিন্তু শহরে চলে না, শহরের বাজে দোকানে চলে যায় কিন্তু ব্যাঙ্কে চলে না। ব্যাঙ্কে তাকে ভাঙাতে গেলেই সেখানে যে পোদ্দারটি আছে সে একেবারে স্পর্শমাত্রেই তাকে তৎক্ষণাৎ মেকি বলে বাতিল করে দেয়।

আমাদেরও সেই দশা— আমরা ঘরের মধ্যে, গাঁয়ের মধ্যে, সমাজের মধ্যে নিজেকে চলনসই করে রেখেছি কিন্তু বড়ো ব্যাঙ্কে যখন দাঁড়াই তখনই পোদ্দারের কাছে একমুহূর্তে আমাদের সমস্ত খাদ ধরা পড়ে যায়।

সেখানে যদি চলতি হতে চাই তবে সত্য হতে হবে, আরও সত্য হতে হবে। আরও অনেক বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে হবে, আরও অনেক দায় মানতে হবে। সেই অমৃতের বাজারে এতটুকু মেকিও চলে না— একেবারে খাঁটি সত্য না হলে অমৃত কেনবার আশা করাও যায় না।

তাই বলছিলুম কেবল অমৃতরসের কথা তো বললেই হবে না, তার হিসাবটাও দেখতে হবে।

আমরা নিজের হিসাব যখন মেলাতে বসি তখন দু-চার টাকার গরমিল হলেও বলি ওতে কিছু আসে যায় না। এমনি করে রোজই গরমিলের অংশ কেবলই জমে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে

এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রত্যহই ছোটোবড়ো কত অসত্য কত অন্যায়ই চালিয়ে দিচ্ছি সে-সম্বন্ধে যদি কথা ওঠে তো বলে বসি, 'অমন তো আক্‌সার হয়েই থাকে, অমন তো কত লোকেই করে— ওতে ক'রে এমন ঘটে না যে আমি ভদ্রসমাজের বার হয়ে যাই।'

ঘোরো হিসাবের খাতায় এইরকম শৈথিল্য ঘটে কিন্তু যারা জাতিতে সাধু, যারা মহাজন, তারা লাখটাকার কারবারে এক পয়সার হিসাবটি না মিললে সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারে না। যারা মস্ত লাভের দিকে তাকিয়ে আছে তারা ছোট্ট গরমিলকেও ডরায়— তারা হিসাবকে একেবারে নিখুঁত সত্য না করে বাঁচে না।

তাই বলছিলুম, সেই যে পরম রস, প্রেমরস— তার মহাজন যদি হতে চাই তবে হিসাবের খাতাকে নীরস বলে একটু ফাঁকি দিলেও চলবে না। যিনি অমৃতের ভাণ্ডারী তাঁর কাছে বেহিসাবি আবদার একেবারেই খাটবে না। তিনি যে মস্ত হিসাবি— এই প্রকাণ্ড জগদ্‌ব্যাপারে কোথাও হিসাবের গোল হয় না— তাঁর কাছে কোন্‌ লজ্জায় গিয়ে বলব, 'আমি আর কিছু জানি নে, আর কিছু মানি নে, আমাকে কেবল প্রেম দাও, আমাকে প্রেমে মাতাল করে তোলো।'

আত্মা যেদিন অমৃতের জন্যে কেঁদে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে— 'অসতো মা সদ্‌গময়— আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেলো। অমৃতের কথা তার পরে।'

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে, বলতে হবে, 'অসতো মা সদ্‌গময়— বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না— তাকে অটুট সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেলো— তার পরে সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না।'

৬ পৌষ

উৎসব তো আমরা রচনা করতে পারি নে, যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব। সে-প্রকাশ কবেই বা বন্ধ আছে। পাখি তো রোজই ভোর-রাত্রি থেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার সকালবেলাকার গীতোৎসবের নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে। আর প্রভাতের আনন্দসভাটিকে সাজিয়ে তোলবার জন্য একটি অন্ধকার পুরুষ সমস্ত রাত্রি কত যে গোপন আয়োজন করে তার কি সীমা আছে। শুতে যাবার আগে একবার যদি কেবল তাকিয়ে দেখি, তবে দেখতে পাই নে কি জগতের নিত্য-উৎসবের মহা-বিজ্ঞাপন সমস্ত আকাশ জুড়ে কে টাঙিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে আমাদের উৎসবটা কবে? যেদিন আমরা সময় করতে পারি সেই দিন। যেদিন হঠাৎ হুঁশ হয় যে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে এবং সে-নিমন্ত্রণ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। যেদিন স্নান ক'রে সাজ ক'রে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

সেই দিন উৎসবের সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি— 'বাঃ আজ আলোটি কী মধুর, কী পবিত্র!' আরে মূঢ়, এ আলো কবে মধুর ছিল না, কবে পবিত্র ছিল না। তুমি একটা বিশেষ দিনের গায়ে একটা বিশেষ চিহ্ন কেটে দিয়েছ বলেই কি আকাশের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে।

আর কিছু নয়— আজকে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেছি অন্যদিন করি নি, এইমাত্র তফাত। আয়োজনটা এমনিই প্রতিদিনই ছিল, প্রতিদিনই আছে। জগৎ যে আনন্দরূপ, এইটে আজ দেখব বলে কাজকর্ম ফেলে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমিও নিজের আনন্দময় স্বরূপটিকেই ছুটি দিয়েছি; আজ বলেছি, থাক্‌ আজ দেনাপাওনার টানাটানি, ঘুচুক আজ আত্মপরের ভেদ, মরুক আজ সমস্ত কার্পণ্য, বাহির হোক আজ যত ঐশ্বর্য আছে। যে আনন্দ জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র

বিরাজমান সেই আনন্দকে আজ আমার আনন্দনিকেতনের মধ্যে দেখব। যে উৎসব নিখিলের উৎসব সেই উৎসবকে আজ আমার উৎসব করে তুলব।

বিশ্বের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জনে নানাক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্তি। নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত আশ্রমের যে প্রাত্যহিক উৎসব, আমরা আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্যতারা ও তরুশ্রেণীর সঙ্গে কোনোদিন যোগ দিয়েছি? আমরা এই আশ্রমটিকে কি তার সমস্ত সত্যে ও সৌন্দর্যে দেখেছি। দেখি নি। এই আশ্রমের মাঝখানে থেকেও আমরা প্রতিদিন প্রাতে সংসারের মধ্যেই জেগেছি এবং প্রতিদিন রাত্রে সংসারের কোলেই শুয়েছি।

৩৬৪ দিন পরে আজ আমরা আশ্রমবাসীগণ এই আশ্রমকে দেখতে এসেছি। যখন সূর্য পূর্ব-গগনকে আলো করে ছিল তখন দেখতে পাই নি—যখন আকাশ ভরে তারার দীপমালা জ্বলেছিল তখনো দেখতে পাই নি—আজ আমাদের এই ক'টা তেলের আলো, মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে একে দেখব! তা হোক তাতে অপরাধ নেই। মহেশ্বরের মহোৎসবের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে আমাদেরও যেটুকু আলোর সম্বল আছে তাও বের করতে হয়। শুধু তাঁর আলোতেই তাঁকে দেখব, এ যদি হত তা হলে সহজেই চুকে যেত—কিন্তু এইটুকু কড়ার তিনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন যে, আমাদের আলোটুকুও জ্বালতে হবে—নইলে দর্শন হবে না, মিলন ঘটবে না—আমাদের যে অহংকারটি দিয়ে রেখেছেন সে এরই জন্যে। অহংকারের আগুন লাগিয়ে আমরা মহোৎসবের মশাল তৈরি করব। তাই চিরজাগ্রত আনন্দকে দেখবার জন্যে আমার নিজের এইটুকু আনন্দকেও জাগিয়ে তুলতে হয়, সেই চিরপ্রকাশিত জ্ঞানকেও জানবার জন্যে আমার জ্ঞানটুকুর ক্ষুদ্র পলতেটিকে উসকে দিতে হয়—আর যাঁর প্রেম আপনি প্রবাহিত হয়ে ছাপিয়ে পড়ছে তাঁর সেই অফুরান প্রেমকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি নে যদি ছোটো জুঁইফুলটির মতো আমাদের এই এতটুকু প্রেমকে না ফুটিয়ে তুলতে পারি।

এইজন্যেই বিশ্বেশ্বরের জগদ্‌ব্যাপী মহোৎসবেও আমরা ঠিকমত যোগ দিতে পারি না যদি আমরা নিজের ক্ষুদ্র আয়োজনটুকু নিয়ে উৎসব না করি। আমাদের অহংকার আজ তাই আকাশ-পরিপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চোখের সামনে নিজের এই দরিদ্র আলোকয়টা নির্লজ্জভাবে জ্বালিয়েছে। আমাদের অভিমান এই যে, আমরা নিজের আলো দিয়েই তাঁকে দেখব। আমাদের এই অভিমানে মহাদেব খুশি, তিনি হাসছেন। আমাদের এই প্রদীপক'টা জ্বালা দেখে সেই কোটি সূর্যের অধিপতি আনন্দিত হয়েছেন। এই তো তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখবার শুভ অবসর। এই সুযোগটিতে আমাদের সমস্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই চেতনা আমাদের সমস্ত শরীরে জেগে উঠে রোমে রোমে পুলকিত হোক, এই চেতনা দিবালোকের তরঙ্গে তরঙ্গে স্পন্দিত হোক, নিশীথরাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হোক, আজ সে যেন ঘরের কোণে ঘরের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত না হয়, নিখিলের পক্ষে যেন মিথ্যা হয়ে না থাকে—আজ সে কোনোখানে সংকুচিত হয়ে যেন বঞ্চিত না হয়। অনন্ত সভার সমস্ত আয়োজন, সমস্ত দর্শন স্পর্শন মিলন কেবল এই চৈতন্যের উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় আছে—এইজন্যে আলো জ্বলছে, বাঁশি বাজছে—দূতগুলি চতুর্দিক থেকেই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে—সমস্তই প্রস্তুত, ওরে চেতনা, তুই কোথায়। ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

৭ পৌষ

একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল—এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন। এই দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোটির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। আজ কৌটো উদ্ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রান্তরের আকাশের মধ্যে তুলে ধরে

দেখব—এখানকার ধূলিবিহীন নির্মল নিভৃত আকাশতলে যে নক্ষত্রমণ্ডলী দীপ্তি পাচ্ছে সেই তারাগুলির মাঝখানে তাকে তুলে ধরে দেখব। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্ঘাটন করার দিন, সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন; সেই দীক্ষার যে কতবড়ো অর্থ আজকের দিন কি সে কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে? সেই কথাটি না শুনে গেলে কী জন্যেই বা এসেছি আর কী নিয়েই বা যাব?

সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জ্বলে নি, জনসমাগমও হয় নি—সেই শীতের নির্মল দিনটি শান্ত ছিল, স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কী ঘটছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ জানছিলেন।

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'এই যে জিনিসটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য—এর ভার যখন গ্রহণ করেছ তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় তো সমস্তই যাক। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে।'

তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তার পরে আর তো তিনি ঘুমোতে পারেন নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল—এতবড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তাঁর সহায়, সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এ যে প্রভুর সত্য। এই অগ্নি-রক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই, আর নিদ্রা নেই। রুদ্রদেবের সেই অগ্নিদীক্ষা আজকের দিনের উৎসবের মাঝখানে আছে। কিন্তু সে কি প্রচ্ছন্নই থাকবে? এই গীতবাদ্যকোলাহলের মাঝখানে প্রবেশ করে সেই 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' যিনি তাঁর দীপ্ত সত্যের বজ্রমূর্তি আজ প্রত্যক্ষ করে যাবে না? গুরুর হাত হতে সেই যে 'বজ্রমুদ্যতং' তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এই ৭ই পৌষের মর্মস্থানে সেই বজ্রতেজ রয়েছে।

কিন্তু শুধু বজ্র নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কী বরাভয় আছে তাও দেখে যেতে হবে। সেই ধনিসন্তানের জীবনে যে সংকটের দিন এসেছিল তা তো সকলের জানা আছে। যে বিপুল ঐশ্বর্য রাজহর্ম্যের মতো একদিন তাঁর আশ্রয় ছিল সেইটে যখন অকস্মাৎ তাঁর মাথার উপরে ভেঙে প'ড়ে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার উদ্‌যোগ করেছিল তখন সেই ভয়ংকর বিপৎপতনের মাঝখানে একমাত্র এই সত্যদীক্ষা তাঁকে আবৃত করে রক্ষা করেছিল—সেইদিনে তাঁর আর-কোনো পার্থিব সহায় ছিল না। এই দীক্ষা শুধু যে দুর্দিনের দারুণ আঘাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিল, তা নয়—প্রলোভনের দারুণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে—সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব। সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে, আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তা হলে ধন্য হব। এর মধ্যে ফাঁকি নেই, লুকোচুরি নেই, দ্বিধা নেই, দুই দিক বজায় রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলাবার জন্যে সুনিপুণ মিথ্যাযুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্যে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা নেই, মানুষের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভয়, ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ—চিরজীবনের যে গম্যস্থান, যে অমৃতনিকেতন, সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি—সত্যদীক্ষার এই অর্থ।

সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারি দিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে; এই দিনটিরই আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্য-দীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে। এই দিনটিকে যেন আমাদের অন্যমনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি— একে ভক্তিপূর্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও, আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে সম্পদে পূর্ণ করো।

হে দীক্ষাদাতা, হে গুরু, এখনো যদি প্রস্তুত হয়ে না থাকি তো প্রস্তুত করো, আঘাত করো, চেতনাকে সর্বত্র উদ্যত করো— ফিরিয়ে দিয়ো না, ফিরিয়ে দিয়ো না— দুর্বল ব'লে তোমার সভা-সদ্‌দের সকলের পশ্চাতে ঠেলে রেখো না। এই জীবনে সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে— নির্ভয়ে এবং অসংকোচে। অসত্যের স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে ব্যর্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে— তুমি শক্তি দাও।

৭ পৌষ

কালকের উৎসবমেলার দোকানি-পসারিরা এখনো চলে যায় নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জেলে গল্প করে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণচতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে এসে বসলুম তখনো রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার— এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অক্লিষ্ট জাগরণের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে, ভাঙামেলার লোকেরা শুকনো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা। বাগানের সমস্ত পাখি জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না— শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।

কিন্তু কয়জন মানুষে মিলে যখন কলরব করে তখন প্রভাত প্রকৃতির এত স্তব্ধতা কেন এমন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উপাসনার জন্যে সাধক পশুপক্ষিহীন স্থান তো খোঁজে না, মানুষহীন স্থান খুঁজে বেড়ায় কেন?

তার কারণ এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ একটানে একতালে চলে না। এইজন্যেই যেখানেই মানুষ থাকে সেইখানেই চারি দিকে সে নিজের একটা তরঙ্গ তোলে; সে একটিমাত্র কথা না বললেও, তারার মতো নিঃশব্দ ও একটুমাত্র নড়াচড়া না করলেও বনস্পতির মতো নিস্তব্ধ থাকে না। তার অস্তিত্বই অগ্রসর হয়ে আঘাত করে।

ভগবান ইচ্ছা করেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য একটুখানি নষ্ট করে দিয়েছেন— এই তাঁর আনন্দের কৌতুক। ঐ যে আমাদের পঞ্চভূতের মধ্যে একটু বুদ্ধির সঞ্চার করেছেন, একটা অহংকার যোজনা করে বসে আছেন, তাতে করেই আমরা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছি— ঐ জিনিসটার দ্বারাতেই আমাদের পঙ্‌ক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এইজন্যেই গ্রহসূর্যতারার সঙ্গে আমরা আর মিল রক্ষা করে চলতে পারি নে— আমরা যেখানে আছি সেখানে যে আমরা আছি, এ কথাটা আর কারো ভোলবার জো থাকে না।

ভগবান আমাদের সেই সামঞ্জস্যটি নষ্ট করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের একঘরে করে দেওয়াতে সকালবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের নিজের কাজের ধন্দায় নিজে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ঐ সামঞ্জস্যটি ভেঙে গেছে বলেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট বিশ্বের শান্তি নেই— আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠেছে, 'চাই চাই চাই'। শরীর বলছে চাই, মন বলছে চাই, হৃদয় বলছে চাই— এক মুহূর্তেও এই রবের বিশ্রাম নেই। যদি সমস্তর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিল থাকত তা হলে আমাদের মধ্যে এই হাজার সুরে চাওয়ার বালাই থাকত না।

আজ অন্ধকার প্রত্যুষে বসে আমার চারি দিকে সেই বিচিত্র চাওয়ার কোলাহল শুনছিলুম— কত দরকারের হাঁক। 'ওরে গোরুটা কোথায় গেল! অমুক কই! আগুন চাই রে! তামাক কোথায়! গাড়িটা ডাক্ রে! হাঁড়িটা পড়ে রইল যে!'

এক জাতের পাখি সকালে যখন গান গায় তখন তারা একসুরে একরকমেরই গান গায়— কিন্তু মানুষের এই যে কলধ্বনি তাতে একজনের সঙ্গে আর-একজনের না আছে বাণীর মিল, না আছে সুরের।

কেননা ভগবান ঐ যে অহংকারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আমাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা সমস্তই এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয় করে এক-একটি অপরূপ মূর্তি ধরে বসে আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়াকাড়ি-টানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেসুর কত উত্তাপ যে জন্মাচ্ছে, তার আর সীমা নেই। সেই বেসুরে পীড়িত, সেই তাপে তপ্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলই সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করছে, সেইজন্যেই আমরা কেবলমাত্র খেয়ে প'রে জীবন ধারণ করে বাঁচি নে। আমরা একটা সুরকে, একটা মিলকে চাচ্ছি। সে চাওয়াটা আমাদের খাওয়াপরার চাওয়ার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়— সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই। সেইজন্যেই কথা নেই, বার্তা নেই, আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি— কত লিখছি, কত আঁকছি, কত গড়ছি। কত গৃহ কত সমাজ বাঁধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি। আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা। এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে নানা দেশের মানুষ কত নানা আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুলছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষাদীক্ষা। কী করলে নানা মানুষের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে, এই চেষ্টায়, এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতেই মানুষ আপনার একটা সৃষ্টি তৈরি করে তুলছে— নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহংকারের মধ্যে নির্বাসিত হওয়াতেই তার এই নিজের সৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন। মানুষের ইতিহাস কেবলই এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্বয়ের ইতিহাস— তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে কেবলই এই অমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। 'পেতে চাই, পেতে চাই, মিলতে চাই মিলতে চাই।' এ ছাড়া আর কথা নেই।

সেইজন্যে এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্রয়োজনের নানা কলরবের মধ্যে যখন শুনলুম একজন গান গাচ্ছে, 'হরি, আমায় বিনামূল্যে পার করে দাও' তখন সেই গানটির ভিতর এই সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুনতে পেলুম। সমস্ত চাওয়ার ভিতরকার চাওয়া হচ্ছে এই পার হতে চাওয়া। যে বিচ্ছিন্ন সে কেবলই বলছে, 'ওগো আমাকে এই বিচ্ছেদ থেকে উত্তীর্ণ করে দাও।' এই বিচ্ছেদ পার হলেই তবে যে প্রেম পূর্ণ হয়। এই প্রেম পূর্ণ না হলে কোনো কিছু পেয়েই আমার তৃপ্তি নেই— নইলে কেবলই মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাচ্ছি— একের থেকে আরে ঘুরে মরছি— মিলে গেলেই এই বিষম আপদ চুকে যায়।

কিন্তু যে মিলটি হচ্ছে অমৃত, তাকে পেতে গেলেই তো বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পেতে হয়। মিলে থাকলে তো মিলকে পাওয়া হয় না।

সেইজন্যে ঈশ্বর যে অহংকার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম অচরিতার্থ। মানুষ তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের

তরী গড়ে তুলছে—এ-সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্মতন্ত্রই বল।

কিন্তু তাই যদি হয়, তবে পার হয়ে যাব কোথায়? তবে কি অহংকারকে একেবারেই লুপ্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে যাওয়াই অমৃতলোক-প্রাপ্তি? সেই দেশেই তো ধুলা মাটি পাথর রয়েছে। তারা তো সমষ্টির সঙ্গে একতানে মিলে চলেছে, কোনো বিচ্ছেদ জানে না। এই রকমের আত্মবিলয়ের জন্যেই কি মানুষ কাঁদছে?

কখনোই নয়। তা যদি হত, সকলপ্রকার বিলয়ের মধ্যেই সে সান্ত্বনা পেত, আনন্দ পেত। বিলুপ্তিকে মানুষ সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, তার প্রমাণ-প্রয়োগের কোনো দরকার নেই। কিছু-একটা গেল, এ কথার স্মরণ তার সুখের স্মরণ নয়। এই আশঙ্কা এবং এই স্মরণের সঙ্গেই তার জীবনের গভীর বিষাদ জড়িত—সে ধরে রাখতে চায়, অথচ ধরে রাখতে পারে না। মানুষ সর্বান্তঃকরণে যদি কিছুকে না চায় তো সে বিলয়কে।

তাই যদি হল, তবে যে অসামঞ্জস্য, যে বিচ্ছেদের উপর তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত, সেইটেকে কি সে চায়? তাও তো চায় না। এই বিচ্ছেদ, এই অসামঞ্জস্যের জন্যেই তো সে চিরদিন কেঁদে মরছে। তার যত পাপ, যত তাপ, সে তো একেই আশ্রয় করে। এইজন্যেই তো সে গান গেয়ে উঠছে—'হরি, আমায় বিনামূল্যে পার করো।' কিন্তু পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়াই হল তবে তো আমরা মুশকিলেই পড়েছি। তবে তো এপারে দুঃখ, আর ওপারে ফাঁকি।

আমরা কিন্তু দুঃখকেও চাই নে, ফাঁকিকেও চাই নে। তবে আমরা কী চাই, আর সেটা পাবই বা কী করে।

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না—দুই যখন একসঙ্গে থাকে, অথচ, তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না, তারা পরস্পরের সহায় হয়।

এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাই নে। আমাদের যা-কিছু প্রয়াস যা-কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যেই—দুইয়ের মধ্যেই এককে লাভ করবার জন্যে। আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরদুঃখের বিচ্ছেদকেই চিরন্তন আনন্দের বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের সুধা পান করাবেন। তখনই বুঝিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কী অমূল্য রত্ন।

৮ পৌষ

মানুষের মনটা কেবলই যেমন বলছে, 'চাই, চাই, চাই'—তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর-একটি কথা বলছে, 'চাই নে, চাই নে, চাই নে।' এইমাত্র বলে, 'না হলে নয়,' পরক্ষণেই বলে, 'কোনো দরকার নেই।'

ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল, 'গোটাকতক কাঠকুটা লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই'; তখন এমনি হয়েছিল যে, না হলে চলে না। শীতে খোলা মাঠের মধ্যে ঐ একটুখানি আশ্রয় রচনা করাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনসাধন বলে মনে হয়েছিল। কোনোমতে একটা চুলো বানিয়ে, শুকনো পাতা জ্বালিয়ে, যা হোক কিছু-একটা রেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এ চাওয়া ও চেষ্টার কাছে পৃথিবীর আর-সমস্ত ব্যাপারই ছোটো হয়ে গিয়েছিল।

কোনো গতিকে এই কাঠকুটো পাতালতা সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আজ রাত্রি না যেতেই শুনতে পাচ্ছি—'ওরে গাড়ি কোথায় রে, গোরু জোত রে।' যেতে হবে, এবার গ্রামে যেতে হবে। এই চলে যাওয়ার প্রয়োজনটাই এখন সকলের বড়ো। কাল রাত্রিবেলাকার একান্ত প্রয়োজনগুলো আবর্জনা

হয়ে পড়ে রইল— কাল যাকে বলেছিল বড়ো দরকার, আজ তাকে পরিত্যাগ করে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর-এক যুগে যাবার আয়োজন করছে। যখন নূতন প্রভাত উঠছে, যখন রাত ভোর হবে হবে করছে— তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি করে ডাকছে— 'ওরে চল্ রে— ওরে গোরু কোথায় রে, ওরে গাড়ি কোথায়।' তখন ঐ রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলো এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জনা হয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে, তার ছাইগুলো জমে উঠছে। ভাঙা হাঁড়িসরা, শালপাতায় মাঠ বিকীর্ণ। আশ্রয়গৃহগুলি আশ্রিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অত্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট ও লজ্জিত হয়ে আছে। সমস্তই রইল— পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে— এবারে যাত্রা করে বেরোতে হবে। আবার, আবার আর-এক যুগের প্রয়োজন সংগ্রহ করতে হবে। তখন মনে হবে, এইবারকার এই প্রয়োজনগুলিই চরম— আর কোনো দিন ভোরের বেলায় গাড়িতে গোরু জুততে হবে না। এই বলে আবার কাঠ-কুটো-ডালপালা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু তখনো এই অত্যন্ত একান্ত প্রয়োজনের দূর সম্মুখ দিগন্ত থেকে করুণ ভৈরবীসুরে বাণী আসছে, 'প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই।'

যদি এই সুরটুকু না থাকত— যদি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভিতরেই অত্যন্ত অপ্রয়োজন বাস না করত তা হলে কি আমরা বাঁচতে পারতুম। প্রয়োজন যদি সত্যই একান্ত হত তা হলে তার ভয়ংকর চাপ কে সহ্য করতে পারত। অত্যন্ত অপ্রয়োজনের দিন ও রাত্রি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভার হরণ করে রয়েছে বলেই আমরা দরকারের অতি প্রবল মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেও চলাফেরা করে বেড়াতে পারছি। সেইজন্যেই ভোরের আলো দেখা দেবা মাত্রই রাশীকৃত বোঝা যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে ফেলে রেখে আমরা গাড়িতে চড়ে বসতে পারছি। 'কিছুই থাকে না' বলে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলছি— তেমনি 'কিছুই নড়ে না' বলে হতাশ হয়ে পড়ছি নে। থাকছেও বটে, যাচ্ছেও বটে, এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেয়েছি, আশ্রয়ও পেয়েছি— আমাদের ঘরও জুটেছে, আলোবাতাসও মারা যায় নি।

৮ পৌষ

আমরা অনেক সময় উৎসব করে ফতুর হয়ে যাই। ঋণশোধ করতেই দিন বয়ে যায়। অল্পসম্বল ব্যক্তি যদি একদিনের জন্যে রাজা হওয়ার শখ মেটাতে যায় তবে তার দশদিনকে সে দেউলে করে দেয়, আর তো কোনো উপায় নেই।

সেইজন্যে উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড়ো ম্লান। সেদিন আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা চলে যায়— সেদিন অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু উপায় নেই। মানুষ বৎসরে অন্তত একটা দিন নিজের কার্পণ্য দূর করে তবে সেই অকৃপণের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। ঐশ্বর্যের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।

দুই রকমের উপলব্ধি আছে। একরকম— দরিদ্র যেমন ধনীকে উপলব্ধি করে, দানপ্রাপ্তির দ্বারা। এই উপলব্ধিতে পার্থক্যটাকেই বেশি করে বোঝা যায়। আর-একরকম উপলব্ধি হচ্ছে সমকক্ষতার উপলব্ধি। সেইস্থলে আমাকে দ্বারের বাইরে বসে থাকতে হয় না— কতকটা এক জাজিমে বসা চলে।

প্রতিদিন যখন আমরা দীনভাবে থাকি তখন নিরানন্দ চিত্তটা আনন্দময়ের কাছে ভিক্ষুকতা করে। উৎসবের দিনে সেও বলতে চায়, 'আজ কেবল নেওয়া নয়, আজ আমিও তোমার মতো আনন্দ করব— আজ আমার দীনতা নেই, কৃপণতা নেই আজ আমার আনন্দ এবং আমার ত্যাগ তোমারই মতো অজস্র।'

এইরূপে ঐশ্বর্য জিনিসটি কী, অকৃপণ প্রাচুর্য কাকে বলে, সেটা নিজের মধ্যে অনুভব করলে ঈশ্বর যে কেবলমাত্র আমার অনুগ্রহকর্তা নন, তিনি যে আমার আত্মীয় সেটা আমি বুঝি এবং প্রমাণ করি।

কিন্তু এইটে বুঝতে এবং প্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় শেষে দুঃখ পেতে হয়। পরদিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট, গলা বাতি এবং শুকনো মালার দিকে তাকিয়ে মন উদাস হয়ে যায়—তখন আর চিত্তের রাজকীয় ঔদার্য থাকে না—হিসাবের কথাটা মনে পড়ে মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

কিছু দুঃখ পেতে হয় না তাকে যে প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে—প্রতিদিনই যে লোক উৎসবের আয়োজন করে চলেছে—যার উৎসবদিনের সঙ্গে প্রতিদিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য নেই, পরস্পর নাড়ির যোগ আছে।

এটি না হলেই আমাদের ঋণ করে উৎসব করতে হয়। আনন্দ করি বটে কিন্তু সে আনন্দের অধিকাংশই ঠিক নিজের কড়ি দিয়ে করি নে—তার পনেরো আনাই ধারে চালাই। লোক-সমাগম থেকে ধার করি, ফুলের মালা থেকে, আলো থেকে, সভাসজ্জা থেকে ধার করি—গান থেকে, বাজনা থেকে, বক্তৃতা থেকে ধার নিই। সেদিনকার উত্তেজনায় চেতনাই থাকে না যে, ধারে চালাচ্ছি—পরদিনে যখন ফুল শুকোয়, আলো নেবে, লোক চলে যায় তখন দেনার প্রকাণ্ড শূন্যতাটা চোখে পড়ে হৃদয়কে ব্যাকুল করে।

আমাদের এই দৈন্যবশতই উৎসবদেবতাকে আমরা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জন দিয়ে বসি—উৎসবের অধিপতিকে প্রতিদিনের সিংহাসনে বসাবার কোনো আয়োজন করি নে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা কয়জন প্রতিদিন প্রত্যুষে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্রে মিলে কিছু কিছু জমাচ্ছিলুম—আমরা এই উৎসবের মেলায় একেবারেই রবাহূত বিদেশীর মতো জুটি নি—আমাদের প্রতিদিনের সকালবেলার সব-ক'টিই হাতে হাতেই বাজে খরচ হয়ে যায় নি। আমার উৎসবকর্তাকে বোধ করি বলতে পেরেছি যে, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে, তোমার নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি।'

তার পরে আমাদের উৎসবকে হঠাৎ একদিনেই সাঙ্গ করে দেব না—এই উৎসবকে আমাদের দৈনিক উৎসবের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। প্রতিদিন প্রাতঃকালেই আমাদের দশজনের এই উৎসব চলতে থাকবে। আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতা এবং আত্মবিস্মৃতির মধ্যে অন্তত একবার করে দিনারম্ভে জগতের নিত্য-উৎসবের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করে যাব। যখন প্রত্যহই উষা তাঁর আলোকটি হাতে করে পূর্বদিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা কয়জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে অনুভব করব, আমাদের প্রত্যেক দিনই মহিমান্বিত, ঐশ্বর্যময়—আমাদের জীবনের তুচ্ছতা তাকে লেশমাত্র মলিন করে নি—প্রতিদিনই সে নবীন, সে উজ্জ্বল, সে পরমাশ্চর্য—তার হাতের অমৃত-পাত্র একেবারে উপুড় করে ঢেলেও তার এক বিন্দু ক্ষয় হয় না।

৯ পৌষ

একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না, আমাদের প্রাচীন সংহিতায় সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা করেছেন। কেননা একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহুদূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমন-কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।

আধ্যাত্মিক সঞ্চয় সম্বন্ধেও যে এ কথা খাটে না, তা নয়। আমরা যদি কোনো পুণ্যকে মনে করি যে ভবিষ্যৎ কোনো একটা ফললাভের জন্যে তাকে জমাচ্ছি, তা হলে জমানোটাই আমাদের পেয়ে বসে—তার সম্বন্ধে আমরা কৃপণের মতো হয়ে উঠি—তার সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিকতা একেবারে চলে যায়; সব কথাতেই কেবল আমরা সুদের দিকে তাকাই; লাভের হিসাব করতে থাকি।

এমন অবস্থায় পুণ্য আমাদের আনন্দকে উপবাসী করে রাখে এবং মনে করে উপবাস করেই সেই পুণ্যের বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক সাধনাক্ষেত্রেও অনেক কৃপণ আহারকে জমিয়ে তুলে প্রাণকে নষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক গৃহস্থালিতে আমরা কালকের জন্যে আজকে ভাবব না। তা যদি করি, তবে আজকেরটাকেই বঞ্চিত করব। আমরা জমানোর কথা চিন্তাই করব না, আমরা খরচই জানি। আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়। মনে করব না, তার থেকে আমরা শান্তিলাভ করব, পুণ্যলাভ করব, ভবিষ্যতে কোনো একসময়ে পরিত্রাণলাভ করব, বা আর কিছু। যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে তা হাতে হাতে সমস্তই তাঁকে ঢেলে শেষ করে দিতে হবে; তাঁকেই সব দেওয়াতেই সেই দেওয়ার শেষ।

যদি আমরা মনে করি তাঁর উপাসনা করে আমার পুণ্য হচ্ছে তা হলে সমস্ত পুজা ঈশ্বরকে দেওয়া হয় না, পুণ্যের জন্যেই তার অনেকখানি জমানো হয়। যদি মনে করতে আরম্ভ করি, ঈশ্বরের যে কাজ করছি তার থেকে লোকহিত হবে, তা হলে লোকহিতের উত্তেজনাটা ক্রমেই ঈশ্বরের প্রসাদলাভকে খর্ব করে দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

ধর্মব্যাপারে এই পাপের ছিদ্র দিয়েই বিষয়কর্মের সাংসারিকতার চেয়ে তীব্রতর সাংসারিকতা প্রবেশলাভ করে। তার থেকেই ক্রোধ বিদ্বেষ পরনিন্দা পরপীড়ন নিশাচরগণ ধর্মের নামে তাদের গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ে— মতের সঙ্গে মতের যুদ্ধে পৃথিবী একেবারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে— ঈশ্বর করবেন, সে আর মনে থাকে না; তখন ঈশ্বরের ভৃত্যেরাই ঈশ্বরের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য।

তাই আমার এক-একবার ভয় হয়, আমিও বা সকালবেলায় ক্রমে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কথা জমাবার ব্যাবসা খুলেছি। তোমরা কী করলে বুঝবে, তোমাদের কী করলে ভালো লাগবে, কী করলে আমার কথা হিতকর হয়ে উঠবে, এই ভাবনা ক্রমে বুঝি আমাকে পেয়ে বসে। তার ফল হবে এই যে, উপাসনার উপলক্ষে এমন একটা কিছু জমানো চলতে থাকবে যার দিকে আমার বারোআনা মন পড়ে থাকবে— যদি কেউ বলে, 'তোমার কথা ভালো বোঝা যাচ্ছে না' বা 'তুমি ভালো সাজিয়ে বলতে পার নি,' তা হলে আমার রাগ হবে।

শুধু তাই নয়, আমার কথার দ্বারা অন্য লোকে ফল পাবে, এই চিন্তা গুরুতর হয়ে উঠলে অন্য লোকের উপর জুলুম করবার প্রবৃত্তি ঘাড়ে চেপে বসে। যদি দেখি যে, মনের মতো ফল হচ্ছে না, তা হলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নয়, অন্যেরই বুদ্ধি ও স্বভাবকে ধিক্‌কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আর মনের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি নে যে, ঈশ্বর তাঁর বহুধাশক্তিযোগে বিচিত্র উপায়ে বিচিত্র মানবের মঙ্গল করুন; তখন আমাদের অসহিষ্ণু উদ্যম এই কথাই বলতে থাকে যে, আমারই শক্তি, আমারই বাক্য, আমারই উপায়ে পৃথিবীর লোককে আমারই মতে বাধ্য করে তার ভালো করুক।

সেইজন্যে ঐ আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা থেকে এই যে কিছু কিছু করে কথা বাঁচাচ্ছি, একেই আমি ভয় করি। এই কথা আমার বোঝা না হোক, আমার বন্ধন না হোক; আমার পথের বাধা না হোক। এই কথা সম্পূর্ণই তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত মনে করে যেন নিজ খাতে এর কোনো হিসাব না রাখি। এর যদি কোনো ফল থাকে তবে তুমি ফলাও— আমার মমতার নাড়ী বিচ্ছিন্ন করে এ যেন ভূমিষ্ঠ হয়। হে নীরব, এই প্রভাতের উপাসনার সমস্ত বাক্যকে তুমি গ্রহণের দ্বারাই সফল করো আমার কণ্টকিত অহংকারের বৃন্ত থেকে একে একেবারে উৎপাটিত করে নাও।

১০ পৌষ

সেই যে সেদিন ভাঙামেলার ভোর রাত্রে নানা হাসিতামাশা-গোলমাল-তুচ্ছকথার মাঝখানে গান উঠেছিল— 'হরি, আমায় পার করো'—সে আমি ভুলতে পারছি নে, সে আমাকে আজও বিস্মিত করছে।

এই যে কথাটা মানুষ এতদিন থেকে বলে আসছে, 'আমায় পার করো,' এটা একটা আশ্চর্য কথা। তার এই আকাঙ্ক্ষাটা আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ জানে কি না, তাও বুঝতে পারি নে।

যদি কোনো সাধক সংসারের সমস্ত চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁর সাধন-সমুদ্রের কূলে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে সিদ্ধিদাতা, তুমি আমাকে সিদ্ধির কূলে পার করে দাও' তবে তার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু যার সম্মুখে কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো সাধনা নেই—তার নাবিক কোথায়, তার সমুদ্র কোথায়, সে কী পার হতে চাচ্ছে? তার এপারটাই বা কোথায়, আর ওপারটাই বা কোথায়?

আমরা আমাদের কাজকর্মের ভিড়ের মাঝখানে থেকেই বলছি, 'হরি, পার করো'; গাড়োয়ান যখন গাড়ি চালাচ্ছে বলছে, 'পার করো'; মুদি যখন চালডাল ওজন করছে, বলছে, "পার করো'।

মনে ক'রো না, তারা বলছে, 'আমাদের এই কর্ম হতেই পার করো।' তারা কর্মের মধ্যে থেকেই পার হতে চাচ্ছে, সেইজন্যে গান গাবার সময় তাদের কাজ কামাই যাচ্ছে না।

হে আনন্দসমুদ্র, এপারও তোমার, ওপারও তোমার। কিন্তু একটা পারকে যখন আমরা পার বলি, তখন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্যে ভিতরে ভিতরে কেবলই তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিণী। পার হবার জন্যে তাই এত ডাকাডাকি।

এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে, যতক্ষণ না বলতে পারছে, 'এইটে তোমারও ঘর' ততক্ষণ তার যে কত দাহ, কত বন্ধন, কত ক্ষতি, তার সীমা নেই—ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, 'হরি, আমায় পার করো।' যখনি সে আমার ঘরকে তোমার ঘর করে তুলতে পারে তখনই সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হয়ে যায়। আমার কর্ম মনে করে আমি-লোকটা রাত্রিদিন যখন হাঁসফাঁস করে বেড়ায়, তখন সে কত আঘাত পায় আর কত আঘাত করে, তখনই তার গান, 'আমায় পার করো'—যখন সে বলতে পারে, 'তোমার কর্ম', তখন সে পার হয়ে গেছে।

আমার ঘরকে তোমার ঘর করব, আমার কর্মকে তোমার কর্ম করব তবেই তো আমাতে তোমাতে মিল হবে। আমার ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে যাব, আমার কর্ম ছেড়ে তোমার কর্মে যাব এ কথা আমাদের প্রাণের কথা নয়। কেননা, এও যে বিচ্ছেদের কথা। যে-আমির মধ্যে তুমি নেই, আর যে-তুমির মধ্যে আমি নেই দুইই আমার পক্ষে সমান।

এইজন্যেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই, আমাদের কাজকর্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠছে, আমায় পার করো।' এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার।

১১ পৌষ

যার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে মাত্র সে আমার পাশে বসে থাকলেও তার আর আমার মাঝখানে একটি সমুদ্র পড়ে থাকে—সেটি হচ্ছে অচৈতন্যের সমুদ্র, ঔদাসীন্যের সমুদ্র। যদি কোনো-দিন সেই লোক আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে ওঠে তখনি সমুদ্র পার হয়ে যাই। তখন আকাশের ব্যবধান মিথ্যা হয়ে যায়, দেহের ব্যবধানও ব্যবধান থাকে না, এমন-কি, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তরাল রচনা করে না। যে অহংকার আমাদের পরস্পরের চারি দিকে পাঁচিল তুলে পরস্পরকে অতিনিকটেও দূর করে রাখে, সে যার জন্যে পথ ছেড়ে দেয় সেই আমাদের আপন হয়ে ওঠে।

সেইজন্যে কাল বলেছিলুম সমুদ্র পার হওয়া কোনো একটা সুদূরে পাড়ি দেবার ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে কাছের জিনিসকেই কাছের করে নেওয়া।

বস্তুত আমাদের যত কাছের জিনিস যত দূরে রয়েছে তার দূরত্বটাও ততই ভয়ানক। এই কারণেই, আমরা আত্মীয়কে যখন পর করি তখন পরের চেয়ে তাকে বেশি পর করি। যার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আছি তাকে যখন অনুভবমাত্র করি নে তখন সেই অসাড়তা মৃত্যুর অসাড়তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই, জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তাঁকেই যখন দূর বলে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন— যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ তিনি ঐ স্থূল দেয়ালের চেয়ে দূরে দাঁড়ান— সংসারে তখন এমন কোনো দূরত্ব নেই যার চেয়ে দূরে তিনি সরে না যান। এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি নে বটে কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব, আমাদের ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

অথচ যে সমুদ্রপারের জন্যে আমরা কেঁদে বেড়াচ্ছি সে পারটা যে কত কাছে— এমন-কি, এপারের চেয়েও যে সে কাছে, সে কথা, যাঁরা জানেন, তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন। শুনলে হঠাৎ আমাদের চমক লাগে— মনে হয় এত কাছের কথাকেও আমরা এতই দূর করে জেনেছিলুম। একেই বলেছিলুম, অগম্য, অপার, অসাধ্য।

যাঁরা সমুদ্র পার হয়েছেন তাঁরা কী বলেন! তাঁরা বলেন, এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমাসম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এষঃ মানে ইনি— এই সামনেই যিনি, এই কাছেই যিনি আছেন। অস্য মানে ইহার— সেও খুব নিকটের ইহার। ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি। যিনি যার পরম গতি তিনি তার থেকে লেশমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাঁকে ইনি বললেই হয়, তাঁর নাম করবারও দরকার নেই— 'এই যে ইনি' বলা ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না। ইনিই হচ্ছেন ইহার সমস্তই। ইনি যে কে এবং ইহার যে কাহার সে আর বলাই হল না। সমুদ্রের এপারে যে আছে সে তো ওপারের লোককে এষঃ বলে না, ইনি বলে না।

ইনি হচ্ছেন ইহার পরমাগতি। আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খ্যাতি আমাদের চালায়, মানুষ আমাদের চালায়; যিনি পার হয়েছেন তিনি বলেন ইনিই ইহার গতি— এঁর টানেই এ চলেছে— টাকার টান, খ্যাতির টান, মানুষের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্ছে এঁর— সব টান যেতে পারে কিন্তু সে টান থেকেই যায়— কেননা সব যাওয়ার মধ্যেই তাঁর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না 'তুমি এইখানেই থেকে যাও', খ্যাতিও বলে না, মানুষও বলে না— সবাই বলে 'তুমি চলো'— তিনি পরমাগতি তিনিই গতি দিচ্ছেন, আর-কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মতো আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?

আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই-যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারানক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি।

এই পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'— কেই বা কোনোপ্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তগতি দান করে রয়েছেন— আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি।

তাই আমি বলছি, আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমা-

গতি আছেন। যেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণশক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমাগতি, তিনি হচ্ছেন এষঃ, এই ইনি। সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়— এই-যে এইখানেই।

তার পরে যিনি আমাদের পরম সম্পৎ, আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের পরম আনন্দ— তিনি আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত সম্পদ, প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রয় এবং প্রতিদিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের ধনজন, আমাদের ঘরদুয়ার, আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই যিনি পরমরূপে রয়েছেন তিনি যে এষঃ— তিনি যে ইনি— এই-যে এইখানেই।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে, আমার সমস্ত আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এষঃ বলে জানব— একেই বলে পার হওয়া।

১২ পৌষ

প্রতিদিনই আলোক এবং অন্ধকার, নিদ্রা এবং জাগরণ, সংকোচন এবং প্রসারণের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে— একবার তার জোয়ার একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিদ্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহৃত হয়ে আসে। সকাল বেলায় সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাহৃত হয় সেই সময়েই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই? আর সকালে যখন আমাদের শক্তি অন্যের দিকে নানা পথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনি কি আমরা নিজেকে হারাই?

ঠিক তার উল্টো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনি আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে— সেইজন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি, কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন তখন তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। কারণ, সত্যকে সর্বত্র দেখলেই তার সত্যমূর্তি প্রকাশ পায় এবং সেই মূর্তিই আমাদের আনন্দ দান করে।

তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা কিছু সৃষ্টি করছে তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব পরিহার করে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে— এই তার যথার্থ সুখ। এইজন্যেই বলা হয়েছে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'— ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নেই। তার কারণ, অল্পে আত্মাও অল্প হয়।

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্রভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণবাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভ্যসমাজে যেখানে জ্ঞান প্রেম ও কর্মচেষ্টা নিয়ত দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে

আছে সেইখানে যে-মানুষ বাস করে সে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে না। সে ব্যক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পায়। এইজন্যেই সকলের যোগে ভূমার যোগে সভ্যসমাজবাসী প্রত্যেকেই যথাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও দুর্বল হয়ে থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী, ভূমার সঙ্গে যে-সকল সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই— সেখানে চিত্তসমুদ্রের জোয়ার এসে পেঁৗছোয় না; এইজন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য নিজের গৌরব অনুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

এইজন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওয়ে টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ রেলওয়ে টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ— কোনো স্থানীয় ইস্টেশন বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সংকীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্মবুদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বহুলোককে বহুবন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল হওয়া চাই। সেখানে ধৈর্যবীর্য অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈষা সমস্তই খুব বড়ো রকমের না হলে নয়। বস্তু কোনোমতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্মও বৃহৎ না হয়— ধর্ম যখনি দুর্বল হয় তখনি বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কখনোই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।

অতএব যখনি বহুব্যাপারবিশিষ্ট বহুদূরব্যাপ্ত বহুশক্তিশালী কোনো সভ্যসমাজকে দেখব তখনি গোড়াতেই ধরে নিতে হবে তার ভিতরে একটি প্রবল ধর্মবুদ্ধি আছে— নইলে এতলোকের পরস্পরে বিশ্বাস পরস্পরে যোগ, এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

আমাদের দেশের সমাজেও সমস্ত ক্ষুদ্রতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাত্মা কখনোই বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত হতে পারবে না। সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ, অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলবে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে না।

সেই সুযোগ রচনা করবার জন্যে আমরা নানাদিক থেকে চেষ্টা করছি। কিন্তু ছোটো-বড়ো আমরা যা কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্ছি তার মধ্যে যদি কেবলই বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ছে এইটেই দেখা যায় তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে গোড়ায় ধর্মবুদ্ধির দুর্বলতা আছে— নিশ্চয়ই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে; নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার বল নেই এবং পূজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করবার চেষ্টা করছে; নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা রয়েছে, ক্ষমা নেই; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসায় ক্ষুদ্র বাধাতেই নিরস্ত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেখানে কৃতকার্যতার বাধা ঘটবে সেখানে নির্বাক উপ-করণের প্রতি দোষারোপ করে যেন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা না করি। পাপ আছে তাই বাঁধছে না, ধর্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা যাচ্ছে না। এইজন্যেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে সর্ববিষয়েই নিষ্ফল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি— এইজন্যেই আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা সম্মিলিত হয়ে মানবাত্মার উপযুক্ত বিহারক্ষেত্র নির্মাণ করছে না— আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্মা বিরাট পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট রূপ ধারণ করতে পারছে না।

১৩ পৌষ

যখন আমরা জাগ্রত থাকি তখন আমাদের শক্তির সঙ্গে শক্তির লীলা ঘটে। বিশ্বকর্মার বিশ্ব-কর্মের সঙ্গে আমাদের কর্মের যোগসাধন হয়। যিনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো-দধাতি'—তাঁরই সেই বহুবিভক্ত শক্তির বিচিত্র প্রবাহ-পথে আমাদের চেষ্টাকে চালন করে আমরা শক্তির আশ্চর্য গতি-সকল আবিষ্কার করে আনন্দিত হই। এক সময়ে যেখানে মনে করেছিলুম শক্তির শেষ, চলতে গিয়ে দেখতে পাই সেখান থেকে পথ আবার একটা নূতন বাঁক নিয়েছে; এমনি করে জগদ্ব্যাপারের সেই বহুধাশক্তির মধ্যে নিজের শক্তিকেও বহুধা করে দিয়ে তার সঙ্গে সকল দিকে সমান গতিলাভ করবার জন্যে আমাদের চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এমনি করে আমাদের জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মানসশক্তির জালকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করে নানা বেগ নানা স্পর্শ, নানা লাভের দ্বারা নিজেকে সার্থক করে।

কিন্তু কেবলই জাল বাইচ করে তো জেলের চলে না। জালে গ্রন্থি পড়ে, জাল ছিঁড়ে আসে, জাল মলিন হয়। তখন আবার সেগুলো সংশোধন করে নেবার জন্যে জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়।

রাত্রে নিদ্রার সময় আমরা প্রাণের জাল-বাওয়া, চেতনার জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিই। তখন সংশোধন ও ক্ষতি-পূরণের সময়। তখন আমাদের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিল মলিন জালটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিতে হয় 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ' যে পুরুষ, সকলে যখন সুপ্ত তখন জাগ্রত থেকে, প্রয়োজনসকলকে নির্মাণ করছেন।

অতএব একবার করে নিজের সমস্ত চেষ্টাকে সংবরণ করে সম্পূর্ণভাবে সেই বিশ্বপ্রাণের হাতে আমাদের প্রাণকে সমর্পণ করে দিতে হয়—সেই সময়ে আমরা গাছপালার সমান হয়ে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো বিচ্ছেদ থাকে না, আমাদের অহংকারের একেবারে নিবৃত্তি হয়, তখনি আমরা নিখিলের অন্তর্বর্তী যে গভীর আরাম তাকেই লাভ করি। জেগে উঠে বুঝতে পারি যে, বিশ্রামকে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র শূন্যতারূপে পাই নি, তা একটা পূর্ণ বস্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও সে একটা আরাম—সেটা হচ্ছে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত আরাম—যে আরামের শ্যামল মূর্তি ও নির্বাক প্রকাশ আমরা শাখাপল্লবিত নিস্তব্ধ বনস্পতির মধ্যে দেখতে পাই।

এই যেমন আমাদের প্রাণকে প্রতি রাত্রে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করে দিয়ে আমরা প্রভাতে নূতন প্রাণচেষ্টার জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হয়ে উঠি—তেমনি দিনের মধ্যে অন্তত একবার করে আমাদের আত্মাকে পরমাত্মার হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেবার প্রয়োজন আছে—নইলে আবর্জনা জমে ওঠে, ভাঙাচোরাগুলো সারে না, তাপ বাড়তেই থাকে—কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলো তাদের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে অন্তরে বাহিরে বিদ্রোহ রচনা করে।

সেইজন্যে প্রভাতে উপাসনার সময়ে আমাদের সকল চেষ্টাকে ক্ষান্ত করে সব রিপুকে শান্ত করে কিছুকালের জন্যে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করে নেওয়া দরকার—সেই সময়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে পরমাত্মাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিতে হবে; তা হলে সেই একান্ত আত্মবিসর্জনের সুগভীর শান্তির সুযোগে আমাদের মনের ব্যাধির মধ্যে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হবে, সমস্ত সংকোচন প্রসারিত হয়ে যাবে এবং হৃদয়গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে আসবে।

তার পরে উপাসনাশান্ত সেই আমাদের অন্তরপ্রকৃতি যখন সংসারে বিচিত্রের মধ্যে বহুর মধ্যে বিভক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে নানা আকারে প্রকারে আত্মোপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হবে তখন সকল কাজে সে গম্ভীরভাবে পবিত্রভাবে নিযুক্ত হতে পারবে, তখন কথায় কথায় চতুর্দিককে সে আঘাত দিতে থাকবে না, তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে শান্তি থাকবে। বিশাল বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে, যেটি থাকাতে সমস্ত চেষ্টার মূর্তি শান্ত ও শক্তির মূর্তি সুন্দর হয়ে উঠেছে—যেটি থাকাতে বিশ্বজগৎ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা অথবা প্রকাণ্ড

কারখানাঘরের মতো কঠোর আকার ধারণ করে নি— আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য থাকবে, আমাদের কর্মের মধ্যে সেই সৌন্দর্য ফুটে উঠবে।

আমরা যদি প্রতিদিন দিবসারম্ভে তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ ললাটে গ্রহণ করে নিয়ে যাই এবং সে কথা যদি স্মরণ রাখি তবে ললাটকে আর ধূলিতে লুণ্ঠিত করতে পারব না। এই উপাসনার সুরটি যেন তানপুরার সুরের মতো আমাদের মধ্যে সমস্তদিন নিয়তই বাজতে থাকে— যাতে আমরা আমাদের প্রত্যেক কথাটি এবং ব্যবহারটিকে সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করতে পারি এবং সমস্ত দিনকে বিশুদ্ধ সংগীতে পরিণত করে সংসারের কর্মক্ষেত্রকে আনন্দক্ষেত্র করে তুলতে পারি।

১৪ পৌষ

প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখো, সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়। আমি যে কিছুমাত্র ক্ষুদ্র নই, অশক্ত নই, মানবসমাজে মহাপুরুষেরা তার প্রমাণ দিয়েছেন— তাঁদের যে সিদ্ধি সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি— আমাদের প্রত্যেক আত্মার শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাতির ঊর্ধ্বভাগ যখন আলোকশিখা লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির। বাতির নিতান্ত নিম্ন ভাগেও সেই জ্বলবার ক্ষমতা রয়েছে— যখন সময় হবে সেও জ্বলবে— যখন সময় না হবে তখন সে উপরের জ্বলন্ত অংশকে ধারণ করে থাকবে। প্রতিদিন প্রভাতের উপাসনায় নিজের ভিতরকার মানবাত্মার সেই মাহাত্ম্যকে আমরা যেন একেবারে বাধামুক্ত করে দেখে নিতে পারি। নিজেকে দীন দরিদ্র বলে আমাদের যে ভ্রম আছে সেই ভ্রম যেন দূর করে যেতে পারি। আমরা যে কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে একটা সংস্কার নিয়ে বসে আছি সেটা যেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকে আমার এই শরীরের জন্ম, সেইজন্যে বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিষ্ক কুটুম্বগণ আমাদের তত্ত্ব নেবার জন্যে আলোকের দূত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর আমার অহংকারটুকুর মধ্যেই যে আমার আত্মার চরম আবাস তা নয়— যে অধ্যাত্মলোকে তার স্থিতি সে হচ্ছে ব্রহ্মলোক। যে জগৎসভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসি নি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা হেঁট করে সংকুচিত হয়ে সংসারে সঞ্চরণ না করি— নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

আকাশের অন্ধকার যেমন নিতান্ত কাল্পনিক পদার্থের মতো দেখতে দেখতে কেটে গেল— আমাদের অন্তরপ্রকৃতির চার দিক থেকে সমস্ত মিথ্যা সংস্কার তেমনি করে মুহূর্তে কেটে যাক। আমাদের আত্মা উদয়োন্মুখ সূর্যের মতো আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামুক্ত জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাক— তার উজ্জ্বল চৈতন্যে তার নির্মল আলোকে আমাদের সংসারক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হোক।

১৫ পৌষ

জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে— ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে; কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই— যেখানে

আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে আজ আমি বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এ-সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্ব— এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহা বিজনলোকে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

হে আমার প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে—সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানবজন্ম তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্যের সঙ্গে সংগীতের সঙ্গে পবিত্রতার সঙ্গে মহত্ত্বের সঙ্গে সচেতনভাবে বহন করে নিয়ে যায়। আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনোদিন কোনোমতেই না ভোলে। অনন্ত বিশ্বসংসারে এই যে একটি আমি হয়েছি মানবজীবনে এই আমি সার্থক হোক।

এই আমিটিকে আর-সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে ধরে নিয়ে এসেছ কিন্তু কারো সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেল নি। কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছে। তোমার সেই অনাদিকালের সংগ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা—সেই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হোক তোমার চেয়ে বড়ো না হোক। আর আমার এই যে সাধারণ জীবন যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে, আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ আনন্দ অনন্তকালের সুহৃদ্ ও সারথিরূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না দাঁড়ায়। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করি, না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু আমিরূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেননা স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না। এইজন্যে এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ, আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃস্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম, প্রিয়তম, এই আমি-নিকেতনেই যে তোমার চরমলীলা। সেইজন্যেই তো এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান—সেইজন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু—এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে। এই দুঃখ ও সুখ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত ও মৃত্যু, এই তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে পারি, আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছুই চাই নে।

১৬ পৌষ ১৩১৫

কাল রাত্রে এই গানটা আমার মনের মধ্যে বাজছিল—

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে।
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব,
সব বাধা ভাঙিয়া দাও।

কিন্তু এ কেমন প্রার্থনা। এ প্রেম কার সঙ্গে। মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে।

বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মানুষ যে কত ক্ষুদ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র, আমার সুখ-দুঃখ কতই অকিঞ্চিৎকর। সৌরজগতের মধ্যে সেই মানুষ এক মুষ্টি বালুকার মতো যৎসামান্য— এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে এই সৌরজগতের স্থান এত ছোটো যে অঙ্কের দ্বারা তার গণনা করা দুঃসাধ্য।

সেই-সমস্ত অগণ্য অপরিচিত লোকলোকান্তরের অধিবাসী এই মুহূর্তেই সেই বিশ্বেশ্বরের মহারাজ্যে তাদের অভাবনীয় জীবনযাত্রা বহন করছে। এমন-সকল জ্যোতিষ্কলোক অনন্ত আকাশের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে যার আলোক যুগযুগান্তর হতে অবিশ্রাম যাত্রা করে আজও আমাদের দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করে নি। সেই-সমস্ত অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকও সেই পরম-পুরুষের পরমশক্তির উপরে প্রতিমুহূর্তেই একান্ত নির্ভর করে রয়েছে, আমরা তার কিছুই জানি নে।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর— তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বসবে! অনন্ত আকাশের নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোমহুতাশন যুগযুগান্তর জ্বলছে, আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে!

বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই এ কথা জানা কথা। শুনেছি নাকি আর-একটা পৃথিবী যদি থাকত তবে তিনি জয়যাত্রায় বেরোতেন। দুবেলা যার অন্ন জোটে না সেও কুবেরের ভাণ্ডারের স্বপ্ন দেখে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে কোনো কল্পনাকেই অসম্ভব বলে মানে না এমন প্রমাণ অনেক আছে।

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায়, এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহংকারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তার প্রেমের জন্যে যে লোক খেপেছে— সে যে নিজেকে দীন করে— সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী তাঁদের পায়ের ধুলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্যের কাঙাল সে নয়— সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেইজন্যেই জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে আমার মনে হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়— এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য, বড়ো লাভ বলে চায়। কেন চায়? কেননা মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম এতে আর ভয় লজ্জা কিসের।

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এইখানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড়ো দাবি— সমস্ত সূর্য তারার চেয়ে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশ্বের

ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তা হলে সে যে একে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গৌরব রক্ষা করে কেমন মাথা তুলে চলেছে। পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মাঝখানে থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেইজন্যেই জগতের সঙ্গে নিজেকে ওজন করে ক্ষুদ্র বললে তো চলবে না। তার সঙ্গে আমি তো তুলনীয় নই।

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন, 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।' বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

তাঁর জগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা দিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ-বাতাসের অনেক রকমের ট্যাক্‌স আছে, সমস্তই আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়—যেখানে কিছু দেনা পড়ে সেই-খানেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার এই আমিটুকু একেবারে লাখেরাজ, ঐখানেই বন্ধুর মন্দির কিনা, আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব—যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত। কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন—বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, 'আমার চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজনদরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।'

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি, 'আমি তোমাকে চাই নে।' সে কথা তাঁর ধূলি-জলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, 'তোমাকে আমি চাই নে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই'—তিনি বলেন, 'আচ্ছা বেশ।'

এ দিকে কখন এক সময়ে হুঁশ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি তো আমার খাতাঞ্জির হাতে নেই—টাকাকড়ি ধনদৌলত তো সেখানে কোনোমতে পৌঁছোয় না। ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা ঘরটি জগতের আর একটি মহান একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যেদিন বলতে পারব 'আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এসো'; যেদিন বলতে পারব 'চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার' সেই দিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন—সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সেদিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটবে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জানব তাঁর প্রেমকে ততই বড়ো করে বুঝব। তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব, নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়। এইজন্যে প্রেম যখন লাভ করি তখন নিজেকে বড়ো করে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হয় না—বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুখ দেয়—তখন

তাঁর লীলার ভিতরকার একটি মস্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝতে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, জগতে আমি যতই ক্ষুদ্র যতই দীন, দুর্বল, নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দ্বারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্থ। আমি অনন্তভাবে দীন বলেই দুর্বল বলেই তাঁর অনন্ত প্রেমের দ্বারা ধন্য হয়েছি।

১৭ পৌষ

সকালবেলা থেকেই আমার সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। কেননা, এ যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই হচ্ছে এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কী চাই কী না চাই, আমি কাকে রাখব কাকে ছাড়ব সেই কথাকে মাঝখানে নিয়েই আমার সংসার।

আমাকে বিশ্বভুবনের ভাবনা ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য উঠছে না, বায়ু বইছে না, অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড়ো ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেননা সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এতবড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোটো সংসারের অতি ছোটো কথা আমার কাছে ছোটো বলে মনে হয় না। আমার প্রভাতের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্যোদয়ের সম্মুখে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না; এমন-কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চলতে পারে।

এই তো দেখতে পাচ্ছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করছে। একটি হচ্ছে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর-একটি আমার এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা তো রাজত্ব করেন আবার তাঁর অধীনস্থ তালুকদার, সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই আপনার রাজত্বটুকু বসিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্যের সমস্ত লক্ষণ আছে— কেননা ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এই যে আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন— যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্ছে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ— এ কথার আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। যিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন— দানপত্রে আছে 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ' আমরা একে ভোগ করতে পারব।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর-কাউকেই মানি নে— এই বলে সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে আমরা স্পর্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর-একটি তত্ত্ব আছে— স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে— ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত না হতে পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। যেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজনের কথা সেখানে জোর খাটানো চলে— জোর করে খাবার কেড়ে খেয়ে ক্ষুধা মেটে। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রয়োজনহীন, যেখানে অহেতুক-ভাবে সে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে থাকে, সেখানে সে যা চায় তাতে একেবারেই জোর খাটে না, কারণ, সেখানে সে ইচ্ছাকেই চায়। সেখানে কোনো বস্তু, কোনো উপকরণ, কোনো স্বাধীনতার গর্ব, কোনো ক্ষমতা তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না— সেখানে সে আর-একটি ইচ্ছাকে চায়। সেখানে সে যদি কোনো উপহার-সামগ্রীকে গ্রহণ করে তবে সেটাকে সামগ্রী বলে গ্রহণ করে না— যে ব্যক্তি দান করেছে তারই ইচ্ছার নিদর্শন বলে গ্রহণ করে— তার ইচ্ছারই দামে এর দাম। মাতার সেবা যে ছেলের কাছে এত মূল্যবান সে তো কেবল সেবা বলেই মূল্যবান নয়, মাতার ইচ্ছা বলেই তার এত

গৌরব; দাসের দাসত্ব নিয়ে আমার ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা মেটে না— বন্ধুর ইচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের জন্যেই সে পথ চেয়ে থাকি।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না। সেখানে নিজেকে তার খর্ব করতেই হয়। এমন-কি, তাকে আমরা বলি ইচ্ছা বিসর্জন দেওয়া। ইচ্ছার এই যে অধীনতা এমন অধীনতা আর নেই। দাসতম দাসকেও আমরা কাজে প্রবৃত্ত করতে পারি কিন্তু তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারি নে।

আমার যে সংসারে আমার ইচ্ছাই হচ্ছে মূল কর্তা সেখানে আমার একটা সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সম্মিলিত করা। যত তা করতে পারব ততই আমার ইচ্ছার রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকবে— আমার সংসার ততই বৃহৎ হয়ে উঠবে। সেই গৃহিণীই হচ্ছে যথার্থ গৃহিণী যে পিতামাতা ভাইবোন স্বামী পুত্র দাসদাসী পাড়া প্রতিবেশী সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সুসংগত করে আপনার সংসারকে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে গঠিত করে তুলতে পারে। এমন গৃহিণীকে সর্বদাই নিজের ইচ্ছা খাটো করতে হয়, ত্যাগ করতে হয়, তবেই তার এই ইচ্ছাধিষ্ঠিত রাজ্যটি সম্পূর্ণ হয়। সে যদি সকলের সেবক না হয় তবে সে কর্ত্রী হতেই পারে না।

তাই বলছিলুম আমাদের যে ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীনতার সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, সেই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্তি। ইচ্ছা যে অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে। ইচ্ছা আপনাকে উদ্যত করে নিজের যে ঘোষণা করে তাতেই তার শেষ কথা থাকে না, নিজেকে বিসর্জন করার মধ্যেই তার পরম শক্তি, চরম লক্ষ্য নিহিত।

ইচ্ছার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম যে অন্য ইচ্ছাকে সে চায়, কেবল জোরের উপরে তার আনন্দ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও সে ধর্ম আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি ইচ্ছাকে চান। এই চাওয়াটুকু সত্য হবে বলেই তিনি আমার ইচ্ছাকে আমারই করে দিয়েছেন— বিশ্বনিয়মের জালে একে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেন নি— বিশ্বসাম্রাজ্যে আর-সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ঐ একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি— সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা— ঐটি তিনি কেড়ে নেন না— চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ঐ একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল— কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছাটুকুর জন্যে প্রতিদিন যে আমার দ্বারে আসছেন আর যাচ্ছেন তার নানা নিদর্শন আছে। এইখানে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব করেছেন, কেননা এখানেই তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নেমে এসেই তাঁর প্রেমের সম্পদ প্রকাশ করেছেন— আমারও ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সংগত করে তাঁর অনন্ত ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন— কেননা ইচ্ছার কাছে ছাড়া, ইচ্ছার চরম প্রকাশ হবে কোথায়? তিনি বলছেন, 'রাজখাজনা নয়, আমাকে প্রেম দাও।'

তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তো তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক অদ্ভুত আমির লীলা ফেঁদে বসেছ— এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

১৮ পৌষ

ঈশ্বর সত্যং। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এতটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং অমোঘ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু তিনি তো শুধু সত্য নন— তিনি 'আনন্দরূপমমৃতং'। তিনি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখছি কোথায়?

আমি পূর্বেই আভাস দিয়েছি আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জোর খাটে না, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা যেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিথিল করে দিই— সেদিন স্বার্থকে শিথিল করি, প্রয়োজনকে শিথিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিথিল করি, সংসারের কঠিন সংকোচকে শিথিল করি— তবেই ঘরের মাঝখানে এমন একটুখানি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয়, এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার; কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত, এটুকু না জানলে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বদ্ধ করছে কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না।

অতএব দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর-কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে 'ছাই তোমার সৌন্দর্য' মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয়। কোনো আইন নেই, কোনো পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব জগতে ঈশ্বরের এই যে অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্যের আয়োজন, এ আমাদের কাছে কোনো মাসুল কোনো খাজনা আদায় করে না, এ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়— বলে, 'আমাতে তোমাতে আনন্দ হোক: তুমি স্বতঃ আমাকে গ্রহণ করো।'

তাই আমি বলছিলুম, আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে, জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে। সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তা হলে জোড়হাত করে তাঁকে মানতুম— কিন্তু তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না— সেইজন্যে পাপ-ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে তো চলবে না— শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছার সঙ্গে স্বীকার না করে তবে জন্ম-জন্ম সে কেবল দাস, দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে। মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম, সে খবরটা সে যে একেবারে পাবেই না। ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্যের দৃষ্টি পৌঁছোয় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জেলে তোল্। যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি, তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না— বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না।

কেন যে আমি 'আমি' হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরেছি, সেদিন সেই বিরহ-দুঃখের রহস্য একমুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

১৯ পৌষ

কেউ কেউ বলেন, উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান নেই—উপাসনা কেবলমাত্র ধ্যান। ঈশ্বরের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

সে কথা স্বীকার করতে পারতুম যদি জগতে আমরা ইচ্ছার কোনো প্রকাশ না দেখতে পেতুম। আমরা লোহার কাছে প্রার্থনা করি নে, পাথরের কাছে প্রার্থনা করি নে—যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।

ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়মরূপে তাঁর প্রকাশ হত তা হলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু তিনি নাকি 'আনন্দরূপমমৃতং', তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে, ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয়।

পূর্বেই বলেছি জগতে ইচ্ছার একটি নিদর্শন পেয়েছি সৌন্দর্যে। এই সৌন্দর্য আমাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে এবং ইচ্ছার উপরেই তার নির্ভর। এইজন্যে আমরা সৌন্দর্যকে উপকরণরূপে ব্যবহার করি প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়। এইজন্যে আমাদের সজ্জা, সংগীত, সৌন্দর্য সেইখানেই, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মিলন। জগদীশ্বর তাঁর জগতে এই অনাবশ্যক সৌন্দর্যের এমন বিপুল আয়োজন করেছেন বলেই আমাদের হৃদয় বুঝেছে, জগৎ একটি মিলনের ক্ষেত্র—নইলে এখানকার এত সাজসজ্জা একেবারেই বাহুল্য।

জগতে হৃদয়েরও একটা বোঝবার বিষয় আছে, সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? একদিকে আলোক আছে বলেই আমাদের চক্ষু আছে; একদিকে সত্য আছে বলেই আমাদের চৈতন্য আছে—একদিকে জ্ঞান আছে বলেই আমাদের বুদ্ধি আছে; তেমনি আর একদিকে কী আছে আমাদের মধ্যে হৃদয় হচ্ছে যার প্রতিরূপ? উপনিষৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—'রসো বৈ সঃ।' তিনিই হচ্ছেন রস—তিনিই আনন্দ।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আমরা শক্তির দ্বারা প্রয়োজন সাধন করতে পারি, যুক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারি কিন্তু আনন্দের সম্বন্ধে শক্তি এবং যুক্তি কেবল দ্বার পর্যন্ত এসে ঠেকে যায়—তাদের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই আনন্দের সঙ্গে একেবারে অন্তঃপুরের সম্বন্ধ হচ্ছে ইচ্ছার। আনন্দে কোনোরকম জোর খাটে না—সেখানে কেবল ইচ্ছা, কেবল খুশি।

আমার মধ্যে এই ইচ্ছার নিকেতন হচ্ছে হৃদয়। আমার সেই ইচ্ছাময় হৃদয় কি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত! তার পুষ্টি হচ্ছে মিথ্যায়, তার গম্য স্থান হচ্ছে ব্যর্থতার মধ্যে? তবে এই অদ্ভুত উপসর্গটা এল কোথা থেকে, একমুহূর্ত সে আছে কোন্ উপায়ে। জগতের মধ্যে কি কেবল একটিমাত্রই ফাঁকি আছে। এবং সেই ফাঁকিটিই আমার এই হৃদয়?

কখনোই নয়। আমাদের এই ইচ্ছা-রসময় হৃদয়টি জগদ্ব্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা—সেইখান থেকেই সে আনন্দরস পেয়ে বেঁচে আছে—না পেলে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়—সে অন্নবস্ত্র চায় না, বিদ্যাসাধ্য চায় না, অমৃত চায়, প্রেম চায়। যা চায় তা ক্ষুদ্ররূপে সংসারে এবং চরমরূপে তাঁতে আছে বলেই চায়—নইলে কেবল রুদ্ধদ্বারে মাথা-খুঁড়ে মরবার জন্যে তার সৃষ্টি হয় নি।

অতএব হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনন্তের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অন্যদিকেও আছে—অন্যদিকে না থাকলে সে নিমেষকালও থাকত না—এতটুকু কণামাত্রও থাকত না যাতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়া-টুকুও চলতে পারে। সেইজন্যেই উপনিষৎ এত জোর করে বলেছেন, 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ

যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি'। কেই বা শরীরের চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ-ধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকতেন—ইনিই আনন্দ দেন।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্যসাধন করে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ প্রার্থনা-দূতী। এইজন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশির যে নানা সুর বেজে উঠছে সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা—আমাদের হৃদয়কে তিনি এই অনির্বচনীয় সংগীতে ডাক দিয়ে চাচ্ছেন, সেইজন্যেই তো এই সৌন্দর্য-সংগীত আমাদের হৃদয়ের বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলে।

সেই ইচ্ছাময় এমনি মধুরস্বরে যেখানে আমাদের ইচ্ছাকে চাচ্ছেন, সেখানে তাঁর সমস্ত জোরকে একেবারে সংবরণ করেছেন—যে প্রচণ্ড জোরে তিনি সৌরজগৎকে সূর্যের সঙ্গে অমোঘরূপে বেঁধে দিয়েছেন সেই জোরের লেশমাত্র এখানে নেই—সেইজন্যে এমন করুণ, এমন মধুর স্বরে এমন নানা বিচিত্র রসে বাঁশি বাজছে—আহ্বানের আর অন্ত নেই।

তাঁর এমন আহ্বানে আমাদেরও মনের প্রার্থনা কি জাগবে না? সে কি তার বিরহের ধূলি-আসনে লুটিয়ে কেঁদে উঠবে না? অসত্য, অন্ধকার এবং মৃত্যুর নিরানন্দ নির্বাসন থেকে অভিসার-যাত্রার সময়ে এই প্রার্থনা-দূতীই কি তার কম্পিত দীপশিখাটি নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলবে না?

যতদিন আমাদের হৃদয় আছে, যতদিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানাসৌন্দর্য দ্বারা এই জগৎকে আনন্দনিকেতন করে সাজাচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মানুষের বেদনা ঘুচবে কী করে? ততদিন কোন্ সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমান মানুষের প্রার্থনাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে।

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পঙ্কশয্যা থেকে ব্যাকুল শতদলের মতো তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমুখে মুখ তুলছে—তার সমস্ত সৌগন্ধ্য এবং শিশিরাশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করে দিয়ে বলছে—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।' মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পূজোপহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে?

২০ পৌষ

এই ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠলেই তার উল্টো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে, তবে এত শাসন বন্ধন কেন? যা চাই তা পাই নে কেন, যা চাই নে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন?

এইখানে মানুষ তর্কের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। সে বলছে, 'স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।'

অর্থাৎ যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন, 'স এব বন্ধুঃ' তিনি তো আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকত তবে তো আমি থাকতুমই না। আবার 'স বিধাতা'। বিধাতা আর দ্বিতীয় কেউ নয়—যিনি জনিতা তিনিই বন্ধু, বিধানকর্তাও তিনি—অতএব বিধান যাই হোক, মূলে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু বিধান জিনিসটা তো খামখেয়ালি হলে চলে না; আজ একরকম, কাল অন্যরকম—আমার পক্ষে একরকম, অন্যের পক্ষে অন্যরকম—কখন কী রকম তার কোনো স্থিরতা নেই, এ তো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখ-সুবিধার জন্য যদি বলি, তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন

করে দাও—এক জায়গায় অন্য-সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য করে দাও, তা হলে বস্তুত বলা হয় যে, এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও।

এই বিধান জিনিসটা কারো একলার নয় এবং কোনো একখণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনোকালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষৎ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ' তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথাতথরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল—এ বিধান অনাদি অনন্তকালের বিধান; তার পরে আবার, এই বিধান যাথাতথ্যতঃ বিহিত হচ্ছে—এর আদ্যোপান্তই যথাতথ—কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

কিন্তু শুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লৌহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতা-রূপেই বসে থাকেন তা হলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তা হলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু তিনি শুধু তো বিধাতা নন, 'স এব বন্ধুঃ'—তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্রে নয়--সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে—আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর-একদিকে আত্মা—একদিকে রাজার খাজনা জোগায় আর-একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর-একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।

যেদিকে আমি ইঁট কাঠ গাছ পাথরের সমান সেই সাধারণ দিকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপী নিয়ম কোনোমতেই আমাকে সাধারণ থেকে লেশমাত্র তফাত হতে দেয় না—আর যেদিকে আমি বিশেষ ভাবে আছি সেই স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঈশ্বরের বিশেষ আনন্দ কোনোমতেই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলে যেতে দেয় না। বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন—সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর সেই তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাত্মা।

২১ পৌষ

প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দ্বারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দ্বারাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

এইজন্যে যেদিকে আমি সর্বসাধারণের, যেদিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, যেদিকে আমি মানব-প্রকৃতির, সেদিকে যদি আমি নিজেকে নিয়মের অনুগত না করি, তা হলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই এবং অশান্তির সৃষ্টি করি। একটি ধূলিকণার কাছ থেকেও আমি ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে পারি নে—তার নিয়ম আমি মানলে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এইজন্যে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।

এই শিক্ষাটির পরিণাম যিনি, তিনিই হচ্ছেন 'শান্তম্'। যেখানেই নিয়মের ভ্রষ্টতা, যেখানেই

নিয়মের সঙ্গে নিয়মের যোগ হয় নি, সেইখানেই অশান্তি। যেখানেই পরিপূর্ণ যোগ হয়েছে সেখানেই শান্তম্‌ যিনি, তাঁর পরিপূর্ণ উপলব্ধি।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্‌ স্বরূপ দেখতে পাই? তাঁর শান্তস্বরূপ। সেখানে যারা ক্ষুদ্র করে দেখে তারা প্রয়াসকে দেখে, যারা বৃহৎ করে দেখে তারা শান্তিকেই দেখতে পায়। যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাতথ না হত, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্ব-শান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তা হলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। কিন্তু চেয়ে দেখো, সূর্যনক্ষত্রলোকের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অটল নিয়মাসনে মহাশান্তি বিরাজ করছেন। সত্যের স্বরূপই হচ্ছে শান্তম্‌।

সত্য শান্তম্‌ বলেই শিবম্‌। শান্তম্‌ বলেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে ধ্রুব আশ্রয় পেয়েছে। আমরাও যেখানে সংযত না হয়েছি অর্থাৎ যেখানে সত্যকে জানি নি এবং সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা করে চলি নি সেখানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অশান্তি এবং সেই অশান্তিই অমঙ্গল— নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব!

যিনি শিবম্‌ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্‌ প্রকাশমান। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেইখানেই তিনি আনন্দময়, প্রেমময়, সেইখানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মঙ্গলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই— অমঙ্গলই হচ্ছে বিরোধ বিচ্ছেদের অপদেবতা।

একদিকে সত্য অন্যদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে যেতে হয়।

আমাদের দেশে যে তিন আশ্রম ছিল— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, তা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বৈতস্বরূপ।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্মের মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়— নতুবা গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সংসারে সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে হলেই স্বার্থবৃত্তিসকল সম্পূর্ণ পরাহত হয় এবং যথার্থ মিলনের ধর্ম যে কিরূপ নির্মল আত্মবিসর্জনের উপরে স্থাপিত তা আমরা বুঝতে পারি। যখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই যিনি অদ্বৈতম্‌ সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয়। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম, পরে প্রেম।

এইজন্যে যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র 'শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌'— তেমনি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র 'অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।' অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে, তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজপ্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী— এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা হোক।

২১ পৌষ

ঈশ্বর যে কেবল মানুষকেই পার্থক্য দান করেছেন আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক হয়ে রয়েছেন, এ কথা বললে চলবে কেন? প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর তো কোনো ক্রিয়া চলত না।

তফাত এই যে, মানুষ জানে সে স্বতন্ত্র— শুধু তাই নয়, সে এও জানে যে ঐ স্বাতন্ত্র্যে তার অপমান নয়, তার গৌরব। বাপ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে নিজের তহবিল থেকে একটি স্বতন্ত্র

তহবিল করে দেন তখন এই পার্থক্যের দ্বারা তাকে তিরস্কৃত করেন না—বস্তুত এই পার্থক্যেই তাঁর একটি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ পায় এবং এই পার্থক্যের মহাগৌরবটুকু মানুষ কোনোমতেই ভুলতে পারে না।

মানুষ নিজের সেই স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের অধিকারটি নিয়ে নিজে ব্যবহার করছে। প্রকৃতির মধ্যে সেই অহংকার নেই, সে জানে না সে কী পেয়েছে।

ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন। নিয়ম দিয়ে।

নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক করে দিতেন তা হলে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকত না। একাকার হয়ে থাকলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।

যে লোক দাবাবড়ে খেলায় নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চায় সে প্রথমে নিজের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। কেমন করে? নিয়ম রচনা করে। প্রত্যেক ঘুঁটিকে সে নিয়মে বদ্ধ করে দেয়। এই যে নিয়ম, এ বস্তুত ঘুঁটির মধ্যে নেই—যে খেলবে তারই ইচ্ছার মধ্যে। ইচ্ছা নিজেই নিয়ম স্থাপন করে সেই নিয়মের উপরে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে তবেই খেলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে, তা তো নয়। তার ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে—নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজন্যেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' সেইজন্যেই বলেন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ—অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা—ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা সীমার দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন সে যদি কেবলমাত্রই পার্থক্য হত তা হলে জগৎ তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তা হলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে, কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের একাকারে জানবার কিছুই থাকত না।

অতএব এর মধ্যে আর একটি জিনিস আছে যা এই চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করছে। সেটি কী? সেটি হচ্ছে শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই-সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে একে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবড়ের ঘুঁটির মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্যবিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।

এইজন্যই তাঁকে ঋষিরা বলেছেন 'কবিঃ'। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে—তিনিও তেমনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি' অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন—নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

'শক্তিযোগাৎ' শক্তি যোগের দ্বারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা পৃথক্‌কৃত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন—নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, রূপের সঙ্গে রূপান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের বহুবিচিত্রসংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।

এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকাল-স্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন—জগৎ-রচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে

পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তা হলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবন্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবন্ধ জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন— নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।

এই অহংকারে যদি কেবল পার্থক্যই সর্বপ্রধান হত তা হলে আত্মায় আত্মায় বিরোধ হবার মতোও সংঘাত ঘটতে পারত না— আত্মার সঙ্গে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শই থাকতে পারত না। কিন্তু তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে যোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যের নিহিতার্থটিকে জাগ্রত করে তুলছে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভয়ংকর নিরর্থক হত।

এখানেও সেই আশ্চর্য রহস্য। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক-বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতে কত আঁকাবাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটোবড়ো কত আসক্তি অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেমসমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।

২৩ পৌষ

প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র, এ কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে 'প্রচার' করছেন, আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে 'দান' করছেন।

অধিকাংশ মানুষ এই দুই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ বা প্রাকৃতিক দিকেই সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ বা আধ্যাত্মিক দিকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও এ সম্বন্ধে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারা অন্নপূর্ণার বরলাভ করে পরিপুষ্ট হয়।

তারা সর্ববিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড়ো জিনিস লাভ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের শ্রেষ্ঠ লাভ হচ্ছে শ্রেয়োনীতি।

কারণ, বড়ো হয়ে উঠতে গেলে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন-সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু বড়ো রকমে, স্থায়ী রকমে, সকলের চেয়ে সার্থক রকমে মিলতে গেলেই এমন একটি নিয়মকে স্বীকার করতে হয় যা মঙ্গলের নিয়ম— অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম— অর্থাৎ শ্রেয়োনীতি। এই নিয়মকে স্বীকার করলেই সমস্ত বিশ্ব আনুকূল্য করে— যেখানে অস্বীকার করা যায় সেইখানেই সমস্ত বিশ্বের আঘাত লাগতে থাকে— সেই আঘাত লাগতে লাগতে কোন্ সময়ে যে ছিদ্র দেখা দেয় তা চোখেই পড়ে না— অবশেষে বহুদিনের কীর্তি দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

যাঁরা শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করেন তাঁদের বড়ো বড়ো সাধকেরা এই নিয়মকে বিশেষ করে আবিষ্কার করেন। তাঁরা জানেন, নিয়মই শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল, তা ঈশ্বরের সম্বন্ধেও যেমন মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। নিয়মকে যেখানে লঙ্ঘন করব শক্তিকে সেইখানেই নিরাশ্রয়

করা হবে। যার আপিসে নিয়ম নেই সে অশক্ত কর্মী। যার গৃহে নিয়ম নেই সে অশক্ত গৃহী। যে রাষ্ট্রব্যাপারে নিয়ম লঙ্ঘন হয় সেখানে অশক্ত শাসনতন্ত্র। যার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপারে নিয়মকে দেখতে পায় না সে জীবনের সর্ব বিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত।

এইজন্যে যথার্থ শক্তির সাধকেরা নিয়মকে বুদ্ধিতে স্বীকার করেন, বিশ্বে স্বীকার করেন, নিজের কর্মে স্বীকার করেন। এইজন্যেই তাঁরা যোজনা করতে পারেন, রচনা করতে পারেন, লাভ করতে পারেন। এইরূপে তাঁরা যে পরিমাণে সত্যশালী হন সেই পরিমাণেই ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠতে থাকেন।

কিন্তু এর-একটি মুশকিল হচ্ছে এই যে, অনেক সময়ে তাঁরা এই শ্রেয়োনীতিকেই মানুষের শেষ সম্বল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলই কর্ম করা যায়, কেবলই শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ করা যায় সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রেয় বলে জানেন। এইজন্যে বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্মের আশ্রয়ভূত শ্রেয়োনীতিকেই তাঁরা পরম পদার্থ বলে অনুভব করেন।

কিন্তু যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশ্বর্যকে পায়, ঈশ্বরকে পায় না। কারণ ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের ঐশ্বর্যকে উদ্ঘাটন করেছেন।

এই অনন্ত ঐশ্বর্যসমুদ্র পার হয়ে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য কার আছে। ঐশ্বর্যের তো অন্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। সেইজন্যে ক্রমাগতই অন্তহীন একের থেকে আরের দিকে চলতে হয়। সেইজন্যেই মানুষ এই রাস্তায় চলতে চলতে বলতে থাকে-- ঈশ্বর নেই, কেবলই এই আছে, এবং এই আছে; আর আছে, এবং আরও আছে।

ঈশ্বরের সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে? আমরা যতই রেলগাড়ি চালাই আর টেলিগ্রাফের তার বসাই শক্তিক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর হতে অনন্ত দূরে থেকে যাই। যদি স্পর্ধা করে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তা হলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইজন্যেই জগতের সমস্ত ধর্মসাধকেরা বারংবার বলেছেন, ঐশ্বর্যপথের পথিকদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা চরমতাহীন পথে তাদের কেবলই ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব ঈশ্বরকে বাহিরে অর্থাৎ তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারি নে। সেখানে যে বালুকণাটির অন্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিঃশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের, কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায় সে অর্জুনের মতো ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে— সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না—সেখানে না হেরে উপায় নেই।

এই শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই—এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মূর্তি—এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে। আর-এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি—এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়; আমাদের কোনো দিক দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না—না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে। বড়ো বড়ো রাজ্যসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়—বড়ো বড়ো ঐশ্বর্যভাণ্ডার ভুক্তশেষ নারিকেলের খোলার মতো পড়ে থাকে। এখানে পাওয়ার মূর্তি খুব সুন্দর, উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত, কিন্তু যাওয়ার মূর্তি, হয় বিষাদে পরিপূর্ণ নয় ভয়ংকর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, কারণ, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান।

কিন্তু যেমনই হোক, এখানে পাওয়াও চরম নয়, যাওয়াও চরম নয়—এখানে পাওয়া এবং

যাওয়ার আবর্তন কেবলই চলেছে। সুতরাং এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়। এর কোনোখানে এসে মানুষ চিরদিনের মতো বলে না যে, এইখানে পৌঁছনো গেল।

২৪ পৌষ

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না।

এইজন্য শ্রেয়োনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিস—তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ, যে গৃহে কোনোকালেই মানুষ পৌঁছবে না, সে গৃহকে মানলেও হয়, না মানলেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি, তাকে উন্নতি না বললে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ, তাতে শক্তির চালনা হয়; লাভে শক্তির কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুত ঐশ্বর্যপদার্থের গৌরবই এই যে, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য আমাদের থামতে দেয় না; কিন্তু দুর্গতির পূর্বে দেখতে পাই মানুষ বলতে থাকে, 'এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি পেয়েছি।' তখন পথিকধর্ম সে বিসর্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে—তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কী করলে আটেঘাটে বাঁধা যায়, রক্ষা করা যায়, সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিসটা যে কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে 'আমার যথেষ্ট হয়েছে—এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব', সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে 'এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব'—তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে দুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—'এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।'

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি, পরিণাম কোথাও নেই, এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ কথা ঐশ্বর্যগর্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ কথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে আমরা তাঁকে পাই, কেননা তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই, জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে, কিন্তু পশুত্বলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারণ, আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না— বরঞ্চ তার চেষ্টা আরও গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন— এই ধরা দেওয়ার দরুন তিনি আমাদের কাছে ছোটো হয়ে যান না— তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়— সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না— এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কী বলব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর ভয় পান না।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন— যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? সেইজন্যে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।

সে দিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড়ো বলে তো বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা অহংকে বড়ো করে সফল হয়— আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা অহংকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্য দীন যে, সে সেখানে ধন্য। যে অহংকার করবার কিছুই রাখে নি, সেই ধন্য— কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্যেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি : নমস্তেঽস্তু— তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

জগতে তুমি রাজা অসীম-প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয়-মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয়দান।

২৫ পৌষ

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সব দিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে— সৌন্দর্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করছে। এই ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি— তাঁর একই দূত সকল পথেরই দূত হয়ে হাস্যমুখে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে, সত্যকে আমরা একমুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে

পাই নে। প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে— তদনুসারে দূরকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্যে নিকটকে বড়ো করে ও দূরকে ছোটো করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখছিলুম। এরকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তা হলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটেকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে হচ্ছে। এমন-কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যে দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

এ কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তা হলে এ কথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্য দিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্যমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয় তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তা হলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত; সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, 'হয় আমি মরব নয় তুমি মরবে।'

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি, তা হলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে 'আত্মা মরুক আমি থাকি', আত্মা বলে 'প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি'। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ও দিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ

একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে— জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই— কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্তবন্ধুর বন্ধুত্ব-সূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি।

২৬ পৌষ

আমাদের দেশের জ্ঞানীসম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা-কিছু জাগতিক ক্রিয়া, একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বি-জিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম।

যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে, তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই-সকল কর্মের দ্বারা বদ্ধ?

এক দিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর-এক দিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়সার জালের মতো, শামুকের খোলার মতো, তাঁর নিজেকে বদ্ধ করছে এ কথাও বলা চলে না। এইজন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বলছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুইরকমের হয়— এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় নতুবা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে, আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন; আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়, বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এইজন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া— আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তি-দান করতে থাকে। সেইজন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যেই তিনি আনন্দ, এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়বন্ধুর যে কাজ

করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বন্ধ করে না। শুধু বন্ধ করে না তা নয়, সেই কর্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে, যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে, তবে সেই বিনা বেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ংকর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্‌টা হবে? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ, কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে। এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।
কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এইসমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেইসঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হোক, আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন-- কোনো ক্রীতদাসও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত, তা হলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র যদি এই কর্মযোগের তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তা হলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন, আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে-- মৃত্যুং তীর্ত্বা-- অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে, তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন-- তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষ্যাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি-- 'যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'-- যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তা হলে তিনি কর্মকে স্বার্থসাধনের অঙ্গরূপেই একান্তভাবে গণ্য না করে তাকে কল্যাণময় ও বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারবেন-- যে আনন্দ আকাশে না থাকলে-- 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ'-- কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত, জগতের সেই-সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত না।

২৭ পৌষ

জ্ঞান প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সংগত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন, সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্যে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তা হলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠব তা হলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তবেই বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়—সেই স্বীকারের দ্বারাই সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বলছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি—কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেয়ে বড়ো হতে পারি। পরিত্যাগ করে পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ করো। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন, তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ। অর্থাৎ, তিনি হাঁ।

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

শুনেছি এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মুক্ত—কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্তিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই, প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা, স্বার্থপর, জগৎসংসারে তার সশ্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ফলকে সে যে চিরদিনের মতো আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্ম ত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি—তা ছোটোই হোক আর বড়োই হোক, সেই পরমাত্মার

স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বন্ধ করতে পারবে না— সেই কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

২৮ পৌষ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।

ব্রহ্মবিদ্‌দের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন— এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ— প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপে ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে 'ভবতে নাতিবাদী' অর্থাৎ, ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না— তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন ক'রে বলে? সেতারের তার যেমন ক'রে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে— সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে, স্পন্দিত করে, ঝংকৃত করে তিনি বলছেন— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি— তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন আর কেমন করে বলবেন? তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম? না, যে কর্মদ্বারা প্রকাশ পায় তিনি 'আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ', পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরববিস্তারে নয়। তিনি যে, 'নাতিবাদী'— তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত ক'রে তুলছেন— শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এমনি ক'রে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গললোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একই কালে আনন্দ ও কর্ম-রূপে প্রকাশমান, সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্মসংগীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো, কিন্তু যেন শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হোক, গভীর হোক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হোক—হে আবিঃ, তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হোক।

২৯ পৌষ

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের—অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল, তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন—প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে এক পাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎ-ক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্মদ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন, অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো, সে কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একই কালে একটি নির্গুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করি নি। তখন মনে হয়েছে জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে, কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ, যা-কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলই সকলের হাতে পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় 'তুমি দয়া করে জ্বলো', বাতাসকে বলতে হয় 'তুমি দয়া করে বও', সূর্যকে বলতে হয় 'তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না'।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না। 'অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ'—যেখানে ব্যবস্থা দেখতে পাই নে সেখানে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবি নেই, সেটা একেবারেই একতরফা।

অথচ যার সঙ্গে এতবড়ো কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে

বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও তো কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যেরকমই তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়, সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই তো বোঝাতে হয়। কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এরকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। সেও আবার এমন পর যে খামখেয়ালিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয়তো হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এইরকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়—কারণ, পালিয়ে যাব কোথায়? মরবার পথও যে এ আগলে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে—যখন দেখে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক সর্বত্রই সেই আলোক। এমন-কি, সর্বত্রই সেই আলোক অখণ্ড-রূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত।

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর তো বাধা পেল না। সে বলল, 'আঃ! বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার পিতৃভবন। আর তো আমাকে সংকুচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেখছিলুম যেন পাগলাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা ব'সে আছেন, সমস্তই আমার আপনার।'

এই তো হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়—নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজের শিকল ছিন্নভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান-প্রদান করবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়—কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে আর চুপ করে থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বদ্ধ ক'রে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয়-ঘরে নিয়তই ত্যাগ ক'রে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্মই হতে পারবে না।

তা, কী করা যাবে? নিন্দাই করো আর যাই করো, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন

হতেই চাচ্ছেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেইজন্যই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্যা করছেন।

জ্ঞান যেদিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন, তখনই আমাদের শক্তি সতী হন— তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয়-- তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জন যেমন, তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই, তবেই তো তাকে মুক্তি বলব— নির্গুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১ মাঘ

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয়, সমাজপ্রকৃতি বলে আর-একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ, সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে— মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় ততখানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি, তা হলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়— সমাজকে একটা প্রকাণ্ড-এঞ্জিনওআলা কারখানা বলে মানতে হয়— ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এইরকম অত্যন্ত প্রয়োজনওআলা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে তো কৃপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দীশাল-মূর্তি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে— সে বলে, 'প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কী। আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ বিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই— আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকব।'

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে, তখন এতবড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে? প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানব-সমাজের মূলগত নয়— প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়— তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধন-মুক্ত হয়ে যাব। তখনই বলে উঠব— 'প্রেম! আঃ বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই।' কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব-সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম। যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মুক্তি। তার পরে? তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক

বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, 'আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে।' কাজেই, যেখান থেকেই ডাক পড়ে, তার আর না বলবার জো নেই। মুক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে।

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায়, মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না, তারই অধীন হবার জন্য সে কাঁদছে। সে বলছে, 'হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে! যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র, সেই-খানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ, আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই, ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি। আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যখনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম-আমি আছ— আমার আমি তারই জোরে আমি— তখনই এক মুহূর্তে মুক্তিলাভ করি।' কিন্তু শুধু তো মুক্তিলাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম-আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

১ মাঘ

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ আত্মা শরীরের চেয়ে বড়ো। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত, তা হলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এইজন্যে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসেবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।

এইজন্যে সত্যকে বারংবার মতদেহ পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে, তখন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা যে কোনো-একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায় আমরা ভীত ও পীড়িত হই নে— সেইরকম, মানুষ যে-সকল মহৎ সত্যকে নানা দেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে এক-একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্য-আত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তা হলেই সত্যের অমৃতস্বরূপ জানতে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলই মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্যের মত খণ্ডন করব এই অহংকার সুতীব্র হয়ে উঠে জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে সত্যকে যতই দূরে ফেলতে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন

উদ্দাম, এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমাদের ধৈর্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্যহরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা এক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর-এক দিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত একঘরে করতে চান।

যাঁরা 'অদ্বৈতম্' এই সত্যটিকে লাভ করেছেন, তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন-কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সে দিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন। মায়া কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানি নে? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বলছে না? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি-লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু এই মায়া কি ব্রহ্মে আছে?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যে একেবারে পর্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে, তবে আমরা এই-যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি, একে অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য থাকত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি এক দিকে অনন্তকে প্রকাশও করছে, এক দিকে আচ্ছন্নও করছে। যে দিকে আচ্ছন্ন করছে সে দিকে তাকে কী বলব? তাকে মায়া বলব না কি? মিথ্যা বলব না কি? তবে 'মিথ্যা' শব্দটার স্থান কোথায়?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ-মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই স্তব্ধ শান্ত গম্ভীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতিলাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাই নে।

কেননা, আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে 'আমি' বলে ঠিক করে বসে আছি তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি—যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকে ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে—'ও সমস্ত মায়া, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তা হলে তোমার 'মহতী বিনষ্টিঃ'।'

নিজের অহংকারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি-প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয়, তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টানব? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভুল জানছি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎসম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্ছে না? সেই ভ্রমই কি আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার 'আমি'টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না? তাই, ইচ্ছা কি করে না এই মাকড়সার জাল একেবারে ছিন্নভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহংকারের সমস্ত আবরণ-বর্জিত হয়ে অবগাহন করি—ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি?

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পথভ্রষ্ট বালকের মতো থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্‌ মুখে। আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে— একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

২ মাঘ

সংসার পদার্থটা আলো-আঁধার ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই সমস্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ-শক্তি বিপ্রকর্ষণশক্তি কেন্দ্রানুগ শক্তি, কেন্দ্রাতিগ শক্তি—কেবলই বিরুদ্ধতা-দ্বারাই সৃষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য হত তা হলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখতুম— শান্তিকে কোথাও কিছুমাত্র দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ, এই বিরোধ সংসারেই আছে, ব্রহ্মে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাকবে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে, কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে এক জায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখের সোজা লাইনে টানতে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ—অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অখণ্ড আকাশগোলকের মধ্যে পূর্ব দিকের পূর্বত্ব নেই, পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন-কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই-যে জিনিসটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে, তাকে কী নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন—অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তখনই একে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক থেকে দেখতে গেলেই এ-সমস্ত অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে, প্রভেদের মধ্যে, বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধ-ভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই-যে অদ্বৈতের বিরাট সাধনা, ছোটো বড়ো নানা মাত্রায় মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। একেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তার পরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহংকারকে যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্মই করতে পারে। মানুষের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে, 'তোমার আমিই একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ, তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চলো।'

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তা হলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে

ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অ-টাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারি নে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে বড়ো বড়ো ভাব, মঙ্গলভাব, ধর্মভাব, কতরকম করে কাজ করছে। বড়োর মধ্যে ছোটোর বিশেষত্বগুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে; এইজন্যে বড়োর মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াতে মানুষ বড়ো ভাবের আনন্দে ছোটোর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। মানুষকে একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্ত ভাবে যে-সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তারই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হোক, বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি, মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে শয়তান বল বা আর কোনো নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে? সে তো কোনোমতে মনেও করতে পারি নে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত যা-কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্বিশেষের আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছনো যায়, অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই-সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর সে আমাদের বন্ধ করতে পারে না। কর্ম তখন আনন্দের কর্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বেঁচে যায়—সংসার তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩ মাঘ

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোহর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ-রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ, তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে, এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনাপ্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম—তিনি সর্বব্যাপী এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে—যথা—স পর্যগাৎ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি শুক্রম্ অকায়ম্ প্রভৃতি বিশেষণ পদের দ্বারা ব্যক্ত

হয়েছে। দ্বিতীয়ত শুক্রম্ অকায়ম্ এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ কবির্মনীষী প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের শরীর নেই এই পর্যন্তই সহ্য করা যায়, কিন্তু ব্রণ নেই, স্নায়ু নেই বললে এক তো বাহুল্য বলা হয়, তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই-সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়িত করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেজন্যে অনুতপ্ত নই, বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তখনই লাভ করা সৌভাগ্য, যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি যে, এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ—তিনি সর্বত্রই গিয়েছেন, সর্বত্রই আছেন। আর-একটি হচ্ছে ব্যদধাৎ—তিনি সমস্তই করছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্ধে তিনি করছেন। যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ-পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ। অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন, কেননা তিনি মুক্ত, তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখতে হয়। তিনি যে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্ব-ব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয় সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না, কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই, সুতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজনসাধন করে—সেরকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুন কী বলা হল তা ঐ অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই, সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং অখণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে এক দিকে হেলিয়ে এক দিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল—স পর্যগাৎ।

তার পরে—স ব্যদধাৎ। যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্যগাৎ, তেমনি অনন্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। নিত্যকাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্যকালের জন্য বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়—যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী? তিনি কবি। এ স্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা, এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয়, তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয়, তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগৎ-মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন-যে আপনা আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয়, তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন।

তিনিই হচ্ছেন পরিভূঃ। কী জগৎপ্রকৃতি কী মানুষের মন সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না, তিনি স্বয়ম্ভূ— তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এইজন্যে তাঁর কর্মকে, তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই— এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এইরকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও— পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্যসাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে— ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভুত্ব সুস্পষ্ট হবে, অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভূ আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ-নির্বিশেষ বিচিত্র-বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন— কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না— উপনিষদের ঐ একটি ছোটো মন্ত্রে সে কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

৪ মাঘ। কলিকাতা

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ, এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ এ কথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি-না কেন, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ— এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়, আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায়, মৃত হয়ে যায়। এ কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু এ কথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি— যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন— তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজনসাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয়, যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন-কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই, সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি এ কথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানাপ্রকার সুবিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তারা

সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থলবাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড়ো করে পেতুম তাকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জল স্থল বাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করো। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো। দক্ষিণে বামে, অধোতে ঊর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ করো। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে, সেই ধীশক্তি যোগে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো—নিজের তুচ্ছতা-দ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ কোরো না। সমস্তই আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ—সর্বত্রই মাথা নত হোক, হৃদয় নম্র হোক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনা মূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও।

য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ। পূর্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন—তার পরে আছেন যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বার বার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন। তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল!

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন, সে-ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা পান নি, দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না—কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন, এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ মাঘ

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কী, আমরা যে কী করছি, তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী, সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানে না যে, মানবজীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ, সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ এ কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে, ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠছে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের ঊর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চলবে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সংবৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন, মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মতো প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন, কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো; এমন-কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তা হলেও একে ছোটো করা হবে।

আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তা হলে চিত্তের সংকোচ দূর হবে না; তা হলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে না; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ—এর ক্ষুদ্রতা নেই।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না। মহান্তং পুরুষম্—মহান্ পুরুষকে, মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না; এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারি দিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন—সে মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক, সে রাজচক্রবর্তী হোক আর দীন দরিদ্রই হোক—অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন, ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন। সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বেদাহং, আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেইদিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতমন্ত্রে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয় নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারি দিক হতে বন্ধ হতে লাগল, নির্বাপিত প্রদীপের মতো ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোটো ছোটো জলাশয়ে বিভক্ত করে—যে ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরের সম্পদ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসংগীতের তানপুরার মতো পর্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত নিরন্তর বাজতে থাকত, সেই বিশ্বকল্যাণীধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক-একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে, সেই খণ্ডতাগুলি পূর্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না—সেইরকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল। তার পরে, হায়, বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্য সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারি দিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ ভারতবর্ষ কেবলই কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্যালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন—কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে অবারিত মন্দির কোথায়। সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারি দিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতর্ আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারীগণ আমার নিকট আসুন, স্বাহা।

কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম জ্ঞান সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চলছে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনোই হয় না। যে বলতে পেরেছে 'বেদাহং', আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে—তাকে বলতেই হবে: শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

এইরকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমোচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসংগীতের সুর এসে পৌঁছল— যে সুরে লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝংকৃত হয়েছে— সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বললে— বেদাহমেতং, আমি একে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিত্যবর্ণং— জ্যোতির্ময়কে জেনেছি, যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ— তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার। সেখানে দ্বারে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে; সে বলছে, 'না না, এখানে না— দূরে যাও, দূরে যাও।' সে বলছে কান বন্ধ করো পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বসো পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্তু— বেদাহমেতং, আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের, যাঁকে জানলে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না— যাঁকে জানলে নিম্নদেশ যেমন জলসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে— তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল— 'দূর করো, দূর করো, একে বের করে দাও। এ তো আমার ঘরের সামগ্রী নয়। এ তো আমার নিয়মকে মানবে না।'

না, এ তোমারই ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না— আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না। তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে।

প্রভাত এসেছে, আমাদের উৎসব এই কথা বলছে। আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব।

বহু যুগ পূর্বেই এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল— একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক। পৃথিবীর এই পূর্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন— একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক।

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, একসূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়— হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে— বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে

আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহসিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা— সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের এক সভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন— এক এক এক! তিনি বলছিলেন— ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি— এই একেকেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ— এই একে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান একের উপলব্ধি-অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দিনের মধ্যে এই বাংলাদেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্' দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ কথা নিশ্চয় জানতে হবে, সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এই বাংলাদেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নিচু করে রয়েছি— আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে, নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে। এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন— একমেবাদ্বিতীয়ম্। বলে গিয়েছেন, ‘মনে রাখিস, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস অদ্বিতীয় এক। সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস অদ্বিতীয় এক।’

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিদ্রা নেই দেখছি। ‘এক’ আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা সুস্থির থাকতে পারছি নে, আজ আমরা ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এ পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না— এখন দেখছি অভাব নেই। ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন, সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই ‘এক’কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছল।

তার পর থেকে আনাগোনা তো চলেইছে; একে একে দূত আসছে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মতো স্ফীত হয়ে উঠছে। আমরা অনুভব করছি— সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসংগমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনই খুলবে এমনি আমাদের মনে হচ্ছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আর ঐ যে দেখছি বাতায়নে এক-একজন মাঝে

মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্ছে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়। পৃথিবীতে কালে কালে যে-সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না; তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সংগীতকে এখনই বিশ্বলোকের রাজ-পথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহাসংগীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন— একমেবাদ্বিতীয়ম্। সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারংবার ফিরিয়ে আনতে হবে— একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের পরিচয় এই যে, আমরা তারাই, যারা বলে না যে, ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তারাই যারা বলে—একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক প্রভুই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আমরা তারাই যারা বলে না যে, বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া-দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলি—হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ, হৃদয়-স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়। আমরা তারাই যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলি নে। আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং—বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন, কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না। আমরা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি—এক, এক, অদ্বিতীয় এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই উৎসবে, সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করেছে।

সেই মহাদিন এসেছে, অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করছে সে তো এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি, যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের, না। আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি; আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি তা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল, আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, এই যে মহান আত্মা, এই যে বিশ্বকর্মা দেবতা, যিনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন, তিনিই আজ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য। এই আশ্চর্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করছি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্‌বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহতী কৃপায় যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিকে প্রশস্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনো না, দুর্বল বলে মেনো না। তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ করো, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্মকে যন্ত্রবৎ কোরো না—সত্যকে সকলের ঊর্ধ্বে স্বীকার করো এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হে জনগণের হৃদয়াসন সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্মা, আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, জীবন-যাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো। তোমার

যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করছি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, জগতে আমরা যে নব-যুগের সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কী তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানা দেশে নানা কালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই—ভয় দূর হোক, অশ্রদ্ধা দূর হোক, অহংকার দূর হোক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত এবং এক মঙ্গলসংকল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগূঢ় সংকল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না, এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহাসংকল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সংকল্পকে স্বেচ্ছাপূর্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরোই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, হৃদয় বলতে থাক্—আনন্দং পরমানন্দং এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর-একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।—
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে, শিল্পকলা থেকে, গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্যে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ অন্যান্য রসলাভের জন্যে যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেইরকম নানাপ্রকার আয়োজন করে। যাঁরা ভালো করে বলতে পারেন সেইরকম লোক সংগ্রহ করে রসোদ্রেক করবার জন্যে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবৎ-রস নিয়মিত জোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এইরকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া বলে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একটা লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্‌গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মানুষকে ভাই বলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অনুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ঐখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তা হলে এই জিনিসটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে দুটি পাবার পন্থা আছে।

গাছ দুরকম করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এক তার পল্লবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর-এক তার শিকড় থেকে সে নিজের খাদ্য আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রৌদ্র উঠছে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্ছে, কখনো বসন্তের হাওয়া বইছে—পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারই থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্ছে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়ছে—আবার নতুন পাতা উঠছে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিয়ত স্তব্ধ হয়ে, দৃঢ় হয়ে, গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিয়ত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করছে।

আমাদেরও শিকড় এবং পল্লব এই দুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য এই দুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটা ভাবের দিক নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই, সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই—সেইখানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড়ো অলক্ষ্য, বড়ো গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে কিন্তু ভাবব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না। সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা। সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলই গভীর থেকে গভীরতরে গিয়ে নাবছে। সে শুদ্ধচারিণী স্নাত পবিত্র সেবিকার মতো সকলের নীচে জোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে—দাঁড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কত পরিবর্তন। আজ তার যে-কথায় তৃপ্তি, কাল তার তাতে বিতৃষ্ণা। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। গাছের পল্লবের মতো তার বিকাশ আজ নূতন হয়ে উঠছে, কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পল্লবিত চঞ্চল হৃদয় নব নব ভাব-সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে, যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না থাকে তা হলে এই-সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও বিনাশের কারণ হয়। যে গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে, সূর্যের আলো তাকে শুকিয়ে ফেলে, বৃষ্টির জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তা হলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না, কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই, সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়ছে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের থেকে বর্ষিত হয় না—সেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জিনিস আর ভাবুকতা পল্লবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্‌বোধিত করে দিই।

২ ফাল্গুন ১৩১৫

আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্যে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই-সমস্ত প্রবৃত্তি নানা দিকে নানা প্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, কত লীলাখেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই।

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রেমবশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উদ্যম প্রকাশ

পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়— অনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে; নানাপ্রকার সামাজিক আলাপ সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উদ্যমকে আকর্ষণ করে নেয়। এই উদ্যমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শান্ত করব সে কথা আর চিন্তা করতেই হয় না— লোক-লৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে দান করে নিজেকে নিঃস্ব করে তা নয়— ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সংবরণ করতে পারে না। নানা রকমের খরচ করে তার উদ্যম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুশি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে খরচ করে, সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয়, কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তি-বশত।

চর্চাদ্বারা এই প্রবৃত্তি কিরকম অপরিমিতরূপে বেড়ে উঠতে পারে তা য়ুরোপে যারা সমাজ-বিলাসী তাদের জীবন দেখলে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই— উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন। কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়দৌড়, এই নিয়ে তারা উন্মত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চলছে না; কেবল দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরছে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদূর যাই নে, কিন্তু আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃদুতরভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে খরচ করবার জন্যেই খরচ করে থাকি। মনকে মুক্তি দেবার, শক্তিকে খাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানি নে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাত। আমরা মানুষের জন্যে যা দান করি তা এক দিকে খরচ হয়ে অন্য দিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে— নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্‌কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কেবলই তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চলতে হয়, কোথাও থামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এইজন্যে যাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের জন্যে নিজের শক্তিকে যাঁদের খাটানো আবশ্যক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্বতে নির্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান। শক্তির নিরন্তর অজস্র অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জনতা, এই পর্বতগুহা কোথায় খুঁজে বেড়াব? সে তো সব সময় জোটে না এবং মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও তো মানুষের ধর্ম নয়।

এই নির্জনতা, এই পর্বতগুহা, এই সমুদ্রতীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে— আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকত তা হলে নির্জনতায় পর্বতগুহায় সমুদ্রতীরে তাকে পেতুম না।

সেই অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই, সেইজন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই-যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্ছি, বাইরের সংস্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়— কারণ, মানুষকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ

প্রতিকার হচ্ছে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তা হলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্মলুব্ধ লোককে দেখতে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উদ্যমকে কেবলই মানদণ্ড হাতে করে হিসাবি কৃপণের মতো খর্ব করছে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে কেবলই শুষ্ক কৃশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করছে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না। আর যাই হোক, মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে; উদ্দামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, কৃপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে—বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, যখন-তখন ঘোরতর কাজকর্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে, বেষ্টন করে আছে. এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে, সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে, সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ আকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করছেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস করো, শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যখন হাসছ খেলছ কাজ করছ তখনো একবার সেখানে যেতে যেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হয়ে উল্টে পড়ে তোমার সমস্ত-কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না- বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে, সেই অনুসারেই আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি – এজন্য লোকের কথা আমাদের মর্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে, লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এইজন্যে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে আমার আর কেউ নেই। তখন আমরা এ কথা বলবার ভরসা পাই নে যে—

> সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
> তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
> নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
> সেও আছে তব ভবনে।

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করে নি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি, আমাদের নানা শক্তিকে নানা দিকে কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখসমৃদ্ধির জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি। একবার খবরও রাখি নে যে, অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই তো সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অন্য লোককে বাইরে থেকে বিচার করছি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারছি নে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলই সংকীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঙ্গলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বলতে হবে— ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে। নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না এবং অন্যের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। যখন জানব যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন, তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন— তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তখন সংযম কেবল বাহিরের নিয়মপালনমাত্র হবে না। যে পর্যন্ত তা না হয়, যে পর্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ত, যে পর্যন্ত বাহিরই সমস্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবকাশ রোধ করে ফেলে— সে পর্যন্ত কেবলই বলতে হবে—

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে।

৩ ফাল্গুন

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে-একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন সুবিহিত সুশৃংখল সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভালোরকম না হলে ঐক্যটিও ভালোরকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে, তখন তার মধ্যে একের মূর্তি পরিস্ফুট হয় না।

আমাদের মধ্যে খুব একটি বড়ো বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্ছে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ। যতদিন সেই বিভাগটি বেশ সুনির্দিষ্ট না হবে ততদিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটিমাত্র মহল। স্বার্থপরমার্থ নিত্য-অনিত্য সমস্তই আমাদের ঐ এক জায়গায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। সেইজন্যে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

যে-জিনিসটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখতে হবে, তাকে অন্তরে নিয়ে গিয়ে তুললে সেখানে সেটা জঞ্জাল হয়ে ওঠে। যেখানে যার স্থান নয় সেখানে সে যে অনাবশ্যক তা নয়, সেখানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই— বাহিরের জিনিস যাতে বাহিরেই থাকতে পারে, ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকে না। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না? তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সে তো বাইরেই

ঝরে পড়ে যায়। সেই তার বাহিরের অনিবার্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে, অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহতভাবে চলে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করি নে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাখরচ ভিতরের খাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামি বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপকল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখতে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহলে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম আছে— সেখানে জমা করবার জায়গা। এইজন্যে সেখানে এমন-কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিস নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃতদেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে এই দুটি কক্ষ আছে, স্থায়িত্বের এবং অস্থায়িত্বের— অন্তরের এবং সংসারের।

অন্য জন্তুদের মধ্যেও সেটা অস্ফুটভাবে আছে— তেমন গভীরভাবে নেই। সেইজন্যে অন্য জন্তুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না; কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মানুষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা প্রয়োগ করে তাকে যতদিন পারে টিঁকিয়ে রাখতে ত্রুটি করে না। তার অন্তরপ্রকৃতি নাকি স্থায়িত্বের নিকেতন, এইজন্যেই তার এই ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্তুদের মধ্যে যে-সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অনুগত হয়ে আপন স্বাভাবিক কর্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায়, মানুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিয়ে কল্পনার রসে ডুবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজনসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এইজন্যে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে, অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে-জিনিসটা অন্নসংগ্রহচেষ্টারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত করে তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্তি ধারণ করে স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্যনিকেতনে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্যে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্ছে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের খাদ্য নয়। যে দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাহু এবং লেজটা কেতু-আকারে বৃথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গল-রূপে সমস্ত জগৎকে দুঃখ দিচ্ছে।

আমাদের যে-অন্তরভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার দিই, তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সংগতি নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই দুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে, কিন্তু বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট। সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্বত বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে। তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভুর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত তো দাসের বেতন নয়, সে যে দেবতার পূজার ভোগসামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত, তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বলছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনযাত্রার সাধনা।

৫ ফাল্গুন ১৩১৫

অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসারসংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘোরতর কর্মসংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব করো। এইরকম ক্ষণে ক্ষণে বারংবার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতর থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে—সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পেঁচচ্ছে না। সেখানে শান্ত, স্তব্ধ, নির্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না। এই-যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসিখেলার মহা জনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘুরে এসো—দেখে এসো সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে, অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পেঁছয় না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শান্ত।

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নেই, একটি কণাও নেই, যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন. কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নন। এই জগৎ তাঁরই বটে, তিনি এর সর্বত্রই আছেন বটে, কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেইরকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর। এই সংসারে শরীরে বুদ্ধিতে হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন, কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার শরীর বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখ দুঃখ ভোগ করছে, এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে, বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা শূন্য নয়; তখন নিজের অন্তরে সেই নির্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে, সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াম্‌'। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পরমকোষকে জানতে পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

এইজন্যই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অন্তরাত্মাকে জানো, তা হলেই অমৃতকে জানবে, তা হলেই পরমকে জানবে। তা হলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছু পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৬ ফাল্গুন

উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোন্‌খানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে তার নিত্যনিকেতনে দেখো—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষ-শোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ

করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তা হলেই ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে, এবং তা হলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধিব্যাধি জরামৃত্যু বিচ্ছেদমিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলই যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ—যদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান, তা হলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তা হলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে-সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয় হচ্ছে, বিনাশ হচ্ছে—এমনি করে বারংবার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড়ো পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে দেখো, তা হলেই হর্ষ-শোকের সমস্ত জোর চলে যাবে। তা হলে ক্ষতিতে নিন্দাতে পীড়াতে মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়—আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত। আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত। সেইজন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা 'ন বিভেতি কদাচন'।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

পরমব্রহ্মের মধ্যে যাঁরা আপনাকে যুক্ত করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন। আর, সংসারে যাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা 'শোচতি শোচতি শোচত্যেব।'

৭ ফাল্গুন ১৩১৫

চারি দিকে সংসারে আমরা দেখছি—সৃষ্টিব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে—এক মুহূর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিণতির পথে চলেছে, কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর বুদ্ধি মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরছে, ক্রমাগতই তার সংযোগবিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই সূর্যতারাময় লক্ষকোটি চাকার রথ ধাবিত হচ্ছে—কোথাও এর শেষ গম্যস্থান দেখি নে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি, যেন এক জায়গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্ছে অথচ কোনোকালে কোথাও পোঁছতে পারছি নে? আমাদের অস্তিত্বই কি এইরকম অবিশ্রাম চলা, এইরকম অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই?

যদি এই সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে, তা হলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে, তবে অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা-কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো অর্থই নেই।

তা যদি হয় তবে এই ব্রহ্মের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। যাঁকে কোনোকালেই পাব না তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? তা হলে এই কথাই বলতে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকেও তো পাওয়া যায় না। সংসার তো মায়ামৃগের মতো আমাদের কেবলই এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা তো দেয় না। কেবলই খাটিয়ে মারে, ছুটি দেয় না—ছুটি যদি দেয় তো একেবারে বরখাস্ত করে। এমন কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। শ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ সে কেবলই আমাদের চালাবে, খাওয়াবে সেও চালাবার জন্যে, মাঝে মাঝে যেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্যে, চাবুক লাগাম সমস্তই চালাবার উপকরণ। যখন না চলব তখন খাওয়াবেও না, আস্তাবলেও রাখবে না, ভাগাড়ে ফেলে দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না। ঘোড়া স্পষ্ট করে জানেও না সে ফল কে পাচ্ছে। ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চলতেই হবে; সে মূঢ়ের মতো কেবলই নিজেকে প্রশ্ন করছে, 'কোনো কিছুই পাচ্ছি নে, কোথাও গিয়ে পৌঁচচ্ছি নে, তবু দিনরাত কেবলই চলছি কেন? পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, হৃদয় মনের মধ্যে কত শত জ্বালাময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এর অর্থ কী?'

যাই হোক, কথা হচ্ছে এই যে, সংসারকে তো কোনোখানেই পাচ্ছি নে, তার কোনোখানে এসেই থামছি নে—ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মতো? তাঁকেও কি কোনোখানেই পাওয়া যাবে না? তিনিও কি আমাদের অনন্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়া-হীন চলাকেই অনন্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলই কোনোমতে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করব?

তা নয়; ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই—সংসারের তত্ত্বই হচ্ছে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে এ কথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা, তিনিই হচ্ছেন সত্য।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন-যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলছি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি, এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশকালের রাজত্ব নয়, সেখানে ক্রমশসৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বলছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম, যে পরম ব্যোম, যে চিদাকাশ, অন্তরাকাশ, সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন, তার সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন, এ কথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' রূপে সুগভীর-ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমত জানলে বাসনায় আমাদের আর ব্যথা ঘুরিয়ে মারে না—পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এইজন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাই নে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই, কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি 'অস্য' 'এষঃ' হয়ে আছেন। তিনি এর 'এই' হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই 'আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি'—সংসারে তাঁরই প্রেমের লীলা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ—আনন্দের, অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান-পরম্পরার ভিতর দিয়ে, নানা রকমে পাচ্ছি; যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।' যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি, বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে, সে, যেখানে তার রানীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে—ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

দৌর্ভিক্ষ্যাং যাতি দৌর্ভিক্ষ্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।

৯ ফাল্গুন ১৩১৫

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে—একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন-কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না—আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কল্পনায় বাহ্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ করে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে, আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই শামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়া দ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসনগুলিও বাহ্য অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কিরকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই সমস্তই তখন ধর্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি দ্বারা, মনের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানারকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে

আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই, যখন আমরা তার সীমা দেখতে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মাল। তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তখন বলতে লাগলুম—যার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনন্ত প্রদক্ষিণ, তাকেই আমরা সত্য বলে, তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম—আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে-প্রবৃত্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে, শূলে চড়িয়ে, ফাঁসি দিয়ে, একেবারে নির্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে-সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল, সেই-সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজসূয় যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজাকে হার মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তররাজধানীর উচ্চ প্রাসাদচূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখ-দুঃখকে কড়া পাহারায় রাখলুম, পূর্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো কেবল আত্মশাসনের অতিবিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো কেবল অন্তরের নিয়মবন্ধন নয়। শান্ত দান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দজ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে, অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গল-রশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয়, তখন আনন্দ; তখন সংগ্রাম নয়, তখন লীলা; তখন ভেদ নয়, তখন মিলন; তখন আমি নয়, তখন সব—তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা-পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্ব-জগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

১০ ফাল্গুন ১৩১৫

আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে উদ্‌বোধিত করে তোলবার ভার সব-প্রথমে বাহিরের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

সে আমাদের জাগাবে, অভিভূত করবে না, এই ছিল কথা। জাগব এইজন্যে যে নিজের চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব করব— দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মূঢ়তা জড়তা দূর করে তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া। রাজা যে কারও দাস নয়, এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাস্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানা প্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাস্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুগ্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে যে, বড়ো হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, এই মাস্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছয়, যখন সে আমাদের উপর চেপে পড়বার জো করে, তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্ছে শ্রেয়ের পন্থা।

বাহির যে শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে— এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে— এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তা হলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রকার ঐশ্বর্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর-এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস। ইচ্ছা আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না— সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারি দিকে বেঁধে ফেলে।

তখন কী হয়? না, যে-সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তা হলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সংবরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সেজন্যে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয়, সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তা হলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য চলে না। বাসনা যখন তার ভিতরের কূল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

যেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র, তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আধটি নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিদ্যার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে তো কম নয়।

তা ছাড়া আর-একটা জিনিস দেখতে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে বেতন মিলত তাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্যেই মানুষ বারংবার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড়ো দুঃখের চাকরি। এতে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই, তখনো তো অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শ্রান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়— শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘুরিয়ে মারে এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এইজন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা, সেরকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখতে পায় না, তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো-এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড়ো করলে, নায়কের অভাবে সেই দুর্দান্ত সৈন্যগুলোর হাতেই তার মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজ্য দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভালো, বটে, কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য— এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন উপভোগ করি? যখন বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মঙ্গল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু। সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই, তখনই তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম, সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম, রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর করে গ্রহণ করলে।

১১ ফাল্গুন

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন— স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয়, তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ, তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না— অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না, লোকের খ্যাতিই তাকে কোনো-রকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত। তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন, সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসার-তাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে— তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো

মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে-বুকে গেল—এই অতিক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্বল, সেই শক্তিকে আশ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে লাভ করো—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ কোরো না—তোমার সামান্য যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্যকে লজ্জা দেবে।

১১ ফাল্গুন

তাঁর নাম পরশরতন

পাপীহৃদয়-তাপ-হরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে।

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার মনের চিন্তাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্মকে স্পর্শ করাতে হবে।

তা হলে, যা হালকা ছিল এক মুহূর্তে তাতে গৌরবসঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে. যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকালবেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব—তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, 'শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌' এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করব না—তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতালাভ করব না, প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনই স্নিগ্ধতার দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনই বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে, তখনই আপনাকে হারিয়ে ফেলি। আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মতো মন্দিরেরই পূজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো না থাকে—তা হলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস, অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে

ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে—সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশকালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনো যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে, মনে পড়ে যে অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন, মনে পড়ে যে সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাই বলে এ কথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারেই বিসর্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে পেয়ে বসে—ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরও বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। স্বভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেয়কে প্রেয়ের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব। তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে বুঝতে দেব না—কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা আমাদের কাজকর্ম আমাদের বিষয়আশয় যা-কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও। আপনিই সমস্ত বড়ো হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।

১২ ফাল্গুন

যিনি পরম চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্মল চৈতন্যের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সস্তায় আমাদের কাছে ধরা দেবেন না—এতে যতই বিলম্ব হোক। সেইজন্যেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমস্তই চলছে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরিসমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হোক বিলম্বে হোক, সেজন্যে তিনি কোনো অস্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্ছেন না। সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়—অনেক দিন ও রাত্রির শুশ্রূষায় তার হাজারটি দল একটি বৃন্তে ফুটে উঠবে।

সেইজন্যে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাতঃকালে উপাসনার জন্যে অনেকে সমবেত হয়েছি, এখানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তটিকে তো আনতে পারি নে—তবে এ কাজটি কি আমাদের ভালো হচ্ছে? নির্মল চৈতন্যের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অন্যায় করছি নে?

আমার মনে এক-এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়। মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদস্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি, পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি, কিছুমাত্র আলস্যের বাধা ঘটে, পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিমুখভার সৃষ্টি করে। উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্য যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন, পাছে এই তাগিদটাই সকলের চেয়ে বড়ো

হয়ে ওঠে। সেইজন্যে এক-এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অনুকূল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না।

কিন্তু সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে-সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের বেশি সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ দুর্লভ। তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন, চার দিকেই তাকে টানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার সুর নেমে যায়, তার কথা চিন্তা কাজ তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত—সে এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই। ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না। সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈথিল্য করলে চলবে না। একদিনও ভুলব না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রয় দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে—'তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো—তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।'

যেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্যামী তা জানেন। কোনোদিন আমাদের মনে কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগে না—মনে বিক্ষেপ আসে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে-মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না। দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব, দ্বার খুলুক আর নাই খুলুক। যদি এখানে আসতে কষ্ট বোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আসব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখতে চায় তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আসব।

কিছু না-ই জোটে যদি তবে এই অভ্যাসটুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয়, যে জড়তা মোচন করতে হয়, সেটাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই। অত্যন্ত দরিদ্রের যে রিক্তপ্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিন্তায় যাঁকে রাজা করে বসিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া, কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই 'না' করে রেখে দেব, এ তো কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে, পিতা নোঽসি—তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাক্ তোমাদের কাজকর্ম, থাক্ তোমাদের আমোদপ্রমোদ। আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতা নোঽসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জন্মে, তাঁর চন্দ্রসূর্যের আলোর মধ্যে চোখ মেলে জাগরণের প্রথম মুহূর্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে : ওঁ পিতা নোঽসি। এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি। এতবড়ো বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না—এ তো কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিস্ফুট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শূন্য হৃদয়কেও দান করো, তোমার শুষ্কতা

রিক্ততাকেই তাঁর সম্মুখে ধরো, তোমার সুগভীর দৈন্যকেই তাঁর কাছে নিবেদন করো। তা হলেই যে দয়া অযাচিতভাবে প্রতি মুহূর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে। এবং প্রত্যহ ঐ যে অল্প একটু বাতায়ন খুলবে সেটুকু দিয়েই অন্তর্যামীর প্রেমমুখের প্রসন্ন হাস্য প্রত্যহই তোমার অন্তরকে জ্যোতিতে অভিষিক্ত করতে থাকবে।

১৩ ফাল্গুন

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে—সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে 'তুমি আছ' ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ময়, আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্যলোকে সে জ্যোতি কুলোয় না, সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো, আমাকে জ্যোতির্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃতস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনো-কালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না, তুমি মিলেছ; সেখানে তোমার কেবল সত্য নয়, সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি; সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই; কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু। আমি যে চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত হোক, অতি দূরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও—ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে, খুব গোপনে।

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো—আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি, কেবলই তুমিময় আনন্দ।

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহু-দিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে। তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে, হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে

ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক্। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনই রক্ষা পাব।

১৪ ফাল্গুন

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

অর্থাৎ—

পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয়, কিন্তু আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয় এবং সেইজন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়োই ম্লান হয়ে থাকে, তখন তার সত্য স্ফূর্তি পায় না। এইজন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে, মিত্রের মধ্যে, নানা লোকের মধ্যে, নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হতে থাকে, কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাই নি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিলুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন 'কর' 'খল' প্রভৃতির পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে' বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে' আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয় না, বিরক্তিবোধ হয়, এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়—সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ, আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা-আমিতেই সার্থক। এইজন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যখন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন, পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন, তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে সেই বড়ো আমির কাছেই একটুখানি এগোল তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে

যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এইজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাই নে, আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমত বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন উপলক্ষই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না—প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে, নিজেকে নয়। তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম বলে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয়, উজ্জ্বল হয়, তখনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন, যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয়, সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার অভিমুখেই আমাদের বহন করে রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সংকারমন্ত্র হচ্ছে—

> মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
> মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
> মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
> মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।

বায়ু মধু বহন করছে, নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধিবনস্পতিসকল মধুময় হোক, রাত্রি মধু হোক, উষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক, সূর্য মধুমান হোক।

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য, সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য-দ্বারা আসক্তিবন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি'—এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সমস্তই সেই আনন্দরূপ, সেই অমৃতরূপ। কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্ছি বলে আর

অহংকার করে না, প্রকাশ হচ্ছেন কেবল আনন্দ, কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্য সমস্তের, কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ ফাল্গুন ১৩১৫

সাধনা-আরম্ভে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড়ো বাধা আছে—সেইটি কাটিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্ছে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাতসমুদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্ছে কলম্বসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরও অনেকেই আট্‌লান্টিক্‌ পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছোতে পারত, কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না; তাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল ছিল না যে, কূল আছে; এইখানেই কলম্বসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমুদ্রে যে পাড়ি জমাই নে তার প্রধান কারণ—আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে নি যে, সে সমুদ্রের পার আছে। শাস্ত্র পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মুখে বলি হাঁ-হাঁ বটে-বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে-প্রত্যয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। এইজন্য ধর্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা তাতে উদ্‌বোধিত হয় নি।

এই বিশ্বাসের জড়তাবশতই লোককে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করি, আমরা বলি এতে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিসটা কী? না, পুণ্য হচ্ছে একটি হ্যান্ডনোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এইরকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল। কিন্তু সাধনার লক্ষ্যকে এইরকম বহির্বিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না। সে একটা পারলৌকিক বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অন্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনোই বাহিরের কোনো স্থান নয়, যেমন স্বর্গ; বাহিরের কোনো পদ নয়, যেমন ইন্দ্রপদ; এমন কিছুই নয় যাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্যে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কী এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারও কোনো শোনা কথায় এখানে কাজ চলবে না—কেননা এটি কোনো ছোটো কথা নয়, এটি একেবারে শেষ কথা। এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি—আশ্চর্য এই চারি দিক।

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো—কেন? এ-সমস্ত কী জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে, পূর্ণ করে জানতে হবে।

আত্মাকে যেখানে জানলে সত্য জানা হয় সেখানে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি নে। এইজন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌঁছোয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জানতে চাচ্ছি। তাকে কেবলই ঘর-দুয়োর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিই নে—এইজন্যে তাকে পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, কেবল কাঁদছি আর ভয় পাচ্ছি। মনে করছি এই জিনিসটা না পেলেই আমি মলুম, আর ঐ জিনিসটা পেলেই একেবারে ধন্য হয়ে গেলুম। এটাকে এবং ওটাকেই প্রধান করে জানছি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্যের বোঝাকেই ঐশ্বর্যের গর্বে বহন করছি।

আত্মাকে সত্য করে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাষ্পে ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় করে দেখার দুর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি-দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্মলতার মধ্যেই নিজেকে জানবে। কামক্রোধলোভ যে-সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আত্মা বিশুদ্ধ শুভ্র নির্মুক্ত পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মুক্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জানবে। সে জানবে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য—সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈন্য দূর করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পষ্ট জানতে পারবে যে সে চিরদিনের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখো, নিরীক্ষণ করে দেখো, সমস্ত চেষ্টাকে স্তব্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখো। একটি চাকা কেবলই ঘুরছে, তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি, বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে। সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে— চাকার ঘূর্ণাগতির মধ্যে দেখা বড়ো শক্ত— কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখতে পারি।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

আমাদের সাধনার দ্বিতীয় বড়ো বাধা হচ্ছে সাধনার অনভ্যাস। কোনোরকম সাধনাতেই হয়তো আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সমুখে এসেছে সেইটের মধ্যেই হয়তো আমরা আকৃষ্ট হয়েছি, যেমন-তেমন করে ভাসতে ভাসতে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে আমরা চলে যাচ্ছি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাতেই চলছে বলেই আমরা চলছি—আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো-একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চাই করি নি। এইজন্যে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে যাবার জো হয়েছে। কে কোথায় যে আছে তার ঠিকানা নেই—ডাক দিলেই যে ছুটে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে-সব খাদ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি জড়ো হয়, নইলে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারি দিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার সুখও নেই। এতে আছে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ, যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তখন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে। তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখছি, একবার তার উপর রাখছি, এমনি করে কেবলই টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার কোনো উপায় না পাই তখন কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজনগুলোও দ্বিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলই জমে উঠতে থাকে, জীবনান্তকাল পর্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নে।

তাই বলছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থাতেই একটা আনন্দ আছে, সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহৎলক্ষ্য-অনুসরণে নিজের বিক্ষিপ্ততাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যেটুকু সচেষ্টতা থাকলে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে ক্ষয়ে গিয়ে থাকে তবে বড়ো বিপদ। যেমন করে হোক বারংবার স্খলিত হয়েও সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুলতে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চলতে শেখে, তেমনি করেই তাকে চলতে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই; তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে, সেটি জানা চাই; তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চলতে শেখা। স্থৈর্য এবং গতি দুই চাই। বিশ্বাসে চিত্ত স্থির হবে— এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

যখন সিদ্ধির মূর্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে— তখন থামায় কার সাধ্য। তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্তি তো নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও তো সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয়, তখন তো আর ভাবনা থাকে না; তখন তো পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না, তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য, সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র শৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্ছে না তবু চলছে। পানীয় রস পাচ্ছে না তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। যখন মনে হয় সামনে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই, তখনো তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে, কিছু না পেয়েও, আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে, কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও, সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের

মতো ছুটে আসে, তখন সে ধুলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মতো এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর। মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে— সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়; হৃদয়কে ডাকাডাকি করি, হৃদয় সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার কঠিন ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চলতে পারে— দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্ছেই, অগ্রসর হচ্ছেই— প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ঐ দেখো হঠাৎ একদিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস দেখা দেয়— সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা। সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্ছে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা তো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে, ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখতে পারে। ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি, কিন্তু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়— সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। এই আমাদের মরুপথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহংকার করে না, কোনো দাবি করে না— সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করেই তার সুখ।

১৭ ফাল্গুন

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয়, সে আমাদের কেবলই সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চলতে চলতে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুলতে চায় না— সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কী হচ্ছে! এ কী করছ! সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে, পিপাসার সময় উপায় কী হবে!

আমরা সমস্ত দিন কতরকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই— কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, এই যে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে বোলো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চোলো না, যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে খামকা পা ডুবিয়ে বোসো না।' আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনো সে আমাদের ভোলে না— বলে, 'ছি, এ কী কাণ্ড!' বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়, তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। সহজ কবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি। তখন স্খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না, তখন পদে পদে যতিপতন হয়; যেখানে

থামবার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থামবার সেখানে বেগ সামলাতে পারি নে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই, সে জেগেই আছে। সে বলে, 'ও কী! ঐ যে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল। ঐ যে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে। ঐ যে শত্রুতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্ছ, এই পবিত্র নির্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মতো শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!'

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই জানতে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গনি। যখন চরম সুহৃদ্‌কে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদ্‌রূপে থাকেন। তাঁর কঠোর মূর্তি প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই চাঞ্চল্যবর্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, তাদের সমুদ্রযাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না। তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্তি দেখবার জন্যে ব্যস্ত ছিল; কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে; এইজন্যে দিন যতই যেতে লাগল, সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য ততই বেড়ে উঠতে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোনো নিশ্চয় চিহ্ন না দেখতে পেয়েও নিঃশব্দে চলতে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল, তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না। তখন সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধু জ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় কেউ সহায় নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়। বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই নে যাকে আমরা সত্যবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি। তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আসবে, তখন তীরের পাখি তোমার মাস্তুলের উপর উড়ে বসবে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে, তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাকবে না; কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্য-জয়ী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের-উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায়-অবিচলিত নিষ্ঠা—কোনোমতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে—যে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

১৭ ফাল্গুন

সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মা যিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছেন—তিনি বড়ো প্রচ্ছন্ন হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্ছেই সন্দেহ নেই—কেবল সে কাজ যে চলছে তা আমরা জানি নে বলেই আনন্দের অভাব আছে। সেই কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিই নি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই কাজ করছে। তিনি আমার জীবনের একটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারাখচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত

রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর-একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার-রচনায় তাঁর বড়ো আনন্দ। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য শিল্পরচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দগ্ধ করতে হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করছেন সে দিকে আমি তো তাকালুম না—আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি, হাসি গল্প করছি, আর ভাবছি কোনোমতে দিন কেটে যাচ্ছে—যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানবজীবনের নাট্যশালায় প্রবেশ করে যে দিকে অভিনয় হচ্ছে সে দিকে মূঢ়ের মতো পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। নাট্যশালার থামগুলো চৌকিগুলো এবং লোকজনের ভিড়ই দেখছি। তার পরে যখন আলো নিভে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখতে পাই নে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কী করতে এসেছিলুম, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই থাম চৌকির অর্থ কী, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কী করতে? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্ছে সে দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করছেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করছেন—ঐ থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র। ঐগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও—তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাণ্ডটা হচ্ছে সমস্তই যে অন্তরে হচ্ছে। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনই ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হচ্ছে একি কেবলই তোমার বাইরে? বাইরেই যদি হত তবে তুমি সেখানে কোন্ দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ সূর্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মতো মাথা তুলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারি দিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ। তোমারই এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার সুতো রুপোর সুতো এত রঙ-বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ এতবড়ো একটা আশ্চর্য বুনানি বুনছেন—এ যে তোমার ভিতরেই—যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনই দেখো। এই প্রভাতকে তোমারই অন্তরের প্রভাত বলে দেখো, তোমারই চৈতন্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সৃষ্টি বলে দেখো। এ আর কারও নয়, এ আর কোথাও নেই—তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারই মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে তোমার এই অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা—দিনে রাত্রে অবিশ্রাম। এই আশ্চর্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেবলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না, অর্থ পাবে না।

যখন আমি ইংলন্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লন্ডন থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তখন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারি দিক আচ্ছন্ন, বরফ পড়ছে। লন্ডন ছাড়িয়ে স্টেশনগুলি বাম দিকে আসতে লাগল। যখন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো এক ব্যক্তিকে ডেকে স্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগলুম। আমার গম্য স্টেশনটি শেষ স্টেশন। সেখানে যখন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকালুম—সে-দিকে আলো নেই প্ল্যাটফর্ম নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলুম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লন্ডনের অভিমুখে পিছোতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কী হল! পরের স্টেশনে যখন গাড়ি থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক

স্টেশন কোথায়? উত্তর শুনলুম, 'সেখান থেকে তুমি যে এইমাত্র আসছ।' তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কখন পাওয়া যাবে? উত্তর পেলুম— অর্ধরাত্রে। গম্য স্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বাঁ দিকের স্টেশনগুলিরই খোঁজ নিয়ে চলেছি। ডান দিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত। একটার পর একটা পার হয়েই গেলুম। যে-স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই— ঐ বাম দিকেই চেয়ে দেখলুম। দেখলুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে-সুযোগ কেটে গেল— গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ-আহ্লাদ অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন পাওয়া যাবে! এই যে সুযোগ পেয়েছিলুম ঠিক এমন সুযোগ কখন পাব— কোন্ অর্ধরাত্রে!

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে, এমন একটা স্টেশন আছে। সেখানে যদি না নামি— সেখানকার প্ল্যাটফর্ম যে দিকে সে দিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নিরর্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কী আছে। কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠলুম, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চললুম, কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল, ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে, ক্ষুধা আমার কোন্খানে মিটবে, আশ্রয় আমি কোন্খানে পাব— সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল।

১৮ ফাল্গুন

ঈশ্বরের সঙ্গে খুব একটা শৌখিন রকমের যোগ রক্ষা করার মতলব মানুষের দেখতে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেইরকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশ্বরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশ্বরকে বলি, 'তুমি ঘরের মধ্যে এসো কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এসো— দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়'— ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়। এ আসনটায় বোসো না, এটাতে আমার অমুক বসে; এ জায়গায় নয়, এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি; এ ঘর নয়, এ আমার অমুকের জন্যে সাজিয়ে রাখছি। এই করতে করতে সব চেয়ে কম জায়গা এবং সব চেয়ে অনাবশ্যক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্যে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তো কখনো সে আর ভোগ করতে পারবে না, সেইজন্যে সে যে-জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই দিতে তার মন সরে না— যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মতো দেবার কথায়, মন আকুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সব চেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেইটুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সব চেয়ে কম লোভ— যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্‌বৃত্তের উদ্‌বৃত্ত। ঈশ্বরের-নাম গাঁথা দুটো-একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল, দুটি-একটি সংগীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভালো বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বললুম বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে— আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।

একেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না, তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সব চেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয়, নিজের অংশটাকেই সব চেয়ে বড়ো করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে এক পাই অংশের শরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে 'যা স্বয়লোকসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী'— যাতে দুই লোকেরই সাধনা হয় মানুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্ত যে-চাতুরী দুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ঐ দুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভুলতে থাকে, তার চাতুরী ঘুচে যায়। যে-লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে বেড়ে চলতে থাকে। ঈশ্বরের জন্যে ঐ যে এক পাই জমি রেখেছিলুম, যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মরুভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। 'আমি' জিনিসটা যে একটা মস্ত পাথর, তার ভার যে ভয়ানক ভার। যে দিকটাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেই দিকটাতেই যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাত হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও, তবে ঐটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভালো হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বরকে দিতে পারি তা হলেই দুই লোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই দুই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে এক-সঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই। আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তা হলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না, সেটা বিষয়কর্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্মের যে গতি তারও সেই গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই —তার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও-সমস্ত চাতুরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণই আত্মসমর্পণ করতে হবে এই কথাটাকেই পাকা করা যাক। আমার দুইয়ে কাজ নেই, আমার একই ভালো। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতীর লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়, সে যথার্থই দুইকে চায় না, সে এককেই চায়; যখন সে এককে পায় তখনই সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সংকট এই যে, আজ পর্যন্ত সে-জন্যে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনি ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়, যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সেরকম গোঁজামিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি 'পুনশ্চ নিবেদনের' সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভুলেই থাকি, তবে গোড়াগুড়ি সে ভুলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অমনি একরকম করে কাজ সেরে নেও, এ কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্বরবিবর্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তখনই বুঝতে পারি যখন তাঁর দিকে যেতে চাই। যখন অন্যটার মধ্যেই বসে আছি তখন সে যে আমাকে বেঁধেছে তা বুঝতেই পারি নে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাস প্রত্যেক সংস্কারটি কী কঠিন গ্রন্থি। জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানি নে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছেড়ে তো দেখতে পাই তার পিছনে আরও পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এতদিন বহুযত্নে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিকড় জড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার। তাদের কোনোটাকেই একটুমাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কী করে। তারা যে বাঁচবার জিনিস নয় তা বেশ জানি, তবু চিরজীবনের

সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে চলবে না যে। ধনকে আপনার বলে জানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি যে আজ বুঝব সে শক্তি কোথায় পাই। বহুদীর্ঘকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্বতসমান ভারী হয়ে উঠেছে, তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে।

এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে-ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন। ধন এখানে শুধু টাকা নয়, জীবন যা-কিছুকেই দিনে দিনে আপনার ব'লে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে অত্যন্ত নিজের ব'লে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে— সে ধনই হোক আর খ্যাতিই হোক, এমন-কি, পুণ্যই হোক।

এমন-কি, ঐ পুণ্যের সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা নিচ্ছে তা সব ঈশ্বরকেই দিচ্ছে। লোকের হিত করছি, ত্যাগ করছি, কষ্টস্বীকার করছি, অতএব আর ভাবনা নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাচ্ছি সে খেয়ালমাত্র নেই।

যেমন মনে করো আমাদের এই বিদ্যালয়। যেহেতু এটা মঙ্গলকাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসেব দেখবার দরকার নেই, যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্ছে। আমরা যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙছি তার খোঁজও রাখছি নে: এ বিদ্যালয় আমাদের বিদ্যালয়, এর সফলতা আমাদেরই সফলতা, এর দ্বারা আমরাই হিত করছি, এমনি করে এ বিদ্যালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠছে, সেটা একটা বিষয়সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণে তার জন্যে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে, তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে। পাছে কেউ কোনো ত্রুটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়— লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোলবার জন্যে একটু বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এ-সব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাদ্য হয়ে উঠছে। এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিদ্যালয় থেকে এই যে-অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলছি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্ছি নে। তখন ঈশ্বরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এইজন্যে সঞ্চয়ীর পক্ষেই বড়ো শক্ত সমস্যা। সে ঐ সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে, ঈশ্বরকে তাই সে চারি দিকে সত্য করে অনুভব করতে পারে না, শেষ পর্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি— সে-সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেইজন্যে মনের মধ্যে যে-চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে— কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনোরকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না— তার চেয়ে অসাধ্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কী করা কর্তব্য?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে— তবেই নূতন করে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জানতে হবে, যে জীবন আমার ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে-লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে

জন্মেছিলুম একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এসো মৃত্যু এসো— এসো অমৃতের দূত এসো—

এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন।
এসো গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়;
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণ-সাধন।

১৯ ফাল্গুন

ভিতরের সাধনা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন বাইরে কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে; সে লক্ষণগুলি কী রকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মানুষ বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত, মানুষের লক্ষ্যসিদ্ধি মানুষের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিস যদি জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ফল জিনিসটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য—পরিণত মানুষটি তেমনি সমস্ত সংসারবৃক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মানুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কী? একটি আমফল যে পাকছে তারই বা লক্ষণ কী?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রঙ ধরতে আরম্ভ করেছে, তার শ্যামবর্ণ ঘুচবে ঘুচবে করছে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যখন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না, কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণসাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আসতে থাকে, চারি দিকে আকাশের আলোর যে রঙ সেই রঙের সঙ্গেই তার মিল হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না—চারি দিকের নিবিড় শ্যামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠতে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আসে। আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল কিন্তু এখন আর সে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় সুগন্ধময় কোমলতা।

পূর্বে তার যে রস ছিল সে-রসে তীব্র অম্লতা ছিল, এখন সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়, সকলেরই ভোগের হয়, সকলকে আহ্বান করে, কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীরতর সার্থকতার অভাবেই মানুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈন্যেই তার দৈন্য, সেইজন্যেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিস, তার আঁটি—যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘটতে থাকে। সেটা যে তার নিত্যপদার্থ নয়

তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শস্য অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক হতে থাকে, ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল, তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক করে রাখে না— নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যখন নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন, সেখানটি যখন সুদৃঢ় সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে থাকে— তখন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তখন তাঁর ভয় নেই, কেননা তখন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তখন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে থাকে না; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যুদশা ঘটে না। তখন পাখিতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরত্বকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে, তখন সে 'অতিমৃত্যুমেতি'। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে, অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না— নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না— সুতরাং ঐ শাঁস খোসা বোঁটার জন্যে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে— 'য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'

ভিতরে যখন সেই অমৃতের সঞ্চার হয় তখন অমরাত্মা বাইরেকে আর একান্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তখন, তার যা গন্ধ, যা বর্ণ, যা রস, যা আচ্ছাদন, তাতে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই— সে এ-সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্লিপ্ত, এর ভালোমন্দ তার ভালোমন্দ আর নয়, এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তখন ভিতরে সে লাভ করে, বাইরে সে দান করে; ভিতরে তার দৃঢ়তা, বাইরে তার কোমলতা; ভিতরে সে নিত্যসত্যের, বাইরে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; ভিতরে সে পুরুষ, বাইরে সে প্রকৃতি। তখন বাইরে তার প্রয়োজন থাকে না বলেই পূর্ণভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে, তখন সে ফলভোগী পাখির ধর্ম ত্যাগ করে ফলদর্শী পাখির ধর্ম গ্রহণ করে। তখন সে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সকলের জন্যে আপনাকে সমর্পণ করতে পারে। তখন তার যা-কিছু, সমস্তই তার প্রয়োজনের অতীত, সুতরাং সমস্তই তার ঐশ্বর্য।

২০ ফাল্গুন ১৩১৫

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবঃস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতি-মুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে; এইজন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেইরকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্ছে। চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্ছে না, চারি দিকের দৃশ্যগুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্ছে।

সেইজন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্মসৃষ্টি-দ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এইরকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্যন্ত অধিকার করে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। এইজন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে, তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্‌বোধিত করে না। সূর্য উঠছে তো উঠছে, নদী বইছে তো বইছে, গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে, প্রতিদিনের কাজ নিয়মমত চলছে তো চলছে। সেইজন্যে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখি নে, এমন কোনো ঘটনা জানতে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন—তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়, জগৎ একটা যন্ত্রের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না; প্রতি-মুহূর্তেই এই অনন্ত-আকাশ ব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্ছে, বিকীর্ণ হচ্ছে. ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে অমৃত-রূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না—তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।

৩ চৈত্র ১৩১৫

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এইখানে উপাসনা করতে বসি—এও একটি সৃষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা দু-চারজনে পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্র হয়ে বসলুম, তার পরে রোজ রোজ এইরকম চলে আসছে।

ঘটনা এই বটে, কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখলে এ একটি সামান্য ব্যাপার, কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখলে এ বড়ো আশ্চর্য, প্রতিদিনই আশ্চর্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামণ্ডলী নিরন্তর সৃষ্টি করছেন। আমরা মনে করছি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্যে বসে কাজ সেরে তার পরে অন্য কাজে চলে গেলুম, বাস চুকে গেল—কিন্তু এ তো ছোটো ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়ছি, পড়াচ্ছি, খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, তখনো এই আমাদের মণ্ডলীটির সৃষ্টিকর্তা এরই সৃষ্টিকার্যে রয়েছেন। সেই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, তিনি আমাদের এই কয়জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুলছেন। তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই, বিশ্বসৃষ্টি তাঁর যত বড়ো কাজ এও যেন তাঁর তত বড়োই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলই হচ্ছে, হচ্ছে, হয়ে উঠছে—দিনরাত, দিনরাত। আমরা যখন ঘুমোচ্ছি তখনো হচ্ছে, আমরা

যখন ভুলে আছি তখনো হচ্ছে। সত্য যখন আছে, তখন কিছুই হচ্ছে না বা একমুহূর্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভুবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাজ করছেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভুবনকে তার যথাস্থানে যথানিয়মে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করছেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসছি। বিশ্বভুবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছে। যেখানে আমাদের দূরবীন পৌঁছয় না, মন পৌঁছয় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বলছে নমোনমঃ। আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি, যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাঙ্গণে বসে আছেন; কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ সৃষ্টি চলছে তারও শক্তি বিকীর্ণ করছেন, আমাদের কয়েকজনের মনকে এই বিশেষ ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্ছেন, আমাদের কয়জনের প্রকৃতি সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মুহূর্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুলছেন এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাব তখনো তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝখানের সেই সত্যকে, আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব। আমরা প্রত্যহ জেনে যাব, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি সৃষ্টি। তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজটিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রকাশককে আমরা দেখে যাব।

৩ চৈত্র ১৩১৫

সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর-একবার নূতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো অত্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে যে জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নয়, তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে, মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অনুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন এবং ভোগের আয়োজন—যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা কত প্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকে-জমকে লোকের চক্ষুকর্ণকে ঈর্ষা ও লুব্ধতায় আকৃষ্ট করে আকাশে মাথা তুলেছিল—তা একটি মুহূর্তেই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্যে বার বার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারি নে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই, গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝাটাকে জঞ্জালের মতো

মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্য কিছুই নেই। কোনোপ্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তা হলে ধনজনমান তো মন থেকে খসে পড়ে একেবারেই শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

বস্তুত সংসার তো মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কী। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে, কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। সূর্যালোকে তো কোনো কালিমা পড়ে নি, আকাশের নীল নির্মলতায় মৃত্যুর চাকা তো ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি; অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্‌টা? এই সংসারকে আমার বলে আমি ধরে রাখতে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ঐ আমার উপরেই সমস্ত জিনিসের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সে-ই বালির উপর ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধূলায় পড়ে ধূলিসাৎ হয়।

আমি বলে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়— তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা-কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখতে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাকিয়ে খেটে মরে। মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষুধার্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে, 'সমস্তই রইল পড়ে, কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।'

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই যদি চিরন্তন বলে না জানি তা হলেই যথেষ্ট হল না— কারণ, সেরকম বৈরাগ্য কেবল শূন্যতাই আনে। সে সঙ্গে এও জানতে হবে যে এই সংসারটা থাকবে। অতএব আমার যা-কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে, ত্যাগের দ্বারা নয়— আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না, সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিচ্ছেন, তিনি নিজের জন্যে কিছুই নিচ্ছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সত্য যদি তা দান করি— যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমস্তই মিথ্যা। সেই কথাটা যখন ভুলি তখন সমস্তই উল্টা-পাল্টা হয়ে যায়— তখনই শোক দুঃখ ভয়, তখনই কাম ক্রোধ লোভ। তখনই, স্রোতের মুখে যে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্য আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিস স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যখন মনে করি যে নিজে নিচ্ছি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে— এবং সেইসঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরকে তাদের খোরাকিস্বরূপ হৃদয়ের রক্ত জোগাতে থাকি।

৪ চৈত্র

'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারি দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারি দিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল— তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ঐসঙ্গে আমাকেও নাও—আমাকেও রাখো', তখন সংসার বলে—তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেইসঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল, অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনো-মতেই জমাবার জিনিস নয়।

৪ চৈত্র

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী। পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই।

পরমাত্মার স্বভাব কী? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন— আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয়, সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে, তা হলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি 'দেব', তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব?

ঐ যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে— তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়, কেননা সে যে মরে আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে, না জন্মায় না মরে। কিন্তু ঐ অহংটা জন্মেছে, তার একটা নাম-করণ হয়েছে; কিছু না পারে তো, অন্তত তার ঐ নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, একে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বলব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধনজন খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে, এ সমস্ত আমি পাচ্ছি আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা-কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বারবার করে বলব— ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না বলে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি। এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।

অহং-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া— এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর-একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে; ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে, সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারি দিকে ঘানির বলদের মতো পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না— সুতরাং এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

৫ চৈত্র

তবে অহং আছে কেন? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিসকে আমার বলতে চায় কেন?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারি নে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে 'আমার' বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়, সে উপকরণকে বিশেষভাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে যদি কিছুই তার 'আমার' না থাকে তবে সে দেবে কী?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার 'আমার' করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে তাকে তিনি 'আমার' বলতে দেবেন— কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই দরিদ্র হয়ে থাকবে। সে দেবে কী? বিশ্বভুবনের কিছুকেই তার আমার বলবার নেই।

ঈশ্বর ঐখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোটো শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেলতে-খেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুস্তির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে— তেমনি ঈশ্বর আমাদের মতো অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন, এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিত, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন, আমারই সসাগরা বসুন্ধরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে থাকতে হয়। সেইজন্য তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমুদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে!

এই যে তিনি 'আমার' বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্যটি কী?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম, অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্ছে আনন্দময়স্বরূপ— সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল— যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি তখন সে আমাব জল, তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব-দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাও গে, তা হলে জল দান করা হল না— যদিচ সে জল প্রচুর বটে এবং নদীও হয়তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, হাঁ, তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই 'আমার' বলবার অধিকাব জন্মায়— একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মে না।

তবেই দেখা যাচ্ছে, অহং-এর ধর্মই হচ্ছে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গৌরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এইরকম সব জিনিসেই নিজের নাম নিজের সীলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকত, তা হলে আত্মার যথার্থ কাজটি চলত না, সে দরিদ্র এবং জড়বৎ হয়ে থাকত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দ-ময়স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

তখন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না। অহং বলে 'এ সমস্তই আমি নিলুম'।

সে মনে করে 'আমি পেয়েছি'। কিন্তু ডালির ফুল তো বনের ফুল নয় যে, কখনো ফুরোবে না, নিত্যই নূতন নূতন করে ফুটবে। পেলুম বলে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তখন শুকিয়ে যাচ্ছে। দুদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়, পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তখন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিসটা, নেওয়া জিনিসটা, কখনোই নিত্য হতে পারে না।

আমরা পাব, নেব, আমরা করব, কেবল দেওয়ার জন্য। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ— অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন করতে হবে বলেই। নিজের দিকে একবার টেনে আনব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি, সে তো নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বলছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বলতে হবে, 'না, ও আমার নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে রাখতে হবে, বাইরে দিতে হবে, ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না।' অহং-এর এইসমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না, তিনি দিচ্ছেন, আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা-দ্বারা বদ্ধ হবার জন্যে হয় নি, এই রচনাগুলি-দ্বারাই সে মুক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে, কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারায় তার যথার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দরূপ অমৃতরূপ বিসর্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেইজন্য অহং তখনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

৬ চৈত্র

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা, অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে— আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চির-চঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি, তা হলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে এমন আশংকা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না, তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে, সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে— কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার-পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে, কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তা হলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে— এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার

দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণ-সমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারি দিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে—'তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও, তুমি এই ধন-দৌলতেই থাকো, এই ঘর-বাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতি-প্রতিপত্তিতেই থাকো।'

যদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতি-বেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ, অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশপরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ, তার সংগীত।

কিন্তু যখনই উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে, তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতিরোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

৭ চৈত্র

প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্মের সঙ্গে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তা হলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকত, তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকত, তা হলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তা হলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই, সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।

মনে করো একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে, ছোটো মাপকাঠি কী করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্ত্বকে প্রকাশ করে। না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না, এখনো শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাকত তা হলে বৃহত্ত্বের সঙ্গে কেবলমাত্র নিজের বৈপরীত্যটুকুই জানত, কিন্তু সে নাকি চলেছে, এই চলার দ্বারাই বৃহত্ত্বকে পদে পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার দ্বারা মাপকাঠি ক্ষুদ্র হয়েও বৃহত্ত্বকে প্রচার করছে। এইরূপে ক্ষুদ্রে বৃহতে বৈপরীত্যের মধ্যে যেখানে একটা সামঞ্জস্য ঘটছে সেইখানেই ক্ষুদ্রের দ্বারা বৃহতের প্রকাশ হচ্ছে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়— তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভিব্যক্তি আছে, একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চলতে-চলতে সে ক্রমাগতই বলছে, 'আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না।' এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং, তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্যে দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে। আত্মা অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে-করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে। রূপ কেবলই বলে, 'একে আমি বাঁধতে পারলুম না, এ আমাকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চলছে।' এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দ্বার নয়। সে যেন তার রাজপথের বিজয়তোরণের মতো, তার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে-করতে সে চলে যাচ্ছে, এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। অহং নিয়ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপছে আর কেবলই বলছে— 'না, একে আমি সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারলুম না।' সে যেমন সব জিনিসকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়। বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম। অথচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি, তেমনি বদ্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্বনেশে জিনিস আর কী হত।

তাই বলছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলই বাঁধছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে, সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে আত্মার মুক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করছে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মুক্তির প্রকাশ কোথায় থাকত? যদি না ছেড়ে দিত তা হলেই বা কোথায় থাকত?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে, এইটেই হচ্ছে ওর সামঞ্জস্য। অহং সে কথা ভোলে সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্যে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে দুঃখ দেয়, ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে, কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়, ভাব ম্লান হয়ে যায়।

যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেইজন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলি নে, তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ, সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করছে, বাধাগ্রস্ত করছে না।

এইজন্যেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার

মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে— নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে, মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।

৮ চৈত্র

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেরকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন, সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম-ভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ—সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। সূর্যকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন। সূর্য তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্ছে, সেইখানেই কুঁড়ি মুষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্ছে—সেইখানেই বন্ধন, বিকার, বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান-দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠে-ছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ—সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলির মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা, তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কী হব? পরমাত্মার মতো সেই স্বরূপটি লাভ করব, যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভূ। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্-রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবে না।

যে প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে প্রার্থনা, যে প্রার্থনার যুগযুগান্তব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দনা রোদসী বলেছে, সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো।

আমি অসত্যে আচ্ছন্ন, আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট, আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো। আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট, আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হোক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক— সেই প্রকাশ বাধা নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন— এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

৯ চৈত্র

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করছি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্ছি নে কেন? আমাদের মন বসছে না কেন? আমাদের ভাব জমছে না কেন?

সে কি অমনি হবে? আপনি হয়ে উঠবে? এতবড়ো লাভের খুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি? ঈশ্বরকে পাওয়া বলতে কতখানি বোঝায় তা ঠিকমত জানলে এ সম্বন্ধে বৃথা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়।

ব্রহ্মকে পাওয়া বলতে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তা হলে কোনো কথাই ছিল না— কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে একমনে নিযুক্ত করলুম কই? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানতে চাও। এই যে উপদেশ, সে উপদেশের মতো তপস্যা হল কই।

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা, নাম শোনাই তপস্যা? জীবনের অল্প একটু উদ্‌বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব-নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর? বল যে 'এই তো উপাসনা করছি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন'? এত সস্তায় কোন্‌ জিনিসটা পেয়েছ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জন্যে কী তপস্যাই না করতে হয়েছে? বাপ মা'র কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা, রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন। সেজন্য ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠি নি— কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজসাধনা চলেইছে।

সমাজবিহারের জন্য যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা, তবে ব্রহ্মবিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই-চারিটি কথা শুনে বা দুই-চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে?

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে, সে ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও বড়ো— বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাখতে হবে প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি— শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জা-সংকোচ করতে শিখেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শায়েস্তা হয়ে

এসেছে। সভাস্থলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না। সমাজের সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণাভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে যে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে; এমন-কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয়, হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন এখন থাক্‌।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পা'কে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে—যে ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি স্তব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুলতে হবে—এ তনু ভগবানের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবে না, অতি সহজেই সর্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-দ্বেষ লোভ-ক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌঁচচ্ছি না কেন সে যেমন অসংগত বলা, তেমনি নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

১০ চৈত্র

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীলগ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই, যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না, এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্‌সরতি। শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন?

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি অসবলানি, অকম্মাসানি ভুজিস্‌সানি বিঞ্ঞুপ্‌পসত্থানি, অপরামট্‌ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি

কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে।

এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারংবার স্মরণ করেন। এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা 'মঙ্গলসুত্তে' কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই--

বহু দেবা মনুস্‌সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকংখমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, 'বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।'

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন--

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয়্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্‌ঞতা
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্‌পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্‌ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্‌ঞমো
অপ্‌পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্‌ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই, সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে, তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছোনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে-করতে, নয় নয় বলতে-বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে-করতেই সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টো পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে— মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটা দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা—সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তিভাবনা—মৈত্রীভাবনা। প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু; সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষ্যা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না—এইজন্য শীলগ্রহণ শীল-

সাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এ তো শূন্যতার পন্থা নয়। তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মথ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজু চ সুহুজু চ,
সুবচো চস্‌স মুদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই— তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ
অপ্‌পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্‌পগব্‌ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্‌বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়. সদ্‌বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্‌ঞূপরে উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক, নিরাপদ হোক, সুস্থ হোক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথূলা।

দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা হোক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্‌ঞা
নঞ্‌ঞ মঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না—কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেষু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্ধ্বে অধোতে চার দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্ঠেয়
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন : ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোটো করে ঝাপসা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এই দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না, তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব এক দিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনা-দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে—এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ এক দিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্ম-বিহার কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে?

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন, তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসো; বলেছেন প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌঁছতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারী লোকের দুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এতদূর পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

অতএব এই বড়ো লক্ষ্য এবং বড়ো পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস দেবে। নিজের অন্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্‌বোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকে অসত্যের দ্বারা কেটে ক্ষুদ্র করলে, উপায়কে দুর্বলতার দ্বারা বেড়া দিয়ে সংকীর্ণ

করলে, তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়—যা আমাদের পাবার তা পাই নে, যা পারবার তা পারি নে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ আমাদের কারো প্রতি অশ্রদ্ধা অনুভব করেন নি, যখন তিনি বলেছেন, 'মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।' যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি যখন তিনি বলেছেন, 'তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।'

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি। তখন আমরা ভূমাকে পাবার এই দুরূহ পথকে অসাধ্য পথ বলি নে—তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাভৈঃ বাণী অনুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যুক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করো।

একবার ভিতরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো—প্রতিদিন কোন্‌খানে ঠেকছে। একজন মানুষের সঙ্গেও যখন মিলতে যাচ্ছি তখন কত জায়গায় বেধে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অহংকারে ঠেকছে, স্বার্থে ঠেকছে, ক্রোধে ঠেকছে, লোভে ঠেকছে—অবিবেচনার দ্বারা আঘাত করছি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্ছি। কোনোমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আনতে পারছি নে যার দ্বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সহজ এবং মধুর হয়। এই বাধা যখন স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছি তখন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাতে আমাকে একটি মানুষের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিলতে দেবে না তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন করবে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন, যাতে শত্রুকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেন নি—হাতে রেখে কথা কন নি। তাঁরা বলছেন, একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে, স্বার্থের দিকে, আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে, প্রেমের দিকে, পরমাত্মার দিকে, অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। যাঁরা এই মহাপথে যাত্রা করবার জন্য মানবকে নির্ভর দিয়েছেন, একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

১২ চৈত্র

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই, এ কথা বললে মানুষের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন তা হলে খোরাক কী? মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কী করে? মায়ের মুখ থেকে শুনতে-শুনতে খেলতে-খেলতে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে—ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তখন তার কথাগুলি আধো-আধো, ব্যাকরণ-ভুলে পরিপূর্ণ। তখন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সংকীর্ণ। কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাকা হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না, ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না—তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয়, তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে

নিতে হবে, সেটাকে সর্বত্র পাকা করে নিতে হবে, কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে নয়, তাকে গভীরতর উচ্চতর ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। এক দিকে পাওয়া আর-এক দিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে: আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে—সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা দুটোই যদি পাশাপাশি না চলে, তা হলে হয় পাওয়াটা কাঁচা হয়, নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

বুদ্ধদেব কঠোর শিক্ষকের মতো দুর্বল মানুষকে বলেছিলেন, 'এরা ভারি ভুল করে, কাকে কী বোঝে, কাকে কী বলে তার কিছুই ঠিক নেই। তার একমাত্র কারণ এরা শেখবার পূর্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক, তা হলে যথাসময়ে পাবার জিনিসটা এরা আপনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপনমাত্র এদের কাছে করা হবে না।'

কিন্তু ঐ চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা তো নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে। ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয়, ও যে গতিও দেবে।

অতএব আমরা যতই ভুল করি, যাই করি, কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মানতে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখব এ চলবে না, মায়ের কাছেও শিক্ষা পাব।

মায়ের কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে, সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায়?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই, একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মাতার মুখ থেকে সে খাবার খায়। যদি তাকে বলি, যে পর্যন্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্যন্ত খেতেই পাবে না, তা হলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চা করব, তেমনি প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রসাদের জন্যে ক্ষুধিত চঞ্চুপুট মেলতে হবে: তার কাছ থেকে সহজ কৃপার দৈনিক খাদ্যটুকু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে। এ ছাড়া উপায় দেখি নে।

এখন তো অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি, এখন তো নীড়েই পড়ে আছি। ছোটোখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্য বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রয়। এই আশ্রয়ের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাদ্যের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয়, তা হলে আমাদের কী দশা হবে?

তুমি বলতে পার, 'ঐ খাদ্যের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তা হলে চিরদিন নিশ্চেষ্ট হয়েই থাকবে, নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।'

সে শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলি নে। ওড়বার প্রয়াসে দুর্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কৃপার খাদ্যটুকু, প্রেমের পুষ্টিটুকু, প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তা হলে যখনই পুরোপুরি বল পাব তখন নীড়ে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার? দ্বিজশাবকের স্বাভাবিক ধর্মই যে অনন্ত আকাশে ওড়া। তখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসারনীড়ে বাস করবে বটে, কিন্তু অনন্ত আকাশে বিহার করবে। ·

এখন সে অক্ষম ডানাটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে, আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেইটুকুকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেখলেও সে কেবল ডালে ডালে লাফাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীণ সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটা অত্যুক্তি প্রয়োগ করছেন—যা বলছেন তার ঠিক মানে কখনোই এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া। ঐ যে লাফাতে গেলে মাটির সংস্রব

ছেড়ে যেটুকু নিরাধার ঊর্ধ্বে উঠতে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তাঁরা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করছেন—ওটা কবিত্বমাত্র, ওর মানে কখনোই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসারনীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন, ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন, তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারি নে।

কিন্তু এ-সব আশ্চর্য কথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন, যাঁরা পেয়েছেন। সেই আশ্বাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে, সেই বার্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রক্ষা করি—তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর প্রসাদসুধা চাইব সেইসঙ্গে এই কথাও বলব, 'আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো। আমি কেবল আনন্দ চাই নে, শিক্ষা চাই; ভাব চাই নে, কর্ম চাই।'

১৩ চৈত্র

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব; তখন তিনি বললেন, 'তোমার ও-সব কথায় কাজ কী? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো দুঃখে পড়েছ, তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখতে পারো না, যা রাখ তাতে তোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার উপায় করে তবে অন্য কথা।' এই বলে দুঃখনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে, তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই তো মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্‌প্‌স পর্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। 'আমি দুঃখ সইতে পারি, আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে'—এ কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেক্‌জাণ্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম নদী গিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা—বড়ো হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্ছে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কী জন্যে এই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে যতদূর সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ কথা বলা মিথ্যা যে, 'তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্ছি।' তাকে এ কথাও বলা মিথ্যা যে, 'ভোগের বাসনা ত্যাগ করো, আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না।' ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে।

বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখ-

স্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়োরকম করে ত্যাগ, খুব বড়োরকম করে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যিই এমন কোনো একটা জায়গায় মানুষ ঠেকতে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তির শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই, তা হলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরোতে হত।

অতএব মানুষকে যখন বলি দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে রাগ করে বলতে পারে, 'চাই নে আমি দুঃখনিবৃত্তি।' ওর চেয়ে বড়ো কিছু একটাকে দিতে হবে, কারণ মানুষ বড়োকেই চায়।

সেইজন্যে উপনিষৎ বলেছেন : ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয়, বড়োই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। এই বড়োকেই জানতে হবে, এঁকেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমত বুঝি তা হলে কখনোই বলি নে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেন না, টাকায় বলো, বিদ্যাতে বলো, খ্যাতিতে বলো, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে 'আমার সব পাওয়া হল'।

অতএব যিনি ব্রহ্ম, যিনি ভূমা, যিনি সকলের বড়ো, তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর করো, শুচি হও, সবল হও— আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও, তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু পাই, তা হলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অনুষ্ঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে— পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

দুধে তেঁতুল দিয়ে সেই দুধকে দধি করবার চেষ্টা করলে হয়তো বহু চেষ্টাতেও সে দুধ না জমে উঠতে পারে, কিন্তু যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে-দেখতে দুধ সহজেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম সুসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ করে দিতে হবে, তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন। তা হলে চলাও আনন্দ, পোঁছনোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তা হলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসৎ থেকে সৎ হয় না, একেবারে না-পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না— এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে যাবেন।

১৪ চৈত্র

ওঁ শব্দের অর্থ— হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা 'হাঁ'কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায়

পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বললেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হাঁ এবং না'এ খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্রই খণ্ডতা আছে, সর্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা 'হাঁ' পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখছে, কানও শুনছে, নাসিকাও ঘ্রাণ করছে। এর মধ্যে যে কেবল একটা 'হাঁ' এবং অন্যটা 'না' হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় 'হাঁ' হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস, অঞ্জলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিথুনের মাঝখানে, অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই, এই ওঁ। যেখানে এক দিকে ঋক্ এক দিকে সাম, এক দিকে বাক্য এক দিকে সুর, এক দিকে সত্য এক দিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে, সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সংগীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারে না; তাকে ঠেকতে হয়, তাকে ঠকতে হয়; মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ। শেষকালে দেখে, এর সব-তাতেই পাপ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, 'না' তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের এক দিকেই ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন—

এতজ্‌জ্ঞেয় নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

অর্থাৎ—

আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

অর্থাৎ—

সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি' কেবল নয়, আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রই।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃস্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি এদিকে ভূর্‌ভুবঃস্বকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যই তিনি ওঁ।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই, সংসারকেই, একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে—আবার যারা বিদ্যাকে, ব্রহ্মজ্ঞানকে, ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। এক দিকে বিদ্যা আর-এক দিকে অবিদ্যা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-এক দিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেইখানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত, নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত; চলার দ্বারা থামা বর্জিত, থামার দ্বারা চলা বর্জিত; অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত, বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির, সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি; কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্যই তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। এক দিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করছেন, আর-এক দিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষৎ বলেন—

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংস্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি, পরস্পরকে কাটতে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মানতে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মানতে চায় না, কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক। তার মানে এ নয় যে, তবে এ-সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলছি আমি তুমি নয়, তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্।

মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জিত হয় নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা, যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়—যা চন্দ্রে নয়, সূর্যে নয়, মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে—যা কানে নয়, চোখে নয়, বাক্যে নয়, মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে—সেই এককেই, সেই হাঁকেই—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওঙ্কার।

১৫ চৈত্র

মানুষের একদিন ছিল যখন সে যেখানে কিছু অদ্ভুত দেখত সেইখানে ঈশ্বরের কল্পনা করত। যদি দেখলে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠছে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তখন সে কোনো একটা অসামান্য লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বলত অমুক মানুষে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মূর্তিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্বত্র এক বলে দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জানতে পারল যে, যাকে অসামান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনি মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে, সমাজ থেকে, রাজ্য থেকে, মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখা, স্বভাবে দেখা।

কোনোপ্রকার বাহ্য ও সংকীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌কে ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুললে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে, স্বভাব থেকে, সুতরাং মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব— আমরা যে দিকটাতে এইরকম অসংগত ঝোঁক দেব সেই দিকটাকেই বিপর্যস্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে— এই তো তার অনিষ্টের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কী? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয়, প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপ প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জনস্পৃহা যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জনের দিকেই মানুষের শক্তিকে একান্ত বাঁধিতে চায় তখনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়। তখনই সে মানুষের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে। এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে-ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কখনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায় না, সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মানুষের প্রতি অনুরাগ যখন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তখনি তা কাম হয়ে ওঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বরলাভের বাধা।

এইজন্য সামঞ্জস্য থেকে, বিকৃতি থেকে, মানুষের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্ছে ধর্ম-নীতির একান্ত চেষ্টা।

১৬ চৈত্র

ব্রহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে?

সংসারে আমরা অশন বসন জিনিসপত্র প্রতিদিন কত কী পেয়ে এসেছি। পেতে হবে বললে মনে হয় তবে তেমনি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে মনে করি তবে তো পাচ্ছি নে। তখন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যাতে আমাদের অন্যান্য পাওয়ার শামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের যে ফর্দটা আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে, গাড়ি আছে, আমার ঘটি আছে, বাটি আছে, তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখার দরকার এই যে, ঈশ্বরকে পাবার জন্যে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কী? সে কি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আরও একটা বড়ো জিনিসকে যোগ করবার আকাঙ্ক্ষা?

তা কখনোই নয়। কেননা যোগ করে করে জড়ো করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রী-গুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিরন্তর কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্যেই কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে। তাঁকেও কি আবার একটা তৃতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে জোড়া দিয়ে বসব? আরও জঞ্জাল বাড়বে?

কিন্তু আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চায় তার মানেই হচ্ছে— সে বহুর দ্বারা পীড়িত এইজন্য

সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এইজন্য সে ধ্রুবকে চায়, নূতন-কিছুকে বিশেষ-কিছুকে চায় না। যিনি নিত্যোঽনিত্যানাং, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন, সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। যিনি রসানাং রসতমঃ, সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম, তাঁকেই চায়; আর-একটা কোনো নূতন রসকে চায় না।

সেইজন্যে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা-কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখবে। আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিস সন্ধান বা নির্মাণ করবে না। এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে, আনন্দ পাবে।

এমনি করে তো নিখিলের মধ্যে তাঁকে জানবে। আর ভোগ করবে কী? না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, তিনি যা দান করেছেন তাই ভোগ করবে। মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং, আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে যা-কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে, তেমনি তুমি যা-কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কী হবে? না, তুমি যা-কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরও কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সেরকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তা হলেই অল্পই হবে বহু, তা হলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড়ো করে কখনোই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌঁছনো যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমত জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

১৭ চৈত্র

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন—তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে, অতএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ঐখানেই অভাব আছে—সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের, অহংকারের, ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন-কি, বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এইজন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড়ো সত্তা বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে, তা হলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তা হলে তো আমাদের এই অহং, এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই, একেবারে পরম লাভ—তা হলে একে আঁকড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন?

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়— আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি-দ্বারা, ক্ষমা-দ্বারা, সন্তোষের দ্বারা, সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্ছি নে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্ছি নে কেন? আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি নে বলেই— সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে— ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়— নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায়, তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করি নে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন। তাঁরই আনন্দ শক্তিরূপে ছোটো বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে, এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ, সমস্তই সহজ হয়ে যাবে— কেননা যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

১৮ চৈত্র

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপে যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেননা আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে, তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই-সকল রসের রসতমকে, সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্ছে— নইলে তার তৃপ্তি নেই।

জীবাত্মা যা-কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি।

প্রথমে দেখছি আমি আছি— আমি সত্য।

তার পরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনো হই নি, তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে, ছুঁতে পারি নে, কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়— সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে, বর্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়— যা চিন্তা করি নি, ভবিষ্যতে করব, তার

সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম, তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্যমান যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখছে। এ এমন করে কাজ করছে যাতে আমাদের শরীরের 'আজ'ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায়, শরীরের 'কাল'ও আপনার দাবি রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাটছে, আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরছে। এই শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে, পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করছে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করছে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে, স্বাস্থ্যের মধ্যে, একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জানছে আমি হচ্ছি আমি, আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আছি।

শুধু জানছে নয়, এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারে না; এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে, রাখছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই-যে সমগ্রতা, যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে, অর্থাৎ সত্য কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালোবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজসত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না, তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত, আনন্দময়, অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেম-ময়,

যোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয়, আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে; মানুষ অন্ধভাবে নয়, সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করছে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ— বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ, দুর্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন— ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

১৯ চৈত্র

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্য বুদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই-যে সমগ্রতা, সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালোবাসে।

শুধু তাই নয়, এইজন্য সর্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়— সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা-কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারি দিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র একতে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই-যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর-সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে বুঝতে পারি, মানবকে এক বলে বুঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে বুঝতে পারি, এমন-কি, সেইরকম এক করে যাকে না বুঝতে পারি তার তাৎপর্য পাই নে— তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাতড়ে বেড়াতে থাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজছি, সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা— মানবকে এক বলে জানি, সেই জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা— বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্‌ বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা। এইজন্যই উপনিষৎ বলেন, সাধক— আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি— আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ, আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এইজন্যই পরমাত্মাকে 'একাত্মপ্রত্যয়সারং' বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে, সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম— সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতম যদয়মাত্মা।

২১ চৈত্র

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা— একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন-কি, শিশু যখন নানা জিনিসকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার জন্যে চারি দিকে হাত বাড়াচ্ছে তখনো সে সেই

এককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও শিশুরই মতো নানা জিনিসকে ছুঁচ্ছি, শুঁকছি, মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি, তার থেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিচ্ছি। এই-সমস্ত পরীক্ষা এই-সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই এককেই চাচ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু— ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লিষ্ট করে, আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না— ওঁ। বলতে পারছে না— হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারি দিকে মাথা ঠুকতে থাকি, উঁচট খেতে থাকি, তখন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিসকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি 'এই তো পেয়েছি'— তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা, এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়— অমনি এতদিনের এত খোঁজা, এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো বিশেষ জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তখন যে-জিনিসের ঠিক যে-ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কী জ্ঞানে, কী প্রেমে, কী কর্মে, সেই এককে সেই আসল জিনিসকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়— জিনিসের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লাঘব হয়ে যায়। সাঁতারটি যেমন জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাই নে, আপনি ভেসে উঠি। এই সাঁতারটি না জানলেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয়, আমাকে মারতে চায়। যে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জানলে আমার পক্ষে লীলা, আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার না জানলে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে দুঃখ, আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত-পা ছুঁড়ে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

আমাদের আসল জানবার বিষয়কে— পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি, অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না, মারতে পারে না। তখন, পূর্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ হয়ে যায়— সংসারে তখন আমরা মুক্তভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ, বিক্ষেপ, যে শক্তির অপব্যয় ছিল, সেটা কেটে যায়।

সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন, তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি, সেই সর্বব্যাপীকে যাঁরা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে, যুক্তাত্মা হয়ে, সর্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য লাভ করেন, আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলই

বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন। তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। নিজেকে কোনো অহংকার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না, একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বহুর মধ্যে প্রবেশ করেন, সমস্ত বহু তখন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই-সকল ধীর সেই-সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনুসরণ করব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

২২ চৈত্র

সাধনার দুই অঙ্গ আছে। একটি ধরে রাখা, আর-একটি ছেড়ে দেওয়া। এক জায়গায় শক্ত হওয়া, আর-এক জায়গায় সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার দুটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে হাল আর-একটি হচ্ছে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধরে রাখতে হবে। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জন্যে দিক জানা দরকার, নক্ষত্রপরিচয় হওয়া চাই, কোন্‌খানে বিপদ কোন্‌খানে সুযোগ সে-সমস্ত সর্বদা মন দিয়ে বুঝে না চললে চলবে না। এর জন্যে অহরহ সচেষ্ট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্যে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর-একটি কাজ হচ্ছে অনুকূল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা। জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের সুযোগ হতে সে যেন লেশমাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তেমনি। যেমন এক দিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেষ্ট রাখতে হবে, তেমনি আর-এক দিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখতে পাই। এখানেও মানুষের যেন একটা কৃপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখতে চায় ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন নিজের শক্তির পরিচয় পায়। প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতখানি চলা হল। এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করছি সমস্তই তিনি করছেন এইটি কল্পনা করা। করছি কাজ আমি, অথচ নিচ্ছি তাঁর নাম, এবং দায়িক করছি তাঁকে—এমন দুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখতে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মানতে হবে। কাত হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চললে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপুরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমুহূর্তে যেন আপনাকে প্রসারিত করে রাখে। যা শ্রেয় তা যেন সহজেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্যন্তই তাকে নিয়ে যায়।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে, আমি ধর্মেই থাকি আর অধর্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্ছ আমি তেমনি চলছি। এর ভাব এই যে, আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় না, অধর্ম থেকে নিরস্ত করে না; তাই হে প্রভু, স্থির করেছি

তোমাকেই আমি হৃদয়ে রাখব এবং তুমি আমাকে যে দিকে চালাবে সেই দিকে চলব। স্বার্থ আমাকে যে দিকে চালাতে চায় সে দিকে চলব না, অহংকার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হব না।

অতএব তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হোক।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃতফলভারে সার্থক হোক্। সর্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ঐ একটুখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কী দরকার, তার কী মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা কোরো না—সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হার-জিত তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে, কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে, কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা যতই করি, ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন।

২৪ চৈত্র

কোনো লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও যে-সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধসূত্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন। যে-রসের দ্বারা সেই-সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই। এইজন্যে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মানুষ তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।

পিতা যত বড়োই হোন আর পুত্র যত ছোটোই হোক, উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক্, তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড়ো বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে, নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উঠবেন না।

তিনি তো কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ সূর্যকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে এত লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব ঘুচিয়ে মাঝখানে রয়েছেন, তেমনি তিনিই নিজে এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের সম্বন্ধরূপে বিরাজ করছেন। নইলে একের সঙ্গে আরের

ব্যবধান যে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাকতেন তা হলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কী করে!

অতএব তিনি দুরূহ তত্ত্বকথা নন, তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অখণ্ড আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্বাদে গন্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন। তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করেছেন, নইলে ফল-নামক সত্যটিকে আমি কোনো দিক থেকেই কোনো রকমেই এতটুকুও নাগাল পেতুম না।

কিন্তু আপন যে কতদূর পর্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্যন্ত, তা তিনি মানুষের সম্বন্ধে মানুষকে দেখিয়েছেন— শরীর মন হৃদয় সর্বত্র সেই আত্মীয়তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেইজন্যে মানুষের এই সম্বন্ধগুলির মধ্য দিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কী? সেই তিনি তাঁকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না। তার চেয়ে চরমতম অন্তরতর কথা হচ্ছে: তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিদ্যা আমার ধন, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই-যে যোগ এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে— পিতা নোঽসি, তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র: তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে: তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে: তুমি পিতা।

এই-যে যোগ, এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, পিতা নোবোধি, তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো— পিতা নোঽসি, পিতা আছ; কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না— পিতা নোবোধি, তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধি-যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্ছি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি— ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব! কিন্তু সেইসঙ্গে যেন এই বোধটুকুও পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছি, পাচ্ছি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারছি নে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্ছি নে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়। সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে। আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কাররূপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর। এ জলভারনত মেঘের মতো, ফলভারনত শাখার মতো, রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে

পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য তা নয়, এ প্রবল শক্তি। এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে, উদ্ধত অহংকার তেমন করে পারে না। একে কেউ পরাভূত করতে পারে না। জীবন এই নমস্কারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জয়ী হয়। এই নমস্কারের দ্বারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়, পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্তকালীন বন্যার মতো চলে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এইজন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমার নমস্কার হোক। সুখ আসুক দুঃখ আসুক, নমস্তেঽস্তু। মান আসুক অপমান আসুক, নমস্তেঽস্তু। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই নমস্তেঽস্তু। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কালের অধীশ্বর তুমিই পিতা নোঽসি এই জেনেই—নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। আমাকেই বড়ো বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চির-দিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করি।

২৬ চৈত্র

বীণার কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইস্পাতের, কোনো তার মোটা, কোনো তার সরু, কোনো তার মধ্যম সুরে বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হবে, তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ সুর জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে।

সূর্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা-না-একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। মানুষের জীবনকেও কি এই চির-উদ্‌গীত সংগীতে যোগ দিতে হবে না?

কিন্তু এখনো এই জীবনটাকে তারের মতো বাঁধি নি। এর মধ্যে এখনো কোনো গানের আবির্ভাব হয় নি। এ জীবন সূত্রবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য সুরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি-কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়, সেইসঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়। সেই মন্ত্র মনের মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোঽসি।

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি, কাজ করছি, বিশ্রাম করছি, এই পর্যন্তই।

কিন্তু অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ঐ মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ঐ মন্ত্রটি বারংবার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্ : পিতা নোঽসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক, কারও কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশু ঐ সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলে নি— সে কেবলই বলেছে : পিতা নোঽসি।

সেই যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে : পিতা নোঽসি।

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমত প্রকাশ করা বড়ো কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সন্তানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সন্তত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুলতে পারি তবে তো এই সুর বাজবে না যে : পিতা নোঽসি।

সেইজন্যেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হোক : পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু।

২৭ চৈত্র

পিতা নোঽসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছ থেকে গ্রহণ করব। যিনি পিতা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বলব, তুমি যে পিতা সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে তো কোনো তৈরি-করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পর বোঝাপড়া আছে, সেই বোঝাপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয়, সে একেবারে আদিতম সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অস্তিত্বের মূলে। অতএব এই গভীর আত্মীয়-সম্বন্ধ কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায়? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সন্তানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে, নিজের মধ্যে, নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, বিশ্বে এই যা-কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমনি, ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনোই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ঐ নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত। সেইজন্যেই সর্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধকারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিমুহূর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ চৈতন্য ধীশক্তি লাভ করছি। এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয়, এই কথাটিকে ভক্তিদ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ঐ মন্ত্র সার্থক হবে : ওঁ পিতা নোঽসি। আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ—মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ, আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে, এই কথাটি নিজেকে ভালো করে বলাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নয়। তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে, গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আমরা কেবল বেঁচে আছি, কাজ করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায় আহারে বিহারে কাজে কর্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে, নানা সুখ—নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্ছি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারখানাঘরের সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্ছে?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্যেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে, নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায়, জোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি : ওঁ পিতা নোঽসি। কেবলই তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্ছেন, এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি। কেই-বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত? আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন।

২৮ চৈত্র

ওঁ পিতা নোঽসি, এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে, পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছেন।

আর-এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর-এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি, কিন্তু স্পর্ধা করতে পারি নে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে আমাকে মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেননা তিনি কেবলমাত্র আমার বড়ো নন, তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়ো, আমি তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার বড়ো আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই, জবরদস্তি নেই। যে বড়োর

মধ্যে আমি আছি, যে বড়োর মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা, তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়। আমারই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহত্ত্ব অনুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে— নমস্তেঽস্তু, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠুক।

তাঁকে 'পিতা নোঽসি' বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি পরিমাণ রক্ষা হয়। তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমত্ত হবার যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। সম্ভ্রমের দ্বারা আমাদের আনন্দ গাম্ভীর্য লাভ করে, অচঞ্চল গৌরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানবসম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থান দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও এক দিকে যেন ওজন কম আছে, এক দিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, তার রোগে শুশ্রূষা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাবনিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এইজন্যই সন্তানের আরাম ও সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এইজন্য তিনি সন্তানকে দুঃখও দেন। তাকে শাসন করেন, তাকে বঞ্চিত করেন, যাতে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয়, সে দিকে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে, কিন্তু সে-স্নেহ সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেইজন্যে পিতাকে নমস্কার করবার সময় বলা হয়েছে— নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। যিনি সুখকর তাঁকে নমস্কার, যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্কার।

পিতা কেবল আমাদের সুখের আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন। সেইজন্যেই সুখেও তাঁকে নমস্কার, দুঃখেও তাঁকে নমস্কার। ঐখানেই পিতার পূর্ণতা; তিনি দুঃখ দেন।

উপনিষৎ এক দিকে বলেছেন— আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা-কিছু সমস্ত জন্মেছে। আবার আর-এক দিকে বলেছেন— ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে। অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না, সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। এই যা-কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে— সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্‌ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চলছে, তিনি কী রকম? না, তিনি উদ্যত বজ্রের মতো মহাভয়ংকর। সেইজন্যেই তো সমস্ত চলছে— নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মতো অতি নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। এই ভয়ের দ্বারাই অনাদি কাল থেকে সর্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও যে দিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে, সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন— মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। সে দিকে কোনো ব্যত্যয় নেই, কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যখন বলি 'পিতা নোঽসি', তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে 'পিতা নোঽসি', সে তাঁর সামনে

'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ' হয়ে থাকে। সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধৈর্য ক্ষুদ্র আত্মবিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে চলতে থাকে।

২৯ চৈত্র

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি— যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভালো তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো তাই আমার ভালো, কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে, অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা, সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব-স্তুতি অনুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না, সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে, তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনো নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় নি। এখনো চলতে ফিরতে বাধে। এখনো সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করি নে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এইজন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না, পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করছি, তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ মঙ্গল এখনো আমার পক্ষে ধর্ম হয়ে ওঠে নি। যার ধর্ম যেটা সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয়, সেইটেই তার আনন্দ। চোখের ধর্ম দেখা, তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট। মনের ধর্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম যেমন পুত্রস্নেহ, ঈশ্বরের ধর্মই তেমনি মঙ্গল।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে, সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে ওঠবার জন্যে নিয়তই মনুষ্যসমাজে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনই তার মুক্তি হয়, যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্র-বদাচরেৎ, ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মতো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই-সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানে আনন্দসম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তখনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের-দ্বন্দ্ব-বর্জিত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার-দ্বিধা-বর্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়। তখনই আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শূন্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে; কর্ম চলে যায় না, কিন্তু কর্মই আসক্তিশূন্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

৩০ চৈত্র

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতা নোঽসি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আকাঙ্ক্ষাটিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখা বড়ো কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাঙ্ক্ষা আছে, কত অসাধ্যসাধনের সংকল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না। বাইরে থেকে যদি বা খাদ্য জোগাতে নাও পারি, তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে-আকাঙ্ক্ষা সকলের চেয়ে বড়ো, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায়, তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—আমিই ইচ্ছা করছি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে, কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোটো ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখে না টাকা জিনিসটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভালো খাবে, ভালো পরবে, সে-কথা তার মনেও নেই। কারণ, বস্তুতই টাকার লোভে সে ভালো খাওয়া পরা পরিত্যাগ করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্য কোনো সুখকে চাচ্ছে না, অন্য সব সুখকে অবজ্ঞা করছে, সে টাকাকেই চাচ্ছে।

এমনতরো একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ—এই ইচ্ছা তার একলার নয়, সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্ছে, কোনোমতেই তার ইচ্ছাকে থামতে দিচ্ছে না।

কোনো সমাজে যদি কোনো একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ গৌরব থাকে তবে অনেক

লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্য তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে। দশজনে এইটে আকাঙ্ক্ষা করে এই হচ্ছে ওর জোর, আর কোনো তাৎপর্য নেই।

যে-দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড়ো জিনিস বলে জানে সে-দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। অন্য দেশে এই দেশানুরাগের উপযোগিতা উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হোক-না, তবু দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ, দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্ছে না, পালন করছে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড়ো ইচ্ছা। কিন্তু এতবড়ো ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এইজন্যেই। আমার চারি দিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করছে না। এর চেয়ে ঢের যৎসামান্য, এমন-কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনোমতে নিবে যেতে দিচ্ছে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই সার্থক করে রাখতে হবে। দশজনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে, কৃত্রিম অর্থকে, সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড়ো করে সত্য করে রেখেছে। সেই ইচ্ছাগুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টানছে, আমার চেষ্টাকে কাড়ছে। বুদ্ধিতে যদি বা বুঝি তারা তুচ্ছ এবং নিরর্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেলতে পারি নে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায়, কিন্তু সে যখন আমারই ইচ্ছা-আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জানতেও পারি নে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এতবড়ো একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে, এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথি করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই একদিনে শেষ হবে না, কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, এর মধ্যে কোনোমতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশজনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত খাঁটি হয়ে চলতে হবে।

টাকা, বিদ্যা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে, সেগুলোকে নিয়ে সকলে মিলে কাড়া-কাড়ি করে। অতএব আমি যদি তার কিছু পাই তবে অন্যের চেয়ে আমার জিত হয়। এইজন্যেই সমস্ত উপার্জনের মধ্যে ঈর্ষা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এইজন্যে লোক এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার অর্থ বেশি, যার বিদ্যা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এই-সকল জিনিসের দ্বারা মানুষের কছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, সুতরাং জিনিসে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে সেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয়। মানুষকে ঠকানোও একেবারে অসাধ্য নয়, এইজন্যে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে, এইজন্যে ভিতরে যদি-বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে-সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেইগুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের

অগোচরেও এসে পড়ে। ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করি নে। এমন-কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিসকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যাবসা চালাতে পারে, কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনফা কী হবে।

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্যস্বরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে জাল-জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জানবেন— মানুষকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোন্‌দিন জাল-দলিল বানিয়ে তাঁকে সুদ্ধ মানুষের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকব। ঐখানে দশকে আসতে দিয়ো না, নিজেকে খুব করে বাঁচাও। তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাঙ্ক্ষাটির দ্বারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা করো, এর দ্বারা মানুষকে ভোলাবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, কারণ, ঈশ্বরের আসনে সবাইকে বসাবার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশ্বরকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সামলানো শক্ত হয়, মানুষ তখন মানুষকে চঞ্চল করে, তখন খাঁটি ভগবানকে চালাতে পারি নে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বলতে পারব সেদিন পিতাই যেন সে-কথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মানুষ যদি শুনতে পায় তো যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

৩১ চৈত্র

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই— একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ঐ আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই দুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।

সেইজন্যে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সম্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, দিবসের শেষ মুহূর্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়ছে, আজ সায়াহ্নে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জানব— তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব, যস্য ছায়ামৃতম্‌ যস্য মৃত্যুঃ।

মৃত্যু সুন্দর, মধুর। মৃত্যুই জীবনকে সহজ করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণ-স্থিতিকে বিচলিত করে।

আসক্তির মতো নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে না, সে

কারও জন্যে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে।

ত্যাগ সুন্দর, কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য। মৃত্যুই পরিবেশন করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই। এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে। চারি দিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে। এই বিদায়ের সুরটি যখন কানে এসে পৌঁছয় তখন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়, তখন বৈরাগ্য নিঃশব্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানি নে। দুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরছে এবং সেও সরছে, সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোচ্ছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে, কিন্তু সে চলছে। ঐখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকত তা হলে সেই স্থিরত্বের উপর রুদ্রের অসীম শাসনদণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড তো তাকে এক জায়গায় চেপে রাখছে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলই মার্জনা করছে, কেবলই ক্ষমার অভিমুখে বহন করছে।

আজ বর্ষশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না? যার উপরে মরণের সীলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিস, তাকে কি আজও আমরা যেতে দেব না। বছর ভরে যে-সব পাপের আবর্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বৎসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্মল হয়ে নব বৎসরে প্রবেশ করতে পাব না?

আজ আমার মুষ্টি শিথিল হোক। কেবল কাড়ব এবং কেবল মারব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাই নি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সম্মুখে এসে, ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক। আজ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়তে সম্পূর্ণ মরতে এক মুহূর্তে পারব না; তবু ঐ দিকেই মন নত হোক, নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্জলি প্রসারিত করুক, সূর্যাস্তের সুরেই বাঁশি বাজতে থাক্‌, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক। নববর্ষের ভারগ্রহণের পূর্বে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সর্বভারমোচনের সমুদ্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি; নিস্তরঙ্গ নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই; বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে স্তব্ধ হই, শান্ত হই, পবিত্র হই।

৩১ চৈত্র

"

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কতরকম প্রতিকারের আশ্চর্য ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময়

সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য-স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই, তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করছে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব বলে আবদার করছে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জিততে চাচ্ছে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি, কত যুদ্ধ কত দলাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে। তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে আছেই, না থাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না—সে হচ্ছে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হোক, ভালো হোক এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে। এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল-ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো, বিদ্যায় বড়ো, খ্যাতিতে বড়ো হয়ে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো যিনি, অনন্ত, অখণ্ড, এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে। শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ঐ মঙ্গল-ইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেই-সকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে; সে যেখানে গিয়ে পৌঁচচ্ছে সেখানে গিয়ে থামতে পারছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করছে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই

আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা, কোনো বর্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়। সে-ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম, এইজন্যে সে তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কী শরীরে, কী সমাজে, কী আত্মায়, সর্বত্রই আমরা এই যে দুটি ইচ্ছার ধারাকে দেখতে পাচ্ছি—একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন; একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর-একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী; একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর-একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করো, এর তাৎপর্য গ্রহণ করো। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে, সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্যই সমস্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করো।

৩ বৈশাখ

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে-সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না—অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে, সেইজন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে-সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেট ভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে-সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক, মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে-সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেলতে পারি নে—যা বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে-আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করি নে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না-পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি যে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। যে-জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর তার মূল্য অতি অল্প, কেননা সেটা একটা সংকীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না, যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, যা কেবল ঘটনা-বিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয়, কোনো-এক সময়ের আলাপে আমোদে, কোনো-এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সঙ্গে যে সময়ে যে আলাপে যে কর্মে নিযুক্ত আছি, সে সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারি নে, সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত, এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয়, সে না পেতেও চায়। এইজন্যেই

সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ক্ষুদ্র ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্, যিনি বলেন 'আমি তাঁকে জানি নি' তিনিই জানেন, যিনি বলেন 'আমি জেনেছি' তিনি জানেন না।

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই, পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ, ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেন— নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয়, আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই সমস্ত জিনিসপত্র জানি; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাই নে। যদি চাইতুম তা হলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিসপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেক-দিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ঐ যে, ঐ আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর-একজন বললে, দূর, চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে। বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্ছে এই যে, যে-ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা এইরকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিই চাই—টিকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ঐ চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সব চেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলেই নদীতে, নৌকায়, ঘাটে, গ্রামে, পথে, নগরের হর্ম্যতলে, গাছের নীড়ে, চারি দিক থেকে গান জেগে ওঠে; কারও টিকেয় আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজনসিদ্ধি করব। কেবল

প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উল্টো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে-জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহংকারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য, আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি— আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেরে ওঠার মধ্যে, এই না-পাওয়ার মধ্যে, নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে-বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারি দিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবল বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, খাদ্য দিচ্ছে। এইজন্যেই মানুষ কেবলই বলে— অনেক দেখলুম, অনেক শুনলুম, অনেক বুঝলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন, না-শোনার ধন, না-বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না, যাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদছে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

৪ বৈশাখ

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই, তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঐ-সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনো ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ঐরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে-ছাড়তে বাড়তে-বাড়তে মরতে-মরতে বাঁচতে-বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া— সে তো লাভ নয়, সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে— বল কী! তুমি ব্রহ্ম হবে! এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাত নেই? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত খেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে, পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই-সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ঐ বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে, কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা-গহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না। যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে 'হাঁ, সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি', তাকে উত্তর দেব, 'ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে, কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে, সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।'

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি, আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি, এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকু-মাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁতখুঁত কোরো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা কোরো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উল্টো দিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তা হলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তা হলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ বৈশাখ

এই যে সকালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা-দ্বারা সকল মহৎ জিনিসকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ, এইজন্যে সে সমস্ত জিনিসকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখতে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই সেই অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ—আনন্দরূপমমৃতং—ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায়, যা ফুরিয়ে যায়, তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি, অমৃতকে দেখি, সেখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো, নূতন কিছু তৈরি করা নয়, কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকারমোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়—পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা মূঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্তস্বরূপেই আনন্দিত তা হলে তাঁর সেই অব্যক্তস্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া-নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি, এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে, সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নব-শক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায়; তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ঐ অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বন্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ; কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে। আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।

৭ বৈশাখ

যে-ভাষা জানি নে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলই আমার কানে ঠেকতে থাকে, সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তখন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে, তখন তাকে কাব্য বলে বুঝতে পারি, ভোগ করতে পারি।

বালক যখন কোনো দুর্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন কাব্যপাঠ বন্ধ করে তাকে যে মুক্তি দেওয়া যায় সে মুক্তির মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে তুলে তাকে যে মূঢ়তার পীড়া হতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, চিরন্তন মুক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি। জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়, তবে বিশ্বকবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বলব।

কিন্তু এই কাব্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করার চেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্যন্ত কোনো দেশের মানুষ সমুদ্র সেঁচে ফেলবার চেষ্টা করে নি, তারা সাধ্যমত নৌকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্বপ্রকাশের রূপের মধ্যে যখন আনন্দকে দেখব, কেবলই রূপকে দেখব না, তখন রূপ আমাকে আর বাধা দেবে না। সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয়, আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয়, ভাষা তখন নিজের সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে, ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মুগ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই-যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এটা নিজের ভিতর থেকেই

বুঝতে হয়। যে ভাষা জানি নে কেবলমাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনোকালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোখ কান সেখান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যখন একবার ভিতর বুঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের ঊর্ধ্ব দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দপ্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারি নে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি, সে বিশ্বেও সর্বত্র মূঢ়তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে, আনন্দ না থাকে, তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা, কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে, তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের, বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে, দূরে ও নিকটে, সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। একেই তো বলে মুক্তি।

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা—ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা, এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্যমাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে—পাপপরিশূন্য মঙ্গলসাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে থাকবে ততই বিশ্ব-সংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক থেকেই জগৎকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।

৭ বৈশাখ

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি। আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে-প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন : আবিরাবীর্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত

হও। তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি তো আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাকে সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে, এই পরমাত্মাকে, এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন, অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন, তাঁর আর পর্দা নেই. দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই-যে অহংকার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহং-এর আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে-প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও পলতের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব করে। আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পলতের দিকে ফিরে তাকায়? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পলতে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং-দীপ যখন এই দীপ্তিকে, এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহংকারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানং ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেইজন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব-কিছুকেই দেখতে পায়। সে তো কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এইজন্যই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি-বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত-ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এইজন্যে সেই দীক্ষা ভিতর থেকে তাঁর জীবনকে ধনী-গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনো প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।

তিনি আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি

জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু, ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে-জায়গায় বড়ো এসে দাঁড়ান সে-জায়গাকে ছোটো বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি, সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না। এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে। এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানং ভূতভব্যস্য তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে-কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশু-পক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে— সর্বভূতেষু চাত্মানং— আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না, মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে খর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতম্‌-রূপে বিরাজ করছেন তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ, না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সেজন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতম্‌-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব; সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয়, সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্ছে— অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে। এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড়ো আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করছে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্মল করে দিচ্ছে। সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সংকোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছে। তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্ছে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাদের ধৈর্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠছে এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্ছে এবং যে জ্যোতির্ময় পরমানন্দধারা বিশ্বের দুই কূলকে

উদ্‌বেল করে দিয়ে নিরন্তর ধারায় দিগ্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুনতে পাচ্ছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চলছে, সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্ছে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলই বিকীর্ণ করছে, কেবলই বলছে 'তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি মনের আনন্দ'—সে বলা আর শেষ হচ্ছে না। সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ সেই আনন্দসম্মিলন তো শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে, এখানকার গাছপালা শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্ছে। অনেক দিনের অনেক সুগভীর আনন্দমুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে সূর্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন, সেই দিনটি আর মরল না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মতো আটকা পড়ে গেল। শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রঙ, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল। যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা, সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে-ক্রমে দিনে-দিনে বর্ষে-বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এই-যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে, উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে চায় না, তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরো একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর-একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে। যেই এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ, যে ইনি ইহার পরমানন্দ, সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুলবে

না? না, তা কখনোই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণহৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে, সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারি দিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারি দিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানি নে। তোমার সূর্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করছে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই, কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি, শক্তি বলে জানি নে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকছে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করছে, যা বলছে 'আমি জল', ব'লে আমাদের স্নান করাচ্ছে, যা বলছে 'আমি স্থল', ব'লে আমাদের কোলে করে রেখেছে— যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি— তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি। তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সকল সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্মশক্তি আনন্দে প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে, ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে। কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে— সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে তো কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি তো অচেতনভাবে হবে না, সেটি তো মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও— জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব, ভিক্ষার দ্বারা নয়, এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয়। যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্মল করব, আমরা আজ যথার্থভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযত করে দেখব— যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব— এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয়

আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।

৭ পৌষ, প্রাতঃকাল, ১৩১৬

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর লই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে যদি এইরকম দূরে না যাই তবে কর্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি নে। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড়সার জালের মতো আমাদের চারি দিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এইজন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক-একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবলমাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার-কারখানার মুটে-মজুরের মতোই সর্বাঙ্গে কালিঝুল মেখে দিন কাটিয়ে দেব না। একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই শামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এসে পৌঁচেছি। এবার কি আবার নূতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেখছি না? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাসবশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল; তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না?

এ আনন্দ কিসের জন্যে? এ কি সফলতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি? এ কি আমাদের আত্মকীর্তির গর্বানুভবের আনন্দ?

তা নয়। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্মের চেয়ে বহু-গুণে বড়ো জিনিসটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহংকার দূর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে, তেমনি আর-এক দিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকে দেখি না।

এখানকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র। কেবল নিয়ম-রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড়ো করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড়ো ফল বলে গর্ব করা নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল-অনুষ্ঠানে মঙ্গলফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গলকর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গলকর্মের উপরে সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল-অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গলকর্ম সেই বিশ্বকর্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা।

অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না। নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এইজন্যই কর্ম, নইলে কর্মের মধ্যেই কর্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা, তা হলে কর্মের মধ্যে যা-কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কর্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে; কারণ, কর্মফলের চেয়ে আরও যে বড়ো ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে আমরা কৃতকার্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না, বস্তুত কৃতকার্য হব কি না তা জানি নে। কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভস্মমুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও যে, কর্মে বাধা আছে। আনন্দিত হও যে, কর্ম করতে গেলেই তোমাকে নানা দিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারংবার তার পরাভব ঘটবে। আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে। আনন্দিত হও তুমি যে বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিল বারংবার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই তো সাধনা। যে ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায় সে ব্যক্তির কাঠ পুড়েছে বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? যে কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও। তাই ছুটির পরে কর্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে, ভরা জোয়ারের মতো সমস্ত থম্‌থম্‌ করতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী। তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ংকর উদ্যম কী পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কী কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দর-রূপ দেখে উন্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব। কর্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে আচ্ছন্ন করে দেব। আমাদের কর্ম, মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্‌, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে।

এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারি দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ-আলো বর্ণগন্ধ ফুলফল—নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চার দিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তংশিবমদ্বৈতম্‌-এর আরাধনা—আর কিছুই নয়।,

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো

দুই ভাই বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষিপিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোঽসি, পিতা নোবোধি, নমস্তেঽস্তু—এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ প্রচলিত নেই, কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অনন্তের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—এত বড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণদ্বারাও আজ স্পষ্ট-রূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এক দিকে এই পুরাতন আকাশ পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবন-বিকাশের নিত্যনূতনতা, আর-এক দিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী—এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পেঁছিয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক, তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না, তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চার দিকে, এইজন্যে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয়; তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে, গোলমালের মধ্যে, কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে, দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে-সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইগুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াসম, সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময় যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য, যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা—যেটি সব চেয়ে সহজ তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন—যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন—পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার

সমস্ত তাৎপর্যটি আমরা না পাই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে 'এই যে এইখানেই', আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি— কই? কোথায়? এই যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই যে আত্মার আত্মায়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই— এই যিনি অত্যন্তই আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্যে এক-একজন লোকের এত দুঃখের দরকার।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ বা ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চির-দিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে বিশেষ মন্ত্র পড়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল, তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে— মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি নিষেধের অনুগত নয়— সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়— বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ। কিন্তু, তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জন্যে যিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারি দিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যারা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো, সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে, সেই

প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

৭ পৌষ, রাত্রি, ১৩১৬

আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহু-কালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধুলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুষে প্রভাত এসে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে জাদুকরের মতো জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়। দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্তা এই মুহূর্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্‌ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে? এ দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড়ো বড়ো সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে, এ সেই অতিপুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্ম-মুহূর্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল— সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মতো এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি, সদ্যোজাত শিশুর মতোই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনই নবীন হয়ে ওঠে, এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী। পুরাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মতো আসছে যাচ্ছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, একে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা। তারা মরীচিকার মতো, জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না, প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতিপুরাতন দিন, একে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বার বার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তার পরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তা হলে ধুলার পর ধুলা, আবর্জনার পর আবর্জনা, কেবলই জমে উঠত। চেষ্টার ক্ষোভে, অহংকারের তাপে, কর্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তা হলে কেবলই মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলই কাড়তে যাওয়া, কেবলই ধাক্কা খাওয়া, কেবলই অন্তহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন যাত্রা— এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনো দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমস্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি। কিন্তু এই দিন

যতই অগ্রসর হবে, কর্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠতে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে উদ্‌বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেসুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর। তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই; তার মধ্যে খণ্ডতা নেই সংশয় নেই। সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার, সম্পূর্ণতার সুর। নিত্যরাগিণীর মূর্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুনতে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হোক-না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিসটি হচ্ছে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই, একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে, কিন্তু রোজ সকালবেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই-সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্ছেন শিবম্‌। প্রভাতে তাঁর একটি নির্মল মূর্তিকে দেখতে পাই— চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে, বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলটপালট হয়ে যাক-না তবু দেখি যে, সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্‌, অন্তে শিবম্‌ এবং অন্তরে শিবম্‌।

সমুদ্রের ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড, এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে, যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব— এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্‌। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। গণনাহীন অনেককে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন সেই অদ্বৈতম, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্‌, অন্তে অদ্বৈতম্‌, অন্তরে অদ্বৈতম্‌।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে— শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে, তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে— শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌। এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে, তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে, এ কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবল সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্রব কোনোমতেই ঘুচছে না। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম; গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ— বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে,

আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেইজন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে, স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না; আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মূলে ফিরে আসবে; সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বার বার অনুভব করে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে, তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত-কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের কুলের ধনের ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে, তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্‌, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না, তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে এতবড়ো শক্তি কোন্‌ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্বলতা। এইজন্যেই অহংকারকে বলে বিনাশের মূল, এইজন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই-সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না, গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক-না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন— শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয়-ভয় করতে থাকে, কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এইজন্যে যে, সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারংবার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে— অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যতদূরই যাক-না সে যাবে কোথায়? তার মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতোই উধাও হয়ে চলে যেতে চায় কোনো মতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায়, তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে কিন্তু সেই ফেরা

প্রলয়ের দ্বারা, পতনের দ্বারা ঘটবে— তাকে বিদীর্ণ হয়ে, দগ্ধ হয়ে, নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে, কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা সমস্তের মূলে যিনি আছেন তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক— তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভালো করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য— খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁত করে, সমস্ত তারগুলিকে সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না— সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল, তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিনতে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযমসাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমের কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যত দূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না। আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে— আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছনো, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্তন— কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্মের ভিতর দিয়ে, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে, গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবনযাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে, প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্মের বেগে সে যত দূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক-না, এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে, সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে— তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম— হে চিত্ত, তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ

ছিল, ধুলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা-কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ এটা পুরানো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা-আপনি ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুমকিও খসে নি; আজও প্রতি রাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে, 'বলো দেখি আমি তোমার জন্যে কী এনেছি!' তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকে আপনি ধ্বংস করছে—সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চার দিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখো—শৈশবের সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, জল স্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো—কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কী নিবিড়, কী নিগূঢ়, কী আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সংগীতে বেজে উঠছে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে—তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেইজন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন। এই সৌন্দর্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই, চিরযৌবন তুমি চিরসুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা, সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো, সত্য হোক তোমার জীবন তোমার জগৎ, জ্যোতির্ময় হোক, অমৃতময় হোক।

প্রাতঃকাল
১১ মাঘ ১৩১৬

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়, অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়, তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ

মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায়, তা হলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা, যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারি দিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এইজন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোটো হোক বড়ো হোক, উচ্চ হোক নীচ হোক, শত্রু হোক মিত্র হোক, সকলেই আমার আপন।

মানুষের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেইজন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন, সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল, যা-কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি; তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই—আরও বড়ো, আরও বড়ো—আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োত্বের মধ্যেই বন্দী।

সে ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেইজন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভু, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয়, তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটেই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়— যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানে তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তা হলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে, প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়— যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।

এই-যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই— আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে— ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধঃ, লোভ কোরো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বলছে— ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই-সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠুর। এর কারণ এই— প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম বলে জানে; বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য, আর সমস্তই মায়া। এই-সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে

যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে, তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে, স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো করে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই খর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ-দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ এক দিকে যতই বড়ো হয় অন্য দিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এইজন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে— ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। বলে— মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চেষ্টা। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্য-দেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতাবোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সেজন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে— বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে সাত্ত্বিকতার, অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসা মাত্র নয়, নানা উপলক্ষে পশুপক্ষী, এমন-কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা— অন্ন জল নদী পর্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা— ধর্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তার চৈতন্যও তত বড়ো হওয়া চাই, এইজন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই এমনতরো সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানা দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়োরকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের— ধর্মের সঙ্গে ধর্মের— সমাজের সঙ্গে সমাজের— স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়, ছোটোবড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদার-ভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তাকে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি

মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন— যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন, কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই; যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদে পদেই খণ্ডিত হতে থাকে. তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না। সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয়—আমরা খাওয়া-শোওয়া ওঠা-বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করে-ছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে। যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে, তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করছে। দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানবঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল, শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল. ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। যে মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ইঁহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইঁহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য। প্রত্যেকের মধ্যে, সকলেরই মধ্যে, তাঁকে চিন্তা করে, তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে-পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই; যে-পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশেই সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত. সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে-সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করছে, কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্য-বোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনও তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তাদের শক্তি এখনও কোথাও তেমন করে অভিহত হয় নি। তারা চলেছে, তারা বদ্ধ হয় নি। কিন্তু সেইজন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কী? তারা মনে করছে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম, এর পরে বুঝি আর কিছু নেই, যদি থাকে মানুষের তাতে

প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনের উন্নতি বলতে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষের সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেইজন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী, এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মংগলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বার বার কেবলই আঘাত পেতে থাকব, কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। কিন্তু তার একটিমাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি 'সর্বগতঃ শিবঃ', যিনি 'সর্বভূতগুহাশয়ঃ', যিনি 'সর্বানুভূঃ'। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না, তা হলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভালো। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে, কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ, যিনি এক; অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই; বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে। সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূরনিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

২

বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন, এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি, এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে—আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতো দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে, সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায়, তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে— কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে যে-সব জিনিস সংসারের জোয়ারে ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা-কিছু হারায়, যা-কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায়, তার ক্ষতিকে সে এমনি একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে, কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলই তার মনে হয়, সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলই তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই-সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্তি দেখতে পায় না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্‌বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে, তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সে মনে মনে জানে, ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি— বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড়ো জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে-মাটির উপরে আমাদের ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু শুধু এই নিষ্ঠার দৃঢ়তাই যথেষ্ট নয়। এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে— এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত, তাহলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে— সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ— তার চলাফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল। সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে— এইজন্যেই কেবলই সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে-আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে— তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে; সে অন্যকে আঘাত করে; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে : নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না বলে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্য দিকে আছে, তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে বলে কল্পনা করে।

নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারি ভিতের মধ্যে জোর করে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়— সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে-যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গিময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্যচলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনা-বোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিসটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায়, এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে-নম্রতা— যে-নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের সুরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারিদিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে-নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে; যে-নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা— শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে, রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে— আনন্দের ধর্মই হচ্ছে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না— অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়— এমন-কি, যে-রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্যে যে-লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত। যেখানে তিনি সুন্দর; যেখানে রসো বৈ সঃ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দ-ভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়ো কথা। তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, এ-সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোটো; তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে-ভঙ্গিতে হাসিতে গানে রসে-গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা— তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়—একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্যে, এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাঁকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে-যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য মিলবে বলেই, ধরা দেবে বলেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই-সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

বর্তমান হিন্দুসমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল, বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলই দূর করছে, কেবলই ভাগ করছে, নিজেকে কেবলই সংকীর্ণ বদ্ধ করে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করছে। হিন্দুর ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলই বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারি নে। কারণ, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার উপরের জিনিস। ক্রীতদাস রাজাকে খুন করে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয়, স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল করে বসে, তা-হলে সেইরকমের অন্যায় ঘটে। এইজন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে রাখতে থাকলেও, ধর্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে—বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে সেইখানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্রপথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে-ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে, মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ, তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি—তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে।

আশ্চর্য•ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারই হাতে দিতে চেষ্টা করছি, যে-জিনিসটা ধর্মের চেয়ে নীচেকার। আমরা স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বলছি, তা না-হলে আমরা বড়ো হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা

আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম আমাদের পৃথক থাকতে বলছে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করছে!

কিন্তু ধর্মবুদ্ধি যে-মিলনের ঘটক নয়, সে-মিলনের উপর আমি ভরসা রাখতে পারি নে। ধর্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলই গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোলবার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোটো বড়ো সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব; নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা স্বাজাত্য-অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি, তবে ধর্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদপার্থক্য, এত বিরোধবিচ্ছেদ গলতে পারবে না— মিলতে পারবে না।

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃস্ট যে প্রেম-ভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন, তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি— তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেমে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল, তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের আচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনই সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-সাধন, তখন সাধককে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন-কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।

এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে-দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেননা দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়— সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে-প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখস্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম মলিন করে না, তাকে আরও দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে-সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে, কর্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয়—সে তাঁর অলংকার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এইজন্যে মানবসমাজে কর্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না—তাঁরা অনায়াসেই কর্মকে শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে-যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে-যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়—দুঃখে নম্রতা ও কর্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন কর্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয়, তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্বর করে সে চলতে থাকে; তখন নুড়িপাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সংগীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে-গতি সে তার নিজেরই গতি—সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে-কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলই নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনি মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনি তার ওঠাবসা খাওয়াপরা সকল দিকেই বাঁধাবাধি। তখনি সে সেই-সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলই একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্‌ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্‌ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান, তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান, তাঁরা অহংকে প্রেমের

দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্ছে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্যে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তাহলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না: গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে ব'লেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ ক'রে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্ছে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে-বের-করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল? যা-কিছু পাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্ছি নে—যা পাচ্ছি নে, তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে, এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল?

পশুদের মনে তো এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারি মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে—মুহূর্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারছে না ব'লে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না—এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে, 'দেখতে পাচ্ছি নে কিন্তু আরও আছে, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আরও আছে।'

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে রকম নয়—এ আচ্ছন্ন ব'লে গুপ্ত নয়, এ গভীর ব'লেই গুপ্ত, সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে—তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এইজন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকুমাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি—এইজন্যে কোন্ সুদূর অতীতকালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরুপ্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথ-রাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্করহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ-নিদ্রাহীন-নেত্রে যাপন করেছে—তাদের যে-মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারও সেদিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ-যে কেবল সত্যকেই উদ্ঘাটন করেছে, তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের

সাহায্যেও সে প্রতিদিন এককে আর ব'লে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই. কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই, সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে-যে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জালফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলছে, তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে— কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার— আফ্রিকার বন্যবর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয় পাই, তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য— এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না। এখানে সমুদ্রপর্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না, বারংবার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না— এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে।

২৩ চৈত্র ১৩১৬

মানুষ দ্বিজ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয় তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই ক'রে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি— এমন-কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেমে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনি মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে— ভূমার দিকে অগ্রসর হয়— তখনি মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম, যা প্রত্যক্ষ, তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে— সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক: সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা-কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না— তাকে মাপ করে ওজন করে দেখাবার কোনো উপায়ই নেই— তাকে যদি কোনো স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, 'কী তুমি পেলে একবার দেখি'— তাহলে বিষম সংকটে পড়তে হয়। এমন-কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি, ভারী জিনিস হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে, 'আমি সমুদ্র দেখব, আমি হিমালয় পর্বত দেখব', তবে তাকে

এ কথা বলতে হয় না যে, 'আগে তোমার চোখদুটোকে মস্ত-বড়ো করে তোলো তবে তোমাকে পর্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব'— কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বলতেই হয়, 'একটু রোসো; গোড়া থেকে শুরু করতে হবে; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করো তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেললেই চলবে না, কান খুললেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' মূঢ় যদি বলে, 'না, আমি সাধনা করতে রাজী নই, আমাকে তুমি এ-সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মতো সহজ করে দাও', তবে তাকে হয় মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয় তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক সময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজ করে দিচ্ছি'— বলে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন-খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা-হলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরও গোপন করে দিলেন। এ-রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর বলেই তাঁকে চায়— সেই গভীর আনন্দ আর-কিছুতে মেটাতে পারে না বলেই তাঁকে চায়— চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে, তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত-কিছু চায় না বলেই একাগ্র-মনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো— এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার গুহাশয় রূপেই তাঁকে পাবে; অন্য রূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে, তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না— তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে কি ইতিহাসে, কি শিল্পে কি ধর্মে কি কর্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য— ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই কথাটি-যে মানুষ বলতে পেরেছে, এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এইজন্যেই সে গভীরকে চায়— তবু যদি তুমি বল, 'আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝছি, তার মতো কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা-কিছু পাওয়ার মতো পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ করে তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মতো সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এইজন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে— বারংবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারছে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে; ভালোবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই

অকৃতকার্য হোক, একে সে কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে, 'যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য, তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্য সাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায় অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন—কেননা, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।'

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা করে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ কথা বলে না, 'টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।'—টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মতো সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্টা কথা বলতে যাব। কেন বলব, 'তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই।' কেন বলব, 'আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ করে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।'

না, কখনো তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে-নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারই চিরন্তন বন্ধু; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ঐ পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করেছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চলব—আমার সমস্ত যাত্রাসংগীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে—পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে, কোনো ছোটোকে, কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে—আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সংকল্প ত্যাগ করে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ—এতে আমার অনেকদিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগে নি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করে নি।

বস্তুত, নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল, সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্যে থেকে আমাদের সদ্য

আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন, উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড়ো করে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে, সংসারে তার আবির্ভাব যে পরমরহস্যময় এবং সে-যে চিরদিন এখানে থাকবে না, সে কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে— মনে হয়, তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে আছে তো আছেই— তার মধ্যে অন্তরের প্রকাশ আর আমরা দেখতে পাই নে। তখন যদি আমরা উৎসব করি, সে বাঁধা প্রথার উৎসব— সে একরকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে, ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি, তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না; তখন সে যেন আমাদের কাছে একরকম ফুরিয়ে আসে। সেরকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চলতে পারে কিন্তু উৎসব চলতে পারে না; কারণ, উৎসব জিনিসটাই হচ্ছে নবীনতার উপলব্ধি— তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্ছে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেখানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে-না-হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে 'আজ তোমার জন্মদিন'। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ, সেইরকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র, সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত— নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম, তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠত। বস্তুত, জীবন তখন আমার সামনেই— পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল, তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মতো অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকত।

পথ তখন নির্দিষ্ট হয় নি। নানা দিকে তার শাখাপ্রশাখা। কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কী পাব, তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতিপরিবর্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দিষ্ট হয়, তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারও জীবনের ধারা যখন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সংকুচিত হয়ে চলতে থাকল। তখন নিজের জীবনকে বারংবার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এইজন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর-কোনো নূতন আশার সুরে বাজতে থাকল

না। সেইজন্যে জন্মদিনের সংগীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল, তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর-কারও কাছে এর আর-কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে, তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম তো আমার অর্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে-যে কবেকার পুরানো কথা তার আর ঠিক নেই—মৃত্যুদিনের মূর্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে—এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার।

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল, এবং সেই কথাটাই তোমাদের সামনে আমি বলতে ইচ্ছা করি।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে। জগতে আমরা অনেক জিনিসকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক; তারা আমাদের চারি দিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাই নি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত-কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্তেই আপনার লোককে পায়, পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনা-গোনার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মতো আপন করে পাওয়া যায়, তখনো এই সাজসজ্জা, এই গীতবাদ্য। 'তুমি আমার আপন' এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না—একে সৌন্দর্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল 'তোমাকে আমরা পেয়েছি'—সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, 'তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি-যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।'

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে-উৎসব করছ, তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা-হলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয়, তা বলতে পারি নে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বার বার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন্ রহস্যধাম হতে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মতো আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর-একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে। সেইজন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাত লোক ছিল।

সেইজন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি, এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

২৫ বৈশাখ ১৩১৭

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়—এখানে সে অনেকের অন্তর্বর্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্ছি কেন্দ্র, অন্য-সমস্ত তার পরিধি, মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্বর্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ সমগ্রের ভালোমন্দেই তার ভালোমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে, তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারি নে; মায়ের কোলেই, ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেইরকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন, তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারি নে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠি নে। তখন আমরা চলতে চাই, কারণ চারি দিকে চলার ক্ষেত্র অবাধবিস্তৃত—কিন্তু চলতে পারি নে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মতো চলতে গিয়ে বার বার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে-ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে তখনো যেমন জানা যায়, সে এই চলা-ফেরা-জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না, তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্রপরিবর্তন হয়েছে, সে কথা একরকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি, জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতরো বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে, তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক দুঃখস্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ এ লোকের জীবনই হচ্ছে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে, তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে; তার অন্তরাত্মা যে-ডালকে আশ্রয় করে, তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে-শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে সে অহংকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহংকার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় ক'রে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি ক'রে প্রথম অবস্থায় বিরোধ-অসামঞ্জস্যের বিষম ধন্দের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি, এখানে আমার পূর্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এইজন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো-একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু এ কথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মতো আশ্রয় করেছি মাত্র, বয়স্কের মতো একে আমি অধিকার করতে পারি নি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসংগতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি, সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ—একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি, সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ—এবং সেইজন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ, এ কথা যদি সত্য হয়, তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এইসঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে; যে-লোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এ লোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরনাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে, একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী জন্মলাভ করে—তোমাদের ছোটো ছোটো জীবনের ধারাগুলি তেমনি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে—তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার ক'রে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে—সেই জানার সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ—এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ, এই হচ্ছে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্তসম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোনো সংকীর্ণ ব্যবধান নেই; এখানে তিনিই পিতা হয়ে, প্রভু হয়ে আছেন—য একঃ, যিনি এক—অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই,—বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি—স দেবঃ, সেই দেবতা। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থ-বুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে-যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

বৈশাখ ১৩১৭

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর-যত-কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে, তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরও গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বার বার তাকে ধ্বনিত করে তুলছে—শিশু তার নূতন-শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেই-রকম—তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।—ঐ-রকম খুব বড়ো করেই বলতে চায়, ঐ-রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়, কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে, তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয়, তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত-সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিসগুলির বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিত্যব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশ-ভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক-রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক মূর্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখো গাছের ফুল। তাকে দেখতে যতই শৌখিন হোক, সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হোক, তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এইজন্যেই তার রঙ, এইজন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতালাভের উপক্রম করে, অমনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়; তার শৌখিনতার সময়মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্‌ করে ছুটে চলেছে, যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় 'নামঞ্জুর', তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ঐ ফুলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়, বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'তুমি ভুল বুঝছ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা; তার সঙ্গে সৌন্দর্যের যে-অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ, সে তোমার নিজের পাতানো।'

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, কিছুমাত্র ভুল বুঝি নি। ঐ ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে— একদিকে আসে বন্দীর মতো, আর-একদিকে আসে মুক্তস্বরূপে— এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয়, এ কথা কেমন করে মানব। ঐ ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্য কারণসূত্রে ফুটে উঠেছে, এ কথাটাও সত্য কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য, আর অন্তরের সত্য হচ্ছে: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

ফুল মধুকরকে বলে, 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি'— আবার মানুষের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে কিছুমাত্র ঠকে নি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস ক'রে তাকে ধরা দেয় তখন দেখতে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলে নি।

ফুল-যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করছে তা নয়— মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজায় যে-ফুলকে যথাঋতুতে যথাসময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে-দূত কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল; এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে, তখনি তিনি বুঝলেন, রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলই বলছে, 'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপিচুপি আমাদের কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে একমুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।'

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা জানব কী করে।' সে বলে, 'এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা।'

তাই তো বটে। এ-যে তাঁরই আংটি, মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দ-ময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়—এর বাইরে আমার মুক্তি আছে—সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা-প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক-না আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানাঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির—একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি—একই সময়ে একদিকে তার কর্ম আর-একদিকে তার ছুটি; বাহিরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকারসভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই করুণ গান জেগে উঠছে—

> তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
> অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
> বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
> হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই-যে বিরহিনী—তুই বেঁচে আছিস কী করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে।'

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি, এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেননা বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বালার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে। ঐ-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর-একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে— তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বানসংগীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না, সে-সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি বলে যায়— এবং মানুষ কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গীহীন বিরহ-সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার— তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়; এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে এই নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য— যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে, তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে,' তাহলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অংকুর পর্যন্ত বাঁচত না; কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে **হরি বিনে** দিনরাতিয়া— সেইজন্যে 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে— তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে— বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে— সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীর-ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর-একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারই সামঞ্জস্যসংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যত-কিছু অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্যশিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিসের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার

বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে—ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার আর সীমা নেই; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই অথবা যেখানে তার মিলনসাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর-একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান-পতনের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ। যে-ধর্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, সেই ধর্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা; এ কথা তার বলবার জো নেই যে, 'এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চলব।' এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়, সেই দুর্গতি যে কী নিদারুণ, পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই—তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীর-ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চলবে, এতে তাদের কোনো ধিক্‌কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসংকোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সংকোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ-আড়ালের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়—তার আহার-বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত—নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন-কি, নিজের নিত্যসহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ, মানুষ-যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার আর-একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর-একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে, তা হলেই বুঝতে পারি, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই-সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি, বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না—উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয়, তবে সেই-সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে-সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন-কি, জীবনের আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়—যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে—তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই—তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে—মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্ছে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ, স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাকলেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই, তখনি আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনি আমরা আপনাকে পাই

বলেই অন্য-সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানে না বলেই তার মাকে জানে না—যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে, তখনি সে মাকে জানে।

সেইজন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে, ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলই টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই—মা মা হিংসীঃ—আমাকে আঘাত কোরো না, আমাকে আর আঘাত কোরো না। আমি এমন করে কেবলই দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচি নে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত—এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না—পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না, মানুষ পশুদের মতো অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না—বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও। এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজন-সাধনের প্রার্থনা নয়—মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে, 'আমাকে পাপ হতে মুক্ত করো। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না—পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারছি নে—হে অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা, এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারছে না—তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারছি নে।'

যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব—যা ভালো তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব—ভালো যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্‌-ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা, দুঃখের প্রার্থনা—নাড়ীছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর-কেউ করতে পারে না।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু—যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তা হলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়—আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায়; সেখানে কোনো অহংকার টিঁকতেই পারে না—ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়; মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহংকারের একান্ত বিসর্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার?

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি সুখের আকর তাঁকেও

নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার, যিনি চরমমঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করছে, তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা গেছে, পিতরৌ বলতে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন—তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এইজন্যে তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো, তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সংকীর্ণ পরিধির কেন্দ্র-স্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এইজন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি একমাত্র হত, নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত, তা হলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়—তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোটো হয়ে না থেকে বড়ো হয়ে ওঠবার যে-দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড়ো হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে-যে সত্য হবে, তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে—এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্তব্য হয়ে ওঠে।

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করছে, নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার—একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখতে হবে। তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ—সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার—মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করছেন, পালন করছেন, তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করছেন, তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে—তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ নেই, বিরোধ নেই—তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর—তখন পিতা এবং মাতা একই—তখন একমাত্র পিতা; এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঊর্ধ্বগামী একাগ্র এই নমস্কার, অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মতো দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'

তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত—এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে। তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে, সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে, তখন তাকে মনে মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা কলেজের ছাত্র এ কথা নিশ্চয় জানে যে, ঐ ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব যে, সেই শিশুশিক্ষাধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না—অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নার কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের জীবন বলে যে-শিক্ষালয়টি আছে তার আশ্চর্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোটো ছেলেকেও এখানকার এম.এ. ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না; এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারাবাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ, সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায়, তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয়, তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন তো শিশু ছিলুম, সেদিনের কথা তো ভুলি নি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা যেমন অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে-অংশ অধিকার করেছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধুলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে-যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত, তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি নিজের বাল্যগণ্ডির মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়োবয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম, তবে তাকে বৃহত্তর বাল্যজীবন বলেই মনে হত—অর্থাৎ রূপকথা খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড়ো করে তোলা ছাড়া আর-কোনো বড়োকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির তাসে ক খ শেখার মতো। ক-এ কাক, খ-এ খঞ্জন, গ-এ গাধা, ঘ-এ ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মতো অসম্পূর্ণ শেখা আর-কিছু হতেই পারে না। অক্ষরগুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে, তখই ক খ শেখার সার্থকতা হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে শিশুর পক্ষে আনন্দকর হয়ে উঠে—সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তাঁর জগতের পুঁথিতে যে-সমস্ত রঙচঙ-করা কথ-এর ছবির পাতা খুলে রাখেন, তাই বার বার উল্টে-পাল্টে তার আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না—সে ছবি দেখেই খুশি হয়ে থাকে; মনে করে, এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তার পরে আঠারো বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম, সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে-ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম, সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্‌ করছে এবং ভিতর থেকে যে একটি নহবতের আওয়াজ আসছে, তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্ছে। এতদিন ছিলুম বাইরে, কিন্তু সাহিত্যের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর-কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্যযৌবনে যখন পেঁছনো গেল তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহিরবাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে সেখানে নয়—ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্যসাধনের জয়পতাকা হাতে, অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করছে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে,—সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গম শিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সুমহৎ ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী তুলে রয়েছে। এই বা কী বিরাট ক্ষেত্র! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু এইখানে এসেই যে সমস্ত ফুরোয়, তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায় তখন দেখি, আরও আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্ধক্য সমস্তই অপূর্বভাবে সম্মিলিত। জীবন যখন ঝরনার মতো ঝরছিল তখন সে ঝরনারূপেই সুন্দর, যখন নদী হয়ে বেরোল তখন সে নদীরূপেই সার্থক, যখন তার সঙ্গে চার দিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিল তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব—তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে সংগত হল তখন সেই সাগরসংগমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করছি। আমি দেখছি, তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সামনেও সেই অভাবনীয়কেই দেখছি। নূতন আর কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের সীমায় এসে ঠেকেছি, এ কথা কোনোমতেই বলতে পারছি নে। আমি তো দেখছি, আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ, যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম এখন দেখছি, তার শেষ হয় নি—তাকেই আবার আর-এক আলোকে আর-এক অর্থে আর-এক সুরে লাভ করতে হবে, মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি অথচ চলেওছি। শিশু-কালের যে-পৃথিবী, যে-চন্দ্রসূর্যতারা, এখনো তাই—স্থানপরিবর্তন করতে হয় নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনোদিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয়, তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুলতে হয়। কিন্তু এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে—সেই পুঁথিকে

শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা পড়ছে কাব্যের মতো এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বসতে হয় নি— কাউকে এমন কথা বলতে হয় নি যে, 'এ জগতে আমার চলবে না, আমি একে ছাড়িয়ে গেছি— আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।'

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্ছেন তিনি অনন্ত নূতন— তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন— মনে হচ্ছে না যে, কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এইজন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছি— মনে হচ্ছে, এই যথেষ্ট,— মনে হচ্ছে, আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটছে তখন সে এমনি করে ফুটছে যেন সেই চরম; তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার কারণ হচ্ছে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ, অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধুলোবালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশুভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন, তাহলে তুচ্ছ ধুলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মতো হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন, এইজন্যে শিশুর জীবনে সেই পরিপূর্ণ-স্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয়; কেউ তাকে ছোটো বলে, মূঢ় বলে, অক্ষম বলে অবজ্ঞা করতে পারে না— অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত করে তুলেছেন যে, জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেইজন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবাবন্ধুর তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা করতে পারি নে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছেন, তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চরমের আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে যুবারা এই-সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে। ত্যাগের মধ্যে রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পরিপূর্ণতা, সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায় নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করছেন, যিনি কিছুই চান না; তিনিই বৃদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বারস্বরূপ যে ত্যাগ, অমৃতের দ্বারস্বরূপ যে মৃত্যু, তারই অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন, তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে 'না' হয়েই থাকতেন। কিন্তু পদে পদে তিনিই আমাদের হাঁ। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য; বার্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই বার্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এইজন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এইজন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাই নে। তিনি যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের উপর আমাদের এই-যে ভালোবাসা, এ তাঁরই উপর ভালোবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি, এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, 'হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।' ভুলে যাই, যিনি প্রিয় করেছেন মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে, এটা অপূর্ণ ওটা অপূর্ণ, অতএব এ সমস্তকে আমরা

পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এরই মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখব। ক্ষেত্রকে বড়ো করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড়ো হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে-অবস্থায় আছি, সকলের মধ্যেই যদি তাঁকে দেখবার অবকাশ না থাকত, তা হলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরেই অগ্রসর হই-না, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারও তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই, এ কথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান? নেতি নেতি করে জানান না, ইতি ইতি করেই জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই এ কথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি—সর্বত্রই সেই 'এষঃ'।

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চলছে, এই লেখার অন্য-সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়িগুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে—একে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্ছে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাই কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা কোনো ভালো কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না—যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে—এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো-একটা বিশেষ উপলক্ষে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে-ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে—তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা, অন্য দিক থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এই-রকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, মানুষ থামতে লজ্জা করে। সেইজন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুনতে পাই যে, জিন্‌লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এইজন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এইজন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেননা সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি নে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়—সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা, সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে, পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন তো আলস্যের বন নয়, সে-যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা, দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শই খুব বড়ো জিনিস। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল, সে খুব সুন্দর কিন্তু ফসল ফলে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয়, তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধান-খেতের সমস্ত রৌদ্রবৃষ্টির ইতিহাস নিবিড়ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে বলে কি তার কোনো অগৌরব আছে।

মানুষের জীবনকেও কেবল তার খেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে-জিনিসটা আদায় করি, তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিসটাই দাবি করি, তা হলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবি করতে পারি, সেটা করার আদর্শ নয়—সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চলছে, কেবলই ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাই নে—যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। খেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে—এইজন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে সমাজে যেরকম দাবি সেই দাবি অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবি করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর-সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ করে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র, সেখানে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বললেই হয়, সেখানে কেবলই অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে-জায়গায় থামে সে-জায়গায় কিছুই পায় না, কেবল লজ্জা পায়; সেখানে কাজ একটা মদের মতো, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারছে, বলছে 'জাগো'। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আসছে, বলছে 'জাগো'। যেখানে সেই বড়োর আহ্বানে আমাদের ছোটোটি তখনি সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়ছে, প্রত্যেক তারটিকেই বলছে 'জাগো'। যে তারটি জাগছে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সংগীত। যে-তার শিথিল, যে-তার জাগছে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সংগীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

এইরকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে, তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে। অন্তরের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানাদিকের জাগরণ—গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন—এই মনুষ্যত্বের মুক্ত দ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে—সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না, ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে-না-যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল, স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই-যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ। গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। আমাদের চোখকান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ ক'রে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছে? তারপর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে—বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে—যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে—যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে. সেইখানেই তার চারি দিকে শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্র-নির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহা-উদ্‌বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে—বলছে, 'ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড়ো করে জানো।' বলছে, 'নিজের কৃত্রিম আচারের, কাল্পনিক বিশ্বাসের, অন্ধ সংস্কারের তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও।'

এই-যে জাগরণ, যে-জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি—যে-জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সংকোচ বিদীর্ণ ক'রে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি, সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরবরাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন—আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোটো আর-একদিকে অত্যন্ত বড়ো। যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে। আর যেদিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, সেদিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শত-সহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে, আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, 'তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর-কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে। এই বড়োর দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ এমন ছোটোর দিকে কখনোই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহংকারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের-চেয়ে-বড়ো-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়ো দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর-কেউ তা নয়।

তা-হলে দেখা যাচ্ছে এই-যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি. এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ম খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চির-বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই-যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্ছেন উনি। পৃথক না হলে মিলনও হয় না; তাই দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎ জুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে কেবলই পরস্পর বোঝাপড়া করছে। আমার আমির

মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা; তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলছে, আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছে। এমনি করে আমি এবং আমি-না'র মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ারভাঁটা চলেছে। এমনি করে আমি আমাকে জানছি বলেই তাব প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে ব'লে আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ, সেইদিকে তার পাপ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার ত্যাগ, সেদিকে তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকেই তার কঠোর অহংকার, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর-একদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্বসমাধানের প্রার্থনা— অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন—

যব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ, এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্ছে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না, একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই আমাকে নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাতলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু, এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে; তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে— মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অংকুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকারগ্রহণের উপলক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেও কেবলই সে তৈরি করে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ— বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে, নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে; ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উপনিষৎ বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না—জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, 'আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে।' তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙা-গড়ার মধ্যে লীলা করছে—তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ, সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর-বাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্যদৃষ্টিতে দেখো। যদি তা দেখ তা হলে কর্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে। তা হলে আমরা দেখতে পাব কর্মের দুঃখকে মানুষ বহন করছে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য কর্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহু ভার লাঘব করছে। কর্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে—তার এক দিকে দায় আছে, আর-এক দিকে সুখও আছে; কর্ম এক দিকে অভাবের তাড়নায়, আর-এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করছে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে—নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে মারছে। কিন্তু, আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠল না। পশুপক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চুপ করে থাকতে পারলে না; কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই

সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। মানুষের মতো কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে। এখানে কত কাল থেকে সে কত ভাঙছে গড়ছে, কত নিয়ম বাঁধছে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্ছে, কত পাথর কাটছে কত পাথর গাঁথছে, কত ভাবছে কত খুঁজছে কত কাঁদছে। এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড়ো বড়ো লড়াই লড়া হয়ে গেছে। এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করছে। এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়। এইখানেই সে দুঃখকে এড়াতে চায় নি, নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে। এইখানেই মানুষ সেই মহৎতত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারি দিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়ো— এই জন্যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনও সে যা হয়ে ওঠে নি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বার বার দুঃখ পেতে হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই কথা মনে রেখে, মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে নি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে। অনেক সময় এত দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে যে কর্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, কর্মের-স্রোতে-বাহিত আবর্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক-একটা কেন্দ্রের চার দিকে ভয়ংকর আবর্ত রচনা করছে— স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত। কিন্তু, তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই; সংকীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে। কারণ, চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম করতে হবে, কর্ম করে বেঁচে থাকতে হবে, এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম করা এবং বাঁচা এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই, তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য— অন্তর এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয়, তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখো-না কেন, শরীরকে তো নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়; এক নিমেষেও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই; তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না— তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্তচলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানা প্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্বদাই তার চাই— কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে, দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখছি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভালো করে বিশ্বাসই করে না। এত দূর পর্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে, তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে— জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে

উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি, আর-এক দিকে সমাপ্তি; এক দিকে পরিণতি, আর-এক দিকে পরিপূর্ণতা; এক দিকে ভাব, আর-এক দিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে গান এবং গান-গাওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা যে, গান কোনো জায়গাতেই নেই—কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখছি, কোনো সময়েই তো সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখছি নে—কিন্তু, তাই বলে কি এটা জানি নে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র করে-যাওয়া চলে-যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ। জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না। সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে, আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব, তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না, এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থাণু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়; আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কত দূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি নি। আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর-বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্মকর্ম ইতিহাস-পুরাণ সমাজ-সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর-কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁতভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখি নে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর-বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের এক দিকে নিয়ম, এক দিকে আনন্দ। তার এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে : ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি। আর-এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। এক দিকে বন্ধনকে না মানলে অন্য দিকে মুক্তিকে পাবার জো নেই। ব্রহ্ম এক দিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর-এক দিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনই মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতরো? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক-সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বয়ংতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়, তখন সেই তারে গান বাজে এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। এক দিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্য দিকে সে সংগীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয় নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু, তাই বলে এই তার খুলে

ফেলাকেই মুক্তি বলে না। সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বন্ধ থেকেও এবং বন্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু, তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে, ব্যর্থতার মধ্যে, নিষ্ক্রিয়তালাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

কর্মের মধ্যে মানুষের এই-যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই-যে নিরন্তর আত্ম-নিবেদন, ঘরের কোণে বসে একে কে অবজ্ঞা করতে চায়! সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানবমাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো-একটা ভাবরস-সম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! এখনই শুনতে কি পাচ্ছ না, ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে; বনজঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মতো তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করছে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করছে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেলছে। তার চারি দিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্মের আনন্দ-লোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তার কেউ সারথি নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে না? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথির যথার্থ মিলন ঘটছে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্যোগও সেই সারথির অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারছে না, মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না; আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথির—চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নামবার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথির। কে বলতে চায় এই-সমস্তই মিথ্যা—এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্য বিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তর-বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। কর্মের মধ্যে আমার যা-কিছু বাধা, যা-কিছু বেসুর, যা-কিছু জড়তা, যা-কিছু অব্যবস্থা, সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসংকোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করছেন।

উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেছেন? আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনি ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই, এ কখনো হতেই পারে না—সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কী করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এইজন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে—তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পরহিতসাধন, সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে

প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম-আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রহ্মাবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন; তিনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি'। তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন তো তিনি নিজেই, তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করছেন। কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন— নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কী করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলই উৎসর্গ করছে, সেই তো তাঁর সৃষ্টি।

উপনিষৎ বলেন তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমা শক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে। আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়, আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেননা হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাই নে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়— আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাই নে। কর্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিই নে বলে, দান করি নে বলে কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মতো তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মতো তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মতো তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্‌। জীবনকে তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-পূরণ, সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালোবাসতে পারি এমন বীর্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। দুর্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করছে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্তগাড়িকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করছে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলই কর্মের রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করছে সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলই অভিশাপ দিচ্ছে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্মে মানুষের অনাস্থা, সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ। সেইখানেই যত সংকোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ংকর হোক-না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ জগৎটা আসলে যে কী তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন

বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই সেই-সকল সূক্ষ্মতম মূল-বস্তুর যোগ-বিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু, বিজ্ঞানের সেই মূল-বস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক-এক পা এগোচ্ছে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে; সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা এক দিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর এক দিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্ছে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জানতে হচ্ছে না; আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী। জল মানে বাষ্প-বিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তিবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়— জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী, সে আমার চোখের জিনিস, স্পর্শের জিনিস; সে আমার স্নানের জিনিস, পানের জিনিস; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কী তা আমরা ধারণা করতে পারি নে, কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে যে দুর্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্তমনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মতো ব্যবহার করছে, কোথাও কিছু বাধছে না।

জড়জগতে যেমন মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কী তা কেমন করে বলব। পর্দার উপর পর্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব। সেই প্রাণ এক দিকে যত বড়ো প্রকাণ্ড রহস্যই হোক-না কেন, আর-এক দিকে তাকে আমরা কী সহজেই বহন করছি— সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্তে অগণ্য জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন শাখাপ্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জনতাকে সজন করে তুলছে— এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্যালোকে উঠছে এবং সূর্যালোক থেকে অন্ধকারে নেমে পড়ছে। এ কী তেজ, কী বেগ, কী নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই; আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জিত উন্মথিত হয়ে উঠছে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে এক সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু, এখানেই সে আছে, এখনই সে আছে, আমার হয়ে আছে। তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে সে আছে। সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বন্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট মানবপ্রাণ— তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, শীতগ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করছে। এই অনির্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে আপন হয়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

তাই বলছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্বচনীয় ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালোবাসছি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাই নে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে তো এই রকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি সেখানে সে এমন সহজ সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে সমগ্র করে আপন

করে লাভ করছে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কী কঠিন হয়েছে!

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না. চারি দিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু, আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার; তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না-পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাই নি, ওটা পাই নি; ততক্ষণ যা-কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেননা, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিসকেই পাই নে; এমন কোনো আধার থাকে না যার মধ্যে কোনো কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি সবই মায়া— সবই ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আত্মাকে যখনই পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিত করে ধরতে পারি, তখনই সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারি দিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাই নি তখন যা-কিছু অসত্য ছিল আপনাকে পাবামাত্রই সেই-সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মতো ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না, কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে। এইজন্যে যে লোক আত্মাকে পেয়েছে জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্যরূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ তার কাছে জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এইজন্য তার কাছে কোনো সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায় নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না— তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনই জগতের গ্রহনক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মানিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারি দিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাই নে, কিছুই দিই নে; যখনই সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে— মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্ত কালেও আমরা এককে পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ

বোধে এক মুহূর্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর-কিছুতে পাবার জো নেই—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্ছে প্রকাশ—এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়, আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না—যা-কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে—দরজা খুলে দিতে হবে, তা হলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

মাঘ ১৩১৭

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়। তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের। কিন্তু, যে জাতি যেরকম পরিণতিই পাক-না কেন, সকলেই কোনো-না-কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে চাচ্ছে। এমন একটি বড়ো যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্ছে, যা তার কেনা-বেচার সামগ্রী তা নিয়ে তো তাকে থাকতেই হয়। সেইসঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখাশোনা খাওয়াপরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে। তাকেই আপনার সমস্ত সুখ-দুঃখের চেয়ে বড়ো বলে স্বীকার করছে। কেননা, মানুষ জানছে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই; তার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা আরাম-বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বলছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারছে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করতে হবে; তাকে যুক্ত করতে হবে। সেই দিকে চেয়েই মানুষ এক দিকে আপনার দীনতা আর-এক দিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং সেই দিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়; ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায়; তার পরম আপনাকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার-বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি। এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন। এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্বাঙ্গীণ রূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন,

সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলই বিশুদ্ধ করে তুলছেন— সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্ছেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্বতে জ্যোতিষ্কলোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে, অসীমকে দেখি; কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাই নে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্ছে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখতে পাই; কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখতে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখব?

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন— এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন; সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেননা, সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন। সেইখানেই সকলের চেয়ে বড়ো প্রকাশ— ইচ্ছার প্রকাশ, প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও পারি, না মানতেও পারি; সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব— সেই একটি মস্ত অপেক্ষা একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেননা, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপ মলিনতার অবকাশ ঘটেছে; কেননা, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন তবে এমনটি ঘটতে পারত না; বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন, সে জায়গা তিনি মানুষকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয়; কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন, এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন অথচ নেই। এইজন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করছি, আঘাত পাচ্ছি, ধুলোয় আমাদের সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠছে, সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠছে; আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায় এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারি গান; মাঝি, তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না! তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সংকোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ, তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে। এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়; এখানে জোর খাটে না। রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এইজন্যে ভক্ত যে দিন আপনার

অহংকারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছা করে আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, সেই দিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন। সেইজন্যই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়ছে—এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন, সেইজন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্ছে। বলছে : আবিরাবীর্ম এধি।

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজকাল অন্য দেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্ছে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখলুম। তিনি ভগবানকে ডেকে বলছেন—

Thou hast need of thy meanest creature;
  thou hast need of what once was thine:
The thirst that consumes my spirit
  is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বলছেন, তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করছে সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি, তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি—তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
বহ প্রভু অসীম ভাষায়,
(তাই দীননাথ.) আমি ক্ষুধিত আমি তৃষিত
তাই তো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা তাই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো উষার আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার তো আর কোনোই কাজ নেই, সে তো কেবলই হৃদয়ের প্রতি হৃদয়মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বলছে : তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির! তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে, কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে; সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এসো, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এসো, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক।—এই একটি বিরহবেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেইজন্যেই আমার মধ্যেও আছে।

I have come from thee, why I know not;
  but thou art, O God! what thou art;
And the round of eternal being is the pulse
  of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি কেন যে তা জানি নে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; এই-যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্ছে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই-যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুলছে, কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বলছেন, এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব; এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার। তাই কবি বলছেন, আমি যে দুঃখ পাচ্ছি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না প্রভু।—

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কী স্বামী!
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
কোরো নিশিদিন।
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব!
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ,
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ তো আমি চাই নে—যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো। আমি যে তোমার পত্নী; আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব। সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেইজন্যেই, আমি বলছি নে আমাকে সুখ দাও, আমি বলছি : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও।

আমি তোমার ধর্মপত্নী,
ভোগের দাসী নহি।
আমার কাছে লাজ কি স্বামী,
নিষ্কপটে কহি—
আমায় প্রভু, দেখাইয়ো না
সুখের প্রলোভন,
তোমার সাথে দুঃখ বহি
সেই তো পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি,
তাই তো ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে
দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি,
তাই তো তোমার ঘরে
হে ভিখারি, সব দারিদ্র্য
আমার সেবা করে।
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই
পাই না সুখের দান—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী
এই তো আমার মান।

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না। তখন সে বলে : যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায় তখন আর আরামকে চাইলে চলবে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না, তখন আর

কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না। তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তখন কর্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই। তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কী দেখি? দেখি, সে তর্ক-বিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকাভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়, সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়—সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না, সেও তেমনি। ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখতে পাই নে। তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে, মহৎ হয়ে, শক্তিশালী হয়ে মেলে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম মেলে। বাহির মেলে, অন্তর মেলে। কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে। কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে। কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে। সমস্তই আনন্দে মিলে যায়, রাগিণীতে মিলে ওঠে। তখন জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ বিপদসম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে, নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্বচনীয় রূপ হচ্ছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুইই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুইই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুইই সার্থক; এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মতো, মধুর সুরে বাজতে থাকে। এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার বীরত্বও তেমনি সুকঠিন। এই প্রেম দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে এবং পরকে, জীবনসমুদ্রের এ পারকে এবং ও পারকে প্রবল মাধুর্যে এক করে দিয়ে, দিগ্‌দিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাহত করে দিয়ে, উষার মতো উদিত হয়। অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে। তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ সেই প্রভেদ কেবলই অমৃতে ভরে ভরে উঠতে থাকে, সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপড়ি একটির পর একটি করে বিকশিত করতে থাকে। তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে।

ফাল্গুন ১৩১৭

পশ্চিম আকাশের পারে তখনো সূর্যাস্তের ধূসর আভা ছিল; আমাদের আশ্রমে শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুলছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্তমান মুহূর্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল, যেদিন প্রত্যহ সূর্যের উদয় এ দেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখির কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুলত, এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোম-ধেনুগুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আনত, ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্যাবর্তের দিগন্তপ্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্যপিতামহেরা তাকে এক দিনও এক বেলাও উপেক্ষা করেন নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায়

দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, কেবল ভোগীর মতো নয়, ভাবুকের মতো নয়। সৌন্দর্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন; সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে মনকে স্থির শান্ত করে উষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল, নদীসংগমে সমুদ্রতীরে পর্বতশিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানেই তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো-একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি, এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোটো না করে, ভক্তিবৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জানতে পারি। অর্থাৎ, কেবলই তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ করে আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল, সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডির মধ্যে সৌন্দর্যকে অত্যন্ত শৌখিন রকম করে দেখতে চাই। তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি; সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই; এইজন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোটো করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে-সমস্ত বিরোধ ও বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়োর মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখতে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু, মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠি নে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে তার সমস্ত ছোটোকে আমরা বড়ো করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়; কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এইজন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই নে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখছি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনই অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইছে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তা হলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্ছিত হয়ে যেতুম। টুকরো টুকরো করে যদি দেখ তা হলে এর মধ্যে কত ঘাতসংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে! এই-যে আমাদের চোখের সামনেই ঐ গাছটি এই তারাখচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে যদি আংশিকভাবে দেখতে যাই তা হলে দেখতে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি, কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে। আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই; কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা-কিছু তুচ্ছ যা-কিছু ব্যর্থ যা-কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে

আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য যে কাটাছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডি-কাটা জিনিস নয়, বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, এত বড়ো বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করছে। সেই-যে শক্তিকে দেখতে পাই সে অতি ভীষণ। সে কাটছে ভাঙছে টানছে জুড়ছে; সে তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্যনিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে; তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে ক্রন্দসী রোদন করে উঠছে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ংকর তারই অখণ্ড সত্যরূপ কী পরমশান্তিময় সুন্দর। সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য থাকত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলই বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্য থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলছে। সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ংকর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে, সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য। জগতে এই মুহূর্তেই যেমন আকাশজোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। তাঁর ভয়ংকর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলছে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্ছে, এখনই এ আমরা কত সহজে কী অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছি— আমাদের মনে ভয় নেই, ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানবসংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করছে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ংকর ঘাতসংঘাত সর্বদাই বড়ো করে প্রত্যক্ষ করছি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য হানাহানি-কাটাকাটির মন্থন কেবলই চারি দিকে চলছে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাকত তা হলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তন-হীন কদর্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চলছে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ততেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্যবেগে উদ্গত হয়ে উঠছে; তারই ভয়ংকর পেষণ-ঘর্ষণে রাজ্যসাম্রাজ্য শিল্পসাহিত্য ধর্মকর্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠছে। এই সংসারের মাঝখানে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং; কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহাসৌন্দর্যকেই দেখেন। তাঁরা অমৃতকেই দেখেন য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

১৫ চৈত্র ১৩১৭

অনেকে এমনভাবে বলেন, যেন প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে উপরে ওঠবার কোনো বেগ নেই; সেইজন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু, আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি; সে তো জড়যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধ-ভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো তার পথের কোনো একটা জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌঁচেছে, এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড় কত প্লাবন কত ভূমিকম্প কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘনমেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল, আজ

কেবল কয়লার খনির ভান্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভালো করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ কত অদ্ভুত পাখি কত আশ্চর্য জন্তু কোন্ নেপথ্যগৃহ থেকে এই সৃষ্টিরঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায় নি। থেমে যদি যেত তা হলে এখনই যা-কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদিঅন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন করে করেই এগোতে হচ্ছে, কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। এইজন্যেই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু, সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোটো ছোটো সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলই ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ, দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়। এইজন্যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতিভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্ছি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা— এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সব সময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারি নে তার কারণ পূর্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই-সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখছি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখছি নে; সেইজন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্ছেন না, সেইজন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ঐ দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে; তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা। কিন্তু সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ। কত দুঃখের দারুণ দাহে ঐ সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে। সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা। সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর। শুধু তাই নয়; তাঁর চারি দিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ— পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে

পাচ্ছি মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেই রকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখ-রূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব; ভীষণকে সুন্দর বলে জানব; মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয় অপ্রিয় সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড করে এক করে সুন্দর করে দেখব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব। নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারি দিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে—তখন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে। সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলুম, সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

১৫ চৈত্র ১৩১৭

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই-যে উপাসনা, এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক, তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ। শেষ বলতে যে কী বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না; বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করছে, আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করছে। তোমরা এই-যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করছ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি—তোমরা কেবল নিচ্ছ এবং খাচ্ছ। আর, আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আসছি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করছি; ঘরে যা সঞ্চয় করে বসে ছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না, সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে। আজ কিছু যাচ্ছে, কাল কিছু যাচ্ছে; অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্বাচলের যাত্রী, সূর্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ; সেই দিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করছেন, তাঁকে তোমরা পূর্বমুখ করেই প্রণাম করো। আমরা পশ্চিম-অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা করি; সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আসছে, সেই আহ্বানও সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ; একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ—কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে,

তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই— এক দিকে যিনি শিশুর আর-এক দিকে তিনিই বৃদ্ধের। এক দিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে তাঁর একস্বরূপের দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত হয়েছে। কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না, ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, বিরাম যে কেবল কর্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায়, এই কথাটি আজ এই চৈত্রপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকাশে যেন মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জগতে যা-কিছু চলে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়, তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি, তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতিদিন কেবল নূতন-নূতনকে পাচ্ছ আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্ছেই। এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তা হলে কী জন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ংকর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? তা হলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুত না, আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলই একটি পাওয়াতে এসে ঠেকছে; সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড়ো একটি আশ্চর্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই পাই নি পাই নি কান্নাটা থেকে যায়— অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুনতে পাই নে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুনতে দেয় না।

কিন্তু, একটু একটু করে বিরক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে সেটি কী গভীর পাওয়া, কী বিশুদ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবামাত্র মৃত্যুভয় চলে যায়। তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে যা-কিছু যাচ্ছে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্ছে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে; সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন-নূতনকে পায় না, তখন তার দেবার পালা। তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু, আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই তো পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলই আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। তখন আপনার নানা জিনিস থাকে তখন আমরা মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত কিছু আছে, সে-সব ঘুচলেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেইজন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এইজন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখতে পেতুম। তা হলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম; সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলই মেঘের মতো সরে যাচ্ছে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে বলেই যিনি সরে যাচ্ছেন না, মিলিয়ে যাচ্ছেন না, তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাই আমি বলছি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বন্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। কিছুই থাকছে না, সবই

চলেছে, এইটিই লক্ষ করো। মন শান্ত করে হৃদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্ছে এমন একটি থাকা স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগোচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসা'র মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে। তা অনেক তা অসংখ্য। কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। 'গেছে গেছে' এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন—এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা-কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও, দেখো : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ করো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণু-পরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু এক জায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলশব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্মমরণ এই নিঃশব্দ সংগীতে বিলীন হয়ে রয়েছে 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'।

চৈত্র ১৩১৭

এই-যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যুষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না, আকাশ-ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল, কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল—তার জন্য কোথাও কিছু-মাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে; সেখান থেকে নিত্য-নূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি; আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিণ বাতাসে নবীনতার আশিসমন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখতে দেখতে তখনই অনায়াসে শুকনো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়—এই-যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়। কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু, মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়—বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্গের মতো দিকে দিগন্তে চকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশিদিনের সন্তান নয় তবু জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে যেন প্রাচীন। কেননা সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত; যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাকতে পারছে না। সে আপনার শতসহস্র সংস্কারের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে

তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে; সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস-মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখতে দেখতে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শতসহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মতো। চারি দিকের জগৎ নূতন থাকে, আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারি দিকের বিরাট প্রকৃতির থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন— সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না— অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারি দিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার। সেইজন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্মস্থানে গিয়ে পড়ে; তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, প্রভু. তুমি আমাকেই মারছ। বলি, আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা করো। কিংবা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি, তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, এ আমি গ্রহণ করব না।

মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষকোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসংগত সুসংহত করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা, ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধ-জয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুলছে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং সুষমার পরিবর্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারি দিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

সেইজন্যে বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে. এক দিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই, সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না; তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়; বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেইজন্যে আমি বলছি, এই প্রত্যুষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই যে অরুণালোকের সহজ নির্মলতা, এই যে পাখির কাকলির স্বাভাবিক মাধুর্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়— যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ; যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি, এই আলোকের নির্মলতা আমারই নির্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি; মনে যেন না করি স্তব পাঠ করে,

নামগান করে, কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ করে, আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়, পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন; তিনি তাকে সহজ জীবন দেন নি। সেইজন্যেই সাধনা করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়; তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলছি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষ পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে তো সহজ দান নয়, আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি তবে মাথা তুলতে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি 'তোমার এ ভার বহন করতে পারি নে প্রভু, মনুষ্যত্বের অতিবিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর'।

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন, তাই তো মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা প্রেমের সাধনা কর্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্যেই তার উপরে এত দাবি। এইজন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব করে চলাতে হয়; এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসংবরণ।

মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর। তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মতো আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও। একটি দরজার পর আর-একটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আর-একটি পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ করো। তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না। ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক।

এই যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র; সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্বলকণ্ঠে বলি 'আমার বল নেই' সেইটেই আমাদের মোহ। দুর্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনিককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শাণিত অস্ত্র সব ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। সে-সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষত-বিক্ষত করছে। এ-সমস্ত তো সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণহস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এসো, এসো, দলে দলে বাহির হয়ে পড়ো— নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠছে। সমস্ত অবসাদ কেটে যাক, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক— জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার প্রভুর।

না না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সংবৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য

সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে, এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মতো গ্রহণ করো।

১ বৈশাখ ১৩১৮

কর্ম করতে করতে কর্মসূত্রে এক-এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে; তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে, খুলতে, সেরে নিতে, চার দিকে কত রকমের টানাটানি করতে হয়—তাতে মন উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল; তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বসেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে; এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কী করলে জট ছাড়ানো হবে, জঞ্জাল দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা অবহিতভাবে শুনতে পারবে, সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠল, তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল, পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল—ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে-সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্নান ও পানের জলের কিরকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল; দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারি দিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়, চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়—পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্যাপ্ত বর্ষণ, এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা, আমারও মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারই ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা এক মুহূর্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ করে, একটুর সঙ্গে আর-একটুকে জুড়ে গেঁথে, কোনো কালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু ভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষকোটি ফুলের নিগূঢ় মর্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করছে—যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে অকস্মাৎ সে কী আশ্চর্যরূপে দেখা দেয়। বহুদিনের মৃতপত্র তখন এক মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহুকালের শুষ্ক ধূলিকে এক মুহূর্তে

শ্যামল করে তোলে— তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখতেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন— সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গম্ভীর— সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করছে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই, কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বলছে না; কেবল ইচ্ছা করছে বিশ্বজগতের মধ্যে যে-একটি পরম গম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে, কোনো দুঃখ-বিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারছে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই— তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাকবে, যে দীনতা কোনোদিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। নামবে তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাকবে তোমার প্রসাদধারা; গহ্বর যত গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। বারিধারা ঝরছে ঝরছে— সমস্ত ধুয়ে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে; সমস্ত নবীন হয়ে উঠছে, শ্যামল হয়ে উঠছে। বাইরে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার, তারই মধ্যে নেমে আসছে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূতগুলি, ভরে ভরে নিয়ে আসছে তাঁরই সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই, এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে-ঘেরা আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কী গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব! সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে; প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে— তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারি দিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুশির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুশি হও! এই সহসা-অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুশি, এই এক মুহূর্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুশি, সেই খুশির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মন প্রাণ শরীর আজ খুশি হয়ে উঠুক। আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কর্ম-ক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে যাক— পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এসো এসো, হে গোপন, তুমি এসো! প্রান্তরের এই নির্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টি-ধারার মধ্য দিয়ে তুমি এসো! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এসো, আজ বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও— তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শলাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি।

৬ বৈশাখ ১৩১৮

যা প্রাণের জিনিস তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার যে কত বড়ো লোকসান সে কথা তো প্রতি-দিন মনে পড়ে না। কিন্তু, আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে তো ফাঁকি দিয়ে সারি নে। অন্নজলকে তো সত্যকারই অন্নজলের মতো ব্যবহার করে থাকি। কেবল আমার ভিতরকার এই-যে মানুষটি ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়া-রৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না, সেই আমার অন্তরতম চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি; তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল

মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়ো; এইজন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাত হচ্ছে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই-না কেন সে সেটা পায়, আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেইজন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌', শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেননা, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে, একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে, আর-একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই, তা হলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন-কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনোই সম্পূর্ণ দান নয়; সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে, কিন্তু সে দান ধর্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা তো নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করছি; সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করছি; সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি-দান যখনই বন্ধ হয়ে যাবে তখনই প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এইরকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারছি ততই দান করছি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণে দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান তো আমাদের চলছেই; কিন্তু কী দান করছি এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে তো আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিস কুড়িয়েবাড়িয়ে যা কিছু পাচ্ছি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করছি? সে তো সমস্তই দেখছি বাইরেই এসে জমছে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে তো এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু, নিজেকে এই-যে আমরা দান করছি, এই-যে আমার চেষ্টা, এই-যে আমার সমস্তই, এ কি পূর্ণ দান হচ্ছে। শ্রদ্ধার দান হচ্ছে? ধর্মের দান হচ্ছে? এতে করে আমরা বাড়াচ্ছি, কিন্তু বড়ো হতে পারছি কি? এতে করে আমরা সুখ পাচ্ছি, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি নে; এতে করে তো আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারছে না। মানুষ বললে যতখানি বোঝায় ততখানি তো ব্যক্ত হয়ে উঠছে না।

কেন এমন হচ্ছে। কেননা, এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনছি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করছি যে, আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলছি।

নিজেকে যে লোক কেবলই ধনমান জোগাচ্ছে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করছে; সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলই অপমান করছে; তাকে সে কিছুই দিচ্ছে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করছে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধা

দিচ্ছে না—এবং 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করছে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে তো আমরা বিনাশ করতে পারি নে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে দিচ্ছি, তার দুর্গতি তো কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে তো আমাদের বাঁচায় না, আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে তো আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন তো বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তখন তো বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারি নে; আর অকস্মাৎ বজ্রের মতো মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক তো কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারি নে। যখন এক দিকে ভার চাপতে চাপতে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির ঠোকাঠোকি হতে থাকে, অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্যসামন্ত কাকে ডাকব যে তার উপরে এক ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে। মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে, কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে, কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মতো বেঁচে গেলে?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে? আমরা এতদিন ধরে তাকে কোন্ ভরসা দিয়ে এলুম? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড়লণ্ঠন খাটিয়ে দিলুম, কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল, সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে ধুলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কী বলে তাকে আশ্বাস দিলুম।

তার সেই মর্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বড়োই ব্যাঘাত করতে লাগল, আমাদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে, তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাকে বলে এসেছি: 'ভয় নেই তোমার, আমি আছি।' মনে করেছি, এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড়ো অভয়মন্ত্র যে 'আমি আছি'। নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ মানমর্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মতো গেঁথে ফেলে তার হাতে দিয়ে বলেছি: এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বার বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলই একমনে জপ করতে থাকো আমি আমি আমি। আমি সত্য, আমি বড়ো, আমি প্রিয়।

তাই নিয়ে সে জপছে বটে: আমি. আমি, আমি। কিন্তু, তার চোখ দিয়ে জল পড়া আর কিছুতেই থামছে না। তার ভিতরকার এ কোন্ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্ছে: না না না, নয় নয় নয়। কোন্ তাপসিনীর করুণবীণায় এমন উদাস-করা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুলছে: ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হল রে, সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রিবেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল; মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।

কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে? সে হচ্ছে চিরদিনের সেই সত্য বাণী: পিতা নোঽসি, পিতা তুমিই আছ।

তুমি আছ, পিতা, তুমি আছ, আমাদের পিতা তুমি আছ: এই বাণীতেই সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর ওটা কী ভয়ানক মিথ্যা, ঐ যে 'আমি আছি'! কই আছ, তুমি আছ কোথায়! তুমি

ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনাগুলোকে আশ্রয় করে বলছ 'আমি আছি'। যে বুদ্বুদটি যখনই ফেটে যাচ্ছে তাতে তখনই তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সংসারে দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগছে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্ছে। তুমি আছ কিসের উপরে। তুমি কে। অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বলছে 'চাই' তখন তুমি অহংকার করে তাকে গিয়ে বলছ : আমি আছি, তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুশি থাকো। এ তোমার কেমন দান। তোমার প্রকাণ্ড বোঝা বইবে কে। এ যে বিষম ভার। এ যে কেবলই বস্তুর পরে বস্তু, কেবলই ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ। এ তো তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা। তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলই অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও। তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে যেতে থাক্! যে মানুষটি যাত্রী যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন। এই-সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকবে সে অবকাশ তার কোথায়। এইজন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তুমি কি সেই নির্ভর নাকি। তবে কোন্ ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপছ 'আমি আছি'!

পিতা নোঽসি : পিতা, তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। 'সত্যং' এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে : পিতা নোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে। তুমি আছ, এ তো শুধু একটা মন্ত্র নয়। তুমি আছ, এটা তো শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। তুমি আছ, এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে যেতে না পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম, কেনই বা কিছুদিনের জন্য নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম—শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল।

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতিদিনের সমস্ত খাজনা তার হাতে শেষ কড়াটি পর্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি-বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড়ো দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারি নে।

সেইজন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি : তুমি যে পিতা তুমি যে আছ, এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও।

জল যখন তাপের দ্বারা হালকা হয়ে যায় তখনই সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে। তখনই সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক করে ফেলে। তখনই সে ব্যর্থ হয়ে স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়, তখনই সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্মই হচ্ছে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা, সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়—তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্পরাশি পৃথক হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নীচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অমনি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না; নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্বজনের নিম্নক্ষেত্রে, সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনই জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনই মিলনের স্রোত চারদিকে ছুটে বইতে

থাকে, বর্ষণের সংগীতে দশ দিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনই আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে, আপনার ধর্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে সমর্পণ করতে চাচ্ছে। এই তার যথার্থ ধর্ম। সে অহংকারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্ছে; পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্মটিকে যে পর্যন্ত সে না পাচ্ছে সেই পর্যন্তই তার যত-কিছু দুঃখ, যত-কিছু অপমান। এইজন্যেই সে প্রতিদিন জোড়-হাত করে বলছে, নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

১১ মাঘ ১৩১৮

আজকের এই প্রান্তরের উপর জ্যোৎস্নার আলোক দেখে আমার অনেক দিনের আরও কয়েকটি জ্যোৎস্নারাত্রির কথা মনে পড়ছে।

তখন আমি পদ্মানদীতে বাস করতুম। পদ্মার চরে নৌকা বাঁধা থাকত। শুক্লপক্ষের রাত্রিতে কতদিন আমি একলা সেই চরে বেড়িয়েছি। কোথাও ঘাস নেই, গাছ নেই, চাঁদের আলোর সঙ্গে বালু-চরের প্রান্ত মিশিয়ে গেছে—সেই পরিব্যাপ্ত শুভ্রতার মধ্যে একটিমাত্র যে ছায়া সে কেবল আমার।

সেই আমার নির্জন সন্ধ্যায় আমার একজন সঙ্গী জুটল। তিনি আমাদের একজন কর্মচারী। তিনি আমার পাশে চলতে চলতে অনেক সময়েই দিনের কাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। সে-সমস্তই দেনাপাওনার কথা, জমিদারির কথা, আমাদের প্রয়োজনের কথা।

সেই আমার কানের কাছে সেই একটিমাত্র মানুষের একটুখানি কণ্ঠের ধ্বনি এত বড়ো নক্ষত্র-লোকের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিত এবং এত বড়ো একটি নিভৃত শুভ্রতার উপরেও যেন ঘোমটা পড়ে যেত, তাকে আর যেন আমি স্পষ্ট করে দেখতেই পেতুম না।

তার পরে তিনি চলে গেলে হঠাৎ দেখতে পেতুম আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম, সেইজন্যে চার দিকের বড়োকে আমি আর সত্য বলে জানতে পারছিলুম না; এত বড়ো শান্তিময় সৌন্দর্যময় আকাশ-ভরা প্রত্যক্ষ বর্তমানও আমার কাছে একেবারে কিছুই-না হয়ে গিয়েছিল।

এই নিয়ে কতদিন মনের মধ্যে আমি বিস্ময় অনুভব করেছি। এই কথা মনে ভেবেছি, যতক্ষণ কেবল আমারই সংক্রান্ত কথা হচ্ছিল, আমারই বিষয়কর্ম, আমারই আয়োজন প্রয়োজন—আমার মনের মধ্যে আমিই যখন একমাত্র প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলুম—বস্তুত তখনই আমার বিশ্বের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম। ততক্ষণ চাঁদ আমার কাছ থেকে তার জ্যোৎস্না ফিরিয়ে নিয়েছিল। নদীর কলধ্বনি আমাকে একেবারে নগণ্য করে দিয়ে পাশে থেকেও আমাকে অস্পৃশ্যের মতো পরিহার করে চলে গিয়েছিল। এই দিগন্তব্যাপী শুভ্র আকাশের মধ্যে তখন আমি আর ছিলুম না, আমি নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলুম।

শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের মধ্যে যে ভাব, যে ভাবনা, চারি দিকের বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যেন কোনো সত্য যোগ নেই। নিখিলের মাঝখানে তাকে ধরে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় সে একটা অদ্ভুত মিথ্যা। জমি-জমা হিসাব-কিতাব মামলা-মকদ্দমা এ-সমস্ত শূন্যগর্ভ বুদ্‌বুদ বিশ্ব-সাগরের মধ্যে কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে কত শতসহস্র বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক, তবু সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদেরও স্থান আছে। সমুদ্রের সমগ্র সত্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ঐ বুদ্‌বুদেরও যেটুকু সত্য সেটুকুকে একেবারে অস্বীকার করবার দরকারই হয় না। কিন্তু আমরা যখন এই বুদ্‌বুদের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারে হারাই তখনই আমাদের বিপদ ঘটে।

আমরা বড়োর মধ্যে আছি এই কথাটি যখন আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকে তখন ছোটোকে স্বীকার করে নিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বড়ো জগতে আমাদের বাস, বড়ো সত্যে আমাদের চির-আশ্রয়, এই কথাটি যাতে ভুলিয়ে দেয় তাতেই আমাদের সর্বনাশ করে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে বড়োতে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। ছোটোখাটোর মধ্যে সহজেই আমাদের চলে যায়। কিন্তু যাতে তার কেবলমাত্র চলে যায় মানুষকে তার মধ্যে তো মানুষ থাকতে দেয় নি। মানুষকে সকল দিকেই মানুষ তার থেকে বাইরে টেনে আনছে।

এই-যে তোমরা মানবশিশু, পৃথিবীতে তোমরা সকলের চেয়ে ছোটো; আজ তোমাদের আমরা এই মন্দিরে এনেছি, জগতে সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তাঁকে প্রণাম করতে। বাহির থেকে দেখলে কারও হাসি পেতে পারে, মনে হতে পারে এর কী দরকার।

কিন্তু, মনকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো, এত বড়ো আকাশ, এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বা আমাদের জন্মাবার কী দরকার ছিল। আমাদের চার দিকে যথোপযুক্ত স্থানটুকু রেখে তার চার দিকে বেড়া তুলে দিলে কোনো অসুবিধা হত না; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে হয়তো সুবিধা হত, অনেক কাজ হয়তো সহজ হতে পারত।

কিন্তু, ছোটোর পক্ষেও বড়োর একটি গভীরতম অন্তরতম দরকার আছে। সে এক দিকে অত্যন্ত ছোটো হয়েও আর-এক দিকে অত্যন্ত বড়োকে এক মুহূর্তের জন্যেও হারায় নি এই সত্যের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। তার চার দিকে সমস্তই তাকে কেবল বড়োর কথাই বলছে। আকাশ কেবলই বলছে 'বড়ো', আলোক কেবলই বলছে 'বড়ো', বাতাস কেবলই বলছে 'বড়ো'। দিবসের পৃথিবী তাকে বলছে 'বড়ো', রাত্রের নক্ষত্রমণ্ডলী তাকে বলছে 'বড়ো'। গ্রহনক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে নদী সমুদ্র প্রান্তর সকলেই তার কানের কাছে অহোরাত্র এই এক মন্ত্রই জপ করছে— 'বড়ো'। ছোটো মানুষটি বড়োর মধ্যেই দৃষ্টি মেলেছে, সে বড়োর মধ্যেই নিশ্বাস নিচ্ছে, সে বড়োর মধ্যেই সঞ্চরণ করছে।

এইজন্যে মানুষ ছোটো হয়েও কিছুতেই ছোটোতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এমন-কি, ছোটোর মধ্যে যে সুখ আছে তাকে ফেলে দিয়ে বড়োর মধ্যে যে দুঃখ আছে তাকেও মানুষ ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থনা করে। মানুষের জ্ঞান সূর্য চন্দ্র তারার মধ্যেও তত্ত্ব সন্ধান করে বেড়ায়; তার শক্তি কেবলমাত্র ঘরের মধ্যে আপনাকে আরামে আটকে রাখতে পারে না। এই বড়োর দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেই দিকেই তার সত্য— এই সহজ কথাটি কখন সে ভুলতে থাকে? যখন সে আপন হাতের-গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চার দিক ঘিরে তুলতে থাকে। তখন এই জগৎ থেকে যে বড়োর মন্ত্রটি দিনরাত্রি উঠছে সেটি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না। আমরা ছোটো হয়েও বড়ো, এই মস্ত কথাটি তখন দিনে দিনে ভুলে যেতে থাকি। এবং আমাদের সেই এক বড়ো দেবতার আসনটি ছোটো ছোটো শতসহস্র অপদেবতা এসে অধিকার করে বসে।

বড়োর মধ্যেই আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। এই কথাটা একেবারে ভুলে গিয়ে যখন আমরা নিশ্চয় করে মনে করে বসি ঘরের মধ্যেই আমাদের বাস, ধনের মধ্যেই আমাদের বাস, তখনই হৃদয়ের মধ্যে যত রাজ্যের উৎপাত জেগে ওঠে— যত কাম ক্রোধ লোভ মোহ। বদ্ধ জলে বদ্ধ বাতাসে যেমন কেবলই বিষ জমে, তেমনি যখনই মনে করি আমাদের সংসারক্ষেত্র আমাদের কর্মক্ষেত্রই আমাদের সত্য আশ্রয় তখনই বিরোধ বিদ্বেষ সংশয় অবিশ্বাস পদে পদে জেগে উঠতে থাকে; তখনই আপনাকে ভুলতে পারি নে এবং অন্যকে কেবলই আঘাত করি।

১৩১৮

আমরা মানুষকে সত্য করে কখন দেখি নে? কখন তাকে ছোটো করে দেখি? যখন আমার দিক থেকে তাকে দেখি, তার দিক থেকে তাকে দেখি নে। আমার পক্ষে সে কতখানি এইটে দিয়েই আমরা মানুষকে ওজন করি। আমার পক্ষে তার কী প্রয়োজন, আমি তার কাছ থেকে কতটা আশা করতে পারি, আমার সঙ্গে তার ব্যবহারিক সম্বন্ধ কতখানি, এই বিচারের দ্বারাই আমরা মানুষকে সীমাবদ্ধ করে জানি। যেমন আমরা পৃথিবীতে অধিকাংশ সময়ে এই ভাবেই বাস করি যে, কেবল আমার বিষয়সম্পত্তিকে আমার ঘরবাড়িকে ধারণ করবার জন্যই বিশ্বজগৎটা রয়েছে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই। তেমনি আমরা মনে করি, আমার প্রয়োজন এবং আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সম্বন্ধকে বহন করবার জন্যেই মানুষ আছে— আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সে যে কতখানি তা আমরা দেখি নে।

জগৎকে অহরহ ছোটো করে দেখলে যেমন নিজেকে ছোটো করে ফেলা হয়, তেমনি মানুষকে কেবলই নিজের ব্যাবহারিক সম্বন্ধে ছোটো করে দেখলে নিজেকেই আমরা ছোটো করি। তাতে আমাদের শক্তি ছোটো হয়ে যায়, আমাদের প্রীতি ছোটো হয়ে যায়। জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুকরো করে দেখেন নি। এতে করে তাঁদের নিজেদের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে তাঁরা মানুষের জন্যে দান করতে পেরেছেন।

নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। এমন গল্প শোনা গেছে, ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সা মাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখে মানুষের প্রাণকে সে এক পয়সার চেয়েও ছোটো করে ফেলেছে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করি নে— আমার লুব্ধ বাসনার দ্বারা অনায়াসেই আমরা মানুষকে খর্ব করতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার ঈর্ষ্যা ক্রোধ বিদ্বেষ এ-সমস্তেরই মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে আমরা আমার দিক থেকে দেখার দরুন তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এর ফল হয় এই যে, এতে করে আমাদের নিজেরই মূল্য কমে যায়। অন্যকে নামিয়ে দিলেই আমরা নেমে যাই। কেননা, মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ, আমরা বড়ো হয়ে পরস্পরকে বড়ো করি। যেখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ নামিয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণকেও নীচে নামতে হয়েছে, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শূদ্র যদি বড়ো হত সে স্বতই ব্রাহ্মণকে বড়ো করে রাখত। রাজা যদি নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা বুঝে প্রজাকে খর্ব করে রাখে তবে নিজেকে সে খর্ব করেই। কারণ, কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়; প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষকে মূল্য দান করে। যেখানে মানুষ ভৃত্যকে ভৃত্যমাত্র মনে না করে মানুষ বলে জ্ঞান করে সেখানে সে মনুষ্যত্বকে সম্মান দেয় বলেই যথার্থরূপে নিজেকেই সম্মানিত করে।

কিন্তু, আমাদের তামসিকতাবশত জগতেও যেমন আমরা সত্য করে বাস করি নে মানুষকেও তেমনি আমরা সত্য করে দেখতে পারি নে। সেইজন্যে জগৎকে কেবলই আমার সম্পত্তি করে তুলব এই কথাই আমার অহোরাত্রের ধ্যান হয় এবং সেইজন্যই অধিকাংশ জগৎই আমার কাছে থেকেও না-থাকার মতো হয়ে যায়, মানুষকেও তাই আমরা আমাদের নিজের সংস্কার স্বভাব ও প্রয়োজনের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই দেখি; সেইজন্যে মানুষের যে দিকটা নিত্য সত্য, যে দিকটা মহৎ, সে দিকটা আমাদের চোখেই পড়ে না। সেইজন্যে ব্যবসায়ীর মতো আমরা কেবলমাত্র তার মজুরির দাম দিই, আত্মীয়ের মতো তার মনুষ্যত্বের কোনো দাম দিই নে। এইজন্যে যদিচ আমরা বড়োর মধ্যেই আছি তবু আমরা বড়োকে গ্রহণ করি নে, যদিচ সত্যই আমাদের আশ্রয় তবু সে আশ্রয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি।

এইরকম অবস্থায় মানুষকে আমরা অতি অনায়াসেই আঘাত করি, অপমান করি। মানুষকে এরকম উপেক্ষা করে অবজ্ঞা করে আমাদের যে কোনো প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় তা নয়, এমন-কি অনেক সময় হয়তো প্রয়োজনের ব্যাঘাত ঘটে— কিন্তু, এ একটা বিকৃতি। বৃহৎ সত্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে স্বভাবতই যে বিকৃতি দেখা দেয় এ সেই বিকৃতি। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে আমরা আমাদের পরিবেষ্টনকে সংকীর্ণ করে নিয়েছি বলেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলো দূষিত হয়ে উঠতে থাকে; সেই দূষিত প্রবৃত্তিই মারীরূপে আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে মারতে থাকে।

কর্ম করতে করতে কর্মের সংকীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে; কিন্তু দিনের মধ্যে অন্তত একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে উদার সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন এমন-ভাবে যাপন করতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা সত্যকে মানি। আমাদের সত্য করে বাঁচতে হবে; সমস্ত মিথ্যার জাল, সমস্ত কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতেই হবে— জগতে যিনি সকলের বড়ো তিনিই আমার জীবনের ঈশ্বর এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে তাঁর মধ্যে বেঁচে আছি এ কথা কি জীবনে একদিনও অনুভব করে যেতে পারব না? এই নানা সংস্কারে আঁকা, নানা প্রয়োজনে আঁটা, আমির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চার দিকে দেখতে পাব জগৎ কী আশ্চর্য অপরূপ! মানুষ কী বিপুল রহস্যময়! তখন মনে হবে এই-সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এই যেন আমি প্রথম সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি; আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয় নি। সেইদিনই এই জ্যোৎস্নারাত্রি তার সমস্ত হৃদয় উদ্ঘাটন করে দেবে; এই আকাশে এই বাতাসে একটি চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সেইদিন আমাদের মানবসংসারের মধ্যে জগৎ-সৃষ্টির চরম অভিপ্রায়টিকে সুগভীরভাবে দেখতে পাব; এবং অতি সহজেই দূর হয়ে যাবে সমস্ত দাহ, সমস্ত বিক্ষোভ, এই অহমিকাবেষ্টিত ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত দুঃসহ বিকৃতি।

ভাদ্র ১৩১৮

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য করে বিরাজ করছেন তাঁকেই একেবারে সহজে জানব এই আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে এই কথাটি নিয়ে সেদিন আলোচনা করা গিয়েছিল।

কিন্তু, এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যিনি সকলের চেয়ে সত্য, যাঁর মধ্যে আমরা আছি, তাঁকে নিতান্ত সহজেই কেন না বুঝি— তাঁকে জানবার জন্যে নিয়ত এত সাধনা এত ডাকাডাকি কেন?

যার মধ্যে আছি তার মধ্যেই সহজ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে; এখানে তারই উল্লেখ করব। মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন হয়ে থাকে। মাতার দেহ থেকে সে রস গ্রহণ করে, তাতে তাকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। মায়ের স্বাস্থ্যেই তার স্বাস্থ্য, মায়ের পোষণেই তার পোষণ, মায়ের প্রাণেই তার প্রাণ।

যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিশ্চেষ্টতা থেকে একেবারে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। এখানে আলোক অজস্র, আকাশ উন্মুক্ত, এখানে সে কোনো আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু, তবু এই মুক্ত আকাশ প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করেও এই মুক্তির মধ্যে সঞ্চরণের সহজ অধিকার সে একেবারেই পায় না। অনেক দিন পর্যন্ত সে চলতে পারে না, বলতে পারে না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তার হৃদয়ে মনে যে শক্তি আছে, যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা সে এই পৃথিবীর মধ্যে সহজ হয়ে উঠবে, তাকে অক্লান্ত চালনা করে অনেক দিনে তবে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, তবু অনেক দিন পর্যন্ত গর্ভের সংস্কার তার ঘোচে না। সে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটে।

কিন্তু, জড়ত্বের এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও তবু আমরা জানি সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করছে,

জানি তার এই নিশ্চেষ্ট নিশ্চলতা চিরকাল সত্য নয়। এখনও যদিচ সে চোখ বুজে কাটায়, তবু সে যে আলোকের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা সত্য এবং এই সত্যটি ক্রমশই তার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতররূপে অধিকার করতে থাকবে।

তৎপূর্বে তার চেষ্টা অল্প নয়। বার বার সে পড়ে পড়ে যাচ্ছে, বার বার সে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু তার এই কষ্ট দেখে, এই অক্ষমতা দেখে আমরা কখনোই বলি নে যে, তবে ওর আর কাজ নেই— ও থাক্ মায়ের কোলেই দিনরাত পড়ে থাক্। আমরা তাকে ধরে ধরে বারংবার চলার চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত করি। কেননা, আমরা নিশ্চয় জানি, এই মানবশিশু যেখানে জন্মেছে সেইখানে সঞ্চরণের শক্তিটা যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি নে তবু সেইটেই ওর পক্ষে সত্য, অক্ষমতাই যদিচ চোখে দেখতে পাচ্ছি তবু সেইটেই সত্য নয়। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভর করে শিশুকে আমরা অভ্যাসে প্রবৃত্ত রাখি বলেই অবশেষে একদিন তার পক্ষে চলা বলা এমনি সহজ হয়ে যায় যে, তার জন্যে এক মুহূর্ত চেষ্টা করতে হয় না।

মানুষের মধ্যে আত্মা মুক্তির ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে। পশুর চিত্ত বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত। সে প্রাকৃতিক সংস্কারের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতির চেষ্টা তার মধ্যে চেষ্টারূপে কাজ করছে। ভ্রূণের মতো সে কেবল নিচ্ছে কেবল বাড়ছে আপনার প্রাণকে কেবল পোষণ করছে। এমনি করে বিশ্বের মধ্যে মিলিত হয়ে সে চলছে বলে ভ্রূণের মতো আপনাকে সে আপনি জানে না।

মানুষের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ থেকে অধ্যাত্মলোকে জন্মেছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকৃতির ভিতর থেকে কেবল অন্ধভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চয় করতে থাকবে, এ আর হতেই পারে না। এখন সে কর্তা— এখন সে সৃষ্টি করবে, আপনাকে দান করবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিক্ষেত্রে জন্মেছে যদিচ এই কথাটাই সত্য, তবু একেবারেই এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি নে। প্রকৃতির গর্ভবাসের মধ্যে বদ্ধ অবস্থার যে সংস্কার তা সে এই মুক্ত-লোকের মধ্যে এসেও একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এ কথা এখনও তাকে দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। এখনও সে যেন প্রবৃত্তির নাড়ির দ্বারা প্রকৃতি থেকে রস শোষণ করে কেবল জড়ভাবে আপনাকে পুষ্ট করতে থাকবে এমনি তার ভাব; আপনার মধ্যে তার আপনার যে একটি সত্য আশ্রয় আছে এখনও তার উপরে নির্ভর দৃঢ় হয় নি, এইজন্যে প্রকৃতিকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে; এইজন্যেই শিশুর মতোই সে সব জিনিসকে মুঠোয় নিতে এবং মুখে পুরতে চায়—জানে না জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিসকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করবার দিন তার এসেছে। এখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে পাবে, আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারা দান করার দ্বারাই সে আপনাকে পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করবে ; সত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের গর্ভের মধ্যে নয়, সেই সত্যের মধ্যে তার ক্ষয় নেই, তার ভয় নেই—আপনাকে নিঃসংকোচে শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিতে এই অমর সত্যকে প্রকাশ করবার পরম সুযোগ হচ্ছে মানবজন্ম, এ কথাটাকে এখনও সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারছে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্বল দ্বিধা দেখেই একদল দীনচিত্ত লোক মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে—মানুষের আত্মাকে তারা দেখতে পায় না; তারা ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাতুর অহংটাকেই চরম বলে জানে, অন্যটাকে কল্পনা বলে স্থির করে।

কিন্তু, শিশু যদিচ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং অচেতনপ্রায় ভাবে তার স্তনপান করছে, অর্থাৎ যদিচ তার ভাব দেখে মনে হয় সে একান্তভাবে পরাশ্রিত, তবু যেমন সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, বস্তুত সে স্বাধীন কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেই জন্মলাভ করেছে—তেমনি মানুষের আত্মা সম্বন্ধেও আমরা আপাতত যত বিরুদ্ধ প্রমাণই পাই নে কেন তবু এই কথাই নিশ্চিত সত্য যে, বিষয় রাজ্যের

সে দীন প্রজা নয়, পরমাত্মার মধ্যেই তার সত্য প্রতিষ্ঠা। সে অন্য যে-কোনো জিনিসকেই মুখে প্রার্থনা করুক, অন্য যে-কোনো জিনিসের জন্যই শোক করুক, তার সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরেই পরমাত্মার মধ্যে একান্ত সহজ হবার প্রার্থনাই সত্য এবং তাঁর মধ্যে প্রবুদ্ধ না হবার শোকই তার একমাত্র গভীরতম ও সত্যতম শোক।

শিশুকে সংসারে যে আমরা এত বেশি অক্ষম বলে দেখি তার কারণই হচ্ছে সে একান্ত অক্ষম নয়। তার মধ্যে যে সত্য ক্ষমতা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করে আছে তারই সঙ্গে তুলনা করেই তার বর্তমান অক্ষমতাকে এমন বড়ো দেখতে হয়। এই অক্ষমতাই যদি নিত্য সত্য হত তা হলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তারই উদয় হত না।

সূর্যগ্রহণের ছায়া যেমন সূর্যের চেয়ে সত্য নয়, তেমনি স্বার্থবন্ধ মানবাত্মার দুর্বলতা মানবাত্মার চেয়ে বড়ো সত্য নয়। মানুষ অহংকে নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, তাই নিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন যত উত্থান পতনই হোক-না কেন তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়। মানুষের আত্মাই তার সত্য বস্তু বলেই তার অহং-এর চাঞ্চল্য এত বেশি প্রবল করে আমাদের আঘাত করে। এই তার অন্তরতম সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠার সাধনাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা। এই সত্যের মধ্যে সত্য হতে গেলে বন্ধভাবে জড়ভাবে হওয়া যায় না; বাধা কাটিয়ে তাকে লাভ না করলে লাভ করাই যায় না। সেইজন্য মানুষের আত্মা যে মুক্তিক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে সেই ক্ষেত্রের সত্য অধিকার সে নিশ্চেষ্টভাবে পেতেই পারে না। এইজন্যেই তার এত বাধা, এবং তার এই-সকল বাধার দ্বারাই প্রমাণ হয় অসত্যপাশ হতে মুক্ত হওয়াই তার সত্য পরিণাম।

এ দেশে আমরা শুচিতার একটি মূর্তি প্রায়ই দেখতে পাই, সে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যেন নিজের চতুর্দিককে কেবলই নিজের সংস্রব থেকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলতে থাকে। তার শুচিতা কৃপণের ধনের মতো কঠিন সতর্কতার সঙ্গে অন্যকে পরিহার করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এইরকম কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা বিশ্বকে কাছে টানে না, তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে।

আমরা শুচিতার বাহ্য লক্ষণ এই একটি দেখেছি, আহারে বিহারে পরিমিত ভাব রক্ষা করা। ভোগের প্রাচুর্য শুচিতার আদর্শকে যেন আঘাত করে। কেন করে। যা আমার ভালো লাগে তাকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা এবং ভোগ করার মধ্যে অপবিত্রতা কেন থাকবে। বিলাসের মধ্যে স্বভাবত দূষণীয় কী আছে। যে-সকল জিনিস আমাদের দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শবোধকে পরিতৃপ্ত করে তারা তো সুন্দর, তাদের তো নিন্দা করবার কিছু নেই। তবে নিন্দাটা কোন্‌খানে?

বস্তুত নিন্দাটা আমারই মধ্যে। যখন আমি সর্বপ্রযত্নে আমাকেই ভরণ করতে থাকি তখনই সেটা অশুচিকর হয়ে ওঠে। এই আমার দিকটার মধ্যে একটা অসত্য আছে যেজন্য এই দিকটা অপবিত্র। অন্নকে যদি গায়ে মাখি তবে সেটা অপবিত্র—কিন্তু, যদি খাই তাতে অশুচিতা নেই—কারণ, গায়ে মাখাটা অন্নের সত্য ব্যবহার নয়।

আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখন সে অসত্য হয় এইজন্যই সে অপবিত্র হয়ে ওঠে, কেননা কেবলমাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য নই। সেইজন্য যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই তখন আত্মা অসতী হয়ে ওঠে, সে আপনার শুচিতা হারায়। আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো; তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়েই সত্য হয়। তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা। তার সেই স্বামীসম্বন্ধেই উপনিষদ বলেছেন, এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। ইনিই তার পরম গতি, ইনিই তার পরমা সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আনন্দ।

কিন্তু যখন আমি সমস্ত ভোগকে আমার দিকেই টানতে থাকি, যখন অহোরাত্র সমস্ত জীবন আমি এমন করে চলতে থাকি যেন আমার স্বামী নেই, আমার স্বামীর সংসারকে কেবলই বঞ্চনা করে নিজের অংশকেই সকলের চেয়ে বড়ো করতে চাই, তখনই আমার জীবন আগাগোড়া কলঙ্কে

লিপ্ত হতে থাকে, তখন আমি অসতী। তখন আমি সত্যের ধন হরণ করে অসত্যের পূরণ করবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা চিরকালের মতো সফল হতেই পারে না; যা-কিছু কেবল আমার দিকেই টানব তা নষ্ট হবেই, তার বৃহৎ সফলতা স্থায়ী সফলতা হতেই পারে না; তার জন্যে ভয় ভাবনা এবং শোকের অন্ত নেই। অসত্যের দ্বারা সত্যকে আঁকড়ে রাখা কোনোমতেই চলে না। ভোগের ফুলের মাঝখানে একটি কীট আছে, সে কীট আমি এই অসত্য আমি; সে ফুলে ফল ধরে না। ভোগের তরণীর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে, সে ছিদ্র আমি এই অসত্য আমি; এ তরণী অতৃপ্তি-দুঃখের সমুদ্র কখনোই পার হতে পারে না, পথের মধ্যেই সে ডুবিয়ে দেয়।

সেইজন্যে শুচিতার সাধনা যাঁরা করেন ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। কেননা, এই স্বামী-বিমুখ আমির উপকরণ যতই জোগাতে থাকি ততই সে উন্মত্ত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার অতৃপ্তিই তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করে তাকে প্রলয়ের পথে দৌড় করাতে থাকে। এইজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই উচ্চসাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ভোগকে খর্ব করা, সুখের ইচ্ছাকে পরিমিত করা। অর্থাৎ, এমন করে চলা যাতে নিজের দিকেই সমস্ত বোঝা বাড়তে বাড়তে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে সেই দিকটাতেই কাত হয়ে না পড়ি।

আমার একটি পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র আমাকে বলছিলেন: কাল সন্ধ্যাবেলা যখন আমরা ঝড়-বৃষ্টিতে মাঠে বেড়াচ্ছিলুম তখন আমার মনে কেবল এই একটা চিন্তা উঠছিল যে, প্রকৃতির মধ্যে এই-যে এতবড়ো একটা আন্দোলন চলছে আমাকে এ যেন দৃক্‌পাতও করছে না, আমি যে একটা ব্যক্তি ও তার কোনো একটা খবরও রাখছে না।

আমি তাঁকে বললুম: সেইজন্যেই তো বিশ্বপ্রকৃতির উপরে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এমন দৃঢ় করে নির্ভর করতে পারে। যে বিচারক কোনো বিশেষ লোকের উপর বিশেষ করে তাকায় না, তারই বিচারের উপর সর্বসাধারণে আস্থা রাখে।

এ উত্তরে আমার ছাত্রটি সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মনের ভাব এই যে, বিচারকের সঙ্গে তো আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ নয়, কাজের সম্বন্ধ। আমার মধ্যে যখন একটি বিশেষত্ব আছে, আমি যখন ব্যক্তিবিশেষ, তখন স্বভাবতই সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ সম্বন্ধকে প্রার্থনা করে। যখন সেই বিশেষ সম্বন্ধকে পায় না তখন সে দুঃখ বোধ করে; প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সেই দুঃখ আছে। সে আমাকে বিশেষ ব্যক্তি বলে বিশেষ ভাবে মানে না। তার কাছে আমরা সকলেই সমান।

আমি তাঁকে এই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম যে, মানুষের বিশেষত্ব তো একটি ঐকান্তিক পদার্থ নয়। মানুষের সত্তার সে একটা প্রান্তমাত্র। মানুষের এক প্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। যদি আপনার সৃষ্টিছাড়া নিজত্বের মধ্যে মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত তা হলে নিজেরই একটি স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত, সেখানে তার নিজের সুবিধা অনুসারে সূর্য উঠত কিংবা উঠত না। সেখানে তার যখন যেমন ইচ্ছা হত তখন তেমনি ঘটত; কোনো বাধা হত না, সুতরাং কোনো দুঃখ থাকত না। সেখানে তার কাউকে জানবার দরকার হত না, কেননা সেখানে তার ইচ্ছামতই সমস্ত ঘটছে। এই মুহূর্তেই তার প্রয়োজন-অনুসারে যেটা পাখি, পরমুহূর্তেই সেটা তার প্রয়োজনমত তার মাথার পাগড়ি হতে পারে। কারণ, পাখি যদি চিরদিনই পাখি হয়, যদি তার পক্ষিত্বের কোনো নড়চড় হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কোনো-না-কোনো অবস্থায় আমাদের বিশেষ ইচ্ছাকে সে বাধা দেবেই; সব সময়েই আমার বিশেষ ইচ্ছার পক্ষে পাখির দরকার হতেই পারে না। আমার মনে আছে একদিন বর্ষার সময় আমার মাস্তুলতোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নীচে দিয়ে যাচ্ছিলুম; মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল। এ দিকে বর্ষানদীর প্রবল স্রোতে নৌকাকে বেগে ঠেলছে; মাস্তুল মড়্‌মড়্‌ করে ভাঙবার উপক্রম করছে। লোহার সেতু যদি সেই সময় লোহার অটল ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট মাত্র উপরে ওঠে, কিংবা মাস্তুল যদি কেবল এক সেকেন্ড মাত্র তার কাঠের ধর্মের

ব্যত্যয় করে একটুমাত্র মাথা নিচু করে, কিংবা নদী যদি বলে 'ক্ষণকালের জন্যে আমার নদীত্বকে একটু খাটো করে দিই, এই বেচারার নৌকোখানা নিরাপদে বেরিয়ে চলে যাক' তা হলেই আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। কিন্তু তা হবার জো নেই—লোহা সে লোহাই, কাঠ সে কাঠই, জলও সে জল! এইজন্যে লোহা-কাঠ-জলকে আমার জানা চাই এবং তারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে আপনার ধর্মের কোনো ব্যতিক্রম করে না বলেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে জানতে পারে। নিজের যথেচ্ছাঘটিত জগতের মধ্যে সমস্ত বাধা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাস করি নে বলেই বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা ধর্মকর্ম যা-কিছু মানুষের সাধনের ধন সমস্ত সম্ভবপর হয়েছে।

একটা কথা ভেবে দেখো, আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল যে ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কাকে চাচ্ছে? যদি আমাদের নিজের মনের মধ্যেই তার তৃপ্তি থাকত তা হলে মনের মধ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে বানিয়ে তাকে স্থির করে রাখতে পারতুম। কিন্তু, ইচ্ছা তা চায় না। সে আপনার বাইরের সমস্ত কিছুকে চায়। তা হলে আপনার বাইরে একটা সত্য পদার্থ কিছু থাকা চাই। যদি কিছু থাকে তবে তার একটা সত্য নিয়ম থাকা দরকার, নইলে তাকে থাকাই বলে না। যদি সেই নিয়ম থাকে তবে নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকে সে সব সময়ে খাতির করে চলতেই পারে না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত সেই বিশ্বের কাছে তাকে বাধা পেতেই হবে, আঘাত পেতেই হবে। নইলে সে বিশ্ব সত্য বিশ্ব হত না, সত্য বিশ্ব না হলে তাকে আনন্দও দিত না। ইচ্ছা যদি আপনার নিয়মেই আপনি বাঁচত, সত্যের সঙ্গে সর্বদা যদি তার যোগ ঘটবার দরকার না হত, তা হলে ইচ্ছা বলে পদার্থের কোনো অর্থই থাকত না; তা হলে ইচ্ছাই হত না। সত্যকে চায় বলেই আমাদের ইচ্ছা। এমন-কি, আমাদের ইচ্ছা যখন অসম্ভবকে চায় তখনও তাকে সত্যরূপে পেতে চায়, অসম্ভব কল্পনার মধ্যে পেয়ে তার সুখ নেই।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের বিশেষত্বের পক্ষে এমন একটি বিশ্বনিয়মের প্রয়োজন যে নিয়ম সত্য, অর্থাৎ যে নিয়ম আমার বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে না।

বস্তুত আমি আমাকেই সার্থক করবার জন্যেই বিশ্বকে চাই। এই বিশ্ব যদি আমারই ইচ্ছাধীন একটা মায়া পদার্থ হয় তা হলে আমাকেই ব্যর্থ করে। আমারই জ্ঞান সার্থক বিশ্বজ্ঞানে, আমারই শক্তি সার্থক বিশ্বশক্তিতে, আমারই প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে। তাই যখন দেখছি তখন এ কথা কেমন করে বলব 'বিশ্ব যদি বিশ্বরূপে সত্য না হত, সে যদি আমারই বিশেষ ইচ্ছানুগত হয়ে স্বপ্নের মতো হত তা হলে ভালো হত'? তা হলে সে যে আমারই পক্ষে অনর্থকর হত।

এইজন্যে আমরা দেখতে পাই, আমির মধ্যে যার আনন্দ প্রচুর সেই তার আমিকে বিশেষত্বের দিক থেকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। আপনার শক্তিতে যার আনন্দ সে কাজকে সংকীর্ণ করতে পারে না, সে বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে চায়। তা করতে গেলেই বিশ্বের নিয়মকে তার মানতে হয়। বস্তুত এমন অবস্থায় বিশ্বের নিয়মকে মানার যে দুঃখ সেই দুঃখ সম্পূর্ণ স্বীকার করাতেই তার আনন্দ। সে কখনোই দুর্বলভাবে কান্নার সুরে বলতে পারে না 'বিশ্ব কেন আপনার নিয়মে আপনি এমনি স্থির হয়ে আছে, সে কেন আমার অনুগত হচ্ছে না'। বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি স্থির হয়ে আছে বলেই মানুষ বিশ্বক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে। কবি যখন নিজের ভাবের আনন্দে ভোর হয়ে ওঠেন তখন তিনি সেই আনন্দকে বিশ্বের আনন্দ করতে চান। তা করতে গেলেই আর নিজের খেয়ালমত চলতে পারেন না। তখন তাঁকে এমন ভাষা আশ্রয় করতে হয় যা সকলের ভাষা, যা তাঁর খেয়াল মতো একেবারে উলটোপালটা হয়ে চলে না। তাঁকে এমন ছন্দ মানতেই হয় যে ছন্দে সকলের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়, তিনি বলতে পারেন না 'আমার খুশি আমি ছন্দকে যেমন-তেমন করে চালাব'। ভাগ্যে এমন ভাষা আছে যা সকলের ভাষা, ভাগ্যে ছন্দের এমন নিয়ম আছে যাতে সকলের কানে মিষ্ট লাগে, সেইজন্যেই কবির বিশেষ আনন্দ আপনাকে বিশ্বের আনন্দ করে তুলতে পারে। এই বিশ্বের ভাষা বিশ্বের নিয়মকে মানতে গেলে দুঃখ আছে, কেননা সে তোমাকে

খাতির করে চলে না; কিন্তু এই দুঃখকে কবি আনন্দে স্বীকার করে। সৌন্দর্যের যে নিয়ম বিশ্বনিয়ম তাকে সে নিজের রচনার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে চায় না; একটুও শৈথিল্য তার পক্ষে অসহ্য। কবি যতই বড়ো হবে, অর্থাৎ তার বিশেষত্ব যতই মহৎ হবে, ততই বিশ্বনিয়মের সমস্ত শাসন সে স্বীকার করবে; কারণ, এই বিশ্বকে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিশেষত্ব সার্থক হয়ে ওঠে।

মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে এইখানে; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে, এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড়ো রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। বিশ্বের সঙ্গে পশুর যোগ নিজের খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধে; এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই পশুকে আপনার বাইরে যেতে হয়, এই দুঃখের ভিতর দিয়েই সে সুখ লাভ করে। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই, মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানা রকম করে নেয় তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানা রকমে দেয়। তার সৌন্দর্যবোধ তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায়; তা না করতে পেলেই সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব। এ কথা যখন সত্য তখন তুমি যদি বল 'বিশ্বপ্রকৃতি আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে মেনে চলে না বলে আমার দুঃখবোধ হচ্ছে' তখন তোমাকে বুঝে দেখতে হবে—মেনে চলে না বলেই তোমার আনন্দ। বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে প্রতিষ্ঠা। দুঃখের একান্ত অভাব যদি ঘটত, অর্থাৎ যদি কোথাও কোনো নিয়ম না থাকত, বাধা না থাকত, কেবল আমার ইচ্ছাই থাকত, তা হলে আমার ইচ্ছাও থাকত না; সে অবস্থায় কিছু থাকা না-থাকা একেবারে সমান। অতএব, তুমি যখন মাঠে বেড়াচ্ছিলে তখন ঝড়বৃষ্টি যে তোমাকে কিছুমাত্র মানে নি এ কথাকে যদি বড়ো করে দেখি তা হলে এর মধ্যে কোনো ক্ষোভের কারণ দেখি নে। তা হলে এইটেই দেখতে পাই: ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁরই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য তাপ দিচ্ছে, এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হচ্ছে। তারা সহস্রের ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত নয়, একের শাসনে চালিত। এইজন্যেই তারা সত্য, তারা সুন্দর; এইজন্যেই তাদের মধ্যেই আমার মঙ্গল; এইজন্যেই তাদের সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব; এইজন্যেই তাদের কাছ থেকে আমি পাই এবং তাদের মধ্যে আমি আপনাকে দিতে পারি।

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কাল রাত্রে আকাশের গ্রহতারাকে বল্‌গার দ্বারা সংযত করে বিচিত্র বিশ্বরথকে একাকী সেই সারথি নিয়ে গেছেন—রথচক্রের শব্দ ওঠে নি, রাত্রির বিরামের কিছুমাত্র ব্যাঘাত করে নি। আজ নিদ্রা দূর হয়েছে, পাখিরা কুলায়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

আমাদের উৎসব-দেবতা কোলাহল নিরস্ত করেন নি, তিনি মানা করেন নি। তাঁর পূজা তিনি সব-শেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন যাতে লোকে তাঁকে না মেনে থাকতে না পারে। কিন্তু যিনি রাজার রাজা তাঁর কোনো আয়োজন নেই। তাঁকে যে ভুলে থাকে সে থাকুক—তাঁর কোনো তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে সেই তাঁর পূজা করুক—এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেন না তাঁর কাছে কোনো ভয় নেই। বিশ্বের আর সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মানতে হয়। আগুনে হাত দিতে ভয় পাই, কেন না জানি যে হাত পুড়বেই। কিন্তু কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোনো ভয় নেই—তিনি বলেছেন, আমাকে ভয় না করলেও তোমার কোনো ক্ষতি নেই। এই যে আজ এত লোকসমাগম হয়েছে,—কে তাদের চিত্তকে স্থির করেছে? তিনি কি দেখছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্ষিপ্ত? কিন্তু তাঁর শাসন নেই। যাঁদের পদমর্যাদা আছে, রাজপুরুষদের কাছে সম্মান

আছে এমন লোক আজ এখানে এসেছেন। যাঁরা জ্ঞানের অভিমানে মত্ত হয়ে তাঁকে বিশ্বাস করেন না এমন লোক এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তাঁর বসুন্ধরার ধৈর্য তাঁদের ধারণ করে রয়েছে, আকাশের জ্যোতির এক কণাও তাঁদের জন্য কমে নি— সব ঠিক সমান রয়েছে। তাঁর এই ইচ্ছা যে তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু নেবেন না। তাঁর প্রহরীদের কত ঘুষ দিচ্ছি— তারা কত শাসন করছে কিন্তু বিশ্বমন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে সেই কুঁড়ি ফুটবে! যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পূজার অর্ঘ্য ভরছে না— তারি জন্য তিনি যুগযুগান্তর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন। এমনি নির্ভয়ে যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে— এতেও তিনি ধৈর্য ধরে বসে আছেন। এতে তাঁর কোনোই ক্ষতি নেই।

ক্ষতি হচ্ছে আমারই। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদ-মর্যাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। বিষয়ী লোকের জ্ঞানাভিমানী লোকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না— কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তার। এই যে বিশাল বসুন্ধরায় আমরা জন্মলাভ করেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে জ্ঞান নিয়ে কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব? সেই সার্থকতার জন্যই যে তৃষিত হয়ে অন্তরাত্মা বসে আছে। কিন্তু ভয় নেই কোথাও কোনো ভয় নেই। তিনি বলছেন— আমি তো জোর করে চাই নে; যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙবে। ইচ্ছা করে তাঁর কাছে আসতে হবে, এইজন্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বলব— আমার হল না, আমার হৃদয় ভরল না।

কিন্তু এ ভুল তবে রয়েছে কেন? আমাদের এই ভুলের মধ্যেই যে তাঁর উপাসনা হচ্ছে। এরই মধ্যে যিনি সাধক তিনি তাঁর সাধনা নিয়ে রয়েছেন। যাঁদের উপরে তাঁর ডাক গিয়ে পোঁচেছে সেইসকল ভক্ত তাঁর অঙ্গনের কোণে বসে তাঁকে ধ্যান করছেন, তাঁকে ছাড়া তাঁদের সুখ নেই। এ যদি সত্য না হত, তাহলে কি পৃথিবীতে তার নাম থাকত? তাহলে অন্য কথাই সকলের মনের মধ্যে জাগত, তারই কোলাহলে সমস্ত সংসার উত্যক্ত হয়ে উঠত। ভক্তের হৃদয়ের আনন্দজ্যোতির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নিয়ত যোগ হচ্ছেই। এই জনপ্রবাহের ধ্বনির মাঝখানে, এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী কল্লোলের মধ্য থেকে মানবাত্মার অমর বাণী জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের চিরদিনের সাধনার প্রবাহকে সেই বাণী প্রবাহিত করে দিচ্ছে— অতল পঙ্কের মধ্যে থেকে পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠছে। কোথা থেকে হঠাৎ বসন্ত সমীরণ আসে— যখন এসে হৃদয়ের মধ্যে বয় তখন আমাদের অন্তরে পূজার পুষ্প ফুটব ফুটব করে ওঠে। তাই দেখছি যে যদিচ এত অবহেলা, এত দ্বেষ-বিদ্বেষ, চারিদিকে এত উন্মত্ততা, তথাপি মানবাত্মা জাগ্রত আছে। কারণ মানবের ধর্মই তাঁকে চিন্তা করা। মানবের ধর্ম-যে তার চৈতন্যকে কেবল সংসারে বিলুপ্ত করে দেবে তা নয়। সে যে কেবলই জেগে জেগে উঠছে। যারা নিদ্রিত ছিল তারা হঠাৎ জেগে দেখছে যে এই অনন্ত আকাশে তাঁর আরতির দীপ জ্বলেছে, সমস্ত বিশ্ব তাঁর বন্দনা গান করছে। এতেও কি মানুষের দুটি হাত জোড় হবে না? তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানব অন্তরের মধ্যে তপস্বীদের কণ্ঠে স্তবগান উঠছে। অনন্তদেবের প্রাঙ্গণে সেই স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে— শোনো একবার শোনো, সমস্ত মানবের ভিতরে, মানবের নিভৃত কন্দরে যেখানে ভক্ত বসে রয়েছেন, সেইখানে তাঁর বন্দনা-ধ্বনি উঠছে শোনো! এই অর্থহীন নিখিল মানবের কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই একটি চিরন্তন বাণী কালে কালে যুগে যুগে জাগ্রত। তাঁকে বহন করবার জন্য বরপুত্রগণ আগে আগে চলেছেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছেন। সে আজ নয়। আমরা অনন্ত পথের পথিক— আমরা যে কত যুগ ধরে চলেছি। যাঁরা গাচ্ছেন তাঁদের গান আমাদের কানে পোঁছচ্ছে। তাই যদি না পোঁছয় তবে কী নিয়ে আমরা থাকব। দিনের পর দিন কি এমনি করেই চলে যাবে? এই কাড়াকাড়ি মারামারি উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে কি জীবন কাটবে? এই জন্যেই কি জন্মেছিলুম? জীবনের পথে কি এই জন্যেই

আমাদের চলতে বলা হয়েছে? এই যে সংসারে জন্মেছি, চলেছি—এখানে কত প্রেম কত আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে—তা কি আমরা দেখছি না? কেবলই কি দেখব পদমর্যাদা টাকাকড়ি, বিষয়-বিভব—আর কিছুই নয়? যিনি সকল মানবের বিধাতা, একবার তাঁর কাছে দাঁড়াবার কি ক্ষণমাত্র অবকাশ হবে না? পৃথিবীর এই মহাতীর্থে সেই জনগণের অধিনায়ককে কি প্রণাম নিবেদন করে যাব না?

কিন্তু ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি, অন্যমনস্ক হয়ে আছি—তবু বলা যায় না,—শুভক্ষণ যে কখন আসে তা বলা যায় না। তাই তো এখানে আসি। কী জানি যদি মন ফিরে যায়। তিনি যে ডাক ডাকছেন—তাঁর প্রেমের ডাক—যদি শুভক্ষণ আসে, যদি শুনতে পাই! সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি—এই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলে নি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে। 'অসতো মা সদ্‌গময়।' সত্যকে চাই। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চির-কালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

রাত্রি
৭ই পৌষ ১৩২০

দিন তো যাবেই: এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়েছে। কিন্তু, সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে যেটা হবার সেটা হয় নি। দিন তো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলই বলেছে: হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনও তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কিসের মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়! পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে-সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোনো বেদনা নেই। এখনও যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি, এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটি রয়েছে—হয় নি, যা হবার তা হয় নি। কী হয় নি। আমি যা হব বলে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না: আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব, এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠেছে যে হয় নি, হয় নি, দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না, মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে আমি হব। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী-তরুলতার সঙ্গে সমান।

কী নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্ছে। প্রতিদিনের আবর্তনে কী জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। আজ যা হচ্ছে কালও তাই হচ্ছে, এক দিনের পর কেবল আর-এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলছে; ঘানিতে জোতা হয়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোনো নতুন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। এই সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক•অভ্যস্ত কর্মে আমরা কী পাচ্ছি। আমরা কী জড়ো করছি। এই-সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এমনি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে। অভ্যাস, অভ্যাস—তারই জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি; তারই উপরে যে আমাদের একদিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলই মলিনতা জমা হচ্ছে; অভ্যাসকে কেবলই বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে, এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সংকীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, বিশ্ব-ভুবনের আশ্চর্য লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখবার বেলা দেখি উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে

জীবনযন্ত্রের চাকা চালানো। জগৎ জুড়ে শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো কলঙ্কে-মলিন ধূলিতে-আচ্ছন্ন সেই একটুমাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমার টাকা রাখব, আসবাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ির ভিত কাটব। সেখানে তাঁকে বলি, তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পারব না, তোমাকে ওখান থেকে নির্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষেরই কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হল। আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আর-সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়, তারা অনাদর সইতে পারে না। আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই বলেছি, তোমাকে দিতে পারব না।

১১ মাঘ ১৩২০

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে; কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে। না, তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব, আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এইজন্যে যে তিনি যুগ যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি। আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্যশ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে। তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনও বাকি। বাষ্প-আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটে নি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প-আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। তাঁর সেই রচনাকার্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন; কিন্তু আমরা কেবল খাব, পরব, সঞ্চয় করব, এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলেম। অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেছি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য ফুটেছিল। জগৎ-সংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম, অভাবকে তো কিছু পূরণ করেছি, কিছু অজ্ঞান দূর করেছি। এই কথাটি তো বলে যেতে হবে। এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাকব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না কিছু দিতে পেরেছি।

শিল্পী কী করে। সে কেন শিল্প রচনা করে। বিধাতা বলেছেন, আমি এই-যে উৎসবের লণ্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কি আল্পনা আঁকবে না। আমার রোশনচৌকি তো বাজছেই, তোমার তম্বুরা, কি একতারাই না হয়, তুমি বাজাবে না? সে বললে, হাঁ, বাজাব বৈকি। গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিলল অমনি ঠিক গানটি হল। যে লোক মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে সে কিছুই নয়। কিন্তু, শিল্পী

কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য নিল, কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরই জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে, কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন 'এষঃ' এই-যে তিনি, সেখানে তো কোনো কথা বলা চলে না। 'সীমা' শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা 'অসীম' শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু অসীম তো 'না' নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ'। তাই তো তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়। ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন— কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে; মৃত্যুর 'না' দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে 'হাঁ'।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্ছেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্ছে। সমস্ত স্খলিত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্ছে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্তন সমস্ত গতায়াতসত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানছি; নিরন্তর সমস্ত চলে-যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করছে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখছি; কখনো আজ কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়। তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে। যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন-কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করে নি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে— কিন্তু, সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন তাঁরাই বলেছেন : এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এ তো জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই-যে ইনি, এই-যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরম গতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। তিনি এক দিকে যেমন গতি আর-এক দিকে তেমনি আশ্রয়, এক দিকে যেমন সাধনার ধন আর-এক দিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

সন্ধ্যা
১১ মাঘ ১৩২০

আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তা হলে কখনই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না— বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ— তেমনি অনন্তস্বরূপের প্রকাশও তো আমার সংগ্রহ করা উপকরণের অপেক্ষা

করে নি; তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করছেন। যখনই তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করছেন তখনই তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাত তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা তো আমারই, বনের শ্যামল শোভা তো আমারই—ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে। ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সংগীত উঠেছে সে সংগীত কার জন্যে। আর, এই তো রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর-দক্ষিণ-হস্ত-ধরা বন্ধু, এই তো ঘরে বাহিরে যাদের ভালোবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্ছে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন। এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আল্পনা-আঁকা বরণবেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করছেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব। সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে। তবে তো বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেছে তাইতে তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কী বলেছে, তার থেকে তুমি কী বুঝলে। সে বললে, সে কথা তো আমাদের মাস্টারমশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাস্টারমশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে, রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়, মাস্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর-একটা কথা বসানো, 'সুশীতল' শব্দের জায়গায় 'সুস্নিগ্ধ' শব্দ প্রয়োগ করা। এপর্যন্ত মাস্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে। যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি। এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না। সেও বলে আমি বুঝি নে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ শহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভুগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'নদী জিনিসটা কী—তুমি কখনো কি দেখেছ' সে বললে, না। ভুগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে; এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভুগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগ্‌জ্যামিন-পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাস্টারমশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নে, দেখতে পেলুম না। বোঝবার আছে কী? এই-যে এষঃ,

এই-যে এই। এই-যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই-যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়ছে, এই-যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রঙ ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠেছে; এই-যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠছে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর ঐ-যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কষা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠছে— এই তো এষঃ, এই তো এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে বিজয়কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি— সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং, সেই কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই-যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীরভাবে পূর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদিঅন্তে পরিব্যাপ্ত সেই-যে 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে— পিতা মাতা বন্ধু— সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোটো করে আপন হাতে আপনার মতো ক'রে গড়েছি তখন কী যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না। যখন আমরা বলেছি 'আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্যে ছোটো করব তখনই আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি। তখন টুকরো কেবলই হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থামতে চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মতো স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরোতে কেবলই ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়। থামার সীমাই হচ্ছে আমাদের মৃত্যু; আরওর পরে আরওই হচ্ছে আমাদের প্রাণ— সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়তসাধনার দিক। সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোটো করতে গিয়ে পূজনীয়কে একপ্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর-এক বিপদে গিয়ে পড়ে— আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পেঁছিতে পারে না, অথবা পেঁছিতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে অসীমকে কেবলমাত্র ছোটো করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড়ো করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়; তাঁকে শুধু ছোটো করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড়ো করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোটো হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনি আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের

তার এক সুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনই এ কথা সত্য হয়েছে তখনই এ কথাও সত্য— অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। এক দিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-এক দিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; এক দিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-এক দিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এইজন্যেই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই; সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়— বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে। মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে। কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো হয় কোনো পূর্বপিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু, তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অংগের উচ্ছেদ-সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে এক দিকে আনন্দের দ্বারা অন্যদিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না— জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে, তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম : আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে! সে আরও গেয়েছিল : আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে! তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিংবা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কী

অর্থ বোঝে। কেননা, অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে, ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বৈকি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেইজন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেছে : খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়! আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে-একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ; তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে : আমার মনের মানুষ কে রে! আমি কোথায় পাব তারে! সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না। তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বন্ধ হবে না। কোথায় পাব তারে। কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না; স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া, আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে। এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে 'আমি কোথায় পাব তারে'। সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্যলাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায়, পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই-যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ তো কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না, জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে—ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে দিকেই মানুষ বলেছে 'আমি চিরকালের মতো পৌঁচেছি' 'আমি পেয়ে বসে আছি', এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই-যে তার চিরকালের গান : আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে! এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন : মনের মানুষ যেখানে বলো কোন্

সন্ধানে যাই সেখানে! কেননা, সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

১১ মাঘ ১৩২০

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন। সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে। সে কত পূজার অর্ঘ্য কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে। তাই মানুষ অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে কত জাদুমন্ত্র পড়েছে তার ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুকরো টুকরো হয়ে দেখা দিচ্ছে তাদের সমস্তকে অধিকার করে এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে সত্য। অর্থাৎ, যা-কিছু দেখছি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখি নে কেন। কেননা, সে যে কিছুর সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে যদি হত 'একটি' তা হলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে কোনো একটা জায়গায় দেখতে পেতুম। কিন্তু সে যে হল 'এক', তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ করে দেখবার জো রইল না।

এত বড়ো আবিষ্কার মানুষ আর কোনো দিন করে নি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কী। বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ—তাতে বলছে জগতে কোনো জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করছে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তার পরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয় এ কথা বার বার চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু, যেগুলি মানুষের অমৃতবাণী সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরও বেড়ে চলে। মানুষের সেইরকম একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কিন্তু, মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে। কোথাও কিছুই তো স্থির হয়ে নেই, দেখতে দেখতে এক আর হয়ে উঠছে। আজ আছে বীজ, কাল হল অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই সমস্ত অরণ্য স্লেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজিবিজির মতো কতবার মাটির উপর থেকে মুছে যাচ্ছে। পাহাড়-পর্বতকে আমরা বলি ধ্রুব; কিন্তু সেও যেন রঙ্গমঞ্চের পট, এক-এক অঙ্কের পর তাকে কোন্ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র সূর্য তারাও যেন আলোকের বুদ্‌বুদের মতো অন্ধকারসমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে ওঠে আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এইজন্যেই তো সমস্তকে বলি সংসার, আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোন্‌খানে।

সত্যের তো প্রকাশ এমনি করেই, এই চিরচঞ্চলতায়। নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গিও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানাখানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে 'আমি নাচ দেখছি'। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গিই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গিকেই মুখ্য করে দেখছি নে; আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুশি হয়ে উঠছি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পড়ে থাকে; কিন্তু যে গাড়ি চলছে তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়তপ্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই, তবেই সে চলে। অর্থাৎ, তার

দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার ক'রে, তাদের যুক্ত ক'রে, তাদের অতিক্রম করে যদি সত্য না থাকে তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলই বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বলছে সমস্তই স্বপ্ন নয় বলছে সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ— অতি ভীষণ। সে হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে নয় ভীষণ বিশ্বের দেবতাকে দারুণ উপচারে খুশি করবার আয়োজন করছে। কিন্তু, যে লোক সমস্ত তরঙ্গের ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গির ভিতরকার নাচটি, সমস্ত সুরের ভিতরকার সংগীতটি দেখতে শুনতে পাচ্ছে সেই তো আনন্দের সঙ্গে বলে উঠছে সত্যং। সেই জানে, বৃহৎ ব্যাবসা যখন চলে তখনই বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে দেউলে হয়ে অচল হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনই তা সম্ভব। সংসারের সমস্ত-কিছু চলছে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উল্টো কথা। আসল কথা সত্য বলেই সমস্ত চলছে। তাই আমরা চারি দিকেই দেখছি সত্তা আপনাকে স্থির রাখতে পারছে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চলে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন করে। এ তো তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না; এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখেছি। সত্যের রহস্য সব চেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায় পশুপাখিতে। সত্য যে প্রাণস্বরূপ তা এই পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্রে পত্রে লেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি একটি বিরাট প্রাণ না থাকত তবে তার এই জগৎজোড়া লুকোচুরি খেলায় সে তো একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই ঘাসটুকুর মধ্যে আমরা কী দেখছি। যেমন গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি। বৃহৎ অঙ্গের ধ্রুপদ গান চলছে; চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করছে মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক-একটি ছোটো ছোটো তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্যে ঢাকা আছে, ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্পপরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের তত্ত্বটি কী তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বারা তাকে আটেঘাটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সবচেয়ে শক্ত যাকে আমরা সবচেয়ে সহজে বুঝেছি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেইজন্যে তাকে বোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। এক দিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; আর-এক দিকে সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্তমানকে অতিক্রম করে প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্তে আছে। বস্তুত সেই বর্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্তে না থাকা এবং বর্তে থাকা, এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ন্যায়শাস্ত্রেই আছে— আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই তো চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে মুক্তি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমাদের কেউ অহল্যার মতো পাথর করে স্থির করে রাখে তবে বুঝি যে সেটা আমাদের অভিশাপ। আবার যদি আমাদের প্রাণের মুহূর্তগুলিকে কেউ চকমকি-ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মতো বর্ষণ করতে থাকে তা হলে সে প্রাণকে আমরা একখানা করে পাই নে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত, যা আপনাকে আপনি কেবল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে, যা অসীমকে সীমায়

আকারবন্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমরা নিখিলের প্রাণরূপে জানতে পারছি। বুঝতে পারছি এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সকলকে অতিক্রম করে আছে বলে বিশ্বসংসার কেবলই চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এইজন্য জগতে স্থিরত্বই হচ্ছে বিনাশ, কেননা স্থিরত্বই হচ্ছে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এইজন্যেই বলা হয়েছে : যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যে-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ। আর, অপ্রাণ কোথাও নেই? অপ্রাণ আছে, কেননা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, সেই অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্রাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা ফেলা একটা বাধায় ঠেকে। কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও এক দিকে বাধা, আর-এক দিকে বাধামোচন। সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয়; সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ; সেই দিকেই সে সমস্তকে মেলাচ্ছে এবং চালাচ্ছে।

যেদিন এই কথাটি আমরা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পেরেছি সেদিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিক্ষার দিন নয়; সেদিন কোনো উচ্ছৃঙ্খল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সেদিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য বলে আনন্দিত হবার দিন।

সেদিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু, সত্যের পূজা তো কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে তো বর পাবার জো নেই। সত্য প্রাণময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বর পাচ্ছে, তার দৈন্য দূর হচ্ছে, তার তেজ বেড়ে উঠছে। কোথায় দেখেছি? যেখানে মানুষের চিত্ত অচল নয়, যেখানে তার নব নব উদ্যোগ, যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি, যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছেঁদে স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে মুক্ত রাখবার জন্যে সর্বদাই সচেতন। জ্বালানি কাঠ যখন পূর্ণতেজে জ্বলে না তখন সে ধোঁয়ায় কিংবা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে। তেমনি দেখা গেছে, যে জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলই বাঁধতে চেয়েছে তার সত্য সকল দিক থেকেই ম্লান হয়ে এসে তাকে নির্জীব করে; কেননা সত্যের ধর্ম জড়ধর্ম নয়, প্রাণধর্ম—চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে তখনই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারি দিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে; তখন তার রথ পর্বত লঙ্ঘন করে, তার তরণী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সংকটের মধ্যে ঘা পেতে থাকে বটে, কিন্তু নুড়ির ঘা খেয়ে ঝর্নার কলগান যেমন আরও জেগে ওঠে তেমনি ব্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর, যারা মনে করে স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলই জমে ওঠে, নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটাখেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম। নিজের দুর্গতির জন্যে তারা পরকে অপরাধী করতে চায়, এ কথা ভুলে যায় যে যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিল সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কী তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব? যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারলে না সেইখানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী তবে কোথায় যাব? যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয় সেইখানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে, সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে

দেখতে পাই—কেননা মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়—যেখানে আজও সে পৌঁছোয় নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়। তার ভিতরকার সত্য তাকে চলার দ্বারাই জানাচ্ছে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

আমাদের যে বিকাশ সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, সে জানার বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

যে সত্য কেবলই হয়ে উঠছে মাত্র অথচ সেই হয়ে ওঠা আপনাকেও জানছে না, কাউকে কিছু জানাচ্ছেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমনি জ্বলে অমনি যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারে নি বলেই মানুষ বলেছে : সত্যং জ্ঞানং। সত্য সর্বত্র, জ্ঞানও সর্বত্র। সত্য কেবলই জ্ঞানকে ফল দান করছে, জ্ঞান কেবলই সত্যকে সার্থক করছে—এর আর অবধি নেই। এ যদি না হয় তবে অন্ধ সৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

১৫ মাঘ ১৩২০

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু; এই তো হল জগৎ। চার দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে; স্বাভাবিক এই কাজ। অর্থাৎ, আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে : এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলেছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না, যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত।

যেমন প্রদীপের মুখের ছোটো শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ, তেমনি আমার জানাও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, আমার জ্ঞানের জোরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু, এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত তবে এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার করে বলে 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি'; কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেইজন্যে যেদিন মানুষ বললে সত্যং সেইদিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরে সর্বত্র দেখতে পেলে। যেদিন বললে জ্ঞানং সেইদিন সে বুঝলে যে সে যা-কিছু জানছে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে সমস্তই একটি বৃহৎ জানার মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এইজন্যই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে তার শক্তির এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবলই বেড়ে চলবে, কোথাও সে থেমে যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ জাদুমন্ত্র পৌরোহিত্যের শরণ নিতে হবে না।

মানুষ আপনার সত্যের অনুভবে সত্যকে সর্বত্র দেখছে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্বত্র জানছে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলেছে : অনন্তং ব্রহ্ম।

কোথায় সেই পরিচয়। যখনই কোনো বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে

তখনই আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়! তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এইজন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়, আমাদের সমস্ত নিত্যকীর্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই মানুষ বলেছে : ভূমৈব সুখং, ভূমাই আমার সুখ; ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকেই আমার জানতে হবে; নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না। এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না; এইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটো করে জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কারের ধূলিজালে আবৃত সেখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে কৃপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বলতে, অক্ষম বলতে, লজ্জা বোধ করে না। সত্যকে মতে মানি, কিন্তু কাজে করতে পারি নে এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সংকোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল-অনুষ্ঠানও বাহ্য-আচার-গত হয়ে ওঠে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এই জন্যই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না। সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ 'আনন্দরূপমমৃতং' আপনার আনন্দ-রূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মতো আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে মানুষ অনন্তস্বরূপকে বলেছে 'আত্মদা', তিনি আপনাকে দান করছেন, সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

এই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে। তার উত্তর এই যে, আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই, তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই সীমা অসীমকেই প্রকাশ করছে। সীমায় সত্য নিশ্চল নেই। ব্রহ্ম সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়েরই অতীত, তাঁর মধ্যে রূপ এবং অরূপ দুইই সংগত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে 'বলদা', তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে; আবার আত্মদা, সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটে নি—সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ সরূপের, অপরূপ মিলন ঘটে গেছে। সত্যং এবং অনন্তং অনির্বচনীয়রূপে পরস্পরের যোগে একই কালে প্রকাশমান হচ্ছে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে, সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দ-মিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটোর মধ্যে দেখতে পাই। এই রহস্যটি রবিচন্দ্রতারার পর্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে; এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্যযোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজস্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মাপরমাত্মার একাত্ম মিলনে শান্তং শিবম-দ্বৈতম্ রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠছে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত চাঞ্চল্যের মর্মনিহিত শান্তি; এই মঙ্গল দ্বন্দ্ববিহীন নির্জীব মঙ্গল নয়, সমস্ত দ্বন্দ্বমন্থনের আলোড়ন-জাত মঙ্গল; এই অদ্বৈত একাকারত্বের অদ্বৈত নয় সমস্ত বিরোধবিচ্ছেদের সমাধানকারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি 'বলদা আত্মদা'; সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্যে দিয়েই তিনি কেবলই আপনাকে দান করছেন।

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই-যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে এসেছে 'মা মা হিংসীঃ : আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো'—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যে শারীরিক মৃত্যু তার নিশ্চিত ঘটবে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক প্রার্থনা করে তার কোনো লাভ নেই। সে জানে মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত সত্য আর নেই, দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন না একদিন ঘটবেই। এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু, সে যখন বলেছে 'আমাকে বিনাশ কোরো না' তখন সে যে কী বলতে চেয়েছে তা তার অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এমন যদি হত যে তার শরীর চিরকাল বাঁচত, তা হলেও সেই বিনাশ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কারণ, সে যে প্রতি মুহূর্তের বিনাশ। সে যে কত রকমের মৃত্যু একটার পর একটা আমাদের জীবনের উপরে আসছে। ক্ষুদ্র কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখদুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে যে প্রতিদিনই আমরা মরছি। যে গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তারই মধ্যে জীবন কত মরা মরছে, কত প্রেম কত বন্ধুত্ব মরছে, কত ইচ্ছা কত আশা মরছে—এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের মধ্যে এই মৃত্যুর ব্যথা যে আমাদের ভোগ করতে হয় তার কারণ হচ্ছে আমরা দুই জায়গায় আছি। আমরা তাঁর মধ্যেও আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আমাদের এক দিকে অনন্ত, অন্য দিকে সান্ত। সেইজন্য মানুষ এই কথাই ভাবছে, কী করলে এই দুই দিককেই সে সত্য করতে পারে। আমাদের এই সংসারের পিতা, যিনি এই পার্থিব জীবনের সূত্রপাত করে দিয়েছেন, তাঁকে শুধু পিতা বলে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই। কারণ আমরা যে জানি যে, এই শারীরিক জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে। আমরা তাই সেই আর-একজন পিতাকে ডাকছি যিনি কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের নয়, কিন্তু চিরজীবনের পিতা। তাঁর কাছে গেলে মৃত্যুর মধ্যে বাস করেও আমরা অমৃত-লোকে প্রবেশ করতে পারি, এই আশ্বাস কেমন করে যেন আমরা আমাদের ভিতর থেকেই পেয়েছি। এইজন্যই পথ চলতে চলতে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে উপরের দিকে তাকায়। এইজন্যই সংসারের সুখ-ভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে তার অন্তরের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে এবং তখন ইচ্ছাপূর্বক সে পরম দুঃখকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেন। কারণ, সে বুঝতে পারে মানুষের মধ্যে কতবড়ো সত্য রয়েছে, কতবড়ো চেতনা রয়েছে, কতবড়ো শক্তি রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মরছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত, তার উপর আসবেই আসবে—কে তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু, যেমনি সে তার সমস্ত দুঃখ-আঘাতের মধ্যে সেই অমৃতলোকের আশ্বাস পায় অমনি তার এই প্রার্থনা আর-সকল প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে ওঠে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে বাঁচাও বাঁচাও প্রতিদিনের হাত থেকে, ছোটোর হাতের মার থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বড়ো আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার হাত থেকে নিয়ে যাও। তোমার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে আমার জীবন যেতে চাচ্ছে। আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে প্রতিদিন আপনার অহমিকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমার কোনো আনন্দ নেই। মা মা হিংসীঃ। আমাকে বিনাশ থেকে বাঁচাও।

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল! অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। পীস কন্‌ফারেন্স, শান্তিস্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে

এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে: মা মা হিংসীঃ। পিতা, তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কখনো এটা সত্য হতে পারে না যে, মানুষ কেবলমাত্র আপনার ভিতরেই আপনার সার্থকতাকে পাবে।

আমরা আজ এই পাপের মূর্তি যে কী প্রকাণ্ড তা কি দেখব না। এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এ কথা কি আমরা বুঝব না। আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলছি। এ পাপ কতদিন ধরে জমছে, কত যুগ ধরে জমছে। প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছি নে। বহু শতাব্দী থেকে আমরা কি কেবলই মরছি নে। সেইজন্যই তো এই প্রার্থনা : মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও, এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও। এই-সমস্ত দুঃখশোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্ট হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপরে জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা বাঁচব। সেইখানে আমাদের মুক্তি দাও।

আজ অপ্রেমঝঞ্ঝার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে, এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই-যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি— সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠেছে : মা মা হিংসীঃ। মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। কে বাঁচাবে। পিতা নোহসি। তুমি যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাঁচাও। তোমার বোধের দ্বারা বাঁচাও। তোমাকে সকল মানুষ মিলে যেদিন নমস্কার করব সেই দিন নমস্কার সত্য হবে। নইলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নমস্কার করতে হয় সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাও। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। মা মা হিংসী। বিনাশ থেকে রক্ষা করো।

২০ শ্রাবণ ১৩২১

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময়ে মুখের কথা হয়; কারণ, চারি দিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছয় না। কিন্তু, ইতিহাসের মধ্যে জীবনের মধ্যে, এমন এক-একটি দিন আসে যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। তখনই এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয় : বিশ্বানি দেব সবিতার্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারি না 'আমাদের পাপ ক্ষমা করো'; কারণ, তিনি ক্ষমা করেন না, তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা : তুমি মার্জনা করো। যেখানে যত কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারংবার রক্তস্রোতের দ্বারা, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা, সেখানে তিনি মার্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্বলের ভীরুর প্রার্থনা, সে প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছবে না।

আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রতেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু-আধটু খবর পাই তার পশ্চাতে কী অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি। যে হানাহানি হচ্ছে তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে। ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এইজন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর; কারণ, যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ, সে যদি বেদনা পেত তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়; কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক-একসময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে : যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না; সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না। সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠেছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন; সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ী ছিন্ন হয়ে যাবে। যার চিত্তত‌ন্ত্রীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে।

তাই বলছি যে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে যে একটি পরম বেদনা পরম প্রেম আছেন তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গায় বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে। এই কথাটি আজ বিশেষভাবে অনুভব করো।

তাই এ কথা আজ বলবার কথা নয় যে 'অন্যের কর্মের ফল আমি কেন ভোগ করব'। 'হাঁ, আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী ভোগ করব' এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি করো, তপস্যা করো, দুঃখকে গ্রহণ করো।

৯ ভাদ্র ১৩২১

আরও চাই, আরও চাই— এই গান উৎসবের গান। আমরা সেই ভাণ্ডারে এসেছি যেখানে আরও পাব। পৃথিবী ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, মানুষের ঘর স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মীর কোলে মানুষ

জন্মেছে। সেখানে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে। এক-একদিন আর বাইরে এসে 'আরও'র ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মানুষের উৎসব।

একদিন মানুষ পৃথিবীতে দেবতাকে বড়ো ভয় করেছিল। কে যে প্রসন্ন হলে জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে, কে যে অপ্রসন্ন হলে দুর্যোগ উপস্থিত হয়, তা মানুষ কোনোমতেই সেদিন ভেবে পায় নি। যে শক্তির সঙ্গে আত্মার যোগ নেই তাকে প্রসন্ন রাখবার জন্য বলির পশু নিয়ে তখন ভয়াতুর মানুষ একত্র মিলেছে। তখনকার সেই ভয়ের পুজো তো উৎসব নয়। ডাকাতের হাতে পড়লে যেমন ভীরু বলে ওঠে 'আমার যা আছে সব দিচ্ছি কিন্তু আমায় প্রাণে মেরো না' তেমনি পৃথিবীর মধ্যে অদৃশ্য শক্তিকে খুশি রাখবার জন্য সেদিন মানুষ বলেছিল : 'আমি তোমাকে সব দেব, তুমি আমায় সংকটে ফেলো না।' কিন্তু, সে তো আনন্দের দান নয়। আনন্দের দেবতাকে উপলব্ধি করলে আর ভয় নেই। কারণ, এই আনন্দের দেবতাই যে 'আরও', এই তো সকলকে ছাড়িয়ে যায়। যা-কিছু পেয়েছি বুঝেছি তার চেয়ে তিনি আরও; যা পাই নি, হারিয়েছি, তার চেয়েও তিনি আরও। তিনি ধনের চেয়ে আরও, মানের চেয়ে আরও, আরামের চেয়ে আরও। তাই তো সেই আরও'র পুজোয়, আরও'র উৎসবে মানুষ আনন্দে বলেছে : আমার ধন নাও, প্রাণ নাও, সম্মান নাও। অন্তরে এবং বাহিরে মানুষের এই-যে আরওকে জানা এ বড়ো আরামের জানা নয়। যেদিন মানুষ জেনেছে যে সে পশু নয়, তার দেবতা পাশব নয়, সে বড়ো, তার দেবতা বড়ো, সেদিন সে যে পরম দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েছে। সেদিন মানুষ যে বিজয়ী, মানুষ যে বীর, তাই সেই বিজয়লাভের জয়োৎসব সেদিন হবে না? পাখি যেমন অন্ধকারের প্রান্তে জ্যোতির স্পর্শ-মাত্রে অকারণ আনন্দে গেয়ে ওঠে তেমনি যেদিন পরম জ্যোতি তাকে স্পর্শ করেন সেদিন মানুষও গেয়ে ওঠে। সেদিন সে বলে : আমি অমৃতের পুত্র। সে বলে : বেদাহমেতং, আমি পেয়েছি। সেই পাওয়ার জোরে নিজের মধ্যে সেই অমৃতকে অনুভব করে ভয়কে সে আর ভয় করে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে : আমার পথ সামনে, আমি পিছু হটব না, আমার পরাজয় নেই— রুদ্র তোমার প্রসন্নতা অন্তহীন।

একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে। সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখছে, কী প্রলয়ের বিভীষিকা! সেখানে এই বিভীষিকার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে। সেখানে ইতিহাসের ডাক এসেছে, সেই ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। কে ভুল করেছে, কে ভুল করে নি, এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী, সে কথা দূরের কথা। কিন্তু, ইতিহাসের ডাক পড়েছে; সে ডাক জার্মান শুনেছে, ইংরেজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পুজো গ্রহণ করবেন; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে তা হবে না, ইতিহাস-বিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এত দিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন, এ স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না। যেমনি এই হুকুম পোঁচেছে অমনি কামানের গোলা দুই পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। বীরের দল ইতিহাসবিধাতার পুজোয় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে। যারা আরামে ছিল তারা আরামকে ধিক্‌কার দিয়ে বলে উঠেছে, প্রাণকে আঁকড়ে থাকব না, প্রাণের চেয়ে মানুষের মধ্যে আরও আরও বেশি আছে। কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে। মা কেঁদে উঠেছে, স্ত্রীপুত্র অনাথ হয়ে বক্ষে করাঘাত করছে। সেই কান্নার উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে উৎসব হচ্ছে; বাণিজ্য ব্যবসায় চলছিল, ঘরে টাকা বোঝাই হচ্ছিল, রাজ্যসাম্রাজ্য জুড়ে প্রতাপ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল— ডাক পড়ল বেরিয়ে আসতে হবে।

মহেশ্বর যখন তাঁর পিণাকে রুদ্র নিশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে 'যাও'। স্ত্রীকে কেঁদে নিজের হাতে স্বামীকে বর্ম পরিয়ে দিতে হয়েছে। সমুদ্রপারে আজ মরণযজ্ঞে সেই প্রাণের মহোৎসব।

সেই উৎসবের ধ্বনি আমাদের উৎসবের মধ্যে কি আজ এসে পৌঁছয় নি। ভীত মানুষ, আরামের জন্য লালায়িত মানুষ, যে প্রতিদিন তুচ্ছ স্বার্থটুকু নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করে মরেছে, কে তার কানে এই মন্ত্র দিলে 'সব ফেলে দাও—বেরিয়ে এসো'। যাঁর হাতে আরও'র ভাণ্ডার তিনিই বললেন, 'যাও মৃত্যুকে অবহেলা করে বেরোও দেখি!' বিরাট বীর মানুষের সেই পরিচয়, যে মানুষ আরো'র অমৃতপানে উন্মত্ত হয়েছে সেই মানুষের পরিচয়, আজ কি আমরা পাব না। আমরা কি এ দেশে অজ্ঞানদেবতা উপদেবতার মন্দির তৈরি করে ষোড়শোপচারে তার পূজা করি নি। তার কাছে মানুষের বুদ্ধিকে শক্তিকে বলি দিই নি? যে অজ্ঞানমোহে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে দূরে পরিহার করে সেই মোহের মন্দির, সেই মূঢ়তার মন্দির কি আমাদের ভাঙতে হবে না। আমাদের সামনে সেই লড়াই নেই? আমাদের মার খেতে হবে আত্মীয়স্বজনের। আমরা দুঃখকে স্বীকার করব, আমরা অপমান নিন্দা বিদ্রূপের আঘাত পাব, তাতে আমরা ভয় করব না।

আজ জগৎ জুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে তার মধ্যে ভয়ের সুর নেই; তার ভিতর দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, তারই মধ্যে ইতিহাসবিধাতার আনন্দ। সে ক্রন্দন তাঁর মধ্যে শান্ত। সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতম্-এর মধ্যে মৃত্যু মরেছে। তিনি নিজের হাতে মানুষের ললাটে জয়তিলক পরিয়েছেন। তিনি বিচ্ছেদবিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন। যাত্রীরা যেখানে যাত্রা করেছে, মৃত্যুর ঝংকার যেখানে প্রতিধ্বনিত, সেইখানে দেখো সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। আজ সেই রুদ্রের দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। রুদ্রের প্রসন্ন হাসি তখনই দেখা যায় যখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর বীর সন্তানেরা দুঃখকে অগ্রাহ্য করেছে। তখনই তাঁর সেই প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হয়ে সত্যজ্যোতিতে অভিষিক্ত করে দেয়। রুদ্রের সেই প্রসন্নতা আজ উৎসবের দিনে আমাদের জীবনের উপরে বিকীর্ণ হোক।

প্রাতে
৭ পৌষ ১৩২১

পুত্র কখনো কখনো পিতার জন্মোৎসব করে থাকে, সংসারে এমন ঘটনা ঘটে। সেদিন পুত্র মনে ভাবে যে তার পিতা একদিন শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন যেন তার ঘরে সে নূতন করে তার পিতার জন্মব্যাপারকে অনুভব করে। পিতাকে সে যেন নিজের পুত্রের মতো লাভ করে। এ যেমন আশ্চর্য তেমনি আশ্চর্য বিশ্বপিতা যেদিন জন্মগ্রহণ করেন আমাদের ঘরে। যিনি অনন্ত ভুবনের পিতা তিনি একদিন আমার অন্তরের ভিতরে চৈতন্যের মধ্যে জন্মলাভ করবেন; তিনি আসবেন। পিতা নোঽসি। পিতা তুমি পিতা হয়ে আছ, আমার জীবনকে তোমার মহাজীবনে আলিঙ্গন করে আছ, যুগ হতে যুগে লোক হতে লোকান্তরে আমায় বহন করে এনেছ। পিতা নো বোধি। কিন্তু, আমার বোধের মধ্যে তো তোমার আবির্ভাব হয় নি। সেই বোধের অপেক্ষায়, আমার উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় যে তাঁকে থাকতে হয়। যেদিন আমার বোধের মধ্যে পিতা-রূপে তাঁর আবির্ভাব হবে সেদিন পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠবে। ভক্তের চৈতন্যে সেদিন যে তাঁর নবজন্মলাভ।

সংসারের সুখে দুঃখে যখন তরঙ্গায়িত হচ্ছি চৈতন্যের মধ্যে তখন আমরা পিতৃহারা। জীবধাত্রী বসুন্ধরা পিতার সিংহাসন বহন করছে; প্রাণের ভাণ্ডার অন্নের ভাণ্ডার সেখানে পরিপূর্ণ। কিন্তু, অন্তরে যে দুর্ভিক্ষ, সেখানে যে পিতা নেই। সে বড়ো দৈন্য, সে পরম দারিদ্র্য। যিনি রয়েছেন সর্বত্রই, তাঁকে আমি পাই না। পাই না, কারণ ভক্তি নেই। যুক্তি খুঁজে পাওয়া সহজ, কিন্তু ভক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দ সহজ না হলে পাওয়া যায় না। উপনিষদে বলে, মন বাক্য তাঁকে

না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে তার আর ভয় নেই। তাঁকে দেখা উৎসবের মধ্যে দেখা; জ্ঞানে নয়, তর্কের মধ্যে নয়। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই পাবার উপায় নেই।

এই-যে উৎসবের আলোক জ্বলছে একে কি তর্ক করে কোনোমতেই পাওয়া যেত। চোখের মধ্যে আলো পাবার আনন্দ আছে, তাই তো চোখ আলো পায়; চোখ যে আলোর জন্য লালায়িত। এক সময়ে জীবের তো চক্ষু ছিল না; চক্ষু কেমন করে ক্রমে জীবের অভিব্যক্তিতে ফুটল? জীবের মধ্যে আলোককে পাবার তৃষ্ণা ছিল, দেহীর দেহের পর্দার আড়ালে বিরহীর মতো সেই তৃষ্ণা জেগে ছিল; তার সেই দীর্ঘ বিরহের তপস্যা সহসা একদিন চক্ষুবাতায়নের ভিতরে সার্থক হল। আলোকের আনন্দদূত তার চোখের বাতায়নে এল। আলোককে পাবার আনন্দের জন্য তপস্যা ছিল; সেই তপস্যা অন্ধ জীবের অন্ধকার দেহের মধ্যে চক্ষুকে বিকশিত করে স্বর্গের আলোকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। সেই একই সাধনা অন্ধ চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে; আত্মা কাঁদছে সেখানে। যতদিন পর্যন্ত অন্ধ জীব চক্ষু পায় নি সে জানত না তার ভিতরে আলোকবিরহী কাঁদছিল; সে না জানলেও সেই কান্না ছিল বলেই চোখ খুলেছে। অন্তরের মধ্যে চৈতন্যগুহায় অন্ধকারে পরম-জ্যোতির জন্য তপস্যা চলেছে। এ কথা কখনোই সত্য নয় যে কোনো মানুষের আত্মা ধনজনের জন্য লালায়িত। মগ্নচৈতন্যের অন্ধকারময় রুদ্ধ বাতায়নে বিরহী আত্মা কাঁদছে; সেই কান্না সমস্ত কোলাহলের আবরণ ভেদ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত উঠেছে। আনন্দ যেদিন আসবে সেদিন চোখ মেলে দেখব সেই জ্যোতির্ময়কে। সেদিন তিনি আমার ভবনে আসবেন এবং বিশ্বভুবনে তার সাড়া পড়ে যাবে।

৭ পৌষ ১৩২১

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে!

তিনি যে চেয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে, আমার অন্তরের মাঝখানে, এ কি উপলব্ধি করব এইখানে। এ-সব কথা কি এই কোলাহলে বলবার কথা। তারার আলোকে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে, ভক্তের অন্তরের নিস্তব্ধলোকে, যখন অনন্ত আকাশ থেকে একটি অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টি পড়ে তখন সেই নিঃশব্দ বিরলতার মধ্যেই এই পরম আনন্দের গভীর বাণী জেগে উঠতে পারে—এই কথাই মনে হয়। কিন্তু তা নয়, সেই বিরলতার মধ্যেই যে সাধকের উৎসব সম্পূর্ণ হয় তা কখনোই সত্য নয়। মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনাবেচার বিচিত্র লীলা চলেছে, এরই মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই, তাঁর পূজার গীত উঠেছে—এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনোই তাঁর উৎসব নয়। আকাশের তারায় তারায় যে সংগীত উঠছে যুগ যুগান্তর ধরে সে সংগীতের কেবলই পুনরাবৃত্তি চলেছে। সেখানে কোনো কোলাহল নেই, ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই; নক্ষত্রলোকে যেন বিশ্বরূপ বাউল তার একতারার একটি সুর ফিরে ফিরে বাজাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জগতে যে গান উঠছে সে কি একটি তারের সংগীত। কত যুদ্ধবিগ্রহ বিরোধ-সংগ্রামের কত বিচিত্র তার সেখানে ঝংকৃত হচ্ছে, তার বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু এই সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে, শান্তির সুর বাজছে। মানুষের চারি দিকে ষড়্‌রিপুর হানাহানি, তাণ্ডবলীলা চলেছে; কিন্তু এত বেসুরে এসে কই এই একটি সুরকে তো লুপ্ত করতে পারলে না! সকল বিরোধ, সকল বিপ্লব, সকল যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে এই সুর বেজে উঠল : শান্তং শিবং অদ্বৈতম্‌।

মানুষের ইতিহাসে এই-যে উৎসব চলছে তারই কি একটি প্রতিরূপ আজকের এই মেলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে কেউ বাজার করছে, কেউ খেলা করছে, কেউ যাত্রা শুনছে, কিন্তু নিষেধ তো করা হয় নি, বলা হয় নি 'এখানে উপাসনা হচ্ছে— তোমরা সাধু হয়ে চুপ করে বসে

থাকো'। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জগতে যে-একটা প্রচণ্ড কোলাহল চলছে শান্তিনিকেতনের নিভৃত শান্তিকে তা আবিল করুক। মানুষই কোলাহল করে, আর তো কেউ করে না। কিন্তু মানুষের কোলাহল আজ পর্যন্ত কি মানুষের সংগীতকে থামাতে পারল। ঈশ্বর যে খনির ভিতর থেকে রত্নকে উদ্ধার করতে চান, তিনি যে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্য থেকেই তাঁর পূজাকে উদ্ধার করবেন। কারণ, এই কোলাহলের জীব মানুষ যখন শান্তিকে পায় তখন সেই গভীরতম শান্তির তুলনা কোথায়। সে শান্তি জনহীন সমুদ্রে নেই, মরুভূমির স্তব্ধতায় নেই, পর্বতের দুর্গম শিখরে নেই। আত্মার মধ্যে সেই গভীর শান্তি। চারি দিকের কোলাহল তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়; কোলাহলের ভিতরে নিবিড়রূপে সুরক্ষিত সেই শান্তি। হাট বসে গিয়েছে, বেচা-কেনার রব উঠেছে; তারই মধ্যে প্রত্যেক মানুষ তার আপনার আত্মার ভিতরে একটি যোগাসনকে বহন করছে। হে যোগী, জাগো। তোমার যোগাসন প্রস্তুত, তোমার আসন তুমি গ্রহণ করো; এই কোলাহলে, ষড়্‌রিপুর ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিরোধের মাঝখানে অক্ষতশান্তি. সেইখানে বোসো। সেখানে তোমার উৎসবপ্রদীপ জ্বালো, কোনো অশান্ত বাতাস তাকে নেবাতে পারবে না। তুমি কোলাহল দেখে ভীত হোয়ো না; ফলের গর্ভে শস্য যেমন তিক্ত আবরণের ভিতরে থেকে রক্ষা পায়; সেইরূপ কোলাহলের দ্বারাই বেষ্টিত হয়ে চিরকাল মানুষের শান্তি রক্ষা পেয়ে এসেছে। মানুষ তার বৈষয়িকতার বুকের উপর তার ইষ্টদেবতাকে সর্বত্রই তো প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে তার আসক্তি জীবনের সব সূত্রগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে তারই মাঝখানে তার মন্দিরের চূড়া দেবলোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাদের চিত্ত আজ অনুকূল হয় নি, ক্ষতি নেই। যাক যার মন যেখানে খুশি যাক, কোনো নিষেধ নেই। তবু এই অসীম স্বাধীনতার ভিতরে মানুষের পূজার ক্ষেত্র সাবধানে রক্ষিত হয়ে এসেছে। সেই কথাটি আজ উপলব্ধি করবার জন্য কোলাহলের মধ্যে এসেছি। যার ভক্তি আছে, যার ভক্তি নেই, বিষয়ী ব্যবসায়ী পাপী, সকলেরই মধ্যে তাঁর পূজা হচ্ছে। এইখানেই এই মেলার মধ্যেই তাঁর পূজা হয়েছে, এই কোলাহলের মধ্যেই তাঁর স্তব উঠেছে। এইখানেই সেই শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌-এর পদধ্বনি শুনছি; এই হাটের রাস্তায় তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে। মানুষের এই আনাগোনার হাটেই তাঁর আনাগোনা; তিনি এইখানেই দেখা দিচ্ছেন।

রাত্রি
৭ পৌষ ১৩২১

মানুষের বিকাশে যত বাধা— ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই। সে যে খোলা আকাশে থাকে; সমস্ত আলোকের ধারা, বাতাসের ধারা নিয়ত সেই আকাশ ধুয়ে দিচ্ছে— সে-বাতাসে তো দূষিত বাষ্প জমা হয়ে তাকে বিষাক্ত করছে না, মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশ ভরা প্রাণ সেই বিষকে ক্ষালন করে দিচ্ছে, তাকে কোথাও জমতে দিচ্ছে না। মানুষের মুস্কিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে: কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, আকাশের আলোকে আমি বিশ্বাস করব না, আমার ঘরের মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব, আলোক নতুন কিন্তু আমার ঐ দীপ সনাতন। তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে,— সেইটেতেই সে পড়ে থাকতে চায়, কেননা সে যে হল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো ঈশ্বরের বাতাস কেবলই সে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায়, তারি উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে, সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তখন

কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে?

চিরদিন এমনি করে সত্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ! মানুষের নিজের হাতের গড়া জিনিসের উপর মানুষের বড়ো মোহ— সেই জন্য মানুষ নিজের হাতেই নিজে মার খায়। মানুষ নিজের হাতে নিজেকে মারবার গদা তৈরি করে। সেই জন্য আজ সেই নিজের হাতের গড়া গদার আঘাতে রাজ্য সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি আজ বলছে, ধর্ম-বুদ্ধির কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আমি গায়ের জোরে সব কেড়েকুড়ে নেব। সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে; সে ধর্ম, যে দুর্বল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র— সেই জন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে, স্বার্থের ধর্ম যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে। যা জমিয়েছ তাকে চিরকালই আঁকড়ে ধরে রাখবে এ কেমন মমতা যেমন দেহের প্রতি আমাদের মমতা। আমরা কি হাজার চেষ্টা করলেও দেহকে রাখতে পারি— যতই কেঁদে মরি না কেন, যতই বলি না কেন যে তার সঙ্গে অনেক দিন ধরে আমার সম্বন্ধ— তাকে রাখতে পারব না, কারণ তাকে রক্ষা মানেই মৃত্যুকে ধরে রাখা। আমাদের যে দেহকে ত্যাগ করে মৃত্যুকেই মারতে হয়। তেমনি বাপ পিতামহ থেকে যা চলে আসছে যা জমে রয়েছে— তাকে চিরকাল ধরে রাখবার ইচ্ছাও মৃত্যুকে ধরে রাখবার ইচ্ছামাত্র। দেহকে রাখতে পারলুম না, পুরাতনকেও রাখতে পারব না।

ইতিহাসবিধাতা তাই বললেন— নতুন হতে হবে। কামানের গর্জনে আজ সেই বাণীই শুনতে পাচ্ছি— নতুন হতে হবে। জাতীয়তার আদর্শকে নিয়ে য়ুরোপ এতকাল ধরে তার প্রতাপকে অভ্রভেদী করে তুলেছে। ছোটো জাহাজ ছিল, তার পর বড়ো জাহাজ, তারপর বড়ো জাহাজ থেকে আরও বড়ো জাহাজ; কামান ছোটো ছিল তা থেকে আরও বড়ো কামান গড়ে তুলে য়ুরোপ তার মারণ অস্ত্র সব এতকাল বসে শানিয়েছে। জলে স্থলে এই সব ব্যাপার করে তুলে তার আর তৃপ্তি হল না— আকাশে পর্যন্ত মারবার যন্ত্র তাকে তৈরি করতে হল। নিজের প্রতাপকে এমনি করে অভ্রভেদী করে সে দুর্বলকে টিপে তার রক্ত পান করবে— এমন কথা কি সে বলতে পারে? মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে— এই হবে? ইতিহাসবিধাতা তাই হতে দেবেন? না। তিনি কামানের গর্জনের ধ্বনির ভিতর দিয়ে বলেছেন— নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব? ইতিহাসবিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন? দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন,— না হয় নি, তোমাদেরও হয় নি, নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয় নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায় বিশ্বাস করো। বীর পুত্র দুঃসাহসিক পুত্র সব, বেরিয়ে পড়ো। এই বাণী কি আসে নি? একথা তিনি শোনান নি?

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামবাসী। তোমাদের এই অন্ধকারের মধ্যে সেই পরপার থেকে আলোক আসছে। সেইখান থেকে যে আলোক আসছে তাতে জাগ্রত হও, বসে বসে চকমকি ঠুকলে দিনকে সৃষ্টি করতে পারবে না। সেই আলোকে যে নব নব দিন অমৃতের বার্তা নিয়ে আসছে। নব নব লীলায় সব নূতন নূতন হয়ে উঠছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দ আসছে— রক্তস্রোতের উপর জীবনের শ্বেত শতদল ভেসে উঠছে।

সেই অমৃতের মধ্যে ডুব দাও— তবেই হে বৃদ্ধ, কাননে যে ফুল এই মাত্র ফুটেছে তুমি তার সমবয়সী হবে, আজ ভোরে পূর্বাশার কোলে যে তরুণ সূর্যের জন্ম হয়েছে, হে প্রবীণ, তোমার

বয়স তার সঙ্গে মিলবে। বেরিয়ে এসো এই আনন্দলোকে, সেই মুক্তির ক্ষেত্রে। ভেঙে ফেলো বাধা বিপত্তিকে, নিত্য নূতনের অমৃতলোকে বেরিয়ে এসো। সেই অমৃতসাগরের তীরে এসে অকূলের হাওয়া নিই— সত্যকে দেখি। সত্যকে নির্মুক্ত আলোকের মধ্যে দেখি। সেই সত্য যা নিশীথের সমস্ত তারকার প্রদীপমালা সাজিয়ে আরতি করছে, সেই সত্য যা সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সাক্ষীর মতো সমস্ত দেখছে। নব নব নবীনতার সেই জ্ঞানময় সত্য। যার মধ্যে প্রাণের বিরাম নেই জড়তার লেশ নেই, যার মধ্যে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ।

১০ মাঘ ১৩২১

এই উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোনো পান্থশালাতে আমরা বন্ধ নই। কোনো বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব হয় না— চলার পথে উৎসব, চলতে চলতে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে যেদিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই দিন থেকে এই আনন্দ উৎসবের আমন্ত্রণ পৌঁচেছে— সেই আহ্বানে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সেই দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাই তো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে পথে চলছি সে সংসারের পথ, তার মাঝে সংসার তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান, তার অবসান মৃত্যুতে; কিন্তু না, পথ তো কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী, তার দক্ষিণ হাত ধরে কত সংকটের মধ্য দিয়ে সংশয়ের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাকে পাশে নিয়ে চলেইছ; কোনো কিছুতে এসে থামতে দাও নি। সে বিদ্রূপ করেছে, বিরুদ্ধতা করেছে— কিন্তু তুমি তার দক্ষিণ হাত ছাড়ো নি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছ— তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মনুষ্যত্বের বিরাট রাজপথে, সেখানে সমস্ত যাত্রীর দল চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে কী আনন্দকোলাহল, কী জয়ধ্বনি, সেই তো উৎসবের আনন্দধ্বনি! তুমি বন্ধ করো নি, তুমি বন্ধ হতে দেবে না, তুমি কোনো মতের মধ্যে প্রথার মধ্যে মানুষকে নজরবন্দী করে রাখবে না। তুমি বলেছ মাভৈঃ— যাত্রীর দল বেরিয়ে পড়ো। কেন ভয় নেই, কিসে নির্ভয়? তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে চলছ। তাই তো যে চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে! যে চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনার সম্প্রদায়কেই পাচ্ছে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেছেন, তিনি কবে চলবে বলে কারও জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েছে, সে কি দেখতে পাচ্ছে না তার বন্ধন— সে কি জানে না যে, এই বন্ধন না খুলে ফেললে সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না? সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেছি, এমন কথা কে বলে? অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে? তুমি যত বড়ো মুগ্ধ হও-না কেন তোমার মোহ অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেলবে এত বড়ো স্পর্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে?

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি— তাকে বলেছি তোমার আসল এইটুকুর মধ্যে, এর বাহিরে নয় তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়ো না। সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব; মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর, এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এত দিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না? মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে— সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না? তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন? তিনি কি বলতে পারেন যে তিনি বন্দী? তিনি এ কথা বললে সংসারকে কে বাঁচাবে? তিনি বলেছেন— সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত। এই উদ্‌বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র— এখনি নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে— অনন্তকাল

জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করছে—জপ করছে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা। জাগ্রত হও, জাগ্রত হও—প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা কোরো না। সত্য তা হলে নিদারুণ হয়ে উঠবে—যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে, সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ, সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি? অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন—বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয় মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে—সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকবার নয়—চলবার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব—সেই সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি, কালের স্রোতে ডুবল না সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—অন্ত নেই, তার অন্ত নেই—অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন—সেই যে মুক্তির আনন্দঘোষণার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা কজনে সম্পন্ন করব? এই কলকাতা শহরের এক প্রান্তে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দধ্বনি বেজে উঠবে না? এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন? এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন, বিশ্বের মর্মকুহর থেকে এই মুক্তিমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এই যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্ছে—সেই আগুনকে তাঁরা এই কটি সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব? আর বলব, সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ইতিহাসের জীর্ণ দেয়ালে ভাঙাঘড়ির কাঁটার মতো চিরদিনের জন্য থেমে গেছে? গৌরব করে বলব আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে—বুকের উপরে সেই জগদ্দল পাথরের ভার আমরা বইছি? না, কখনই না। উদ্‌বোধনের মন্ত্র আজ জগৎজুড়ে বাজছে—যাত্রী বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো। ভেঙে ফেলো তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে চলো, যারা চন্দ্র সূর্য তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চলছে।

১১ মাঘ, সন্ধ্যার উদ্‌বোধন, ১৩২১

তিনি যেখানে আমাদের প্রিয়তম, সেখানে তিনি জাগেন নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রেম উদ্‌বোধিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি—এ কথা আমি জানলুম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম, এ কথা সত্য। এ বললে স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ ঘটে, কারণ তিনি যদি প্রিয়তম তবে তাঁকে ভালোবাসি না কেন? কিন্তু তা বললে কী হবে—তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন? কত মানুষের ভিতরে জীবনের তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল—মন ভরল না, সে কেঁদে বলল, জীবন ব্যর্থ হল—এমন একটি এককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পারি, দ্বিধা সংশয়ের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

সমস্ত সৌন্দর্যের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্যের ভিতরে যেদিন সেই মধুরকে পেলুম, সেদিন আমার মাধুর্যের পরিচয় দেব কিসে? মাধুর্যে বিগলিত হয়ে কি পরিচয় দেব? না—মাধুর্যের পরিচয় মাধুর্যে নয়, মাধুর্যের পরিচয় বীর্যে। সেদিন মৃত্যুকে

স্বীকার করে পরিচয় দেব। বলব—প্রিয়তম হে, মরব তোমার জন্য। আমার আর শোক নেই, ক্ষুদ্রতা নেই, ক্ষতি নেই। প্রাণের মায়া আর আমার রইল না—বলো না তুমি, প্রাণকে তোমার কোন্ কাজে দিতে হবে? তোমাকে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে বেড়াব তা নয়, কেবল মধুর রসের গান করব তা নয় গো। যেদিন বলতে পারব যিনি মধুর, পরম মধুর, যিনি সুন্দর, পরম সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন, সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে চলে যাব। সেদিন জানব যে কর্মে কোনো ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোনো বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে, তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেঁকে না—জগৎভরা আনন্দ যেদিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে সেদিন মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব সরল হবে, তার কর্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সেদিন মানুষ বীর সেদিন ইচ্ছা করে সে বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগবেন, সে খবর পাব কেমন করে? গান যে বেজে উঠবে। কী গান বাজবে? সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্র বীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে, সৌন্দর্যে অভিভূত হব বলে এ পৃথিবীতে জন্মাই নাই—সৌন্দর্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব। মাধুর্যের প্রকাশ কেবল ললিত কলায় নয় এই সৌন্দর্য-সুধার মধ্যে বীর্যের আগুন রয়েছে—মানুষ যেদিন এই সৌন্দর্যসুধা পান করবে সেদিন দুঃখের মাথার উপরে সে দাঁড়াবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয়-বিষরসের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দরসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহ চন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে—সেই বীর্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলই মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করছে—প্রাণের কোথাও বিরাম নেই। অন্তরাত্মা জানে যে সেই সুধার ধারা জীবন থেকে জীবনান্তরে লোক থেকে লোকান্তরে বয়েই চলেছে—কত যোগী, কত প্রেমিক, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় সমস্ত জীবনকে ডুবিয়ে অমৃতত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন—তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুর পুত্র নও।

কিন্তু সে-কথায় মানুষের বিশ্বাস হয় না। সে যে বিষয়ের দাসত্ব করছে, সেইটেই তার কাছে বাস্তব—আর এ সব কথা তার কাছে শূন্য ভাবুকতা মাত্র। সে তাই এ সব কথাকে বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, অবিশ্বাস করে। যাঁরা অমৃতের বাণী এনেছেন, মানুষ তাই তাঁদের মেরেছে। তাঁরা যেমন মানুষের হাতে মার খেয়েছেন, এমন আর কেউ নয়, অথচ তাঁরা তো মলেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে রইল। কারণ তাঁরাই যে মার খেতে পারেন; তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারা তাঁরা অমৃতের প্রমাণ করেন। মানুষের দরজায় এসে দাঁড়ালে মানুষ তাঁদের আতিথ্য দেয়নি, আতিথ্য দেবে না—মানুষ তাঁদের শত্রু বলে জেনেছে। কারণ আমরা আমাদের যত কিছু মত বিশ্বাস সমস্ত পাথরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছি, ঐ সব পাগলকে ঘরে ঢোকালে সে সমস্ত যে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, এই মানুষের মস্ত ভয়। মৃত্যুকে কৌটার মধ্যে পুরে লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, ওরা ঘরে এলে কি আর রক্ষা আছে—লোহার সিন্দুক ভেঙে যে মৃত্যুকে এরা বার করবে।

সেই মৃত্যুকেই তাঁরা মারতে আসেন। তাঁরা মরে প্রমাণ করেন, আছে সুধা সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে,—নিঃশেষে পরম আনন্দে সেই সুধার পাত্র থেকে তাঁরা পান করেন। তাঁরা প্রিয়তমকে জেনেছেন, প্রিয়তম তাঁদের জীবনে জেগেছেন।

আমাদের গানে তাই আমরা ডাকছি—প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো। কেননা, প্রিয়তম

হে, তুমি জগো নি বলেই মনুষ্যত্ব বিকাশ হল না, পৌরুষ পরাহত হয়ে রইল। তোমার কণ্ঠের বিজয়মাল্য দাও পরিয়ে তুমি আমাদের কণ্ঠে— জয়ী করো সংগ্রামে। সংসারের যুদ্ধে পরাভূত হতে দিয়ো না— বাঁচাও, তোমার অমৃতপাত্র আমার মুখে এনে দাও। অপমানের মধ্যে পরাভবের মধ্যে তোমাকে ডাকছি— জাগো, জাগো, জাগো। জাগরণের আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

১১ মাঘ, সন্ধ্যার উপদেশ, ১৩২১

মৃত্যু তো পদে পদেই, সেইজন্য অমৃত পদে পদেই প্রকাশমান। গানের প্রত্যেক সুরটি কেবলই সরে সরে যায় সেই জন্যেই গানের অখণ্ড রাগিণী প্রকাশ পাচ্ছে। একই সুর যদি স্থির হয়ে লেগে থাকত তাহলে কেবল সেই সুরটাকেই দেখতে পেতুম রাগিণীকে দেখতে পেতুম না। সুর চলতে থাকে বলেই রাগিণীর প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। রাগিণীকে মনের মধ্যে যে একবার পূর্ণ করে দেখে নিয়েছে গানের প্রত্যেক খণ্ড সুরেই সে অখণ্ডের আনন্দকে লাভ করে; কোনো সুরকেই তার আর বর্জন করতে হয় না, যে সুর যাচ্ছে এবং যে সুর আসছে সমস্তকেই সে পূর্ণের মধ্যে পেতে থাকে। তার কাছে সুরের চলে যাওয়া লেশমাত্র ক্ষতি নয়।

কেননা, সে তখন কানের মধ্যে নিচ্ছে গতিটাকে অন্তরের মধ্যে পাচ্ছে স্থিতিটিকে। নইলে শুদ্ধমাত্র গতির দিকে তাকালে গতির তাৎপর্য পাওয়া যায় না— সুরকেই একান্ত করে জানলে রাগিণীকে জানা যায় না; সেই রকম শুদ্ধমাত্র স্থিতির দ্বারাই স্থিতিকে জানা যায় না— সুরের গতিকে একেবারে বর্জন করে রাগিণীকে ধরতে পারা যায় না। এই জন্যে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ঐক্য আছে এইটি জানতে গেলেই ভেদ থাকা চাই। এই ভেদের প্রয়োজন, ভেদকেই জানবার জন্যে নয়, অভেদকে জানবার জন্যেই। যখন ভেদকেই জানি তখন আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ; ভেদের জন্যেই যখন অভেদকে জানি তখনই আমাদের মুক্তি, আমাদের আনন্দ। ভেদকে তখন লীলা বলেই জানতে পারি এবং সেই লীলাতেই যোগ দিই, সে লীলাকে লুপ্ত করতে চাই নে। কেননা ভেদ তখন বিচ্ছেদের ব্যবধান নয়, ভেদই তখন মিলনের সেতু।

ঈশ্বরের আনন্দ সার্থক হচ্ছে বন্ধনে (যেমন কবির আনন্দ সার্থক হচ্ছে কাব্যে); জীবের বন্ধন সার্থক হচ্ছে আনন্দে যেমন পাঠকের পাঠদুঃখ সার্থক হচ্ছে কাব্যরসে; ঈশ্বর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে জীবাত্মায় প্রকাশমান হচ্ছেন, জীব সৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঈশ্বরে উত্তীর্ণ হচ্ছে— মিলনের এই বিচিত্র লীলা নিয়তই চলছে— যেদিক থেকে দেখ এই লীলার মাঝখানে থেকে যাচ্ছে একটা বাধা— তাকে মায়া বল, বন্ধন বল, সংসার বল যা খুশি। একে কেউবা গালি দিই, কেউবা অস্বীকার করি, কেউবা ভালো বলি— কিন্তু মাঝখানটাতে এ রয়েইছে। এই বাধাটাকে যদি চরম বাধা বলে মনে করি তাহলেই ভয়— কিন্তু সেটাকে যদি মাঝখানকার জিনিস বলেই জানি তাহলে না তার প্রতি ভয়, না তার প্রতি একান্ত আসক্তি থাকে। অথচ তখন তার প্রতি প্রীতি বেড়ে ওঠে। কেননা তার ভিতর দিয়ে যখন আনন্দকে পাই তখন সেও আনন্দময় হয়ে ওঠে; ছন্দের মধ্য দিয়ে যখন কাব্যরসকে পাই তখন সেও কাব্যরসের আনন্দের অন্তর্ভূত হয়ে প্রকাশ পায়— সেই রস যখন না পাই, তখন সমস্তটাই পরীক্ষার পড়ার মতো বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে আমার বলবার কথাটি হচ্ছে এই যে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদবিলুপ্তিই মুক্তি নয়, ভেদের চরিতার্থতাই মুক্তি।

১০১৮

এবার আমার নববর্ষের প্রথম দিন এই সমুদ্রযাত্রার মাঝখানে এসে দেখা দিল। প্রত্যেকবার আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি— কিন্তু এবার আমারই পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ। এবারকার নববর্ষ যেন আমার কূল থেকে বিদায় নেবার হুকুম নিয়ে এল— আমাকে যাত্রার আশীর্বাদ দিয়ে গেল। এবার ডাঙার মায়া একেবারে

ছেড়ে দিয়ে কর্ণধারের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে দিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে পড়তে হবে। সেখানে পথের চিহ্ন চোখে পড়ে না— কিন্তু যিনি হাল ধরে আছেন, তিনি পথ জানেন এই কথা মনে নিশ্চয় জেনে বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাঙায় স্থির হয়ে বসতে গেলে ভিত খুঁড়তে হয়, শিকড় গাড়তে হয়, সঞ্চয় বিস্তার করতে হয়, আর চলতে গেলে শিকল খুলতে হয়, নোঙর তুলতে হয়, স্থাবর সম্পত্তির বোঝা ফেলে আসতে হয়— এখন থেকে সেই সমস্ত চিরাভ্যাসের আয়োজন থেকে নিষ্কৃতি নেবার আয়োজন করতে হবে। অসত্য থেকে সত্যের পথে মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে যাত্রা। এ পথের কি কোনোদিন অন্ত আছে? কিন্তু যেমন অন্ত নেই তেমনি গম্যস্থান যে প্রতিপদেই— আমরা যেমন চলেছি তেমনি পৌঁচচ্ছি— আমাদের এই চিরজীবনের যাত্রায় চলা এবং পৌঁছনো একই কথা। তা যদি না হত তাহলে অনন্ত চলা যে অনন্ত শাস্তি হয়ে উঠত। কিন্তু সমস্ত জীবনব্যাপারের মজাই হচ্ছে ঐ, তার অপূর্ণতা এবং পূর্ণতা একেবারে এপিঠ ওপিঠ হয়ে দেখা দেয়— যখন খেতে থাকি তখন আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক গ্রাসই খাওয়া। খাওয়ার আনন্দের জন্যে খাওয়ার অবসানের অপেক্ষা করতে হয় না। তাই এবারকার নববর্ষের দিন মনকে বার বার বলিয়ে নিলুম, মন, চলতে হবে, এখন থেকে পিছন দিকে তাকাবার অভ্যাস ছাড়তে হবে। যদি সামনের মুখে চলবার দিকেই সমস্ত ঝোঁক দেওয়া যায় তাহলেই মিথ্যার মায়া কাটানো সহজ হবে। তাহলেই কে কী বলছে, কে কী ভাবছে কিসে কী হবে এ সব কথা ভাবনার একেবারেই দরকারই হবে না। কেননা যখন আমরা মনে করি বসে থাকাটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখনই আশে পাশে যে-কেউ আছে সকলেরই মুখের দিকে তাকাতে হয়, এবং পোঁটলা পুঁটলি, ঘটিবাটি কাঁথা-কম্বল সমস্তই একেবারে ভূতের মতো পেয়ে বসে;— যে হতভাগা দশের দাসত্ব করে তাকে প্রতিদিন যে আপনাকে ও পরকে কত বঞ্চনা করতে হয়, কত মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তার ঠিকানা নেই— কিন্তু অনন্তের পথে চলতে হবে এই কথাটা ঠিকভাবে বলতে পারলে জীবন আপনিই সত্য হয়ে ওঠে— কেননা আমাদের জীবনের সত্যস্বরূপটাই হচ্ছে তাই, অনন্তের পথে চলা, রাস্তার মাটি কামড়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নয়। এই জন্য বসে থাকতে গেলেই জীবন মিথ্যা হয় এবং চলতে আরম্ভ করামাত্রই সত্য হতে থাকে। তাইতো আমাদের প্রার্থনা, অসতো মা সদ্গময়— অসত্য থেকে সত্যের দিকে আমাদের নিয়ে যাও— ঐ নিয়ে যাওয়ার দিকেই সমস্ত সার্থকতা— বসিয়ে রাখাতেই যত গেরো। ধনমান যখন আমাদের ধরে বেঁধে রাখতে চায় তখনই আমাদের গুরু এসে বলেন ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে বরঞ্চ উট গলতে পারে কিন্তু ধনী কখনও স্বর্গরাজ্যে যেতে পারে না। সে কথার মানে হচ্ছে ধনসঞ্চয় যে আমাদের ধরে রাখতে চায়, এবং ধরে রাখলেই আমরা স্বরূপ থেকে ভ্রষ্ট হই— কারণ, বসে থাকার দ্বারাই আমরা অন্তের মধ্যে আটকা পড়ি, চলার দ্বারাই আমরা অনন্তকে উপলব্ধি করতে পারি— সেই উপলব্ধিতেই আমাদের এক মাত্র সত্য। সেইজন্যেই আমাদের প্রার্থনার ভিতরকার কথা হচ্ছে— গময়, গময়, গময়— আমাদের বসিয়ে রেখো না। কারণ, যখনই আমরা চলতে থাকব তখনই প্রকাশ আমাদের মধ্যে প্রকাশমান হবেন। বীণাযন্ত্রে তারের উপর তার চড়াতে থাকলেই যে সংগীতের প্রকাশ হয় তা নয়— তারের উপর ঝংকার দিয়ে তাকে সচল করলে তবেই সংগীতের আবির্ভাব বীণাকে সফল করে তোলে। আমরা খোঁটা আঁকড়ে ধরে বসে আছি বলেই আমাদের আবিঃ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারছেন না। তাই এবারে যাত্রার পথে নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করা গেল— এবার আমাদের 'শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ' হোক

'আমাদের যাত্রা হোলো শুরু
এবার ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার।
এবার তুফান উঠুক বাতাস ছুটুক
ভয় করিনে আর— তোমারে করি নমস্কার।'

কেননা, যে যাত্রা করেছে— 'অথ সো ভয়ং গতো ভবতি।'

১৩২০

আমাদের দেশে গ্রাম বল, ঘর বল, পরিবার বল, সমাজ বল— তার মধ্যে দুর্বলতার কীট এসে প্রবেশ করে তাকে ছারখার করছে— আমাদের এই কথাই মনে জাগছে— পারি না, পারি না, পারি না; আমরা নিজেকে যেমন অপমানিত করছি, সেইরূপ যিনি আমাদের ঈশ্বর, যাঁর কাছ থেকে আমাদের সব শক্তি আসছে, তাঁকেও অপমানিত করছি। কোনখানে মানুষের সমস্ত শক্তি? আপনার জড়ত্বকে ছিন্ন করে আত্মত্যাগের দিকে দুঃখের দিকে কোন শক্তি তাকে নিয়ে যাবে?— যদি সেই শক্তিকে পাওয়ার পথ রুদ্ধ করো— যদি সেই শক্তিকেই নানা খানা করে নিজের বড়ো বোধকে ভূমার বোধকে একবারে জীর্ণ জীর্ণ শতধা বিদীর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দাও তবে কেমন করে নিজে বড়ো হবে? না— তোমাদের বলতে হবে— মানুষ পারে, পারে, পারে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সিংহাসনে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রসূর্যের প্রচণ্ড শক্তিপুঞ্জকে সংহত সংযত করে যে রাজরাজেশ্বর দেবতা বসে রয়েছেন— সমস্ত দেশকাল যাঁর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন— মানুষ তাঁকেই সমস্ত হৃদয় দিয়ে পূজো করতে পারে।— তুমি ভাবছ তিনি আপনার সিংহাসনে আপনিই অধিষ্ঠিত, তা হোক, আমি তাঁকে আমার স্বকৃত আয়োজনের মধ্যে ডাকব। সত্যই তো, এও তো আমারই সিংহাসন। তিনি তো তাঁর বিশ্ব-আসনে বসেছেন, কিন্তু আমি যখন তাঁকে সেইখানে পূজো করি তখন সেই বিশ্বের আসনকে আমিই তো পূজোর আসন করে তুলি এমনি করে তাঁরই আসনকে আমার নিজের হাতে পাতা আসনরূপে সৃষ্টি করি। সে আমারই জ্ঞানের সৃষ্টি। সেই জ্ঞান সেই ভক্তিকে যতই বড়ো করি ততই তাঁর নিজের সৃষ্টির সঙ্গে আমার সৃষ্টি এক হয়ে আসে, তখন তাঁরই মন্দির আমার মন্দির হয়। যদি সমস্ত ইচ্ছাকে প্রেমকে জাগিয়ে বলি, তুমি তোমার অনন্ত সিংহাসনে বসো— তুমি তো বসে আছই, আমি আমার করে সেখানে তোমাকে বসাব— আমি সেখানে তোমা প্রণাম করব— সে প্রণাম করবার শক্তি আমার মধ্যে রয়েছে— তবেই তাঁর পূজো হল, তবেই আমার সঙ্গে তাঁর মিল হল। কিন্তু কোনো কোনো লোক বলে, এখানে তো আমার শক্তির পরিচয় হল না— অতএব ঈশ্বরকে আমার নিজের মতো করে নিতে হবে। নিজের মতো তো এই-ই, নিজের সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত আনন্দ জাগালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেই অনন্ত ঈশ্বরকে তো এমনি করেই দেখা যায়। এইখানেই তো পূজোর আসন, এই বড়ো জায়গাতেই তো যথার্থ পূজো। এ কেবল চোখ চেয়ে দেখার উপর নির্ভর করে। দেখছি মনকে খুলে দিয়ে এই উদার ধরণীতলে, এই নীলাকাশে অন্তরের অন্তরে সমস্ত নির্মল করে সেই ভূমাকে সেই প্রাণের প্রাণকে। তিনি এত বড়ো অথচ তিনি আমার নিশ্বাসের নিশ্বাস হয়ে আমার নিকটতম হয়ে আছেন। এই কথা মানুষের কানে বলতে হবে না— তুমি পার না, পার না, পার না— বলতে হবে— এই বোধই তুমি উপলব্ধি করতে, পার, পার, পার। না যদি পার তবে মহতী বিনষ্টিঃ। তাঁকে নিয়ে তোমরা তর্ক করবে, বিতর্ক করবে, তোমরা সমস্ত মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে তাঁর কাছে যাবে না? দীনহীন হয়ে, দুর্বল হয়ে, চিত্তকে অপবিত্র করে বুদ্ধিকে হীন করে তাঁর কাছে যাবে? মনুষ্যত্বের সমস্ত দীপগুলি জ্বালিয়ে উজ্জ্বল হয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ— শোনো তোমরা অমৃতের পুত্র সব, তোমরা যে বাস করছ সে দিব্যলোকে। এই সব অমৃত মন্ত্রকে পরিহাস করে আমরা কী বলছি— কী নিয়ে আমরা কুতর্ক করছি? কী অপমান, কী লজ্জা, কী ভয় আমাদের দেশকে চারি দিক থেকে ঘিরে রুদ্ধ করে রেখেছে— এই দুর্গতির সঙ্গে কি তোমরাও আজ যোগ দিয়ে দেশের ভারকে বাড়াবে, অজ্ঞানতাকে বাড়াবে, দেশকে মরবার পথে এগিয়ে দেবে? না। তপস্যাকে জাগ্রত করতে হবে। মানুষ যে মানুষ, মানুষের মনুষ্যত্ব যে কত বড়ো সেই কথা অনুভব করো। সহজ নিয়ে মানুষ থাকবে না। প্রবৃত্তি যা বলছে তাই নিয়ে মানুষ থাকবে না। মানুষের যথার্থ স্বভাব তা নয়। ঈর্ষ্যা হিংসা লোভ মানুষের স্বভাব নয়। মানুষ কেমন করে ত্যাগ করছে, কেমন করে মহত্ত্ব প্রকাশ করছে তাই দেখো— সেইখানে মানুষের যথার্থ স্বভাবের পরিচয় পাবে সেইখানেই মানুষের সম্মান মানুষের গৌরব। মানুষের যথার্থ সম্মান অভিমানকে বলিদান দিয়ে, অভিমানকে চরিতার্থ করে নয়। এই কথাই আজ দুর্গতির দিনে আমাদের সমস্ত মনকে দিয়ে বলাতে হবে,— পারি, পারি, পারি— পারি দুঃখকে

বরণ করতে, পারি অহংকারকে দূর করতে। বলি—নমস্তেঽস্তু,—বোধ দাও, বোধ দাও—নমস্কার করতে পারছি না—আত্মগৌরবের অভিমানে, প্রবৃত্তির অভিমানে মাথা হেঁট হয় না, মাথা হেঁট করে দাও। অভিমানকে নত করাই সকলের চেয়ে কঠিন কিন্তু দেব, তাকেও বলিদান দেব। সমস্ত সংকীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত করব—তাঁর পূজা সর্বত্র হবে—বাসস্থানে, গৃহে, পরিবারে, বাক্যে, চরিত্রে, জ্ঞানে—কোথাও তাঁকে অপমান করব না। বড়ো কঠিন, বড়ো দুঃসাধ্য সেই পূজা। আগাছাগুলো উৎপাটিত করতে প্রাণ যেন বেরিয়ে যায়—কিন্তু সেই দুঃসাধ্য সাধনকেই বরণ করবে মানুষ! বোলো না যে অনায়াসে হবে—সেই মলিনতা, নিশ্চেষ্টতা জড়ত্বে লুটিয়ে লুটিয়ে থেকো না—এমনি করে সমস্ত দেশ মরেছে।

২৭ ফাল্গুন, রবিবার, ১৩২১

তিনশো চৌষট্টি দিন পূর্বে অন্ধকার রজনীর তোরণদ্বার উদ্ঘাটন করে যে বৎসরটি এসেছিল সে অদ্য আর এক রজনীর তোরণদ্বার উন্মোচন করে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলে।

বিদায়কে সামনে নিয়ে আজ আমাদের উপাসনা। এর পিছনে পূর্ণ আছেন, এই কথাটি অনুভব করবার জন্য আজ উপাসনা। সামান্য নিন্দা, অপমান, আঘাত ও ক্ষতিকে যে আমরা সংবৎসর অত্যন্ত একান্ত করে দেখেছি, আজ বৎসরের শেষ দিনে বলি সেই মায়া আজ কাটল।

কেন বলছি আমরা মৃত্যুকে দেখছি, ক্ষতিকে দেখছি? কোথায় দেখছি? সেই সব পণ্ডিতেরা যারা বিশ্বকে মৃত্যুনিকেতন বলছে তারা মৃত্যুকে দেখলে কোথায়? এই যে আকাশ প্রতিরাত্রে নক্ষত্রমণ্ডলীর স্বর্ণাক্ষরে কী আশ্চর্য লিপি লিখছে, সে কি মৃত্যুর লেখা লিখছে? এই যে বিশ্বের জীবপ্রবাহ নিমেষে নিমেষে তরঙ্গিত মুখরিত হয়ে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্য থামে নি, এর মধ্যে মৃত্যুকে কে কোথায় দেখল? কোনখানে ক্ষয়ের জরার, বিকারের লক্ষণ দেখা গেল? সংসারকে তো চিরনবীন চিরপ্রাণময় করেই দেখছি। মৃত্যুকে তো এর মধ্যে কোথাও দাঁড়াতে দেখি নি। সে বলুক দেখি একটি কণাকেও সে জয় করতে পেরেছে? একটি সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানেও তার জয়পতাকা নিহিত হয়েছে? সে কোথাও স্থান পায় নাই। মৃত্যু সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে? না। এই যে বর্ষ চলে যাচ্ছে—এ যে ফিরিয়ে ফিরিয়ে সামনের দিকে আঙ্গুলের সংকেতে দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ অচল পরিপূর্ণতা।

খেলা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন সেই খেলাঘরের ভাঙাচোরা খেলনার মাঝখানেই আজ তোমাকে পাওয়ার উৎসব আমাদের এই ভগ্নাবশেষের মধ্যেই তুমি আজ এসো, ধুলোর ঝড় উড়িয়ে তুমি এসো। কারণ খেলা তো ফুরোবার নয়—তুমি যে আমার খেলার সাথী। তোমার খেলার উপকরণ ক্রমাগতই আমার জীবনের ঘরে নূতন নূতন করে জমে উঠবে।

বর্ষশেষ ১৩২১

কাল রাত্রে যখন জানলা খুলে বাইরের দিকে চেয়েছিলুম তখন আমার মনে হল, নিজের অন্ধকারের মধ্যে নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদটিকে উপলব্ধি করবার জন্যে তপস্বিনী রাত্রি ধ্যানে বসেছে। নিজেকে যখন বিলুপ্ত করে দেবে, অন্ধকার আবরণ যখন খসে যাবে, তখনই সে আপনার অন্তরের জগৎটিকে প্রকাশ করতে পারবে।

মানুষের মধ্যেও একটি পরম শক্তি গোপন রয়েছে। কত বড়ো যে সেই শক্তি তা দেখাই যাচ্ছে না। তার প্রভাত তার রাত্রির আবরণে ঢাকা আছে। এমন সম্পদ তার অগোচরে রয়েছে বলে সে নিজেকে জন্মদরিদ্র বলেই জানছে; সেই জন্যেই সংসারের কাছে তার ভিক্ষার অন্ত নেই। এবং তার ভিক্ষার ঝুলি থেকে একটি কণা খসলেই আক্ষেপের সীমা থাকে না।

বীজ যতক্ষণ বীজ ততক্ষণ সে কৃপণ। তখন তার সকল দরজা আঁটা। কিন্তু তারই ভিতরে একটি চিরপ্রবাহিত মহারণ্যের ধারা অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। ঐ অতি ক্ষুদ্রের ভিতরে অতি বৃহৎ যে কেমন করে ধরল, তা ভেবেই পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বীজ যতক্ষণ বস্তার মধ্যে রইল ততক্ষণ সেই বিরাট চাপা রইল, ততক্ষণ ছোটোরই জয়। এমন করে হাজার বছর কেটে যেতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত মাটির ভিতর যখন সে প্রবেশ করলে যখন একদিকে রস আরেক দিকে তাপ তার অন্তরের শক্তিকে চঞ্চল করে তুললে— তখন সেই শক্তি নিজের আবরণ বিদীর্ণ করে বীজের সত্যকে প্রকাশ করতে লাগল।

মানুষেরও আত্মার সত্য তার অহং আবরণের মধ্যে অব্যক্ত হয়েই থাকে যতক্ষণ না তার প্রকাশ-শক্তি জাগ্রত হয়। মানুষের সকল ধর্মশাস্ত্রেই এই প্রকাশ শক্তিকে বাধামুক্ত করবার উপদেশ আছে। প্রবৃত্তির একান্ত প্রবলতাই হচ্ছে সেই বাধা। কেন বাধা সেটা ভেবে দেখা যাক।

পশুধর্মই যদি মানুষের পক্ষে একমাত্র এবং চরম হত তাহলে প্রবৃত্তিকে সংযত করবার কথা কেউ তাকে বলতই না। কারণ সেই একমাত্র ধর্ম পালনের শক্তিকে খর্ব করতে বলা আত্মহত্যা করতে বলা। মূলধনের চেয়ে বড়ো ধন যদি কোথাও কিছু না থাকে, তাহলে সেটাকে নষ্ট করা বিষম ক্ষতি। কিন্তু লাভের ধন মূলধনের চেয়েও বড়ো বলেই বণিককে সহজেই বলা যায় লোহার সিন্দুকের ভিতরে যে-টাকাটা আছে সেইটেই লোকসান। সেটাকে খরচ করে খাটালেই লাভ।

পশুধর্মের উপরে একটা মানব-ধর্ম আছে। অর্থাৎ দৈহিক জীবনের চেয়েও বড়ো জীবন হচ্ছে মানুষের। দৈহিক জীবনের প্রবৃত্তি দৈহিক জীবনের শক্তি; এই জন্যে সে-শক্তি একান্ত হয়ে বড়ো জীবনকে যখন বাধা দেয় তখন আমাদের মানব-ধর্ম বলে, 'আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ঐ শক্তিটাকে কাটিয়ে ওঠো।' মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে তার আত্মার জীবনটাই তার পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য— অতএব সেই জীবনটাকেই যদি না পাই, না বাঁচাই, তাহলে সেইটেই হবে মানুষের পক্ষে যথার্থ আত্মহত্যা, মহতী বিনষ্টি।

এই জন্যেই মানুষ আপন পশুধর্মের মধ্যে আবৃত হয়ে থাকাকেই বন্ধন বলে। এরই থেকে আত্মার জীবনে মুক্তি পাবার জন্যে প্রবৃত্তির নাড়ীবন্ধন সে ছিন্ন করতে চায়। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার উপদেশ প্রবৃত্তিকে শাসন করো, মনকে নির্মল করো।

এইগুলি হল নীতিকথা, এবং নীতিকথা শুষ্ক। কিন্তু নীতি তো নিজের মধ্যে নিজে সমাপ্ত নয়— নীতির মানেই হচ্ছে যাতে করে আমাদের নিয়ে যায়। নীতি যদি বলে আমাতেই শেষ, আমার ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই, তাহলে মানুষের বলবার অধিকার আছে আমি নীতি মানব না। কাউকে যদি বলি পথই পথের লক্ষ্য, পথ কোথাও পৌঁছে দেয় না, তাহলে সে লোক পথ চলা বন্ধ করলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। নীতি-উপদেষ্টা সেই ভাবেই কথা বলেন বলে নীতি-উপদেশ শুষ্কতার চরমে গিয়ে পৌঁছয়; এবং মানুষ যদি বলে স্বার্থত্যাগের ক্ষতিকে এবং প্রবৃত্তিদমনের শুষ্কতাকে গ্রহণ করব কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় না।

কিন্তু বীজকে এই জন্যই বলা যেতে পারে, 'তুমি নিজেকে বিদীর্ণ করো, বিলুপ্ত করো।' যেহেতু সেই বিলোপ তার ক্ষয় নয়, তাতেই তার আত্মোপলব্ধি। মানুষ আপনার ক্ষুদ্রজীবনের শক্তিকে অতিক্রম করবে আপনারই বড়ো জীবনের শক্তিলাভ করবার জন্যে। সেই অতিক্রম করার পথই হচ্ছে নীতির পথ, বুদ্ধদেব যাকে শীল বলেছেন সেই শীলের পথ। বীজের ভিতরকার গাছের মতো মানুষকে এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যেতে হবে বলেই মাঝখানে এত তার দ্বন্দ্ব, এত তার দুঃখ। কিন্তু বড়ো জীবনকে যে-মানুষ সুনিশ্চিত সত্য বলে জেনেছে এই দুঃখের মূল্য দিতে সে চিন্তামাত্রও করে না। এই জন্যেই মানুষকে এত করে বলতে হয়, 'জানথ আত্মানং', আত্মাকে জানো। আত্মাকে সত্য বলে জানলে সেই আত্মাকে প্রকাশ করবার পরমশক্তি নিজের মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করি। কিন্তু আত্মাকে সত্য বলে জানতে গেলেও তার আবরণ দূর করতে হবে। সেই আবরণকে দূর করবার জন্যেই প্রবৃত্তিকে দমন করা, স্বার্থকে ত্যাগ করা। বাধার ভিতর দিয়েও

আত্মাকে যতক্ষণ না সত্য বলে নিশ্চিত জানব, ততক্ষণ এই কাজ কঠিন, যখন সত্য বলে জানব তখন এই কাজ আনন্দময়।

১০ বৈশাখ বুধবার, ১৩২৬

যেটা আমার আপন আর যেটা আমার আপন নয় তার মধ্যে তফাত কত বড়ো সে একবার ভেবে দেখো। রাস্তা দিয়ে কত লোক চলেছে তারা আমার কাছে ছায়া বললেই হয় অর্থাৎ তাদের সত্য আমার কাছে ক্ষীণতম। কিন্তু যেই তাদেরই মধ্যে একজন আমার বন্ধু হয় অমনি এত বড়ো তফাত ঘটে যে তার পরিমাণ পাওয়া যায় না। আত্মা যখন কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তখন তার বাহ্য আকৃতি প্রকৃতি গুণের কোনো প্রভেদ ঘটে না অথচ পূর্বের থেকে এমন একটা প্রভেদ ঘটে যা অনির্বচনীয়। যা সত্য ছিল না তা সত্য হয়ে ওঠে। যদি দেখি স্পর্শমণি ছুঁইয়ে ঢেলাকে সোনা করা হল তাহলে সেটাকে আমরা বলি অলৌকিক। আত্মার স্পর্শমণিতে মুহূর্তেই যে কাণ্ড ঘটে সে এর চেয়েও অপরূপ।

এমনি করেই দেখতে পাই প্রত্যেক মানুষ বিধাতার সৃষ্টির মাঝখানে আবার একটি আপন সৃষ্টি রচনা করে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের নিজের জানা জিনিস এবং বেছে-নেওয়া জিনিসে তৈরি একটি স্বকীয় জগৎ আছে। সেই জগতের উপকরণ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে পৃথক। শুধু উপকরণ নয় সেই সব উপকরণ ও বিন্যাসও পৃথক। আমি আমার জগতে যে জিনিসকে সামনে রাখি ও তাকে যে মূল্য দিই, আর একজন হয়তো সেই জিনিসকেই পিছনে রাখে এবং তাকে অন্য মূল্য দেয়। এমনি করে উপাদানের বিচিত্র সমাবেশে ও মূল্যভেদে এই স্বকীয় জগৎগুলির পার্থক্যের আর অন্ত থাকে না।

এই জন্যেই দেখতে পাচ্ছি বিধাতার জগতে তারায় তারায় মিল আছে, সৌরমণ্ডলে গ্রহগুলি আপন নৃত্যে পরস্পর তাল কাটাকাটি করছে না। কিন্তু মানুষের স্বকীয় জগতে পরস্পর সংঘাত চলেছেই। কেবল প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর বিরোধ ঘটছে তা নয়, এক পরিবারের ভাইয়ে ভাইয়েও কত বিরোধ। তার পরে রাজার সঙ্গে প্রজার, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বিরোধ। এতেই যত দুঃখ যত অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়েছে। মানুষের সংসারে শান্তি বড়ো দুর্লভ, সুখ বড়ো অচিরস্থায়ী।

এই দুঃখ কী করে গোড়া ঘেঁসে দূর করা যেতে পারে সেই আলোচনা আমাদের দেশে অনেক-দিন থেকেই চলছে। সেই দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে অবশেষে আমাদের সংসারের মাঝখানে যে-আমিটা আছে তাকেই অপরাধী বলে গ্রেফতার করা হল। সে-ই যত ভেদ ঘটিয়েছে। এই ভেদ না থাকলে তো কোনো বিরোধই থাকে না।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, শুধু ভেদই তো বড়ো কথা নয়, ঐক্যও আছে। এক-আমির জগৎ এবং আর-এক আমির জগতে যদি আকাশ পাতাল তফাত থাকত তাহলে আমাদের না থাকত ভাষা, না থাকত সমাজ, না থাকত সাহিত্য শিল্প ধর্মতন্ত্র। মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অর্থাৎ যাতে তার স্থায়ী আনন্দ সে সমস্তেরই ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সাধারণ ঐক্যের মধ্যে।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মানুষ যখন এই ভেদটাকেই বড়ো করে ঐক্যকে খর্ব করে তখনি যত বিরোধ আর অমঙ্গল উপস্থিত হয়। জগতে যাঁরা মহাত্মা তাঁরা তাঁদের আমির মধ্যে সকল আমির ঐক্যটাকেই বড়ো করে দেখেন। অতএব একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে 'আমি' কেবল ভেদকেই দেখে, সেই ভেদের মধ্যে ঐক্যকেও সে দেখে। সেই দেখাই সত্যকে দেখা, মঙ্গলকে দেখা সুন্দরকে দেখা।

বহু আমির মধ্যে যে ঐক্যকে এক-আমি উপলব্ধি করে সেই ঐক্য সত্য ঐক্য, আনন্দের ঐক্য। একে সম্পূর্ণরূপে পাবার পাশেপাশেই অনেক বিরোধ অনেক দুঃখ। তাই বলে সেই বিরোধকে দুঃখকেই চরম বলা যায় না। পা যেমন চলে, পা তেমনি স্খলিতও হয়, তাই বলে বলা যায় না যে,

স্খলিত হবার জন্যেই পায়ের সৃষ্টি। কারণ স্খলন অনেক বেশি হলেও অল্পচলার মূল্যেও তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই এ সংসারে বিরোধজনিত যত দুঃখ পাই না কেন, মানুষ সেইটেকেই একান্ত বলে গ্রহণ করছে না। শিক্ষায় দীক্ষায় সাধনায় মানুষের নিরন্তর কঠিন চেষ্টা কল্যাণকে লাভ করা, কল্যাণকে স্থায়ী ও সফল করা। এই কল্যাণই হচ্ছে ভেদের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে পাওয়া বিরোধের মধ্য দিযে মিলনকে লাভ করা। যারা মন্দকেই বড়ো করে দেখে তারা বলবে এ লাভ মিলল কই? তারা এটা দেখছে না প্রতিদিনই মিলছে। সেই মেলার শেষ নেই। গাছের উদ্দেশ্য ফল ফলানো, কিন্তু সমস্ত গাছটাই আগাগোড়া ফল হয় নি বলে তাকে নিন্দা করে লাভ নেই। গাছের মধ্যে ফলটাই কম অথচ গৌরবে বেশি। মানুষের মধ্যেও তেমনি কল্যাণ। মুখে যা-ই বলুক কিছুতে মানুষ তাকে অবিশ্বাস করতে পারে না। হাজার বিরুদ্ধতাতেও এই বিশ্বাস টলল না। কেননা এই বিশ্বাস মানুষের 'আমি'র অন্তরে নিহিত। এই জন্যেই এই বিশ্বাসমতো চলাকেই মানুষ ধর্ম বলে। 'আমি'র মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাকেই একান্ত করার ভীষণ ফল সংসারের চারিদিকেই প্রভূত পরিমাণে দেখছি অথচ তাকেই মানুষ আপনার স্বভাব বলছে না; যদি বলত তাহলে সেই স্বভাবকেই প্রবল করা ও রক্ষা করা মানুষের একমাত্র কর্তব্য হত। মানুষের 'আমি' নদীর ধারার মতো; সে এক তটের সঙ্গে আরেক তটকে বিচ্ছিন্ন করছে, আবার মিলিত করছে—কেননা দুইয়ের মাঝখানে সে রস, সে গতি, সে গান, সে সফলতা, সে স্বাস্থ্য, সে সৌন্দর্য। সে এককেই বিচিত্র করছে এবং বিচিত্রকেই এক করছে।

১৩২৬

আকাশের নীহারিকার মধ্যে অণুপরমাণুর সংযোজনে যেমন নক্ষত্রসৃষ্টির ব্যাপার চলেছে তেমনি মানুষের মধ্যে জাতিসৃষ্টি চলেছে। এক এক দেশে এক এক দল লোক আত্মীয়তার বন্ধনে দৃঢ় হয়ে মিলছে। এই মিলন বিচিত্র প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তুলছে। এই মিলনের ভিতর থেকে কত বিশেষ চিন্তা, বিশেষ শিল্প, বিশেষ সাহিত্য, সবসুদ্ধ একটি বিশেষ ইতিহাস উৎসারিত হয়ে উঠছে।

মানবের ইতিহাসে দেখতে পাই যখনই জাতির এই বন্ধন বেঁধেছে তখনই মানুষ নিজেদের মিলনের কেন্দ্রস্বরূপ একটি দেবতাকে অনুভব করেছে—সে দেবতা অন্ধশক্তি নয়, ইচ্ছাশক্তি। ঐক্যের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ উপলব্ধি যা মানুষের আছে সে হচ্ছে নিজের আত্মা। মানুষের নিজের ভিতরকার সেই ঐক্য বাহিরে নিরন্তর বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে চলেছে। এই ঐক্যকে সে সপ্রাণ সজ্ঞান ইচ্ছাময় বলে জানে। এই জন্যই আপন দেশের জনসমবায়ের মধ্যে যে-শক্তিমান ঐক্যকে সে জানে তাকেও মানুষ ইচ্ছাশক্তি বলেই জানে, সেই ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সংগত করাকেই সে সাবচেয়ে বড়ো কর্তব্য বলে বোধ করে।

সেই আদিম মানুষের দেবতা নিজ নিজ সংঘের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ ছিল। তার কারণ, মানবের ঐক্যের অনুভূতিও সেই গণ্ডিতে রুদ্ধ ছিল। তখন এক দেশের লোকের সঙ্গে অন্য দেশের বিরোধ ছিল। এক দেশের কল্যাণ অন্য দেশের কল্যাণের সঙ্গে বাঁধা ছিল না। এই জন্যে বিশেষ জাতি নিজের বিশেষ দেবতাকে নিজেদেরই অনুকূল ও অন্যদের প্রতিকূল বলে জানত। এই জন্যই বহু বিরুদ্ধ দেবতাকে কল্পনা করতে হয়েছিল—এমন-কি, অন্যের শক্তিমান দেবতাকে মন্ত্রের দ্বারা নিজের আয়ত্ত করবার চেষ্টাও তখন দেখা গিয়েছে।

যাই হোক নিজেদের মিলনের মাঝখানে এই দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার ভিতরে মানুষের একটি গভীর মনের কথা আছে। এই পূজার দ্বারা মানুষ এই কথাই বলছে যে, আমাদের মিলনে নানা প্রয়োজন সাধিত হচ্ছে বটে কিন্তু সেই প্রয়োজনই এর মূল নয়, এর মূল হচ্ছেন একটি মহান পুরুষ। এই দেবতার ইচ্ছার মধ্যে নিজেকে অন্যের সঙ্গে বিধৃত জেনে তবে মানুষ শক্তি লাভ করেছে, গৌরব লাভ করেছে, আনন্দ লাভ করেছে। মানুষের নিজের ইচ্ছা আছে, অথচ যে

বৃহৎক্ষেত্রের মধ্যে সে চালিত হচ্ছে সেখানে ইচ্ছাশক্তি নেই কেবল আছে অন্ধ জড়শক্তি, সমগ্রের সঙ্গে নিজের এমন ভয়ংকর অসামঞ্জস্য মানুষ ভাবতেও পারে নি। নিজের ভিতরকার একটি প্রাণময় ইচ্ছাময় ঐক্যের অব্যবহিত যোগ থেকেই মানুষ একটি বিরাট ইচ্ছাকে সহজেই আবিষ্কার করেছে।

কিন্তু একদিন যা সহজেই আবিষ্কৃত হয়েছিল তাকে আবার বাধার ভিতর দিয়ে না পেলে সম্পূর্ণ করে পাওয়া হবে না। সম্প্রতি দীর্ঘকাল ধরে মানুষ সেই সন্দেহের ভিতর দিয়ে চলেছে। সন্দেহ জন্মাল কী করে? বিজ্ঞান, জগৎকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মহতী শক্তিকে ধরতে পারে কিন্তু মহান পুরুষ তাকে এড়িয়ে যায়। যেখানে সেই পুরুষ নেই শক্তি আছে সেখানে সে-শক্তি যন্ত্রমাত্র; সেই যন্ত্রে কৌশল আছে সফলতা আছে অথচ ইচ্ছা নেই আনন্দ নেই।

এমনি করে ইচ্ছার দেবমন্দিরে যন্ত্র আপন কারখানাঘর গড়তে শুরু করে দিলে, সেই যন্ত্র-শক্তিকে আয়ত্ত করবার যে সফলতা তাও মানুষ প্রভূত পরিমাণে পেতে লাগল। এতে করে একদিকে মানুষের ধনও যেমন বাড়ছে অন্যদিকে তার পীড়াও তেমনি বেড়ে উঠছে। কলের দাসত্ব করতে করতে মানুষের হৃদয় দলিত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনের সকল বড়ো বড়ো বিভাগেই কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্পর্ক, কেবলমাত্র ফললাভের সম্পর্ক, সব চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে—এইটে সৃষ্টির মিলন নয়, আত্মপ্রকাশের মিলন নয়, এর মধ্যে আনন্দময় অহৈতুক পরমরহস্যটি নেই। এর মধ্যে দ্বিজ মানুষের স্থান নেই, এর মধ্যে চরম মানুষের প্রকাশ নেই। পুরাকালে মানুষ অনেক ক্রূর দেবতার কল্পনা করেছে কিন্তু একালের ফললোলুপ যন্ত্রদেবতার মতো ভয়ংকর দেবতা কোনো কালে ছিল না—এই দেবতা বাহিরের পৃথিবীকে কলুষিত করেছে আর মানবজীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করছে।

য়ুরোপে পলিটিক্সে বাণিজ্যব্যাপারে এই যন্ত্রদেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই যন্ত্রদেবতা একতলা-বাসী, এ কেবল অর্থকেই জানে, পরমার্থকে জানে না। কিন্তু এই দেবতা কানা বটে তবু পঙ্গু নয়। এ দেবতার মধ্যেও একটি বড়ো সত্য আছে সেই সত্যটি হচ্ছে বিশ্বনিয়ম। সুতরাং এ সত্য কখনও নিষ্ফল হতে পারে না। তাই এ দেবতা সার্থকতা যদি বা না দেয় সফলতা দেয়।

কিন্তু আমাদের সমাজের দিকে চেয়ে দেখো এখানেও জড়দেবতা। যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণ করেন এ সে দেবতা নয়, আর যে নিয়ম বিশ্বব্যাপারকে চালনা করে এ সে-নিয়মও নয়। এ হচ্ছে আচার, অর্থাৎ নিয়ম বটে কিন্তু কৃত্রিম নিয়ম। অর্থাৎ একে যন্ত্র তাতে নিষ্ফল যন্ত্র। য়ুরোপে যে যন্ত্রের পূজা হয় তাতে মানুষের বুদ্ধি লাগে উদ্যম লাগে, তাতে প্রকৃতির ক্ষেত্রে মানুষ নূতন নূতন পথ উদ্ঘাটন করেছে। কিন্তু আমাদের সমাজ যে-সব নিয়মে চলছে তাতে বুদ্ধিকে প্রবেশ করতে দিলেই বিপদ, তার জন্যে কেবল পুঁথি আবৃত্তি করতে হয়। য়ুরোপে সফলতালাভের লোভে বহু সংখ্যক লোককে কঠোর বন্ধন স্বীকার করতে হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা মানুষকে খর্ব করেছি, তাকে তার ঈশ্বরদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, কিসের জন্য? কোনো ফললাভের জন্যে নয়। কৃত্রিম সমাজের যে চাকা কোথাও অগ্রসর না হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলই ঘুরছে তার ব্যর্থ ঘূর্ণগতি চিরস্থায়ী করবার জন্যে। এই আচারযন্ত্রকে দেবতার আসনে বসিয়ে এর কাছে প্রতিদিন নরবলি নারীবলি দিচ্ছি। এই সমাজে মানুষ বিশ্বের নামে বিশ্বদেবতার নামে মিলল না, বিভক্ত হল মিথ্যা আচারের নামে, যে আচারে মানুষকে নিরর্থক এবং অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে নিয়ত ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। তিনি সত্য সম্বন্ধে মানুষকে বাঁধবার জন্যে ডাক দিয়েছেন তাঁকে অবজ্ঞা করে পৃথিবীতে আজ আমরা কেউ বা রাষ্ট্রীয় কল কেউ বা সামাজিক কল স্থাপন করলুম, তার মধ্যে দয়া নেই ধর্ম নেই। সৃজনের যে মূলনীতি তাকে এমনি করে আঘাত করছি।

১৩২৬

পৃথিবীর চার দিকে একটি হাওয়ার মণ্ডল আছে, সেটি সূক্ষ্ম, সেটিকে দেখা যায় না, কিন্তু সেইটিই পৃথিবীর প্রাণ, তার ভিতর দিয়েই পৃথিবীর রৌদ্রবৃষ্টির লীলা।

আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার চার দিকে তেমনি একটি সূক্ষ্মভাবের পরিমণ্ডল আছে। অনেক জ্ঞানী অনেক প্রেমিক অনেক কর্মবীরের বাণী দিয়ে জীবন দিয়ে সেটি রচিত— সেইটি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত থেকে আমাদের আত্মাকে প্রাণ দেয়, দীপ্তি দেয়, রস দেয়। আমরা যেটিকে বলি সাধু-সঙ্গ, অথবা যেটিকে বলে থাকি বিশেষ স্থানমাহাত্ম্য, সেও আমাদের এই আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডলের অঙ্গ।

পৃথিবী আপন বায়ুমণ্ডলকে আপন আকর্ষণ শক্তির জোরে নিজের চার দিকে বেঁধে রেখেছে। আমাদের আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডলকেও তেমনি নিজের কেন্দ্রবর্তী টানের জোরে বেঁধে রাখতে হয়। চাঁদ আপন বায়ুকে বেঁধে রাখতে পারলে না, সব বাষ্প আকাশে উড়ে গেল— তাই চাঁদ গেল শুকিয়ে, চাঁদ গেল মরে। অথচ বাইরে থেকে দেখি, ধনীর ঐশ্বর্যের মতো সে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। আমরাও তেমনি ধনে মানে বাহিরে উজ্জ্বল হয়েও ভিতরে আত্মাকে শুকিয়ে ফেলতে পারি নিষ্ফল করতে পারি— কেবলমাত্র এই অতি সূক্ষ্মভাবের হাওয়াটিকে নিরন্তর চার দিকে যদি আঁকড়ে না রাখি।

এই তো গেল চারি দিকের হাওয়ার কথা। তারপরে নিজের ভিতর থেকে ফসল ফলিয়ে তোলবার যে সচেষ্টতা সেও চাই। বাইরের বায়ুমণ্ডল থেকে আমরা পাই, কিন্তু ভিতরের শক্তি থেকে আমরা যদি দিতে পারি তবেই আমাদের পাওয়া সার্থক হয়।

সাধারণত দেখা যায় আমাদের দেশে ধর্মসাধনায়, হয় ধ্যানবিলাসিতা, নয় ভাববিলাসিতা অত্যন্ত বেশি। আমাদের জ্ঞানের অবিচলিত গাম্ভীর্যে কিংবা ভাবরসম্ভোগের উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্যে পূর্ণ হওয়াকেই সাধনার লক্ষ্য বলে তৃপ্তিলাভ করি। এই জ্ঞান কিংবা রস যেটাকে আমরা আপনার মধ্যে পাই, সেটাকে সচেষ্ট জীবনের সার্থকতায় বাইরে ফলিয়ে তুললে তবেই অন্তরবাহিরের যোগে সাধনা সম্পূর্ণ হয়, এই কথাটা আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই।

ধর্মসাধনায় চরিত্র একটা বড়ো সম্পদ। এই চরিত্রের প্রকাশ এবং প্রমাণ হচ্ছে বাইরের দিকে, জগতের কাজে। পৃথিবী আকাশ থেকে বৃষ্টি পেলে, রৌদ্র পেলে, পেয়ে সেটিকে আত্মসাৎ করে যদি ঢেকে রেখে দেয় তবে পাওয়ার প্রমাণ হয় না, পাওয়ার সম্মান হয় না। সে আপনার ভিতর থেকে বিচিত্র প্রাণের সম্পদকে উদ্ঘাটিত করে যখন আকাশের দিকে তুলে ধরে তখনই তার সমস্ত পাওয়া সার্থক হয় দেওয়ার মধ্যে। তার আপনাকে প্রকাশই হচ্ছে আপনাকে দান।

পৃথিবীর যেমন এই প্রাণবান সচেষ্ট শক্তি নানা সৃজনে প্রকাশ পায়, তেমনি মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনাও মানুষের কর্মে প্রকাশ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। এই উদ্যমশক্তির দিকটাই হচ্ছে মানুষের চরিত্র বিভাগ। জ্ঞানচর্চায় ভাবচর্চায় আমাদের যেটুকু কাজ, সে হচ্ছে আমাদের ভোজনের কাজের মতো— কোনটা কী পরিমাণে নেব এবং কোনটা কী পরিমাণে ছাড়ব সেইটে বাছাই করা। কিন্তু ভোজনের দ্বারা যে স্বাস্থ্য ও শক্তি পাওয়া গেল সেইটেকে খাটাবার পথ নিজের পাকশালা বা পাকযন্ত্রের দিকে নয়– তার উল্টো দিকে। তেমনি কোন পথে কী ভাবে নিজেকে কর্মে উৎসর্গ করতে হবে সেই চিন্তা ও সেই চেষ্টাই হচ্ছে চরিত্রের কাজ।

চরিত্রেরও দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে নিয়ত চেষ্টায় তার শক্তিকে বিশুদ্ধ করা, তাকে মোহমুক্ত করা। আর একটা হচ্ছে তাকে প্রয়োগ করা। একদিকে বাইরের নানা শাসন, নানা অভ্যাস, স্তুতিনিন্দার নানা তাড়না আমাদের কর্মশক্তিকে জড়িত ও চালিত করছে, আরেকদিকে ভিতরে আমাদের নানা রিপু তাকে আপন আপন ছাঁচে ঢেলে নানারকম বাঁকিয়ে চুরিয়ে দিচ্ছে। এই যে সমস্ত বিক্ষেপের কারণ আছে তার থেকে নিজের চরিত্রকে বাঁচাবার জন্যে প্রত্যহ চেষ্টা করা চাই। এই চেষ্টা মনে মনে কিছুতেই হতে পারে না। সুরের গলা যদি ঠিক রাখা না হয়ে থাকে তবে বিশুদ্ধ সুরের সঙ্গে মিলিয়ে গান গাইলেই তবে গলার সংশোধন হয়। অন্তরকে কর্মক্ষেত্রে

বাহিরে প্রকাশ করাই নাকি চরিত্রের কাজ সেই জন্যে বিশুদ্ধ সংকল্পের সুরটি অন্তরে রেখে বাহিরের কর্মের দ্বারাই চারিত্র বললাভ এবং শুদ্ধিতা লাভ করে। শুধু মাত্র জ্ঞান এবং রস-ভোগেই যদি মানবপ্রকৃতির পূর্ণতা হত তাহলে এই কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হত না।

এই চারিত্রকে বিশুদ্ধ করবার জন্যে বৌদ্ধধর্মে শীলগ্রহণের উপদেশ আছে। ভালো হও, ভালো হব একথাটা অত্যন্ত বড়ো এবং অস্পষ্ট। একথাটাকে ব্যবহারে লাগাতে গেলে একেবারে সমস্তটাকে আঁকড়ে ধরা চলে না। ভাবের দিকে, আকাঙ্ক্ষার দিকে, উৎসাহের দিকে চলে কিন্তু কাজের দিকে চলে না। এই কারণে চিত্তের দিকে ভূমাকে ভূমা বলেই উপলব্ধি করা চাই, কিন্তু কর্মের দিকে তাকে একটি ক্রম পরম্পরার ভিতর দিয়ে অনুসরণ ও প্রকাশ করতে হয়।

একটি সদুদ্যমের সঙ্গে আরেকটি সদুদ্যমের স্বাভাবিক যোগ আছে। এই জন্যে যদি সাধারণ-ভাবে সকল সদিচ্ছাকেই স্বীকার করে নিয়ে বিশেষভাবে একটি বা দুটিকে জীবনে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার সাধনা করা যায়, এবং ক্রমশ তার ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে সেই প্রণালীটি কাজের হয়; অথচ সেটা যে বস্তুত সংকীর্ণ হয় তাও হয় না; কারণ সত্য প্রাণধর্মী; এই জন্যে তার বীজের মধ্যে অরণ্য থাকে, তার ছোটোর মধ্যে বড়ো, তার একের মধ্যে অনেকের স্থান।

এই জন্যেই, জ্ঞাতসারে মিথ্যা বলব না, কাউকে অন্যায় দুঃখ দেব না আত্মাভিমানকে খর্ব করব প্রভৃতি যে-কোনো শীলগ্রহণের দ্বারা সমস্ত চিত্তকেই বৃহৎ কল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। কারণ কল্যাণের সাধনাই কল্যাণ, তার ফল যে কেবল পরিণামে তা নয়, তার ফল প্রতি পদবিক্ষেপেই। শীলগ্রহণের দ্বারা একটি কথা সর্বদাই আমাদের মনে থাকে যে, আত্মার গতি স্বার্থের গতির উল্টো দিকে; মনে থাকে, আত্মাকে প্রবৃত্তির রঙিনসূত্রে জড়িত গুটির মধ্যে বন্দী করে রাখা তার সার্থকতা নয়; তাকে মুক্তি দিতে হবে। এই কথাটা প্রতিদিনের সুখদুঃখের হট্টগোলের মধ্যে মনে রাখাই মস্ত কথা।

১৩২৬

এখানে যারা এসে একসঙ্গে মিলেছি তাদের অনেকেই একদিন পরস্পরের পরিচিত ছিলুম না; কোন্ গৃহ থেকে কে এসেছি তার ঠিক নেই। যেদিন কেউ এসে পৌঁছল তার আগের দিনেও তার সঙ্গে অসীম অপরিচয়। তারপর একেবারে সেই না-জানার সমুদ্র থেকে জানাশোনার তটে মিলন হল, তার পরে এই মিলনের সম্বন্ধ কতদিনের কত না-দেখাশুনোর মধ্য দিয়েও টিঁকে থাকবে। এই জানাটুকু কতই সংকীর্ণ অথচ তার পূর্বদিনের না-জানা কত বৃহৎ।

মায়ের কোলে যেমন ছেলেটি এল, অমনি মনে হল এদের পরিচয়ের সীমা নেই। যেন তার সঙ্গে অনাদিকালের সম্বন্ধ অনন্তকাল যেন সেই সম্বন্ধ থাকবে। কেন এমন মনে হয়? কেননা সত্যেরও সীমা দেখা যায় না। সমস্ত 'না' বিলুপ্ত করেই সত্য দেখা দেয়। সম্বন্ধ যেখানেই সত্য সেখানে ছোটো হয় বড়ো, মুহূর্ত হয় অনন্ত। সেখানে একটি শিশু আপন পরম মূল্যে সমস্ত সৌরজগতের সমান হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে কেবল জন্ম এবং মৃত্যুর সীমার মধ্যে তার জীবনের সীমা দেখা যায় না, মনের মধ্যে আকাশের ধ্রুব তারাটির মতো সে দেখা দেয়। যার সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর হয় নি, তাকে মৃত্যুর মধ্যে কল্পনা করতে মন বাধা পায় না, কিন্তু পিতামাতাকে ভাইকে, বন্ধুকে যে জানি সেই জানার মধ্যে সত্যের ধর্ম আছে—সেই সত্যের ধর্মই নিত্যতাকে জানিয়ে দেয়। অন্ধকারে আমরা হাতের কাছের একটুখানি জিনিসকে একটুখানি জায়গার মধ্যে দেখতে পাই। একটু আলো পড়বামাত্র জানতে পারি যে, দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু ভয়ভাবনা সে কেবল অন্ধকার থেকেই হয়েছে। সত্য সম্বন্ধ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই আলো ফেলে এবং এই আলোতে আমরা নিত্যকে দেখি।

হৃদয়ের আলো হচ্ছে প্রীতির আলো, অপ্রীতি হচ্ছে অন্ধকার। অতএব এই প্রীতির আলোতে

আমরা যে সত্যকে দেখতে পাই সেইটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে; বাহিরের অন্ধকার তাকে যতই প্রতিবাদ করুক এই শ্রদ্ধাকে যেন বিচলিত না করে। সত্যপ্রীতির কাছে অল্প বলে কিছু নেই, সত্যপ্রীতি ভূমাকেই জানে। সংসার সেই ভূমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যু সেই ভূমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে থাকে কিন্তু প্রেমের অন্তরতম অভিজ্ঞতা যেন আপনার সত্যে আপনি বিশ্বাস না হারায়।

পূর্বে বলেছি অপরিসীম অজানার থেকে জানার মধ্যে মানুষ আসবামাত্র সেই না জানার শূন্যতা এক নিমেষে চলে যায়—সেই না জানার মহাগহ্বর সত্যের দ্বারা নিমেষে পূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে বুঝতে পারি আমাদের গোচরতা এবং অগোচরতা দুইকেই ব্যাপ্ত করে সত্যের লীলা চলছে। অগোচরতা সত্যের বিলোপ নয়। পাবার বেলায় এই যে আমাদের অনুভূতি ছাড়বার বেলায় একে আমরা ভুলব কেন? ঢেউয়ের চূড়াটি নীচের থেকে উপরে যখন উঠে পড়ল তখন সত্যের বার্তা পেয়েছি। ঢেউয়ের চূড়াটি যখন উপর থেকে নীচে নেমে পড়ল তখন সত্যের সেই বার্তাটিকে কেন বিশ্বাস করব না? এক সময়ে সত্য আমাদের গোচরে এসে 'আমি আছি' এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে লিখে দিলে—তার স্বাক্ষর রইল। এখন সে যদি অগোচরে যায় অন্তরের মধ্যে তার এই দলিল মিথ্যা হবে কেন? ঋষি বলেছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, মৃত্যু সৃষ্টির বিরুদ্ধ শক্তি নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে যেগুলি চালক শক্তি তার মধ্যে অগ্নি হচ্ছে একটি; অণুপরমাণুর অন্তরে অন্তরে থেকে তাপরূপে অগ্নি যোজন বিযোজনের কাজ করছেই। সূর্যও তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে এবং ঋতু সংবৎসরকে চালনা করছে। জল পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান, বায়ু পৃথিবীর নিশ্বাসে নিশ্বাসে সমীরিত। সৃষ্টির এই ধাবমান শক্তির মধ্যেই মৃত্যুকেও গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই প্রাণকে অগ্রসর করে দিচ্ছে--মৃত্যু ও প্রাণ এই দুইয়ে মিলে তবে জীবন। এই মৃত্যুকে প্রাণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভক্ত করে দেখলে মিথ্যার বিভীষিকা আমাদের ভয় দেখাতে থাকে। এই মৃত্যু আর প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিরাট ছন্দের মধ্যে আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিধৃত হয়ে লীলায়িত হচ্ছে; এই ছন্দের যতিকে ছন্দ থেকে পৃথক করে দেখলেই তাকে শূন্য করে দেখা হয়, দুইকে অভেদ করে দেখলেই তবেই ছন্দকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই যতিকে ছন্দের অঙ্গ বলে দেখা সহজ হয়। কেননা আমাদের প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্যে শ্রাদ্ধের দিন হচ্ছে শ্রদ্ধার দিন,—এই কথা বলবার দিন যে, মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রদ্ধা করি।

আমাদের প্রেমের ধন স্নেহের ধন যারা চলে যায় তারা সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে দিক, তারা আমাদের জীবনগৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায় তার মধ্য দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি, অসীম পূর্ণতাকেই যেন দেখতে পাই। আমাদের সেই যে অসত্যদৃষ্টি যা জীবন মৃত্যুকে ভাগ করে ভয়কে জাগিয়ে তোলে, তার হাত থেকে সত্যস্বরূপ আমাদের রক্ষা করুন, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতে নিয়ে যান।

১৩২৬

আমাদের গৃহ এক জায়গায় বিদ্যালয় আর এক জায়গায়; প্রয়োজনের খাতিরে গৃহের সঙ্গে শিক্ষার এই বিচ্ছেদ আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা দুঃখ আছে, সুতরাং এই বিধানকে কোনোমতেই আমরা চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারি নে। আমাদের বলতেই হবে যে, শিশুশিক্ষার সমস্যা মানুষের মধ্যে ঠিকমতো সমাধান করা হয় নাই, তাই স্বভাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধে আমাদের যেতে হয়েছে, পাখির ছানা নীড়ের মধ্যে পক্ষীমাতার কাছেই তার প্রথম শিক্ষা

পায়—সেই শিক্ষায় তার আনন্দ। মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়। সেই কান্নার মধ্যেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েছে।

শুধু শিক্ষা নয়। কর্মের সঙ্গে গৃহের এই বিচ্ছেদ আরও প্রবল। আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কর্মীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কর্মের যোগ নেই। এতে মানুষের দারুণ পীড়া। মাটি থেকে গাছকে উপড়ে নিলে তার যে দশা হয় এতে মানুষের সেই দশা হচ্ছে। সে শুকিয়ে যাচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে, তার মানসিক শক্তির সংকীর্ণতা এবং জড়তা ঘটছে। সে আগাগোড়া কেবল তার আপিসের ফরমাসের জিনিস হয়ে উঠছে, তার নিজের স্বাভাবিক জীবন বলে আর কিছুই বাকি থাকছে না। বর্তমান যুগের সভ্যতা অধিকাংশ মানুষকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে ছিন্ন করে আনছে।

স্বস্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার যে অধিকার, সে আজ কেবল সেই অল্প কয়জন পায় যাদের অর্থ আছে। সেই অল্পসংখ্যক মানুষের জন্যে অধিকাংশ মানুষ নিজেকে খর্ব করছে—আধুনিক সভ্যতার লক্ষণই এই। এ সভ্যতা মানুষকে মানে না। বস্তুকে, পণ্যকে, কার্যপ্রণালীকে মানে। বস্তুত এটা দাসত্বের যুগ। যেখানে কর্মের সঙ্গে কর্মীর আন্তরিক সম্বন্ধ নেই, যেখানে স্বভাবের সঙ্গে কর্মের যোগ বিচ্ছিন্ন, সেখানেই দাসত্ব। সেই দাসত্ব আজ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত। ইংরাজ জাতি বলে, তারা দাসত্ব প্রথা দূর করেছে। সে কথাটা স্থূলভাবে অধিকাংশভাবে সত্য। অল্প কয়েকজনের যে বিশেষ এক রকমের দাসত্ব ছিল, সেইটেই তারা দূর করেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতিই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরদাসত্ব না করলে সে সভ্যতা চলেই না। যে সমস্ত উপকরণ তার অত্যাবশ্যক, তার পরিমাণ অতি বিপুল; তাকে যথাসম্ভব সুলভ করাও চাই; এই দ্রব্য উৎপাদন এবং সংগ্রহ চেষ্টায় মানুষের সেই অবকাশ অল্প হয়ে গেছে যে-অবকাশে তার স্বাধীন ইচ্ছা আশ্রয় পায়, যে-অবকাশে অন্ন স্বাভাবিক আত্মীয়-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা।

প্রবৃত্তির দাস পশু; বাহ্যপ্রাকৃতিক নিয়মের শাসনে পশু একান্ত চালিত; মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই পশুবিভাগও আছে। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব এই বিভাগের ঊর্ধ্বে যেখানে সে কর্তা, সে মুক্ত, সেখানে সে আধ্যাত্মিক মানুষ! বর্তমান সভ্যতায় সেই আধ্যাত্মিক মানুষের সঙ্গে সাংসারিক মানুষের বিচ্ছেদ ঘটেছে।

এই সভ্যতার পূর্ববর্তীকালে মানুষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনেক কম জানত, অনেক বিষয়ে তার অন্ধসংস্কার ছিল, এ সমস্তই সত্য। কিন্তু সংসারের সঙ্গে আত্মার বিরোধ তখন এত ভয়ংকর ছিল না। আজ সংসারভার অত্যন্ত প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। মানুষের প্রয়োজনের জটিলতা অতিশয় পরিমাণে বেড়ে ওঠাতে সকল দিকে তার আয়োজন দুঃসাধ্য হয়েছে। এমন কি, আমোদ আহ্লাদে খেলাধুলার উপকরণ পর্যন্ত দুর্মূল্য।

জীবনযাত্রার উপকরণ যখন দুর্মূল্য এবং তা সংগ্রহ যখন কষ্টসাধ্য হয় তখন সে সম্বন্ধে মানুষের অহংকার খুব প্রবল হয়ে ওঠে। সেইজন্যে উপকরণ-বানের আত্মাভিমান আগেকার দিনের চেয়ে এখন অনেক বেশি হয়েছে। যে অভাব মোচন মানুষের অত্যাবশ্যক তার জন্যে তাকে তত বেশি প্রয়াস পেতে হয় না,—কিন্তু 'আমি ধনী' এই অহংকারকে আজকালকার দিনে ভালো করে ব্যক্ত করার উপযুক্ত ধন অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু এই ধনী বলে জানাবার আকাঙ্ক্ষা অধিকাংশ লোকেরই মনে জাগরূক; সেই জন্যে এই আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় মানুষ এমন কর্মের বন্ধন গ্রহণ করে যে-বন্ধনে তার জীবনের সমস্ত অবকাশটাকে ধন-নিষ্কর্ষণের জাঁতার সঙ্গে ঘানির সঙ্গে পশুর মতো বেঁধে রাখে।

সংসার আজকাল এত অত্যন্ত বেশি দাবি করে বলেই মানুষের বেশির ভাগ শক্তি তার নীচের তলায় তার আপিস ঘরেই খাটে। অর্থাৎ তার অহং-এর দরবারেই তার দিন যায়। তার উপরের তলায় যে অধ্যাত্ম-নিকেতন আছে সেখানে তার যাতায়াত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সংসারটাই দলে

দলে সমস্ত মানুষকে প্রবল টানে টানছে বলেই যেনাহং নামৃতঃস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্ এটা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কথার কথা হয়ে উঠেছে। অধ্যাত্ম-জীবনের সম্পদের তুলনায় সংসারের ধনমান যে তুচ্ছ একথা সমস্ত বিরুদ্ধ পৃথিবীর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলবার শক্তি কত অল্প লোকেরই আছে! সমাজের অধিকাংশ লোকে মিলে যে জিনিসকে মূল্য দেয় সেই জিনিসটাই ব্যক্তিবিশেষের কাছে মহামূল্য হয়ে ওঠে—সেই জিনিসটা সংগ্রহের দ্বারা সকল লোকের কাছে যে গৌরব লাভ করে—এটা প্রবল প্রবর্তনা। আজকালকার দিনে বাইরের উপকরণগুলি যখন সেই অত্যন্ত বেশি দাম পেয়েছে তখন আত্মার দিকে তাকিয়ে কজন বলতে পারে, যেনাহং নামৃতঃস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

এই কারণেই আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সাংসারিক জীবনযাত্রার বিচ্ছেদ আজ এতই কঠিন হয়েছে। সেই জন্যে আপনার নীচের তলা থেকে উপরতলায় যেতে মানুষ এত বেশি দুঃখ অনুভব করে। কেননা ব্যবহারের অনভ্যাসে সিঁড়িটা হয়েছে জীর্ণ। এতে করে মানুষ ছোটো হয়ে গেছে।

য়ুরোপে যুদ্ধ যারা করছিল তারা আজ ক্লান্ত হয়েছে। তারা বলছে, এই সংসারটার পরিবর্তন দরকার। তারা বলছে স্বদেশের একান্ত স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যের অত্যন্ত রেষারেষি, এতে কল্যাণ নেই। দলটাকে আরও বড়ো করতে হবে। কয়েকটা প্রবল জাতি মিলে একটা আন্তর্জাতিক সংঘ গড়ে তোলা যাক্। কিন্তু এ-ও বাইরের কথা। সেই আন্তর্জাতিক সংঘ কাকে প্রকাশ করবে? মানুষের শক্তিকে, না মানুষের আত্মাকে? এই প্রশ্নের সত্য উত্তরের উপরেই সব নির্ভর করবে।

আত্মাকে প্রকাশের ভার কোনো সম্প্রদায়ের উপর নয়, আমাদের প্রত্যেকের উপর। যে একে প্রকাশ করবে সে কেবল নিজের পথকে আলোকিত করবে না, সমস্ত মানুষকে সাহায্য করবে; মানুষ সব চেয়ে বড়ো ভুল ভুলেছে, আপনাকে ভুলেছে, তার ভুল ভাঙিয়ে দেবে। সবাই যখন 'চাই' 'চাই' বলে নিদারুণ হয়ে উঠেছে তখন আপন অন্তরে আনন্দ থেকে বলতে হবে, 'চাই না'। সেই 'না' শূন্য নয়, সেই 'না' পরিপূর্ণ কল্যাণে। সেই 'না'-এর আসন ভরপুর করে বসে আছেন তিনি যাঁকে আমরা নমস্কার করে বলি 'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ'।

য়ুরোপের মধ্যযুগকে অন্ধযুগ নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নাম সত্য নয়। নিশ্চয়ই সে-যুগে অন্ধকার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তখনকার মানুষ সেই অন্ধকারকেই চরম বলে স্বীকার করে নেয় নি। তারা বলেছিল, 'অন্ধকার থেকে আলোকে যাব।' তারা অনুভব করেছিল এই অন্ধকারের বাইরে আলো আছে। সেই আলোর লক্ষ্যই মানুষের শেষ লক্ষ্য। যেটার মধ্যে জড়িত হয়ে আবৃত হয়ে আছি সেটাকে বিদীর্ণ করে ছাড়িয়ে যেতে হবে এই কথাটা তখনকার মানুষ অনুভব করেছিল। তাই আপনার আবরণের সঙ্গে তখনকার মানুষের একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত থামে নি। তখন মানুষ দারিদ্র্যব্রত নিতে প্রস্তুত হয়েছিল আত্মার সম্পদকে সত্য করে জানবার জন্যে। তখন টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তিকে সকলের চেয়ে বড়ো মান দেওয়া হয় নি। তখন রাজাকে মাথা হেঁট করতে হয়েছে তাদের কাছে যারা রাজত্বকে গ্রাহ্য করে নি।

আজ মানুষ গৌরব করে বলছে আমাদের এই ডিমক্রেসির যুগ, আমাদের আজ সকলেই রাজা। অবশ্য একথাটা ছোটো নয়। মানুষের অধিকার যে দিকে যতই বড়ো হোক ততই ভালো। কিন্তু তবু 'ততঃ কিম্!' একজন রাজার জায়গায় দশ বিশ কোটি রাজা নিয়েই কি পৃথিবীর চরম সার্থকতা? প্রভুত্বই কি সব চেয়ে বড়ো? মুক্তি কি তার চেয়ে বড়ো নয়? এই যে সব লক্ষ লক্ষ প্রভুরা মিলে বাণিজ্যের কলুষে পৃথিবীর দেশবিদেশকে কলঙ্কিত করছে, স্বার্থপর রাষ্ট্রনীতিকে সুগভীর গূঢ় মিথ্যার চোরাবালির উপর গড়ে তুলতে যাচ্ছে, আর পরস্পর হানাহানি করে ভ্রাতৃ-রক্তের ভীষণ বন্যায় ধরণীকে অপবিত্র করছে—এই যে সব যূথবদ্ধ লুব্ধতা ও হিংস্রতার কীর্তি-কলাপ, এটা এক প্রভুর না হয়ে বহু প্রভুর কৃত বলেই কি মস্ত গৌরবের বিষয়।

প্রভুত্ববান বহু পুরুষের হুহুংকারে আজ আকাশ আলোড়িত, কিন্তু মুক্ত পুরুষদের নির্মল প্রশান্ত জ্যোতি তো আজ লোকালয়ে দেখা যায় না? আজ ঝড়ের আকাশে মুহুর্মুহু অট্টহাস্যে

বিদ্যুৎ হানছে, কিন্তু সপ্তর্ষিকে দেখি নে কেন? ধ্রুবতারা কোথায়? আজ মৃতমাংস নিয়ে সব গৃধ্র শকুন মাতামাতি করছে কিন্তু অমৃতের বার্তা নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় পুরুষ কই আসে?

বহুলক্ষ রাজা আমাদের যা না দিতে পারে একজন মুক্ত পুরুষ জগৎকে তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে পারে এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি বর্তমান যুগ তার শ্রদ্ধা হারিয়েছে বলেই আজ শক্তির সাধনা পণ্যের সাধনা নিয়েই প্রভুত্ব-অধিকারদৃপ্ত ডিমক্রেসি মেতে রয়েছে; মুক্তির সাধনাকে এ যুগ বিস্মৃত হয়েছে। এই সাধনার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ভার ভারতবর্ষ কি আজ নিতে পারে না। মানুষের অহমিকা আজ বড়ো বড়ো নাম ধরে মানুষকে অভিভূত করছে, সেই অভিভূতি থেকে ভারতবর্ষ আপনাকে যদি বাঁচাতে পারে তাহলে সমস্ত মানুষকে বাঁচাবার পথ সে বের করবে। আর কিছু নয় মানুষের আত্মাকে সে যদি মানুষের সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়ো বলে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে পারে তাহলেই সেই সত্য শ্রদ্ধার জোরে সে অসাধ্য সাধন করতে পারবে। কেননা আত্মার শক্তি সকল শক্তির চেয়ে বড়ো, বিনা অস্ত্রে দেশকে এবং কালকে সে জয় করে, শৃঙ্খলে তাকে বন্দী করে না, মৃত্যু তাকে নিহত করে না, দরিদ্র তাকে দীন করে না, এবং অগ্নিশিখার গায়ে যেমন পঙ্কলেপন অসম্ভব তেমনি কোনো অসম্মান তাকে বাহির থেকে স্পর্শ করেও কলঙ্কিত করতে পারে না।

৩ অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩২৬

ভিড় ঠেলে আসতে হল মন্দিরের দ্বারে। কিন্তু আমরাও তো ভিড়ের মানুষ, এর বাহিরে যাব কোথায়? শান্ত হয়ে বসে শোনা যাক এই কোলাহলের কেন্দ্র হতে যে বাণী উৎসারিত হচ্ছে।

আজকের মেলায় কত লোক মাঠে মাঠে কত দিকে ছড়িয়ে রয়েছে,—কেউ এ-বাজারে কেউ ও-বাজারে, কেউ আলো দেখছে কেউ যাত্রা শুনছে, তাদের প্রত্যেকের ডাক হাঁক কথাবার্তা সমস্ত স্বতন্ত্র। এই ভিড়ের মধ্যে আমরা পৃথিবীর লোকালয়কে সংহত করে দেখছি। একবার তাকে কল্পনা করে দেখো। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ এই মুহূর্তে কত হাট কত বাজার, কত ঘর কত পথ, কত কাজ কত কথা, কত আমোদ, কত কান্না, তার অন্ত নেই। তারই কণা পরিমাণ একটুখানিকে এই মাঠে একটি মেলায় আমরা যেমনি সংহত করেছি অমনি অসীম নক্ষত্রলোকের নীরবতা লুপ্ত হয়ে গেল।

এই সর্বগ্রাসী কোলাহলটাই কি লোকালয়ের সত্যকার জিনিস? এরই সঙ্গে সঙ্গে আকাশের যে বিপুল শান্তি আছে তাকে কি বাদ দিয়েই দেখতে হবে? আজ তাকে বাদ দিয়ে মাঠের মধ্যে যে অবিমিশ্র কোলাহলটাকে পাচ্ছি সেইটেই যদি সমস্ত পৃথিবীর জিনিস হত তাহলে আমাদের কান ফেটে যেত, আমাদের মন উদভ্রান্ত হয়ে যেত। কিন্তু আসলে, দেশ ও কালের ভিতরকার উদার শান্তি মানুষের সংসার-কোলাহলের চেয়ে ঢের বড়ো বলেই আমরা বেঁচে আছি, নইলে আমরা নিজেদের সম্মিলিত তাপে দগ্ধ হয়ে সম্মিলিত বেগে পিষ্ট হয়ে পাগল হয়ে মারা যেতুম।

বৈজ্ঞানিকেরা জীবের জীবনসংগ্রামকে মনে মনে অনেক সময়ে এই রকম সংহত করে কল্পনা করেন। তখন তাঁরা কেবল একান্ত করে এই দেখতে পান যে, প্রাণীরা টিঁকে থাকবার জন্য ভীষণ উদ্যমে ঠেলাঠেলি হানাহানি করছে। এই রকম করে দেখবামাত্রই তাঁরা এই মেলার কোলাহলের মতোই একটা জিনিস মনে মনে তৈরি করে তোলেন সে জিনিসটা কৃত্রিম, কেননা এর সঙ্গে সঙ্গে এর উপরকার বড়ো জিনিসটা নেই। জীবজন্তুর হানাহানি যে স্নেহের সঙ্গে সহযোগিতার সঙ্গে শান্তির সঙ্গে মিশিয়ে আছে, সে এই হানাহানির চেয়ে অনেক বড়ো।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে, সে দৃশ্য দুঃসহ। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে এই যুদ্ধ তো অন্য নামে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে; প্রতিযোগিতা, হিংসা ও মৃত্যুর সমগ্র পরিমাণ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিমাণের চেয়ে অনেকগুণে বেশি কিন্তু তবু তো এই যুদ্ধের নিদারুণতা আমরা প্রত্যহ এবং সর্বত্র দেখতে পাই নে। কল্পনায় সংহত করে দেখলে যে জিনিসটা জীবনসংগ্রামরূপ ধারণ করে সেইটেকেই স্বস্থানে

যখন দেখি তখন সে হয় জীবনযাত্রা। এই জীবনযাত্রার মধ্যে সংগ্রাম আছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো করে আছে শান্তি, নইলে মানুষ বাঁচতেই পারত না।

অনেক সময় নীতিপ্রচারকেরা আক্ষেপ করে বলে থাকেন মৃত্যু অহরহ এবং চারদিকেই ঘটছে অথচ মানুষ মৃত্যুকে কিছুতেই মানতে চাচ্ছে না। কিন্তু কেন চাচ্ছে না? কেননা মানুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের বিকাশকেই সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সুতরাং নীতিপ্রচারকেরা মৃত্যুকে যে একান্ত করে জানছেন সেটা তাঁদের কল্পনা মাত্র। আমরা যখন চলি তখন দুই পায়ে লাফিয়ে চলি নে। আমাদের একটা পা যখন চলে তখন আর একটা পা থামে। এই থামাটাকেই মনে মনে যোগ করে যদি মস্ত বড়ো একটা অঙ্ক করে তুলি তাহলে চলাটা আর সপ্রমাণ হয় না কিন্তু আমরা থামা-চলা দুইকে নিয়ে সমগ্র গতিটাকেই স্পষ্ট উপলব্ধি করছি, এই জন্যেই চলাকে আমরা চলা বলছি।

মানুষকে যদি আমরা ছোটো করে দেখি তাহলে দেখতে পাই, সে খাচ্ছে বেড়াচ্ছে কাজ করছে ঘুমোচ্ছে। তখন সমস্ত মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে তার যে যোগের সূত্র আছে সে-সূত্র আমরা দেখতে পাই নে। তখন ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাই বিশেষ করে চোখে পড়ে। সেই তুচ্ছতাকেই যদি মনে মনে দেশে ও কালে পুঞ্জীভূত করে দেখি তাহলে যে সমষ্টি পাই সেইটেই কি মানুষের ইতিহাস। এই সমস্ত তুচ্ছতার এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত কর্মের অন্তরে অন্তরে অন্তর্গূঢ় হয়ে একটি তপস্যা রয়েছে, সেই তপস্যাই বিপুল তুচ্ছতার ভিতর থেকে জ্ঞানে কর্মে ধর্মে নানা আকারে মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে তুলছে। প্রকৃত ইতিহাস সেই মনুষ্যত্বেরই ইতিহাস, তুচ্ছতার ইতিহাস নয়।

নানা ইচ্ছা, নানা কর্ম, নানা ভাষা, নানা রুচি, এই সমস্তকে যোগ করে দেখলে রাশীকৃত জটিলতা এবং অভ্রভেদী কোলাহলমাত্র পাওয়া যায়। তবুও এর এই অতি প্রকাণ্ড বিক্ষিপ্ততাই এর আসল সত্য নয়— এরই অন্তরে অন্তরে সেই এক আছেন যিনি এর সকল গতিকে সকল প্রাপ্তিকে আপনার মধ্যে আহ্বান করছেন। যিনি আশ্রয়রূপে সঙ্গে সঙ্গে আছেন বলেই এত চলাও সংঘাত আকারে সংহার করছে না, এবং সংসারের বিপুল আবর্জনাও সৃষ্টির নিয়মে রূপ ধারণ করছে।

তেমনি আমাদের নিজের জীবনের এবং সমস্ত মানুষের ভিতরের চঞ্চলতা ও তুচ্ছতার ভিতর দিয়েই সেই পরম গতি পরম সম্পদ পরম আশ্রয় পরম আনন্দের প্রকাশ আছে এইটেই হচ্ছে সত্য, এইটেই হচ্ছে হাঁ। একে জানলেই ঠিক দেখা হল, এর উল্টোকে জানলে দেখাই হল না। সমস্ত কেবল উদভ্রান্ত হচ্ছে, এর অন্তরে কোনো ঐক্য নেই, এর সম্মুখে কোনো লক্ষ্য নেই, এমনতরো নিদারুণ মতের যে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না তা বলি নে, কিন্তু সে সমস্ত প্রমাণই সংসারের সেই 'না' বিভাগ হতেই আহরিত। মোটের উপর, সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও মানুষ এই না-কে কিছুতেই স্বীকার করে না। যদি করত, তাহলে কোনোদিকেই মানুষ কিছুতেই উন্নতির চেষ্টা করত না, কেননা হাঁ-কেই সত্য বলে মানা সকল উন্নতির আশা। জীবনের যে অংশে এই হাঁ-কে সত্য বলে স্বীকার না করি সেই অংশেই আমাদের দুর্গতি ঘটে।

অন্ধ উদ্যমকেই যখন দেখি তখন প্রকৃতিরই ক্রিয়াশক্তিকে দেখি, তখন মানুষকে প্রকৃতির বাহ্য-ক্ষেত্রেই দেখা হয়, অর্থাৎ জীববিজ্ঞান যে ক্ষেত্রে বৃক্ষকে পশু পক্ষীকে দেখে সেই ক্ষেত্রেই মানুষের পরম গতি পরম আশ্রয় কল্পনা করি। কিন্তু মানুষের আত্মাকে যখন জানি অর্থাৎ যখন তার কর্তৃত্ব দেখি, যখন তার ইচ্ছাময় সৃষ্টিশক্তিকে জানি তখন তার পরমগতি পরম আশ্রয়কে সেই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুঁজে পাই নে যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচন নামক একটা কর্মপ্রণালীই কলের মতো কাজ করে যাচ্ছে। যখন মানুষকে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে দেখি, তখন পরম ইচ্ছার মধ্যে মানুষের ইচ্ছাকে জানি, পরম পুরুষের মধ্যে মানুষের আত্মা পুরুষকে উপলব্ধি করি। তখন বুঝতে পারি, মানুষকে চলতে হবে, কিন্তু পশুর মতো নয়; তাকে চলতে হবে জ্ঞানের সঙ্গে আত্ম-চালনার আনন্দের সঙ্গে; তাকে বুঝতে হবে যে সেও কর্তা, অতএব তাকেও সৃষ্টি করতে হবে।

আরেকপ্রকার মানুষের চলাটাকে তার হাঁ এবং না-এর দিকে বিচার করি। এমন কথা বলা যেতে পারে যে, মানুষ নিয়মের যন্ত্রে চালিত হচ্ছে, কার্যকারণের পারম্পর্যই তার একমাত্র বিধাতা।

কিন্তু এটা হল 'না'। এই দিক থেকে মানুষকে বিচার করাও যা আর পিঠের দিকটাই মানুষের আসল চেহারা বলাও তা। মানুষের আত্মকর্তৃত্ব আছে মানুষের সংসার-যাত্রায় এইটেই হল তার হাঁ-এর দিক। তার সমস্ত কল্যাণ সমস্ত উন্নতি এই উপলব্ধিতে।

কিন্তু তার এই উপলব্ধিই যে সত্য, এটা যে মায়া মাত্র নয় এ যদি হয়, তবে এটা তাকে বুঝতেই হবে যে একটি অনন্ত সত্যে তার এই আত্মোপলব্ধির প্রতিষ্ঠা আছে, সেই সত্যই পরমাত্মা। এখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, অর্থাৎ এখানকার পূর্ণ যোগ প্রেমে।

তাই ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন চলেছি, তখন যদি কেবল সংস্কারের বাঁধা পথ এবং প্রবৃত্তির অন্ধ বেগকেই একান্ত করে মানি তাহলে পরম সত্যকে দেখতে পাই নে। কেননা, পরম সত্য শুধু সত্য নন তিনি হচ্ছেন, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। নিজের জ্ঞানকে অহমিকার আবরণ থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে উদবোধিত করলেই সেই জ্ঞান-স্বরূপকে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। নিজে যখন কর্তৃত্ব হারাই যখন কেবল অভাবের দায়ে বাইরের শাসনে কিংবা দুর্দাম আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে চলি তখন নিজের মধ্যে সেই বোধশক্তি দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে থাকে যার দ্বারা আত্মা আপনার পরম লোককে উপলব্ধি করতে পারে। সেই জন্যে আমাদের প্রতি উপদেশ আছে জানথ আত্মানং— আত্মাকে জানো, অর্থাৎ আপনাকে আত্মা বলেই জানো।

মানুষের সংগীত কোন্ ধ্রুব সত্যকে প্রকাশ করছে? না,— সমস্ত ছড়াছড়ির মূলে একটি গভীর মিল আছে, একটি অনির্বচনীয় আনন্দময় মিল। সেই মিলের কথাটি ভাষায় বলা যায় না, কেবলমাত্র সুরেই বলা যায়। এই জন্যই মানুষকে গান গাইতে হয়েছে। মানুষের এই গান বিশ্বের ভিতরকার গানের রসটিকেই, তার অন্তরতম অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করছে বলেই জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যে প্রতিদিনের সমস্ত দীনতার মধ্যে, গান এমন করে আমাদের হৃদয়ের কাছে অব্যবহিতভাবে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করছে অমৃতলোকের রসস্বরূপের কথা। আমাদের সমস্ত গভীর ভালোবাসাও তাই করে। ফুল বল, তারা বল, প্রভাত ও সন্ধ্যাকাশের শান্তি বল সকলেরই এই বাণী। এই বাণী কোনো বিরুদ্ধ প্রমাণের প্রতিবাদ করে না, কোনো স্বপক্ষের প্রমাণকে সংগ্রহ করে দেখায় না— কিন্তু আলোক যেমন সহজেই আলোকিত করে, তেমনি সহজেই বলতে থাকে, রসো বৈ সঃ রসংহি লব্ধানন্দী ভবতি। ভিড়ের মধ্য দিয়ে বইতে বইতে আমাদের জীবন একটি সংগীতধারার মতো সহজে ধ্বনিত হয়ে উঠবে— সহজেই অনির্বচনীয়কে সমস্ত সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের মধ্যে প্রকাশ করতে থাকবে— এই আমাদের পরম সার্থকতা। কোনো তর্ক নয়, প্রমাণের প্রয়াস নয়, আমাদের সমস্ত জীবনই একটি অখণ্ড সুরে এই বাণীকে বহন করবে— শান্তং শিবমদ্বৈতম্— এই আমাদের প্রার্থনা।

৭ পৌষ সন্ধ্যা ১৩২৬

পৃথিবীর সমস্ত পশুপাখি বাহিরের দিকে যেমন চোখ মেলে দেখলে মানুষও তেমনি দেখলে, সমস্ত জগৎ তার ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সমস্ত মনকে দখল করে নিলে।

কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই মানুষ অনুভব করে আসছে, সে যা দেখছে তার ভিতরে একটা রহস্য রয়ে গেছে। চোখের সামনে যা আছে কেবলমাত্র তা-ই আছে একথা মেনে নিলে কোনো আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু মানুষ একথা মানতে পারলেই না।

এই রহস্যের বোধটাকে প্রকাশ করবার জন্য মানুষ কত রকমের শব্দ আওড়ালে যার কোনো মানেই নেই, কত রকমের কাণ্ড করলে যাকে পাগলামি বললেই চলে। এমনি করে নিজেকে সহজের স্বাভাবিকের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে এই কথাটা কোনোমতে বলবার চেষ্টা করেছে যে, যেটা প্রত্যক্ষ জানছি তার চেয়েও জানবার একটা কিছু আছে। যা বাইরে আছে সেটাই শেষ কথা নয়।

সে যে অনুষ্ঠানগুলো করলে সেগুলো ভয়ংকর। পশুবলি দিলে, নরবলি দিলে, নিজেকে অসহ্য কষ্ট দিলে, অন্যকেও দিলে, বেশভূষা যা করলে তা উৎকট। তার মনে হচ্ছে একটা দুঃসহ এবং ভয়ংকর আঘাত করা চাই, নইলে স্বভাবের আবরণকে বিদীর্ণ করে তার গুপ্তধন পাওয়া যাবে না।

তারপর ক্রমে ক্রমে মানুষের সাধনার প্রণালী বদলাতে লাগল। বাইরের স্বভাবের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে এতদিন বাইরের দিকে সে সৈন্য লাগিয়েছিল অস্ত্র মেরেছিল, ক্রমে সেই লড়াইটার গতি ভিতরের দিকে চলল। সে বললে হৃদয়ের স্বাভাবিক যে সব ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে সেইটেকে চরম বলে মানব না; সেটাকে যদি ভেঙে ফেলতে পারি তাহলেই তার ভিতর থেকে আসল রহস্যময় শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারব। এই বলে মানুষ নিজেকে দুঃখ দিতে লাগল। সমস্ত ত্যাগ করে করে দেখতে চাইলে সব ত্যাগের শেষে কী বাকি থাকে।

মানুষ দেখতে পেলে বাহিরের সুরের একেবারে উল্টো সুর সেই ভিতরের দিকে। বাইরের ক্ষেত্রে ক্রোধ, ভিতরের ক্ষেত্রে ক্ষমা; বাইরে ধনের মাহাত্ম্য, ভিতরে ত্যাগের; বাইরে গতি, ভিতরে শান্তি।

ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা; ফলে দেখতে পাই তার বাইরের সংকোচ, তার পাপড়ির খসে পড়া, অন্তরের মধ্যে তার বীজের বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিস্তব্ধ কেন্দ্রীভূত।

তেমনি মানুষ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাইরে আপন রঙ ফলিয়েছে, বাইরে যতদূর পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করছে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাহিরের যে আয়োজন সব চেয়ে বেশি করে চোখে পড়েছিল, সে সবই পাপড়ির মতো খসে পড়ল। সেইখানে সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের উপর। যেমনি তাই হল অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল।

একদিক থেকে একদল মানুষ বললে, এই ফুলের জীবন, এই পাপড়ির বিস্তারই চরম,—তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই। তারা কোমর বেঁধে লাগল লড়াই করতে, বোঝাই করতে। দেহ মনকে ভোগের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়াকেই তারা সকলের চেয়ে বড়ো করে দেখলে।

আর একদিক থেকে আর একদল মানুষ বললে, অন্তরের নিভৃতে বাইরের শাসন থেকে নিষ্কৃতি আছে; সেখানে বসে আমি বাইরের বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করতে পারি, সেখানে আপনার মধ্যেই আমার আপনার রাজসিংহাসন আছে। সেই সিংহাসনেই আমি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হব—বাইরের দিকে তাকাবই না।

তারা বললে, বাইরের দিকে যে শক্তির টানে সমস্ত জীব পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, যে শক্তি কেবলই এক জিনিস ভেঙে আরেক জিনিস গড়ছে, যার বিস্তারের আর অন্ত নেই সেই হল প্রকৃতি। সেই তো একদিকে বাসনা, আর একদিকে ভোগের সামগ্রী সাজিয়ে সংসার নাট্যমঞ্চে হাসিকান্নার অবসানহীন পালা জমিয়েছে। আর অন্তরের মধ্যে এই নাট্যের বাতি নিবিয়ে দিয়ে সমস্ত সামগ্রীকে ত্যাগ করে ভোগকে নিবৃত্ত করে যে সত্তা আপনাকে মুক্তভাবে উপলব্ধি করে আনন্দ পায় সেই হল আত্মা। এই আত্মাকেই মানব, প্রকৃতিকে মানবই না।

এ কথা যে বলছে তাকে প্রাণপণ জোর করেই বলতে হয়েছে। কেননা মানবজীবনের সব চেয়ে আদিমতম অভ্যাস হচ্ছে বাহিরেই ছড়িয়ে যাওয়া, বাহিরকেই একান্ত করে জানা। ইন্দ্রিয়বোধই তার প্রথম আলো জেলেছে, প্রবৃত্তিই তাকে প্রথম চালনা করেছে। এইজন্যে তার মন এই বাহিরের জগতে অনেক দূরে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে—তার বিশ্বাস একেই বড়ো শক্ত করে আঁকড়ে রয়েছে। এই জন্যে তত্ত্বজ্ঞানী আর ধর্ম-উপদেষ্টা যিনি যা-ই বলুন, আর মানুষও মুখের কথায় যা-ই প্রচার করুক, বুদ্ধির দ্বারা যা-ই চিন্তা করে জানুক, আচারে, ব্যবহারে আত্মাকে সর্বতোভাবে স্বীকার করে এমন মানুষ লক্ষের মধ্যে একটি পাওয়াও কঠিন। বাহিরটাই তার ইন্দ্রিয়কে মনকে বিশ্বাসকে বুদ্ধিকে এমন প্রবল শক্তিতে এবং অতিমাত্রায় অধিকার করে বসেছে বলেই তার একান্ত প্রভাবকে

বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই মানুষ এমন বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে এমন একনিষ্ঠ বৈরাগ্যের সঙ্গে বাহিরকে একেবারে অস্বীকার করবার প্রস্তাব করেছে।

সত্য এমনি করে দুইভাগ হয়ে গেল। নদীর দুই তীর যে একই নদীর, জলের ধারার মধ্যে উভয়েরই ঐক্য চিরকাল প্রবহমান একথা মানুষ ভুলে গেল।

উপনিষদ বলেছেন, 'যশ্চায়মস্মিন্ পুরুষঃ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ', তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বাইরে এই আকাশে সমস্তকে অনুভব করে আছেন। পরক্ষণেই বলছেন, 'যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ' এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আত্মাতে সমস্ত অনুভব করে আছেন। অর্থাৎ অসীম সত্য অন্তরকে বাহিরকে এক করে বিরাজ করেন।

সত্যের এই যে অন্তরবাহির দুই দিক আছে, এদের সামঞ্জস্য তখনি নষ্ট হয় অন্তর যখন বাহিরের উপর আপন কর্তৃত্ব হারায়, বাহির যখন অন্তরকে অভিভূত আচ্ছন্ন করে। আবার বাহিরকে যদি নির্বাসিত করা যায় তবে অন্তর আপন কর্তৃত্বের অধিকার হারায়।

রাজা আছে তার রাজত্ব নেই, একথা বলা তো চলে না। আত্মাকে যদি বলি রাজা, তবে এই সংসারের সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে তারই প্রভুত্বকে প্রচার করতে হবে। তার প্রভুত্বের ক্ষেত্রকে দূর করলে তাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়।

আসল কথা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সত্যের কোনো একটা অংশকে ছাঁটতে চেষ্টা করলে সে ছাঁটা পড়ে না, সে উপদ্রব হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে আমি, তার মধ্যেই থেকে আঘাত করে তাকে যদি দূর করতে চেষ্টা করি তাহলে সে দূর হয়ে ভেঙে পড়ে আমাকেই চেপে মারে।

ভারতবর্ষ আপন সাধনায় আত্মার দিকে একান্ত ঝোঁক দিয়েছিল। তার ফলে স্থূল ও জড় প্রকৃতির প্রভাব তো মরল না। বরঞ্চ ভারতবর্ষ আপন ধর্মে আচারে এই স্থূলকে যত বেশি মেনেছে এমন অন্য কোনো সভ্য দেশ মানে নি।

য়ুরোপে মধ্যযুগের সাধক কৌমার্য ব্রত নিলে, একান্ত দারিদ্র্য ব্রত নিলে, হেঁকে চাবুক মারলে, কাঁটার শয্যায় শুয়ে রইল,—এ যেমন সমাজের এক অংশে প্রকৃতির প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার, তেমনি আরেক অংশে খুনোখুনি কাড়াকাড়ি; উন্মত্ত ভোগলালসায় পৃথিবীকে নিংড়ে নিংড়ে খেয়েও আপন অংশে খুনোখুনি কাড়াকাড়ি; সত্যকে একদিক দিয়ে যখন মারি সে আরেক দিক দিয়ে আমাদের সাত গুণ মারে। দেহের দিকে যাকে বিনাশ করি ভূত হয়ে সে আমাদের বেশি করে পেয়ে বসে।

তবে একথা মানি, বাহির যখন অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে উদ্দাম হয়েছে, তখন তাকে দমনের জন্য আঘাত করতে হবে। সেটা কেবল একটা ক্ষণিক চিকিৎসা। বাহির আত্মার রাজ্য, অতএব আত্মা তাকে পালন করবে—কিন্তু রাজ্য যদি বিদ্রোহী হয় তবে শত্রুর মতো করেই তাকে মারতে হবে, তাকে পীড়া দিতে হবে। বাহিরের প্রবৃত্তি যখন আত্মার শাসনকে লঙ্ঘন করে, তখন তাকে মেরে, তার দুর্গ ভেঙে, তার সর্বস্ব লুট করে তাকে হয়রান করতেই হবে কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরে রাজায় প্রজায় সত্যকার মিলনের দিন। তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বারা শুচি হবে, ভোগে সংযমের শান্তি আসবে; তখন আত্মা তার বাইরের অধিকারে আপনার ইচ্ছার বাধাহীন বিস্তার দেখে আনন্দিত হবে। তখন বাইরের চারিদিকে দেখবে সব সুন্দর সব মঙ্গল।

এই যে দ্বন্দ্ব সামঞ্জস্যে নিয়ে আসে, এ দল বেঁধে কোনো বিশেষ নামধারী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করে হবে না। এর ভার প্রত্যেক মানুষের উপর ব্যক্তিগত ভাবেই আছে। তুমি যদি পার তবে তোমার ভিতর দিয়েই সংসার সফলতা লাভ করবে। একটি সংসারেও যদি আত্মার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আত্মার কর্তৃত্ব সেইখান থেকেই সমস্ত মানবজগৎকে ধন্য করবে।

আমাদের দুর্বলতার মস্ত একটা কারণ এই যে, চারদিকে আমরা দুর্বলতার নানারূপ সর্বদা দেখি। তাতে করে আত্মার স্বরূপ দেখতে পাই নে, আত্মার স্বরূপের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে

না, তখন শক্তিহীনতার জন্যে লজ্জা চলে যায়। সত্যকে যদি বিশ্বাস করতে পারি তবে সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারি। চার দিকের দুর্বলতায় সত্যের প্রতি সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়, তখন মনে হয় তার জন্যে ত্যাগস্বীকার করা নিতান্ত যেন ঠকা, সে যেন মূঢ়তা।

১৩২৭

হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমরা সবাই চমকে উঠেছি। কাছে থেকে তোমাদের যে সান্ত্বনা করতে পারতুম এত দূরে থেকে তা আর সম্ভব হয় না। তোমাদের চিঠি আসতে এবং আমার উত্তর পৌঁছতে যে দীর্ঘ সময় যাবে সেই সময়ই ধীরে ধীরে প্রতিদিন প্রতিরাত্রি তোমাদের শুশ্রূষা করবে। জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি আর যা বলি তার মধ্যে অন্ধকার থেকে যায়, কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারি নে। আমরা ভাগ করে দেখি। ঘরের মধ্যে আমরা আলো জ্বালি, কেননা তখনকার মতো ঘরের মধ্যেই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু সেই আলো-জ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোটোঘর আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে দুই স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমরা যাকে বলি জীবন সেও সেই আলোকিত, ছোটো ঘরের মতো, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে সংহত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের লীলা-স্থল। তার বাইরে যে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের বিরুদ্ধ বলে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই— আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ববশত অংশমাত্রকে একান্ত করে জানছি বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্ছি। আজ যেখানে আলো জ্বলছে কাল সেখান থেকে আলো সরে যেতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্ব সরে যাবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিয়েছে— এই সত্যটুকু শিখতে তার দেরি হয় যে, আলোতেও তার মা আছে অন্ধকারেও তার মা আছে। জীবনমৃত্যুর সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মতো— আমরা বৃথা ভয়ে কেঁদে বলি, জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে তাকে হারাই। কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্তিকে দেখো, সে-মূর্তি আনন্দ মূর্তি। চারি দিকে তরুলতা পশুপক্ষী রূপে শব্দে গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করছে। বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দরূপ কি কখনই টিঁকে থাকতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো প্রাণ-পূর্ণ সত্য না থাকত? রাত্রে আমরা ছোটো প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু পলতেই বা জ্বালাই। কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে ভয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয় জানা আছে যে, সে নিভলেও সূর্য কখনও নিভবে না। বিশ্বের মধ্যে মহাপ্রাণই হচ্ছে অনির্বাণ সত্য, সেই জন্যেই ক্ষুদ্রপ্রাণ নিবলেও ভাবনা নেই। যা ওঁ যা হাঁ, তাকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখছি সেই হাঁ-কেই বিশ্বাস করো, না-কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস করো, কুয়াশাকে না। আমাদেব চারি দিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয়বাণী ঘোষণা করছে, মৃত্যু কোনোমতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করতে পারছে না। মেঘ বারেবারে এসে সূর্যকে যেন মুছে ফেলতে চাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারছে না। মৃত্যু তেমনিই প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু প্রাণকে কখনই আচ্ছন্ন করে বিলুপ্ত করতে পারবে না। অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা করো মৃত্যুকে না। যাকে ভালোবেসেছ যাকে সত্য বলে জেনেছ সে মৃত্যুতেও সত্যই আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত করো।

বিলাতযাত্রীর পত্র
২৭ আশ্বিন, ১৩২৭

যেমন বীজকে প্রথমে ছোটো আলে রোপণ করা হয়, তারপর অঙ্কুরোদ্গম হলে তাকে বৃহৎ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হয় তেমনি এক একটি জাতি ছোটো সীমানার মধ্যে সত্যসাধনার বীজ বপন করেছিল, কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভৌগোলিক সীমা অসত্য হয়ে গেছে। জলে স্থলে আকাশে পথ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। অতীতের বাধা দূর হয়ে গেছে। চিরাভ্যাসক্রমে এই বাধাকে আজও যে স্বীকার করে সে এই বাধাগুলিকে দৃঢ় করে তোলাই আজও তার সাধনা বলে কল্পনা করেছে। জাতীয় বিচ্ছেদের সীমাগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে সে পাকা করে খাড়া করবার চেষ্টা করছে। সমুদ্র পর্বত দিয়ে দেশের যে সব সীমা নির্দিষ্ট ছিল তার ভার মানুষকে তেমন করে বহন করতে হয় নি। কিন্তু আজ কৃত্রিম সীমাবেষ্টনকে জোর করে ধ্রুব রাখবার যে উদ্যোগ, নিরন্তর সৈন্য সামন্ত অস্ত্রশস্ত্রের যে আয়োজন তার ভার কৃত্রিমতার ভার, এইজন্য তা দুর্ভর। এই ভার যতই বাড়ে মন ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে, সংশয়ের কারণ ততই বাড়তে থাকে— পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ততই দূর হতে দূরে প্রসারিত হতে থাকে। এমনি করে অস্ত্রের ভারবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের রিপুর ভার এবং রিপুর ভারবৃদ্ধির সঙ্গে তার অস্ত্রের ভারবৃদ্ধি অন্তহীন আবর্তে ঘুরতে থাকে। এমনি করে কৃত্রিম আত্মরক্ষার চিরবর্ধমান প্রভূত প্রয়াসের চাপে প্রবল জাতিরা আত্মবিনাশের প্রবল উপায় কেবলই উদ্ভাবন করছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সঙ্গে মানুষ যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজও সত্য বলে অনুভব করতে পারছি নে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকে মনের মধ্যে পাকা করে তোলবার চেষ্টা এখনও চলছে; তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় করে তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি। এমন অবস্থায় কোনো এক জায়গায় আজ সেই বাণী-ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই, যে-বাণী সীমাবদ্ধ অতীত কালের বাণী নয়, যে-বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী। সেইখান থেকে বলতে হবে, নবযুগ এসেছে নব অরুণোদয় হয়েছে। এই বাণী কারা ঘোষণা করবে? ঐশ্বর্যমদে মত্ত যারা তারা নয়; তারা যে প্রবল বন্যায় ডুবতে ডুবতেও তাদের অতীত সঞ্চয়কে আঁকড়ে থাকে— তারা যে লুব্ধ— বাহিরের ধনকেই একান্ত বলে মানাই যে তাদের চির অভ্যাস। তাই অকিঞ্চনের কণ্ঠ থেকে নবযুগের জয়ধ্বনি উঠবে এমন আশা আছে। বিধাতা অক্ষমকে দিয়ে সবলকে পরাভূত করেন। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো উন্নত মস্তক যাঁদের চরণধূলি গ্রহণ করে সার্থক, তাঁদের চরণ আশ্রয়হীন পথের ধূলির মধ্যে বিচরণ করেছে।

এমন কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাই যে, যতক্ষণ রাষ্ট্রশক্তিতে আমরা শক্তিমান না হই ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আমাদের সত্য প্রচারের অধিকার নেই। অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে ধনে মানে সমকক্ষ না হলে তার কাছে আমরা আত্মার বাণী বহন করতে পারব না। কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের যাঁরা দৌত্য করেছেন তাঁদের কয়জনই বা বাহ্য সম্মানের পাথেয় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাত্রা করেছেন? দারিদ্র্য ও অপমানে কি তাঁদের বাণীর অধিকারকে হরণ ও তার তেজকে খর্ব করেছে? কত কৌপীনধারী ভিক্ষু মানুষের ইতিহাসকে চিরকালের মতো অগ্রসর করে দিয়েছেন। বিধাতা কালে কালে দেখিয়েছেন যে, যারা ঐশ্বর্যমদে মত্ত তারা মহতী বিনষ্টির দিকে গেছে, মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমরা বাহ্য ক্ষমতায় হীন হলেও আত্মার বাণী আমাদেরই কণ্ঠের অপেক্ষা করেছে। নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে নম্র হয়ে আমরাই বলব দেবতার আহ্বান এসেছে। নব অরুণোদয় হয়েছে। আমরাই পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে বলব, ঐশ্বর্যের মোহ দূর হয়ে যাক— আনন্দের সঙ্গে বলব কোনো ভয় নেই। যার বহু সম্পদ আছে সে-সম্পদ রক্ষা করতে তাকে সর্বদা ত্রস্ত থাকতে হয়। সে আপনার দ্বার রুদ্ধ রাখে— সেই রুদ্ধতা তার আত্মাকেই সংকীর্ণ করে। তার কাছে পরম সত্য সহজ হয় না; আপনার লোভতৃপ্তির দ্বারাই সে আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা বলব, তোমরা লোভকে বিশ্বাস কর, আমরা ত্যাগকে বিশ্বাস করি, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রকে বিশ্বাস কর, আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি।

এসো অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি',
অপহৃত শঙ্কা অপগত সংশয়।

৭ পৌষ ১৩২৮

জীবপর্যায়ে মানুষের বিকাশ হল কোন পথে? উন্নতির পথে একথা সকলেই স্বীকার করি, অথচ দেখতে পাই জন্তুদের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ যতদূর উৎকর্ষলাভ করেছে, মানুষের মধ্যে তার চেয়ে অনেক দূরে পিছিয়ে পড়েছে। কুকুরের চেয়ে তার ঘ্রাণশক্তি কম, শকুনির চেয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। অনেক পাখিপতঙ্গের যে দিক্‌বোধ আছে মানুষের তা নেই। এমন কি, মানুষের মধ্যে আজও যারা বর্বর শ্রেণীভুক্ত তাদের ইন্দ্রিয়বোধের তীক্ষ্ণতা সভ্যজাতিদের চেয়ে প্রবল। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, মানুষের বিকাশ বাইরের দিক থেকে অন্তরের দিকে।

এই অন্তর্লোকে আমরা বহির্লোকের আদর্শ নিয়ে গিয়ে মেলাতে পারি নে। সেই অন্তর্লোকের একটি সত্য আছে তাকে আমরা ভাষায় বলি কল্যাণ। বহির্লোকে সুখের যে মূল্য অন্তর্লোকে কল্যাণের মূল্য তার চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এত বেশি যে বহির্লোকের দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার পরিমাপ হয়।

বিশ্বজগতে প্রাণ মাত্রের মধ্যেই ত্যাগের তত্ত্ব আছে। তার কারণ, প্রাণ কেবল আপন বর্তমান-টুকুর মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করে না। তার একটা ভবিষ্যৎ আছে যা তার অগোচর, তার একটা স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে যা তার উপস্থিত অবস্থার চেয়ে বড়ো এবং অপ্রত্যক্ষ। নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে তাকে আরাম বিশ্রাম ত্যাগ করতে হয়, তার ভবিষ্যতের জন্যে জাতি রক্ষার জন্যে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়। প্রাণের পক্ষে তার বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ, প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষ বড়ো সত্য। কিন্তু মানবজগতের মধ্যে এই প্রাণের ক্রিয়া অনেক অংশেই স্বাধীন ইচ্ছার বাইরে। নিম্ন-পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যে প্রাণক্রিয়ার যে একটা অবশ্যশক্তি আছে মনুষ্যের মধ্যে সেই শক্তির কার্যভার অনেকটা পরিমাণে তার ইচ্ছাশক্তির উপর পড়েছে। এই জন্যই মানুষের শুভবুদ্ধির শক্তি তার ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই কল্যাণ নাম ধারণ করে। নিজের মধ্যে মানুষের এই যে কল্যাণবোধ আছে সেই কল্যাণবোধের সত্যকে সে অনন্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে চায়। এই সত্যের স্বরূপটি হচ্ছে প্রেম। সেই প্রেম যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল তার মনের মধ্যেই উৎপন্ন এবং বিলীন হয়, তার আত্ম-অনুভূতির জোরেই একথা সে মানতে পারে না। যদি মানুষের ধর্ম হয় কল্যাণ, তবে তার ব্যতিক্রম দেখি কেন? মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা হিংস্রতার যে প্রচণ্ড মূর্তি দেখি জন্তুদের মধ্যেও তা দেখি নে। তার সেই সমস্ত দারুণ রিপুর তীব্রতায় সংসারে সে ভীষণ দুঃখ আনে আর কোনো প্রাণীর দ্বারা তা ঘটতে পারে না। দুঃখ সে যে সৃষ্টি করে তার মানে কল্যাণের বিরুদ্ধতা তার অধর্ম, অসত্য। সে তার অধর্ম বলেই মানুষের মধ্যে রিপুর প্রবলতা থাকা সত্ত্বেও সেই রিপুকে বরণ করে তারই মধ্যে সে স্তব্ধ হয়ে থাকে নি, তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তার এত প্রাণপণ প্রয়াস। এই নিষ্কৃতিকে সে মুক্তি বলে। যার যেটা ধর্ম তার থেকে সে মুক্তি চায় না— স্বধর্মের মধ্যে বিরাজ করাই স্বাধীনতা। মানুষ এই স্থূল জগতের ধর্ম থেকে তার অন্তর জগতের মধ্যে মুক্ত হয়ে স্বধর্ম পেতে চায়।

এই যে তার স্বধর্ম এর তো একটা প্রতিষ্ঠা আছে। এ যদি তার আপন মনের ঘরগড়া জিনিস হয় তবে তো একে সত্য বলা যায় না। এমনও যদি হত সকল মানুষেরই মধ্যে এই ধর্মবোধ প্রবল আছে, কোথাও এর ব্যত্যয় নেই তাহলেও সেই প্রমাণের জোরে অন্তত সার্বজনীন মানবচরিত্রের মধ্যেই এই সত্যের একটা ভিত্তি পাওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নেই এবং বিরুদ্ধতা যথেষ্ট পরিমাণ আছে, অথচ যখন দেখি এই ধর্মের আদর্শ বাধার ভিতরে ভিতরে কাজ করে যাচ্ছে তখন এ প্রশ্ন

মনে আসে এই সত্যের ধ্রুব ভিত্তি কোথাও আছে। সেই ধ্রুব প্রতিষ্ঠার অভিমুখেই হাত জোড় করে বলি, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

জড় বা প্রাণীর অবশ্যধর্ম থেকে আমরা যে কোনো উপকার পাই তাকে কল্যাণ বলি না। আমাদের মধ্যে সেই কল্যাণ গাছে ফল ফলানোর মতো, অবশ্যক্রিয়া নয় বলেই আমরা এই কল্যাণের যেখানে সত্য প্রতিষ্ঠা অনুভব করি সেখানে ইচ্ছাশক্তির উপলব্ধি না করে থাকতে পারি নে। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার পূর্ণ সম্বন্ধ হচ্ছে প্রেমের সম্বন্ধ। একটি পরম সত্যের মধ্যে এই প্রেমসম্বন্ধের শাশ্বত আশ্রয় মানুষ লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল।

কিন্তু কেবল তর্ক করে হিসাব করে এই আশ্রয়কে যদি আমরা কল্পনা করে নিই, তাহলে জোর পাব কেন? আপনার পরম সত্যকে মানুষ তর্ক করে পায়নি, পেতে পারে না। পূর্বেই বলেছি মানুষ বহির্জগৎ থেকে বের হয়ে ক্রমে অন্তর থেকে অন্তরতম লোকে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। বহির্জগতের প্রমাণ বাহিরের বোধ, অন্তর্জগতের প্রমাণ অন্তরের বোধ। আলো যে দেখছি এর প্রমাণ হচ্ছে আমি চোখ দিয়ে আলো দেখছি। যে অন্ধ সে আমার কথা শুনে মেনে নেয় যে, আলো বলে পদার্থ আছে। তেমনি যখন অন্তর্জগতের আলো দেখি তখন তার প্রমাণ চোখের দেখা নয় অন্তরের আনন্দ। সেই আনন্দ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা তর্ক করে পান নি, তাঁরা আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা পেয়েছেন। সেইজন্য তাঁরা এমন আশ্চর্য কথা বলতে পেরেছেন যে, আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছু হয়েছে। যে আনন্দ স্থূল নয়, যন্ত্র নয়, প্রত্যক্ষগোচর নয়, সেই আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছু হয়েছে, তারই মধ্যে সমস্ত কিছু আছে, তারই অভিমুখে সমস্ত কিছু যাচ্ছে, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা মানুষ এত জোরের সঙ্গে বলতে পারে এইজন্যেই যে, মানুষ অন্তরতম লোকের সত্যকে আনন্দের স্পর্শের দ্বারা জানতে পেরেছে। তাই মানুষ বলেছে, ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়দ্বারা তর্কের দ্বারা নয়, পরন্তু আনন্দের দ্বারা যিনি জেনেছেন তাঁর আর কিছুতেই এবং কখনই ভয় থাকে না। কারণ ভয় আছে তারই, বাহিরকেই যে চরম সত্য জানে। লোভও তারই।

২০ ভাদ্র বুধবার, ১৩২৯

আমি যেখানে শুই সেই ঘরের পাশের একটি জানালা খোলা। ভোর বেলা, তখনো অন্ধকার দূর হয় নি, সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে দেখি প্রভাতের শুকতারাটি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

ওর মধ্যে শাশ্বতকালের একটি অগ্নিময় স্বাক্ষর আছে। ঐ আলোকের শিখাটি কতদিন থেকে জ্বলছে, ও ঝড়ে নেবে না, কিছুতেই ও ম্লান হয় না। ঐ শিখাটি আমাদের পিতাপিতামহরা দেখেছিলেন। আবার আমাদের পরেও যারা পৃথিবীতে আসবে তারাও ওটিকে ঠিক এমনি উজ্জ্বল দেখবে। এই তারাটিকে দেখে প্রথমে আমার মনে একটি বৈরাগ্যের ভাব জেগে উঠল— মনে হল আমি কত ছোটো! এই তারার মধ্যে যুগযুগান্তরের যে-পরিচয় দীপ্যমান হয়ে আছে তার তুলনায় আমার জীবন কী অকিঞ্চিৎকর!

এই কথা যখন ভাবছি, ঠিক সেই সময়ে দেখেছি পাশের ঘরে আমার শয্যার শিয়রে প্রদীপের আলো জ্বলছে— এ হল আমার সংসারের আলো। এই প্রদীপের শিখাকে যদি ছোটো করে দেখি তা হলে এ অত্যন্ত ক্ষুদ্র; কিন্তু একে সত্য করে দেখলে দেখব এরও অন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। এও যে যুগযুগান্তরের সামগ্রী। গৃহ-প্রদীপ মানব-সংসারের শয্যার শিয়রে কত শতশতাব্দী ধরে শিখাটি জ্বালিয়ে এসেছে। মানুষের ঘরে এই প্রদীপটি জ্বলবে বলে কতকাল ধরে তার আয়োজন হয়েছে, কতকালের কত মানুষের ভালোবাসা কত উৎসবের মধুর স্মৃতি এই আলোকের শিখাটির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে রয়েছে। কত বেদনা, কত রোগশয্যার রাতে এই শিখাটি কম্পিত ভাবে জ্বলে এসেছে। আয়তনে যদিও এই প্রদীপটি শুকতারার চেয়ে ঢের ছোটো, কিন্তু গভীরতায়

এ কোনো গ্রহতারকার চেয়ে কম নয়। সমস্ত মানুষের চৈতন্যভাণ্ডারের অনেক সম্পদ এর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে—এও সৃষ্টির বাণী বহন করে এনেছে।

তারপর বারান্দার কোণে পূবে মুখ করে এসে বসলাম। অন্য অন্যদিন পূবের বর্ণচ্ছটা দেখে মনে হয়েছে যেন দেবতার তপের ক্ষেত্রে যোগাগ্নি জ্বলে উঠেছে—তার আভায় দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত; কিন্তু আজ দেখলাম পূর্ব আকাশের সীমান্তে গাছগুলির ঠিক মাথার উপরে মেঘের আবরণ পড়েছে,—এবং তারই মধ্যে প্রভাতের আলোকের বর্ণচ্ছটা তালের পাতার মতো চারি দিকে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সে সেই মেঘের শ্রেণীতে শ্রেণীতে কত খেয়াল, কত বর্ণ, কত খুশি যে ছড়িয়ে দিয়েছে তার কোনো অর্থ কোনো উদ্দেশ্য নেই। মেঘের ভিতরের এই যে আলোকের বাণী সে আজ কী বললে? সে বললে আমিও ছোটো নই—আমি এই বাষ্পরাশির মধ্যে আলোর খেলা—দেখতে দেখতে আমি মিলিয়ে যাব বটে, কিন্তু এই বিশ্বজগতের মধ্যে যে আনন্দ ভরে রয়েছে, আমিও সেই আনন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে উঠেছি—আমি এখনি মিলিয়ে যাব তাতে কী হল? গানের মধ্যে যেমন এক তানের পরেই আর একটি তান ঘুরে আসে—এই তানের ছটা যেমন সমস্ত গানের সম্পদটি বাড়িয়ে তোলে, আসল সুরটির সঙ্গে নিজের সুরটি মিলিয়ে দেয় অথচ প্রত্যেকটি তান, অতি ক্ষণস্থায়ী, তেমনি আমিও আজ আলোকের মধ্যে চিরন্তন আনন্দের একটি তান তুলেছি। হোক না এ একটুখানি সময়ের রঙের খেলা। এই যে মুহূর্তের মধ্যে এই অনন্তের লীলা দেখালো এই তো আনন্দ।

কতদিন দেখেছি ঘনঘোর মেঘ করেছে। প্রভাতের আলো তার মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন। দেখেছি মেঘাবৃত আলোকের প্রভাতের অবগুণ্ঠিতআলোর একটি স্নিগ্ধরূপ। আবার দেখেছি কখনো কখনো ঘনধারা বর্ষণ হয়েছে—বীণকারের অঙ্গুলির আঘাতে কম্পিত তারগুলির মতো গাছের পাতাগুলি জলধারার আঘাতে পুলকে কম্পিত হয়ে তাদের মধ্যে যে সংগীত ছিল তা প্রকাশ করেছে। এই রকম কত বিচিত্রতাই না দেখেছি; এই সমস্তের সঙ্গেই দেখি নিত্যকালের যোগ আছে। বাহিরে থেকে দেখলে মনে হয় সবই ক্ষণস্থায়ী—কেবল আলোর খেলা, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সকলের সামঞ্জস্য আছে—অনন্ত সৃষ্টিকার্যের যোগ আছে।

আমাদের জীবন আজ আছে কাল নেই। তাই বলে তাকে ধিক্‌কার দিলে চলবে না। একদল লোক আছেন যাঁরা বাইরের এই ক্ষণস্থায়ী ভাবটিই মানুষের মনে ফুটিয়ে তোলবার জন্য বলেছেন—জগৎসংসারে যা কিছু রয়েছে তা সবই মায়া, কিছু নয়। কিন্তু এই কি ঠিক কথা? এই যে ভোর বেলা শিশির বিন্দু ঘাসের উপরে পড়ে, আকাশে ঘন মেঘ দেখা দেয়, প্রভাতে আলো ফুটে ওঠে একি সব মিথ্যা? এই সমস্তকে অনিত্য বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। অনিত্যের পত্রপুট ভরে যে নিত্যের সুধা রয়েছে। তাই বললাম সকালের শিশিরবিন্দু ধন্য, এই যে আলো মেঘের লীলা এও ধন্য। আমি যে আছি আমিও কি এদেরই মতো সেই আনন্দটিকে আমার জীবনের মধ্যে পূর্ণ করে তুলব না?

নিজেকে কখন ধিক্‌কার দেব? না, যখন আমি সেই আনন্দের সুরে সুর মেলাতে পারলেম না। যখন আমার মধ্যেকার রিপুরা প্রবল হয়ে আনন্দের নিত্যকালের রূপটিকে আচ্ছন্ন করে দিলে। এই তো দেখছি প্রভাত হতে না হতেই চারিদিকে সব ফুল ফুটে উঠল। এরা অনন্তকে আত্মসমর্পণ করল। এরা যে একটি পূর্ণতার রূপকে প্রকাশ করলে সেইটেই বড়ো কথা। অসীম এদের গ্রহণ করেছেন। ক্ষণস্থায়ী বলে এদের বর্জন করেন নি। কিন্তু আমি যদি নিজের সুখ-সুবিধার জন্যেই আয়োজন উপার্জন করে মারা যাই তাহলে আমার মধ্যে মনুষ্যত্বের কোনো নিত্য-রূপের তো পরিচয় দিতে পারলুম না। আমি অনন্তকে যা দিতে পারি তার বাহ্যরূপ ক্ষণিক হলেও যে তা থাকে। আমার জীবন যদি যথার্থ দান হয় তাহলে ক্ষণকালের পত্রপুটেও সে পূর্ণকে নিত্যকে প্রকাশ করে। এই দানই হচ্ছে প্রকাশ, এই হচ্ছে যথার্থ জাগরণ। কুঁড়ি নিজেকে দান করে না, সে সুপ্ত। ফুল আপন ভাণ্ডারদ্বারা উদ্‌ঘাটিত করে দেয়, সে জাগ্রত। যে মানুষ আপনাকে

দিতে পারল না, সে আপন মানবজন্মে জাগলই না। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে রইল, সকলের মধ্যে আপনাকে সে উপলব্ধি করল না। সকলের মধ্যে আমাদের যে জাগরণ তাকে সময়ের সীমা দিয়ে পরিমাপ করা চলে না। তা এক মুহূর্তের মধ্যেই অসীম। ক্ষণস্থায়িত্বের অপবাদ তাতে পৌঁছয় না। সেই জাগরণ হচ্ছে অমৃতলোকে জাগরণ। এই অমৃতলোকের উপাদান কেবল যে সুখ তা নয়—দুঃখও বটে। সমস্ত সুখদুঃখকে নিয়েই তার আনন্দের সৃষ্টি। বাইরের প্রকৃতিতে দেখছি কোনোদিন সকালে নির্মল আলোর বিকাশ, আবার কোনোদিন সকালে ঝোড়ো মেঘের ছায়া, সৃষ্টির একই রাগিণীতে এই দুই তান, দুইয়ের মধ্যেই সৌন্দর্যের বিচিত্রতা, কেননা এদের খেলা হচ্ছে চিরন্তনের বুকের উপর খেলা। তেমনি করে আমার সংসারের সমস্ত দুঃখক্ষতিমৃত্যুকেও যদি নিত্যকালের ভূমিকার উপরে সাজাতে পারি, তারা যদি কেবল আমারই ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে না থাকে, আমার দুদিনের জীবনকে তার সমস্ত সুখদুঃখ নিয়ে যদি ঐ গ্রহচন্দ্র-তারার মতো, এই ভোরবেলাকার শুকতারাটির মতো শুভ্র ও সম্পূর্ণ করে তুলতে পারি তাহলে নিত্যস্বরূপের সঙ্গে আমার মালাবদল হবে, সংসারের তীরে আমার এই ছোটো ঘরে চিরকালের মানুষটির সঙ্গে দেখাশুনো হবে। এই পারলে তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। কিন্তু আমরা তা পারি না, আমাদের মনের দরজায় যে মরচে পড়ে গেছে। আমার এই ঘরে সেই মহানের যাতায়াতের পথ হল না। সেই দুঃখেই মানুষের এই প্রার্থনা—অসতো মা সদ্গময়—অসত্যের তুচ্ছতা থেকে আমাকে বাঁচাও। ছোটো একটি ফুলে যেমন তোমার অসীম শোভা পূর্ণ হয়ে উঠছে তেমনি আমার ছোটো জীবনেও তোমার পূর্ণতাকে যেন প্রকাশ করতে পারি।

১৭ মাঘ বুধবার, ১৩২৯

সভ্যতা শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এই জন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপনি বলছে, অপাবৃণু—খুলে ফেলো,—তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও, সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে-আপন সকলের, তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে-আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'—সে আর গোপন থাকে না। অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা : 'অসতো মা সদ্গময়', অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও! 'আবিরাবীর্মএধি', হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা এক সঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত" প্রদীপ আপনাকে দেয় না তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় করে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সে-ই প্রচ্ছন্ন, সে-ই অবরুদ্ধ,—যে মানুষ নিজেকে দান করে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সে-ই প্রকাশিত সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল

না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনি আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনি নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটে চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষ্যা, যত ঝগড়া, যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রং দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্যরূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদাররূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ মুক্ত করে দেখি, তাহলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

১ বৈশাখ ১৩৩০

মানুষ যখন সাংঘাতিক রোগে পীড়িত, তখন মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রাণশক্তির সংগ্রামটাই সকলের চেয়ে প্রাধান্যলাভ করে। মানুষের প্রাণ যখন সংকটাপন্ন তখন সে যে প্রাণী এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যান্য জীবের মতোই আমরা যে কেবলমাত্র প্রাণী মানুষের এই পরিচয় তো সম্পূর্ণ নয়। যে প্রাণশক্তি জন্মের ঘাট থেকে মৃত্যুর ঘাটে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয় আমরা তার চেয়ে বড়ো পাথেয় নিয়ে জন্মেছি; সেই পাথেয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে আমাদের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ করে দেবার জন্যে। যারা কেবল প্রাণীমাত্র, মৃত্যু তাদের পক্ষে একান্ত মৃত্যু। কিন্তু মানুষের জীবনে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই কথাটি আমরা ভুলে যাই। সেই জন্যে সংসারে জীবনযাত্রার ব্যাপারে ভয়ে, লোভে, ক্ষোভে পদে পদে আমরা দীনতা প্রকাশ করে থাকি। সেই আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে আমাদের প্রাণের দাবি উগ্র হয়ে ওঠে, আত্মার প্রকাশ ম্লান হয়ে যায়। জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোক আছে যে-কোনো মানুষ এই কথাটি নিঃসংশয় বিশ্বাসের দ্বারা নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তোলেন অমৃতধামের তীর্থ যাত্রায় তিনি আমাদের নেতা।

আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্প বয়স্ক যুবকটির মতো, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগ শয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।

আমাদের প্রাণের বাহন দেহ যখন দীর্ঘকাল অপটু হয়, শরীরের ক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে যখন বিচিত্র দুঃখ দুর্বলতার সৃষ্টি করে, তখন অধিকাংশ মানুষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারে না, তার সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের সত্যকে যাঁরা জানেন তাঁরা এই কথা জানেন যে, জরামৃত্যু রোগশোক ক্ষতিঅপমান সংসারে অপরিহার্য, তবু তার উপরেও মানবাত্মা জয়লাভ করতে পারে এইটেই হল বড়ো কথা। সেইটে প্রমাণ করবার জন্যেই মানুষ আছে; দুঃখ তাপ থেকে পালাবার জন্যে নয়। যে-শক্তির দ্বারা মানুষ ত্যাগ করে, দুঃখকে ক্ষতিকে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সেই শক্তিই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে তার অস্তিত্বের সত্যটি সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ আয়ুকালের ছোটো সীমানার মধ্যে বদ্ধ নয়। মর্ত্য প্রাণের পরিধির বাইরে মানুষ যদি শূন্যকেই দেখে তাহলে সে আপনার প্রাণটুকুকে, বর্তমানের স্বার্থ ও আরামকে, একান্ত করে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি আপনার মধ্যে অনুভব করেছে বলেই মৃত্যুর অতীত সত্যকে শ্রদ্ধা করতে পারে।

জীবনের মাঝখানে মৃত্যু যে-বিচ্ছেদ আনে তাকে ছেদরূপে দেখে না সেই মানুষ, যে মানুষ নিজের জীবনেরই মধ্যে পূর্ণতাকে উপলব্ধি করেছে। যে মানুষ রিপুর জালে বন্দীকৃত, পরকে যে আপন করে জানে নি, বৈষয়িকতার মোহে বৃহৎ বিশ্ব থেকে যে নির্বাসিত, মৃত্যু তার কাছে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ংকর। কেননা, জগতে মৃত্যুর ক্ষতি একমাত্র আমি-পদার্থের ক্ষতি। আমার সম্পত্তি, আমার উপকরণ দিয়ে আমার সংসারকে আমি নিরেট করে তুলছিলেম, মৃত্যু হঠাৎ এসে এই আমি-জগৎটাকে ফাঁকা করে দেয়। যে-আমি নিজের আশ্রয়নির্মাণের জন্যে স্থূল বস্তু চাপা দিয়ে কেবলই ফাঁক ভরাবার চেষ্টায় দিনরাত নিযুক্ত ছিল সে এক মুহূর্তে কোথায় অন্তর্ধান করে এবং জিনিসপত্রের স্তূপ পুঞ্জীভূত নিরর্থক হয়ে পড়ে থাকে। সেইজন্যে যে বিষয়ী, আত্মম্ভরী, মৃত্যু তার পক্ষেই অত্যন্ত ফাঁকি। আমিকে জীবনে যে অত্যন্ত বড়ো করে নি সেই তো মৃত্যুকে সার্থক করে জানে।

সাহিত্যে চিত্রকলায় ব্যঞ্জনাই রসের প্রধান আধার। এই ব্যঞ্জনার মানে, কথাকে বিরল করে ফাঁকের ভিতর দিয়ে ভাবের ধারা বইয়ে দেওয়া। বাক্য ও অলংকারের বিরলতার ভিতর দিয়ে যাঁরা ইঙ্গিতেই রসকে নিবিড় করেন তাঁরাই গুণী, আর যাঁদের ভাবুক দৃষ্টিতে সেই বিরলতাই রসে পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাঁরাই রসজ্ঞ। ভাবের মহলে যারা অর্বাচীন তারা উপকরণকেই বড়ো করে দেখে সত্যকে নয়। সুতরাং উপকরণের ফাঁক তাদের কাছে সম্পূর্ণই ফাঁক। তেমনি নিজের আয়ুকালটাকে যে মানুষ 'আমি' ও 'আমি'র আয়োজন দিয়েই ঠেসে ভরিয়ে দেয়, সেই মানুষের মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা থাকে না— সেইজন্যে মৃত্যু তার পক্ষে একান্ত মৃত্যু।

দিনের বেলাটা কর্ম দিয়ে, খেলা দিয়ে ভরাট থাকে। রাত্রি যখন আসে, শিশু তখন ভয় পায়, কাঁদে। প্রত্যক্ষ তার কাছে আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে সে মনে করে সবই বুঝি গেল। কিন্তু আমরা জানি, ছেদ ঘটে না, রাত্রি ধাত্রীর মতো দিনকে অঞ্চলের আবরণের মধ্যে পালন করে। রাত্রিতে অন্ধকারের কালো ফাঁকটা যদি না থাকত তাহলে নক্ষত্রলোকের জ্যোতির্ময় ব্যঞ্জনা পেতুম কেমন করে? সেই নক্ষত্র আমাদের বলছে, 'তোমার পৃথিবী তো এক ফোঁটা মাটি, দিনের বেলায় তাকেই তোমার সর্বস্ব জেনে আঁকড়ে পড়ে আছ। অন্ধকারে আমাদের দিকে চেয়ে দেখো— আমরাও তোমার। আমাদের নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে এক হয়ে আছে এই বিশ্ব, এইটেই সত্য।' অন্ধকারের মধ্যে নিখিলবিশ্বের ব্যঞ্জনা যেমন মৃত্যুর মধ্যেও পরম প্রাণের ব্যঞ্জনা তেমনি।

আমরা ফাঁক মানব না। ফাঁককে মানাই নাস্তিকতা। চোখে যেখানে ফাঁক দেখি আমাদের অন্তরাত্মা সেইখানে যেন পূর্ণকে দেখে। আমার মধ্যে এবং অন্যের মধ্যে মানুষে মানুষে তো আকাশগত ফাঁক আছে; যে লোক সেই ফাঁকটাকেই অত্যন্ত বেশি করে সত্য জানে সে-ই হল স্বার্থপর সে-ই হল অহংনিষ্ঠ। সে বলে, ও আলাদা, আমি আলাদা। মহাত্মা কাকে বলি যিনি সেই ফাঁককে আত্মীয়সম্বন্ধের দ্বারা পূর্ণ করে জানেন, জ্যোতির্বিৎ যেমন করে জানেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝখানকার শূন্য পরস্পরের আত্মীয়তার আকর্ষণসূত্র বহন করছে। এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের ফাঁক আরও বড়ো। শুধু আকাশের ফাঁক নয়, আচারের ফাঁক, ভাষার ফাঁক, ইতিহাসের ফাঁক। এই ফাঁককে যারা পূর্ণ করে দেখতে পারলে না তারা পরস্পর লড়াই করে পরস্পরকে প্রতারণা করে মরছে। তারা প্রত্যেকেই 'আমরা বড়ো' 'আমরা স্বতন্ত্র' এই কথা গর্ব করে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে। অন্ধ যদি বুক ফুলিয়ে বলে, 'আমি ছাড়া বিশ্বে আর কিছু নেই' সে যেমন হয় এও তেমনি। আমাদের ঋষিরা বলেছেন, পরকে যে আত্মবৎ দেখেছে সে-ই সত্যকে দেখেছে। কেবল কুটুম্বকে, কেবল দেশের মানুষকে আত্মবৎ দেখা নয়, মহাপুরুষেরা বলেছেন শত্রুকেও আত্মবৎ দেখতে হবে অসত্য বলে একে উপহাস করতে পারব না। এই সত্যকে আমি আয়ত্ত করতে পারি নি বলে একে আমার সাধনার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। কেননা পূর্ণস্বরূপের বিশ্বে আমরা ফাঁক মানিতে পারব না। এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমার মনে বেজে উঠেছে তার কারণ সেদিন সেই

যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মতো অত বড়ো বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে পরম শত্রু বলে জানে, তাকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেয়েছেন। তাই আমাকে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন—

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।'

যে গানটি তিনি আমাকে দুবার অনুরোধ করে শুনলেন সেটি এই :

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে ক'রে নিল আমায় জন্মমরণ পারে,
এল পথিক সেজে।
চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলোআঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।
এত কালের ভয়ভাবনা কোথায় যে যায় স'রে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভ'রে
কালিমা যায় মেজে।—
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো গভীর শান্তি এ যে।

জীবনকে আমরা অত্যন্ত সত্য বলে অনুভব করি কেন? কেননা এই জীবনের আশ্রয়ে আমাদের চৈতন্য বহুবিচিত্রের সঙ্গে আপনার বহুবিধ সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধবোধ বর্জিত হয়ে থাকলে আমরা জড় পদার্থের মতো থাকতুম, সকলের সঙ্গে যোগে নিজেকে সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারতুম না। এই সুযোগটি দিয়েছে বলেই প্রাণকে এত মূল্যবান জানি। মৃত্যুর সম্মুখেও যাঁদের চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশস্ত থাকে তাঁরা মৃত্যুর মধ্যেও সেই মূল্যটি দেখতে পান। যিনি সকল সম্বন্ধের সেতু, সকল আত্মীয়তার আধার, বহুর মধ্য দিয়ে যিনি এককে বিধৃত করে রেখেছেন, তাঁরা মৃত্যুর রিক্ততার মধ্যে তাঁকেই সুস্পষ্ট দেখতে পান। সেই জন্যেই এ মৃত্যুপথের পথিক আমাকে গান গাইতে বলেছিলেন, পূর্ণতার গান, আনন্দের গান। তাঁকে গান শুনিয়ে ফিরে এসে সে রাত্রে আমি একলা বসে ভাবলুম, মৃত্যু তো জীবনের সব শেষের ছেদ কিন্তু জীবনেরই মাঝেমাঝেও তো পদে পদে ছেদ আছে। জীবনের গান মরণের শমে এসে থামে বটে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার তাল তো কেবলই মাত্রায় মাত্রায় ছেদ দেখিয়ে যায়। সেই ছেদগুলি যদি বেতালা না হয়, যদি তা ভিতরে ভিতরে ছন্দোময় সংগীতের দ্বারা পূর্ণ হয় তাহলেই শমে এসে আনন্দের বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু ছেদগুলি যদি সংগীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে চলে, তাহলেই শম একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে। জীবনের ছেদগুলি যদি ত্যাগে, ভক্তিতে, পূর্ণস্বরূপের কাছে আত্মনিবেদনে ভরিয়ে রাখতে পারি,—মৌচাকের কক্ষগুলি মৌমাছি যেমন মধুতে ভরিয়ে রাখে,—তাহলে যা-ই ঘটুক না, কিছুতেই ক্ষতি নেই। তাহলে শূন্যই পূর্ণের ব্যঞ্জনাকে বহন করে। বিশ্বের মর্মকুহর থেকে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্চে ওঁ, হাঁ—আমি আছি। আমাদের অন্তর থেকে আত্মা সুখেদুঃখে উৎসবে শোকে সাড়া দিক ওঁ, হাঁ সব পূর্ণ, পরিপূর্ণ! বলুক,—

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।

২৬ ভাদ্র ১৩৩০

আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্মসাধনার একটি বিশেষ প্রণালী ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটি বিশেষ দিক আমাদের পিতামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব সে একটি বিশেষ সম্পদ, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের পক্ষেই।

বিজ্ঞানে সত্যসাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন করে মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধিলাভ করছে সন্দেহ নাই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে-পশ্চিমদেশ-বাসীরা নিজের অধ্যবসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করছেন তাঁরা কেবল নিজেদের নয় সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ শক্তি দান করছেন।

ভারতের যে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট হয়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব ভারতবাসীর আছে। যে-সাধনার ধারা ভারতের চিত্ত-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহবশত লুপ্ত হতে দিই, তাহলে আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্যকে বঞ্চিত করব।

সাধারণত পশ্চিমের মানুষ বলে থাকে চলাটাই লক্ষ্য, পাওয়াটা লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিস কিছু আছে কি না সে সম্বন্ধে সেখানে সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরি দিনে দিনে চুকিয়ে নেওয়া, চলতে চলতে টুকরো টুকরো জিনিস জমিয়ে তোলা এইটে হচ্ছে সেখানকার কথা। সেখানকার বন্দোবস্ত রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে চলা, ঘরের প্রদীপ জ্বালানো নয়।

ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম সত্যে পৌঁছবার যে প্রণালীটি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল সেটি কী? এক কথায় তাকে নাম দেওয়া হয়েছে যোগ।

ধর্মসম্বন্ধে ভারতচিত্তে বিশেষ অভিমুখিতা যে কী তা এই যোগ শব্দের দ্বারাই জানা যায়; সেই কথাটাকে একটু স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া চাই।

যে-সত্যকে মানুষ সাধারণত ঈশ্বর নাম দিয়ে থাকে সেই সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের বিধিকেই আমরা ধর্ম বলি।

কোনো কোনো ধর্মে বলে এই সম্বন্ধের বিশুদ্ধিতা অনুসারে আমরা বিশেষ পুরস্কার পেয়ে থাকি। সেই পুরস্কারকে কখনো পুণ্য বলি, স্বর্গ বলি, কখনো পরিত্রাণ বলি। যা-ই বলি না কেন, এর একটা বাহ্য মূল্য আছে।

ঈশ্বর বিধাতা, তাঁর বিধান পালন করার দ্বারা আমরা তাঁর প্রসন্নতা পাই, সেই প্রসন্নতায় আমাদের কল্যাণ। অতএব বিধাতার বিধানপালনে যে ধর্ম সেই ধর্মকে আশ্রয় করবার একটা হিসাব পাওয়া গেল।

এই পন্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের পন্থার এক জায়গায় মিল আছে। বিজ্ঞানের নির্দেশ এই যে বিশ্বের অমোঘ নিয়মগুলিকে যদি আমরা জানি এবং তাদের যদি মানি তাহলে আমরা শক্তিলাভ করি ঐশ্বর্য লাভ করি। নিয়মের জগতে নিয়ন্তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে দণ্ডপুরস্কারের ভয়ে ও লোভে দেওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দেওয়া পাওয়া হচ্ছে বস্তুনীতিগত, আর ধর্মক্ষেত্রে সেটা কর্তব্যনীতিগত। ধর্মবিহিত এই কর্তব্যনীতি কোথাও বা শাশ্বত সত্যের অনুগত কোথাও বা কৃত্রিম আচারগত। যেখানে তা শাশ্বত সত্যের বিরোধী নয় সেখানে মানুষ তা পালন করে কল্যাণ লাভ করে, যেখানে তা কৃত্রিম আচারমাত্র সেখানে তাকে আশ্রয় করে মানুষ দুর্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে; অমাদের দেশে পদে-পদে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। এই আচারকে ধর্ম বলা আর জাদুবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা একই কথা।

কিন্তু ভারতবর্ষ যাকে পরম সত্য বলছে, যাতে উত্তীর্ণ হবার প্রণালী হচ্ছে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সম্বন্ধ নেই, হওয়ার সম্বন্ধ। বস্তুত সত্য হওয়া ছাড়া সত্যকে পূর্ণভাবে পাওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

মানুষের দুটো দিক। একদিকে সে স্বতন্ত্র, আর একদিকে সে বিশ্বতন্ত্র। আহারে ব্যবহারে সঞ্চয়ে কর্মচেষ্টায় এই স্বাতন্ত্র্য আমাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। একে বাঁচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে মানা চাই। নইলে চারিদিকের টানে ধূলিসাৎ হতে হবে। এই নিয়মকে আপনার আয়ত্ত করে স্বাতন্ত্র্যকে বলিষ্ঠ করে তোলা য়ুরোপের স্বভাবগত। এতে বিশ্বনিয়মের সঙ্গে ক্রমাগত তাকে বোঝাপড়া করতে হয়।

ভারতবর্ষ সত্যের সেই দিকে ঝোঁক দিয়েছে যেদিকে মানুষ বিরাট। এই যে বিশ্বের মধ্যে আমি বিরাজ করছি একে যে পরিমাণে আপন না করব সেই পরিমাণেই আমি অসত্য থাকব। সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করে তবে আমার পূর্ণতা হবে।

সেই প্রবেশের মানে এই নয় যে, আয়তনের দ্বারা বিশ্বকে অধিকার করা। সেই আয়তনের দিকে সীমার কোথাও শেষ নেই। বস্তুত অফুরান সীমা অসীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ।

একখানা গ্রন্থকে তার বস্তুপরিমাণ আর শব্দপরিমাণের দ্বারা পরিমাপ করতে গেলে সেই বোঝা দুঃসাধ্য বৃহৎ হয়ে পড়ে। তার মূল তত্ত্বটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়া যায়।

যা-কিছু সমস্তর মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস ও প্রণালী হচ্ছে যোগ। কিন্তু পূর্বেই আভাস দিয়েছি সমস্ত মানে সমষ্টি নয়। তাকে ওতপ্রোত করে এবং অতিক্রম করে যে-সত্য বিরাজ করেন সেই ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশই যোগের লক্ষ্য।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

এই যে যোগ এ মনের কর্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের ভেদ ঘটিয়ে সংসারযাত্রার কাজ চালায়। যোগসাধনার প্রধান অঙ্গই হচ্ছে মনকে ভোলা। যারই সঙ্গে যোগে মনের ব্যবধান ঘুচে যায় তারই সম্বন্ধে আত্মার গভীর আনন্দ ঘটে। কারণ আত্মা বাধামুক্তরূপে সেখানে আপনাকে প্রসারিত করে।

আত্মার এই যোগের পথে মনকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। কোনো কিছু অর্জনে মন কর্তা নয়; উপলব্ধিতে মন কর্তা। যাকে আমরা বাইরে রাখি তাই অর্জন, যা অন্তরের জিনিস তাই উপলব্ধি। এই অর্জনের রাজ্য হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্রের রাজ্য। এখানে সংখ্যা এবং আয়তন এবং ওজন। এখানে সংগ্রহ এবং সঞ্চয় কেবলই পরিমাণের পথে এগোতে থাকে। কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। সেখানে শত যে সে দশশতের এবং দশশত লক্ষের দিকে অন্ধের মতো চলতে থাকে।

উপলব্ধির রাজ্য হচ্ছে পরিমিতির অতীত রাজ্য। এইজন্য সেখানে পৌঁছনর মধ্যে সমাপ্তি আছে অথচ সমাধা নেই। সেখানে আত্মা আপন পূর্ণতার স্বাদ পায়। এই পূর্ণতার অব্যবহিত অনুভূতিই আনন্দ। তারই কথা উপনিষদ বলেছে—

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

পৌষ ১৩৩০

আনন্দের শঙ্খধ্বনি মানুষের জন্মকালে বেজে ওঠে। প্রত্যেক জন্মের মধ্যে আনন্দময় একটি মহৎ প্রত্যাশা আছে। মানুষের চিরকালের যে আকাঙ্ক্ষা তাই পূর্ণ হবে, যুগযুগান্তের এই প্রত্যাশা বারে বারে নবজাত শিশু বহন করে আনে; আমাদের ভিতর যা কিছু অসম্পূর্ণ তাই সম্পূর্ণ হবে, এই সম্ভাব্যতা তার মধ্যে আছে। কিন্তু আজ আমার জন্মদিন তেমন নূতন জন্মদিন নয়, নূতন প্রত্যাশা জাগাবার সম্ভাবনা তায় আর নেই। আমার কর্ম প্রায় শেষ হয়ে গেছে। যদি

কোনো আনন্দ দিয়ে থাকি, কোনোও সান্ত্বনা এনে থাকি, তবে সে দেওয়া হয়ে গেছে, সামনে আর কিছু নেই।

কিন্তু তবু মন তো বলে না, সকল প্রত্যাশার প্রান্তে এসেছি। এখন কি কেবলই পুরাতন, অভ্যাসের দ্বারা বাঁধা, সংস্কারের দ্বারা কঠিন, নিত্য ব্যবহারের দ্বারা অসাড়? এখনো জীবনে অভাবনীয় কি কিছু নেই? তা তো বলতে পারি নে। অজানার ডাকে এখনো প্রাণ সাড়া দেয়, নূতনের ভাষা এখনো বুঝতে পারি।

বিশ্বমানুষ বারে বারে যেমন শিশু হয়ে জন্মায়, তেমনি প্রত্যেক মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে না জন্মালে বিশ্বের দেওয়া নেওয়া তার কাছে স্তব্ধ হয়ে যায়। বারংবার সীমা ভাঙার দ্বারা, আপনার মধ্যে যে অসীম আছে তাকে পাই। প্রাচীন বয়সের দুর্গের পাষাণ ভিত্তির মাঝখানে আজ যে বাসা বেঁধেছে সে আমি কেউ নয়।—আমি কবি, একটি পরম সম্পদ বহন করে এনেছিলুম। কী আনন্দ ছিল, আমার সঙ্গে আমার চারি দিকের যোগে। আমার সেই ঘরের সামনে নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী, শরতের আলোতে তার পল্লবের ঝালর ঝলোমলো; শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রগুলির পরে প্রভাতসূর্যের কিরণ বীণাতন্ত্রীতে সুরবালকের আঙুলের স্পন্দনের মতো। এই শ্যামলা ধরণী, এই নদী, প্রান্তর অরণ্যের মধ্যে আমার বিধাতা আমাকে অন্তরঙ্গতার অধিকার দিয়েছেন, এর মধ্যে নগ্ন শিশু হয়ে এসেছিলুম! আজও যখন দৈব বীণা অনাহত সুরে আকাশে বাজে, তখন সেদিনকার সেই শিশু জেগে ওঠে, শিশু জেগে উঠে বলতে চায় কিছু, সব কথা বলে উঠতে পারে না। আজ আমার জন্মদিন সেই কবির জন্মদিন, প্রবীণের না। আমি কিছু কর্ম করেছি, সেবা করেছি, কিছু ত্যাগ করেছি—কিন্তু সে বড়ো কিছু নয়। সকলের চেয়ে যে বড়ো দান, সে আপনিই আপনাকে দেয়; পুষ্পের গন্ধ প্রকাশ পেলে বাতাস ভরে ওঠে; সে গন্ধ ফুলের অন্তর থেকে আপনি প্রবাহিত। ভাণ্ডার থেকে তাকে চাবি খুলে আনতে হয় না। সে তার সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। সেই রকমের সত্যদান যদি আমার কিছু থাকে, আনন্দলোকে যার সহজ অনুভূতি, যার মধ্যে ক্লান্তি নেই, ছুটির দাবি নেই, বেতন প্রার্থনা নেই, সমস্ত বিশ্বের সেই জিনিস পাথরের মূলে উৎসের মতো আমার মধ্য দিয়ে যদি উৎসারিত হয়ে থাকে, তবে তাই রইল। তা ছাড়া বাইরের গড়া জিনিসের ইঁট-কাঠের ইমারতের, নিয়মে বাঁধা প্রতিষ্ঠানের কালের হাতে নিস্তার নেই। ফুল প্রতি বসন্তে ফিরে ফিরে আসে, তার মধ্যে ক্ষতি নেই—সে বিশ্বের সহজ সামগ্রী। আমার কাজের মধ্যেও সত্যের যদি সুন্দর রূপ কিছু আপনি দেখা দিয়ে থাকে, তবে ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্ধানের মধ্য দিয়েও সে থাকবে। অনেক কিছু আছে যা জীর্ণ হয়ে যাবে, বাকি কিছু রইল ভাবী কাল যা তুলে নেবে। তা হোক; কী থাকবে কী না থাকবে, তা ভাববারও দরকার নেই। দরকার আপনাকে পাওয়া, বারে বারে নতুন করে পাওয়া। আজ সেই অপর্যাপ্ত নতুনকে অনুভব করছি। যাঁর হুকুম নিয়ে এসেছি, একদিন তিনি যে বাণী আমার প্রাণে সঞ্চার করে দিয়েছেন, দেখছি আজও তা শেষ হয় নি। অথচ দিন শেষ হয়ে এল। ভিতরকার যে প্রকাশ অসমাপ্ত রয়ে গেল, রাত্রির অন্ধকারেই কি তার একান্ত অবসান? হয় তো প্রত্যুষ এসেছে বা, আর এক জন্মের জন্য পাথেয় আজ হয় তো এসে পৌঁছল। এই কথা চিন্তা করে আমাদের সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৩

রাজধানীর জনসংঘের কোলাহল থেকে যখন এখানকার শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে আজ এসে পৌঁছলেম, তখন আকাশ দিনাবসানের আলোকে অবগুণ্ঠিত, মেঘাবরণ ছায়ানিক্ষেপ করে অরণ্যানীর শ্যামলতাকে কোমলতর করেছে, বর্ষশেষের যে-রূপটিকে আজ এখানে দেখলুম, রাজধানীতে থাকলে সেটি এমন প্রত্যক্ষ করে দেখতে পেতুম না। সেখানে একটি ঘূর্ণিপাকের আচ্ছাদন চারি দিকে; বিশ্বসৃষ্টিতে আরম্ভ ও অবসানের অবিচ্ছিন্ন সমগ্র রূপটিকে ঐ আচ্ছাদনে লুপ্ত করে রেখেছে। মানবজীবনের সংগীতে ক্ষণে ক্ষণে শমে ফিরে আসবার অপেক্ষা আছে।

কিন্তু জনতার কোলাহলে মনে হয়, তানের পর তান চলছে, কোথাও শম আসে না। সেখানে চারি দিকের ভিড়ের ঠেলায় মানুষ চলেছে; সে-চলায় ছন্দ নেই। বিরামহীন প্রয়াস; সেই প্রয়াসের সঙ্গে শান্তির মিলন হল না। নগরীতে যখন সন্ধ্যা আসে তখন সে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, দিনের কোলাহল অনধিকার প্রবেশ করে তার কণ্ঠরোধ করে দেয়। দিনের উদ্যম সন্ধ্যার বিশ্রামের মধ্যে উগ্র উত্তেজনার সন্ধান করে।

ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে মনে করেছিলেম আজ বর্ষশেষের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাব না। এমন সময় বনপ্রান্তের উপর ঘনমেঘের স্নিগ্ধছায়ার স্পর্শ নামল, প্রান্তরের উপরকার সুবিশাল শান্তি শূন্যতার রূপে নয় সুন্দরের রূপে দেখা দিল, বিশ্বকর্মের অজস্র ব্যয়স্রোতের অন্তরে চিরসঞ্চিত যে পূর্ণতা, সন্ধ্যার কানায় কানায় ভরা সেই পূর্ণতার সঞ্চয় দেখতে পেলুম। ধ্যানে অনুভব করলুম, বাইরে যাকে অবসান বলে জানি, এইখানে তার মধ্যে নবপ্রাণের বীজের অজ্ঞাতবাস।

জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অবসানের মধ্যেই তার সমগ্র ছন্দের পূর্ণতাটিকে দেখতে পাই। যতি না থাকলে ছন্দের চেহারা লুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের জীবনে যতি-নিয়মিত ছন্দের প্রবাহই জীবনকে নির্মল করে,—গতি ও যতির মধ্যে দিয়েই সেই প্রবাহ। মানুষের ইতিহাসের অনেক বড়ো বড়ো সভ্যতা কিছু কালের সমারোহের পরেই অন্তর্ধান করেছে, তার কারণটা এই যে, তার ছন্দের যতিকে সে হারিয়েছিল, তার উদ্যমকে কেবলই সে ছড়িয়েছে, কুড়োয় নি। ক্ষান্তির মধ্যে যে পূর্ণতা তাকে সে স্বীকার করে নি। তার তাল কেটে গেছে। তার শম এল অস্থানে, সেটা বিরাম নয়, সে বিনাশ।

আমার সৌভাগ্য যে আজ এখানে এসেছি। যে নগরী থেকে এলেম সেখানে সন্ধ্যার মূর্তি উন্মত্তা, কল্যাণী নয়; সেখানে মৃত্যুর মুখচ্ছবি আপন গাম্ভীর্য হারিয়েছে। লোকালয়ে মৃত্যুকে অস্বীকার করবার একান্ত চেষ্টা, এইজন্যেই মৃত্যুর সত্যকে সেখানে দেখতে পাই নে। মৃত্যুর সূচনাতেই, চিরাভ্যস্ত অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে প্রবাহিত জলধারার কাছে বাস করবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে সেটি আমার কাছে বড়ো সুন্দর লাগে। যে মৃত্যু আপন বিরাট রথে বিশ্বকে বহন করে নিয়ে যায় আরম্ভ থেকে অবসানে, অবসান থেকে নবজন্মে, সেই পরম গম্ভীর মৃত্যুকে প্রত্যুদ্গমন করে নেবার জায়গা হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, গৃহপ্রাচীরের মধ্যে নয়।

আজ অবসান আমাদেরকে মুক্তির রূপ দেখাক যে মুক্তির মধ্যে পূর্ণতা। শান্ত হয়ে বলি, হে অন্ত, তুমি ওঁ, তোমার মধ্যে অনন্ত। আজ বর্ষশেষের দিনে তোমার মধ্যে অশ্রুর আভাস লাগল, বিরহ বিচ্ছেদ নৈরাশ্য ক্লান্তির অবসাদ আজ গোধূলির অন্ধকারে জড়িয়েছে—তবু সমস্তকে অঙ্গীকৃত করে উত্তীর্ণ করে অন্তরে বাহিরে তোমার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি ওঁ। হৃদয়ের বেদনা ওকে সৌন্দর্যই দিয়েছে,—অশ্রু-বাষ্পে এ ম্লান হয় নি, সুকোমল হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারা-লোকিত বিপুল আকাশে মৃত্যু আপন শান্ত সুন্দর মূর্তিকে প্রকাশ করে, দিনের সমস্ত ভার নাবিয়ে দিয়ে তার আলিঙ্গনে আমরা নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিই। বর্ষশেষে আজ তারই বিরাট রূপকে ক্লান্তিহীন, জীর্ণতাহীন অন্ধকারের মহাসনে আসীন দেখি এবং তাকে নমস্কার করি॥

বর্ষশেষ ১৩৩৪

আজ নববর্ষের প্রথম দিনে যখন নিজেকে একটি প্রশ্ন করি, তুমি কী করতে এসেছ অসীম দেশ ও অসীম কালের এক প্রান্তে? তার উত্তরে মন বলে, আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেছি যে, দেখা হয়েছে। এই উত্তরটি আমার সমস্ত কর্মের মধ্যে নিহিত সমস্ত বাধার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে শুভমুহূর্তে উদ্ভাসিত চৈতন্যের দীপ্তিতে এই উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সকল দেখার অন্তরে সত্যকে দেখতে পেলুম। তীর্থে যায় মানুষ তীর্থের অন্তরতম অধিদেবতাকে দেখতে,—বলে, দর্শন মিলেছে। কোনো কিছু সংবাদ নিতে নয়, তত্ত্ব

নির্ণয় করতে নয়, পরিপূর্ণ আনন্দে শুধু এই কথাটি বলতে,—প্রভাতের সূর্য-কিরণে সন্ধ্যারাতির দীপালোকে দর্শন করা হল।

'আলোয় বাতাসে মাটিতে জলে যে অলক্ষ্য অপরিসীম প্রাণের স্পন্দন, তারি স্পর্শ পেলাম', গাছ এই কথা বলছে তার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায়, নানা ঋতুতে নানা বর্ণে নানা ভাষায়। আলোর মধ্যে মিথ্যে, বাতাসের মধ্যে ছলনা, মাটি জলের মধ্যে চির প্রচ্ছন্ন দীনতা, একথা বর্ষে বর্ষে অজস্র করে বলবার জন্যে সুন্দর হয়ে ফুল ফুটত না, মধুর হয়ে তার ফল ফলত না। গাছ যেখানেই তার বিশ্বের মর্মগত প্রাণশক্তির সঙ্গে যোগে বাধা পেল সেখানেই তার পাতা পড়ল ঝরে, তার শাখা গেল শুকিয়ে। তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা শ্যামল হয়ে সুন্দর হয়ে আলোর দিকে নিজেকে প্রসারিত করে বলছে, 'হে আলো, তোমার স্পর্শ দাও আমাকে।' আলোককে আমি বিশ্বাস করি, এই কথাটি বলা-ই তার সমস্ত অস্তিত্ব। সে বলে, 'যে প্রাণ দেশে কালে আনন্দিত, তাকেই আমি আমার মধ্যে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করব।'

কবিও এই কথাই বলতে এসেছে, 'আনন্দের যে অমৃতরূপ তাই দেখলুম দুই চক্ষু দিয়ে, রক্তের মধ্যে তার কাঁপন লাগল। এই দেখাটি আমার ছন্দে সুরে অক্ষয় রূপ নেবার জন্যে এত করে ব্যাকুল।' চৈতন্য যখন বাধাগ্রস্ত হয়, বাষ্পে ধুলায় তার চারিদিকের হাওয়া যখন ঘন হয়ে ওঠে, তখনি অন্ধ মন বলতে চায় সমস্ত ফাঁকি; সে বলে আমি ঠকেছি। কিন্তু ঠকার কথাটা তো গানে গাবার নয়, কোনো একটি সুনিশ্চিতের আশ্বাস এসেই তো গানের সুরে ঢেউ তুলে দেয়। তার প্রতি বিশ্বাসেই নবীনতা—অবিশ্বাসেই জরার আক্রমণ, তাতে রস শুকিয়ে ফেলে। সেই রস গেলেই বিশ্বলোকে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না। শুকনো ডাল বলে, 'কিছুই পাচ্ছি নে, কিছুই নেই।' সেই তো বলে, 'বসন্ত মিথ্যাবাদী।'

সুন্দরকে দেখে বলি, তোমাকেই পেলেম, 'আমিকে' ভুললেম। সত্যকে আত্মীয় বলে উপলব্ধি করতে পারলে বলি, তোমার জন্যে আমি যেন মরতে পারি। এই আমিকে অতিক্রম করার দ্বারাই সত্যউপলব্ধির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বিক্ষেপকে দমন করে জীবনের লীলাকে যখন ঐক্যের সুষমা দিতে পারি তখন 'আমি'-অত্যাচারমুক্ত সেই সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির মূলগত কল্যাণকে স্পর্শ করি।

আজ আমার জীবনের লীলাক্ষেত্রের প্রান্তসীমায় এসেছি। এ জীবনে কী হতে পারে-না-পারে অনেকটা পরিমাণে সেটা নিশ্চিত করে জানা গেল। বয়স যখন অল্প ছিল আমার আয়ুর অনেকটা অংশই ছিল ভাবীকালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। তখন আশা করবার শক্তির সীমা ছিল না। তখন আপন সার্থকতার যে মূর্তি কল্পনা করতুম, তাতে কোনো ত্রুটির আশংকা করি নি। কালে কালে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, কিছুই অসম্ভব নেই। এই আশা তখন অক্ষুণ্ণ ছিল।

আশা করবার এই শক্তিই প্রথম বয়সের সব চেয়ে বড়ো শক্তি। এই আশাতে কেবল যে পাথেয়-রূপে আমাদের পথ চলাতে উৎসাহ রক্ষা করে তা নয়, এর মধ্যে সৃষ্টি-শক্তি আছে, অনুকূল অবস্থাকে এ গড়ে তোলে। যা অভাবনীয়, তাও সম্ভবপর একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারার দ্বারা একথা সত্য হয়ে ওঠে।

আজ আমার জীবনে বিশেষ নূতন কিছু আশা করবার স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। পথ-চলার সত্য সম্বন্ধে আজ আমার বেশি কিছু বলবার নেই—আজ আমার বলবার কথা লাভ করবার সত্য সম্বন্ধে।

ফললাভের একটা বহিরঙ্গ আছে তাকে বলে সিদ্ধি, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে সাকসেস। সেটাকে সহজে দেখা যায়, পরিমাপ করা যায়, সেটাকে দিয়ে দশজনের কাছে নিজের গৌরব প্রমাণ করা সহজ। তার প্রতি মানুষের লোভ প্রবল। তার কোনো বৈকল্য ঘটলে মানুষ সেটা ঢাকতে চেষ্টা করে, অত্যুক্তির দ্বারা তার ছিন্নতায় তালি দিতে চায়। আপন আপন সিদ্ধি প্রমাণ করবার প্রতিযোগিতায় নিজকৃত অধ্যবসায়ে, ধর্মে পলিটিক্সে মিথ্যাবাদ ও কলহের অন্ত থাকে না।

নবীন বয়সে যখন আশা করবার দিন সম্মুখে থাকে তখন সিদ্ধির ঝুলি ভর্তি করবার চেয়ে চলার উৎসাহই প্রবল থাকে। তারপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িকতায় ধরে। সেই বিষয়বুদ্ধিই লুব্ধ মনে সিদ্ধির হিসাব করতে বসে। অল্পবয়সে বিপুল আশা আমাদের মনকে টানে লক্ষ্মীর কমলাসনের দিকে,—বয়স হলে আমাদের পথ বেঁকে যায় কুবেরের ভান্ডারের দিকে, নগদ লাভের মহলে।

যে সব প্রত্যক্ষ ফল লাভ নিয়ে সিদ্ধি সেটা যে ভালো নয় এমন কথা বলি নে। তাকেও চাই, তাকে নইলে চলবে না, কিন্তু তার যতটা মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে গিয়ে তার পিছনে নিজের সমস্ত সম্বল উজাড় করে দিলেই বিপদ। আমরা যা চাই, বাইরে থেকে হাতে হাতে তার সমস্ত পূর্ণ হতে পারে না, এ অত্যন্ত নিশ্চিত। তাই বলে বলতে পারব না ভাগ্য আমাদের বঞ্চিত করলে। বাহিরের সিদ্ধিই যদি সার্থকতার একমাত্র পরিমাণ হত তাহলে সংসারের মতো এত বড়ো ফাঁকি আর কী হতে পারত? জীবনের অনেক ইচ্ছা অকৃতার্থ, অনেক চেষ্টাই অসমাপ্ত। তবু এ কথা ভুললে চলবে না যে, আমাদের অধিকাংশ সত্য আকাঙ্ক্ষা, আমাদের অকৃত্রিম সত্য প্রয়াস, অসিদ্ধির ভিতর দিয়েই আন্তরিক সার্থকতায় পৌঁছয়, জীবনের ইতিহাসের মজ্জায় গিয়ে তারা সঞ্চিত হয়। মানুষ বললে মানুষের পক্ষে যা অমঙ্গল তাকে চরম বলে মানব না! বিদ্রোহে প্রস্তুত হল। ফল চোখে দেখতে পেলে না। কোন্ শয়তান এই নিষ্ফলতাকে বিদ্রূপ করবে? এই বীর্যের ধ্রুব সার্থকতার আসন রয়ে গেছে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যবিভাগে। যে অবিশ্বাসী অমঙ্গলের প্রতিবাদ করতে দাঁড়াল না, বললে, যা অসাধ্য তাকে সম্ভব করবার চেষ্টা করা শক্তির অপব্যয়, সংসারে সে পরাভব সৃষ্টি করলে। সে পরাভব আত্মার। যে-মুহূর্তে জোরের সঙ্গে সত্য করে বলেছি মানুষের অপূর্ণতাকে কিছুতেই স্বীকার করব না, তার জন্যে দিয়ে ফেলব প্রাণ, তখনি জয়ী হয়েছে সেই দিয়ে ফেলা প্রাণ। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহৎ তাঁরা যা প্রত্যাশা করেন চারি দিকে সেই প্রত্যাশার কঠিন প্রতিবাদ সইতে পারেন। তাঁরা ফল পান নি তবু কাজ করেছেন, এই জন্যেই তাঁরা আমাদের নমস্কার পাবেন। তাঁরা এ সংসারের দিনমজুর নন। তাঁরা বলে গিয়েছেন বাইরে ফলের জন্যে লুব্ধ হোয়ো না, কর্মের ফল অসিদ্ধিকে অতিক্রম করে অন্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা এই কথাটি সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে এসেছি, অসত্যকে অকল্যাণকে মানব না মানব না। দুর্জয় বাধার সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাটি অক্লান্ত উৎসাহে বলার দ্বারা আমাদের আত্মা জয়ী হয়। সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতার অক্ষয় ভান্ডারে অসংখ্য নিষ্ঠাবান বীরের এই বাণী সঞ্চিত, তাতেই তাদেরকে অলক্ষ্যে অমর শক্তি জুগিয়ে দিচ্ছে।

নববর্ষ ১৩৩৫

পশুশাবক পিতৃধর্মের পুনরাবৃত্তি করতে আসে। পিতাই দেখা দেয় বারে বারে। মানুষের শিশু আসে পুত্রকে আবিষ্কার করতে, যে-পুত্র পিতাকে পূর্ণতা দেয়।

পূর্বতনের নিরন্তর অনুকরণই যাদের ধর্ম, যারা অন্তহীন পিতামহ, সেই পশুদের কাছ থেকে কাল কিছুই আশা করে না। তাদের প্রতি কোনো প্রশ্ন নেই, দেখা হলে কেউ তাদের মুখের দিকে চেয়ে উৎসুক হয়ে বলে না, কী সংবাদ! তাদের সংবাদ তাদের বাইরে, বৃষ্টি হল কি না, খাদ্য সুলভ কি না, শত্রু নিকট আছে কি নেই।

মানুষ সংবাদ বহন করে আনে নিজের অন্তরে। সৃষ্টির সংবাদ বা প্রলয়ের সংবাদ, যুগান্তের বা যুগান্তরের সংবাদ। মানুষ যখন দেখা দেয়, তখন তার কাছে প্রত্যাশার অন্ত থাকে না। অতিথিকে শাঁক বাজিয়ে তখন অভ্যর্থনা করি, অন্ন এগিয়ে দিই, মা তাকে বলে, তুমি আমার ধন। আমরা বলি, ঐ কথাটা সার্থক হোক, এই যেন সত্য হয় যে, অপূর্ণকে তুমি পূর্ণতর করেছ, জীর্ণকে করেছ নূতন, মগ্নকে উদ্ধার করেছ, মলিনকে করেছ উজ্জ্বল।

সংসারে যখন শান্তি নেই, দৈন্য মরুবালুকায় অন্নের খেত লুপ্ত করেছে, অজ্ঞানের স্তূপাকার

নিরর্থকতায় আলোকের পথ অবরুদ্ধ, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি, হে নবজাত, হে নবজীবনের দূত, কোথায় তুমি? মাতার বেদনার ভিতর দিয়ে তুমি কি এসেছ, হে আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষ, 'তমসঃ পরস্তাৎ'?

যারা তখন মন্ত্র তন্ত্র জপ তপ আচার অনুষ্ঠানের কথা ভাবে, যারা মনে করে, মন্ত্রযোগে এবং হিসাবীলোকের ষড়যন্ত্রদ্বারা অকল্যাণের প্রতিরোধ করবে, তারা মানুষকে চেনে নি। পশুর জগতে দুঃখ দুর্ভিক্ষ বাইরের দুর্যোগে, মানুষের সংসারে অকল্যাণ অন্তরের দুর্গতিতে। মানুষকে নূতন করে জন্মাতে হবে তবেই হবে তার শোধন। মানুষ দ্বিজ, ব্যর্থজন্মের বিকার থেকে পরিত্রাণের জন্যে নূতন জন্মের সংস্কার তার চাই।

যাঁরা মহান পুরুষ তাঁরা আপন জন্মে সমস্ত মানুষের জন্যে নবজন্ম এনেছেন। তাঁরা মানুষকে দান করেছেন অমর জীবনের অর্ঘ্য।

কাকে বলে অমর জীবন? মানুষের একটা জন্ম হল দৈহিক জীবনে। কালের দ্বারা সে-জীবন পরিমিত, দিন গণনা করে তার দৈর্ঘ্য। তার দ্বিতীয় জন্ম অমিতায়ু। এই জন্মের জীবনকে পরিপূর্ণতার আদর্শে বিচার করতে হয়,—জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেশকালের সীমা সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই জীবনকে কোনো মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে ধারণ করে রাখতে পারে না, এইখানে সকল মানুষের চিরজীবনে সে জীবিত।

দূত জন্মলাভ করেন সেই অমৃত আপন পানপাত্রে বহন করে। বিশ্বাসী ভক্ত অপেক্ষা করে থাকেন নবজন্মের অরুণোদয়ের জন্যে, কেননা তিনি এই দৈববাণী শুনেছেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। সনাতন মানব নূতন জীবনে জন্মলাভ করেন বারে বারে।

'মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়' এই মন্ত্রকে মানবের মাঝে দাঁড়িয়ে যে মন্ত্রদ্রষ্টা উচ্চারণ করলেন অবিশ্বাসী তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, অন্ধ তাঁকে মেরেছে। কিন্তু মৃত্যুর দ্বারাই তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। দুঃখের দ্বারা তিনি সত্যকে প্রমাণ করেছেন।

সেই মৃত্যুঞ্জয় যাঁরা, কোনদিকে তাঁরা মানুষকে পথ দেখালেন? পুরাতন পদ্ধতির দিকে নয়, নূতন ব্যবস্থার দিকে নয়, নবজন্মের দিকে।

আদিকাল থেকে মানবসংসারে যাত্রীরা চলেছে সার্থকতার তীর্থ খুঁজে নানাদেশে নানাকালে। সে-তীর্থ কুবেরের ভাণ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়, সে-তীর্থ সেইখানে পুরাতন মানব যেখানে নূতন হয়ে জন্মলাভ করেছেন, যিনি ঘোর দুর্দিনে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানিয়েছেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। ক্লান্ত আসছে পীড়িত আসছে ক্ষুধাতুর আসছে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নগ্ন শিশুর কাছে; প্রশ্ন করলে, 'তুমি এসেছ?' মাতা বললেন— 'তুমি আমার ধন'—সকলে বললে 'জয় হোক নব জাতকের'।

এই কথাটি আছে কালিদাসের কুমারসম্ভবে। দেবতা পরাভূত, স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট। সুরেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, সুরলোককে কে উদ্ধার করবে? উত্তর এল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, দেবসমিতি নয়, কোনো কর্ম-পদ্ধতি নয়, অমরাবতী অপেক্ষা করে আছে নবজাত কুমারের প্রত্যাশায়; দৈত্যপীড়িত দেবসমাজের তীর্থ মাতার অংকলীন সেই শিশুর কাছে। শিশু জন্ম নিল, সপ্তর্ষির জ্যোতিরুজ্জ্বল আশীর্বাণী ধ্বনিত হল লোকে লোকান্তরে—'জয় হোক নবজাতকের!'

আশ্বিন ১৩৩৮

•

আমার সব চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোনটা?—যে ইচ্ছা আমার স্বার্থসাধন নয় সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহস্য, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরবে, আমার নাম হবে, তা বলা শক্ত নয়—কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হব, তা পৃথিবীতে কজন লোক আবিষ্কার করতে পেরেছে? আমি কী, আমার মধ্যে যে একটা প্রকাশচেষ্টা চলছে তার পরিণাম কী, তার গতি কোন্ দিকে, তা স্পষ্ট করে কে জানে?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই বলতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কী, তা জানবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নইলে উপস্থিতমতো হঠাৎ একটা কিছু চাইতে গিয়ে হয়ত ভয়ানক ফাঁকিতে পড়তে হবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় নিয়েছি— আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করব, তাই অহরহ পরখ করছি। আজ বলছি খেলা, কাল বলছি ধন, পরদিন বলছি মান— এমনি করে সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করছি, আলোড়ন করছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কী চাই, তারই সন্ধান পাবার জন্য। মনে করছি— টাকা খুঁজছি, বন্ধু খুঁজছি, মান খুঁজছি; কিন্তু আসলে আর কিছু নয়, কাকে যে খুঁজছি, তাই নানাস্থানে খুঁজে বেড়াচ্ছি— আমার প্রার্থনা কী, তাই জানি নে।

যাঁরা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজে পেয়েছেন বলেন,— শোনা গেছে তাঁরা কী বলেন। তাঁরা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে— অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও।

কিন্তু কানে শুনে কোনো ফল নেই এবং মুখে উচ্চারণ করে যাওয়া আরও বৃথা। আমরা যখন সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে যথার্থ চাইব, সমস্ত জীবনে তার পরিচয় দেব, তখনি এ প্রার্থনা সার্থক হবে। যে প্রার্থনা আমি নিজের মনের মধ্যে পাই নি তা পূর্ণ হবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নেই। অতএব, সবই শুনলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হল— কিন্তু তবু এখনো প্রার্থনা করবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়ে খুঁজে পেতে হবে।

বনস্পতি হয়ে ওঠবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে, নিগূঢ়ভাবে নিহিত হয়ে আছে— কিন্তু যতক্ষণ তা অংকুরিত হয়ে আকাশে, আলোকে মাথা না তুলেছে, ততক্ষণ তা না থাকারই তুল্য। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাকে জানিই নে, যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করে মুক্ত আকাশে পাতা মেলতে পারে।

আষাঢ় ১৩১১

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী, তা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে জানতে হয়। জগতের মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটি জানবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করে আসছি, আমরা বুঝি পেট ভরাতেই চাই, আরাম করতেই চাই— কিন্তু যখন দেখি, কেউ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করে সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করছেন, তখন হঠাৎ একরকম করে বুঝতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করছে, তাকেই তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানতে পারি— কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা!

তখন আরও একটা কথা বোঝা যায়। বুঝতে পারি যে, যে সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার সুগোচর, যারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতা-লাভের প্রার্থনাকে বাধা দিচ্ছে, স্ফূর্তি দিচ্ছে না, তাকে কেবলই আমার চেতনার অন্তরালবর্তী আমার চেষ্টার বহির্গত করে রেখেছে।

আর, যাঁর কথা বলছি, তাঁর পক্ষে ঠিক এর বিপরীত। যে মঙ্গলইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যা মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করছে— অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়— এই ইচ্ছাই তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাঁর পশ্চাদ্‌বর্তী পদতলগত। তিনি জানেন— সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের এ না হলেই নয়— অন্নবস্ত্রধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলেই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছা তাঁর ভিতর দিয়ে জগতে

প্রত্যক্ষ হয় বলে, প্রমাণিত হয় বলেই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হয়ে ওঠেন। আর আমরা খাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়ে ছাই হয়ে যাই—মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারি নে, মানবসমাজে সে জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনলে একটা ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য, প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তা কোনোমতেই নয়। তা যদি হত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করতে পারত না। যা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য তাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা অমৃতকে বরণ করে লওয়া, এ কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। এ আর-কিছু নয়—যা কাছেই আছে, তাকেই পাওয়া।

মনে রাখতে হবে, আমাদিগকে যা-কিছু দেবার, তা আমাদের প্রার্থনার বহুপূর্বেই দেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিত ধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল নেবার চেষ্টা—তা-ই যথার্থ প্রার্থনা।

সঞ্চয়

প্রকাশ : ১৯১৬

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া
তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ের
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন
করিলাম

রোগীর নববর্ষ

আমার রোগশয্যার উপর নববৎসর আসিল। নববৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেক দিন দেখি নাই।

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড়ো জিনিসকে ঠিক বড়ো করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিসকে খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। মানুষের ইতিহাসে যত বড়ো মহৎ ঘটনাই ঘটুক-না, নিজের পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিতমত যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বাঁচাই শক্ত হয়। যে মজুর কোদাল হাতে মাটি খুঁড়িতেছে সে লোক মনেও ভাবে না যে সেই মুহূর্তেই রাজা-মহারাজার মন্ত্রণাসভায় রাজ্যসাম্রাজ্যের ব্যবস্থা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যত বড়োই হোক, তবু মানুষের কাছে এক মুহূর্তের বর্তমান তাহার চেয়ে ছোটো নয়। এইজন্য এই-সমস্ত ছোটো ছোটো নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারী এমন যুগ-যুগান্তরের ভার নহে— এইজন্য তাহার চোখের সামনে এই নিমেষের পর্দাটাই সকলের চেয়ে মোটা— যুগ-যুগান্তরের প্রসারের মধ্যে এই পর্দার স্থূলতা ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞানে পড়া যায় পৃথিবীর গায়ের কাছের বাতাসের আচ্ছাদনটা যত ঘন, এমন তাহার দূরের আচ্ছাদন নহে— পৃথিবীর নীচের টানে ও উপরের চাপে তাহার আবরণ এমন নিবিড় হইয়া উঠে। আমাদেরও তাই। যত আমাদের কাছের দিকে, ততই আমাদের নিজের টানে ও পরের চাপে আমাদের মনের উপরকার পর্দা অত্যন্ত বেশি নিরেট হইয়া দাঁড়ায়।

শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হালকা হইলে তবেই পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

দেখিতেছি রুগ্‌ণ শরীরের দুর্বলতায় এই টানের গ্রন্থিটাকে খানিকটা আলগা করিয়া দিয়াছে। নিজের চারি দিকে যেন অনেকখানি ফাঁকা ঠেকিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতে কাজ আছে আমি না হইলে তাহা সম্পন্নই হইবে না এই চিন্তায় নিজেকে একটুও অবসর দেওয়া ঘটে না, অবসরটাকে যেন অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্তব্যের যে অন্ত নাই, জগৎসংসারের দাবির যে বিরাম নাই; এইজন্য যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সমস্ত মন কাজের দিকে ছটফট করিতে থাকে। এই টানাটানি যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই নিজের অন্তরের ও বাহিরের মাঝখানে সেই স্বচ্ছ অবকাশটি ঘুচিয়া যায়— যাহা না থাকিলে সকল জিনিসকে যথাপরিমাণে সত্য আকারে দেখা যায় না। বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশের উপরে আছে বলিয়াই, অর্থাৎ তাহা খানিকটা করিয়া আছে ও অনেকটা করিয়া নাই বলিয়াই তাহার ছোটো বড়ো নানা আকৃতি আয়তন লইয়া তাহাকে এমন বিচিত্র করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু জগৎ যদি আকাশে না থাকিয়া একেবারে আমাদের চোখের উপরে চাপিয়া থাকিত— তাহা হইলে ছোটোও যা বড়োও তা, বাঁকাও যেমন সোজাও তেমন।

তেমনি যখন শরীর সবল ছিল তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা; কেবল অন্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেসাঠেসির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার সুযোগ যেন একেবারে হারাইয়াছিলাম। কর্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিসই হোক, সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড়ো হইয়া উঠিয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। সেটা একটা বিপরীত ব্যাপার। মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো।

এমন সময় শরীর যখন বাঁকিয়া বসিল, বলিল, আমি কোনোমতেই কাজ করিব না তখন দায়িত্বের বাঁধন কাটিয়া গেল। তখন টানাটানিতে ঢিল পড়িতেই কাজের নিবিড়তা আলগা হইয়া

আসিল—মনের চারি দিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া বহিতে লাগিল। তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ এ কথাটা যত সত্য, তাহার চেয়ে ঢের বড়ো সত্য আমি মানুষ। সেই বড়ো সত্যটির কাছেই জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়—বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে—সমস্ত রূপরসগন্ধ আমার কাছে স্বীকার করে যে 'তোমারই মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।'

আমার কর্মক্ষেত্রকে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া নিন্দা করিতে চাই না কিন্তু আমার রোগশয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ আমি আপিসের চৌকিতে আসীন নই, আমি বিরাটের ক্রোড়ে শয়ান। সেইখানে সেই অপরিসীম অবকাশের মাঝখানে আজ আমার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল—মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কী সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আস্বাদন পাইলাম। আজ নববর্ষ অতলস্পর্শ মৃত্যুর সুনীল শীতল সুবিপুল অবকাশপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝখানে জীবনের পদ্মটিকে যেন বিকশিত করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

তাই তো আজ বসন্তশেষের সমস্ত ফুলগন্ধ একেবারে আমার মনের উপরে আসিয়া এমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই তো আমার খোলা জানালা পার হইয়া বিশ্বআকাশের অতিথিরা এমন অসংকোচে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আলো যে ঐ অন্তরীক্ষে কী সুন্দর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর পৃথিবী ঐ তার পায়ের নীচে আঁচল বিছাইয়া কী নিবিড় হর্ষে পুলকিত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা যেন এত কাল দেখি নাই। এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি, সেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারই উপরে দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিক্কণ, তাহার নানা রঙের আঁচল-খানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।

আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত উচ্চ-কলরবে উতলা হইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু সেও তো ঐ বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ঐ যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের পর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল—ভিতর বাড়িতে একি দেখা যায়! সেখানে আলোয় তো চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্যসামন্তে ঘর জুড়িয়া তো দাঁড়াইয়া নাই! সেখানে মণি নাই মানিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে তো মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধুলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজ-আস্তরণ তো কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবক-যুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছে কিন্তু রাজোদ্যানের মালী আসিয়া তো কিছুমাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্মশালার বহু কালিমাচিহ্নিত অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পট্টবসন পরিতেছে, কোথাও তো কোনো নিষেধ দেখি না। ইহাই আশ্চর্য যে এত ঐশ্বর্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন! ইহাই আশ্চর্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোকলোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্য নয়, অসংগত নয়—সেজন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছে না। সবাই বলিতেছে তোমার ঐটুকু খেলা, ঐটুকু হাসিকান্নার জন্যই এত আয়োজন—ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারই—যতদূর পর্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই দুই চক্ষুর ধন—যতদূর পর্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে তোমারই মনের সম্পত্তি। তাই এত বড়ো জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অন্তবিহীন ভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরও ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য। সেইখানেই ধরা

পড়ে, কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই তো প্রেম। কৌটার বোঝা বহিতে পারি না কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড়ো নিভৃতে ঐ একটি প্রেম আছে—চারি দিকে সূর্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার স্তব্ধতার মধ্যে ঐ প্রেম; চারি দিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারই মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ঐ প্রেম। ঐ প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে সে বড়ো, ঐ প্রেমের টানে বড়োও যে সে ছোটো। ঐ প্রেমই তো ছোটোর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়োর সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ঐ প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড! সেখানে নির্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখ গুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি! হাঁ সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত! সেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করিল। সেই তো এত বড়ো জগতের মাঝখানেও এত ছোটোকে বড়ো করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটোকে গৌরব দান করিতে পারে।

এইজন্যই তো ছোটোকে তাহার এতই দরকার। নইলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কী করিয়া? ছোটোর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্ত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সেইজন্যই এমন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাখচিত আকাশের নীচে, এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্র-বেলায় ছোটোর কাছে বড়ো আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোটো হইয়াও ছোটো নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক তিলপরিমাণ দেশকে ও পলপরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব;—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখেদুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ সেই সংসার তো আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিন-মজুরি লইতে হইবে? সেইখানেই কি চরম দেনাপাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিল ভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই, কেবল আনন্দ আছে; কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়—সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসিমুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলই আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই—অমৃতহস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন—হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল্—আজ নববর্ষের পাখি সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অযাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্য প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিল না বলিয়া সেই কথাটি আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম—আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণপত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

১৩১৯

রূপ ও অরূপ

জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না, আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি। স্ফটিক জিনিসটা যে কঠিন জিনিস তাহা দুর্যোধন একদিন ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন অথচ আলোকের কাছে যেন সে জিনিসটা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এদিকে যে মহাপ্রবল আকর্ষণ সূর্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে সূর্যে প্রসারিত, যাহা লক্ষ কোটি হাতির বলকে পরাস্ত করে আমরা তাহার ভিতর দিয়া চলিতেছি কিন্তু মাকড়সার জালটুকুর মতোও তাহা আমাদের গায়ে ঠেকিতেছে না। আমাদের সম্বন্ধে যেটা আছে এবং যেটা নাই অস্তিত্বরাজ্যে যমজ ভাইয়ের মতো তাহারা হয়তো উভয়েই পরমাত্মীয়; তাহাদের মাঝখানে হয়তো একেবারেই ভেদ নাই। বস্তুমাত্রই একদিক থেকে দেখিতে গেলে বাষ্প— সেই বাষ্প ঘন হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে দৃঢ় আকারে বন্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখি, কিন্তু উত্তাপের তাড়ায় তাহা আলগা হইয়া গেলেই মরীচিকার মতো তাহা ক্রমশই দৃষ্টির অগোচর হইবার উপক্রম করিতে থাকে। বস্তুত হিমালয় পর্বতের উপরকার মেঘের সহিত হিমালয়ের প্রভেদকে আমরা গুরুতর বলি বটে কিন্তু সেই গুরুতরত্ব ভাবিয়া দেখিলেই লঘু হইয়া পড়ে। মেঘ যেমন অদৃশ্য বাষ্পের চেয়ে নিবিড়তর, হিমালয়ও সেইরূপ মেঘের চেয়ে নিবিড়তর।

তার পর কালের ভিতর দিয়া দেখো সমস্ত জিনিসই প্রবহমান। তাই আমাদের দেশে বিশ্বকে জগৎ বলে— সংসার বলে; তাহা মুহূর্তকাল স্থির নাই, তাহা কেবলই চলিতেছে, সরিতেছে।

যাহা কেবলই চলে, সরে, তাহার রূপ দেখি কী করিয়া? রূপের মধ্যে তো একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে, তাহাকে, যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাটিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমেষেই তাহার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখায় না; যেন অনন্তকাল সে এইরকম অঙ্কুর হইয়াই খুশি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোনো মতলবই নাই। আমরা তাহাকে পরিবর্তনের ভাবে দেখি না, স্থিতির ভাবেই দেখি।

এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ধ্রুব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি— ধরণী আমাদের কাছে ধৈর্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ধ্রুবরূপ আর দেখি না তখন ইহার বহুরূপী মূর্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি কিন্তু বৃহৎকালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাথুরে কয়লার খনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কী হইয়া যায় তাহার আর উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত।

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত তাহার সে রূপ নাই কেননা সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি সে নাম তাহার চির-কালের সত্য নাম নহে। এইজন্যই আমরা যাহা-কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে। নাম ও রূপ যে শাশ্বত নহে এ কথা আমাদের দেশের চাষারাও বলিয়া থাকে।

কিন্তু গতিকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা তো আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব, গতিই সত্য, স্থিতি সত্য নহে, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ধ্রুব বলিয়া থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতিসূত্রে আমরা যাহা-কিছু জানিতেছি নহিলে সে জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি, নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই-সমস্ত নিমেষ মুহূর্তগুলিকে আমরা এক দিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর-এক দিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতাসূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এইজন্যই কাল বিশ্ব-চরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চক্‌মকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গপরম্পরার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্তকে অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি, বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা এক দিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর-এক দিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। এক দিকে তাহা হইয়াছে আর-এক দিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এইজন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এইজন্য কোনো বিশেষরূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।

তাই যাঁহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বার বার এ কথা চিন্তা করিতে হয়, চারি দিকে যাহা-কিছু দেখিতেছি জানিতেছি ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না। যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত। ইহারা অন্তহীন গতি দ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দেশ করিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ।

অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে-কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই-সমস্ত নাম রূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত, তবে ইহারা ছাড়া আর-কিছুর জন্য কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্তকালের জন্য স্থান পাইত না—তবে ইহাদিগকেই সত্য জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতাম—তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই-সমস্ত অচল প্রত্যক্ষ সত্যের ভীষণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া একেবারে মূক হইয়া মূর্ছিত হইয়া থাকিত। ইহার পিছনে কিছুই দেখিতে পাইত না। কিন্তু সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের

কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না।

এই তো আধ্যাত্মিক সাধনা। শিল্প-সাহিত্যের সাধনাটা কী? এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।

সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দ আপনাকেই বাহিরে দেখিতে পায় সেইজন্যই সৌন্দর্যের গৌরব। মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়— শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের সেইজন্যই এত অনুরাগ। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত, আপনাকে না দেখিত, তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।

এইজন্যই শিল্প-সাহিত্যে ভাবব্যঞ্জনার (suggestiveness) এত আদর। এই ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহত হয় না। রাজোদ্যানের সিংহদ্বারটা কেমন? তাহা যতই অভ্রভেদী হোক, তাহার কারুনৈপুণ্য যতই থাক্, তবু সে বলে না আমাতে আসিয়াই সমস্ত পথ শেষ হইল। আসল গন্তব্য স্থানটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই আছে এই কথাই তাহার জানাইবার কথা। এইজন্য সেই তোরণ কঠিন পাথর দিয়া যত দৃঢ় করিয়াই তৈরি হউক-না কেন, সে আপনার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া দেয়। বস্তুত সেই ফাঁকটাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যতটা আছে তাহার চেয়ে নাই অনেক বেশি। তাহার সেই 'নাই' অংশটাকে যদি সে একেবারে ভরাট করিয়া দেয় তবে সিংহোদ্যানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মতো নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া উঠে এবং যাহারা মূঢ় তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার জিনিস, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই; এবং যাহারা সন্ধান জানে তাহারা ইহাকে অতি স্থূল একটা মূর্তিমান বাহুল্য জানিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপমাত্রই এইরূপ সিংহদ্বার। সে আপনার ফাঁকটা লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই নির্দেশ করিলে বঞ্চন করে, পথ নির্দেশ করিলেই সত্য কথা বলে। সে ভূমাকে দেখাইবে, আনন্দকে প্রকাশ করিবে, কী শিল্প-সাহিত্যে কী জগৎ-সৃষ্টিতে এই তাহার একমাত্র কাজ। কিন্তু সে প্রায় মাঝে মাঝে দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত দাসের মতো আপনার প্রভুর সিংহাসনে চড়িয়া বসিবার আয়োজন করে। তখন তাহার সেই স্পর্ধায় আমরা যদি যোগ দিই তবে বিপদ ঘটে— তখন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলাই তাহার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য— তা সে যতই প্রিয় হোক, এমন-কি, সে যদি আমার নিজেরই অহংরূপটা হয় তবুও। বস্তুত রূপ যাহা তাহাকে তাহার চেয়ে বড়ো করিয়া জানিলেই সেই বড়োকে হারানো হয়।

মানুষের সাহিত্য শিল্পকলায় হৃদয়ের ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বন্ধ হয় না। এইজন্য সে কেবলই নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই প্রতিভাকে বলে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'। প্রতিভা রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করে কিন্তু বন্দী করে না— এইজন্য নব নব উন্মেষের শক্তি তাহার থাকা চাই।

মনে করা যাক পূর্ণিমা রাত্রির শুভ্র সৌন্দর্য দেখিয়া কোনো কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, সুরলোকে নীলকান্তমণিময় প্রাঙ্গণে সুরাঙ্গনারা নন্দনের নবমল্লিকায় ফুলশয্যা রচনা করিতেছেন। এই বর্ণনা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা জানি পূর্ণিমা রাত্রিসম্বন্ধে এই কথাটা একেবারে শেষ কথা নহে— অসংখ্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথার মধ্যে এ একটা কথা— এই উপমাটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অন্য অগণ্য উপমার পথ বন্ধ করা হয় না, বরঞ্চ পথকে প্রশস্তই করা হয়।

কিন্তু যদি আলংকারিক বলপূর্বক নিয়ম করিয়া দেন যে, পূর্ণিমা রাত্রিসম্বন্ধে সমস্ত মানবসাহিত্যে এই একটিমাত্র উপমা ছাড়া আর কোনো উপমাই হইতে পারে না— যদি কেহ বলে, কোনো দেবতা রাত্রে স্বপ্ন দিয়াছেন যে এই রূপই পূর্ণিমার সত্য রূপ— এই রূপকেই কেবল

ধ্যান করিতে হইবে, প্রকাশ করিতে হইবে, কাব্যে পুরাণে এই রূপেরই আলোচনা করিতে হইবে, তবে পূর্ণিমা সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এরূপ চরম উপমার দৌরাত্ম্য একেবারে অসহ্য—কারণ ইহা মিথ্যা। যতক্ষণ ইহা চরম ছিল না ততক্ষণই ইহা সত্য ছিল। বস্তুত এই কথাটাই সত্য যে পূর্ণিমা সম্বন্ধে নিত্য নব নব রূপে মানুষের আনন্দ আপনাকেই প্রকাশ করে। কোনো বিশেষ একটিমাত্র রূপই যদি সত্য হয় তবে সেই আনন্দই মিথ্যা হইয়া যায়। জগৎ-সৃষ্টিতেও যেমন সৃষ্টিকর্তার আনন্দ কোনো একটিমাত্র রূপে আপনাকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলে নাই—অনাদিকাল হইতে তাহার নব নব বিকাশ চলিয়া আসিতেছে, তেমনি সাহিত্যশিল্প সৃষ্টিতেও মানুষের আনন্দ কোনো একটিমাত্র উপমায় বর্ণনায় আপনাকে চিরকালের মতো বন্দী করিয়া থামিয়া যায় নাই, সে কেবলই নব নব প্রকাশের মধ্যে লীলা করিতেছে। কারণ, রূপ জিনিসটা কোনো কালে বলিতে পারিবে না যে, আমি এইখানেই থামিয়া দাঁড়াইলাম, আমিই শেষ—সে যদি চলিতে না পারে তবে তাহাকে বিকৃত হইয়া মরিতে হইবে। বাতি যেমন ছাই হইতে হইতে শিখাকে প্রকাশ করে, রূপ তেমনি কেবলই আপনাকে লোপ করিতে করিতে একটি শক্তিকে আনন্দকে প্রকাশ করিতে থাকে। বাতি যদি নিজে অক্ষয় হইতে চায় তবে শিখাকেই গোপন করে—রূপ যদি আপনাকেই ধ্রুব করিতে চায় তবে সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। এইজন্য রূপের অনিত্যতাই রূপের সার্থকতা, তাহাই তাহার গৌরব। রূপ নিত্য হইবার চেষ্টা করিলেই ভয়ংকর উৎপাত হইয়া ওঠে। সুরের অমৃত অসুর পান করিলে স্বর্গলোকের বিপদ, তখন বিধাতার হাতে তাহার অপঘাত মৃত্যু ঘটে। পৃথিবীতে ধর্মে কর্মে সমাজে সাহিত্যে শিল্পে সকল বিষয়েই আমরা ইহার প্রমাণ পাই। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার মূলেই রূপের এই অসাধু চেষ্টা আছে। রূপ যখনই একান্ত হইয়া উঠিতে চায় তখনি তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার অত্যাচার হইতে মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমাপূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্তিকে উপাসক কখনোই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি—দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনি কল্পনা বলিয়া জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না; তখনি কল্পনা আপনার সত্য কাজ করে। সে কাজটি কী না, সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করা। কল্পনা যখন থামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটি রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ করে তখন সে আপনার সেই রূপকেই দেখায়, রূপের অতীতকে অনন্ত সত্যকে আর দেখায় না। সেইজন্য বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চিরপরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্তিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারাপ্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কখনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনি আমরা বিশেষ দেবমূর্তিকে পূজা করি তখনি সেই রূপের প্রতি আমরা চরমসত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই। রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা ধরিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনোই সত্যের পূজা হইতে পারে না।

তবে কেন কোনো কোনো বিদেশী ভাবুকের মুখে আমরা প্রতিমা-পূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনিতে পাই? তাহার কারণ তাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোনো মূর্তিকে দেখিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন না।

একজন খৃস্টানও তাঁহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন; কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র—গ্রীসের এথেনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো-একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা 'সিংহ মায়ের বাহন'। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্‌ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।

যাহা স্বভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো-এক জায়গায় রুদ্ধ করিবামাত্র তাহা যে মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আচার জিনিসটা অনেক স্থলেই সেই বন্ধন-আকার ধারণ করে। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও অভ্যাসের আসক্তিবশত আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাই না। যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য চলা এবং চালানো, এক সময় তাহাকেই আমরা খোঁটার মতো ব্যবহার করি, অথচ মনে করি যেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে।

একটা উদাহরণ দিই। জগতে বৈষম্য আছে। বস্তুত বৈষম্য সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। কিন্তু সেই বৈষম্য ধ্রুব নহে। পৃথিবীতে ধনমান বিদ্যাক্ষমতা একজায়গায় স্থির নাই, তাহা আবর্তিত হইতেছে। আজ যে ছোটো কাল সে বড়ো, আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র। বৈষম্যের এই চলাচল আছে বলিয়াই মানবসমাজে স্বাস্থ্য আছে। কেননা বৈষম্য না থাকিলে গতিই থাকে না—উঁচু নিচু না থাকিলে নদী চলে না, বাতাসে তাপের পার্থক্য না থাকিলে বাতাস বহে না। যাহা চলে না এবং যাহা সচল পদার্থের সঙ্গে যোগ রাখে না তাহা দূষিত হইতে থাকে। অতএব, মানবসমাজে উচ্চ নীচ আছেই, থাকিবেই এবং থাকিলেই ভালো, এ কথা মানিতেই হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্যের চলাচলকে যদি বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া ফেলি, যদি একশ্রেণীর লোককে পুরুষানুক্রমে মাথায় করিয়া রাখিব এবং আর-এক শ্রেণীকে পায়ের তলায় ফেলিব এই বাঁধা নিয়ম একেবারে পাকা করিয়া দিই তবে বৈষম্যের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যই একেবারে মাটি করিয়া ফেলি। যে বৈষম্য চাকার মতো আবর্তিত হয় না সে বৈষম্য নিদারুণ ভারে মানুষকে চাপিয়া রাখে, তাহা মানুষকে অগ্রসর করে না। জগতে বৈষম্য ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তাহা চলে, ততক্ষণ তাহা মুক্ত—জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চলা ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। দুঃখী চিরদিন দুঃখী নয়, সুখী চিরদিন সুখী নয় এইখানেই সুখীতে দুঃখীতে সাম্য আছে। সুখ দুঃখের এই চলাচল আছে বলিয়াই সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে মানুষের মঙ্গল ঘটে।

তাই বলিতেছি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু। এই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের প্রকাশকে যখনি আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করিতে চাই তখনি তাহা সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে। রূপ-মাত্রের মধ্যেই যে একটি মায়া আছে, অর্থাৎ যে চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে, যে অনিত্যতাই সেই রূপকে সত্য ও সৌন্দর্য দান করে, যে অনিত্যতাই তাহার প্রাণ, সেই কল্যাণময়ী অনিত্যতাকে কী সংসারে, কী ধর্মসমাজে, কী শিল্পসাহিত্যে, প্রথার পিঞ্জরে অচল করিয়া বাঁধিতে গেলে আমরা কেবল বন্ধনকেই লাভ করি, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলি। এই গতিকে যদি হারাই তবে

শিকলে বাঁধা পাখি যেমন আকাশকে হারায় তেমনি আমরা অনন্তের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হই সুতরাং সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং চারি দিক হইতে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রমাদ আমাদিগকে মায়াবী নিশাচরের মতো আক্রমণ করিতে থাকে। স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

১৩১৮

নামকরণ*

এই আনন্দরূপিণী কন্যাটি একদিন কোথা হইতে তাহার মায়ের কোলে আসিয়া চক্ষু মেলিল। তখন তাহার গায়ে কাপড় ছিল না, দেহে বল ছিল না, মুখে কথা ছিল না, কিন্তু সে পৃথিবীতে পা দিয়াই এক মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার প্রবল দাবি জানাইয়া দিল। সে বলিল আমার এই জল, আমার এই মাটি, আমার এই চন্দ্র সূর্য গ্রহতারকা। এত বড়ো জগৎ-চরাচরের মধ্যে এই অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটি নূতন আসিয়াছে বলিয়া কোনো দ্বিধা সংকোচ সে দেখাইল না। এখানে যেন তাহার চিরকালের অধিকার আছে, যেন চিরকালের পরিচয়।

বড়োলোকের কাছ হইতে ভালোরকমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে নূতন জায়গার রাজপ্রাসাদে আদর অভ্যর্থনা পাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই মেয়েটিও যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে আসিল উহার ছোটো মুঠির মধ্যে একখানি অদৃশ্য পরিচয়পত্র ছিল। সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তিনিই নিজের নামসইকরা একখানি চিঠি ইহার হাতে দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, এই লোকটি আমার নিতান্ত পরিচিত, তোমরা যদি ইহাকে যত্ন কর তবে আমি খুশি হইব।

তাহার পরে কাহার সাধ্য ইহার দ্বার রোধ করে। সমস্ত পৃথিবী তখনি বলিয়া উঠিল, এসো, এসো, আমি তোমাকে বুকে করিয়া রাখিব—দূর আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত ইহাকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল—বলিল, তুমি আমাদেরই একজন। বসন্তের ফুল বলিল, আমি তোমার জন্য ফলের আয়োজন করিতেছি; বর্ষার মেঘ বলিল, তোমার জন্য অভিষেকের জল নির্মল করিয়া রাখিলাম।

এমনি করিয়া জন্মের আরম্ভেই প্রকৃতির বিশ্বদরবারের দরজা খুলিয়া গেল। মা-বাপের যে স্নেহ সেও প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। শিশুর কান্না যেমনি আপনাকে ঘোষণা করিল অমনি সেই মুহূর্তেই জলস্থল আকাশ সেই মুহূর্তেই মা-বাপের প্রাণ সাড়া দিল, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না।

কিন্তু আরও একটি জন্ম ইহার বাকি আছে, এবার ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে জন্ম লইতে হইবে। নামকরণের দিনই সেই জন্মের দিন। একদিন রূপের দেহ ধরিয়া এই কন্যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে আসিয়াছিল, আজ নামের দেহ ধরিয়া এই কন্যা সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিল। জন্মমাত্রে পিতামাতা এই শিশুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এ যদি কেবলই ইহার পিতা-মাতারই হইত তবে ইহার আর নামের দরকার হইত না, তবে ইহাকে নিত্য নূতন নূতন নামে ডাকিলেও কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটি নাকি শুধু পিতামাতার নহে, এ নাকি সমস্ত মানবসমাজের, সমস্ত মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্মের বিপুল ভাণ্ডার নাকি ইহার জন্য প্রস্তুত আছে, সেইজন্য মানবসমাজ ইহাকে একটি নামদেহ দিয়া আপনার করিয়া লইতে চায়।

মানুষের যে শ্রেষ্ঠরূপ যে মঙ্গলরূপ তাহা এই নামদেহটির দ্বারাই আপনাকে চিহ্নিত করে। এই নামকরণের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজের একটি আশা আছে, একটি আশীর্বাদ আছে—এই

---

*১৮৩৩ শক ৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যার নামকরণ উপলক্ষে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

নামটি যেন নষ্ট না হয়, ম্লান না হয়, এই নামটি যেন ধন্য হয়, এই নামটি যেন মাধুর্যে ও পবিত্রতায় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা লাভ করে। যখন ইহার রূপের দেহটি একদিন বিদায় লইবে তখনো ইহার নামের দেহটি মানবসমাজের মর্মস্থানটিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে।

আমরা সকলে মিলিয়া এই কন্যাটির নাম দিয়াছি, অমিতা। অমিতা বলিতে বুঝায় এই যে, যাহার সীমা নাই। এই নামটি তো ব্যর্থ নহে। আমরা যেখানে মানুষের সীমা দেখিতেছি সেই-খানেই তো তাহার সীমা নাই। এই যে কলভাষিণী কন্যাটি জানে না যে আজ আমরা ইহাকে লইয়াই আনন্দ করিতেছি, জানে না বাহিরে কী ঘটিতেছে, জানে না ইহার নিজের মধ্যে কী আছে— এই অপরিস্ফুটতার মধ্যেই তো ইহার সীমা নহে। এই কন্যাটি যখন একদিন রমণীরূপে বিকশিত হইয়া উঠিবে তখনি কি এ আপনার চরমকে লাভ করিবে? তখনো এই মেয়েটি নিজেকে যাহা বলিয়া জানিবে এ কি তাহার চেয়েও অনেক বড়ো নহে! মানুষের মধ্যে এই যে একটি অপরিমেয়তা আছে যাহা তাহার সীমাকে কেবলই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাই কি তাহার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? মানুষ যেদিন নিজের মধ্যে আপনার এই সত্য পরিচয়টি জানিতে পারে সেই দিনই সে ক্ষুদ্রতার জাল ছেদন করিবার শক্তি পায়, সেই দিনই সে উপস্থিত স্বার্থকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না, সেই দিনই সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়। যে মহাপুরুষেরা মানুষকে সত্য করিয়া চিনিয়াছেন তাঁহারা তো আমাদের মর্ত্য বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আমাদের ডাক দিয়া বলেন, তোমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

আমরা অমিতা নামে সেই অমৃতের পুত্রীকেই আমাদের সমাজে আহ্বান করিলাম। এই নামটি ইহাকে আপন মানবজন্মের মহত্ত্ব চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিক আমরা ইহাকে এই আশীর্বাদ করি।

আমাদের দেশে নামকরণের সঙ্গে আর-একটি কাজ আছে সেটি অন্নপ্রাশন। দুটির মধ্যে গভীর একটি যোগ রহিয়াছে। শিশু যেদিন একমাত্র মায়ের কোল অধিকার করিয়া ছিল সেদিন তাহার অন্ন ছিল মাতৃস্তন্য। সে অন্ন কাহাকেও প্রস্তুত করিতে হয় নাই—সে একেবারেই তাহার একলার জিনিস, তাহাতে আর কাহারও অংশ ছিল না। আজ সে নামদেহ ধরিয়া মানুষের সমাজে আসিল তাই আজ তাহার মুখে মানবসাধারণের অন্নকণাটি উঠিল। সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের পাতে পাতে যে অন্নের পরিবেশন চলিতেছে তাহারই প্রথম অংশ এই কন্যাটি আজ লাভ করিল। এই অন্ন সমস্ত সমাজে মিলিয়া প্রস্তুত করিয়াছে—কোন্‌ দেশে কোন্‌ চাষা রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া চাষ করিয়াছে, কোন্‌ বাহক ইহা বহন করিয়াছে, কোন্‌ মহাজন ইহাকে হাটে আনিয়াছে, কোন্‌ ক্রেতা ইহা ক্রয় করিয়াছে, কোন্‌ পাচক ইহা রন্ধন করিয়াছে, তবে এই কন্যার মুখে ইহা উঠিল। এই মেয়েটি আজ মানবসমাজে প্রথম আতিথ্য লইতে আসিয়াছে, এইজন্য সমাজ আপনার অন্ন ইহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতিথিসংকার করিল। এই অন্নটি ইহার মুখে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে মস্ত একটি কথা আছে। মানুষ ইহার দ্বারাই জানাইল আমার যাহা-কিছু আছে তাহাতে তোমার অংশ আমি স্বীকার করিলাম। আমার জ্ঞানীরা যাহা জানিয়াছেন তুমি তাহা জানিবে, আমার মহাপুরুষেরা যে তপস্যা করিয়াছেন তুমি তাহার ফল পাইবে, আমার বীরেরা যে জীবন দিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার কর্মীরা যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা অব্যাহত হইবে। এই শিশু কিছুই না জানিয়া আজ একটি মহৎ অধিকার লাভ করিল—অদ্যকার এই শুভদিনটি তাহার সমস্ত জীবনে চিরদিন সার্থক হইয়া উঠিতে থাক্‌।

অদ্য আমরা ইহাই অনুভব করিতেছি মানুষের জন্মক্ষেত্র কেবল একটিমাত্র নহে, তাহা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র নহে, তাহা মঙ্গলের ক্ষেত্র। তাহা কেবল জীবলোক নহে তাহা স্নেহলোক, তাহা আনন্দলোক। প্রকৃতির ক্ষেত্রটিকে চোখে দেখিতে পাই, তাহা জলেস্থলে ফলেফুলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ— অথচ তাহাই মানুষের সর্বাপেক্ষা সত্য আশ্রয় নহে। যে জ্ঞান, যে প্রেম, যে কল্যাণ অদৃশ্য

হইয়া আপনার বিপুল সৃষ্টিকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—সেই জ্ঞানপ্রেম-কল্যাণের চিন্ময় আনন্দময় জগৎই মানুষের যথার্থ জগৎ। এই জগতের মধ্যেই মানুষ যথার্থ জন্মলাভ করে বলিয়াই সে একটি আশ্চর্য সত্তাকে আপনার পিতা বলিয়া অনুভব করিয়াছে, যে সত্তা অনির্বচনীয়। এমন একটি সত্যকেই পরম সত্য বলিয়াছে যাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে। এইজন্যই এই শিশুর জন্মদিনে মানুষ জলস্থলঅগ্নিবায়ুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নাই, জলস্থলঅগ্নিবায়ুর অন্তরে শক্তিরূপে যিনি অদৃশ্য বিরাজমান, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়াছে। সেইজন্যই আজ এই শিশুর নামকরণের দিনে মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্যে সাজাইয়া পূজা করে নাই কিন্তু যিনি মানবসমাজের অন্তরে প্রীতিরূপে কল্যাণরূপে অধিষ্ঠিত তাঁহারই আশীর্বাদ সে প্রার্থনা করিতেছে। বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই উপলব্ধি, এই পূজা, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই দৃশ্য জগতের অন্তর্বর্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আশ্চর্য নহে, মানুষের ধনমান লইয়া কাড়াকাড়ি আশ্চর্য নহে, কিন্তু বড়ো আশ্চর্য—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের পর্বে পর্বে মানুষের সেই অদৃশ্যকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, সেই অনন্তকে আপন বলিয়া আহ্বান। অদ্য এই শিশুটিকে নাম দিবার বেলায় মানুষ সকল নামরূপের আধার ও সকল নামরূপের অতীতকে আপনার এই নিতান্ত ঘরের কাজে এমন করিয়া আমন্ত্রণ করিতে ভরসা পাইল ইহাতেই মানুষ সমস্ত জীবসমাজের মধ্যে কৃতকৃতার্থ হইল—ধন্য হইল এই কন্যাটি, এবং ধন্য হইলাম আমরা।

১৩১৮

ধর্মের নবযুগ

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সংকীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডেই আমার চির-কালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিসের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলই তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি-না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম, আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায়, হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এইসমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্মের উপরেই আমাদের নিজের সংকীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এইজন্যই আমাদের ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় এ কথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি—অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনই দেখি-না কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্য-জালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণু-পরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনই ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড়ো কুলীন বলিয়াই মনে করুন-না কেন গোত্র সকলেরই এক। এইজন্য বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্যায়ে যেমনই হোক না কেন, জীবপর্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটে না; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ; এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূর কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়া ছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্‌ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখাপ্রশাখায় উজান বহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গঙ্গোত্রীতে এক মূল প্রস্রবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়ে জীবে সর্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিস্তৃত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে; যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেইখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তৌল করিয়া দেখিবার উদ্‌যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, ধর্মের তুলনা—সমস্তই তুলনা। সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎ জুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে; আজ একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানিতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব

আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারও ধার ধারি না—তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে, সে খাঁচার পাখি, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখি। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ঐ খাঁচার লোহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মতো ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জায় গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসংগতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলা আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না; সেগুলা যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; আর কোনোপ্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজের শক্তিতে তো নহেই—সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনোপ্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মতো নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দিষ্ট খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং এই সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক, যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবল উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই, অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলই সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য নিত্যবহমান প্রকাশ-ব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলই আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলই 'শঙ্খের বদলে মুকুতা', স্থূলের বদলে সূক্ষ্মটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্য যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্য সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। এ কথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম! বাতাস আজ তাহাকে উতলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহা-

কালের যাত্রী, সবক'টা পাল তুলিয়া দে— ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ময় তর্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে, ওরে দ্বিধাকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক্। আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে— যিনি তাঁহার পুরাতন গুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা— যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে— যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই-সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না। 'তবে বাহিরের লোকের কী গতি হইবে' এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, বিদ্যায় মানুষের সর্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্মেই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক, মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক, আর সর্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে; এমন-কি, নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুত মূর্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা— যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষ রূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহা-পুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া প্রবেশের অন্য কোনো উপায় রাখা হয় নাই; মূর্তিপূজা সেই সময়েরই— যখন পাঁচ-সাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী— এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সংকীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয়— যাহারা অলংকারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের সেই অলংকার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে

চাপিয়া ধরে—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্ত-চলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনো-খানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর-একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়াছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশে সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্যের মতো অত্যুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে, সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সংকোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং—এষোস্য পরম আনন্দঃ—ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না, ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর-এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।০

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজা-অর্চনা ক্রিয়া-কর্মের মহাসমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতি-বিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে

নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকালপর্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দকুঞ্জচ্ছায়ায় বুলবুলের মতো প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াই তো আমাদের নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহ্যমূর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচারবিচার-অনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

সেইজন্যই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একই কালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা। হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা, এ কথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যত-কিছু পাপ যত-কিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে-সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড়ো মহত্ত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে; এইজন্যই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য; তাহাকে আমরা যত গোপনই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্‌ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের তপস্যাকেই ম্লান করিয়া দিতেছে। হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে। মানবের অন্তরাত্মার অন্তর্গূঢ় এই চিরসংকল্পটিকে তুমি বীর্যের দ্বারা প্রবল করো, পুণ্যের দ্বারা নির্মল করো, তাহার চারি দিক হইতে সমস্ত ভয়সংকোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না। অনেক দিন মানুষের ধর্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশ দিকে তোমার আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্ছিত; গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্যন্ত কাঁপে নাই—আজ ঝড় আসিয়া পড়িল; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক। ঘরের, সমাজের, দেশের যে-সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহংকার করিয়া আসিয়াছি সে-সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মতো শূন্যে বিসর্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্মের উপাধিধারী প্রাচীন অমঙ্গলের সঙ্গে আজ লড়াই করিতে হইবে, সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক! আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা আজ চেতনার দিন—সেজন্য আজ কাপুরুষের মতো নিরানন্দ হইলে চলিবে না; আজ ত্যাগের দিন আসিল, কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলই পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে, আজ কৃপণের

মতো রুদ্ধ সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীরু, আজ লোকভয়কেই ধর্মভয়ের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে— আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আজ অনেক খসিবে, ঝরিবে, ভাঙিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে,— নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দা সেদিকে হঠাৎ আলোক প্রকাশ হইবে; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্ত-বিধাতা, আজ তোমার প্রলয়লীলায় ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্যবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব— মানুষের চিত্তসাগরের অতলস্পর্শ রহস্য আজ উন্মথিত হইয়া জ্ঞানে কর্মে ত্যাগে ধর্মে কত কত অত্যাশ্চর্য অজেয় শক্তি প্রকাশমান হইয়া উঠিবে, তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বারবাতায়ন অসংকোচে উদ্ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্তশক্তি, আমাদের হিসাব তোমার হিসাব নহে— তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহ-মুগ্ধকে যখন তুমি উদ্‌বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না— এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের যাহা-কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা!

১৩১৮

ধর্মের অর্থ

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোটো থাকিয়াও তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানারকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে। কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রথমে ধরা যাক আমাদের এই শরীরটাকে। এটি একটি ছোটো পদার্থ। ইহার বাহিরে একটি প্রকাণ্ড বড়ো পদার্থ আছে, সেটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া এই শরীরটাকে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করি। যেন এ শরীর আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে এ শরীরের কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাই না। আপনাকে লইয়া এ শরীর করিবে কী? থাকিবে কোথায়? আপনার মধ্যে এই শরীরের প্রয়োজন নাই সমাপ্তি নাই।

বস্তুত আমাদের এই শরীরে যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, সে আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। বৃহৎ বিশ্বশরীরের সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার মিল হয় সেই পরিমাণে তাহার অর্থ পাওয়া যায়। গর্ভের ভ্রূণ যে নাক কান হাত পা লইয়া আছে গর্ভের বাহিরেই তাহার সার্থকতা। এইজন্য জন্মগ্রহণের পর হইতেই চোখের সঙ্গে আকাশব্যাপী আলোর, কানের সঙ্গে বাতাসব্যাপী শব্দের, হাত-পায়ের সঙ্গে চারি দিকের নানাবিধ বিষয়ের, সকলের চেয়ে যেটি ভালো যোগ সেইটি সাধন করিবার জন্য মানুষের কেবলই চেষ্টা চলিতেছে। এই বড়ো শরীরটির সঙ্গে পূর্ণভাবে

মিলিবে ইহাই ছোটো শরীরের একান্ত সাধনা—অথচ আপনার ভেদটুকু যদি না রাখে তাহা হইলে সে মিলনের কোনো অর্থই থাকে না। আমার চোখ আলো হইবে না, চোখরূপে থাকিয়া আলো পাইবে, দেহ পৃথিবী হইবে না, দেহরূপে থাকিয়া পৃথিবীকে উপলব্ধি করিবে, ইহাই তাহার সমস্যা।

বিরাট বিশ্বদেহের সঙ্গে আমাদের ছোটো শরীরটি সকল দিক দিয়া এই যে আপনার যোগ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে এ কি তাহার প্রয়োজনের চেষ্টা? পাছে অন্ধকারে কোথাও খোঁচা লাগে এইজন্যই কি চোখ দেখিতে চেষ্টা করে? পাছে বিপদের পদধ্বনি না জানিতে পারিয়া দুঃখ ঘটে এইজন্যই কি কান উৎসুক হইয়া থাকে?

অবশ্য প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস একটা আছে—প্রয়োজন তাহার অন্তর্ভূত। সেটা আর কিছু নহে, পূর্ণতার আনন্দ। চোখ আলোর মধ্যেই পূর্ণ হয়, কান শব্দের অনুভূতিতেই সার্থক হয়। যখন আমাদের শরীরে চোখ-কান ফোটেও নাই তখনো সেই পূর্ণতার নিগূঢ় ইচ্ছাই এই চোখ-কানকে বিকশিত করিবার জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছে। মায়ের কোলে শুইয়া শুইয়া যে শিশু কথা কহিবার চেষ্টায় কলস্বরে আকাশকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে, কথা কহিবার প্রয়োজন যে কী তাহা সে কিছুই জানে না। কিন্তু কথা কহার মধ্যে যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতা দূর হইতেই তাহাকে আনন্দ আহ্বান পাঠাইতেছে, সেই আনন্দে সে বার বার নানা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কিছুতেই ক্লান্ত হইতেছে না।

তেমনি করিয়াই আমাদের এই ছোটো শরীরটির দিকে বিরাট বিশ্বশরীরের একটি আনন্দের টান কাজ করিতেছে। ইহা পূর্ণতার আকর্ষণ, সেইজন্য যেখানে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই সেখানেও আমাদের শক্তি ছুটিয়া যাইতে চায়। গ্রহে চন্দ্রে তারায় কী আছে তাহা দেখিবার জন্য মানুষ রাত্রির পর রাত্রি জাগিতে শ্রান্ত হয় না। যেখানে তাহার প্রয়োজনক্ষেত্র সেখান হইতে অনেক দূরে মানুষ আপনার ইন্দ্রিয়বোধকে দূত পাঠাইতেছে। যাহাকে সহজে দেখা যায় না তাহাকে দেখিবার জন্য দূরবীন অণুবীক্ষণের শক্তি কেবলই সে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এমনি করিয়া মানুষ নিজের চক্ষুকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতেছে; যেখানে সহজে যাওয়া যায় না সেখানে যাইবার জন্য নব নব যানবাহনের কেবলই সে সৃষ্টি করিতেছে; এমনি করিয়া মানুষ আপনার হাত-পাকে বিশ্বে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জলস্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ অবারিত করিবার উদ্‌যোগ কত কাল হইতে চলিয়াছে। জলস্থল আকাশের পথ দিয়া সমস্ত জগৎ মানুষের চোখ কান হাত-পাকে কেবলই যে ডাক দিতেছে। বিরাটের এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণের পরমুহূর্ত হইতেই আজ পর্যন্ত কেবলই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর, প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়া পথ তৈরি করিতে লাগিয়াছে। বিরাটের সেই নিমন্ত্রণ প্রয়োজনের নিমন্ত্রণ নহে, তাহা মিলনের নিমন্ত্রণ, আনন্দের নিমন্ত্রণ; তাহা ক্ষুদ্র শরীরের সহিত বৃহৎ শরীরের পরিণয়ের নিমন্ত্রণ; এই পরিণয়ে প্রেমও আছে সংসারযাত্রাও আছে, আনন্দও আছে প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।

শুধু চোখ কান হাত পা লইয়া মানুষ নয়। তাহার একটা মানসিক কলেবর আছে। নানা-প্রকারের বৃত্তি প্রবৃত্তি সেই কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই-সব মনের বৃত্তি লইয়া আপনার মনটিকে যে নিতান্তই কেবল আপনার করিয়া সকল হইতে তফাত করিয়া রাখিব তাহার জো নাই। ঐ বৃত্তিগুলাই আপনার বাহিরে ছুটিবার জন্য মনকে লইয়া কেবলই টানাটানি করিতেছে। মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে যতদূর পারে পূর্ণরূপে মিলিতে চাহিতেছে। নহিলে তাহার স্নেহপ্রেম দয়ামায়া, এমন-কি, ক্রোধ দ্বেষ লোভ হিংসারও কোনো অর্থই থাকে না। সকল মানুষের মন বলিয়া একটি খুব বড়ো মনের সঙ্গে সে আপনার ভালোরকম মিল করিতে চায়। সেইজন্য কত কাল হইতে সে যে কত রকমের পরিবারতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। যেখানে বাধিয়া যায় সেখানে তাহাকে আবার ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, গড়িয়া তুলিতে

হয়, এইজন্যই, কত বিপ্লব কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হইয়াছে। বৃহৎ মনঃশরীরের সঙ্গে আপনার মনটিকে বেশ ভালোরকম করিয়া মিলাইয়া লইতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। যে পরিমাণে তাহার ভালোরকম করিয়া মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা। যে ব্যবস্থায় তাহার মিল অসম্পূর্ণ হয় ও কেবলই ভেদ ঘটিতে থাকে সেই ব্যবস্থায় তাহার দুর্গতি। এখানেও প্রয়োজনের প্রেরণা মূল প্রেরণা এবং সর্বোচ্চ প্রেরণা নহে। মানুষ পরিবারের বাহিরে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর বাহিরে দেশ, দেশের বাহিরে বিশ্বমানবসমাজের দিকে আপন চিত্তবিস্তারের যে চেষ্টা করিতেছে এ তাহার প্রয়োজনের আপিসযাত্রা নহে, এ তাহার অভিসারযাত্রা। ছোটো হৃদয়টির প্রতি বড়ো হৃদয়ের একটি ডাক আছে। সে ডাক এক মুহূর্ত থামিয়া নাই। সেই ডাক শুনিয়া আমাদের হৃদয় বাহির হইয়াছে সে খবরও আমরা সকল সময়ে জানিতে পারি না। রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসে, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠে, বার বার পথ হারাইয়া যায়, পা কাটিয়া গিয়া মাটির উপর রক্তচিহ্ন পড়িতে থাকে তবু সে চলে; পথের মাঝে মাঝে সে বসিয়া পড়ে বটে কিন্তু সেখানেই চিরকাল বসিয়া থাকিতে পারে না, আবার উঠিয়া আবার তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

এই যে মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলই বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায়? এই বিস্তারের অন্ত কল্পনা করিব কোন্‌খানে? শুনিয়াছি সেকেন্দর শা একদিন জয়োৎসাহে উন্মত্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন জিতিয়া লইবার জন্য দ্বিতীয় আর-একটা পৃথিবী তিনি পাইবেন কোথায়? কিন্তু মানুষের চিত্তকে কোনোদিন এমন বিষম দুশ্চিন্তায় আসিয়া ঠেকিতে হইবে না যে, তাহার অধিকার বিস্তারের স্থান আর নাই। কোনোদিন সে বিমর্ষ হইয়া বলিবে না যে, সে তাহার ব্যাপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলই কি এই গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌঁছানো নাই? অন্তহীন বহু কেবলই কি তাহাকে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে—সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কাণ্ড দেখি—গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি—আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যাহা পাইবার তা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই পাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি--কিন্তু কেবল আসিলেই তো হইল না—তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এইজন্য একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে তো পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আস্বাদন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই—আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারান্ডায় ছাতে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্বত্রই তাহার শেষ; সর্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।

এ রাজবাড়ির এই তো কাণ্ড, ইহার কোথাও শেষ নাই অথচ ইহার সর্বত্রই শেষ। ইহার মধ্যে সমাপ্তি এবং ব্যাপ্তি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। এইজন্য এখানে কোনোখানে আমরা বসিয়া থাকি না অথচ প্রত্যেক পদেই আমরা আশ্রয় পাই। মাটি ফুঁড়িয়া যখন অঙ্কুর বাহির হইল তখন সেইখানেই আমাদের চোখ বিশ্রাম করিতে পারে। অঙ্কুর যখন বড়ো গাছ হইল তখন সেখানেও আমাদের মন দাঁড়াইয়া দেখে। গাছে যখন ফুল ধরে তখন ফুলেও আমাদের তৃপ্তি। ফুল হইতে যখন ফল জন্মে তখন তাহাতেও আমাদের লাভ। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ শেষ হইলে তবেই তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ণতাকে পাইব আমাদের এমন দুরদৃষ্ট নহে—পূর্ণতাকে আমরা পর্বে

পর্বে পাইয়াই চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিসমাপ্তির স্বাদ পাইতে থাকি সেইজন্যই ব্যাপ্তি আনন্দময়— নহিলে তাহার মতো দুঃখকর আর কিছুই হইতে পারে না।

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনো যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে এক দিকে চলা, এবং আর-এক দিকে পৌঁছানো, এক দিকে বহু, আর-এক দিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর-এক দিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ— এইখানেই মানুষের পর্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়ো। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলিয়াছে এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্ঘ্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বাহির হইতে যখন দেখি তখন বলি মানুষ নিশ্বাস লইয়া বাঁচিতেছে, মানুষ আহার করিয়া বাঁচিতেছে, রক্ত চলাচলে মানুষ বাঁচিয়া আছে। এমন করিয়া কত আর বলিব? বলিতে গিয়া তালিকা শেষ হয় না। তখন দেখি শরীরের অণুতে অণুতে রসে রক্তে অস্থিমজ্জাস্নায়ুপেশীতে ফর্দ কেবল বাড়িয়া চলিতেই থাকে। তাহার পরে যখন প্রাণের হিসাব শেষ পর্যন্ত মিলাইতে গিয়া আলোকে উত্তাপে বাতাসে জলে মাটিতে আসিয়া পৌঁছাই, যখন প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক শক্তিরহস্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

এমন করিয়া অন্তহীনতার খাতায় কেবলই পাতা উল্টাইয়া শ্রান্ত হইয়া মরিতে হয়। কিন্তু বাহির হইতে প্রাণের ভিতর-বাড়িতে গিয়া যখন প্রবেশ করি তখন কেবল একটি কথা বলি, প্রাণের আনন্দে মানুষ বাঁচিয়া আছে, আর কিছু বলিবার দরকার হয় না। এই প্রাণের আনন্দেই আমরা নিশ্বাস লইতেছি, খাইতেছি, দেহ রচনা করিতেছি, বাড়িতেছি। বাঁচিয়া থাকিব এই প্রবল আনন্দময় ইচ্ছাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেষ্ট হইয়া বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রাণের আনন্দেই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; প্রাণের নিগূঢ় আনন্দে প্রাণীরা জগতের নানা স্পর্শের তানে আপনার স্নায়ুর তারগুলিকে কেবলই বিচিত্রতর করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। বাঁচিয়া থাকিতে চাই এই ইচ্ছা সন্তানসন্ততিকে জন্ম দিতেছে, রক্ষা করিতেছে, চারি দিকের পরিবেষ্টনের সঙ্গে উত্তরোত্তর আপনার সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য সাধন করিতেছে।

এমন-কি বাঁচিয়া থাকিব এই আনন্দেই জীব মৃত্যুকেও স্বীকার করিতেছে। সে লড়াই করিয়া প্রাণের আনন্দেই প্রাণ দিতেছে। কর্মী মউমাছিরা আপনাকে অঙ্গহীন করিতেছে কেন? সমস্ত মউচাকের প্রজাদের প্রাণের সমগ্রতার আনন্দ তাহাদিগকে ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতেছে। দেশের জন্য মানুষ যে অকাতরে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে তাহার মূলে এই প্রাণেরই আনন্দ। সমস্ত দেশের প্রাণকে সে বড়ো করিয়া জানিতে চায়— সেই ইচ্ছার জোরেই সেই আনন্দের শক্তিতেই সে আপনাকেও বিসর্জন করিতে পারে।

তাই আমি বলিতেছিলাম মূলে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় প্রাণের আনন্দই বাঁচিয়া থাকিবার নানা শক্তিকে নানা দিকে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, সেই নানা শক্তি নানা দিক হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দেই ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহারই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের এই শক্তি যেমন প্রাণের ব্যাপ্তির দিক, প্রাণের এই আনন্দ তেমনি প্রাণের সমাপ্তির দিক।

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিসটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে; তাহার মধ্যে তালমানলয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে স্বরবিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে; সেই নিয়মের মূলে স্বরতত্ত্বের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ যা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই; সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তহীন নিয়মশৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

কিন্তু যদি এই আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উল্টাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক-না কেন গানকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তি-লাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ঘটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অনুগত হইয়া চলে। তানসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্যলোক; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে। তানসেন এই জায়গায় আসিয়া গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, তাঁহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না; তাহা সম্পূর্ণই ছিল, তাহার লেশমাত্র ত্রুটি ছিল না— কিন্তু তিনি সমস্ত নিয়মের মূলে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মের প্রভু হইয়া বসিয়াছিলেন— তিনি এককে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বহু আপনি তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছিল। এই আনন্দলোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কবি, কর্ম সম্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।

যাহা আপনার ভাব হইতে উঠে তাহাই স্বাভাবিক— তাহার মধ্যে অন্যের তাড়না নাই, তাহাতে নিজেরই প্রেরণা। যে কর্ম আমার স্বাভাবিক সেই কর্মেই আমি আপনার সত্য পরিচয় দিই।

কিন্তু এখানে আমরা যথেষ্ট ভুল করিয়া থাকি। এই ঠিক আপনটিকে পাওয়া যে কাহাকে বলে তাহা বুঝা শক্ত। যখন মনে করিতেছি অমুক কাজটা আমি আপনি করিতেছি অন্তর্যামী দেখিতেছেন তাহা অন্যের নকল করিয়া করিতেছি— কিংবা কোনো বাহিরের বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে একঝোঁকা প্রবৃত্তির জোরে করিতেছি।

এই যে বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা ইহাও মানুষের সত্যতম স্বভাব নহে। বস্তুত ইহা জড়ের ধর্ম। যেমন নীচের টানে পাথর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে প্রবল বেগে গড়াইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ। এই জড়ধর্মকে খাটাইয়া প্রকৃতি আপনার কাজ চালাইয়া

লইতেছে। এই জড়ধর্মের জোরে অগ্নি জ্বলিতেছে, সূর্য তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, কোথাও তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইহা শাসনের কাজ। এইজন্যেই উপনিষদ বলিয়াছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অগ্নিকে জ্বলিতেই হইবে, মেঘকে বর্ষণ করিতেই হইবে, বায়ুকে বহিতেই হইবে এবং মৃত্যুকে পৃথিবীসুদ্ধ লোকে মিলিয়া গালি দিলেও তাহার কাজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে।

মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এইরূপ জড়ধর্ম আছে। মানুষকে সে কানে ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়। মানুষকে প্রকৃতি এইখানে তাহার অন্যান্য জড়বস্তুর সামিল করিয়া লইয়া জোর করিয়া আপন প্রয়োজন আদায় করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি সম্পূর্ণই জড় হইত তাহা হইলে কোথাও তাহার বাধিত না, সে পাথরের মতো অগত্যা গড়াইত, জলের মতো অগত্যা বহিয়া যাইত—এ সম্বন্ধে কোনো নালিশটিও করিত না।

মানুষ কিন্তু নালিশ করে। প্রবৃত্তি যে তাহাকে কানে ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে খাটাইয়া লয় ইহার বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি আজও থামিল না। সে আজও কাঁদিতেছে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্!

সে ভিতরে ভিতরে এই কথাটা অনুভব করিতেছে যে, আমি যে কাজ করিতেছি সে গারদের মধ্যে কয়েদির কাজ—প্রবৃত্তিপেয়াদার তাড়নায় খাটিয়া মরিতেছি।

কিন্তু সে ভিতরে জানে এমন করিয়া অভাবের তাড়নায় প্রবৃত্তির প্রেরণায় কাজ করাই তাহার চরম ধর্ম নহে। তাহার মধ্যে এমন কিছু একটি আছে যাহা মুক্ত, যাহা আপনার আনন্দেই আপনাতে পর্যাপ্ত, দেশকালের দ্বারা যাহার পরিমাপ হয় না, জরামৃত্যুর দ্বারা যাহা অভিভূত হয় না। আপনার সেই সত্য পরিচয় সেই নিত্য পরিচয়টি লাভ করিবার জন্যই তাহার চরম বেদনা।

পূর্বেই আমি বলিয়াছি, কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে; সে তখন বাহিরের অক্ষরগণ কাব্য হয় না; ততই কর্মীর কর্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়—এইখানেই স্বত-উৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।

এইজন্যই শাস্ত্রে বলে—

সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখম্।
যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আত্মবশ তাহাই সুখ।

অর্থাৎ মানুষের সুখ তাহার আপনের মধ্যে—আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।

এত বড়ো কথাটাকে ভুল বুঝিলে চলিবে না। যখন বলিতেছি সুখ মানুষের আপনের মধ্যে তখন ইহা বলিতেছি না যে, সুখ তাহার স্বার্থসাধনের মধ্যে। স্বার্থপরতার দ্বারা মানুষ ইহাই প্রমাণ করে যে, সে যথার্থ আপনার স্বাদটি পায় নাই, তাই সে অর্থকেই এমন চরম করিয়া এমন একান্ত করিয়া দেখে। অর্থকেই যখন সে আপনার চেয়ে বড়ো বলিয়া জানে তখন অর্থই তাহাকে ঘুরাইয়া মারে, তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখে লইয়া যায়—তখনই সে পরবশতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে।

প্রতিদিনই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। যে ব্যক্তি স্বার্থপর তাহাকে আপনার অর্থ

ত্যাগ করিতে হয়—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দায়ে পড়িয়া অর্থেরই জন্য সে অর্থ ত্যাগ করে—সেই তাহার প্রয়োজনের ত্যাগ দুঃখের ত্যাগ। কেননা, সেই ত্যাগের মূলে একটা তাড়না আছে, অর্থাৎ পরবশতা আছে। অভাবের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহাকে ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এক-একটা সময় উপস্থিত হয় যখন সে খুশি হইয়া খরচ করিয়া ফেলে। তাহার পুত্র জন্মিয়াছে খবর পাইয়া সে তাহার গায়ের দামি শালখানা তখনই দিয়া ফেলে। ইহা একপ্রকার অকারণ দেওয়া, কেননা কোনো প্রয়োজনই তাহাকে দিতে বাধ্য করিতেছে না। এই যে দান ইহা কেবল আপনার আনন্দের প্রাচুর্যকে প্রকাশ করিবার দান। আমার আপন আনন্দই আমার আপনার পক্ষে যথেষ্ট এই কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য ঐ শালখানা দিয়া ফেলিতে হয়। এই আনন্দের জোরে মানুষ একেবারে গভীরতম এমন একটি আপনাকে গিয়া স্পর্শ করে যাহাকে পাওয়া তাহার অত্যন্ত বড়ো পাওয়া। সেই তাহার আপনটি কাহারও তাঁবেদার নহে, সে জগতের সমস্ত শাল-দোশালার চেয়ে অনেক বড়ো, এইজন্য চকিতের মতো মানুষ তাহার দেখা যেই পায় অমনি বাহিরের ঐ শালটার দাম একেবারে কমিয়া যায়। যখন মানুষের আনন্দ না থাকে, যখন মানুষ আপনাকে না দেখে, তখন ঐ শালটা একেবারে হাজার টাকা ওজনের বোঝা হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় চর্মের মতো সর্বাঙ্গে চাপিয়া ধরে—তাহাকে সরাইয়া দেওয়া শক্ত হইয়া উঠে। তখন ঐ শালটার কাছে পরবশতা স্বীকার করিতে হয়।

এমনি করিয়া মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া আপনাকে দেখিতে পায়। মাঝে মাঝে এমন এক-একটা আনন্দের হাওয়া দেয় যখন তাহার বাহিরের ভারী ভারী পর্দাগুলাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য উড়াইয়া ফেলে। তখন বিপরীত কাণ্ড ঘটে—কৃপণ যে সেও ব্যয় করে, বিলাসী যে সেও দুঃখ স্বীকার করে, ভীরু যে সেও প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন যে নিয়মে সংসার চলিতেছে সেই নিয়মকে মানুষ এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে। সেইরূপ অবস্থায় মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ এমন একটা যুগান্তর উপস্থিত হয়—পূর্বেকার সমস্ত খাতা মিলাইয়া যাহার কোনোপ্রকার হিসাব পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া পাইবে? স্বার্থের প্রয়োজনের হিসাবের সঙ্গে আত্মার আনন্দের হিসাব কোনোমতেই মেলানো যায় না—কেননা সেই যথার্থ আপনার মধ্যে গিয়া পৌঁছিলে মানুষ হঠাৎ দেখিতে পায়, খরচই সেখানে জমা, দুঃখই সেখানে সুখ।

এমনি করিয়া মাঝে মাঝে মানুষ এমন একটি আপনাকে দেখিতে পায়, বাহিরের সমস্তের চেয়ে যে বড়ো। কেন বড়ো? কেননা সে আপনার মধ্যেই আপনি সমাপ্ত। তাহাতে গুনিতে হয় না, মাপিতে হয় না—সমস্ত গণা এবং মাপা তাহা হইতে আরম্ভ এবং তাহাতে আসিয়াই শেষ হয়। ক্ষতি তাহার কাছে ক্ষতি নহে, মৃত্যু তাহার কাছে মৃত্যু নহে, ভয় তাহার বাহিরে এবং দুঃখের আঘাত তাহার তারে আনন্দের সুর বাজাইয়া তোলে।

এই যাহাকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া পায়—যাহাকে কখনো কখনো কোনো-একটা দিক দিয়া সে পায়—যাহাকে পাইবামাত্র তাহার শক্তি স্বাভাবিক হয়, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়, তাহার কর্ম আনন্দের কর্ম হইয়া উঠে; যাহাকে পাইলে তাহার উপর হইতে বাহিরের সমস্ত চাপ যেন সরিয়া যায়, সে আপনার মধ্যেই আপনার একটি পর্যাপ্তি দেখিতে পায়—তাহার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করে। সেই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে অন্তরতমভাবে আছে বলিয়াই প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় সে যে-সকল কাজ করে সে কাজকে সে গারদের কাজ বলে। অথচ প্রকৃতি যে নিতান্তই জবর্দস্তি করিয়া বেগার খাটাইয়া লয় তাহা নহে—সে আপনার কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বেতনটিও শোধ করে, প্রত্যেক চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সুখও বাঁটিয়া দেয়। সেই সুখের বেতনটির প্রলোভনে আমরা অনেক সময় ছুটির পরেও খাটিয়া থাকি, পেট ভরিলেও খাইতে ছাড়ি না। কিন্তু হাজার হইলে তবু মাহিনা খাইয়া খাটুনিকেও আমরা দাসত্ব বলি—আমরা এ চাকরি ছাড়িতেও পারি না তবু বলি হাড় মাটি হইল, ছাড়িতে পারিলে বাঁচি। সংসারে এই যে আমরা খাটি—সকল দুঃখ সত্ত্বেও ইহার

মাহিনা পাই—ইহাতে সুখ আছে, লোভ আছে। তবু মানুষের প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং বলে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্।

এমন কথা সে যে বলে, বেতন খাইয়াও তাহার যে পুরা সুখ নাই তাহার কারণ এই যে, সে জানে তাহার মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে—সে জন্মদাস নহে—সমস্ত প্রলোভন-সত্ত্বেও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়—প্রকৃতির দাসত্বে তাহার অভাবটাই প্রকাশ পায় স্বভাবটা নহে। স্বভাবতই সে প্রভু; সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে—বাহিরের স্তুতি বা লাভ, বা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু, যেখানে সে আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায়; সেজন্য সে দুঃখ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে। সেজন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়—পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মতো সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এইজন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে, আমি মুক্তি চাই। কী হইতে সে মুক্তি চায়? না, যাহা-কিছু সে চাহিতেছে তাহা হইতেই সে মুক্তি চায়। সে বলে আমাকে বাসনা হইতে মুক্ত করো—আমি দাসপুত্র নই অতএব আমাকে ঐ বেতন-চাওয়া হইতে নিষ্কৃতি দাও। যদি সে নিশ্চয় না জানিত যে বেতন না চাহিলেও তাহার চলে, নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সম্পদ আছে এ বিশ্বাস যদি তাহার অন্তরতম বিশ্বাস না হইত তবে সে চাকরির গারদকে গারদ বলিয়াই জানিত না—তবে এ প্রার্থনা তাহার মুখে নিতান্তই পাগলামির মতো শুনাইত যে আমি মুক্তি চাই। বস্তুত আমাদের বেতন যখন বাহিরে তখনই আমরা চাকরি করি কিন্তু আমাদের বেতন যখন আমাদের নিজেরই মধ্যে, অর্থাৎ যখন আমরা ধনী তখন আমরা চাকরিতে ইস্তফা দিয়া আসি।

চাকরি করি না বটে কিন্তু কর্ম করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। কর্ম বরঞ্চ বাড়িয়া যায়। যে চিত্রকর চিত্ররচনাশক্তির মধ্যে আপনাকে পাইয়াছে—যাহাকে আর নকল করিয়া ছবি আঁকিতে হয় না, পুঁথির নিয়ম মিলাইয়া যাহাকে তুলি টানিতে হয় না, নিয়ম যাহার স্বাধীন আনন্দের অনুগত—ছবি আঁকার দুঃখ তাহার নাই, তাই বলিয়া ছবি আঁকাই তাহার বন্ধ এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ উল্টা। ছবি আঁকার কাজে আপনাকে সে আর বিশ্রাম দিতে চায় না। বেতন দিয়া এত খাটুনি কাহাকেও খাটানো যায় না।

ইহার কারণ এই যে, এখানে চিত্রকর কর্মের একেবারে মূলে তাহার পর্যাপ্তির দিকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতন কর্মের মূল নহে, আনন্দই কর্মের মূল—বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। গঙ্গা হইতে যেমন আমরা পাইপে করিয়া কলের জল আনি, বেতন তেমনি করিয়াই আনন্দকেই ঠেলা দিয়া তাহার একাংশ হইতে শক্তির সম্বল সঞ্চয় করিয়া আনে। কিন্তু কলের জলে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি না, তাহার হাওয়া খাইতে পারি না, তাহার তরঙ্গলীলা দেখিতে পাই না—তা ছাড়া কেবল কাজের সময়টিতেই সে খোলা থাকে—অপব্যয়ের ভয়ে কৃপণের মতো প্রয়োজনের পরেই তাহাকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহার পরে কল বিগড়াইতেও আটক নাই।

কিন্তু আনন্দের মূল গঙ্গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখিতে পাই সেখানে কর্মের অবিরাম স্রোত বিপুল তরঙ্গে আপনি বহিয়া যাইতেছে, লোহার কল অগ্নিচক্ষু রাঙা করিয়া তাহাকে তাড়না করিতেছে না। সেই জলের ধারা পাইপের ধারার চেয়ে অনেক প্রবল, অনেক প্রশস্ত, অনেক গভীর। শুধু তাই নয়—কলের পাইপ-নিঃসৃত কাজে কাজই আছে কিন্তু সৌন্দর্য নাই, আরাম নাই—

আনন্দের গঙ্গায় কাজের অফুরান প্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সৌন্দর্য ও আরাম অনায়াসে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম চিত্রকর যখন সত্য আপনার মধ্যে সকল কর্মের মূলে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, আনন্দে গিয়া পেঁৗছে, তখন তাহার চিত্র আঁকার কর্মের আর অবধি থাকে না। বস্তুত তখন তাহার কর্মের দ্বারাই আনন্দের পরিমাপ হইতে থাকে, দুঃখের দ্বারাই তাহার সুখের গভীরতা বুঝিতে পারি। এইজন্যই কার্লাইল বলিয়াছেন—অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকে বলে প্রতিভা। প্রতিভা সেই শক্তিকেই বলে, যে শক্তির মূল আপনারই আনন্দের মধ্যে; বাহিরের নিয়ম বা তাড়না বা প্রলোভনের মধ্যে নহে। প্রতিভার দ্বারা মানুষ সেই আপনাকেই পায় বলিয়া কর্মের মূল আনন্দপ্রস্রবণটিকে পায়; সেই আনন্দকেই পায় বলিয়া কোনো দুঃখ তাহাকে আর দুঃখ দিতে পারে না। কারণ প্রাণ যেমন আপনিই খাদ্যকে প্রাণ করিয়া লয়, আনন্দ তেমনি আপনিই দুঃখকে আনন্দ করিয়া তোলে।

এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা কথাটা এই যে, যেখানে আপনার সমাপ্তি সেই আপনাকে মানুষ পাইতে চাহিতেছে, আপনার মধ্যে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কারণ সেইখানেই তাহার স্থিতি, সেইখানেই তাহার আনন্দ। সেই তাহার স্বাধীন আপনার সঙ্গেই তাহার সংসারকে তাহার সমস্ত কর্মকে যোজনা করিতে চাহিতেছে। সেখান হইতে যে পরিমাণে সে বিচ্ছিন্ন হয় সেই পরিমাণেই কর্ম তাহার বন্ধন, সংসার তাহার কারাগার। সেখানকার সঙ্গে পূর্ণযোগে কর্মই মানুষের মুক্তি, সংসারই মানুষের অমৃতধাম।

এইবার আর-একবার গোড়ার কথায় যাইতে হইবে। আমরা বলিয়াছিলাম, মানুষের সমস্যা এই যে, ছোটোকে বড়োর সঙ্গে মিলাইবার ভার তাহার উপর। আমরা দেখিয়াছি তাহার ছোটো শরীরের সার্থকতা বিশ্বশরীরের মধ্যে, তাহার ছোটো মনের সার্থকতা বিশ্বমানবমনের মধ্যে। এই শরীর মনের দিক মানুষের ব্যাপ্তির দিক। আমরা ইহাও দেখিয়াছি শুদ্ধমাত্র এই আমাদের ব্যাপ্তির দিকে আমরা প্রকৃতির অধীন, আমরা বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিয়মপরম্পরার দ্বারা চালিত—এখানে আমাদের পূর্ণ সুখ নাই, এখানে বাহিরের তাড়নাই আমাদিগকে কাজ করায়। আমাদের মধ্যে যেখানে একটি সমাপ্তির দিক আছে, যে পরিমাণে সেইখানকার সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপ্তির যোগসাধন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন আমার শরীর আমারই বশীভূত শরীর, আমার মন আমারই বশীভূত মন হইয়া উঠিবে। তখন সর্বমাত্মবশং সুখম্। তখন আমার শরীর মনের বহু বিচিত্র নিয়ম আমার এক আনন্দের অনুগত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহার বহুত্বের দুঃসহ ভার একের মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া সহজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু যেখানে তাহার সমাপ্তির দিক, যেখানে তাহার সমগ্র একের দিক সেখানেও কি তাহার সমস্যাটি নাই?

আছে বৈকি। সেখানেও মানুষের আপন, আপনার চেয়ে বড়ো আপনার সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে। মানুষ যখনই আত্মবশ হইয়া আপনার আনন্দকে পায় তখনই বড়ো আনন্দকে সর্বত্র দেখিতে পায়। সেই বড়ো আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড়ো আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি। মানুষের শরীর বড়ো শরীরকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের মন বড়ো মনকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের আত্মা বড়ো আত্মাকে সহজে দেখে!

এইখানে পেঁৗছানো, এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি। বস্তুত ইহাই মানবের ধর্ম; মানুষের ইহাই স্বভাব, ইহাই তাহার সত্যতম চেষ্টা। বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব—মানুষের ধর্ম ধর্মই—তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না। মানুষের সকল কর্মের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে এই ধর্ম কাজ করিতেছে। অন্য সকল কাজের উদ্দেশ্য হাতে হাতে বোঝা যায়—ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাই, শীত নিবারণের জন্য পরি কিন্তু

ধর্মের উদ্দেশ্যকে তেমন করিয়া চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিবার জো নাই। কেননা, তাহা কোনো সাময়িক অভাবের জন্য নহে, তাহা মানুষের যাহা-কিছু সমস্তের গভীরতম মূলগত। এইজন্য কোনো বিশেষ মানুষ তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে পারে, কোনো বিশেষ বুদ্ধিমান তর্কের দিক হইতে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে— কিন্তু সমস্ত মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে মানুষের সকল প্রয়োজনের মধ্যে, তাহার সমস্ত কাড়াকাড়ি মারামারি তাহার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে এই ধর্ম রহিয়াই গিয়াছে— তাহা অন্নপান নহে, বসনভূষণ নহে, খ্যাতিপ্রতিপত্তি নহে, তাহা এমন কিছুই নহে যাহাকে বাদ দিলে মানুষের আবশ্যকের হিসাবে একটু কিছু গরমিল হয়; তাহাকে বাদ দিলেও শস্য ফলে, বৃষ্টি পড়ে, আগুন জ্বলে, নদী বহে; তাহাকে বাদ দিয়া পশুপক্ষীর কোনো অসুবিধাই ঘটে না; কিন্তু মানুষ তাঁহাকে বাদ দিতে পারিল না। কেননা, ধর্মকে কেমন করিয়া ছাড়িবে? প্রয়োজন থাক্‌ আর নাই থাক্‌ অগ্নি তাহার তাপধর্মকে ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহাই তাহার স্বভাব। বাহির হইতে দেখিলে বলা যায় অগ্নি কাষ্ঠকে চাহিতেছে কিন্তু ভিতরের সত্য কথা এই যে, অগ্নি আপন স্বভাবকে সার্থক করিতে চাহিতেছে— সে জ্বলিতে চায় ইহাই তার স্বভাব— এইজন্য কখনো কাঠ, কখনো খড়, কখনো আর-কিছুকে সে আত্মসাৎ করিতেছে; সে দিক দিয়া তাহার উপকরণের তালিকার অন্ত পাওয়া যায় না কিন্তু মূল কথাটি এই যে, সে আপনার স্বভাবকেই পূর্ণ করিতে চাহিতেছে। যখন তাহার উজ্জ্বল শিখাটি দেখা যায় না কেবল কৃষ্ণবর্ণ ধূমই উঠিতে থাকে, তখন সেই চাওয়া তাহাব মধ্যে আছে; যখন সে ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে তখনো সেই চাওয়া তাহার মধ্যে নির্বাপিত হয় না। কারণ তাহাই তাহার ধর্ম। মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনের মধ্যে চাওয়া। অন্য সকল চাওয়ার হিসাব দেওয়া যায়, কারণ তাহার হিসাব বাহিরে, কিন্তু এই চাওয়াটির হিসাব দেওয়া যায় না, কারণ ইহার হিসাব তাহার আপনারই মধ্যে। এইজন্য তর্কে ইহাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু মূলে ইহাকে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্‌। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত। সেইজন্য আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে। ইহা আছেই। মানুষের একটা প্রয়োজন আজ মিটিতেছে, আর-একটা প্রয়োজন কাল মিটিতেছে, যেটা মিটিতেছে সেটা চুকিয়া যাইতেছে— কিন্তু তাহার স্বভাবের চরম চেষ্টা রহিয়াছেই। অবশ্য এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে, ইহাই যদি মানুষের স্বভাব হয় তবে ইহার বিপরীত আমরা মনুষ্যসমাজে দেখি কেন? চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি যে, শিশু যে বার বার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব— সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নীচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনো তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে— সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়— টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না; ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধুলায় টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

আমাদের ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলই চেষ্টা করিতেছে— যখন ধুলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনো অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে,

তাহা হইলেই গতিকে পাইবে— দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে— তখনই তুমি তোমার চরিতার্থতাকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা-কিছু পাইতেছে তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে— যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই চরিতার্থতা হইতে, এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা-কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে— কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এ যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখিতে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা তো কখনোই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা; ভিতরের দেখা নহে; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত— তাহা কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি-না কেন, কোনো অর্থ নাই; যতই বলি না কাজ কেবল কাজকে জন্ম দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলই দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সুগভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই, মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।

দ্বারী দরজার কাছে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেছে। আমি তাহার ভাষা বুঝি না। আমার কেবলই মনে হয়, একটার পর আর-একটা শব্দ চলিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদের কোনো সম্বন্ধ জানি না। ইহাই মৃত্যুর রূপ; ইহাই অর্থহীনতা। ইহাতে কেবল পীড়া দেয়। যখন ভাষা বুঝি, যখন অর্থ পাই, তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে আর শুনি না— তখন অর্থের অনবচ্ছিন্ন ঐক্যধারাকে দেখি, তখন অখণ্ড অমৃতকে পাই, তখন দুঃখ চলিয়া যায়। তুলসীদাসের রামায়ণে অর্থের অমৃত শব্দের খণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া দেখাইতেছে। সেই পূর্ণটিকে দেখাই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িবার চরম উদ্দেশ্য— যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে ততক্ষণ প্রত্যেক শব্দই কেবল আমাদিগকে দুঃখ দিবে। ততক্ষণ পাঠকের মন কেবলই বলিতে থাকিবে, অবিশ্রাম শব্দের পর শব্দ লইয়া আমি কী করিব— অমৃত যদি না পাই তবে ইহাতে আমার কিসের প্রয়োজন।

আমাদেরও সেই কান্না। আমরা যখন কেবলই অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দেয়— একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগ করিয়া যখন তাহাকে দেখি তখনই তাহার সমস্ত ব্যর্থতা দূর হইয়া যায়। তখন প্রতি পদেই আমাদিগকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন মৃত্যুই আমাদের কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড অমৃতে জগৎকে এবং জীবনকে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদের সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হয়। তখন সা রি গা মা-র অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মরি না— রাগিণীর পরিপূর্ণ রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় লাভ করি।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা দেশে নানা কালে নানা জাতির নানা ইতিহাসে মানুষ এই রাগিণী শিখিতেছে। যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ নব নব তানের মতো কেবলই আকাশ হইতে আকাশে বিস্তীর্ণ হইতেছে— সেই আনন্দ-রাগিণী মানুষ সাধিতেছে। ওস্তাদের ঘরে তাহার জন্ম, পিতার কাছে তাহার শিক্ষা। পিতার অনাদি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে সে সুর

মিলাইতেছে। সেই একের সুরে যতই তাহার সুর মিলিতে থাকে, সেই একের আনন্দে যতই তাহার আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে, বহুর তানমানের মধ্যে ততই তাহার বিঘ্ন কাটিয়া যায়, দুঃখ দূর হয়—বহুকে ততই সে আনন্দের লীলা বলিয়া দেখে; বহুর মধ্যে তাহার ক্লান্তি আর থাকে না, সমস্তের সামঞ্জস্যকে সে একের মধ্যে লাভ করিয়া বিক্ষেপের হাত হইতে রক্ষা পায়। ধর্ম সেই সংগীতশালা যেখানে পিতা তাঁহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মায় সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সংগীতশালায় যে সর্বত্রই সংগীত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার দুঃখ অত্যন্ত কঠোর; সেই কঠোর দুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের একরকমের ভুল নহে, সকলের একজাতীয় বাধা নহে, কাহারও-বা সুরে দোষ আছে, কাহারও-বা তালে, কেহ-বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা; এইজন্য সাধনা স্বতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিশুদ্ধ সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ধর্মশিক্ষা

বালকবালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এ তর্ক আজকাল খৃস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্মসম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে, ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয় অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্‌বৃত্তটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল্যবান জিনিস কী করিয়া বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তাটা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মতো সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ গীতায় বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশিকিছু নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণ-ভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে-সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো

বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মানুষ বলে আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয়, তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে— তখন ধর্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারি দিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে— তখন দেশের ধর্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে— তখন ধর্ম যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য কোনোপ্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক-না কেন ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না— বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন-কি, আমাদের ধর্ম-সমাজসম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর ব্যস্ততাময় উত্তেজনা-পরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকা-বিস্তীর্ণ নদীর মতো— সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত একপাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে; তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রায় সরলতা নাই; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন-কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এককোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠি তবে সেই উদ্‌বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না; তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষা-

লাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে, সেইসঙ্গে বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও চারি দিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সমস্ত য়ুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদসাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে, পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারি দিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস-সম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে; উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার সীলমোহরের স্বাক্ষর আছে এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেঁকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া বাঁধিয়া পুড়াইয়া একঘরে করিয়া বিদ্যার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে বর্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্যদেশে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্মশিক্ষায় মানুষ করিয়া তোলা ভালো কি মন্দ সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। কেননা বিদ্যা-শিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের দেশেও সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন, তখনই তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমত ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন। কারণ বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে

চিরদিন মকুন্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ-অবতার যে সত্যসত্যই বরাহবিশেষ নহে তাহা ভূকম্পশক্তির রূপকমাত্র এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনো প্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে, শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগত-রূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনোমতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এইজন্য এ দেশে হিন্দুবিদ্যালয়সম্বন্ধীয় নূতন যে-সকল উদ্‌যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শের সহিত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই, যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে সুদৃঢ় করিয়া তোলা মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয় তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এইরূপ বাঁধা ধর্মশাস্ত্রের একটা সুবিধা আছে। ধর্মসম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব তাহা লইয়া বেশি কিছু ভাবিতে হয় না, তাহাদের বুদ্ধিবিচারকে উদ্‌বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন-কি, না করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাঁধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে, তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টি বর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই তেমনি কেবলমাত্র ধর্মবক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের দুর্বিপাকে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া মন জিনিসটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল একদিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এইপ্রকার অনির্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব একটি বিশেষ ফিলজফি বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত, কতটুকু দ্বৈতাদ্বৈত; ইহার মধ্যে শংকরের প্রভাব কতটা, কতটা কান্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে উহা ধর্মই নহে উহা একটা ফিলজফি মাত্র; ইঁহারা সেই কলঙ্ককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায়

ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্‌স্টবুক-কমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবুত করিয়া বাঁধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনই কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর, তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেষ—ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেল। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন ব্রাহ্মধর্ম কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবন্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবন-উৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, বাঁধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী—তাহার রূপ প্রবহমান রূপ, তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে—নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, কিন্তু সেসকল ঘাটকেও তাহা বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিবে—কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতত্ত্ব এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? তাহা একটা মোটা কথা, তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আসল কথা এই যে রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে, তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোটো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব মোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যত বারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইডিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয়, ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করা যায় বটে কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে—আর-এক দল ইহাদের খেলার বিঘ্ন না করিয়া অতিদূরে নিভৃতে গিয়া আপনার সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চিরদিন চলে না। যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না।

তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম; বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম; উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল— সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা একমুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত; আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্ম-ধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে— ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে. আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতন্ত্র বা পূজাপদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি— ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার পূর্বে আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে, বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে।

অতএব ইহার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মে অন্য প্রণালীতে কতকগুলি সহজ সুযোগ আছে এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধুলা সহজ!

যাহা হউক এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকাপয়সার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে তাহার এই ধর্ম-প্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো ইস্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না, ইনস্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাণ ধরা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' অর্থাৎ এটা কোনোমতেই পঠন-পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতম্, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন, য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্‌বোধিত করা যাইতে পারে এরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। একদিকে যেমন একদল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্‌বোধিত করিয়া তোলো, অপর দিকে তেমনি আর-এক দল বিশেষ বিশেষ বাহ্যপ্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহ বা বলেন যজ্ঞ করো, কেহ বা বলেন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্তিকে ধ্যান করো, এমন-কি, কেহ-বা বলেন মাদক পদার্থের দ্বারা অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুতবেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনি প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখন মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়, তখনি মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায়, অন্যকে ভোলায়; সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ যাঁহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর-এক জিনিস।

মনে করো আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য; আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনাদুঃখে হজম করিতে পার তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে,

আহারের পর আমি দুই খণ্ড কাঁচা সুপারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আস্ত চুরুট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি, ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়। আসলে আমি যে এতৎ-সত্ত্বেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; এমন-কি, যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনো দিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।

শুনা যায় কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন তবে তিনি আর কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ঐ পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন-না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এমন কথা নাই। এরূপ স্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি তুমি কবিতাই লিখিতে পার তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান, তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত স্বাভাবিক প্রতিভাবশতই যাহারা কোনো একটা জিনিস পায়, পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই-সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে; এমন-কি, তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুণে এই-সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল সময়ে নিজেরাও বুঝেন না, এবং কখনো বা মনে করেন এখন আমার পক্ষে এই-সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে আমরা সার্থকতালাভ করিয়াছি; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না, কারণ তাহাদের কাছে এই-সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে-সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আনুকূল্য আছে। ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারি দিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকলপ্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া

যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন? এ-সব দুর্লভ জিনিস তো আবশ্যক বুঝিয়া ফরমাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা যাহা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যখনই বলিতেছি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র একটা যথার্থ আশ্রয় যথার্থভাবে পাইতেছে না তখনই জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন-কি কোনো-একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ বিশ্ব-প্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকলপ্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি যাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাঁহারা বলিবেন, এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।

অন্য কোনো এককালে যে জিনিসটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে, তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধনুর্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদি বা অনাদৃত হয় কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধ-ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উলটা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনো সেকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দুইপক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মানুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্বে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও অনেকটা সেই পূর্ব আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।

অথচ আমরা অনুকরণচ্ছলে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এইজনাই যদি বলা যায়

আমরা যথাসম্ভব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব তবে আমাদের মনে মস্ত এই একটা সান্ত্বনা আসে যে আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি—অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে-সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি—'না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্ন নহে।' মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তখন সে আধুনিকতা নামক অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলা বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়াতলে যেখানে একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর-এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না আমি এখানে কোনো অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনো নিযুক্ত আছে তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানাবিধ প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম, আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব আমরাই তাহাদের উপকার করিব, ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনো যন্ত্র গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেননা এখনো ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে; আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি; এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন; এখানে গুরুশিষ্য সকলেই একই ইস্কুলে সেই

মহাগুরুর ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি; তখন হইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনো আমাদের যাহা-কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই— যেখানেই আমরা মনে করি আমরা দিব অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না, সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ করিয়া এ কথা আমাকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো; তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে— যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্‌বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানব-সমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল, সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব সেই আশ্রমের যে আহ্বান তাহা সেই শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি-না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল-শঙ্খধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না— তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে, এবং সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেরুয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাঁটিয়া আসিবেন না— তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমন-বার্তা জানিতেও পারিব না। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। এই ভূমার আহ্বানের একেবারেই মাঝখানে আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে। সেই একাগ্র ধ্বনি তাহাদের বিমুখ কর্ণের

বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে। সে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা একহিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতা-সমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক-একটি রবিনসন ক্রুসোর মতো আপনার ফ্রাইডেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এতবড়ো জনময় নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু একশো দুশো মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জন বাস বলা চলে না। এ যে একশো দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে; ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম এমনটি হইবার জো নাই; এই একশো দুশো মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা?

আমার সেই বন্ধু হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও—কিন্তু সংসারে যেখানে চারি দিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠা-পড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ—আর বার বার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আতরটি কোন্ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনায় বিরাজ করে কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতর মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শ যেমন সত্য, সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য—যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে, চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি, সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না—সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং-পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না—কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া-মিশিয়াই থাকে—এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয় এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন তবে সেইপ্রকার স্থানই যে বালক-বালিকাদের ধর্মশিক্ষার অনুকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই— কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে— কারণ আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো-একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাঁহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে এ কথা আমি বারংবার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই, যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ— তাহা বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে, সে আপনাকে যদি বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের ঊর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু কেনই বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে যে ভাবটি ভরিয়া উঠে তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ, শুদ্ধমাত্র এ নহে যে তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি— তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারি একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমালিপ্ত আকাশের নীচে জন্মগ্রহণ করি নাই, শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না; সূর্যোদয় যে ভক্তির পুজাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্তবায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে; আমাদের দেশে এ-সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য; পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই-সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল— তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে? আমরাই তো জগৎপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে— সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে— আমাদের কাব্য-

পুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে—সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। নাহয় আজ যে কালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিতেছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন? নাহয় আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পথের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশ বর্ষ জড়িত হইয়াছে অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম; কারণ আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনোপ্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন-সকল আশ্রমের প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্বাভাবিক; যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে; কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে; যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে; যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে; যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে, তাহারা নানা প্রকারে কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

১৩১৮

•

ধর্মের অধিকার

যে-সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক

বড়ো— অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এইজন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন-সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠে, বলিয়া বসে এ-সব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড়ো বড়ো কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্‌বুদের মতো ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগলামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে, বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেই-সকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরও অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলে সে অংকুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরও নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়— এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন-কি, নিজের অনিচ্ছায়, সেই-সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রঙ বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনো বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহাই তাহার চরম আশ্রয়, এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে— সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন— বলিয়াছেন, পথ এখনো বাকি, পাথেয় এখনো শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্মিত হয় না— বিকশিত হয়, সঞ্চিত হয় না— সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য নহে— তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে— সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য, কেননা আমি দুর্বল আমি শ্রান্ত; তাঁহারা বলেন— এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।

যে ব্যক্তি ছোটো সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্যবাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করিয়া দেয়; এইজন্য সে সত্যকে জানে না, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটোর সঙ্গে বড়োর কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে, আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনো তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান্ পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ময়। এইজন্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্মই আমাকে বাঁচাইতে পারে এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়াতি মারামারি কাড়াকাড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে তখনো তাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ— অতি অল্পমাত্র ধর্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে সৎকর্ম পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মূঢ়তার জড়স্তূপপুঞ্জে প্রতিহত, প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র্য সর্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ, তখনো তাঁহারা অসংশয়ে বলেন, সর্ষপপরিমাণ বিশ্বাস পর্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে

পারে তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না; তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে—এবং সংসারকেই যে-সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি, সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড়ো হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের যাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখো এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই; তাঁহারা বলিয়াছেন, আপনার মতো করিয়াই সকলকে দেখো। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই, আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে এ কথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল, কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন, শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ--এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে-পর্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। তুমি বড়ো হও, ভালো হও, এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—

শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করো। ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তরদেবাস্য তদ্‌ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয় স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড়ো তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোটো করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীরু করিয়া রাখা হয়; বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড়ো করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি ঝোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকেই আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুরুগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে। সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলি না। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, এ কথা বলিলেও কম বলা হয় না—কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান করা মানুষের ধর্ম নহে; কেননা অনেক লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে

নিজেকে সার্থক মনে করে। তবু আজ পর্যন্ত মানুষ এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম, দানই পুণ্য।

কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোনো দুর্বলচিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়াছে এবং ধর্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। আপন ধর্মের পথকে মানুষ বলিয়াছে— ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই বলিয়াছে— ভূমৈব সুখম্।

এইজন্যই এই বড়ো একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তাহার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; সে মুখে যাহাই বলুক শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনকেই সে সত্য-সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।

যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন-না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে— তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এইজন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখে ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতেছে না, দুঃখ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, বাধা তাহাকে পরাভূত করিতেছে না, এমন-কি, নিষ্ফলতাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। তখন সে হঠাৎ দেখিতে পায় ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, ক্লেশ তাহার পক্ষে আনন্দময়, এবং মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃতের সোপান।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার কালে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের মনে কামনা অত্যন্ত বেশি প্রবল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেয়েও প্রবল পদার্থ আমাদের আছে; সত্যের পিপাসা যদি আমাদের রিপুর চেয়ে প্রবলতর না হইত তবে আমাদের মধ্যে কেই-বা ধর্মের পথে চলিতে পারিত।

মানুষের প্রতি এত বড়ো শ্রদ্ধার কথা এত বড়ো আশার কথা সকলে বলিতে পারে না। কামনার আঘাতে মানুষ বারবার স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কেবল ইহাই বড়ো করিয়া তাহার চোখে পড়ে যে ছোটো; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যের আকর্ষণে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইটেই বড়ো করিয়া দেখিতে পান তিনিই যিনি বড়ো। এইজন্য তিনিই মানুষকে বারংবার নির্ভয়ে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই মানুষের জন্য আশা করিতে পারেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটি শুনাইতে আসেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি কৃপণের ন্যায় মানুষকে ওজন করিয়া অনুগ্রহ দান করেন না, এবং বলেন না তাহাই তাহার বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে যথেষ্ট— প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তিনি আপন চিরজীবনের সর্বোচ্চ সাধনের ধন তাহার নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করেন, জানেন সে তাহার যোগ্য। সে যে কত বড়ো যোগ্য তাহা সে নিজে তেমন করিয়া জানে না, তিনি যেমন করিয়া জানেন।

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না— মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার। মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম খাড়া করো; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের

সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাঁহারা দাবি করেন—কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে। কোনো লোক রাজার ছেলে হইয়াও হয়তো আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে তবুও দেশের লোকের দিক হইতে একটা তাগিদ থাকা চাই। তাহার পৈতৃক গৌরব তাহাকে স্মরণ করাইতেই হইবে, তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে, এমন-কি, তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে চাষা বলিয়া মিথ্যা ভুলাইয়া সমস্যাকে দিব্য সহজ করিয়া দিলে চলিবে না; সে চাষার মতো প্রত্যহ ব্যবহার করিলেও সত্য তাহার সম্মুখে স্থির রাখিতে হইবে। তেমনি ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র ইহাই সত্য; ব্যবহারতঃ মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।

ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন মানুষের শরীরের প্রকৃতি ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধিশত্রু পরাভূত করে তখনই ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদারুণ হইয়া উঠে কারণ তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎসকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ সহায়টি দুর্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম তেমনি মানবসমাজে। এই ধর্মের আদর্শই নিয়ত ভিতরে ভিতরে মানবপ্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে কিন্তু যে পরম দুর্দিনে এই ধর্মের আদর্শকেই বিকৃতি আক্রমণ করে সেদিন বাহিরের নিয়ম সংযম আচার অনুষ্ঠান পুলিস ও রাষ্ট্রবিধি যতই প্রবল হউক-না কেন সমাজপ্রকৃতিকে দুর্গতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? এইজন্য দুর্বলতার দোহাই দিয়া ইচ্ছাপূর্বক ধর্মকে দুর্বল করার মতো আত্মঘাতকতা আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ দুর্বলতার দিনেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ধর্মের বল।

আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামত খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসংকোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্মকে ছাঁটিয়া ছোটো করিতে দোষ নাই, এমন-কি, তাহাই কর্তব্য।

ধর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এমন কথা কি বলা যায়? প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাহাকে ছোটো বড়ো করিব! ধর্ম তো জীবনহীন জড় পদার্থ নহে; তাহার উপরে ফরমাশমত অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের করাত তো চলে না। এ কথা তো কেহ বলে না যে, শিশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া মাকেও চারি দিক হইতে কাটিয়া কম করিয়া ফেলো। মা তো শিশুর গায়ের জামার সঙ্গে তুলনীয় নহেন। প্রথমত মাকে কাটিতে গেলেই মারিয়া ফেলা হইবে, দ্বিতীয়ত অখণ্ড সমগ্র মাতাই বড়ো সন্তানের পক্ষে যেমন আবশ্যক ছোটো সন্তানটির পক্ষেও তেমনি আবশ্যক—তাঁহাকে কম করিলে বড়োও যেমন বঞ্চিত হইবে, ছোটোও তেমনি বঞ্চিত হইবে। ধর্ম কি মানুষের মাতার মতোই নহে?

আমি জানি আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে সকল মানুষেরই কি বুদ্ধি ও প্রকৃতি একই রকমের? সকলেই কি ধর্মকে একই ভাবে বোঝে? না, সকলের এক নহে; ছোটো বড়ো উঁচু নিচু জগতে আছে। অতএব সত্যকে আমরা সকলেই সমান দূর পর্যন্ত পাইয়াছি এ কথা বলিতে পারি না। আমাদের শক্তি পরিমিত; কিন্তু যতদূর বড়ো করিয়া সত্যকে পাইয়াছি তাহার চেয়েও সে ছোটো এ মিথ্যা কথা তো ক্ষণকালের জন্যও আমরা কাহারও খাতিরে বলিতে পারি না। গ্যালিলিও যে জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তখনকার কালের প্রচলিত খৃস্টানধর্মের সঙ্গে খাপ খায় নাই—তাই বলিয়া এ কথা বলা কি শোভা পাইত যে, খৃস্টান-বেচারার পক্ষে মিথ্যা

জ্যোতির্বিদ্যাই সত্য? তাহাকে কি এই উপদেশ দেওয়া চলিত যে, তুমি খৃস্টান অতএব তোমার উচিত তোমার উপযোগী একটা বিশেষ জ্যোতিষকেই একান্ত শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা?

কিন্তু তাই বলিয়া গ্যালিলিওই কি জ্যোতিষের চরমে গিয়াছেন? তাহা নহে। তবুও তাহা সত্যের দিকে যাওয়া। সেখান হইতেও অগ্রসর হও কিন্তু কোনো কারণেই পিছু হঠা আর চলিবে না; যদি হঠিতে থাকি তবে সত্যের উল্টা দিকে চলা হইবে সুতরাং তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে একটিমাত্র লোকের বোধও যদি দেশের সকল লোকের বোধকে ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাই সমস্ত দেশের লোকের ধর্ম, কারণ তাহাই দেশের সর্বোচ্চ সত্য। অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব করিবে; কিন্তু তুমি যদি বুঝিয়া থাক তবে তোমাকে সকল লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, ইহাই সত্য এবং ইহা সকল লোকেরই সত্য, কেবল একলা আমার সত্য নহে। কেহ যদি জড়ভাবে বলিতে থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারিব না তবে তোমাকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কারণ ইহা সত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের ধর্ম।

ইতিহাসে আমরা কী দেখিলাম? আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মতো অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় এ কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনোমতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বাপকে সকল ছেলে সমান শ্রদ্ধা করে না এবং অনেক ছেলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও থাকে, তাই বলিয়া ছেলেদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, তোমার বাপ বারো-আনা, তোমার বাপ সিকি, এবং তোমার বাপ বাপই নহে, তুমি একটা গাছের ডালকে বাপ বলিয়া গ্রহণ করো—এবং এইরূপে অধিকার-ভেদে তোমরা বাপের সঙ্গে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে থাকো; তাহা হইলেই তোমাদের সন্তানধর্ম পালন করা হইবে। বস্তুত পিতার তারতম্য নাই; তাঁহার সম্বন্ধে সন্তানদের হৃদয়ের ও ব্যবহারের যদি তারতম্য থাকে তবে সেই অনুসারে তাহা-দিগকে ভালো বলিব বা মন্দ বলিব, এ কথা কখনোই বলিব না তুমি যখন এইটুকু মাত্র পার তখন এইটুকুই তোমার পক্ষে ভালো।

সকলেই জানেন যিশু যখন বাহ্য-অনুষ্ঠান-প্রধান ধর্মকে নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্মের বার্তা ঘোষণা করিলেন তখন য়িহুদিরা তাহা গ্রহণ করে নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্মকে নিখিল মানবের ধর্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি এ কথা বলেন নাই, এ ধর্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই, যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম। এ কথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

এ কথা বলাই বাহুল্য উপস্থিতমত মানুষ যাহা পারে সেইখানেই তাহার সীমা নহে। তাহা যদি হইত তবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মউমাছির মতো একই রকম মউচাক তৈরি করিয়া

চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ, মানুষ নহে। আরও বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধুলামাটিপাথর। মানুষ কোনো-একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলই আরওর দিকে গতি, ভূমার দিকে টান, এইখানেই তাহার শ্রেয়। এই শ্রেয়কে রক্ষা করিবার, ইহাকে কেবলই স্মরণ করাইবার ভার তাহার ধর্মের প্রতি। এইজন্যই মানুষের চিত্ত তাহার কল্যাণকে যত সুদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারে তত সুদূরেই আপনার ধর্মকে প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখিয়াছে—সেই মানবচেতনার একেবারে দিগন্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে।

মানুষের শক্তির মধ্যে দুটা দিক আছে, একটা দিকের নাম 'পারে' এবং আর-একটা দিকের নাম 'পারিবে'। 'পারে'র দিকটাই মানুষের সহজ, আর 'পারিবে'র দিকটাতেই তাহার তপস্যা। ধর্ম মানুষের এই 'পারিবে'র সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত 'পারে'কে নিয়ত টান দিতেছে, তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না, তাহাকে কোনো-একটা উপস্থিত সামান্য লাভের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না। এইরূপে মানুষের সমস্ত 'পারে' যখন সেই 'পারিবে'র দ্বারা অধিকৃত হইয়া সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে তখনই মানুষ বীর—তখনই সে সত্যভাবে আত্মাকে লাভ করে। কিন্তু 'পারিবে'র দিকে এই আকর্ষণ যাহারা সহিতে পারে না, যাহারা নিজেকে মূঢ় ও অক্ষম বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা ধর্মকে বলে আমি যেখানে আছি সেইখানে তুমিও নামিয়া এসো। তাহার পরে ধর্মকে একবার সেই সহজসাধ্যের সমতলক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারিলে তখন তাহাকে বড়ো বড়ো পাথর চাপা দিয়া অত্যন্ত সনাতনভাবে জীবিত সমাধি দিয়া রাখিতে চায় এবং মনে করে ফাঁকি দিয়া ধর্মকে পাইলাম এবং তাহাকে একেবারে ঘরের দরজার কাছে চিরকালের মতো বাঁধিয়া রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিলাম। তাহারা ধর্মকে বন্দী করিয়া নিজেরাই অচল হইয়া বসে, ধর্মকে দুর্বল করিয়া নিজেরা হীনবীর্য হইয়া পড়ে, এবং ধর্মকে প্রাণহীন করিয়া নিজেরা পলে পলে মরিতে থাকে; তাহাদের সমাজ কেবলই বাহ্য আচারে অনুষ্ঠানে অন্ধসংস্কারে এবং কাল্পনিক বিভীষিকার কুজ্ঝটিকায় দশ দিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুত ধর্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনই তাহা মানুষের শিরোধার্য হইয়া উঠে, আর যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্য কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার শ্রেয়, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্বিচারে যোগ দেওয়াই তোমার পুণ্য, ধর্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নীচে নামিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের সঙ্গে আপস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না; একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে পুণ্যকে সস্তা করিবার জন্য বলিয়াছে, কোনো বিশেষ তিথিনক্ষত্রে কোনো বিশেষ জলের ধারায় স্নান করিলে কেবল নিজের নহে, বহুসহস্র পূর্বপুরুষের সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। পাপ দূর করিবার এতবড়ো সহজ উপায়ের কথাটা বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত লোভ হয় সন্দেহ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার ধর্মশাস্ত্রের এই কথায় আপনাকে কিছুপরিমাণে ভুলায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলানো তাহার পক্ষেও অসাধ্য। একজন বিধবা রমণী একবার মধ্যরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের পরে পীড়িত শরীর লইয়া যখন গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'আপনি কি এ কথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে পাপ জিনিসটাকে ধুলামাটির মতো জল দিয়া ধুইয়া ফেলা সম্ভব? অথচ অকারণে আপনার শরীর-ধর্মের বিরুদ্ধে এই যে পাপ করিতে যাইতেছেন ইহার ফল কি আপনাকে পাইতে হইবে না?' তিনি বলিলেন, 'বাবা, এ তো সহজ কথা, তুমি যাহা

বলিতেছ তাহা বেশ বুঝি কিন্তু তবু ধর্মে যাহা বলে তাহা পালন না করিতে যে ভরসা পাই না।' এ কথার অর্থ এই যে, সেই রমণীর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের উপরে উঠিয়া আছে।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেখো। একাদশীর দিনে বিধবাকে নির্জল উপবাস করিতে হইবে ইহা আমাদের দেশে লোকাচারসম্মত অথবা শাস্ত্রানুগত ধর্মানুশাসন। ইহার মধ্যে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে স্বভাবত আমাদের প্রকৃতিতে তাহা বর্তমান নাই। এ কথা কখনোই সত্য নহে স্ত্রীলোককে ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত করিতে আমরা সহজে দুঃখ পাই না। তবে কেন হতভাগিনীদিগকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দুঃখ দিই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আর-কোনো যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজিয়া পাই না, কেবল এই কথাই বলিতে হয় আমাদের ধর্মে বলে বিধবাদিগকে একাদশীর দিনে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিবে না, এমন-কি, মরিবার মুখে রোগের ঔষধ পর্যন্ত সেবন করানো নিষেধ। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম আমাদের সহজবুদ্ধির চেয়ে অনেক নীচে নামিয়া গেছে।

ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাহাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না— কখনোই তাহারা আপনাকে হীনবর্ণ বন্ধু অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠতা জাতিবর্ণের অপেক্ষা রাখে না তাহা তাহারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আহারকালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল— সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণ-কালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতি-অসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান? এতটা মানবঘৃণা আমাদের জাতির মনে স্বভাবতই আছে এ কথা আমি তো স্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত এখানে স্পষ্টই আমাদের ধর্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপে মানুষ ধর্মকে যখন আপনার চেয়েও নীচে নামাইয়া দেয় তখন সে নিজের সহজ মনুষ্যত্বও যে কতদূর পর্যন্ত বিস্মৃত হয় তাহার একটি নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমার মনে যেন আগুন দিয়া চিরকালের মতো দাগিয়া রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি একজন বিদেশী রোগী পথিক পল্লী-গ্রামের পথের ধারে তিন দিন ধরিয়া অনাশ্রয়ে পড়িয়া তিল তিল করিয়া মরিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই মস্ত একটা পুণ্যস্নানের তিথি পড়িয়াছিল— হাজার হাজার নরনারী কয় দিন ধরিয়া পুণ্য-কামনায় সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনও বলে নাই এই মুমূর্ষুকে ঘরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি এবং তাহাতেই আমার পুণ্য। সকলেই মনে মনে বলিয়াছে, জানি না ও কোথাকার লোক, ওর কী জাত— শেষকালে কি ঘরে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তের দায়ে পড়িব? মানুষের স্বাভাবিক দয়া যদি আপনার কাজ করিতে যায় তবে ধর্মের রক্ষকস্বরূপে সমাজ তাহাকে দণ্ড দিবে। এখানে ধর্ম যে মানুষের হৃদয়প্রকৃতির চেয়েও অনেক নীচে নামিয়া বসিয়াছে।

আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না— অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ? আমরা নিজে যাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা ও সাহায্য লইতে দ্বিধা করি না তাহাদিগকে সকল প্রকার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করাকেই আমাদের ন্যায়বুদ্ধি কি সত্যই সংগত বলিতে পারে? কখনোই না। কিন্তু মানুষকে

এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের হৃদয় দুর্বল বলিয়াই যে আমরা এইরূপ অবিচার করি তাহা নহে, ইহাই আমাদের কর্তব্য এবং ইহাই না করা আমাদের স্খলন বলিয়া করিয়া থাকি। আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নীচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নরনারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মতো পীড়ন করিয়া চলিয়াছে!

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ তো য়ুরোপেও আছে; সেখানেও তো অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে চান না। ইঁহাদের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা সত্য—কিন্তু ধর্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপস করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া বসিবে? ধর্ম কি আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না? চোর তো সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিস্ট্রেট সুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে! কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনোমতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে?

এরূপ অদ্ভুত তর্ক আমাদের মুখেই শোনা যায় যে, যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, মদমাংস যাহারা খাইবেই এবং পাশবতা যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, ধর্মের সম্মতি-দ্বারা যদি তাহাদের পাশবতাকে নির্দিষ্টপরিমাণে স্বীকার করা যায়—যদি বলা যায় এইরূপ বিশেষ ভাবে মদমাংস খাওয়া ও চরিত্রকে কলুষিত করা তোমাদের পক্ষে ধর্ম, তবে তাহাতে দোষ নাই, বরং ভালোই। এরূপ তর্কের সীমা যে কোন্‌খানে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমনতরও স্বভাবপাপিষ্ঠ অমানুষ দেখা যায় নরহত্যায় যাহারা আনন্দ বোধ করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য ঠগিধর্মকেই ধর্ম বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত এ কথাও বোধ হয় আমাদের মুখে বাধিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক নিজের গলাটা তাহাদের ফাঁসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে-মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ছোটো ছোটো ভেলা তৈরি করা হয়—তাহাতে মহাসমুদ্রের যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া হাঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র। কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই, কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়কুটা যাহা খুশি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক-না—তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য ধর্মতরীকে টুকরা করিয়াই কি চিরদিনের মতো সর্বনাশ ঘটাইতে হইবে?

এ কথা আবার বলিতেছি, ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না, দুর্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই তো মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজয়, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্মের বলেই মানুষ যাহা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাহা হইয়া উঠিবে বলিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ধর্মের মুখ দিয়াই মানুষ যদি মানুষকে এমন কথা কেবলই বলাইতে থাকে যে, 'তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না', তবে তাহার মূঢ়তা ঘুচাইবে কে, যদি বলায় 'তুমি অক্ষম, তুমি পারিবে না', তবে তাহাকে শক্তি দান করে জগতে এমন সাধ্য আর কাহার আছে?

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই; অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো। কতশত লোক পিতা পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে—মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই; তোমাদের কাছে ধর্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। তোমরা স্থূলকে

লইয়াই থাকো, চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ঐখানেই নীচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্মের ফললাভ করিতে পারিবে।

অথচ হীনতম মানুষেরও একটিমাত্র সম্মানের স্থান আছে ধর্মের দিকে—তাহার জানা উচিত সেইখানেই তাহার অধিকারের কোনো সংকোচ নাই। রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল, সংসারের ক্ষেত্রেই তাহাদের যত-কিছু প্রতাপ প্রভুত্ব—ধর্মের ক্ষেত্রে দীনহীন মূর্খেরও অধিকার কোনো কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সংকীর্ণ করিবার ভার কোনো মানুষের উপর নাই। ধর্মই মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো আশা—সেইখানেই তাহার মুক্তি, কেননা সেইখানেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সেইখানেই তাহার অন্তহীন সম্ভাব্যতা, ক্ষুদ্র বর্তমানের সমস্ত সংকোচ সেইখানেই ঘুচিতে পারে। অতএব সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই খণ্ডিত কর না, ধর্মের দিকে কোনো মানুষের জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এতবড়ো স্পর্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের নাই।

ধর্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পার—তুমি কে যে তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অন্তর্যামী? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহংকার রাখ? তুমি লোকসমাজ, তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন—তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ—তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশকালপাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসংগত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ংকর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড নিষ্পেষিতপৌরুষ নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও তাহার উত্তর কোথাও নাই—কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে; চারি দিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পুরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মূঢ় তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেননা তুমি অক্ষম; সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তীকালের সহিত তোমাকে আপাদমস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কেননা নূতন করিয়া নিজের কল্যাণচিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই। নিষেধজর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এতবড়ো সর্বদেশব্যাপী ভয়ংকর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে?

দুর্গতি তো প্রত্যক্ষ, আর তো কোনো যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব? আমাদের দেশে ব্রহ্মের ধ্যানে পূজার্চনায় যে বহুবিচিত্র স্থূলতার প্রচার হইয়াছে তর্ককালে তাহাকে আমরা চরম বলিয়া মানি না। আমরা বলিয়া থাকি, যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার যে অবস্থায় আছে এ দেশে তাহার জন্য সেইপ্রকার আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমশ স্বতই উচ্চতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জানিতে চাই অনন্ত কালের অসংখ্য মানুষের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য সেরূপ উপযুক্ত আশ্রয় গড়িতে পারে এমন সাধ্য কাহার! সমস্ত বিচিত্রতাকেই স্থান দিবে, বাধা দিবে না, এতবড়ো বিশ্বকর্মা মানবসমাজে কে আছে?

বস্তুত মানুষের অসীম বৈচিত্র্যকে যাহারা সত্যই মানে তাহারা মানুষের জন্য অসীম স্থানকেই ছাড়িয়া রাখে। ক্ষেত্র যেখানে মুক্ত, বৈচিত্র্য সেখানে আপনি অবাধে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। এইজন্যই যে-সমাজে জাগ্রত ও নিদ্রিত কালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা সেখানে

মানুষের চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই একছাঁচে গড়া নির্জীব ভালো-মানুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটিমাত্র বা কয়টিমাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাক, তবে সেই উপায়ে সত্যই কি মানুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চিরধাবমান পরিণতিপ্রবাহকে সাহায্য করা হয়? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বন্ধ করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় না?

এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, কর্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবলপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া ছোটো ছোটো জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে তবে কি সেই হতভাগ্যদের উপকার করা হইত? মানবচিত্তের চিরবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মতো আটক করা যাইতে পারে এ কথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত্র। ছোটো হইতে বড়ো, অবোধ হইতে সুবোধ পর্যন্ত সকলেই এই একই অসীম জগতে বাস করিতেছে বলিয়াই প্রত্যেকেই আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার মধ্য হইতে আপন শক্তির পরিমাণ পুরা প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সেইজন্যই শিশু যখন কিশোর বয়সে পৌঁছিতেছে তখন তাহাকে তাহার শৈশবজগৎটা বলপূর্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে হইতেছে না। তাহার বুদ্ধি বাড়িল, শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল তবু তাহাকে নূতন জগতের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইল না। নিতান্ত অর্বাচীন মূঢ় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সকলেরই পক্ষে এই একই সুবৃহৎ জগৎ। কিন্তু নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তা-বশত মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেইখানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়ংকর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কোনোমতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মতো সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মানুষকে না মারিয়া তাহাকে গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট করো, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটা সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলো। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মানুষ তো মানুষকে এইরূপ নির্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায়; সেইজন্যই তো মানুষ নির্লজ্জ ভাষায় এমন কথা বলে যে, আপামর সকলকেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমরা আর চাকর পাইব না; স্ত্রীলোককে যদি বিদ্যাদান করা যায় তবে তাহাকে দিয়া আর বাটনা বাটানো চলিবে না; প্রজাদিগকে যদি অবাধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তাহারা নিজের সংকীর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত সত্য, মানুষকে কৃত্রিমশাসনে বাঁধিয়া খর্ব করিতে না পারিলে কোনোমতেই তাহাকে একই স্থানে চির-কালের মতো স্থির রাখিতে পারিবে না। অতএব যদি কেহ মনে করেন ধর্মকেও মানুষের অন্যান্য শত শত নাগপাশবন্ধনের মতো অন্যতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মতো একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শতসহস্র নিষেধের দ্বারা বিভীষিকা-দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার রুচি যেন বন্দী থাকে, সামান্য ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গলচিন্তায়

সে যেন নিজের বুদ্ধিবিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্রপার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া একই পাথরে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে।[১]

কিন্তু তার্কিকের সহিত তর্ক করিতে গিয়া আমি হয়তো নিজের দেশের প্রতি অবিচার করিতেছি। এই যে দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্মচিন্তায় স্থূলতা এবং আমাদের ধর্মকর্মে মূঢ়তা নানা রূপ ধরিয়া আজ সমস্ত দেশকে পর্দার উপর পর্দা ফেলিয়া বহুস্তরের অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহা কোনো একদল বিশেষ বুদ্ধিমানে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঘটায় নাই। যদিও আমরা অহংকার করিয়া বলি ইহা আমাদের বহুদূরদর্শী পূর্বপুরুষদের জ্ঞানকৃত কিন্তু তাহা সত্য হইতেই পারে না— বস্তুত ইহা আমাদের অজ্ঞানকৃত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কখনোই সত্য নহে যে, আমরা অধিকারভেদ চিন্তা করিয়া মানুষের বুদ্ধির ওজনমত ভিন্ন অবস্থার উপযোগী পূজার্চনা ও আচারপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের ঘাড়ে আসিয়া যাহা চাপিয়া পড়িয়াছে তাহাই আমরা বহন করিয়া লইয়াছি। ভারতবর্ষে আর্যেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্মকে সভ্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল, পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনি করিয়া একদিন ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির ঐক্যধারা বিভক্ত ও বিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা নিকৃষ্ট জাতির নানাপূজাপদ্ধতি আচারসংস্কার কথাকাহিনী তাঁহাদের সমাজের ক্ষেত্রে জোর করিয়াই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্য ও কুৎসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই-সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা-কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে, সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্যকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়। কাঁটাগাছের সঙ্গে শস্যের যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে পারে এমন কৃষক কোথায়! তাই আজ আমরা যেখানকার যত আগাছাকেই স্বীকার করিয়াছি; জঙ্গলে সমস্ত খেত একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে; সেই-সমস্ত আগাছার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঠেলাঠেলি চাপাচাপি চলিতেছে, আজ যাহা প্রবল, কাল তাহা দুর্বল হইতেছে, আজ যাহা স্থান পাইতেছে কাল তাহা স্থান পাইতেছে না, আবার এই ভিড়ের মধ্যে কোথা হইতে বাতাসে বাহিরের বীজ উড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের কোন্ এক কোণে রাতারাতি আর-একটা অদ্ভুত উদ্ভিদকে ভুঁই ফুঁড়িয়া তুলিতেছে। এখানে আর সমস্ত জঞ্জালই অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, একমাত্র নিষেধ কেবল কৃষকের নিড়ানির বেলাতেই; যাহা-কিছু হইতেছে সমস্তই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে হইতেছে— পিতামহেরা এককালে সত্যের যে

---

[১] এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অধিকারভেদ চিরন্তন নহে, তাহা সাধনার অবস্থাভেদ মাত্র। কিন্তু আমাদের যে সমাজে বর্ণবিশেষের পক্ষে ধর্মের উচ্চতম অধিকার মুক্ত ও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে তাহা রুদ্ধ সেখানে কি এমন কথা বলা চলে? একে তো প্রত্যেক মানুষের অধিকার কোনো কৃত্রিম নিয়মে কেহই স্থির করিয়া দিতেই পারে না, তৎসত্ত্বে যদিবা দেখিতাম সমাজে সেই চেষ্টা সজীব হইয়া আছে, যদি দেখিতাম কখনো বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যাইতেছে ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলেও অন্তত ইহা বুঝিতে পারিতাম এখানে মানুষের অধিকারলাভ তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে সমাজের এবং ধর্মের অধিকার-ভেদ হয়তো এককালে সচল ও সজীবভাবে ছিল— কিন্তু যখনি তাহা সচলতা হারাইয়াছে তখনি তাহা আমাদের পথের বাধা হইয়াছে, যখনি তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে না তখনি তাহা আমাদের জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক পুরাকালে আর্যসমাজ কী নিয়মে চলিত তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহার শস্য কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না। কেহ যদি সেই শস্যের দিকে তাকাইয়া জঙ্গলে হাত দিতে যায় তবে ক্ষেত্রপাল একেবারে লাঠি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে, বলে, এই অর্বাচীনটা আমার সনাতন খেত নষ্ট করিতে আসিয়াছে। এই-সমস্ত নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জনাকে লইয়া নির্বিচারে আমরা কেবলই একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য ও অনার্য অসম্বন্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি; ইহার ভয়ংকর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলিলুণ্ঠিত, কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; এই বিমিশ্রিত বিপুল বোঝাটাই তাহার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; এই বোঝাকে কোনো দিকে কিছুমাত্র হ্রাস করিতে গেলেই সেটাকে সে অধর্ম বলিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে; এবং দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতেও আজ সেই জাতির শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব করিতে থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই, অন্ধসংস্কারের এরূপ বাধাহীন একাধিপত্য আর কোনো সমাজে দেখা যায় না, সকল প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের এরূপ প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই, এবং পরস্পরের মধ্যে এত ভেদ এত পার্থক্যকে আর কোথাও এমন করিয়া চিরদিন বিভক্ত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে—অতএব বিশ্বসংসারে একমাত্র হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ সমান নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না—সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলতম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাক্, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসিকতাই সনাতন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহাকে একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম বলিয়া সম্মান করে।

মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য। যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্মই তাহাকে দান করে। এই কারণে মানুষ আপন ধর্মের আদর্শকে আপন তপস্যার সর্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্মের মতো সর্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নীচে রাখিলে সে নীচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অন্তরের দিকে আসন না দিয়া যদি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্মের উপরেই দেশকালপাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্মকে হাত-পা বাঁধিয়া নির্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে; ধর্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর-এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সংকুচিত ও শতখণ্ড করিয়া ফেলে; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভাসমিতি কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স্‌ এমন কোনো বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সংকট হইতে উদ্ধার পাইলে আর-এক সংকটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অনুগ্রহপূর্বক সম্মানদান করিলে আর-এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনোই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া

আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি, তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো ফল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই; রক্ষার উপায়কে কেবলই বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্বল আত্মার মূঢ়তা—ইহাই ধ্রুব সত্য যে, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

১৩১৮

আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ঐ তারাগুলির মধ্যে যে-খুশি সেই আপন শাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতি বড়ো নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তারা একটু নড়ে না পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বললেন, তুমি কোন্ সাবেককালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ, ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা। একেবারে নিছক কবিত্ব!

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতোই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার করেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রি-টুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ ক'রে বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক।

আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে তো তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখছ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারছ বলেই বলছ ওরা চলছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উল্টো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা তো মান না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে, কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এইজন্যই তো আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহংকার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে—অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্‌ মুখে বলবে, তারাগুলো ছুটোছুটি করে মরছে? মধ্যাহ্নসূর্যকে চোখে দেখতে গেলে কালো কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় দুর্দর্শরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখব বলেই পৃথিবী এই কালো রাত্রিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কী দেখি? সমস্ত শান্ত, নীরব। এত শান্ত, এত নীরব যে আমাদের হাউই, তুবড়ি, তারাবাজিগুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আসতে ভয় করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির। তখন তারা যেন গজমুক্তার সাতনলী হার। জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কোনো তারাকে দেখে তখন দেখতে পায় সে চলছে—তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলটল করে গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে? বিশ্বতারা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ভাষা নিতান্ত সরল—একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দু-একটা তারা তাদের বিশ্বাসন থেকে নীচে নেমে এসে গণিত শাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কী সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর-এক কথা। যারা স্বদলের সম্বন্ধ ছেড়ে এসে পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে সেই-সমস্ত অ্যাপ্রুভরদেরই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই-সমস্ত অ্যাপ্রুভররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। বিস্তারিত খবরের জোর বড়ো বেশি। সমস্ত পৃথিবী বলছে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন ক'রে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত-কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারও প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমাদের দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়োচ্ছে তাতে দোষ কী? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা বলে জানা বলে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর-এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন

ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র, যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্বেই ব্যবহার করেছি, এখনো ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যেই স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

যদি এই পাতাটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে একে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ঐ পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বললেই হয়।

এই তো গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনিই থাকত অথচ গাছের ঐ পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতের যে-সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চলছে তারা আমাদের চার দিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছি নে এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর-একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যাঁরা বহুসময়সাধ্য দুরূহ অঙ্ক এক মুহূর্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিত্ত যে কালকে আশ্রয় করে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু দ্রুত কাল— সেইজন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে তাঁরা অঙ্কফলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখতেই পাই নে, এমন-কি, তাঁরা নিজেরাই দেখতে পান না।

আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলেম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমোই নি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাকতুম তা হলে হয় স্বপ্ন এত দ্রুতবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয়তো সেই স্বপ্নবর্তীকালের রেলগাড়িতে করে চলে যাওয়ার দরুন স্বপ্নের বাইরের জগৎটা রেলগাড়ির বাইরের দৃশ্যের মতো বেগে পিছিয়ে যেতে থাকত; তার কোনো একটা জিনিসের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে-ঘোড়া দৌড়োচ্ছে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশঘণ্টা করতে পারি তা হলে দেখব তার পা উঠছেই না। ঘাস প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে অথচ আমরা তা দেখতেই পাচ্ছি নে। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জানতে পারি ঘাস বাড়ছে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তা হলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড়-পর্বতের মতোই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যে কালের তালে চলছে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখছি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা চলছে। কালের পরিবর্তন হলে হয়তো দেখতুম বটগাছটা চলছে কিংবা নদীটা নিস্তব্ধ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্বত সূর্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি। যেন আমার মন আয়নামাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিসকে একরকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিসকে অন্যরকম দেখে, দ্রুতকালের গতিতে একরকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্যরকম দেখে—এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক হাত আধ হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছাকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখছে তা নয়, লোহার পরমাণুকেও নিবিড় এবং স্থির দেখছে—যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখত তা হলে দেখত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেইজন্যেই লোহা হচ্ছে লোহা, জল হচ্ছে জল, মেঘ হচ্ছে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে সমস্তকে দেখতে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলে। অবশেষে অণুপরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি তো অণু-পরমাণু নয়—দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি। ঈথর পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয়, আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি-দ্বারা যা দেখছি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন ব'লে। তিনি বলবেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি—কারণ আমার বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন তোমার বোধ আর-এক কথা বলে।

আমি বলি, ঐ তো হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি তো কলের সৃষ্টি নয়, সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বলবেন—এক-এক মন এক-এক রকমের সৃষ্টি যদি করে বসে তা হলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি, তা তো হয় নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্ছে, আমার এক-টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত তা হলে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্‌ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেইজন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না, মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করছেন, এই মন পদার্থটা কী শুনি।

আমি উত্তর করি যে, ঈথর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এ-সব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। খ্যাপার বংশ সনাতন-কাল থেকে চলে আসছে। তাই পুরাতন ঋষি বলছেন—

অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র করে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তা হলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে? সেইজন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সংকুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা করলে এ কথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করছি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম করে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত আর-এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে এ কথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেইজন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাকতে পারে না। আপনাকে সেই জানে না যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন বলে জানে না।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই—আমি সে দিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য। অণু-পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার-আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয়সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায়, সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। আমি

এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়—সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে—তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত। কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্যমাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, কিন্তু কবি বলছে, আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন সেই তো এই বিশ্বসংগীত নইলে কিছুই বাজত না। বীণার তার একটি নয়—লক্ষ তারে লক্ষ সুর—কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়, এ যে প্রাণবান—এইজন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে, তা নয়; এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই; কোথাও গিয়ে সে থামবে না; মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব রস আদায় করে নেবেন এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন। আমি ধন্য যে আমি পান্থশালায় বাস করছি নে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয় নি। এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেইজন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

১৩২১

মানুষের ধর্ম

প্রকাশ : ১৯৩৩

ভূমিকা

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু-সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৮ মাঘ ১৩৩৯

পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র: পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে, এমন কর্মকে, সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে। যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল; অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা; গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়; খৃস্টের বাণীতে শুনলে, বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয়, পবিত্রতা চিত্তের নির্মলতায়। তখন মানবের রুদ্ধ মনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন হল। এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে।

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব। ঋগ্‌বেদে সেই বিশ্বমানবের কথা বলেছেন;

• পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—

তাঁর এক চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে। মানুষ যে দিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতিকে, প্রত্যক্ষকে, অতিক্রম করে সত্য সেই দিকে সে মৃত্যুহীন; সেই দিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেই দিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে

রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট; সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণ-যোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারি দিকে ফাঁক। এক দিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-এক দিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।

শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোষগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক, সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবন-প্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়; সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোষগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তা হলে এক দিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হত না। কেননা এই দেহ শুধু যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়, এই দেহে রয়েছে তার অতীত, অপেক্ষা করছে তার ভবিষ্যৎ। আরও একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তা ছাড়াও সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোষের আছে, যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরে গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ— কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়— আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।

ডিমের ভিতরে যে পাখির ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে-বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থই নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ। এই অপরিণত ডানার সংকেত জানিয়ে দেয়, ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনিই মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবনযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্ন-

তলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহারবিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট। তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্যন্ত পেঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানলা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বন্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়। সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারই বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন। ঐ প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলছে হাজার লক্ষ প্রাণীর। কিন্তু মানুষকে অস্থির করে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরোল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।

দেহের দিকে মানুষকে বিচার করে দেখা যাক। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন কথা বলা চলে না যে, দাঁড়াবে না তো কী। দাঁড়ানো সহজ নয়। পাখির দেহের ছন্দটা দ্বিপদী। মানুষের দেহটা চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে বানানো। চার পায়ের উপর লম্বা দেহের ওজন সামনে পিছনে ভাগ করে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হতে পারত। কিন্তু মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এজন্যে সে অসুবিধে সইতেও রাজি। চলমান দীর্ঘ দেহটার ভাররক্ষার সাধনা করলে ঐ দুই পায়ের উপরেই। সেটা সহজসাধ্য নয়, ছেলেদের প্রথম চলার অভ্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। শেষ বয়সে বৃদ্ধকে লাঠির উপর ভর দিতে হয়, সেও একটা প্রমাণ। এও দেখা যায়, চার-পেয়ে জন্তু যত সহজে ভার বহন করতে পারে মানুষ তা পারে না—এইজন্যেই অন্যের 'পরে নিজের বোঝা চাপাবার নানা কৌশল মানুষের অভ্যস্ত। সেই সুযোগ পেয়েছে বলেই যত পেরেছে ভার-সৃষ্টি করেছে। তাকে পরিমিত করবার চেষ্টা নেই। মানুষের এই চালটা যে সহজ নয় তার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশংকা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্ততভঙ্গি নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়াল।

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। পুরাণে বলে ব্রহ্মার পায়ের থেকে শূদ্র জন্মেছে, ক্ষত্রিয় হাতের থেকে।

মানুষের দেহে শূদ্রের পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে, পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হল তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে whole-time

কর্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়— অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে হিসাবি লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'এ-সব কেন।' একমাত্র তার উত্তর, 'আমার খুশি'। তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে তার শিল্পকলায় এই এক উত্তর 'আমার খুশি'। মাথাতোলা মানুষের এতবড়ো গর্ব। জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত। বিড়ালছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুর-ছানার খেলা নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভান। কিন্তু মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী-রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশ-কুসুমের কুঞ্জবন। এই-সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের খেতে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলাভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি, হাল-লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা বাহুল্য, দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী, গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তা ছাড়া মানুষ অকারণে কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে; এমন-কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি, মানুষের অন্নের খেত প্রকৃতির এলেকায় থাকতে পারে দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর তলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব স্বাধীন দায়িত্ব; তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্ব-ভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে; ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দলাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে, সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্র প্রিয়োভবতি।

জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, 'অয়মহং ভোঃ! এই-যে আমি।' সেই দিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানা ভাবে নানা রূপে নানা ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল 'আমি কী'। ঠিক উত্তরটিতে তার আনন্দ, তার গৌরব। জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়। সনাতন গণ্ডারের মতো স্থূল ব্যবহারে গণ্ডার যদি কোনো বাহ্য বাধা না পায় তা হলে আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, মানুষ কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্বরদশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেছে, সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে; এই রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটিত হতে হতে তবে সে আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোনো সত্তার স্বরূপকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার

চেষ্টা করছে, আদর্শরূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত। এমনি করে বড়ো ভূমিকায় নিজের সত্যকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে তার অহৈতুক আগ্রহ। যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই সে প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে 'আমি কী—আমার চরম মূল্য কোথায়'। বলা বাহুল্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয়-কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকলরকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।

জীবসৃষ্টির প্রকাশপর্যায়ে দেহের দিকটাই যখন প্রধান ছিল তখন দেহসংস্থানঘটিত ভ্রম বা অপূর্ণতা নিয়ে অনেক জীবের ধ্বংস বা অবনতি ঘটেছে। জীবসৃষ্টির প্রকাশে মানুষের মধ্যে যখন 'আমি' এসে দাঁড়াল তখন এই 'আমি' সম্বন্ধে ভুল করলে দৈহিক বিনাশের চেয়ে বড়ো বিনাশ। এই আমিকে নিয়ে ভুল কোথায় ঘটে সে প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন আমাদের সকল মহাপুরুষ। তাঁরা এই অদ্ভুত কথা বলেন, যেখানে আমিকে না-আমির দিকে জানতে বাধা পাই, তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি। এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র—এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীতকালের তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান, বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।

ভবিষ্যৎকাল অসীম, অতীতকালও তাই। এই দুই দিকে মানুষের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট। পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্'। যা ভূত, যা ভাবী, এই সমস্তই সেই পুরুষ। মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো-এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত। তাই প্রায় সকলজাতীয় মানুষের পুরাণে দেখা যায় সত্যযুগের কল্পনা অতীতকালের। সে মনে করে, যে আদর্শের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ কোনো-এক দূরকালে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ আকারে। সেই পুরাণের বৃত্তান্তে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পায় যে, অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে

তাই প্রমাণিত হতে থাকবে। যে গানটি পূর্বেই সম্পূর্ণ রচিত গাওয়ার দ্বারাই সেটা ক্রমশ প্রকাশমান, এও তেমনি। মনুষ্যত্বের আদর্শ এক কোটিতে সমাপ্ত, আর-এক কোটিতে উপলভ্যমান। এখনকার দিনে মানুষ অতীতকালে সত্যযুগকে মানে না, তবু তার সকলপ্রকার শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা। কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য বলে জানে দূরদেশে ভাবীকালে সেও তাকে সার্থক করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অগোচর ভবিষ্যতেই নিজেকে সত্যতররূপে অনুভব করে বলেই তার প্রত্যক্ষ বর্তমানকে বিসর্জন দেওয়া সে ক্ষতি মনে করে না। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনো আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছন নি। বরযাত্রীরা আসছে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করছে, বরের বাজনা আসছে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেছে দুর্গম পথে। এই-যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ— এই-যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত— তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায়, যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ও-পারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তা হলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা-কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সংকল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সে আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে, নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিকে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে; কিন্তু তার মন বলছে, এই-সমস্তেরই সত্য রয়েছে সীমার অতীতে— এই সীমাকে যদি প্রশ্ন করি তার শেষ উত্তর পাই নে এই সীমার মধ্যেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়।

দাল্‌ভ্য বললেন, ‘এই পৃথিবীতেই।’ স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়, বোধ করি দাল্‌ভ্যের এই ছিল মত।

প্রবাহণ বললেন, ‘তা হলে তোমার সত্য তো অন্তবান হল, সীমায় এসে ঠেকে গেল যে।’

ক্ষতি কী তাতে। ক্ষতি এই যে, সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি মানত তা হলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণঠেসা করে ধরেছেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন-কিছুতে ঠেকেছেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। বললে কী হবে। অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজা, তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। তিনি বললেন,

অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম, অন্তবদ্‌ বৈ কিল তে সাম।

আদিভূতের যে বস্তুসীমায় প্রশ্ন এসে থেমেছিল সে সীমাও পেরোল। আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসংকেতে, কোনো বোধগম্যতায় নয়। একদিন আলোকের

তত্ত্বকে মানুষ বোধগম্যতার পরপারেই স্থাপন করেছিল। অদ্ভুত কথা বলেছিল, 'ঈথরের ঢেউ' জিনিসকেই আলোকরূপে অনুভব করি। অথচ ঈথর যে কী আমাদের বোধের ভাষায় তার কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। আলো, যা আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল ভৌতিক জিনিসকে প্রকাশ করে দাঁড়াল তা এমনকিছুর প্রকাশ যা সম্পূর্ণই ভৌতিক ধর্মের অতীত, কেবল ব্যবহারে মাত্র জানা যায় যে তাতে নানা ছন্দের ঢেউ খেলে। কিন্তু, প্রবাহণের গণনা থামে না। খবর আসে, কেবল তরঙ্গধর্মী বললে আলোর চরিত্রের হিসাব পুরো মেলে না, সে কণিকাবর্ষীও বটে। এই-সব স্ব-বিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা। তবু বোধাতীতের ডুবজলেও মানুষ ভয় পেলে না। পাথরের দেয়ালটাকেও বললে বিদ্যুৎকণার নিরন্তর নৃত্য। সন্দেহ করলে না যে, হয়তো বা পাগল হয়ে গেছি। মনে করলে না, হয়তো প্রজ্ঞা, যাকে বলে রীজ্‌ন্‌, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজি-খেলোয়াড়; সব জিনিসকে একেবারে উল্টিয়ে ধরাই তার ব্যাবসা। পশুরা যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল। বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করছে। বলছে, সে যাকে যেরকম জানছে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণই উল্টো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এরকম লাইবেল প্রচার করে না। তাদের বোধের কাছে যেটা যা সেটা তাই, অর্থাৎ তাদের কাছে কেবল আছে তথ্য, তাদের অবিচলিত নিষ্ঠা প্রতীয়মানের প্রতি। তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে। তাদের সমস্ত দায় ঐ একতলাটাতেই। মানবজগতের আয়তনে বেধ আছে, যা চোখে পড়ে তার গভীরে। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকেও নইলে নয়।

অন্যান্য বস্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। বলেছে, অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।

এটা নিতান্তই বেহিসাবি কথা হল। হিসাববুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, যা যথেষ্ট সেটাই ভূরি-ভোজের সমান-দরের। শাস্ত্রেও বলছে, সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। তবেই তো দেখছি, সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ, এই দুটো উল্টো কথা সামনে এসে দাঁড়াল। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু, অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিত-মানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোটো মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ করে থাকে; বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন-কি, ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।

উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর, স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে, ভূমৈব সুখম্। কিন্তু, যে স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে— দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

জন্তুর অবস্থাও যেমন, স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা, কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে। তার যা পাওনা তার বেশি তার দাবি নেই। মানুষ বলে বসল, 'আমি চাই উপরি-পাওনা।' বাঁধা বরাদ্দের সীমা আছে, উপরি-পাওনার সীমা নেই। মানুষের জীবিকা চলে বাঁধা বরাদ্দে, উপরি-পাওনা দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহিমা।

জীবনধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ বিরাট। তার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমসলা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহযন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলই টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।

এই প্রাণচেষ্টাতে মানুষের শুধু কেবল অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব নয়, পরিমিতের সঙ্গে অপরিমিতের। বাঁচবার দিকেও তার উপরি-পাওনার দাবি। বড়ো করে বাঁচতে হবে, তার অন্ন যেমন-তেমন নয়; তার বসন, তার বাসস্থান কেবল কাজ চলাবার জন্যে নয়—বড়োকে প্রকাশ করবার জন্যে। এমন-কিছুকে প্রকাশ, যাকে সে বলে থাকে 'মানুষের প্রকাশ', জীবনযাত্রাতেও যে প্রকাশে ন্যূনতা ঘটলে মানুষ লজ্জিত হয়। সেই তার বাড়তি ভাগের প্রকাশ নিয়ে মানুষের যেমন দুঃসাধ্য প্রয়াস এমন তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যও নয়। মানুষের মধ্যে যিনি বড়ো আছেন, আহারে বিহারেও পাছে তাঁর অসম্মান হয় মানুষের এই এক বিষম ভাবনা।

ঋজু হয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে ভারাকর্ষণের বিরুদ্ধে মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। পশুর মতো চলতে গেলে তা করতে হত না। মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলাতেও তার নিয়ত চেষ্টা, পদে পদেই নীচে পড়বার শঙ্কা। এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানবধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের। মানুষের ইতিহাসে এই পশুও আদিম। সে টানছে তামসিকতায়, মূঢ়তার দিকে। পশু বলছে, 'সহজধর্মের পথে ভোগ করো।' মানুষ বলছে, 'মানবধর্মের দিকে তপস্যা করো।' যাদের মন মন্থর—যারা বলে, যা আছে তাই ভালো, যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তারা রইল জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে; তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। তারা পূর্বসঞ্চিত ঐশ্বর্যকে বিকৃত করে, নষ্ট করে।

মানুষ এক দিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর-এক দিকে অমৃতে; এক দিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর-এক দিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে, তদ্দূরে তদ্‌বন্তিকে চ—সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবি নিকটের মানুষের সব-কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই অপ্রত্যক্ষের দিকে মানুষের কল্পনাবৃত্তি দৌত্য করে। ভুল করে বিস্তর, যেখানে থই পায় না সেখানে অদ্ভুত সৃষ্টি দিয়ে ফাঁক ভরায়; তবুও এই অপ্রতিহত প্রয়াস সত্যকেই প্রমাণ করে, মানুষের এই একটি আশ্চর্য সংস্কারের সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে আজও তার জানা পৌঁছয় নি সেখানেও শেষ হয় নি তার জানা।

গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। জ্বলে বলেই জ্বলে, এই জেনে চুপ করে থাকলে মানুষের বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া যেত না। জানবার নেই বলেই জানা যাচ্ছে না, এ কথাটা সংগত নয় তো কী। কিন্তু, মানুষ ছেলেমানুষের মতো বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে কেন। বুদ্ধির বেগার-খাটুনি শুরু হল। খুব সম্ভব গোড়ায় ছেলেমানুষের মতোই জবাব দিয়েছিল; হয়তো বলেছিল, গাছের মধ্যে একটা রাগী ভূত অদৃশ্যভাবে বাস করে, মার খেলে সে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। এইরকম সব উত্তরে মানুষের পুরাণ বোঝাই-করা। যাদের শিশুবুদ্ধি কিছুতেই বাড়তে চায় না তারা এইরকম উত্তরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু, অল্পে-সন্তুষ্ট মূঢ়তার মাঝখানেও মানুষের প্রশ্ন বাধা ঠেলে ঠেলে চলে। কাজেই উনুন ধরাবার জন্যে আগুন জ্বালতে মানুষকে যত চেষ্টা করতে হয়েছে তার চেয়ে সে কম চেষ্টা করে নি 'আগুন জ্বলে কেন' তার অনাবশ্যক উত্তর বের করতে। এ দিকে হয়তো উনুনের আগুন গেছে নিবে, হাঁড়ি চড়ে নি, পেটে ক্ষুধার আগুন

জ্বলছে, প্রশ্ন চলছেই— আগুন জ্বলে কেন। সাক্ষাৎ আগুনের মধ্যে তার উত্তর নেই, উত্তর আছে প্রত্যক্ষ আগুনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে। জন্তু-বিচারক মানুষকে কি নির্বোধ বলবে না, আমরা পতঙ্গকে যেমন বলি মূঢ়, বার বার যে পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে?

এই অদ্ভুত বুদ্ধির সকলের চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ পায় যখন মানুষকে সে ঠেলা দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি আপনি কে।' এমন কথা বলতেও তার বাধে না যে, 'মনে হচ্ছে বটে তুমি আছ কিন্তু সত্যই তুমি আছ কি, তুমি আছ কোথায়।' উপস্থিতমত কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে তাড়াতাড়ি যদি বলে বসি 'আছি দেহধর্মে' অমনি অন্তর থেকে প্রবাহণ রাজা মাথা নেড়ে বলবেন, ওখানে প্রশ্নের শেষ হতে পারে না। তখন মানুষ বললে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্— মানবধর্মের গভীর সত্য নিহিত আছে গোপনে। আমার 'এই আমি' আছে প্রত্যক্ষে, 'সেই আমি' আছে অপ্রত্যক্ষে।

কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

এই-যে জল, এই-যে স্থল, এই-যে এটা, এই-যে ওটা, যত-কিছু পদার্থকে নির্দেশ করে বলি 'এই-যে', এই-সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে, নইলে ভালো করে বাঁচা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বলে, তদ্‌বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে। তাকেই জানো। কাকে, না, ইদং অর্থাৎ এই-যে বলে যাকে স্বীকার করি তাকে নয়। 'এই-যে আমি শুনেছি' এ হল সহজ কথা। তবুও মানুষ বললে, এর শেষ কথা সেইখানে যেখানে ইদং সর্বনাম পৌঁছয় না। খ্যাপার মতো সে জিজ্ঞাসা করে কোথায় আছে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং— শ্রবণেরও শ্রবণ। ভৌতিক প্রণালীতে খোঁজ করতে করতে এসে ঠেকে বাতাসের কম্পনে। কিন্তু, ওখানেও রয়েছে ইদং, 'এই-যে কম্পন'। কম্পন তো শোনা নয়। যে বলছে 'আমি শুনেছি' তার কাছে পৌঁছনো গেল। তারও সত্য কোথায়।

উপর থেকে নীচে পড়ল একটা পাথর। জ্ঞানের দেউড়িতে যে দ্বারী থাকে সে খবর দিলে, এই-যে পড়েছে। নীচের দিকে উপরের বস্তুর যে টান সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্তব্য শেষ হল। ভিতর-মহল থেকে শোনা গেল, একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে 'এই-যে'। কিন্তু সব 'এই-যে'কে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান।

উপনিষদ সকলের মধ্যে এই এককে জানাই বলেন প্রতিবোধবিদিতম্— প্রত্যেক পৃথক পড়ার বোধে একটি অদ্বিতীয় টানকে সত্য বলে জানা। তেমনি, আমি শুনি, তুমি শোন, এখন শুনি, তখন শুনি, এই প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধ-বিদিত এক সত্যই শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং। তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন, অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। আমরা যা-কিছু জানি এবং জানি নে সব হতেই স্বতন্ত্র। ভৌতিক বিজ্ঞানেও যা গুহাহিত তাকে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেবল যে মেলাতে পারি নে তা নয়, বলতে হয়— এ তার বিপরীত। ভাষায় বলি ভারাকর্ষণশক্তি, কিন্তু আকর্ষণ বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয় শক্তি বলতে যা বুঝি এ তাও নয়।

প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি; যে সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত, তাকে সাধনা করেই পেতে হবে। সেই সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। খৃস্টানশাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে; বলেছে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্যে স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল, তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে, আর-একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।

কথিত আছে—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥

মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।

এ-সব কথাকে আমরা চিরাভ্যস্ত হিতকথা বলে গণ্য করি অর্থাৎ মনে করি, লোকব্যবহারের উপদেশরূপেই এর মূল্য। কিন্তু, সমাজব্যবহারের প্রতি লক্ষ করেই এ শ্লোকটি বলা হয় নি। এই শ্লোকে আত্মাকে সত্য করে জানবার উপায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ করার দ্বারা মানুষ কিছু-একটা পায় যে তা নয়, কিছু-একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে, না-হতেও পারে, এমন-কি, অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থটা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নেই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপর পক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর-একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ বলছেন— আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া। নাগর শব্দ বলতে যদি citizen না বুঝিয়ে libertine বোঝায় তা হলে বলতে হয়, নাগর শব্দ আপন সত্য অর্থ হতে হীন হয়ে গেছে। তেমনি একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে, মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত তা হলে এ-সব কথার অর্থ থাকত না।

ডিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম্। আর-কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে। সেই সার্থকতা— নেদং যদিদমুপাসতে। যদি খোলাটার মধ্যেই একশো বছর সে বেঁচে থাকত তা হলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাশক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।

জ্যোতির্বিদ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষেরও মন আপন প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ যথাযথ আবৃত্তি করে চলছে না। অনির্দিষ্টের দিকে, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে। তার থেকে মানুষ কল্পনা করলে দেবলোক। বললে, আদেশ সেইখানকার, আকর্ষণ সেখান হতে। কে সেই দেবলোকের দেবতা তা নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলেছে। যিনিই হোন, তাঁকে দেবতাই বলি আর যাই বলি, মানুষকে জীবসীমার মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে দিলেন না।

সমুদ্র চঞ্চল হল। জোয়ার-ভাঁটার ওঠাপড়া চলছেই। চাঁদ না দেখা গেলেও সমুদ্রের চাঞ্চল্যেই চাঁদের আহ্বান প্রমাণ হত। বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে। যে ক্ষুধা তার অন্তরে নিঃসংশয়, তার লক্ষ্য যে তার বাইরেও সত্য সে কথাটা সদ্যোজাত শিশুও স্বতই জানে। মানুষের প্রাণান্তিক উদ্যম দেখা গেছে এমন কিছুর জন্যে যার সঙ্গে বাঁচবার প্রয়োজনের কোনো যোগই

নেই। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে আছে যে প্রাণ সেই তাকে দুঃসাহসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভৌতিক প্রাণের পথে প্রাণীর নিজেকে রক্ষা; আর এ পথে আত্মবানের আত্মাকে রক্ষা নয়, আত্মাকে প্রকাশ।

বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেছে, যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। তাঁর মহদ্‌যশই তাঁর নাম, তাঁর মহৎ কীর্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই—আত্মাকে প্রকাশ। বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষা করে, বাইরে আপনাকে উৎসর্গ করার দ্বারাই আত্মা আপনাকে প্রকাশ করে। এইখানে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে আপনাকে ঘোষণা করে। এমন-কি, বর্বর দেশের মানুষও নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায় প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চায়। সে নাক ফুঁড়ে মস্ত এক শলা দিয়েছে চালিয়ে। উখো দিয়ে দাঁত ঘষে ঘষে ছুঁচোলো করেছে। শিশুকালে তক্তা দিয়ে চেপে বিকৃত করেছে মাথার খুলি, বানিয়েছে বিকটাকার বেশভূষা। এই-সব উৎকট সাজে-সজ্জায় অসহ্য কষ্ট মেনেছে; বলতে চেয়েছে, সে নিজে সহজে যা তার চেয়ে সে বড়ো। সেই তার বড়ো-আমি প্রকৃতির বিপরীত। যে দেবতাকে সে আপন আদর্শ বলে মানে সেও এমনি অদ্ভুত; তার মহিমার প্রধান পরিচয় এই যে, সে অপ্রাকৃতিক। প্রকৃতির হাতে পালিত তবু প্রকৃতিকে দুয়ো দেবার জন্যে মানুষের এই যেন একটা ঝগড়াটে ভাব। ভারতবর্ষেও দেখি, কত লোক, কেউ বা ঊর্ধ্ববাহু, কেউ বা কণ্টকশয্যায় শয়ান, কেউ বা অগ্নিকুণ্ডের দিকে নতশীর্ষ। তারা জানাচ্ছে, তারা শ্রেষ্ঠ, তারা সাধু, কেননা তারা অস্বাভাবিক। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশেও কত লোক নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব করে। তাকে বলে 'রেকর্ড ব্রেক' করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব-অধ্যবসায় পার হওয়া। সাঁতার কাটছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাইসিক্‌লে অবিশ্রাম ঘুরপাক খাচ্ছে, দীর্ঘ উপবাস করছে স্পর্ধা করে, কেবলমাত্র অস্বাভাবিকতার গৌরব প্রচারের জন্যে। ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব করতে আপন ময়ূরত্ব নিয়েই, হিংস্র জন্তু উৎসাহ বোধ করে আপনার হিংস্রতার সাফল্যে। কিন্তু, বর্বর মানুষ মুখশ্রীর বিকৃতি ও বেশভূষার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব করে জানায়, 'আমি ঠিক মানুষের মতো নই, সাধারণ মানুষরূপে আমাকে চেনবার জো নেই।' এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নঙর্থক, এ সদর্থক নয়; প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্পর্ধামাত্র, যা তার সহজ তার প্রতিবাদমাত্র—তার বেশি আর কোনো অর্থ এতে নেই। অহংকারের প্রকাশকে আত্মগৌরবের প্রকাশ বলে মনে করা বর্বরতা, যেমন নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানকে মনে করা পুণ্যানুষ্ঠান।

এ যেমন দৈহিক দিকে তেমনি আর্থিক দিকেও মানুষের স্পর্ধার অন্ত নেই। এখানেও রেকর্ড ব্রেক করা, পূর্ব-ইতিহাসের বেড়া ডিঙোনো লম্ফ। এখানকার চেষ্টা ঠিক অস্বাভাবিকের জন্যে নয়, অসাধারণের জন্যে। এতে আছে সীমার প্রতি অসহিষ্ণুতা তার বাইরে আর কিছুই নয়। কিন্তু, যা-কিছু বস্তুগত যা বাহ্যিক, সীমাই তার ধর্ম। সেই সীমাকে বাড়িয়ে চলা যায়, পেরিয়ে যাওয়া যায় না। যিশুখৃস্ট বলেছেন, সূচীর রন্ধ্র দিয়ে উট যেমন গলে না ধনীর পক্ষে স্বর্গদ্বার তেমনি দুর্গম। কেননা ধনী নিজের সত্যকে এমন-কিছুর দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করতে অভ্যস্ত যা অপরিমেয়ের বিপরীত, তাই সে হীয়তেঽর্থাৎ, মনুষ্যত্বের অর্থ হতে হীন হয়। হাতির মতো বড়ো হওয়াকে মানুষ বড়োলোক হওয়া বলে না, হয়তো বর্বর মানুষ তাও বলে। বাহিরের উপকরণ পুঞ্জিত করার গর্ব করা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার কথা নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন উপকরণবতাং জীবিতম্‌। যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা করে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠ গান এমন পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটিমাত্র সুরও যোগ করা যায় না। বস্তুত গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব যথার্থ গায়কের আত্মা আপন সার্থকতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা, যা অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম। তাই মানুষের যে সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়, যে দিকে তার আত্মা

সে দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। এক দিকে তার গর্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর-এক দিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য কল্যাণ বীর্য ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য-সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কাকে অনুভব করলে। যিনি নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে মানুষ মহৎ। মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে মহৎ; তবেই প্রমাণ হবে যে, সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত— তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে, সকল কালের হয়ে, আপনারই অন্তরতম বেদীতে। আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই— অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত-কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপনাহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

> আমি কোথায় পাব তারে
> আমার মনের মানুষ যে রে।
> হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
> দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

> তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

> মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি— পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

২

অথর্ববেদ বলেছেন—

> ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
> ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।

ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য সম্পদ বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্‌বৃত্তে আছে।

অর্থাৎ, মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতি-

রিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোল না। ইতিপূর্বে জীবাণুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম। অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে, প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু, মানুষ প্রকৃতিনির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম্। এ-সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি। এই কথাটিকেই উপনিষদ আর-এক রকম করে বলেছেন—

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ
এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

এখানে উনি এবং এ, এই দুয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা-কিছু সে তাঁতেই।

এই তিনি বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যাকে বলি 'আমার আমি' সে যেমন অন্তরতম-ভাবে আমার একান্ত বোধবিষয় তিনিও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয়, গভীর হয়, প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে। তখন অনুভব করি, এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ। অন্য কোনো গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে উপমা ব্যবহার করেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

একখণ্ড লোহার রহস্যভেদ করে বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সেই টুকরোটি আর-কিছুই নয়, কতক-গুলি বিশেষ ছন্দের বিদ্যুৎমণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা। সেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সহজ দৃষ্টিতে যদি সেইরকম দেখা যেত, তা হলে মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন পৃথক দেখি তেমনি তাদেরও দেখতুম। এই অণুগুলি যত পৃথকই হোক, এদের মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে। তাকে শক্তিই বলা যাক। সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সংঘশক্তি। আমরা যখন লোহা দেখছি তখন বিদ্যুৎকণা দেখছি নে, দেখছি সংঘরূপকে। বস্তুত, এই-যে লোহার প্রতীয়মান রূপ এ একটা প্রতীক। বস্তুটা পরমার্থত যা, এ তা নয়। অন্যবিধ দৃষ্টি যদি থাকে তবে এর প্রকাশ হবে অন্যবিধ। দশ-টাকার নোট পাওয়া গেল, বিশেষ রাজত্বে তার বিশেষ মূল্য। একে দেখবামাত্র যে জানে যে এই কাগজখানা স্বতন্ত্র দশ-সংখ্যক টাকার সংঘরূপ, তা হলেই সে একে ঠিক জানে। কাগজখানা ঐ সংঘের প্রতীক।

আমরা যাকে চোখে দেখছি লোহা সেও প্রকাশ করছে সেই সংঘকে যাকে চোখে দেখা যায় না, দেখা যায় স্থূল প্রতীকে। তেমনি ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশকালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, একধেবানুদ্রষ্টব্যং, কিন্তু বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ। সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব

করবার উদার শক্তি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরই তো বলি মহাত্মা, তাঁরাই তো সর্বমানবের জন্যে প্রাণ দিতে পারেন। তাঁরাই তো এই এক গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ্য করে বলতে পারেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা— তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য-সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতর।

বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্‌কার দেন, বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁচেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোকরূপেই ব্যবহার করে, করে ফল পায়, এও তেমনি।

পরমমানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরমজাগতিক সত্তা আছে। সূর্যলোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক। কিন্তু, যার অংশ এই পৃথিবী, যার উত্তাপে পৃথিবীর প্রাণ, যার যোগে পৃথিবীর চলাফেরা, পৃথিবীর দিনরাত্রি, সে একান্তভাবে এই সূর্যলোক। জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি, কিন্তু জ্ঞানে কর্মে আনন্দে দেহমনে সর্বতোভাবে জানি এই সূর্যলোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্ম চ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।

মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো-কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালো-মন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ-বর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপপুণ্যের কথা উঠতে পারে না। অস্তীতিব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কি না, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তামাত্রকে যে ভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। এই কারণেই দোষারোপ করে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা বললে তার ব্যাবসা বন্ধ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনোকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে যে বিরাজ করে না। কিন্তু, যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কী করে। এইজন্যে কোনো আধুনিক পণ্ডিত বলেছেন, বিশ্বজগৎ গাণিতিক মনের সৃষ্টি। সেই গাণিতিক মন তো মানুষের মনকে ছাড়িয়ে গেল না। যদি যেত তবে এ জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমরা জানতেই পারতুম না, যেমন কুকুর বিড়াল কিছুতেই জানতে পারে না। যিনি আমাদের দর্শনে শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপসম্বন্ধে বলা হয়েছে সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। অর্থাৎ, মানুষের বহিরিন্দ্রিয়-অন্তরিন্দ্রিয়ের যত-কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানব-ব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তা হলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।

এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত

আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

বলা হয়েছে বটে, আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস এঁর মধ্যে, কিন্তু এতেই সব কথা শেষ হল না। এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার যে সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম। ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে, আত্মিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে। আত্মিক বিশ্বের পরিচয় মানুষ জন্মমুহূর্তেই আরম্ভ করেছে পিতামাতার প্রেমে। এইখানে অপরিমেয় রহস্য, অনির্বচনীয়ের সংস্পর্শ। প্রশ্ন উঠল মনে, এই পিতামাতার সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত। দাল্‌ভ্য যদি উত্তর করেন, এই পৃথিবীর মাটিতে, প্রবাহণ মাথা নেড়ে বলবেন, যিনি পিতৃতমঃ পিতৃণাম্‌, সকল পিতাই যাঁর মধ্যে পিতৃতম হয়ে আছেন, তাঁরই মধ্যে। মাটির অর্থ বুঝতে পারি বাহির থেকে তাকে নেড়েচেড়ে দেখে, পিতামাতার রহস্য বুঝতে পারি আপনারই আত্মার গভীরে এবং সেই গভীরেই উপলব্ধি করি পিতৃতমকে। সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, বিশেষ কোনো দেশকালেবদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষ কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করছেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে।

এই আহ্বান মানুষকে কোনোকালে কোথাও থামতে দিলে না, তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে। ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা করে ঘর বেঁধেছে তারা আপন সমাধিঘর রচনা করেছে। মানুষ যথার্থই অনাগরিক। জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক। বুদ্ধকে যখন কোনো একজন লোক চরমতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন, 'আমি চরমের কথা বলতে আসি নি, আমি বলব পথের কথা।' মানুষ এক যুগে যাকে আশ্রয় করছে আর-এক যুগে উন্মাদের মতো তার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে পথে। এই-যে বারে বারে ঘর ভেঙে দিয়ে চলবার উদ্দামতা, যার জন্যে সে প্রাণপণ করে, এ প্রমাণ করছে কোন্‌ সত্যকে। সেই সত্য সম্বন্ধেই উপনিষদ বলেন, মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্‌ পূর্বমর্ষৎ। তিনি মনকে ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন। ছাড়িয়ে যদি না যেতেন তবে পদে পদে মানুষও আপনাকে ছাড়িয়ে যেত না। অথর্ববেদ বলেছেন, এই আরও'র দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ত্ব।

তাই মানবদেবতার সম্বন্ধে এই কথা শুনি—

যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্‌।

যা কিছুতে ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে, সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত।

বিশ্বে ছোটোবড়ো নানা পদার্থই আছে। থাকা-মাত্রের যে দাম তা সকলের পক্ষেই সমান। নিছক অস্তিত্বের আদর্শে মাটির ঢেলার সঙ্গে পদ্মফুলের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদ নেই। কিন্তু, মানুষের মনে এমন একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে যাতে প্রয়োজনের বিচার নেই, যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলে না। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহৈতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে, একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ। তাকেই সে বলে শ্রেষ্ঠতা। অথচ, এই শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মতের ঐক্য তো দেখি নে। তা হলে সেটা যে নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা বলা যায় কী করে।

জ্যোতির্বিদ দূরবিন নিয়ে জ্যোতিষ্কের পর্যালোচনা করতে চান, কিন্তু তার বাধা বিস্তর। আকাশে আছে পৃথিবীর ধুলো, বাতাসের আবরণ, বাষ্পের অবগুণ্ঠন, চার দিকে নানাপ্রকার

চঞ্চলতা। যন্ত্রের ত্রুটিও অসম্ভব নয়, যে মন দেখছে তার মধ্যে আছে পূর্বসংস্কারের আবিলতা। ভিতর-বাহিরের সমস্ত ব্যাঘাত নিরস্ত করলে বিশুদ্ধ সত্য পাওয়া যায়। সেই বিশুদ্ধ সত্য এক, কিন্তু বাধাগ্রস্ত প্রতীতির বিশেষত্ব অনুসারে ভ্রান্ত মত বহু।

পুরোনো সভ্যতার মাটিচাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অনুভব করেছে তারই দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরে, ব্যবহারের সামগ্রীতে, সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায় নি— বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন। বাহ্যসম্পদের প্রাচুর্যের মাঝখানেই সেই বিনষ্টির লক্ষণ সহসা এসে দেখা দেয় যখন মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাশ্চাত্য মহাদেশে কি সেই লক্ষণ আজ দেখা দেয় নি। সেখানে বিজ্ঞান আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে, বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু তার দ্বারাও মানুষ রক্ষা পায় না। স্বাজাত্যের শিখরের উপরে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব করতে স্পর্ধা করে, রাষ্ট্রনীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে, তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে। এ কোনো পৌরাণিক ঈশ্বরের আদিষ্ট বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নয়। এই-সব আত্মম্ভরীরা আত্মহনো জনাঃ। এরা সেই আত্মাকে মারে যে আত্মা স্বদেশের বা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ নয়, যে আত্মা নিত্যকালের বিশ্বজনের। একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বড়ো করবার চেষ্টায় অন্য-সকল প্রাণীরই উন্নতি ঘটতে পারে, তাতে তাদের সত্যদ্রোহ ঘটে না; কিন্তু মানুষের পক্ষে সেইটেই অসত্য, অধর্ম, এইজন্যে সকলপ্রকার সমৃদ্ধির মাঝখানেই তার দ্বারাই মানুষ সমূলেন বিনশ্যতি।

বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতে বিশ্বমানবমনের প্রকাশ, এ কথা স্বীকার করা সহজ; কিন্তু রসের অনুভূতিতে সেই বিশ্বমনকে হৃদয়ংগম করি কি না, এ নিয়ে সংশয় জন্মাতে পারে। সৌন্দর্যে আনন্দবোধের আদর্শ দেশকালপাত্রভেদে বিচিত্র যদি হয় তবে এর শাশ্বত আদর্শ কোথায়। অথচ, বৃহৎ কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই, শিল্পসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলবার দিকেই যায়। এ কথা সত্য যে, নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুন্দর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রস পায় না। অনেকের মন রূপকানা, তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে বিশ্বরুচির মিল নেই। মানুষের মধ্যে অনেকে আছে স্বভাবতই বিজ্ঞানমূঢ়, বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা মোহাচ্ছন্ন বলেই তা বহু, এক সংস্কারের সঙ্গে আর-এক সংস্কারের মিল হয় না, অথচ নিজ নিজ অন্ধ সংস্কারের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের এমন প্রচণ্ড দম্ভ যে তা নিয়ে তারা খুনোখুনি করতেও প্রস্তুত। তেমনি সংসারে স্বভাবতই অরসিক বা বেরসিকের অভাব নেই; তাদেরও মতভেদ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা নানা পর্যায়ের জন্মমূঢ়তা আছে বলেই যেমন জ্ঞানের বিশ্বভূমীন সম্পূর্ণতায় অশ্রদ্ধা করা যায় না, সৌন্দর্যের আদর্শ সম্বন্ধেও তেমনি।

বার্‌ট্রান্ড্‌ রাসেল কোনো-এক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, বেটোভনের 'সিম্ফনি'কে বিশ্ব-মনের রচনা বলা যায় না, সেটা ব্যক্তিগত; অর্থাৎ, সেটা তো গাণিতিক তত্ত্বের মতো নয় যার উদ্ভাবনা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন উপলক্ষমাত্র, যা নিখিল মনের সামগ্রী। কিন্তু, যদি এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, বেটোভনের রচনা সকলেরই ভালো লাগা উচিত অর্থাৎ ঠিকমত শিক্ষা পেলে, স্বাভাবিক চিত্তজড়তা না থাকলে, অজ্ঞান অনভ্যাসের আবরণ দূর হলে, সকল মানুষের তা ভালো

লাগবে, তা হলে বলতেই হবে শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতার শ্রেষ্ঠত্ব সকল মানুষের মনেই সম্পূর্ণ আছে, শ্রোতৃরূপে ব্যক্তিবিশেষের মনে তা বাধাগ্রস্ত।

বুদ্ধি জিনিসটা অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু সৌন্দর্যবোধের অপূর্ণতা সত্ত্বেও সংসারে সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সৌন্দর্যবোধের কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এ সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারের কোনো দণ্ডনীয় বাধা নেই। যুক্তিস্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত হয়েছে প্রাণের বিভাগে, শাসনের অভাবে সৌন্দর্যস্বীকারকারী রুচি তেমন পাকা হয় নি। তবু সমস্ত মানবসমাজে সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে এমন অল্প বিষয়েই। অথচ, জীবনধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ, এর দ্বারা বাইরের জিনিসকে পাই নে, অন্তরের দিক থেকে দীপ্তিমান হই, পরিতৃপ্ত হই। এই পরিতৃপ্ত হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি, রসো বৈ সঃ।

এই হওয়ার দ্বারা পাওয়ার কথা উপনিষদে বার বার শোনা যায়; তার থেকে এই বুঝি, মানুষের যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য— কেবল তার বোধের বাধা আছে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

বলছেন, কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হবে, দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ, এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া।

পূর্বে বলেছি, ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ করে দেখতে গেলে কাছের সমস্ত মলিনতা ও চাঞ্চল্য, ব্যক্তিগত সমস্ত বিকার দূর করা চাই। আত্মিক সত্য সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশি খাটে। যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সব চেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেননা, তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই লাগে আঘাত। জানার ভুলের চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এইজন্যেই সম্প্রদায়ের নামে ব্যক্তিগত বা বিশেষজনগত স্বভাবের বিকৃতি মানুষের পাপবুদ্ধিকে যত প্রশ্রয় দেয় এমন বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিতে কিংবা বৈষয়িক বিরোধেও না। সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়; শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্ব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে— স্বয়ং দেবত্ব অবমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরম্পরব্যবহারে আতঙ্কিত করে রাখে। আমাদের দেশে এই দুর্যোগ আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্যের মূলে আঘাত করছে।

অন্য দেশেও তার দৃষ্টান্ত আছে। সাম্প্রদায়িক খৃস্টান ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দেবচরিত্রে পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সংস্কারবশত দেখতে পান না, মানুষের আপন অহিতবুদ্ধি তাঁদেরও দেবতার ধারণাকে কিরকম নিদারুণভাবে অধিকার করতে পারে। অস্নুদীক্ষা বা ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ হবার পূর্বে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে যে সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-মতে তার অনন্ত নরকবাস বিহিত হতে পারে সেই শাস্ত্রমতে দেবচরিত্রে যে অপরিসীম নির্দয়তার আরোপ করা হয় তার তুলনা কোথায় আছে। বস্তুত, যে-কোনো পাপের প্রসঙ্গেই হোক, অনন্ত-নরকের কল্পনা হিংস্রবুদ্ধির চরম প্রকাশ। য়ুরোপে মধ্যযুগে শাস্ত্রগত ধর্মবিশ্বাসকে অবিচলিত রাখার জন্যে যে বিজ্ঞানবিদ্বেষী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত তার ভিত্তি এইখানে। সেই নরকের আদর্শ সভ্যমানুষের জেলখানায় আজও বিভীষিকা বিস্তার করে আছে। সেখানে শোধন করবার নীতি নেই, আছে শাসন করবার হিংস্রতা।

মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ, ধর্মসম্বন্ধীয় সব-কিছুকেই আমরা নিত্য বলে ধরে নিয়েছি। ভুলে যাই যে, ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলেই বৈজ্ঞানিক মতমাত্রই নিত্য, এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তা হলে আজও বলতে হবে, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত এই ভুলই ঘটে; সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত। তার পরে যে বিবাদ, যে নির্দয়তা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধসংস্কারের প্রবর্তন হয় মানুষের জীবনে আর-কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।

এ কথা মানতে হবে, ভুল মত মানুষেরই আছে, জন্তুর নেই। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভুল মতবাদের উদ্ভব হচ্ছে. যেহেতু মানুষের একটা দুর্নিবার সমগ্রতার বোধ আছে। কোন-একটা তথ্য যখন স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে তার সামনে আসে তখন তাকেই সম্যক্‌ বলে সে স্বীকার করে নিতে পারে না। তাকে পূর্ণ করবার আগ্রহে কল্পনার আশ্রয় নেয়। সেই কল্পনা প্রকৃতিভেদে মূঢ় বা প্রাজ্ঞ, সুন্দর বা কুৎসিত, নিষ্ঠুর বা সকরুণ, নানাপ্রকার হতে পারে। কিন্তু, মূল কথাটা হচ্ছে, তার এই বিশ্বাস যে, প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ করে আছে অপ্রত্যক্ষ নিখিলতার সত্য। সমগ্রকে উপলব্ধি করবার যে প্রেরণা আছে তার মনে সেই তার ভূমার বোধ।

মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে, সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।

আমাদের ভৌতিক দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ, পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি, সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর; কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে, পৃথিবী মানুষের পরম দেহ; সাধনার দ্বারা, যোগবিস্তারের দ্বারা এই বিরাটকে মানুষ আপন করে তুলছে, বড়ো দেহের মধ্যে ছোটো দেহকে প্রসারিত করছে, বিশ্বভৌতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে পরিমিত দেহের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণ করছে, চোখ স্পষ্টতর করে দেখছে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে, দুই হাত পাচ্ছে বহুসহস্র হাতের শক্তি, দেশের দূরত্ব সংকীর্ণ হয়ে আমাদের দেহের নিকটবর্তী হচ্ছে। একদিন সমস্ত ভৌতিক শক্তি দেহশক্তির পরিশিষ্ট হয়ে উঠবে, মানুষের এই সংকল্প।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্‌
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

এই-বাণীকে নিজের মধ্যে সার্থক করবে—সেই স্পর্ধা নিয়ে মানুষ অগ্রসর। একেবারে নতুন-কিছু উদ্ভাবন করবে তা নয়, নিজের দেহশক্তির সঙ্গে বিরাট ভৌতিক শক্তির সংযোগকে উত্তরতর করে তুলবে।

মনে করা যাক, সবই হল, ভৌতিক শক্তির পূর্ণতাই ঘটল। তবু কি মানুষ বলতে ছাড়বে 'ততঃ কিম্‌'। রামায়ণে বর্ণিত দশাননের শরীরে মানবের স্বভাবসিদ্ধ দেহশক্তি বহুগুণিত হয়েছিল, দশ দিক থেকে আহরিত ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী। কিন্তু মহাকাব্যে শেষ জায়গাটা সে পেল না। তার পরাভব হল রামচন্দ্রের কাছে। অর্থাৎ, বাহিরে যে দরিদ্র, আত্মায় যে ঐশ্বর্যবান, তার কাছে। সংসারে এই পরাভব আমরা যে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে থাকি তা নয়, অনেক সময়ে তার বিপরীত দেখি; তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ একে পরাভব বলে। মানুষের আর-একটা গূঢ় জগৎ আছে, সেইখানেই এই পরাভবের অর্থ পাওয়া যায়। সেই হল তার আত্মার জগৎ।

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি অহং, আর-একটি আত্মা।

প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায়, আর-একটিকে শিখার সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজার দর, কোনোটার দর সোনার, কোনোটার মাটির। শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে, এবং তারই প্রকাশে আর-সমস্তও প্রকাশিত। প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।

মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি-দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা। ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি-দ্বারা; যে আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলছেন তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনামন্ত্রে আছে য একঃ, যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার। যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ-ইচ্ছা, সিদ্ধিলোভেও শুভ নয়, পুণ্যলোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ—যেহেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেইজন্যেই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি, সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।

পৃথিবী আপনাতে আপনি আবর্তিত, আবার বৃহৎ কক্ষপথে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মানুষের সমাজেও যা-কিছু চলছে সেও এই দুইরকমের বেগে। এক দিকে ব্যক্তিগত আমি'র টানে ধনসম্পদপ্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠছে, আর-এক দিকে অমিতমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, তার আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশে ত্যাগ। এইখানে আত্মার লক্ষণকে স্বীকার করার দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি। উভয়ের মধ্যে পাশাপাশি কিরকম বিপরীত অসংগতি দেখা যায় একটা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কয়েক বৎসর পূর্বে লন্ডনের টাইম্‌স্ পত্রে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল, আমেরিকার নেশন পত্র থেকে তার বিবরণ পেয়েছি। বায়ুপোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিকসৈন্য আফগানিস্থানে মাহ্‌সুদ্ গ্রাম ধ্বংস করতে লেগেছিল, শতঘ্নীবর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গেল পড়ে। একজন আফগান মেয়ে নাবিকদের নিয়ে গেল নিকটবর্তী গুহার মধ্যে, একজন মালিক তাদের রক্ষার জন্যে গুহার দ্বার আগলিয়ে রইল। চল্লিশজন ছুরি আস্ফালন করে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত, মালিক তাদের ঠেকিয়ে রাখলে। তখনো উপর থেকে বোমা পড়ছে, ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করছে গুহায় আশ্রয় নেবার জন্যে। নিকটবর্তী স্থানের অন্য কয়েকজন মালিক এবং একজন মোল্লা এদের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হল। মেয়েরা কেউ কেউ নিলে এদের আহারের ভার। অবশেষে কিছুদিন পরে মাহ্‌সুদের ছদ্মবেশ পরিয়ে এরা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিল।

এই ঘটনার মধ্যে মানবস্বভাবের দুই বিপরীত দিক চূড়ান্তভাবেই দেখা দিয়েছে। এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণে দেখা যায় মানুষের শক্তির আশ্চর্য সমৃদ্ধি, ভূতল থেকে নভস্তল পর্যন্ত তার

সশস্ত্র বাহুর বিপুল বিস্তার। আবার হননে-প্রবৃত্ত শত্রুকে ক্ষমা করে তাকে রক্ষা করতে পারল, মানুষের এই আর-এক পরিচয়। শত্রুহননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবধর্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললে, 'শত্রুকে ক্ষমা করো।' এ কথাটা জীবধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে, যুদ্ধকালে যে মানুষ রথে নেই, যে আছে ভূতলে, রথী তাকে মারবে না। যে ক্লীব, যে কৃতাঞ্জলি, যে মুক্তকেশ, যে আসীন, যে সানুনয়ে বলে 'আমি তোমারই', তাকেও মারবে না। যে ঘুমচ্ছে, যে বর্মহীন, যে নগ্ন, যে নিরস্ত্র, যে অযুধ্যমান, যে যুদ্ধ দেখছে মাত্র, যে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাকেও মারবে না। যার অস্ত্র গেছে ভেঙে, যে শোকার্ত, যে পরিক্ষত, যে ভীত, যে পরাবৃত্ত, সতের ধর্ম অনুসরণ করে তাকেও মারবে না।

সতের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তাঁরই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ তাঁরই ধর্ম। যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে ছোটো দিকে তার জিত হলেও বড়ো দিকে তার হার। উপকরণের দিকে তার সিদ্ধি, অমৃতের দিকে সে বঞ্চিত : এই অমৃতের আদর্শ মাপজোখের বাইরে।

স্বর্ণলঙ্কার মাপজোখ চলে। দশাননের মুণ্ড ও হাত গণনা করে বিস্মিত হবার কথা। তার অক্ষৌহিণী সেনারও সংখ্যা আছে, জয়বিস্তাবের পরিধি-দ্বারা সেই সেনার শক্তিও পরিমেয়। আত্মার মহিমার পরিমাণ নেই। শত্রুকে নিধনের পরিমাপ আছে, শত্রুকে ক্ষমার পরিমাপ নেই। আত্মা যে মহার্ঘতায় আপন পরিচয় দেয় ও পরিচয় পায় সেই পরিচয়ের সত্য কি বিরাজ করে না অপরিমেয়ের মধ্যে, যাকে অথর্ববেদ বলেছেন সকল সীমার উদ্‌বৃত্ত, সকল শেষের উৎশেষ। সে কি এমন একটি স্বয়ম্ভূব বুদ্‌বুদ্‌ কোনো সমুদ্রের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। মানুষের কাছে শুনেছি, ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ—তোমার প্রতি পাপ যে করে তার প্রতি ফিরে পাপ কোরো না। কথাটাকে ব্যবহার ব্যক্তিবিশেষ মানে বা নাই মানে, তবু মন তাকে পাগলের প্রলাপ বলে হেসে ওঠে না। মানুষের জীবনে এর স্বীকৃতি দৈবাৎ দেখি, প্রায় দেখি বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ মাথা গনতি করে এর সত্য চোখে পড়ে না বললেই হয়। তবে এর সত্যতা কোন্‌খানে। মানুষের যে স্বভাবে এটা আছে তার আশ্রয় কোথায়। মানুষ এ প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছে শুনি।

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ
তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা।

আত্মা যার পাপ থেকে বিরত ও কল্যাণে নিবিষ্ট তিনি সমস্তকে বুঝেছেন। তাই তিনি জানেন কোন্‌টা স্বভাবসিদ্ধ, কোন্‌টা স্বভাববিরুদ্ধ।

মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজনের হিতসাধনা করে। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানে কী করে। তেন সর্বমিদং বুদ্ধম। স্বচ্ছ মন নিয়ে সমস্তটাকে সে বোঝে। সত্য আছে, শিব আছে সমগ্রের মধ্যে। যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের তার থেকে বিরত হলে তবে মানুষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে জানে, তখনই জানে আপনার প্রকৃতি। তার এই প্রকৃতি কেবল আপনাকে নিয়ে নয়, তাঁকেই নিয়ে যাঁকে গীতা বলছেন : তিনিই পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব। মানুষ এই পৌরুষের প্রতিই লক্ষ করে বলতে পারে, ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌। মৃত্যুতে সেই পৌরুষকে সে প্রমান করে যা তার দেবত্বের লক্ষণ, যা মৃত্যুর অতীত।

শ্রেয় প্রেয় নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হল সেটা সমাজস্থিতির দিক দিয়ে নয়। নিন্দা-প্রশংসার ভিত্তিতে পাক্কা করে গেঁথে, শাসনের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, আত্মরক্ষার উদ্দেশে সমাজ যে ব্যবস্থা করে থাকে তাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজরক্ষাই মুখ্য। তাই এমন কথা শোনা যায়, শ্রেয়োধর্মকে বিশুদ্ধভাবে সমাজে প্রবর্তন করা ক্ষতিকর। প্রায়ই বলা হয়, সাধারণ মানুষের

মধ্যে ভূরিপরিমাণ মূঢ়তা আছে, এইজন্যে অনিষ্ট থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে মোহের দ্বারাও তাদের মন ভোলানো চাই, মিথ্যা উপায়েও তাদের ভয় দেখানো বা সান্ত্বনা দেওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করা দরকার যেন তারা চিরশিশু বা চিরপশু। ধর্মসম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বতনকালে যে-সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তীকালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না। পতঙ্গমহলে দেখা যায়, কোনো কোনো নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি। তা নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। এক দিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর, অন্য দিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেইসঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন-কি, অন্যায় প্রণালী— ঘর-গড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন। রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বুদ্ধিরই প্রতীক আন্ডামান, ফ্রান্সের ডেভিল আইলান্ড, ইটালির লিপারি দ্বীপ। এদের ভিতরের কথা এই যে, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি এক তালে চলতে পারে না। এই বুদ্ধির সঙ্গে চিরদিনই তাঁদের লড়াই চলে এসেছে যাঁরা সত্যকে শ্রেয়কে মনুষ্যত্বকে চরম লক্ষ্য বলে শ্রদ্ধা করেন।

রাজ্যের বা সমাজের উপযোগিতারূপে শ্রেয়ের মূল্যবিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শ্রেয়কে মানুষ যে স্বীকার করেছে সেই স্বীকৃতির আশ্রয় কোথায়, সত্য কোথায়, সেইটেই আমার আলোচ্য। রাজ্যে সমাজে নানাপ্রকার স্বার্থসাধনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের ব্যবহারে তার প্রতিবাদ পদে পদে, তবুও আত্মপরিচয়ে মানুষ তাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছে, তাকেই বলেছে ধর্ম অর্থাৎ নিজের চরম স্বভাব; শ্রেয়ের আদর্শ সম্বন্ধে দেশকালপাত্রভেদে যথেষ্ট মতভেদ সত্ত্বেও সেই শ্রেয়ের সত্যকে সকল মানুষই শ্রদ্ধা করেছে, এইটেতে মানুষের ধর্মের কোন্ স্বরূপ প্রমাণিত হয় সেইটে আমি বিচার করেছি। 'হয়' এবং 'হওয়া উচিত' এই দ্বন্দ্ব মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকেই প্রবলবেগে চলছে, তার কারণ বিচার করতে গিয়ে বলেছি— মানুষের অন্তরে এক দিকে পরমমানব, আর-এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্যচেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা-অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত। নইলে কেবল সুবিধা-অসুবিধা প্রিয়-অপ্রিয় প্রবল থাকত জৈবিক ক্ষেত্রে জীবধর্মে; পাপ-পুণ্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো অর্থই থাকত না।

মানুষের এই-যে কল্যাণের মতি এর সত্য কোথায়। ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো প্রথম থেকেই আমাদের মনে তার বোধ যদি পূর্ণ থাকত তা হলে তার সাধনা করতে হত না। বলব, বিশ্বমানবমনে আছে। কিন্তু, সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্বমানবমনের মহাদেশ সৃষ্ট, এ কথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাই যদি হত তা হলে যা আছে তাই হত একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া যেত না। অথচ, যা হয় নি, যা হতে পারে, মানুষের ইতিহাসে তারই জোর তারই দাবি বেশি। তারই আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে বর্তমানের সীমা পার করিয়ে দিচ্ছে। সেই আকাঙ্ক্ষা শিথিল হলেই সত্যের অভাবে সমাজ শ্রীহীন হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমার ব্যক্তিগত মনে সুখদুঃখের যে অনুভূতি সেটা বিশ্বমনের মধ্যেও সত্য কি না। ভেবে দেখলে দেখা যায়, অহংসীমার মধ্যে যে সুখদুঃখ আত্মার সীমায় তার রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে— বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অর্থ তার কাছে উলটো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার করে দুঃখকে অতিক্রম করে। স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হালকা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে, পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে, অলৌকিক বলে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।

আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না, যদি থাকত তাহলে

সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হত না। সংগীতের অসম্পূর্ণতায় বিস্তর বেসুর আছে, সেই বেসুরের একটিও থাকতে পারে না সম্পূর্ণ সংগীতে— সেই সম্পূর্ণ সংগীতের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই বেসুরের হ্রাস হতে থাকে। বেসুর আমাদের পীড়া দেয়, যদি না দিত তা হলে সুরের দিকে আমাদের যাত্রা এগোত না। তাই বিরাটকে বলি রুদ্র, তিনি মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন দুঃখের পথে। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর প্রতি প্রেমকে জাগরিত করে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব, যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহ্বান আসছে আমাদের কাছে।

সেই আহ্বানের আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে অজানার দিকে, এই যাত্রার ইতিহাসই তার ইতিহাস। তার চলার পথপার্শ্বে কত সাম্রাজ্য উঠল এবং পড়ল, ধনসম্পদ হল স্তূপীকৃত, আবার গেল মিলিয়ে ধুলোর মধ্যে। তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কত প্রতিমা সে গড়ে তুললে, আবার ভেঙে দিয়ে গেল, বয়স পেরিয়ে ছেলেবেলাকার খেলনার মতো। কত মায়ামন্ত্রের চাবি বানাবার চেষ্টা করলে— তাই দিয়ে খুলতে চেয়েছিল প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডার, আবার সমস্ত ফেলে দিয়ে নূতন করে খুঁজতে বেরিয়েছে গহনে প্রবেশের গোপন পথ। এমনি করে তার ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর-এক যুগ আসছে— মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে; সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা মত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই। প্রভূত হয়েছে মানুষের ভুলভ্রান্তি নিষ্ফলতা, পথে পথে তারা প্রকাণ্ড ভগ্ন-স্তূপরূপে ছড়িয়ে আছে; মানুষের দুঃখব্যথার আঘাত হয়েছে অপরিসীম, তারা অবরুদ্ধ সার্থকতার শৃঙ্খল-ছেদনের কঠিন অধ্যবসায়; এ-সমস্ত এক মুহূর্তও কে সহ্য করতে পারত, মানুষের অন্তরবাসী ভূমার মধ্যে যদি এর চিরন্তন কোনো অর্থ না থাকত। মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে— মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে, তার নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্যধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই-যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি-- তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন

শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জেলেছে সে হোমহুতাশন।

··শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।
··তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।

··শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।

৩

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—

অথ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে সেই 'দেবতা অন্য আর আমি অন্য' এমন কথা ভাবে সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।

অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী করে রাখে; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত।

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।'

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ-পাথর-পূজাকে বলেছে হীনতা এবং তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে। স্বীকার করি, কাঠ-পাথর বাইরের জিনিস, সেখানে সর্বকালের সর্বমানুষের পূজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রথায় প্রথায় সেই পূজা বিচ্ছিন্ন করে, তার ঐতিহাসিক গণ্ডিগুলি সংকীর্ণ।

কিন্তু, তাদের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, নানাপ্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত, শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতির ঐতিহাসিক কার্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্ব-গ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।

এমনতরো কথায় একটা ক্রুদ্ধ কলরব উঠতে পারে। তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা

করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তা হলে পূজা-ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।

একেবারে উল্টো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা—আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা—বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা। সেইজন্যেই কথিত আছে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পেঁছতে পারি।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎ সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরামৃত্যুশোক-ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে।

'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' এই-যে তাঁকে সন্ধান করা, তাঁকে জানা, এ তো বাইরে জানা, বাইরে পাওয়া নয়; এ যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।

প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ—যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্যজ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন করে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। এক দিকে সে ছোটো নদী, আর-এক দিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেননা সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য; বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য। জীবধর্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে আটক করেছে। মানুষের আত্মা জীবধর্মের পাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে, সেই সাগরের যোগে সে জেনেছে আপনাকে। যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে; নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে। তাই বাউল মানুষকে বলেছে, 'তোরই ভিতর অতল সাগর'। পূর্বেই বলেছি; মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেইজন্যে তা শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই-আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি। আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ। ..
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন, তং বেদ্যং পুরুষং বেদ—যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।

আমাদের শাস্ত্রে সোঽহম্ বলে যে তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে তা যত বড়ো অহংকারের মতো শুনতে হয় আসলে তা নয়। এতে ছোটোকে বড়ো বলা হয় নি, এতে সত্যকে ব্যাপক বলা হয়েছে। আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। মাথায় জটা ধারণ করলে, গায়ে ছাই মাখলে, বা মুখে এই শব্দ উচ্চারণ করলেই সোঽহম্-সত্যকে প্রকাশ করা হল,

এমন কথা যে মনে করে সেই অহংকৃত। যে আমি সকলের সেই আমিই আমারও এটা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এই সাধনাই নানা রূপে নানা নামে নানা সংকল্পের মধ্য দিয়ে চলেছে। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোঽহম্-উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্।

তাই উপনিষদ বলেন, মা গৃধঃ—লোভ কোরো না। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসারযাত্রায় তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে, অতিথিদেবো ভব। কেননা 'আমার ভোগ সকলের ভোগ' এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে; তার ঐশ্বর্যের সংকোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। না নিয়ে গেলে সেটা রাজপ্রাসাদের পক্ষেও দীনতা। এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোঽহংতত্ত্ব—অর্থাৎ, আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।

আমাদের দেশে এমন-সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে-উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ—যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।

পূর্বেই বলেছি, মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে। এই দিকে তার সীমার আবরণ খুলে যাবার পথ। একদা মানুষ ছিল বর্বর, সে ছিল পশুর মতো, তখন ভৌতিক জীবনের সীমায় তার মন তার কর্ম ছিল বদ্ধ। জ্বলে উঠল যখন ধীশক্তি তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে। ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতিভাণ্ডার সুহৃদ্ ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে কবি রজ্জবের একটি বাণী পেয়েছি। তিনি বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে রজ্জব বুঝেছেন, এ কথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তারা তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে—মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা-উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরি দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরি সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে। তবু সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

একদা যেদিন কোনো-একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক বললেন, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘুরছে,

সেদিন সেই একজন মাত্র মানুষই বিশ্বমানুষের বুদ্ধিকে প্রকাশ করেছেন। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় ক্রুদ্ধ; তারা ভয় দেখিয়ে জোর করে বলাতে চেয়েছে, সূর্যই পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক, তাদের গায়ের জোর যতই থাক, তবু তারা প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করবামাত্র চিরকালের মানবকে অস্বীকার করলে। সেদিন অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে কে বলতে পেরেছে সোঽহং, অর্থাৎ, আমার জ্ঞান আর মানবভূমার জ্ঞান এক। তিনিই বলেছেন যাঁকে সেদিন বিপুল জনসংঘ সত্য প্রত্যাখ্যান করাবার জন্যে প্রাণান্তিক পীড়ন করেছিল।

যদি লক্ষ লক্ষ লোক বলে, কোটি যোজন দূরে কোনো বিশেষ গ্রহনক্ষত্রের সমবায়ে পৃথিবীর কোনো-একটি প্রদেশের জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর নিজের ও পূর্বপুরুষের আন্তরিক পাপ যায় ধুয়ে, তা হলে বলতেই হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁঠ।

বিশ্বের বুদ্ধি এ বুদ্ধির সঙ্গে মিলল না। কিন্তু যেখানে বলা হয়েছে, অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি—জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোধন হয় সত্যে, সেখানে বিশ্বমানবমনের সম্মতি পাওয়া যায়। কিংবা যেখানে বলা হয়েছে—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

পাপ করে সন্তপ্ত হলে সেই সন্তাপ থেকেই পাপের মোচন হয়, 'এমন কাজ আর করব না' বলে নিবৃত্ত হলেই মানুষ পবিত্র হতে পারে—সেখানে এই বলাতেই মানুষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে। তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্—সেই দেবতাকে আমাদের আত্মায় জানি যিনি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক। আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোঽহম্।

একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু, তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্‌কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন সোঽহম্; সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।

একদিন যিশুখৃস্ট বলেছিলেন, 'সোঽহম্। আমি আর আমার পরমপিতা একই।' কেননা, তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রী-স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এতবড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অথর্ববেদ বলেন, তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে—যিনি বিদ্বান তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্—

যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেষু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।

মাথা গ'ণে বলব না ক'জন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার। মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, 'অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে।' এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

আমাদের দেশে এমন আত্মাবমাননার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, সোঽহংতত্ত্ব সকলের নয়, কেবল তাঁদেরই যাঁরা ক্ষণজন্মা। এই বলে মানুষের অধিকারকে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ভেদে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চেষ্ট নিকৃষ্টতাকে আরাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে যাদের অন্ত্যজ বলা হয় তারা যেমন নিজের হেয়তাকে নিশ্চল করে রাখতে কুণ্ঠিত হয় না তেমনি এ দেশে অগণ্য মানুষ আপন কনিষ্ঠ অধিকার নিঃসংকোচে মেনে নিয়ে মূঢ়তাকে, চিত্তের ও ব্যবহারের দীনতাকে, বিচিত্র আকারে প্রকাশ করতে বাধা পায় না। কিন্তু, মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম্—এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। যে সেই আপন অধিকারকে খর্ব করে সে নিজের মধ্যে তাঁর অসম্মান করে যিনি কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী— যিনি সকলের কর্মের অধ্যক্ষ, সকলের যিনি অন্তরতম সাক্ষী, সকলের মধ্যে যাঁর বাস।

পূর্বেই দেখিয়েছি অথর্ববেদ বলেছেন, মানুষ প্রত্যক্ষত যা পরমার্থত তার চেয়ে বেশি, সে আছে অসীম উদ্‌বৃত্তের মধ্যে। সেই উদ্‌বৃত্তেই মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।

স্থূলদ্রব্যময়ী এই পৃথিবী। তাকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে তার বায়ুমণ্ডল। সেই অদৃশ্য বায়ুলোকের ভিতর দিয়ে আসছে তার আলো, তার বর্ণচ্ছটা, বইছে তার প্রাণ, এরই উপর জমছে তার মেঘ, ঝরছে তার বারিধারা, এইখানকার প্রেরণাতেই তার অঙ্গে অঙ্গে রূপধারণ করছে পরম-রহস্যময় সৌন্দর্য—এইখান থেকেই আসছে পৃথিবীর যা শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর শ্রী, পৃথিবীর প্রাণ। এই বায়ুমণ্ডলেই পৃথিবীর সেই জানলা খোলা রয়েছে যেখানে নক্ষত্রলোক থেকে অন্ধকার পেরিয়ে প্রতি রাত্রে দূত আসছে আত্মীয়তার জ্যোতির্ময় বার্তা নিয়ে। এই তার প্রসারিত বায়ুমণ্ডলকেই বলা যেতে পারে পৃথিবীর উদবৃত্ত ভাগের আত্মা, যেমন পূর্ণ মানুষকে বলা হয়েছে, ত্রিপাদস্যামৃতম্—তাঁর এক অংশ প্রত্যক্ষ, বাকি তিন অংশ অমৃতরূপে তাঁকে ছাড়িয়ে আছে ঊর্ধ্বে। এই সূক্ষ্মবায়ুলোক ভূলোকের একান্ত আপনারই বলে সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর ধূলিস্তরে এত বিচিত্র ঐশ্বর্যবিস্তার যার মূল্য ধূলির মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি।

উপনিষদ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপনিষদ তাই বলেন, 'শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।' শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে—এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে, প্রমাণের সঙ্গে, বলতে পারা যায় সোঽহম্। এ

নয় যে, চোখ উল্টিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্‌বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই-যে কর্ম, এই-যে শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উদ্যম কোন্‌ সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোঽহম্‌। সেই অধিকার জাতিবর্ণ-নির্বিচারে সকল মানুষেরই। ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সংগ্রহ থেকে বাউলের এই বাণী পাই—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।

প্রতিদিনই মানব-সমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে। ইতিহাসে তাদের নাম ওঠে না, আপন প্রাণ থেকে মানুষের প্রাণ-প্রবাহে তারা ঢেলে দিয়ে যায় তাঁরই অমিততেজ যশ্চায়মস্মিন্‌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমস্তই অনুভব করেন, যেমন আকাশব্যাপী তেজকে উদ্ভিদ আপন প্রাণের সামগ্রী করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণলোকে উৎসর্গ করে।

উদ্ভিদের ভিতর দিয়ে বিশ্বতেজ যদি প্রাণবস্তুতে নিয়ত পরিণত না হতে পারত তা হলে জীবলোক যেমন মরুশয্যাশায়ী হত, তেমনি আমাদের গোচরে-অগোচরে দেশে দেশে কালে-কালে নরনারী নিজের অন্তরস্থিত পরমপুরুষের অমিততেজ যদি কল্যাণে ও প্রেমে, জ্ঞানে ও কর্মে, নিরন্তর সমাজের প্রাণবস্তুতে পরিণত না করত, তা হলে সমাজ সোঽহংতত্ত্ববর্জিত হয়ে পশু-লোকের সাথে এক হয়ে যেত। তাও নয়, আপন সত্য হতে স্খলিত হয়ে বাঁচতেই পারত না। ডাক্তার বলেন, মানুষের দেহে পশুরক্ত সঞ্চার করলে তাতে তার প্রাণবৃদ্ধি না হয়ে প্রাণনাশ হয়। পশুসমাজ পশুভাবেই চিরদিন বাঁচতে পারে, মানুষের সমাজ পশু হয়ে বাঁচতেই পারে না। তার্কিক বলবে, নরলোকে তো অনেক পশু আরামেই বেড়ে ওঠে। শরীরে ফোড়াও তো বাড়ে। আশপাশের চেয়ে তার উন্নতি বেশি বৈ কম নয়। সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের গৌরব সেই ফোড়াকে যদি ছাড়িয়ে না যায় তা হলে সে মারে এবং মেরে মরে। প্রকৃতিস্থ সমাজ অনেক পাপ সইতে পারে, কিন্তু যখন তার বিকৃতিটাই হয়ে ওঠে প্রধান তখন চিন্তায় ব্যবহারে সাহিত্যে শিল্পকলায় পশুরক্তস্রোত আত্মস্থ করে সমাজ বেশিদিন বাঁচতেই পারে না। বিলাসোন্মত্ত রোম কি আপন ঐশ্বর্যের মধ্যেই পাকা ফলে কীটের মতো মরে নি। কালিদাস রঘুবংশের যে পতনের ছবি দিয়েছেন সে কি মানুষের জীবনে পশুপ্রবেশের ফলেই না।

অথর্ববেদে শুধু কেবল সত্য ও ঋতের কথা নেই, আছে রাষ্ট্রের কথাও। জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্য তার রাষ্ট্র। ছোটো টবের বাইরে বনস্পতি যদি তার হাজার শিকড় মেলতে না পারে তা হলে সে বেঁটে হয়ে, কাঠি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে যে ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের, সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাসে ধিক্‌কৃত হয়। সকলের মাঝখানে সকল কালের সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে না 'সোঽহম', বলতে পারে না 'আমি আছি আমার মহিমায়, যে আমি কেবল আজকের দিনের জন্য নয়, যার আত্মঘোষণা ভাবীকালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হতে থাকবে'। ইতিহাসের সেই ধিক্‌কার বহুকালের সুপ্তিমগ্ন এসিয়ামহাদেশের বক্ষে দিয়েছে আজ আঘাত; সকল দিকেই শুনছি জনগণের অন্তর্যামী মহান পুরুষ তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছেন ঝংকার, তাঁর প্রকাশের তপোদীপ্তি জ্বলে উঠেছে তমসঃ পরস্তাৎ।

'মানুষের ধর্ম' : পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র

রব উঠেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে— শোনো বিশ্বজন, তাঁর আহ্বান শোনো, যে আহ্বানে ভয় যায় ছুটে, স্বার্থ হয় লজ্জিত মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খধ্বনি করে ওঠেন মৃত্যুদুঃখবন্ধুর অমৃতের পথে।

ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গতই মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটিমাত্র বিন্দুতে সংহত করে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু, ততঃ কিম। কী হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেইজন্যে মানুষের মুক্তি যে মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। যুগে যুগেই তো জন্মাচ্ছেন তাঁরা দেশে দেশে। আজও এই মুহূর্তেই জন্মেছেন, কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের ধারা চলেছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, এই বাণী বহন করে— সোঽহম্। I and my Father are one.

সোঽহম্ মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা কর কর্ম থেকে ছুটি নিতে! সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে! যে ভীরু চোখ বুজে মনে করে 'পালিয়েছি' সে কি সত্যিই পালিয়েছে। সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন, তা হলে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছুই করতেন না। দীর্ঘজীবন ধরে তাঁর তো কর্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তা হলে আজ পর্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হত আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। কেননা, যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্মা।

নীহারিকার মহাক্ষেত্রে যেখানে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে মাঝে মাঝে এক-একটি তারা দেখা যায়; তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সমস্ত নীহারিকার বিরাট অন্তরে সৃষ্টিহোমহুতাশনের উদ্দীপনা। তেমনি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাই বুঝি যে, সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুত, সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে। পৃথিবীর আরম্ভকালের লক্ষ লক্ষ যুগের পরে মানুষের সূচনা। সেই সাংখ্যিক তথ্য মনে নিয়ে কালের ও আয়তনের পরিমাণে মানুষের ক্ষুদ্রতা বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিমাণকে অপরিমেয় সত্যের চেয়ে বড়ো করা একটা মোহ মাত্র। যাকে আমরা জড় বলি সেই অব্যক্ত প্রাণ বহু কোটি কোটি বৎসর সুপ্ত ছিল। কিন্তু, একটিমাত্র প্রাণকণা যেদিন এই পৃথিবীতে দেখা দিল সেইদিনই জগতের অভিব্যক্তি তার একটি মহৎ অর্থে এসে পৌঁছল। জড়ের বাহ্যিক সত্তার মধ্যে দেখা দিল একটি আন্তরিক সত্য। প্রাণ আন্তরিক। যেহেতু সেই প্রাণকণা জড়পুঞ্জের তুলনায় দৃশ্যত অতি ক্ষুদ্র এবং যেহেতু সুদীর্ঘ-কালের এক প্রান্তে তার সদ্য জন্ম, তাই তাকে হেয় করবে কে। মৃতের মধ্যে এই-যে অর্থ অবারিত হল তার থেকে মানুষ বিরাট প্রাণের রূপ দেখলে; বললে, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। যা-কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে। আমরা জড়কে তথ্যরূপে জানি, কেননা সে যে বাইরের। কিন্তু, প্রাণকে আমাদের অন্তর থেকে জানি সত্যরূপে। প্রাণের ক্রিয়া অন্তরে অন্তরে— তার সমস্তটাই গতি। তাই চলার একটিমাত্র ভাষা আমাদের কাছে অব্যবহিত, সে আমাদের প্রাণের ভাষা। চলা ব্যাপারকে অন্তর থেকে সত্য করে চিনেছি নিজেরই মধ্যে। বিশ্বে অবিশ্রাম চলার যে উদ্যম তাকে উত্তাপই বলি, বিদ্যুৎই বলি, সে কেবল একটা কথা

মাত্র। যদি বলি, এই চলার মধ্যে আছে প্রাণ, তা হলে এমন-কিছু বলা হয় আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যার অর্থ আছে। সেই সঙ্গে এও বুঝি, আমার প্রাণ যে চলছে সেও ঐ বিশ্বপ্রাণের চলার মধ্যেই। প্রাণগতির এই উদ্যম নিখিলে কোথাও নেই, কেবল আকস্মিকভাবে আছে প্রাণীতে— এমন খাপছাড়া কথা আমাদের মন মানতে চায় না, যে মন সমগ্রতার ভূমিকায় সত্যকে শ্রদ্ধা জানায়।

উপনিষদ বলেছেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। একটা কীটও প্রাণের ইচ্ছা করত কিসের জোরে, যদি প্রাণের আনন্দ সমস্ত আকাশে না থাকত। দেশালাইয়ের মুখে একটি শিখা এক মুহূর্তের জন্যেও জ্বলে কী করে, যদি সমস্ত আকাশে তার সত্য ব্যাপ্ত না থাকে। প্রাণের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটি অন্তরতর অর্থ পাওয়া গেল, সেই অর্থকে বলি ইচ্ছা। জড় মূক হয়ে ছিল, এই ইচ্ছার ভাষা জানাতে পারে নি; প্রাণ এসে ইচ্ছার বার্তা প্রকাশ করলে। যে বার্তা গভীরে নিহিত ছিল তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ছাত্র বহুদিন বহু প্রয়াসে অক্ষর শিখল, বানান শিখল, ব্যাকরণ শিখল, অনেক কাগজে অনেক আঁকাবাঁকা অসম্পূর্ণ নিরর্থক লেখা শিখল, উপকরণ ব্যবহার করল ও বর্জন করল বিস্তর; অবশেষে কবিরূপে যে মুহূর্তে সে তার প্রথম কবিতাটি লিখতে পেরেছে সেই মুহূর্তে ঐ একটি লেখায় এতদিনকার পুঞ্জ পুঞ্জ বাক্যহীন উপকরণের প্রথম অর্থটুকু দেখা দিল। জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তার পরে জন্তুতে, তার পরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি— সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ এবং শুভকামনায় হৃদয়কে সর্বত্র এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি— সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুক্‌খা পমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।

সেই সঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক— মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক 'সোঽহম্'।

পরিশিষ্ট

মানবসত্য

আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। শীতপ্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উৎতুঙ্গ দুর্গম গিরিশ্রেণী, আর এই বাংলার মতো সমতলভূমি, সর্বত্রই মানুষের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষজাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষজাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান—এক দিকে পৃথিবী, আর-এক দিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিক লোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারও চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারও বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়, যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালোবাসে, নিজের ক্ষতি করে ফেলে, তখন বুঝি, মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্বমানবের চিত্তের দিকে।

বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের সীমায় খণ্ডাকাশ বদ্ধ, কিন্তু মহাকাশের সঙ্গে তার সত্যকার যোগ। ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সংকীর্ণ হলেও তার সত্যকার বিস্তার সর্বমানবচিত্তে। সেইখানকার প্রকাশ আশ্চর্যজনক। একজন কেউ জলে পড়ে গেছে, আর-একজন জলে ঝাঁপ দিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে। অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ সংকটাপন্ন করা। নিজের সত্তাই যার একান্ত সে বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু, আপনি বাঁচাকে সব চেয়ে বড়ো বাঁচা বললে না, এমনও দেখা গেল। তার কারণ, সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত।

আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডি দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনো। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু, পিতৃদেব সেজন্যে কখনো ভৎর্সনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবন-তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনো কখনো তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি-দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

যখন বয়স হয়েছে, হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গিতে ছিলুম দাদার সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনো পায় নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ভাই, সহযোগী।

তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল। আমার পিতাও খুব প্রত্যুষে উঠতেন। মনে আছে, একবার ডালহৌসি পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। সেখানে প্রচণ্ড শীত। সেই শীতে ভোরে আলো-হাতে এসে আমাকে শয্যা থেকে উঠিয়ে দিতেন। সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সে দিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর— যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে। পাবনার গ্রামবাসী কবি যখন প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্যে 'ট্যাহা দামের মোটরি' আনার প্রস্তাব করেন তখন মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই তখনি সে সুন্দর। সেদিন তাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দেখলুম, সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল, সে সুবুদ্ধির জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। তার সুবুদ্ধির একটু পরিচয় দিই। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেছ?' আমি বললুম, 'না, দেখি নি তো।' সে বললে, 'আমি দেখেছি।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিরকম।' সে উত্তর করলে, 'কেন? এই-যে চোখের কাছে বিজ্ বিজ্ করছে।' সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেছে। সেদিন তাকেও ভালো লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সেদিন মনে হল, তার নির্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে 'অমুক' নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হল, এই মুক্তি। এই অবস্থায় চার দিন ছিলুম। চার দিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেছি। তার পর জ্যোতিদা বললেন, 'দার্জিলিঙ চলো।' সেখানে গিয়ে আবার পর্দা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু, তার পূর্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত— যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

২

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা

যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে—প্রভাতসংগীতের মধ্যে। তখন স্বতই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে তাই ধরা পড়েছে প্রভাতসংগীতে। পরবর্তীকালে চিন্তা করে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, প্রভাতসংগীত থেকে যে কবিতা শোনাব তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্যহিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল তা এতে ব্যক্ত হয়েছে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাৎড়ে হাৎড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু, 'চেষ্টা' বললেও ঠিক হবে না, বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে, অস্ফুটবাক্ মন বিনা চেষ্টায় যেমন করে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাব, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখেছি সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য, ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি না, আমার পক্ষে জোর করে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না; আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা তাঁরা সে কথা ভালো জানেন। হৃদয় যখন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্ছে তখনকার লেখা। একে এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেছি, আমাদের এক দিক অহং আর-একটা দিক আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম মামলা-মকদ্দমা এই-সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই; সেই আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বন্ধ, আর-এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুইই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাটপুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে-লীলা সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান!

না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনে সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট-পুরুষ। সেই-যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই-যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চার দিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত-উৎসব'। একই কথা, আর-একটু স্পষ্ট করে লেখা –

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড়ো ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে-দুজন মুটের কথা বলেছি তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন-কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরও খুশি হয়েছিলুম এইজন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি; যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আকুবাঁকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনোরকমে, পরিস্ফুট হয় নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি তা নয়। এ গান দু দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।...
কিসের হরষ-কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল্‌!
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।

এই-যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই-যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালোরকম প্রকাশ করতে পারি নি। যা বলেছি অসম্পূর্ণভাবে বলেছি।

প্রভাতসংগীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারি দিকে,
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্‌ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনি-রূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সে সময় বালকের মন এই অনুভূতি-দ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাতসংগীতের মধ্যে। সেদিন অক্‌স্‌ফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে সেটা বলা। কিন্তু, তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেছি। এখনো বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনো দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন। স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।

৩

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো

লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর, ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোটো গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্যজীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোস্টমাস্টার' 'সমাপ্তি' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোটো শুকনো পুরানো খালে জল এসেছে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হল। ছেলে-গুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেছে। তারা দিনের মধ্যে দশবার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকাল ব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চার দিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসরযাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন; ইচ্ছে করছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার এক দিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-এক দিকের পরিচয় পাওয়া গেল; এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। আমার মধ্যে এ এবং সে—এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু, পরমপুরুষ আছেন সেই-সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম, 'তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।'

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেককাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, 'লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।' এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত, আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে. আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে— তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে. এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।

একসময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এ ভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি: প্রলোভনের হাত থেকে এমনি ভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই-যে দেখা একে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

শিরোনাম-সূচী

Rabindra-Rachanavali, Chaturdash Khanda, Prabandha :
Collected Works of Rabindranath Tagore (1861-1941),
Volume Fourteenth, Essays, Government of West
Bengal, Calcutta, 1992.
25 cm. × 16 cm.; pp. [8] + 1052; 9 Illustrations.